বাংলার শ্মশান ও গোরস্থান ১

বাংলা ভাষায় সমাজ সংস্কৃতির মুখপত্র

বিশেষ সংখ্যা, মার্চ ২০০০

সূচিপত্র

অন্য, অপূর্ণ সম্পাদকীয়

মানুষ মরে গিয়ে আকাশের তারা হয়। মিটি মিটি করে জ্বলতে থাকে রাতের আকাশে। আর আত্মীয় স্বজনকে যেন বলে—আমিও আছি। আমার কথা মনে রেখো, ভুলে যেয়োনা।

ছোটবেলায় মাকে প্রশ্ন করেছিলাম, মানুষ মরে গিয়ে কী হয়? মা বলেছিলেন—আকাশের তারা। তারপর বাবা মারা গেলেন। পিতৃহীন হলাম আমরা। ভেতরে তখন জমাট বাঁধা হিমশৈলের মত শোক। তবুও আর কোনো প্রশ্ন করিনি। শোক নিবৃত্তির জন্য, আপাত উপশমের জন্য মনে মনে ভেবে নিয়েছি—বাবা আছেন। ওই রাতের আকাশের তারার মিটি মিটি স্পন্দনের ভেতর। শুধু একা আমার বাবা, জ্যেঠামশাই, জেঠীমা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা নন—আরও অগণিত মানুষের প্রিয়জন। কারও স্বামী, কারও স্ত্রী, কারও সন্তান বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। ওই তারার বেঁচে থাকার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের শোকের কেমন একটা নিবিড় যোগ আছে। যদিচ কবি বলেছেন—"হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতেরা কোথাও নেই বলে মনে হয়।" তবুও আছেন। তাই অন্ধকার রাতে তারা ভরা আকাশ পানে তাকালে মন দুঃখের আবেশে পূর্ণ হয়ে যায়। কিংবা চাঁদনিরাতে, যখন বাঁশ বাগানের মাথার ওপর চাঁদ ওঠে, চারপাশে ভেসে যায় আলোর বন্যায় তখন কারও প্রিয়তম শোলোক বলা কাজলাদিদির কথা মনে পড়ে, সেও প্রশ্ন করে—"মাগো আমার শোলোক বলা কাজলাদিদি কই।" কিংবা প্রিয়তম রূপাই-এর পথ চেয়ে সমস্ত দুঃখ ব্যথা সেলাই করে গড়ে তোলা নকসী কাঁথাটি সাজুর কবরের উপর দেখে কত প্রেমিক-প্রেমিকের বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। দুঃখ বাস্প হয়ে বেরিয়েছে মুখ-গহ্বর দিয়ে, বুকের জমাট ব্যথার পাহাড় দিন দিন বাড়ে বই কমে না। আর সেই বৃদ্ধ। নাতি-নাতনীদের সঙ্গে নিয়ে হয়তো তাজমহল দেখাতে পারেন না, কিন্তু বাড়ির পাশের কবরখানায় ডালিম গাছের তলায় যে প্রিয়তমা শুয়ে আছে তাকে দেখিয়ে বলেন—'এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে/তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।' কত কথা মনে পড়ে যায়। কত স্মৃতি বেদনার। বালিকা বধূ, চাঁদের মত মুখ, পুতুল খেলার বয়স। তাই—পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেলে সে কেঁদে বুক ভাসাত। আবার 'বাপের বাড়ি যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা/আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজানতলীর গাঁ।' তার মৃত্যু সে কি কম কথা! তার স্মৃতি বারবার জেগে ওঠে, পরাণ মানে না।

চলতে ফিরতে ট্রেনে, স্টেশনে ভিখিরি ফকিরদের গান গেয়ে ভিক্ষে করতে দেখি। গানের বিষয় দেহতত্ত্ব। জীবনের পরিণাম মৃত্যু। যে ভোগ সম্পদ বিলাস-বৈভব তা কিন্তু মানুষের সঙ্গে যাবে না, টাকা পয়সা, সোনাদানা, দালান কোঠা—এসব মিছে মায়া। সত্য একমাত্র মাটি। মাটিই খাঁটি। কেননা এই মাটিতে মানুষের দেহ মিশে যায়। তাই মাটির ঘরই

শ্রেষ্ঠ। গানের ভাষায়। 'একদিন মাটির ভেতর হবে ঘর, মন রে কেন বাঁধিস দালান ঘর।' আদ্যশ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধের দিন বৈষ্ণব গায়কদের গান শুনেছি, শুনেছি পথে ঘাটেও—'সখী তোরা শুনে রাখ/গোনা দিন বয়ে যায়/আসিস তোরা আমার বিয়েতে। যে বিয়ে হলে পরে কেউ আসে না ফিরে/পড়ে থাকে শ্মশান ঘাটেতে।' কিংবা সেই পরিচিত শ্মশান সঙ্গীত— 'কেউ বা কাটে ঝাড়েরও বাঁশ, কেউ বা পাকায় দড়ি/আর চার জনাতে কাঁধে নিয়ে বলবে হরি হরি।' বিয়ের সময় হিন্দুদের নান্দীমুখ হতে দেখা যায়। যা একপ্রকার শ্রাদ্ধ, একে অগ্র বা জ্যেষ্ঠ শ্রাদ্ধ বলে। পূর্ব পুরুষ'কে সম্মান জানানো। শ্রাদ্ধের সময় জোড়া বৃষ কাঠকে বর বউ-এর বেশে সাজানো হয়। আসলে বিয়ের সঙ্গে শ্রাদ্ধের একটা গভীর যোগ আছে।

যারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী কিংবা বিশ্বাসী নন তারা সবাই জানতে চান মৃত্যুর পর কী হয়? প্রিয়জনের বিয়োগজনিত ব্যথা বা শোকের উপশমের জন্য হিন্দুরা গীতা পাঠ করে, আসলে সেখানে সুকৌশলে শোককে কমানোর প্রচেষ্টা আছে। প্রিয় বিয়োগে ব্যথিত মানুষের শোক আর মহাযুদ্ধের মহানায়ক অর্জুনের শোক এক হয়ে যায়। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের সেই বহু কথিত কাহিনি। শোকগ্রস্ত অর্জুনকে কৃষ্ণের উপদেশ—'যে জন্মগ্রহণ করেছে তার মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতব্যক্তি পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে, সুতরাং এনিয়ে শোক করা সাজে না।' সেখানে আরো বলা হয়েছে—'দেহধারী আত্মার যেমন এই দেহে যৌবন, কৌমার, জরা হয়, সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে, ধীর ব্যক্তি তাহাতে মোহগ্রস্ত হয় না।' এখানে আত্মার অমরত্ব ঘোষিত হয়েছে। সেই বিখ্যাত বাণী ('বাসাংসি জীর্ণানি .....) অর্থাৎ মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নব শরীর গ্রহণ করে।' .... জীবসকল আদিতে (জন্মের পূর্বে) অব্যক্ত, মধ্যে (জীবিত কালে) ব্যক্ত নিধনে (মরণের পরে) অব্যক্ত। তবে কি জন্য তোমার বিষাদ। গীতায় ১৩/২, ১৭/২, ২২, ২৭/২, ২৮ অধ্যায়ে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তা যেন কঠোপনিষদে নচিকেতার সেই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর। গৌতম মুনির বংশজাত—বাজশ্রবস রাজার এই পুত্র সব থেকে কঠিন প্রশ্নের উত্তর চেয়ে যমলোকে যমরাজের মুখোমুখি।

২০-১ম বল্লী, কঠোপনিষদে নচিকেতা প্রশ্নের উত্তর বা তৃতীয় বর প্রার্থনা করেছেন এভাবে—'যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা, মনুষ্যে .....। অর্থাৎ 'হে যম কেহ বলিয়া থাকেন, জীবাত্মা বলিয়া কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। কেহ বলেন জীবাত্মা আছে, মৃত্যুর পব জীবাত্মা বিদ্যমান থাকে। তৃতীয় বর প্রদানে যদি করুণা হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর জীবনের কি গতি হয় সেই বিষয়ে জানতে ইচ্ছা করি।' এর উত্তরে মৃত্যুর অধিপতি যম বলেছেন (দৈবেয়ত্রাপি বিচিকিৎসাতাংপুরা নহি সুবিজ্ঞেয় ....)। অর্থাৎ ''হে নচিকেতা, মানুষ মরিলে কি হয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতারাও এ বিষয়ে বহু সন্ধান করিয়োছেন, কিন্তু তাঁহারাও এ

সম্বন্ধে অনুমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই, সুতরাং আমি এসম্বন্ধে আর তোমাকে কি উপদেশ দিব, তুমি আমার নিকট অন্যবর প্রার্থনা কর।'

আখ্যানের পরের অংশ অনেকেই জানেন। সুতরাং বিস্তার বৃথা। নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর যেন ওই গীতায় বর্ণিত। আগেকার দিনে স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য দুটি যজ্ঞ করা হত যার নাম—দর্শ ও পূর্ণমাস। আর পুত্র অভিপ্রায়ে বা পুত্রের কল্যাণে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন দেখা যায়। আগ্রহী পাঠক, তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী' গল্পের কথা স্মরণে আছে নিশ্চয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে স্বর্গ ও নরক ধারণা দেখা যায়। ইউরোপীয়ানরা 'হেভেন' (কিংডম অফ্ গড) এবং হেল (কিংডম অফ ডেভিল) কল্পনা করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে স্বর্গ (জন্নত) ও দোজখ (নরক) ধারণা বর্তমান। উইলিয়াম এফ, ওয়ারেন এর 'প্যারাডাইস ফাউন্ড' গ্রন্থ অনুসারে দেখা যায় চিনাদের বিশ্বাস—দেবতারা স্বর্গে বাস করেন। জাপানীরা তেনজিকু (স্বর্গ) ও তেনজিকুজিন (স্বর্গবাসী) শব্দের মধ্যে দিয়ে ওই কল্পনার প্রসার ঘটিয়েছেন।

আবার আমাদের দেবীপুরাণে বলা হয়েছে নরক হচ্ছে যমের অনুজ। কালিকাপুরাণ মতে নরক দু'প্রকার ১. স্বর্গীয় নরক—বলির ন্যায় একদৈত্য, ২. ভৌম নরক—ভূমিজাত, ভূমিজ বা মৃত্তিজ। হিন্দু পুরাণের মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে প্রেতপুরী বা চৌরাশির নরকের মধ্যে কেবল দক্ষিণ দিকের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্তনাদ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল স্থল মেঘাবলী, উগরিছে রোষে
কালাগ্নি, দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে। ৮ম সর্গ

কিন্তু মরণকে এত ভয় পাবার কী আছে? তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানুষ মরণ ভয়ে ভীত নন। 'মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান, একথা কে আর বলতে পারেন মৃত্যুঞ্জয়ী ছাড়া? আবার একালের কবিরা মৃত্যুর বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে বলেন—

এখনো গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতা কাঠ ডাকে আয় আয়
যেতে পারি
যেকোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু কেন যাবো?

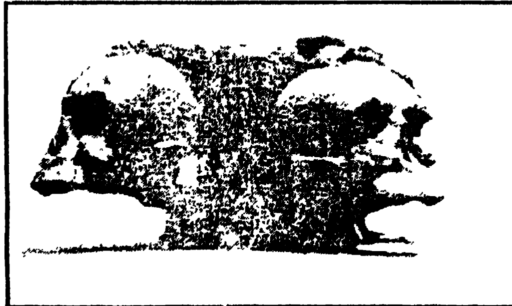
আর একজন কবিতো রীতিমত ঠাট্টা মস্করা করেছেন। তিনি পরকালে বিশ্বাস করেন না। জগৎ কে নিয়ে তাঁর যত মাতামাতি—

মৃত্যুর পরে সব শেষ।
কিছু আহা—উহু, বেশি
দুর্নাম,
চেলারা নতুন গুরুকে
করে প্রণাম
বিধবার ঠোঁটে থাকে পানের রেশ।

শেষকালে কেজো কথা : শ্মশান, গোরস্থান, সমাধিক্ষেত্রগুলোর সংরক্ষণ এক্ষুণি জরুরি। বেদখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ আছে প্রচুর। সমাধিগুলোর স্থাপত্য নিদর্শনগুলো সম্পদ। উত্তরপ্রদেশ সরকারের পঞ্চায়েত বিভাগ ঘোষণা করেছে—অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আচার অনুষ্ঠানে বাধা নেই। কিন্তু লোক খাইয়ে পয়সা নষ্ট করার দরকার নেই (২০ জনের বেশি লোক খাওয়ানো যাবে না)। কলকাতা পুরসভার শ্মশানে, কলকাতার বাইরের লোকজনের শবদাহ করলে এবার থেকে ১৭০ টাকায় হবে না, লাগবে প্রায় দ্বিগুণ। গ্রামাঞ্চলেও কবর দিতে বা দাহ করতে লাগবে কমপক্ষে ৫০ টাকা, সর্বাধিক ১৫০ টাকা। নিমতলা ঘাট সাজিয়ে দিচ্ছে সাহারা ইণ্ডিয়া। বিলেতে কবরখানার জায়গার অভাব দেখা দিয়েছে। তাই তারা দাহ করতে শুরু করেছে।

পাঠক চাইলে হবে আরো ১টি সংখ্যা। মতামত, পরামর্শ কাম্য। ত্রুটি মার্জনীয়।

* গীতার অনুবাদ : যোগীলাল হালদার। * প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের, পত্রিকার নয়। * যাদের ছবি, গ্রন্থ, লেখার অংশ ইত্যাদি ব্যবহৃত সকলের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।



কবরের উপর দগ্ধ মৃত্তিকা নির্মিত নরকপাল

পুরাতনী

মৃত্যুশোক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মা'র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প।[১] অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যে ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু, তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়—তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে!" তখনই বউঠাকুরানী[২] তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা-র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না; সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর-দরজার বাহিয়ে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক-দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া

১. মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু ১২৮১, বুধবার, ২৭ ফাল্গুন [ইং ১৮৭৫, ১১ মার্চ]
২. কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী।

বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম ; গলির মোড়ে আসিয়া তেতলায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ[২] ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ ; শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম, তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত ; আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ; জগতে তাহার আর অন্ত নাই—তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি। কিন্তু আমার ছাব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর[৩] সঙ্গে যে পরিচয় তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়—কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকেও অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমনসময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল—এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে

৩. কাদম্বরী দেবী।

মিল করিব কেমন করিয়া![1]

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিয়া লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি—যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর কবিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে—তেমনি, মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।

তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না—একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না—এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরো গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের

১. তু 'কোথায়' (ভারতী, পৌষ ১২৯১) কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ (সুলভ ১) 'পুষ্পাঞ্জলি' (ভারতী, বৈশাখ ১২৯২) এবং 'প্রথম শোক' ('কথিকা', সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩২৬) লিপিকা ৯।।৩৩

বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড়ো মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোক-লৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে-সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কী মনে করিবে, কিছুদিন এ দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে এক জোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের[১] বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হইতে পারিত এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

এ-সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন, তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা; সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল, তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি আর সরকারি রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিতে ইচ্ছা করে। নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা-পাঁচলা বাড়িগুলা বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি সামনে অক্টর্লনি মনুমেণ্ট্‌টা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ওইটুকুখানি পাশ কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, ধাঁ করিয়া তাহাকে লঙঘন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল—; পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চুড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণ দ্বারের উপরে আঁকপাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিম্বা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকাল বেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

'জীবনস্মৃতি' (১৩১৯)।

৫. Thacker Spink & Co.



এইখানে আসিলে, সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ ; ধনী, দরিদ্র ; সুন্দর, কুৎসিত ; মহৎ, ক্ষুদ্র ; ব্রাহ্মণ, শূদ্র; ইংরেজ, বাঙ্গালি, এইখানে আসিলে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক, সকল বৈষম্য এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, রূসো বল, রামমোহন রায় বল, কিন্তু এমন সাম্য-সংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটক লেখক, একই মূল্য বহন করে। তাই বলি, এ স্থান ধর্ম্মভাবপূর্ণ—এ স্থান সদুপদেশপূর্ণ—এ স্থান পবিত্র।

এইখানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে, মনুষ্যমহত্ত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরে হউক, সকলেই আসিয়া এই শ্মশানমৃত্তিকা হইতে হইবে। যে অমানুষবীর্য্য, যে অহঙ্কার আর পৃথিবী নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে—তুমি আমি কে? যে উৎকট আত্মাভিমান ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে কর চাহিয়াছিল[১] তাহা এই মাটিতে বিলীন হইয়াছে—তুমি আমি কে? সে দিন যে চিন্তাশক্তি, ঈশ্বরকে স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল,[২] তাহা এই মাটিতে মিশিয়াছে—আমি তুমি কে? যে রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, যে সৌন্দর্য্যতরঙ্গে বিপুল রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্যরজ্জুতে জুলিয়স্ সিজর বাঁধা পড়িয়াছিল, যে পবিত্র সৌকুমার্য্যে এ পাপ হৃদয়ে কালানল জ্বলিয়াছে, সে সুন্দরী, সে দেবী, সে বিলাসবতী, সে অনির্ব্বচনীয়া, এই মাটিতে পরিণত হইয়াছে,—তুমি আমি

১ See Lewes' History of Philosophy. Auguste Comte.

২ See J. S. Mill's Three Essays on Religion.

কে? কয় দিনের জন্য সংসার? কয় দিনের জন্য জীবন? এই নদীহৃদয়ে জলবিম্বের ন্যায়, যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই মিলাইতে পারে। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া, একজন ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলাম, কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে যে, আমাকে শৃগাল কুক্কুরে পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার? কিসের জন্য অহঙ্কার? এ অনন্ত বিশ্বে, আমি কে—আমি কতটুকু—আমি কি? এই মাটির পুতুলে, অহঙ্কার শোভা পায় না। তাই বলিতেছিলাম, এই স্থান মনে উঠিলে সকল অহঙ্কার—বিদ্যার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। আর সেই দিন, তাহা অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। যে ভীরুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণসেন, জীবনের ভয়ে, যবনহস্তে জন্মভূমি নিক্ষেপ করিয়া মুখের গ্রাস ভোজন পাত্রে ফেলিয়া, তীর্থযাত্রা করিলেন, তিনি এড়াইতে পারিলেন না। শুনিয়াছি স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই, কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এস্থান স্বর্গের অপেক্ষাও বড়। এ স্থান পবিত্র।

আর স্বার্থপরতার, তাহারও ক্ষুদ্রত্ব অনুমিত হয়। সম্মুখে, অসীম জলরাশি অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে ; পদতলে, বিপুলা ধরিত্রী পড়িয়া রহিয়াছে ; মস্তকোপরি, অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে ; তাহাতে অসংখ্য সৌরমণ্ডল, অগণনীয় নাক্ষত্রিক জগৎ, নাচিয়া বেড়াইতেছে ; সংখ্যাতীত ধূমকেতু ছুটাছুটি করিতেছে, ভিতরে, অনন্ত দুঃখরাশি, ক্ষুব্ধসাগরবৎ, মদমত্ত মাতঙ্গবৎ, দুলিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও সেই দিকেই অনন্ত—আমি কত ক্ষুদ্র—কত সামান্য! এই সামান্যের এই ক্ষুদ্রের, এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রতরের জন্য এত আয়াস, এত যত্ন, এত গোল, এত বিভ্রাট, এত পাপ!—বড় লজ্জার কথা। সেই ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন অতিবাহিত হইল, তাহার মহত্ত্ব কোথায়? কিন্তু তুমি আমি ক্ষুদ্র হইলেও মানবজাতি ক্ষুদ্র নহে। একটি একটি মনুষ্য লইয়াই মনুষ্যজাতি, স্বীকার করি ; কিন্তু জাতিমাত্রই মহৎ। বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, কণা কণা বাষ্প লইয়া মেঘ; রেণু রেণু বালুকা লইয়া মরুভূমি ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র লইয়া ছায়াপথ ; পরমাণু লইয়া এ অনন্ত বিশ্ব। একতাই মহত্ত্ব—মনুষ্যজাতি মহৎ; মহৎ কার্য্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ত্ব আছে। স্বীকার করি, ব্যক্তিমাত্রের ন্যায় জাতিমাত্রেরও ধ্বংস আছে। এরূপ প্রমাণ আছে যে, একাল পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যে দিন মনুষ্যজাতির লোপ হইবে, সে দিন আমিও তাহা দেখিতে থাকিব না, কেননা আমিও মনুষ্য—মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি—

এইখানে আসিয়া সকল জিনিষের সমাধি হয়। ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, সব এই পথ দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ সুখের স্থান। এইখানে শয়ন করিতে পারিলে শোকতাপ যায়, জ্বালা যন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক,

আধিদৈবিক, সকল দুঃখ দূর হয়।[৩] আবার তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এইখানে যে আগুন জ্বলে, তাহা এ জন্মে নিবে না। তাহাতে সৌন্দর্য্য পোড়ে, প্রেম পোড়ে, যাহা পুড়িবার নয় তাহাও পোড়ে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া, সব লুপ্ত হয়। তাই বলি এস্থান সুখেরও বটে, দুঃখেরও বটে—যে চলিয়া যায়, তার সুখ, যে পড়িয়া থাকে তার দুঃখ। এই সংসারেরই ঐ নিয়ম—সবই ভাল, সবই মন্দ। কুসুমে সৌরভ আছে, কন্টকও আছে; মধুতে মিষ্টতা আছে, তীব্রতাও আছে; সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, রোগজনন প্রবণতাও আছে ;[৪] রমণীর চক্ষে সৌন্দর্য্য আছে, সর্ব্বনাশের মূলও আছে, রমণীর হৃদয়ে ভালবাসা আছে, প্রতারণাও আছে। ধনে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যৌননির্ব্বাচনের প্রতিবন্ধকতাও করে।[৫] জগতে কোথাও নির্দ্দোষ দেখিতে পাইবে না। সকলই ভাল মন্দে মিশ্রিত। এই জন্য প্রকৃতি দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলেন, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যে আদি কারণ, সেও ভালমন্দে মিশ্রিত; অথবা দুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুৎপন্ন—সেই শক্তির, একটি ভাল, একটি মন্দ; একটি স্নেহ, একটি

---

৩ দুঃখ ত্রিবিধ;—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই ভাগে বিভক্ত;—শারীর এবং মানস। বাতপিত্তশ্লেষ্মার বৈষম্য নিমিত্ত যে দুঃখ (রোগাদি) তাহার নাম শারীর দুঃখ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয় ঈর্ষা, বিষাদ এবং বিষয় বিশেষের অদর্শন নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহার নাম মানস দুঃখ। উভয় শ্রেণীরই এ সকল দুঃখ আভ্যন্তরীণ হেতুসমুদ্ভূত বলিয়া, ইহাদিগের নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। বাহ্য হেতুসমুদ্ভূত দুঃখও দ্বিবিধ;—আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। মনুষ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ এবং স্থাবর নিমিত্ত যে দুঃখ তাহাই আধিভৌতিক। যক্ষোরাক্ষস বিনায়ক এবং গ্রহাবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ, তাহার নাম আধিদৈবিক দুঃখ। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

৪ Sunstroke. See Tanner's Practice of Medicine. Vol. I page 37 .

৫ The Grecian poet, Theognis, who lived in 550 B.C., clearly saw, that wealth of ten checks the proper action of sexual selection. He thus writies :

"But, in the daily matches that we make,
The price is everything ; for money's sake,
Men marry; women are in marriage given,
The churl or ruffian, that in wealth has thriven,
May match his offspring with the proudest race;
Thus everything is mixed, noble and base!
If then in outward manner, form and mind,
You find us a degraded, motley kind.
Wonder no more, more, my friend! The cause is plain,
And to lament the consequence in vain."

See Darwin's Descent of Man, Part I. chap II. Also Part III. Chap. XX.
যৌন নির্ব্বাচন,—Sexual Selection.

ঘৃণা; একটি অনুরাগ, একটি বিরাগ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ।[৬] কিন্তু, কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি—

ঐই যে সংসার, ইহা এক মহা শ্মশান। চিরপ্রবহমান কালস্রোতঃ, দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে, সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বিস্মৃতির গর্ভে ফেলিতেছে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দেখিয়াছ, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণ দিলেও আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না। এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না, অখিল সংসার খুঁজিয়া দেখিলেও, কোথাও পাইবে না। কোথায় যাইবে, কোথায় যায়, তাহা তুমিও যতদূর জান আমিও ততদূর জানি, এবং তুমি আমি যাহা জানি, তাহার অধিক কেহই জানে না। সবই যায়, কিছুই থাকে না—থাকে কেবল কীর্ত্তি। কীর্ত্তি অক্ষয়। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে। সেক্ষপীয়র গিয়াছেন, হামলেট্ আছে। ওয়াসিণ্টন গিয়াছেন, আমেরিকায় স্বাধীনতার ধ্বজা আজও উড়িতেছে। রূসো গিয়াছেন, সাম্যের দুন্দুভিনিনাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। কীর্ত্তি থাকে। অকীর্ত্তিও থাকে। লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়; কীর্ত্তি ও অকীর্ত্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে। ওয়াসিণ্টনের স্বদেশানুরাগ তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। সেক্সপীয়রের চরিত্রদোষও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।[৭] কিন্তু তাঁহারা লোকের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বলি,—

ভাল মন্দ দুই, সঙ্গে চলি যায়ব,
পর উপকার সে লাভ।

---

৬ Attraction and Resistance of Matter. This theory originated with Laplace; It has been expounded by Herbert Spencer.

৭ K. Villemain says :—"Every year. it is stated. he went during the summer to spend some of his time at Stratford with his wife, his children. and his aged father. The poet's taste for the beauties of nautre, his vivid impression of the green landscapes of England would alone indicate that he was in the habit of seeking rural repose. In his own time, however another motive was attributed for these frequent voyages; it has been stated that, upon the road to his native place, he was fond of stopping at the Crown in Oxford, the hostess of which, remarkable for her elegance and beauty, became the mother of the poet Davenant. Shakespeare, who was an intimate guest, was godfather to his child, who was said to belong to him by a closer tie, and who subsequently took a singular pride in boasting of this descent. We are better able to understand, after this, the zeal of the royalist Davenant for the republican Milton. It was doubtless in his eyes a double debt of poetic parentage."

See Alfonse de Lamartine's Biographies and Portraits of some Celebrated People. vol.I. Essay on Shakespeare & William Davenant.

ইহাই জগতের সারতত্ত্ব—ধর্ম্মের মূলভিত্তি—পুণ্যের সুবর্ণ সোপান।

এই সংসার এক মহাশ্মশান। যে চিতানল ইহাতে গর্জ্জিতেছে, তাহাতে না পোড়ে এমন জিনিস নাই। জড়প্রকৃতি কাহারও মুখ তাকায় না; যাহা সম্মুখে পড়ে তাহাই পোড়াইয়া, সমান জ্বলিতে জ্বলিতে, সমান হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। ঐ যে নক্ষত্রনিচয় অল্পান্ধকারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ও সকল এই বিশ্বব্যাপী মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এ সংসারে কোথায় অনল নাই? নির্ম্মল চন্দ্রিকায়, প্রফুল্ল মল্লিকায়, কোকিলের রবে, কুসুমের সৌরভে, মৃদুল পবনে, পাখীর কূজনে, রমণীর মুখে, পুরুষের বুকে—কোথায় অনল নাই? কিসে মানুষ পোড়ে না? ভালবাস, পুড়িতে হইবে; ভালবাসিও না, তদধিক পুড়িতে হইবে। পুত্রকন্যা না হইলে, শূন্যগৃহ লইয়া পুড়িতে হইবে; হইলে, সংসারজ্বালায় পুড়িতে হইবে। শুদ্ধ মনুষ্য কেন, সমস্ত জীবই পুড়িতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, যৌন নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, সামাজিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, পরস্পরের অত্যাচারে পুড়িতেছে। কে পোড়ে না? এ সংসারে আসিয়া, সুস্থমনে, অক্ষত শরীরে, কে গিয়াছে? আবার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, এ পাপ সংসারে সহৃদয়তা নাই, সহানুভূতি নাই, করুণা নাই। এই অনন্ত জীবসমূহ, এই মহাবহ্নিতে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতেছে;—জড়প্রকৃতি কেবল ব্যঙ্গ করে মাত্র। শশধরের সদা হাসি হাসি মুখে কখন কি বিষাদ চিহ্ন দেখিয়াছ? নক্ষত্র রাজির সোহাগের মৃদু কম্পনে কখন কি হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াছ? কল্লোলিনীর কল নিনাদে কখন কি স্বরবিকৃতি দেখিয়াছ? নবকুসুমিতা ব্রততীর দোলনিতে কখন কি তালভঙ্গ দেখিয়াছ? আমরা পুড়িতেছি—কিন্তু ঐ দেখ, বৃক্ষরাজি করতালি দিয়া নাচিতেছে—ঐ শুন সমীরণ হাসিতেছে—হো—হো—হো।

হায়; এমন করিয়া আর কতদিন পুড়িব? কতদিনে এ যন্ত্রণা ফুরাইবে? আর কখন কি তোমায় পাইব না? আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরে হউক, জন্ম জন্মান্তরে হউক, যুগ যুগান্তরে হউক—আর কখন কি তোমায় পাইব না? না পাই, ভুলিতেও কি পাইব না?

মনে মনে একটা বিশ্বাস আছে যে, যে দিন এই সৈকতশয্যায় শেষনিদ্রায় নিদ্রিত হইব, সেই দিন হয় ত তাহাকে ভুলিতে পারিব—হয় ত এ সায়াহ্নসমীরণ থামিবে—হয়ত এ অনল নিবিবে—হয়ত তাহাকে ভুলিব। এইরূপ একটা বিশ্বাস আছে বলিয়া সময়ে সময়ে মরিতে সাধ হয়। আবার তাও বলি, তাহাকে ভুলিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ মিটিবে, এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া মরিতে পারি না। এজন্মের শোধ সে যে চক্ষের বাহির হইয়াছে, তাহা ত জানি; কিন্তু অন্তরে অন্তরে ত জাগিতেছে। সে যেখানে আছে, সেস্থান পবিত্র—সে মন্দির সাধ করিয়া ভাঙ্গিব কেন? তাহা কি প্রাণ ধরিয়া ভাঙ্গা যায়? সে যতক্ষণ চিন্তার বিষয়, সেই যখন আমার একমাত্র চিন্তা, তখন চিন্তা থাক্। বড় যন্ত্রণা পাই, তা বলিয়া কি করিব? তাহার জন্য যদি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিলাম, তবে মনুষ্যজন্মে ধিক্!—এ ছাই ভালবাসায় ধিক্! ধিক্ এ প্রাণে! ধিক্ এ ছার প্রণয়ে! ধিক্ পরিণয়ে! কিন্তু—

হয়ত আবার তাহাকে পাইব। হয়ত পরলোকে, তাহাতে আমাতে আবার এক হইব।

জাগতিক পরিবর্ত্তন পারম্পর্য্যে, হয়ত সেই মাটিতে এই মাটিতে একত্রে মিশিতে পারে— সেই বরবপুর পরমাণুর সঙ্গে, এই পোড়া মাটির পরমাণুর সঙ্গতি ঘটিতে পারে। দুই দেহের বিশ্লিষ্ট উপকরণের পুনঃসমবায় হইয়া, নূতন এক সত্তা সৃষ্ট হইতে পারে। পরলোকে তাহাতে আমাতে আবার হয়ত এক হইব। বম্ ভোলানাথ! তাহাতে আর আমাতে— প্রাণের যে প্রাণ, জীবনের যে জীবন, নয়নের যে নয়ন, হৃদয়ের যে হৃদয়, তাহাতে আর আমাতে— সংসারের যে কুহক, জীবনের যে ভেল্কি, গৃহের যে আকর্ষণী শক্তি, আমার যে সেই, তাহাতে আর আমাতে—সংসারন্ধকারে যে চাঁদ, জীবন মরুভূমে যে ওয়েসিস্, ভবসাগরে যে তরণী, জীবনের পথে যে পন্থাশালা, তাহাতে আর আমাতে—পৃথিবীর যে সার, স্বর্গের যে নমুনা, ইহলোকের যে সর্ব্বস্ব, পরলোকের যে ততোধিক, তাহাতে আর আমাতে— গৃহকুঞ্জের সেই সুখলতা, চিন্তাসরোবরের সেই প্রফুল্ল নলিনী, আশালতার সেই সংশ্রয়তরু, তাহাতে আর আমাতে—সংসার প্রবাহের সেই স্নেহময়ী সঙ্গিনী, জীবন মরুভূমের সেই শীতল সরোবর, ভূতভবিষ্যতের অন্ধকারের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র, হৃদয়কাননের সেই বিকচ কুসুম, তাহাতে আর আমাতে—আশায় যে বিশ্বাস, মায়ায় যে মোহ, ভালবাসায় যে কবিত্ব মিলিত হইব। সে মরিয়া মাটি হইয়াছে, আমি মরিয়া মাটি হইব;—দুই মাটিতে এক হইবে। আমার দেহের পরমাণুতে, তাহার দেহের পরমাণুতে সংগঠন ঘটিবে। তাহাতে আমাতে এক হইয়া এক নূতন সত্তার অভ্যুদয় হইবে। যাহা হইবে, তাহা মন্দ সামগ্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু কি সুখের মিলন! কি সুখের সংঘটন! আদরেব সেই আদরিণী, সোহাগের সেই সোহাগিনী, অতীতের কোমলাকাশের সেই ইন্দ্রধনু, উপস্থিতের আঁধার গগনের সেই সৌদামিনী— কেমন বুকভরা মিলন! দুইজনে এক হইয়া এক নূতন সত্তা হইব—আমরিরে! কি সুখের সমবায়! জীবের দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কোন্ মূর্খ সন্দেহ করে? আত্মার শরীর পরম্পরাবস্থান অসম্ভব কিসে? পিথাগোরাস্ পূর্ব্বজন্মে এজাক্স্ ছিলেন, ইহা বিচিত্র কি? যে ভীরু বাঙ্গালি সাহস করিয়া দেশের বাহির হইতে পারে না, তাহার শরীরে একিলিস্ অথবা সেকেন্দরের, সিজর অথবা হানিবলের নেপোলিয়ন অথবা ইপামিনণ্ডাসের, ব্রাসিডাস্ অথবা লাইসাণ্ডারের, ভীমের অথবা অর্জ্জুনের দেহাংশ থাকিতে পারে। রামের শরীরে, হয়ত কালডেরন্ অথবা লোপ্‌ডি ভেগার, গেটে অথবা শীলারের, পিটার্ক অথবা ডান্টের, কর্ণেলি অথবা রেসাইনের, সেক্সপীয়র অথবা কালিদাসের, হোমর অথবা বর্জ্জিলের, ব্যাস অথবা বাল্মীকির আত্মা আছে। এই হৃদয় যাহার জন্য লালায়িত, এই হৃদয়ে হয়ত সেই আছে। মনুষ্যদেহের আণবিক পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি সাত বৎসরে নবকলেবর ধারণ করে। সেই ণিয়ত প্রবহমান পরিবর্ত্তপ্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া, হয়ত সেই দেহের পরমাণু এই দেহে মিশিতেছে। জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। জগতে সকলই আশ্চর্য্য। যে গিয়াছে বলিয়া জগৎসংসার আঁধার হইয়া গিয়াছে, সে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে— যুগ যুগান্তরে হউক, কল্প কল্পান্তরে হউক, সেই অকলঙ্কচাঁদ আসিয়া আবার এ গগনে দেখা

দিতে পারে। পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব নহে। তাহাতে—সেই অমূল্য নিধিতে—যাহা যাহা ছিল, সে সকলই আছে। কিছুই একেবারে বিলুপ্ত হয় না। সবই আছে, কেবল একত্রে নাই। সেই সকল উপকরণ জগতে বিরাজমান রহিয়াছে; যেদিন তাহাদের একত্র সংঘটন ঘটিবে, সেই দিন—মনে করিতে হৃদয় নাচিয়া উঠে, প্রাণের ভিতর রোমাঞ্চ হয়—সেই দিন আবার সংসারমরুভূমে সেই সুকুমার, সেই মনোহর, সেই সুন্দর-কুসুম ফুটিবে—দশদিক্ আলো করিয়া, জগৎ হইতে জগদন্তর পর্য্যন্ত সৌরভতরঙ্গ ছুটাইয়া, বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পবিত্রতাস্রোতে ধৌত করিয়া, ফুটিয়া উঠিবে। পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব নয়। জীবের দেহপরম্পরাশক্তি অসম্ভব নয়। হিন্দুধর্ম্মে এমন কোন কথা নাই, যাহা একেবারে ভ্রান্ত—এমন কোন মত নাই, যাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। যে চিন্তাশীল সে চিরকাল বলিবে, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি কোন ধর্ম্ম মানিবার উপযুক্ত হয় ত সে হিন্দুধর্ম্ম।

সে আবার আসিতে পারে। যে গিয়াছে—জগতের মাধুরী হরণ করিয়া, হৃদয়ের পরতে আগুন জ্বালিয়া দিয়া, সোণার সংসার ছারখার করিয়া দিয়া, সুখের পাত্রে গরল ঢালিয়া দিয়া, অন্তরে বাহিরে নৈরাশ্য মাখিয়া দিয়া যে পলাইয়াছে, সে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আমি কি পাগল হইলাম না কি? কোথায় সে? কোথায় আমি? কোথায় সে ভালবাসা? কোথায় সে সুন্দর সংসার? কোথায় সে চিরপ্রেমোচ্ছ্বাস পরিপ্লুত হৃদয়? হায়, কেন মরিলাম না? চক্ষে ধুলা দিয়া সে যখন পলাইল, কেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম না? যখন মৃত্যুর বিকট ছায়া সেই মুখে লাগিল, তখন কেন গরল খাইলাম না? সেই যে চিতা, নৈশান্ধকার দগ্ধ করিযা, ভাগীরথী সৈকত আলো করিয়া জ্বলিয়াছিল, কেন তাহাতে শুইলাম না? সেই সোণার দেহের দগ্ধাবিশিষ্ট অস্থি যখন পাষাণে বুক বাঁধিয়া ভাসাইয়া দিলাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে কেন জলে ঝাঁপ দিলাম না? কেন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলাম না?

হৃদয় মথিত হইল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। কাতরস্বরে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে, ডাকিলাম,—"প্রাণাধিকে, কোথায় তুমি? আমার অন্তরের আলোক, আমার বাহিরের অন্তর, আমার নয়নের মণি, আমার সকলের সব, আমার সবের সকল—জীবনসর্ব্বস্ব তুমি আমার কোথায়?"—অপর পার হইতে কঠোর প্রতিধ্বনি কঠোর স্বরে, অমনি মুখের উপর ডাকিয়া বলিল—আর কোথায়। আকাশে সেই কঠোর স্বর নাচিয়া নাচিয়া বলিল—আর কোথায়। দূরে সেই কঠোর স্বর মিলাইতে মিলাইতে বলিল—আর কোথায়। স্তম্ভিত হইলাম। মুহূর্ত্তেকের জন্য অন্তর-জগতের অস্তিত্ব লোপ হইল। হায়! প্রতিধ্বনি সৃজন করিতে, পোড়া বিধাতাকে কে বলিয়াছিল?

---

*'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আশ্বিন-১২৮২, থেকে পুনর্মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শনের উক্ত রচনায় লেখকের নাম ছিল না। কেহ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী যুগের চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের রচনা। কয়েকটি বঙ্কিম রচনাবলীতে খুঁজিয়াও পাইলাম না। কেহ দাবি করেন ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। সময়াভাবে সমাধানের ভার পাঠকবর্গের হস্তে দিলাম।—সম্পাদক

পুরাতনী

ভারতের আদিম লোকধর্ম

দিলীপ রায়

ভারতের আদিম লোকধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে পৃথিবীর নানা দেশের প্রাগৈতিহাসিক লোকধর্মের কথা না বললেই নয়। শুধুমাত্র ভারতে-পাওয়া নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে আদিম লোকধর্মের ওপর আলোকপাত করা সম্ভব নয়। আজকের লোকধর্মের দিকে তাকিয়ে আদিম লোকধর্মের কথা বলা খুবই কঠিন। সময়ের তালে-তালে লোকধর্মের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের নিয়ম-কানুনও পাল্টে গেছে।

ধর্ম হচ্ছে কতকগুলো বিশ্বাস যার কার্যকারিতা সম্বন্ধে আপাত-দৃষ্টিতে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ এসব আচার অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে পুরুষানুক্রমে ধর্মচর্চা চলে আসছে। আকার বা নিরাকারের অন্তরালে যে অব্যক্ত শক্তিকে কেন্দ্র করে ধর্ম-বিশ্বাস গড়ে ওঠে, তা যুগ-যুগ ধরে আজো অটুট আছে। চেতন-অবচেতন মনে ধর্মের গভীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। আমরা আজ যেভাবে ধর্ম ও লোকধর্মের তফাৎ বুঝতে পারি, আদিম জীবনে ধর্মকে সে ভাবে লোকধর্ম থেকে আলাদা করা যেত না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদমি ধর্মের চরিত্র প্রায় একই। আদিম ধর্মচেতনা গড়ে ওঠার ব্যাখ্যা করতে পারত না, অতিবাস্তব জীবনকে মানতে বাধ্য হত এবং অলৌকিক জীবনকে অস্বীকার করতে পারত না।

আদিম জীবন এখনকার মত এত সহজ সরল ছিল না। প্রতি মুহূর্তে মানুষকে বিপদের সম্মুখীন হতে হত। জীবনযাত্রা ছিল দুর্বিসহ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড তুষারপাত, প্রখর সূর্যের তাপ ফলে খরা, বজ্রপাত, অতি বৃষ্টির জন্য বন্যা, ভূমিকম্পের ভয়াবহ ফাটল, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, পাহাড়ের ধস, আলেয়ার হাতছানি, দাবানলের লেলিহান শিখা ও প্রবল ঝড় প্রভৃতি।

এছাড়া তখন মানুষকে নানা ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হত। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে ভয়ঙ্কর জীবজন্তুর আক্রমণ, এক অঞ্চলের খাদ্য ফুরোলে সে-অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যাওয়া, বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের কামড় ও বিষফল খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়া। কিছু কিছু খাদ্যগুণের অভাব দেখা দিলে শরীরের ক্ষয় হতে-হতে জাতশুদ্ধ বিলুপ্ত হয়ে যেত। দুর্ভিক্ষ হত ও মড়ক লাগল। নানা ধরনের অসুখ ছিল নিত্যসঙ্গী। কোনোরকম

অঙ্গহানি হলে, তার পক্ষে বাঁচা কঠিন হত। গুহা অধিকার নিয়ে দুদল আদিম মানুষের মধ্যে বা হিংস্র পশুর সঙ্গে মানুষের লড়াই হত। এমন কি শিকার না পাওয়ায় অনেকদিন উপোষ পর্যন্ত করতে হত।

সূর্য ওঠে, চাঁদ ডোবে, রামধনু ওঠে, ঋতুর পরিবর্তন ঘটে, ঘুম আসে, স্বপ্ন দেখে, জেগে ওঠে, চলাফেরা করে, শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, জন্ম নেয়, মৃত্যু হয়, মাংসে পচন ধরে— এ সবের কারণ খুঁজে পেত না মানুষ।

প্রকৃতিকে সে আয়না হিসেবে ব্যবহার করত, ধ্যানের ভেতর দিয়ে জগতের নানা বিষয়ের কার্য-কারণ নির্ধারণের চেষ্টা করত, এমনকি প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিয়ে একাত্ম হবার চেষ্টা করত।

হাতিয়ার ব্যবহার, বিপদ সম্বন্ধে সতর্কতা, স্মরণশক্তি, কল্পনা করার প্রবণতা, স্বপ্নদেখা, কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করার গভীর ক্ষমতা, অন্তর্দৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ, রঙ চেনা, জিভের সাহায্যে নানা স্বাদ বোঝা ও বুদ্ধি দিয়ে কার্যকারণ নির্ধারণ করার ক্ষমতা মানুষকে সকল প্রাণী থেকে করেছে আলাদা। মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী হলেও তার পক্ষে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। মৃত্যুর করালগ্রাসকে সে অস্বীকার করতে চাইলেও পারত না।

পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অতি বাস্তবতা, প্রকৃতি সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জন্ম হওয়ার পর থেকেই, তাকে শিখতে হত। ফলে অলৌকিক গল্প, অলৌকিক শক্তির আধার ও প্রেতলৌকিক জীবন সম্বন্ধে জানার আগ্রহ তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত। পরিণত বয়সেও এর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কোনো মতেই সম্ভব ছিল না।

মৃত্যুর পরও মানুষের অস্তিত্ব থাকে, এ-বিশ্বাস পুরাণ পাথুরে সংস্কৃতির যুগ (আপার প্যালিওলিথিক কালচার) থেকে আজও চলে আসছে। দেহে পচন ধরে, বিলীন হয়। আত্মা অবিনশ্বর; সে বেঁচে থাকে পরিবার, আত্মীয় ও গোষ্ঠির মধ্যে। তার আশীর্বাদ বা অশুভ শক্তির প্রভাবের ওপর বাস্তব জীবনের শুভা-শুভ অনেকটাই নির্ভর করে। পাথর, গাছ, পশু পাখিকে সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে ধরে নেয়। পশুপাখির কাছ থেকে সে জীবন ফিরে পেতে চায়। এ বিশ্বাস থেকেই পরবর্তী যুগে টটেম চিন্তা এসেছিল।

স্বপ্নের ভেতর দিয়ে সে কয়েক বছর আগেকার শিকার-কর্মের প্রতিফলন দেখতে পেত। সে ভাবত, এটা সেই জগৎ যেখানে পূর্বপুরুষরা বাস করেন।

প্রকৃতির অমোঘ শক্তি, শত্রুকে পরাজিত করা, মড়ক, অসুখ-বিসুখ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ও প্রেতলোকের অশুভ শক্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আদিম মানুষ পুরোহিতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। জাদু অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে সে এ-সমস্ত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইত। এ সমস্ত জাদু অনুশীলন ও ভবিষ্যৎবাণী করত শ্যামন বা পুরোহিত। কার্যকারণ বিশ্লেষণ করত দলপতি। আবার অনেক সময় দলপতিও 'শ্যামন' হ'ত একই

ব্যক্তি। গুহাচিত্রে দলপতিকে চেনা যায় তার কুল ও কিশ্‌মিশ্‌ জাতীয় ফলের মত জিনিষের অলংকার দেখে। দলের সবচেয়ে এগিয়ে-থাকা ব্যক্তিটিকে পুরোহিত বলে চেনা যায়। অনেক সময় এঁর হাতে জাদুদণ্ড থাকত।

জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে ধর্মের যতটা সম্বন্ধ, জাদুর সঙ্গে ততটা নয়। শ্রদ্ধা এবং পার্থিব জীবনে পাবার আকুলতা,—এ দু'য়ের সমন্বয়ে অলৌকিক শক্তিকে আয়ত্ব করা সম্ভব বলে আদিম মানুষ বিশ্বাস করত। এর থেকেই পশু-দেবতা ও দেবতা 'জন্ম' নেয়।

ফ্রান্সের গুহাবিজ্ঞানী এবেৎ হেনরী ব্রুয়েল আদিম মানুষের ধর্ম ও আলেক্সজাণ্ডার মারশেক্‌ আদিম মানুষের জাদুবিদ্যা অনুশীলন সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন। গুহা-চিত্র পরীক্ষা করে, বর্তমান উপজাতিগুলির লোকধর্ম ও জাদু-অনুশীলন পদ্ধতি এবং আদিম পদ্ধতির মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পেয়েছেন। বর্তমানে নানা দেশের উপজাতিগুলির মধ্যে নানা ধরনের ধর্মীয় আচরণ ও জাদু অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়।

মধ্য-অস্ট্রেলিয়ার কেরকেন উপজাতির মধ্যে জাদু-অনুশীলন ও টটেম বিশ্বাসের প্রচলন আছে। এরা গুহায় উপদেবতা আঁকে যাকে দেখতে অনেকটা অর্ধেক-কাঙ্গারু ও অর্ধেক-মানুষের মত। ধর্মীয়চিহ্ন হিসেবে সূর্য, চন্দ্র, তারা, নদী ও পাহাড় আঁকে। মধ্য অস্ট্রেলিয়ার চুরীঙ্গা উপজাতির লোকেরা গুহাকে মন্দির মনে করে। অনুরূপভাবে ভারতের মধ্যপ্রদেশের সাওড়া উপজাতিও পাহাড়ের গুহাকে মন্দির মনে করে, পূজো অনুষ্ঠান করে। মৃত ব্যক্তির জন্য গুহায় গিয়ে এদের পুরোহিত ছবি আঁকেন। যদি মৃত ব্যক্তি পুরোহিত হন তবে ভগবানের প্রতিভূ করে তাকে আঁকা হয়।

নাগদের মধ্যে 'দিয়াসী' ও 'দিয়াসীন্‌' (স্ত্রী)-কে জাদুবিদ্যা অনুশীলন করতে দেখা যায়। বঙ্গাইন অলৌকিক শক্তি বা অশুভশক্তি। একে নিয়ন্ত্রণ করে 'দিয়াসী'। এসবের দেবতা হল সিংবঙ্গা, মারাবুড়ু, চিমক, ও পীল্‌গো।

উড়িষ্যার শবর, কুখিয়া খোন্দ, করূবোঞ্জা, গদরা, জুয়াং; বিহারের মাল, খাড়িয়া, পাহাড়ী, সনকিয়া, সাবিয়া ও হরোয়াহা ; বাংলার সাঁওতাল, ভূমিজ কোরামাহালী, রাভা, মেচ্‌ প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে জাদু-অনুশীলন ও লোকধর্ম লক্ষ্য করার মত। নানা প্রতীকের মধ্যে উপজাতির মানুষেরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াত; এর ফলে নানা দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। আবার, একসঙ্গে অনেক দেবতার পুজো করার অক্ষমতার ফলে কালক্রমে একটি নতুন দেবতার সৃষ্টি হল, যাকে পুজো দিলে সব দেবতাই তুষ্ট হন।

গুহাচিত্র, পাথুরে ছায়াচিত্র, পাথর, শিং, হাড়, দাঁত, শামুক, ঝিনুক, ডিমের খোলার ওপর খোদাই করে নকশা-করা ও রঙ-করা প্রাগৈতিহাসিক বস্তু, কবর ও কবরে দেওয়া আসবাবপত্র (এই আসবাবপত্র হল, আগে উল্লেখ করা নানা জিনিষের তৈরি হাতিয়ার, অলংকার, খাবার ও মাটির জলপাত্র, পুরুষলিঙ্গ, যোনি, মা ও পশুমূর্তি প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক পুরা-নিদর্শন থেকে আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও জাদু-অনুশীলন সম্বন্ধে

অনেক কিছু জানা যায়।

দেশ-বিদেশে যেসব প্রাসঙ্গিক নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি এখানে তুলে ধরা হল :

এশিয়ার তসীক্তাসে নিয়ণ্ডারথাল মানুষের তৈরি একটি শিশুর কবর-স্থান পাওয়া গেছে। কবরটি পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত। অনেকগুলি ভেড়ার শিংয়ের সূঁচাল মুখ মাটিতে গেঁথে বেড়া দেওয়া হয়েছে কবরটিকে—শিশুর আত্মা যাতে অন্য কোনো মানুষের দেহে না ঢুকে পড়ে।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে লা-কয়েসীতে যেসব কবর খোঁড়া হয়, দেখা গেছে সেসব কবরে খাবার, হাতিয়ার ও প্রাণবন্ত রক্তের প্রতীক লাল রঞ্জক পদার্থ দেওয়া হত। মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির মতই যেন খাবার খাবে, হাতিয়ার দিয়ে পশু শিকার করবে এবং রঞ্জক পদার্থ তার শরীরে রক্ত সঞ্চালিত করবে। এখানকার একটি কবরে, নিয়ণ্ডারথাল মানুষের মাথা ফাটিয়ে তার ঘিলু একটা ডিম্বাকার পাথরের ওপর রেখে মৃত ব্যক্তিকে খেতে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা ধর্মীয় অনুশীলন বলে মনে হয়। বীর পুরুষের মাথার ঘিলু খেলে বীর হওয়া যায়, বুদ্ধিমান মানুষের ঘিলু খেলে বুদ্ধিমান হওয়া যায়, এ বিশ্বাস আদিম চিনের সিনেন্থ পাসদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়—এ ধরনের কোনো ধারণা থেকে হয়তো মৃত মানুষটিকে কবরের মধ্যে ঘিলু পরিবেশন করা হয়েছিল। এটা বীর-পূজার নামান্তর মাত্র।

এ অঞ্চলের এক মহিলার কবর থেকে পাওয়া গেছে, শিং, হাতির দাঁত, হাড়, শামুক, ও ঝিনুক ফুটো করে তৈরি নেকলেস। মৃত মহিলা একটি মহিষের শিং ধরে আছে। দেখে মনে হয় এক জাদুকরী জাদুদণ্ড ব্যবহার করছে। "বেটন ডি কমাণ্ড" বলে অভিহিত অনেকগুলি জাদুদণ্ডও পাওয়া গেছে।

আরো একটা কবরে মানুষের সঙ্গে বুনো ষাঁড়ের মাথাও কবরস্থ করা হয়েছে। সম্ভবত ষাঁড় মৃত মানুষটির 'টটেমে'র প্রতীক। মৃত মানুষটি শুয়ে আছে একটা পাথরের তলায়। ভেতরে দেওয়া হয়েছিল লাল রঞ্জক পদার্থ। চারিদিকে হরিণের শিং পোঁতা ছিল। শরীরের চারপাশে ভালভাবে বাঁধন দেওয়া হয়েছিল, যাতে তাঁর আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে অন্য কোন মানুষের শরীরে না ঢোকে। মৃতব্যক্তি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিল। নিয়ণ্ডারথাল মানুষের দেহ এমনভাবে শোয়ানো হত, দেখে মনে হত মানুষটি মরেনি—যেন ঘুমিয়ে আছে।

ফ্রান্সে নব্য-প্রস্তর যুগে মানুষ কবরের ওপর পাতলা কাঠকয়লা বিছিয়ে দিত। ঘাস-দিয়ে মোড়া জন্তুর পাথর-চাপা কবরও পাওয়া গেছে।

মধ্য-প্রস্তর যুগের একটি কবর পাওয়া গেছে বুন্দেলখণ্ডের বান্দু জেলার বিন্ধ্য-পর্বতের লাক্ষাণীয়াতে (মীর্জাপুর থেকে ৬৫ কি. মি. দূরে)। একটা ডিমের আকারে ঢালু গর্তে কবর দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তিকে শোয়ান হয়েছে পূর্ব-পশ্চিম করে। অন্য আর দুটো কবরে মৃত ব্যক্তিদের শোয়ান হয়েছিল উত্তর-দক্ষিণ করে। সম্ভবতঃ প্রথমজন ও পরের দুই ব্যক্তি

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিল। কবরের সঙ্গে ছিল পাথরের ক্ষুদে হাতিয়ার। এসব কবর পাওয়া গেছে বসত-বাটিরই মেঝের এক অংশে। যে অংশে কবর দেওয়া হয়েছে সে অংশ ব্যবহার করা হত না। গুরু পুজোর প্রচলন ছিল বলে জানা যায় এ প্রদেশেরই মোদিতে পুরাতাত্ত্বিক খনন থেকে।

শ্রীনগরের কাছে বুরজাহোম থেকে পাওয়া গেছে মাটির নিচে গোল গর্ত করা ঘর যার বসবাস করার মেঝের তলা থেকে পাওয়া গেছে নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের কবর। সম্ভবত একই পরিবারের কোনো নিকট-আত্মীয়কে মৃত্যুর পর এখানে কবর দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর পরও নিকট আত্মীয়রা এদের সঙ্গে বাস করছেন বলে বিশ্বাস করত তখনকার মানুষ।

আফ্রিকা, ফ্রান্স, স্পেন ও চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে সেসব মূর্তির বেশিরভাগ জাদু ও ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয়। পশুপাখি ও মা-মূর্তিই বেশি পাওয়া গেছে। নারীযোনি, স্ফীত বুক প্রথম দিকে আনন্দের প্রতীক হিসেবে আদিম ভাস্কর সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয়। পরবর্তী যুগে মা-মূর্তির প্রসারিত যোনি, ভারী নিতম্ব, স্ফীতবুক উর্বরতার প্রতীক হিসেবে দেখান হত। ফ্রান্স, স্পেন ও চেকোশ্লাভাকিয়াতে স্ফীত লিঙ্গ ও যোনি-আকারের পাথর ও হাড়ের তৈরি প্রাগৈতিহাসিক পুরাবস্তুও পাওয়া গেছে।

ভারতের উত্তর প্রদেশের বেলান উপত্যকার মির্জাপুরের কাছ থেকে একটা হাড়ের তৈরি ছোট নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। এই প্রদেশেরই প্রতাপগড় থেকে পাওয়া গেছে হাড়ের আরো একটা মা-মূর্তি।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তারাফেনী উপত্যকার লালজলের কাছ থেকে পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের তৈরি পাথরের একটা মূর্তি। এর গায়ের রং বাদামি। শুধুমাত্র মাথা ও দেহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর সারা গায়ে ছিটে-ছিটে দাগ আছে। নিচের অংশটা মসৃণ ও একই রংয়ের। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়াতে পাওয়া মূর্তির সঙ্গে এর তফাৎ সামান্যই।

মহারাষ্ট্রের ধূলিয়া জেলার পাটনের পুরাতাত্ত্বিক খাতের একটি স্তর থেকে উটপাখির ডিমের খোলার ওপর খুঁদে নকশা-করা পুঁতি পাওয়া গেছে। আরও একটা পুঁতি পাওয়া গেছে, মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা থেকে। গ্রেসিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার থেকে বলা হয়েছে, পুঁতিটির বয়স পঁচিশ হাজার বছর। পুঁতি দুটো সম্ভবত গলার কবচের মত ব্যবহার করা হত। কারণ মাত্র দুটো এধরনের পুঁতি পাওয়া গেছে। শামুক, ঝিনুক, দাঁত, শিং ও হাড়ের পুঁতি যেভাবে অনেকগুলি পাওয়া যায়, সেভাবে এগুলি পাওয়া যায়নি। ভারতবর্ষ থেকে অনেক আগেই উটপাখি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশের নাগদা থেকে পাওয়া গেছে যোনির আকারের একটা বস্তু।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার লালজলের প্রাগৈতিহাসিক গুহার মাটির চতুর্থ স্তর

থেকে নব্য-প্রস্তর যুগের একটা আংটা পাথর পাওয়া গেছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে পাওয়া একই যুগের অজস্র আংটা হাতিয়ারকে যোনির প্রতীক বলে অনেক প্রাগৈতিহাস-বিজ্ঞানী মনে করেন। এখনও বহু গ্রামে দেবতার থানে এ আংটা-পাথর পুজো হতে দেখা যায়। হাতুড়ির কাজে এ-বস্তুটি ব্যবহৃত হত বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন।

নিজের মনের আবেগে এবং মনের জোর বাড়াবার জন্য মানুষ ছবি আঁকত গুহায় বা পাথুরে ছায়ার নিচে। ভারতের বেশিরভাগ চিত্র আঁকা হয়েছে পাথরের ছায়ায়, কিন্তু আফ্রিকা, ফ্রান্স ও স্পেনের গুহা-চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে গুহার একেবারে ভেতরে যেখানে সূর্যের আলো একেবারেই প্রবেশ করে না। আকাঙ্ক্ষিত জন্তুকে কল্পনা করে চিত্রগুলো রূপায়িত করা হত। আদিম চিত্রকরের মনের গভীরে থাকত আধি-ভৌতিক চিন্তার এক প্রচ্ছন্ন ছায়া।

উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ ফ্রান্স, উত্তর স্পেন ও ভারতে অজস্র গুহা ও পাথুরে ছায়ায় অঙ্কিত চিত্র পাওয়া গেছে। এ সব দেয়ালচিত্রে হাতের ছাপগুলোকে জাদুর প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের পেঁচমর্লে গুহার দেয়ালে আঁকা ঘোড়ার গায়ে লাল ছিটে ছিটে যে দাগ দেখা যায়, সেগুলো প্রাণের প্রতীক হিসাবে আঁকা হয়েছিল। গুহার ভেতর অসংখ্য পশুপাখি শিকারের দৃশ্য আঁকা হয়েছে। আধুনিক চিত্রে যেমন দেখা যায়, সেরকম বিভিন্ন ঢংয়ে অজস্র মানুষ আঁকা হয়েছে।

ফ্রান্সের গুহায় পাওয়া একটি দৃশ্যকে ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। ভাল্লুকের চামড়া ও মুখোশ পরে একদল মানুষ গুহার ভেতর ভাল্লুক শিকার করছে। সেই সঙ্গে, শিকারের পর মা-মূর্তির কাছে নৃত্যের দৃশ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এ সমস্ত চামড়া, মুখোশ ইত্যাদি গুহার মধ্যে সযত্নে লুকিয়ে রাখা হত। এ ধরনের নাচ পুরোহিতের নির্দেশ অনুসারে করা হত। কোনো কোনো গুহা-চিত্রে একটি তীরের দ্বারা পশুর হৃদয় বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখা যায়। পশু শক্তির ওপর অলৌকিক শক্তির জয়ের এটা প্রকাশ মাত্র। ভয়ের দৃশ্য, তীব্র দৈহিক যাতনার চিত্র ক্বচিৎ আঁকা হত। শিল্পীর স্বাধীনতা কোনোভাবেই খর্ব হত না।

ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত প্রায় এগারোশো গুহা বা পাথুরে ছায়া চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুহাচিত্র পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশে 'এস' বেল্ট-এ। বিদেশের গুহাচিত্রের সঙ্গে ভারতের গুহাচিত্রের খুব বেশি তফাৎ নেই। এসব চিত্রের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আচরণ, জাদু-অনুশীলন, শিকারের দৃশ্য ও নানা প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। অলৌকিক গল্পকে কেন্দ্র করে অনেক সময় পশুদেবতাকে অতিকায় বা বিকটভাবে দেখানো হত। মধ্যপ্রদেশের পাঞ্চমারিতে কুমিরের মতো মুখের মানুষ চিত্রিত করা হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের বাদামিতে দৈত্যের মতো মূর্তি আঁকা আছে, যার মাথা,

জিভ, পা বিকট দেখতে। অন্য একটি প্রাণীর চোখকে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। এ প্রাণীর লাঠির মতো পা, চৌকো মুখ, সঙ্গে আছে কুকুরের মতো দেখতে অদ্ভুত-দর্শন এক জন্তু। এখানে পুরুষ ও নারী মূর্তির মাঝে এক অদ্ভুত দেবতাকে বিশালভাবে আঁকা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের এদাকলমল পাহাড়ের ওয়েনাদে একটা ভূতের মতো মাথা আঁকা হয়েছে। পশুর মত অনেকগুলি মাথা নিচের দিকে আঁকা হয়েছে। মাথাটা কোনাকুনিভাবে কাটা এবং রোঁয়াপূর্ণ। সঙ্গে সূর্যকেও আঁকা হয়েছে। উপ-দেবতাটি পশুত্বের প্রতিভূ।

বিহারের ঘাটশীলার মধুভাণ্ডে পাঁচটা বড় বড় দেবতার মূর্তি খোদাই করা আছে। সেগুলি আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। একটার ওপর আর একটা মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। দেখলে মনে হয় দেবতারা স্বর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

মধ্যপ্রদেশের সীঙ্গানপুরের পাথুরে চিত্রটি একটি দেবতার। অচেনা একটি পশু এর বাহন। এই প্রদেশেরই চিকলধে একদল মানুষকে নাচতে দেখা যাচ্ছে। এদলে মোট চল্লিশ জন মানুষ আছে। সম্ভবত এটি আদিম কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতিফলন। এ নাচের ভেতর দিয়ে বংশানুক্রমিক বীরত্ব, একতা, ও পূর্ণ শক্তির প্রকাশ হতে দেখা যায় যেভাবে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আজও উপজাতিরা নেচে থাকে। রাইসীনে একটি সন্তান-সম্ভবা গরু ও হাতিকে দেখা যায়। পেটের মধ্যে সন্তানকে পরিস্কার করে আঁকা হয়েছে। এটি উর্বরা-শক্তি ও জাদু-বিদ্যার প্রতিরূপ বলা চলে। জাওরাতে একটা বড় মানুষ-পাখি আঁকা হয়েছে যার অর্ধেক পাখি ও অর্ধেক মানুষ। এটি একটি অলৌকিক দেবতা। জোন্দ্রাচিফ্এ আঁকা চিত্র হল দুটি মহিলা পাথর দিয়ে একটি মন্দির গড়ছে। এ মন্দিরের ভেতর এক অদ্ভুত আকারের বস্তুকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সম্ভবত এটি একটি দেবতা। মধ্যপ্রদেশেব সাতকুঞ্জাতে পাওয়া গেছে একটা ধর্ম অনুশীলনের দৃশ্য। নাগৌরীতে আঁকা আছে একটা কণ্ডুরো আক্রান্ত অদ্ভুত শরীরবিশিষ্ট দেবতা।

এ প্রদেশেরই গান্ধীসাগরে আছে বড় একটা সরীসৃপ ও কুমিরের মত দেখতে এক কাল্পনিক জন্তু এবং দু'জন মুখোশ নাচিয়ে। কাথোটিয়ায় এক দল মানুষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নাচছে। এখানেই আছে একজন মানুষের চোয়ালের মধ্যে জন্য একটি মানুষ। একটা সরীসৃপের পেট অদ্ভুতভাবে আঁকা হয়েছে। তিন জন মহিলা মাটি খুঁড়ছে। একজন দলনেত্রী একটা বড় মাছকে স্পর্শ করে আছে। এছাড়া আছে মিথুন দৃশ্য। খারোসাইতে পাওয়া চিত্রে দেখা যায় মহিলারা মন্দিরের মত কিছু একটা গড়ছে। নাচিয়ে মানুষের দল এবং স্বামী-স্ত্রী নাচছে।

এ প্রদেশের লাক্ষাজোড়ে আছে মুখোশ-পরা শিকারী পশু শিকারে যাচ্ছে। মানুষ এখনও মুখোশকে জাদু অনুশীলনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। মুখোশ-পরা মানুষটি তার শরীর ছেড়ে ঈশ্বরত্ব পায়। সে আলৌকিক কোনো প্রাণী বা টটেমের শক্তি

অধিকার করে। তাড়া চারজন মানুষ তাঁবু বা মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে নৃত্যের দৃশ্যও আছে। এই প্রদেশের মুনিকি পাহাড়ে একটি নারীর গুপ্ত অংশকে বিশেষভাবে আঁকা হয়েছে। আর একটি মূর্তির চৌকো মাথা আঁকা হয়েছে সবুজ রঙ দিয়ে। পুরোহিতের চাদরের মতো এর হাতেও একটা কিছু ঝুলছে। চতুর্ভূজ নালাতে পাওয়া গেছে একটা হরিণের চিত্র যার শরীর জ্যামিতিক নকশায় আঁকা।

মধ্যপ্রদেশেরই পাঞ্চমারির ছোট মহাদেও গুহাতে একটা দেবী মূর্তি আঁকা হয়েছে। আজকের দেবীর মতো তিনি বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। রামচাজাতে আছে একটা নাচের দৃশ্য। একটি গণ্ডারের হৃদয় ও পেটটাকে বিশেষ করে দেখানো হয়েছে। গণ্ডারটিকে শিকার করা হয়েছে।

প্রায় পাঁচশ ছাপান্নটা পাথুরে চিত্র পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশের ভীবেটকায়। এখানকার শিংওয়ালা শূয়োর পশু-দেবতা বলে মনে হয়। পশুর চামড়া পরা জাদুকর ধর্মকথা শোনাচ্ছে। সবুজ রংয়ের তিন মূর্তির মধ্যে বড়টা নকশা করা। একটা মানুষ মুখোশ পরে একটা জাদুদণ্ড ধরে আছে। সম্ভবত মানুষটি স্যামন।

মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম বিন্ধ্য পর্বতের শ্যামলা পাহাড়ের একটা চিত্রে পনেরো জন উলঙ্গ মানুষ হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পুরোহিতের হাতে ছিল একটা জাদুদণ্ড।

পুরুষ লিঙ্গকে স্ফীত ও দীর্ঘাকার দেখানোর পেছনে উর্বরা শক্তির কল্পনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। পরবর্তীকালের লিঙ্গপূজা এ থেকেই শুরু হয়েছিল। মিথুন দৃশ্য শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশ নয়, এটাও একটা ধর্মীয় অনুশীলনের নামান্তর মাত্র।

পশ্চিমবাংলার মেদিনীপুর জেলার লালজলে প্রাগৈতিহাসিক যে পাথুরে ছায়াচিত্র আবিষ্কার করা হয়েছে সেটি একটি হরিণের চিত্র। এ থেকে ধর্মীয় কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়।

প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানুষের ধর্ম প্রকৃত অর্থেই লোকধর্ম। কারণ এসব অনুশীলন সাধারণ আদিম মানুষই করত। আদিম মানুষের ধর্মীয় চিন্তায় দেশ ও বিদেশের কোথাও প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই পূর্ণ অর্থে একে বিশ্ব লোকধর্ম বলা চলে।

* ইন্দুভূষণ অধিকারী সম্পাদিত 'পূর্বাদ্রি'—১৯৮৯ 'লোকধর্ম' সঙ্কলন থেকে পুনর্মুদ্রিত।

সমাধি কথা

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

আবহমানকাল পৃথিবীর সবদেশে মৃতদেহ সৎকার ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রথান এবং কর্মকাণ্ডের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য শেষকৃত্য সম্পৃক্ত প্রথাগুলি যে সবদেশে সমস্ত যুগে একই রকম তা নয়। এমনকি একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত ছিল। আবার গোষ্ঠিভেদে পার্থক্য পর্যন্ত দেখা গেছে।

মৃত সৎকারে দাহ ও প্রোথিত করা এই দুই প্রথা যুগে যুগে প্রচলিত আছে। প্রোথিত ও দাহের সংমিশ্রণে সৎকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি জন্ম নেয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে দাহ করে অবশেষটুকু প্রোথিত করা হয়। প্রোথিত বা সমাধিস্থ করার রীতি ও কৌশল সর্বত্র ও সর্বযুগে একরকম নয়। সাধারণত ধর্মশাস্ত্রীদের নির্দেশ অনুসারে এই কাজ সমাধা করা হয়। মিশরের মমি প্রথা, পারসীক কালদীয় ও আসীরিয়দেব মধ্যে সমাধিপ্রথা অতি প্রাচীনকাল থেকে চালু ছিল। আমাদের দেশে দাহ এবং সমাধি কোনো কোনো সময়ে একই সঙ্গে ঘটে এসেছে। পরবর্তীকালে অগ্নির ভূমিকা কারো কারো কাছে প্রাধান্য পাওয়ায় এবং ধর্মীয় অনুশাসন সমাজবদ্ধ ও গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষ মোটামুটি মেনে চলায় ধর্মীয় নির্দেশে দাহ ও সমাধির মধ্যে প্রথাগত পার্থক্য অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে।

ইহজগতে জীবিতাবস্থায় কোনো ব্যক্তির জীবনচর্যায় যদি সমাজের চোখে অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ে তাহলে সেই অস্বাভাবিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক বিধানের প্রতিফলন দেখা যাবে ঐ ব্যক্তির মরণোত্তর কৃত্যে। আফ্রিকার লো ডাগ্‌গাদের মধ্যে প্রচলিত বিধান মতে যেকোনো রকম সমাজবিরোধীর সমাধিক্ষেত্র হবে গ্রামের বাইরে কোনো জলা বা খানা খন্দ। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের লোককথায় দেখা যায় কোনো খুনী মারা গেলে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে তবে সমাধিস্থ করা হচ্ছে। মিথ্যাচারীর জিভ টেনে বের করে পরে সমাধিস্থ করা, হাত দুটি বেঁধে চোরের মৃতদেহ প্রোথিত করার কথা বলা আছে। মধ্যপ্রদেশে মারিয়ারা আত্মহননকারীদের গ্রামের বাইরে লোকালয় থেকে অনেক দূরে কোথাও প্রোথিত করে।

মিশরে রাজা বা সমপর্যায়ের মৃতদেহ পিরামিড অথবা মস্তবাতে সমাধিস্থ করার রীতি বহুদিনের। প্রসঙ্গত বৌদ্ধদের শারীরিক চৈত্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই প্রথাগুলি

অনুসরণ করলে একটি সত্য দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়, মৃতদেহ সংকারে সাদামাটা স্বাভাবিক প্রথা হল সাধারণ মানুষের জন্য আর অসাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ রীতিনীতি। পৃথিবীর সর্বত্র সর্বযুগে এই পার্থক্য ছিল এবং আছে। এছাড়া কেমনভাবে মৃত্যুটি সংঘটিত হল তার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করেছে মরণোত্তর সংকার প্রক্রিয়া। গর্ভবতী নারীর মৃত্যু, বিশেষ বিশেষ ব্যাধিজনিত মৃত্যু, আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে ভারতের আদিবাসী সমাজ স্বাভাবিক পর্যায়ের বলে বিবেচনা করেনি। তাই এই ধরনের শেষকৃত্যের রীতিপ্রকৃতি প্রচলিত প্রথা থেকে ভিন্নতর হয়েছে।

পৃথিবীর সর্বত্র সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা কেবলমাত্র চমক, প্রত্নসামগ্রী উদ্ধার এবং সংগ্রহশালায় তোলা ও সংবাদ পরিবেশনে মোটেও আর সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, চাইছেন উৎখননের দ্বারা সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা প্রবাহের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান এবং সর্বোপরি সনাতন মানবসন্তানের জীবনচর্যার প্রতি আলোকপাত। সুখের কথা, সাম্প্রতিককালে পুরাতাত্ত্বিকেরা এই প্রেক্ষিতে সমাধিক্ষেত্রকে (পূর্ণ, আশিংক ও পাত্রভ্যন্তরস্থ সমাধি) সবচেয়ে বিশ্বস্ত মাধ্যম বলে মনে করেন।

সমাধিক্ষেত্রের খনন কাজে পুরাতন পদ্ধতির বেশ কিছু সংস্কার সাধিত হয়েছে। নতুন করে নিজেদেরই ভুলের জন্য সমস্যাসৃষ্টি বা বরাবরের জন্য কোনো অমূল্য প্রত্নসম্পদ নষ্ট হতে দেব না—এমন মনোবল নিয়েই যেন পবিবর্তনগুলি করা হয়েছে। এর ফলে সমাধিক্ষেত্র খননে যে যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে তাতে মনে হয় সাংস্কৃতিক পারম্পর্য বর্ণনায় এই সমস্ত বিবরণী হবে সবচেয়ে মূল্যবান দলিল।

বর্তমানে সমাধিক্ষেত্রে যে উৎখনন অবলম্বিত হয় তাকে এক পাশ থেকে সুরু করে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মাটি সরানো একটি মূল কথা। প্রস্থচ্ছেদ, ফটোগ্রহণ এবং নকশার কাজ শেষ হওয়ার পর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমাধিস্থ দেহাবশেষ সরানো হয়। যদি মৃৎপাত্রাভ্যন্তরস্থ সমাধি হয় তাহলে সেই শব অটুট রাখতে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। শেষকৃত্যের অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বস্তু বিবিধ বিচারপর্বে কাজে লাগে।

বারো এবং মহাশ্মীয় (মেগালিথিক,) সমাধির ক্ষেত্রে খাদবিন্যাস সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়। এখানে উৎখনন বাইরে থেকে সুরু হয়ে ক্রমে ভেতরে পৌঁছয়। বলাবাহুল্য, স্তর বিন্যাস অটুট রেখে এ কাজ করা হয়। খাদবিন্যাসে স্ট্রিপ পদ্ধতি অর্থাৎ পুরাক্ষেত্রকে কতকগুলি সমান্তরাল রেখার দ্বারা ভাগ করা যেমন কখনো কার্যকরী হয় তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় কোয়াড্রাণ্ট রীতি অর্থাৎ সমাধিক্ষেত্রকে একটি বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ চার পায়ে ভাগ করা রীতি। শেষের এই পদ্ধতিতে একেকটি পায়ের খনন শেষ করে তবে অন্য পায়ের কাজ শুরু করতে হয়। এতেও সেই বাইরে থেকে খনন সুরু করতে হয়। এতেও সেই বাইরে থেকে খনন শুরু হয়ে ক্রমে ভেতরের অংশে যেতে হয়। সমাধি খনন সম্পর্কিত এই পর্বটি সম্পূর্ণ হাতে-কলমে কাজের পর্ব। এর সঙ্গে প্রত্নস্থল প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা থেকে বিবিধ পদ্ধতি কথা, খননকারীর

কর্তব্যাকর্তব্য, স্তর ও খাদ বিন্যাস প্রস্থচ্ছেদ, ব্যাখ্যা, কাল নির্ণয়, ব্যবহার নির্ধারণ ও খনন বিবরণ প্রদান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির জড়িত। বর্তমান আলোচক এ ব্যাপারে নিজেকে যথার্থ অধিকারী বলে বিবেচনা করেন না। তাছাড়া বর্তমান উপস্থাপনার সীমারেখার মধ্যে ঐগুলি গুরুভার বলে মনে হতে পারে এই আশঙ্কায় ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে এখানে নীরব থাকা গেল। ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সমাধি খননের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় যেটুকু প্রয়োগপর্বের আলোচনা প্রাসঙ্গিক শুধুমাত্র সেইটুকু এখানে উপস্থাপিত হবে।

পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতো ভারতবর্ষে মানুষের ইতিকথা প্রস্তর-যুগের প্রাচীন ও মধ্য পর্ব থেকে বিবৃত হয়। কিন্তু ঐ পর্বের সাংস্কৃতিক নমুনা কয়েকটি আয়ুধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরবর্তীকালের মানুষের কীর্তির বেশ কিছু নমুনা সমাধিক্ষেত্র খননকালে পাওয়া গেছে এবং তা থেকে সংস্কৃতির পারম্পর্য ও তৎকালীন মানুষের জীবনধারার অন্ধকারপর্বে যথেষ্ট আলোকপাত ঘটেছে। রাজস্থানের বেগরের সমাধির বয়সকাল নির্ধারণে বৈজ্ঞানিকরা একমত হয়েছেন যে এগুলি ৩৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মনুষ্যকীর্তি। একই সময়ের সমাধি উৎখনিত হয়েছে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারি, উত্তর প্রদেশের বাঘাইখোড় ও লেখহিয়ায়। ঐ সময়কালের গাঙ্গেয় সমাধির নমুনা দেখা গেছে সরাই-নহর-রাইতে। শেষকৃত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত কিছু চিত্রিত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যেগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য সীমাহীন। উৎখননের ফলে প্রস্তরযুগের এই পর্ব সম্পর্কে পূর্বকৃত অনেকগুলি অনুমান দৃঢ়ভিত্তিক হয়েছে। চিত্রিত মৃৎপাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত তৎকালীন মানুষের সামাজিক, আর্থিক এবং ধর্মীয় জীবনধারা সম্পর্কে সমাধিখনন যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সমাধিগুলি খননে তাম্রাশ্মীয় (ক্যালকোলিথিক) সংস্কৃতির যে নমুনা পাওয়া গেছে তাতে এই সংস্কৃতির প্রকৃতিবিচার ও প্রভাবসীমা অনুসরণে যথেষ্ট সাহায্য মিলেছে। ঝোব তীরবর্তী পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই (খ্রি. পূ. ২৫০০) ; মুঘল ঘুণ্ডাই (খ্রি. পূ. ১৭০০), ডাবর কোট (খ্রি. পূ. ২২০০), কুল্লী (খ্রি. পূ. ২১০০) , মেহি (খ্রি. পূ. ২৫০০), নাল (খ্রি. পূ. ২১৫০), শাহী তুম্প (খ্রি. পূ. ১৮০০), মক্রান (খ্রি. পূ. ২২০০) ইত্যাদি স্থানগুলির সমাধিক্ষেত্রে দেখা গেল পূর্ণ সমাধি, আংশিক সমাধি, মৃৎপাত্রাভ্যন্তরস্থ সমাধি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে লম্বিত সমাধিপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাম্রাশ্মীয় পর্বে কোন্ কোন্ সামগ্রী মৃতের সৎকারে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচতি হত তার কিছুটা আভাস এই খননে পাওয়া গেছে। উৎসর্গীকৃত মৃৎপাত্রগুলি হাল্কা রঙের ওপর লালচে এবং কালো রঙে চিত্রিত থাকত, আর থাকত তামার পাত্র, ছোট দর্পণ জাতীয় বস্তু, তামার বালা বা ঐ জাতীয় বস্তুত বড় দর্পণ এবং অলঙ্কৃত চুলের কাঁটা।

এরপরে সমাধি প্রসঙ্গে যে পর্বটি আমাদের বিচার্য সেই পর্ব নিয়ে বিশ্বের তাবৎ পুরারসিক মাথা ঘামিয়েছেন। এই পর্বটি সমাধি বিচারে হরপ্পা ও রবি সংস্কৃতির ধারক।

বর্তমান উপস্থাপনায় অন্যত্র আমরা সেই প্রসঙ্গে আসছি।

নবাশ্মীয় বা নবোপলীয় (নিওলিথিক) সংস্কৃতির পরিচয়বাহী সমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে কাশ্মীর উপত্যকার বুরজোহোমে। নাবশ্মীয়—তাম্রাশ্মীয় যুক্তপর্বের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে অনেকগুলি সমাধিক্ষেত্রে। কৃষ্ণা উপত্যকার নাগার্জুনকোণ্ডায়, পালাভয়ে, পিকলিহলে, টেক্কালকোটায়, ব্রহ্মগিরিতে, তের্দলে, কোবাল্লিতে এবং হ্যালুরে; কাবেরী উপত্যকার নারসিপুরে; তাপ্তি উপত্যকার বহল-টেকওয়াদায়; অজয় উপত্যকার পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে; গাঙ্গেয় উপত্যকার শোনপুর ও চিরান্দে এবং মহারাষ্ট্রের গোদাবরী তীরের নেবাসা, চাণ্ডোলি, দয়মাবাদ, শোনগাঁও এবং ইনামগাঁওয়ে নবাশ্মীয়—তাম্রাশীয় পর্বের বহু সংখ্যক সমাধি উৎখনিত হয়েছে। এই খননে তৎকালীন মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে যে ধারণা মোটামুটি স্বচ্ছ হয় তাতে জানা যায় যে ঐ সাংস্কৃতিক পর্বের মানুষেরা ছোট ছোট গ্রাম তৈরি করে গোল ও লম্বাটে ধরনের কুটিরে বসবাস করত। চাষ ও পশুপালন তাদের প্রধান বৈষয়িক অবলম্বন ছিল। এই পর্বে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

মহাশ্মীয় পর্বের সমাধির নমুনা ছিল সোয়াত উপত্যকায় সমাধিগুলিতে, টিমারগড়ায়, বলমবটে, থানায়, সৈদু শরীফের কাছাকাছি জায়গায়, বুটকারায় এবং কাটেলাইতে। কাকোড়িয়া, চুনার, কোটিয়া, খেরা, আগ্রা, দৌসা প্রভৃতি স্থানে মহাশ্মীয় এবং প্রায় ঐ প্রকৃতির সমাধির সন্ধান মিলেছে। এই সূত্রে গুজরাটের অমরেলির সমাধির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে হ্যালুর ও পেনিনসুলার সংস্কৃতির সমাধিকথা এসে যায়। এই সঙ্গে বিবিধপর্বের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণতত্ত্ব বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

গত শতক থেকে ভারতবর্ষে সমাধিক্ষেত্র খনন এবং সেই খননলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে প্রাক্ ও প্রায়-ইতিহাস পর্বের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয় প্রদানের প্রয়াস পাওয়া হচ্ছে। এই সূত্রে পুরারসিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কয়েকটি সমাধি উৎখননের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য এ চাঞ্চল্য সমসাময়িক কালসীমার মধ্যে মোটামুটি আবদ্ধ থেকেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে পুনর্বার সেই সমাধি উৎখনিত হয়েছে পূর্বের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কিনা সেই তথ্য যাচাই ও পুরাতত্ত্বের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের আশায়।

মর্টিমার হুইলার প্রাগৈতিহাসিক সমাধির সন্ধানে হরপ্পার উৎখনিত সমাধিক্ষেত্রে পুনরায় খনন কাজ চালান। তাঁর এই কাজে দ্বিস্তর সমাধির তথ্য প্রকাশ পায়। ওপরের স্তরে পাত্রাভ্যন্তরস্থ আংশিক সমাধি নজরে পড়ে এবং নিচের স্তরে পাওয়া যায় লম্বিত ও বিক্ষিপ্ত সমাধির অস্তিত্ব। এই খননে উল্লেখযোগ্য আরেকটি তথ্য প্রকাশ পায়—উৎখনিত ঐ দুই স্তরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র ইত্যাদি যথার্থ হরপ্পাচিহ্নিত মৃৎপাত্র থেকে নিঃসন্দেহে পৃথক্।

তাছাড়া কফিনের সন্ধানও এ খননে পাওয়া গেছে।

প্রায় শতাধিক বছর আগে দক্ষিণ ভারতীয় মহাশ্মীয় সমাধি নিয়ে মেডজ টেলর কাজ শুরু করেন। দীর্ঘদিন তারপর কেটে গেছে। বছর পঁচিশেক আগে পুনরায় সেই সমাধিক্ষেত্রে এই যুগের পুরাতাত্ত্বি নজর পড়ল। এবার খনন শুরু হল মহীশূরের ব্রহ্মগিরিতে এবং এই খননে দক্ষিণ ভারতের মহাশ্মীয় সংস্কৃতির এক বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ল। এতদিন যে প্রশ্নে বিতণ্ডার অন্ত ছিল না সেই মহাশ্মীয় সংস্কৃতির দক্ষিণী প্রকৃতির বয়সকালও জানা গেল খ্রি. পূ. ২০০ থেকে খ্রি. প্রথম শতক। মহাশ্মপূর্ব এবং তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির দক্ষিণী-রূপের বয়সকাল এ থেকে স্পষ্ট হল।

তক্ষশীলা বর্তমানে পাকিস্তানে রাওয়ালপিণ্ডির একটি জগৎবিখ্যাত পুরাতীর্থ। এখানে পরপর তিনটি নগরের অস্তিত্ব ছিল। ভূগর্ভে গ্রীক রাজাদের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে দ্বিতীয় নগর শিরকপ দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছে। এখানে উৎখননে অগণিত প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে। তাছাড়া শিরকপে এক পাহাড়ের ওপর শারীরিক চৈত্যের সন্ধান মেলে। এই চৈত্য সম্পর্কে কেউ কেউ অনুমান করেছেন এটি হয়ত অশোকপুত্র কুণালের স্মৃতি বহনকারী চৈত্য।

উত্তর বিহারের চম্পারণ জেলায় নন্দনগড়ে অশোকস্তম্ভের কাছে অনেকগুলি স্তূপ আছে। প্রায় সত্তর বছর আগে সেগুলি খনন করা হয়েছিল এবং তা থেকে অনুমিত হয় যে দাহের পরে বৈদিকরীতির ভস্মসমাধি রক্ষার জন্য ঐ স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। বছর তিরিশেক পরে ঐ স্তূপ পুনর্বার উৎখনিত হয় এবং শেষবারে যে তথ্য প্রকাশ পেল তাতে জানা গেল ওগুলি বৌদ্ধ শারীরিক চৈতন্য। চৈত্যগর্ভে তাম্রপুটের মধ্যে পত্রে বৌদ্ধসূত্র লিখিত অবস্থায় ছিল।

নালে এবং শাহী তুম্পে প্রাক্ হরপ্পা, হরপ্পা সমসাময়িক এবং পরবর্তী অর্থাৎ প্রলম্বিত ও আংশিক সমাধি পাওয়া গেল। গত দশকে সমাধিখননে কালিবঙ্গা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালের মানুষের সমাধি খননকালে কিছু কিছু মনুষ্যেতর প্রাণীর অস্থি পাওয়া গেছে। যেহেতু এগুলি টুকরো টুকরো অস্থি এবং পরিপার্শ্ববিচারে যে অনুমান স্বাভাবিক তাতে মোটামুটি সিদ্ধান্ত হয় যে, সমাধিকালে মৃতের সৎকারে উৎসর্গীকৃত নানারকম মাংসখণ্ডের অবশেষ এগুলি। (দাহ এবং দাহশেষের অবশিষ্ট প্রোথিত করার কৃত্যাকৃত্য আলোচনা সূত্রে লিখিত সাহিত্য একটি অনুমানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে : 'A goat was burnt with the dead: so a cow. Here the idea clearly expressed in the text (Rg. Veda X) is that the body is covered with the hide, fat and narrow of the cow or goat, so that Agni may not consume the body to ashes and give pain to the dead body with its scorhing heat of flames.'— Origin and Development of the Rituals of Ancestor Worship in India. pp. 21.

সংকারের মধ্যপর্ব জুড়ে দাহ এবং অন্তকৃত্যের অবশেষ প্রোথিত করার যে দীর্ঘ ইতিহাস আছে, প্রত্নতত্ত্বের আলোতে সেগুলি যাচাই এবং অশ্মীয় সংস্কৃতি নির্দেশিত কৃত্যাকৃত্য বিচার বর্তমান উপস্থাপনায় পৃথক্‌ভাবে করা হয়নি। Journal of Ancient Indian History Vol. III-তে ডঃ ডি. আর. দাস একটি সুশৃঙ্খল সন্ধানপত্র রেখেছেন। উৎসাহী পাঠক এইসূত্রে সেটির প্রতি দৃষ্টি দান করবেন এমন ভরসায় এবং দাহপর্বটি সমাধিকথার আওতায় না আসায় আমরা মধ্য-পর্যায়ের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ে বিস্তারিত হওয়া সমীচীন মনে করলাম না।)

কিছুদিনের মধ্যে এই সূত্রে যে তথ্য প্রকাশ পেল তাতে জানা যায় কেবলমাত্র মনুষ্যেতর প্রাণীর জন্য সমাধিব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারত ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে প্রাণী সমাধির নমুনা প্রায় ডজনখানেক পাওয়া গেছে। এগুলির কোনো কোনোটি মানুষের সমাধিক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থিত। এই সমাধিরীতির সাংস্কৃতিক পর্ব ধরা হয়েছে নবাশ্মীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্যায় থেকে মহাশ্মীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্যায়।

অন্ধ্রের গুন্টুর জেলায় নাগার্জুনকোণ্ডায় মনুষ্যেতর প্রাণীর সমাধির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। ওখানকার সমাধিক্ষেত্র তৎকালীন বসতি থেকে অনেকটা দূরে ছিল। খননকালে একটি ক্ষেত্রে মৃত প্রাণীর সংকারে উৎসর্গীকৃত ধুসর মসৃণ মৃৎপাত্রের নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। আফগানিস্তানের দারা-ই কুরেও এই ধরনের প্রাণীসমাধি উৎখনিত হয়েছে। দারা-ই-কুরের এই সমাধির নবাশ্মীয় পর্যায়ের বয়সকাল ১৮৩০—১৩০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ এবং ১৫৭৫—১২৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। এই সময়কালের সঙ্গে কাশ্মীরের বুরজোহোমের প্রাণীসমাধির বয়সকাল আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়। কোনো কোনো পুরাতাত্ত্বিক নবাশ্মীয় এই পর্বটিকে ছাগ-সমাধি নবাশ্মীয় সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করেছেন। এখানে প্রলম্বিত ও অংশত এই দুই প্রকার সমাধির অস্তিত্বকথা জানা গেছে।

পশ্চিমবাংলার কয়েকটি জেলার গ্রামাঞ্চলে হঠাৎ পথের ধারে বা মাঠের মাঝে কতকগুলি আদিম চেহারার পাথরকে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে এমন ভঙ্গীতে প্রোথিত দেখতে অনুমিত হয় ঐগুলি সংকার-স্মারকচিহ্ন অথবা সমাধি নির্দেশক স্তম্ভ। মহাশ্মীয় মেনহির প্রসঙ্গে গ্রামদেশের এই স্তম্ভগুলি স্মরণে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে অগণিত এই ধরনের স্তম্ভের সংবাদ থাকলেও খননকাজ আজ পর্যন্ত বেশি হয়নি। অন্ধ্রপ্রদেশের রায়চুর জেলার মাস্কি এবং পিকলিহলের মেনহির খননে স্পষ্ট জানা গেছে ঐ স্তম্ভের নিচে কিছুই প্রোথিত ছিল না। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের ধানোড়া থেকে. ওই একই সমাচার এল। একমাত্র কেরালার দেবীকুলমে শোনা গেল পাত্রাভ্যন্তরস্থ সমাধির কথা।

অবশ্য আজও কোনো কোনো আদিবাসী সমাজে দাহশেষে কিছু অবশেষ নিয়ে হাড়সারি নামক বিশেষ একটি স্থানে বংশ পরম্পরাগতভাবে ভূগর্ভে প্রোথিত করে ঐ

মেনহিরের ঢঙে নির্দেশক চিহ্নের স্তম্ভ দেওয়া হয়। বস্তুত এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পর্ব একই সময়ে একভাবে সর্বত্র সমস্ত গোষ্ঠীতে দেখা দেয়নি। যখন একদল মানুষ বিংশ শতকের বিজ্ঞানের জয়ে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে অচিন্তনীয় পরিবর্তন সংসাধিত করেছে তখনো হয়তো অন্ধকারে পড়ে থেকে আরেকদল মানব সন্তান মহাশ্মীয় সংস্কৃতির খোলস ছেড়ে বাইরে আসতে পারেনি।

বুদ্ধের ভস্ম, দেহাবশেষ অথবা ব্যবহৃত সামগ্রীর উপর যে স্থাপত্য গড়ে ওঠে তাকে চৈত্য অথবা স্তূপ বলা হয়। এই স্তূপ বা চৈত্যের সাধারণত তিনটি দিক বিবেচনা করা হয়। বৌদ্ধদের নির্বাণের পর দেহাবশিষ্টের উপর যে চৈত্য গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় শারীরিক চৈত্য। এই শারীরিক চৈত্য ঐতিহাসিক যুগের সমাধি বিষয়ে আমাদের বিশেষ তথ্য প্রদান করে। আর যে দুই ধরনের চৈত্য আছে তার একটির নাম পারিভোগিক এবং অপরটি ঔদ্দেশিক চৈত্য। বৌদ্ধ শারীরিক চৈত্যের ভাবনা নিঃসন্দেহে ভারতে বসবাসকারী আদিম মানুষের অমরত্বসন্ধানী সমাধিস্তম্ভের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্ধিত হয়েছে।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকে দেখা যায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পির, গাজী, দরবেশ, সাহেবাৎ, বিবিসাহেবা এবং হিন্দু ও অন্য ধর্মের সন্তেরা সাধারণ মানুষকে আকর্ষণের জন্যে চতুর্দিক থেকে উঠে পড়ে লেগেছেন। সন্তদের মৃত্যু ও সমাধির পর ভক্তদের একটি পবিত্র কর্তব্য দেখা দেয়, বিদেহী সন্তের গুণকীর্তন। এই গুণকীর্তন চরম রূপ নেয় অর্থাৎ সার্বজনীন মহিমা প্রচারের পরিণতি লাভ করে সাধারণত বাৎসরিক উরুস উৎসবে। বস্তুত, মনুষ্যত্বে এই জাতীয় দেবত্ব আরোপ আদিমকাল থেকে চলে আসছে।

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সন্ত, দেবায়িত মহিমাসম্পন্ন মানুষ, দক্ষ রাষ্ট্রকর্তা প্রভৃতি অগণিত মানুষের সমাধিক্ষেত্র রয়ে গেছে। আর্ত, অর্থী লোকসমাজ এইসব সমাধিক্ষেত্রে হাজির হয়ে তাদের বাসনা কামনা প্রার্থনা জানায়। মহাকালের বিচিত্র ভূমিকায় সমাধিস্থ ব্যক্তির মহিমা ক্রমে ক্রমে বহুগণ পল্লবিত হয়ে এক অবিশ্বাস্য রূপ পরিগ্রহন করে। সারা বাংলায় যেসব সন্ত-সমাধি আছে মুখে মুখে তার এক অপূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি হলেও ব্যাপারটির সামাজিক গুরুত্ব কিছুটা স্পষ্ট হয়। এখুনি যে নামগুলি স্মরণে আসে : চেলপির, কাদের জিলানী পির, বিবি ফতেমা, মুবারক গাজী, পির নাসিরখান, পাগলা পির, জরান বিনি, ঢকর সৈদ পির, একিন পির, খোয়াজা পির, পির পানাউল্লা, লোচন দাস, মজলিস সাহেব, বদর সাহেব, দানেশ মন্দ, ভাঙ্গর সুলতান সাহেব, সৈদ মুর্তজা সাহেব, মোসলেমুদ্দিন গাজী, করিম শাহ, মস্তরাম আউলে, দাতা পির, ভোলা পির, শাহ আলম, ফরিদ সাহেব, দেওয়ান পির, মাদার সাহেব, সৈয়দ হুসেন, মচ্ছন্দি পির, হজরত পির, জাফর খাঁ গাজী, মালেক-উল-গউস, তেঁতুল পির, মীর আহম্মদ ফকির, পির গোরাচাঁদ, বড়া পির, নূর কুতব আলম, গাজী মিঞা, কোতয়ালি সাহেব, গউসউদ্দিন

পির, পির গোলাম আলী, পির শাহ্ সুলতান, খান পির, সৈয়দ পির সাহেব, গদাই পির, রণাই পির, পির বাহারম, বড়া খাঁ গাজী, পির পাঞ্জাতন, পির খকড়র সাহেব, সন্ত জয়পাল, বালা পির, হজরত শাহ হোসেন বোখারি, শাহ সুফী সুলতান, খয়রার রহ্মান, সৈয়দ তাবিরোর রহমান, আবেদার রহমান, সৈয়দ ফয়জুর রহমান, মৌলানা মোস্তাফা মাদানি, ছোটা পির, বুঢ়া পির, হজরত মাছুম, তৈয়বহ সাহেব, ফতে আলী, মাজেদ সাহেব, আতাউল্লা দরবেশ, জেঠা পির, মীর সাহেব, নাছমোছ সাহাদাৎ সাহেব, আবদুল মোমেন কুতুব পির, রক্ত গাজী, মখদুম শাহ, নূর কুতব, আলাউল, আখিসেরাজ, জেন্দা পির, করম আলী, কোরবান সাহেব, মিঞা পির, বিবি নাজ, ঠোক্কর সাহেব, সৈয়দ মহম্মদ শাহ, কোরা সাহেব, বারা খাঁ গাজী। এছাড়া রয়ে গেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির অসংখ্য সমাধি। বর্ধমানে ভূগর্ভে প্রোথিত রয়েছেন রহিম খাঁ, খোজা আনওয়ার-শাহ, শের আফগান ও কুতবদ্দিন। খোজা আনওয়ার ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ সেনাপতি এবং তাঁর সমাধিক্ষেত্র বাঁধিয়ে দেন বাদশা ফেরুক শা। বর্ধমান রাজপরিবারের আবু রায় থেকে জগৎরাম পর্যন্ত সকলের সমাধি রয়ে গেছে দাঁইহাটে। ওদিকে মালদহে রয়েছে রিয়াজ-উস্-সালাতিনের ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের সমাধি।

গৌড়ে ফিরোজ মিনার থেকে সামান্য তফাতে গড়ের পাঁচিলের পাশে অবহেলিত এক সমাধি রয়েছে যার সম্পর্কে পূর্বপ্রচলিত লোককথা আজও মুখে মুখে ঘোরে। শোনা যায়, যেদিন মিনারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল সেদিন সুলতান ফিরোজ শাহ রাজমিস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মিনারের ছাদে ওঠেন। সুলতান মিনারের প্রশংসা করায় স্থপতি আনন্দাতিশয্যে বলে ফেলে,—এ আর কি দেখছেন হুজুর। এর দুগুণ লম্বা করতে পারতুম।

—তা করলে না কেন? —সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন।

—মাল মশলা ছিল না।

—দরবারে জানিয়েছিলে?

সুলতানের শেষ প্রশ্নে বেচারা মিস্ত্রী একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিতে যাবে এমন সময়ে প্রহরীদের উদ্দেশ্যে গৌড়েশ্বরের হুকুম শোনা গেল : ওকে ওপর থেকে নিচে ফেলে দাও। বলাবাহুল্য, সুলতানের হুকুম মুহূর্তে পালিত হয় এবং মিনারের মূল কারিগরের জীবনে এইভাবে চিরঅন্ধকার নেমে আসে। ফিরোজ মিনার রয়েছে, কাছেই রয়েছে মিস্ত্রীর সমাধি। আজও রিকশা কিংবা টাঙ্গাওয়ালারা সুলতানের কথোপকথনের টাট্‌কা প্রতিবেদন পেশ করে মিস্ত্রীর ভুল কোন্‌খানে হয়েছিল তা নির্দেশ করবে এবং পরিদর্শককে এক বিচিত্র আলো-আঁধারির পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যাবে।

একলাখী প্রাসাদে শায়িত রয়েছে গণেশপুত্র যদু বা জলালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ, তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র। পঃ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে পুরানপাড়া ও রামচন্দ্রপুরে বানগড়ের ধ্বংসাবশেষের পাশেই রয়েছে জদিঘি-কালদিঘির আতাউল্লা ও করম আলীর সমাধি,

গোবিন্দপুরে আছে হোসেন শাহের সমাধি। মুর্শিদাবাদের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মধ্যযুগের অগণিত সমাধি ছড়িয়ে রয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি সমাধিকে ঘিরে লোককথার ছড়াছড়ি। শেখ দিঘির সৈয়দ ত্রিমিজ, লালগোলার মোছলেমুদ্দিন, ভগবানগোলার করিম শাহ্, শেখপুরার দাতাপীর, জিয়াগঞ্জের মস্তরাম, তোকিয়ার দেওয়ানপীর, বেল-ডাঙ্গার ফরিদ সাহেব, জাহানীয়া এবং পলাশীযুদ্ধের মীর মদন, জগন্নাথপুরের মাদার সাহেব, খড়গ্রামের পাঁচ পীর, গাতলার হুসেন পীর, বরঞার আলমগীর, তালিবপুরের সালার জং, সিজগ্রামের হজরত ফকির, সুতির জরান বিবি এবং ছাপঘাটির মর্তুজা হিন্দের সমাধি বাৎসরিক উৎসব ছাড়াও লোকসমাজকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কাছে টানে। নওদার সাফুয়াগ্রামের লোককথার সেই সাধুর সমাধিক্ষেত্রে নিম গাছের নিচে আজো সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে। তাছাড়া নবাব ও উচ্চতর রাজকর্মচারীদের সমাধির আকর্ষণ তো আছেই। কিছুটা ভিন্নতর লোককথায় রয়েছেন ছাপঘাটির মর্তুজা হিন্দ। তাঁর সাধনায় ভৈরবী ছিলেন আনন্দময়ী নামে এক ব্রাহ্মণকন্যা। ছাপঘাটির সমাধিকে লোকে তাই মর্তুজানন্দের সমাধি বলে। মর্তুজা এবং আনন্দময়ী দুজনের দুটি সমাধি পাশাপাশি রয়েছে।

শহর কলকাতার বুকে দেবায়িত মহিমা সম্পন্ন ব্যক্তির সমাধি বেশ কয়েকটি রয়েছে এর মধ্যে বড়বাজারে সোনাপট্টির পীরসমাধি ও লোককথার প্রকৃতিও একটু ভিন্নজাতের। শোনা যায়, গত শতকে সোনাপট্টির এক অবাঙালি ভদ্রলোক তাঁর ঘোড়ার গাড়ি চালাবার জন্য জনৈক প্রৌঢ় মুসলমানকে নিয়োগ করেন। ঐ অবাঙালি ভদ্রলোকের মা প্রতিদিন ভোররাতে গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। কোনো কোনোদিন তিনি মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে এবং প্রাতঃকৃত্য সেরে গঙ্গায় যেতেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কোনোদিন ঘুম থেকে উঠে তিনি গাড়ি চালক কোচ-ম্যানসাহেবকে দেখতে পান না। গভীর রাতে বাড়ির সদর বন্ধ হয়। সদর বন্ধের সময় রোজই দেখা যায় কোচ-ম্যানসাহেবকে দেখতে পাননা। গভীর রাতে বাড়ির সদর বন্ধ হয়। সদর বন্ধের সময় রোজই দেখা যায় কোচম্যান শুয়ে আছে অথচ রাত্রিতে উঠলে আর দেখতে পাওয়া যায় না। এইভাবে দীর্ঘদিন দেখার পর বৃদ্ধার জেদ চেপে গেল, কোচম্যান কখন ওঠে এবং কোথায় যায় তাঁকে জানতে হবে। একদিন মাঝরাতে বৃদ্ধা জেগে আছেন এমন সময় দেখলেন কোচম্যান কাঁধে গামছা নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে চলেছে। বৃদ্ধাও চললেন পেছন পেছন। কোচম্যান গঙ্গার জল মাথায় ঠেকিয়ে জলে নামল, তীরে লুকিয়ে বৃদ্ধা। হঠাৎ জলের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধার মাথা ঘুরে গেল। দেখেন কি কোচম্যান হেঁটে হেঁটে প্রায় মাঝ-গঙ্গায় চলে যাচ্ছে। সে যেখানে পা ফেলে সেখান থেকে গঙ্গার জল সরে যায়। ঐ দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়িতে এসে চুপি চুপি ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে সব কথা বললেন। ছেলে সব শুনে একেবারে হতভম্ব। কোচম্যান বাড়ি ফেরার পর বৃদ্ধা ও তাঁর ছেলে প্রণাম করে বললেন, না জেনে অপরাধ করেছি। আমাদের ক্ষমা করুন।

আজ থেকে আপনাকে গাড়ি নিয়ে ভাবতে হবে না। আপনি আমাদের এখানে থাকবেন, আমরা আপনার দেখাশোনা করব। এতেই আমরা ধন্য। কোচম্যান নির্বাক অবস্থায় মালিকের কথাবার্তা শুনলেন। সেদিন মধ্যাহ্নভোজের পর কোচম্যান যথারীতি বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লেন, খানিকবাদে চতুর্দিকে হৈ হৈ, তার দেহে প্রাণ নেই। কোচম্যানকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।

কিছুদিন বাদে সাহেবাং জোটে কয়েকজন। তারা কোচম্যানকে পীরসাহেব বলে বর্ণনা করে এবং উরুস উৎসব ও অন্যান্য ধর্মাচরণের জন্য উক্ত সাবাগুলি ভদ্রলোকের কাছে সমাধিস্থানটি দখল চায়। বর্তমানে সোনাপট্টির পিরতলা সেই কোচম্যানের আস্তানা। এই কাহিনিটি সাহেবাংদের কাছে যেমন শোনা যায় তেমনি ওই বাড়ির লোকজনদের কাছে প্রায় প্রায় একই কাহিনি শুনতে পাওয়া যায়। তবে বাড়ির লোকেরা ভেতরে একটি স্থান দেখিয়ে সমাধি নির্দেশ করেন এবং সাহোবাংরা যে পিরসাহেবের নকল সমাধি দেখাচ্ছে সেটা উল্লেখ করতে ভোলেন না।

মধ্যযুগে রাজনগরকে কেন্দ্র করে বীরভূম জেলাতে বেশ কিছু পির গাজী দেখা দিয়েছিলেন। এদের সমাধিক্ষেত্রে আজও জনসমাগম অন্যান্য জেলার মতো হয়ে থাকে। মাড়গ্রামে রয়েছেন কয়েকজন নাম-না-জানা পির, রয়েছেন গল্পের নায়ক জাফর খাঁ। বারাগ্রামে লোহাজং এবং মখদুম হোসেনী সাহেবের সমাধি রয়েছে। কিংবদন্তিতে বেঁচে আছেন হায়েজ খাঁ, আছেন শেরিনা বিবি। রাজনগরের হাটতলার পাশে ইমামবাড়ায় রয়েছেন সিরাজের প্রিয়পাত্র আহম্মদ-উল-জমা খাঁ এবং মহম্মদ আলিনকি, পাথরচাপড়িতে আছেন সিপাহী বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দাতা সাহেব। কীর্ণাহারে একটা উঁচু ঢিবি দেখিয়ে লোকে বলে, চণ্ডীদাসের সমাধি। আবার কেউ কেউ পাশের/গ্রাম নাগড়িতে বলেন চণ্ডীদাসের সমাধি আছে। সিউড়িতে সরকারী চাকুরে কিছু খ্রিস্টানের সমাধি আছে। গুণটিয়ায় রয়েছে বিখ্যাত চীপ সাহেবের সমাধি।

এইভাবে বাঙলার প্রতিটি জেলার বিশেষ বিশেষ সমাধি ও সমাহিত ব্যক্তি সম্পর্কে লোককথাগুলি একত্র করলে বিপুলায়তন এক গ্রন্থের রূপ ফুটে ওঠে। এই সমাধিগুলির কোনো কোনোটিতে আবার বিচিত্র সব ফলক দেখতে পাওয়া যায়। ফলকগুলি অনুসরণ করেও নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

২৪ পরগণার নিমতার কাছে একটি সমাধিক্ষেত্র ছিল। সেখানে দুটি পাশাপাশি সমাধির মধ্যবর্তী স্থানে একটি ফলক ছিল যাতে লেখা : *'যদি জানিতাম প্রেম এমনই মধুর বস্তু তবে বসন্তের দরবার হইতে পুষ্পদ্বয়কে বৃন্তচ্যুত করিতাম না।'* এই ফলকটি পরবর্তীকালে স্থানীয় এক দারোগাবাবু স্বর্গীয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে দেন। হেমেন্দ্রবাবু এই ফলক সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করেন তাতে জানা যায়, কোন এক ভোগী সমান্তরাজ প্রতিদিন নতুন নতুন নারী সম্ভোগে অভ্যস্ত ছিল। একবার এক সুন্দরী ব্রাহ্মণীকে জোর করে ধরে

এনে সেই সামন্তরাজের কাছে নিবেদন করা হয়। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরে সব জেনে স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য উন্মত্তের মতো রাজবাড়িতে প্রবেশ করে। সামন্তরাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর সামনে সেই ব্রাহ্মণের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। মুহূর্তে প্রহরীদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ব্রাহ্মণী মৃত্যু বরণ করেন। পরে সামন্ত রাজা বহুদূরে নিমতার সমাধিক্ষেত্রে ঐ ব্রাহ্মণ দম্পতিকে এনে সমাহিত করেন এবং ঐ ফলক স্থাপন করা হয়। এমন বহুবিচিত্র ফলক সারা বাংলায় ছড়িয়ে আছে। লোয়ার সার্কুলার রোডের বামুনবস্তীর বিপরীতে যে সমাধিক্ষেত্র সেখানকার আলী সাহেবের সমাধি ফলক দীর্ঘদিন আগে খোয়া যায় (Asiatic Journal vol. x. 1928)। বিজের আলীর বিবাহ উৎসবে তৎকালে ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল আর সমাধি বাবদ ব্যয় মাত্র ৭০ টাকা। এই কারণে আশা করা যায়, আলীর ফলকটি হয়ত কোন বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্য জোগাতে পারত।

সি আর উইলসন ইংরেজ শাসন উপলক্ষে এদেশে আগত এবং এখানে মৃত ও সমাহিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি প্রামাণ্য সংকলন কাজ করেছিলেন। তাঁর সেই 'লিস্ট অফ ইন্‌স্‌ক্রিপসন্‌স..., কটন সংকলিত 'ক্যালকাটা ওল্ড এ্যাণ্ড নিউ,' থ্যাকারের 'গাইড টু ক্যালকাটা,' ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত 'দি ন্যারেটিভ অফ ফ্রান্সিস গ্রাণ্ড' এর পরিশিষ্ট প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থে ইংরেজদের সমাধির এক বিরাট ও আকর্ষণীয় তালিকা এবং কতকগুলি বিচিত্র ফলকের উদ্ধৃতি বর্তমান। ফ্রান্সিস গ্র্যাণ্ডের পরিশিষ্টে মিঃ এলিয়ট সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস লিখিত কয়েক ছত্র কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। এলিয়টের স্মৃতিরক্ষার্থে হেস্টিংস যে সমাধিসৌধ করান তাতে হোরেসের ঢঙে তিনি লিখেন :

An early death was Elliot's doom .
I saw his opening virtues bloom
And manly sense unfold,
Too soon to fade, I bade the stone
Record his name midst hordes unknown
Unknowing what is told.

পুরনো কলকাতায় কক্‌রেলপত্নী মারা গেলে ক্যালকাটা গেজেট সেই মৃত্যু সমাচার, শোকযাত্রার বিবরণ এবং সমাধিফলক সম্পর্কে ১৭৮৯, ৮ অক্টোবর যে তথ্য পরিবেশন করে ঐ পরিশিষ্টে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও শোক সাহিত্যের নমুনা ধরে রাখা আছে :

If beauty, youth, and worth could save.
She had not met an early grave.

কোনো কোনো ফলকে সাহিত্যের নামগন্ধ না রেখে শুধুই সমাচার নিবেদন করা আছে। একজন গণ্যমান্য আইনজ্ঞ এবং তাঁর স্ত্রীর সমাধি ফলকের (পার্ক স্ট্রীট সমাধিক্ষেত্র)

লেখা উদ্ধার করেছে 'বেঙ্গল অবিট্যুয়রি'—

Sacred to the memory of
Susan Ledlie
Wife of Robert Ledlie Esq..
Barrister at Law. She died in Calcutta on the 33rd of her age

এবং

Sacred to the Memory of Robert Ledlie. Esq.
Barrister at Law.
Who died 24th November. 1809 aged 65 years.

সেনাবিভাগীয় ব্যক্তিদের সমাধিফলকে প্রাসঙ্গিক কারণে সমাহিত ব্যক্তির কীর্তিকে প্রাধান্য দিতে দেখা যায় :

Sacred to the Memory of
Edward Cook. Esq..
Captain of H.M. Ship "La Sybelle";
Who received a mortal wound in a gallant action.
With the French Frigate "La Forte".
Which he captured in Balasore Roads.
March 1st. 1799 and brought to this port.
Where he died 23rd May 1779.
aged 26 years.

খ্রিস্টান-সমাধির বৈচিত্র্যপূর্ণ ফলক হাওড়া, শ্রীরামপুর ও চন্দননগরে যেমন অসংখ্য রয়েছে তেমনি জেলায় জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে এদেশে সমাহিত বহু বিদেশীর সমাধি। এগুলি ছাড়া আরেক ধরনের ফলকের প্রতি প্রসঙ্গত আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, সেগুলি হিন্দু সতীদাহ প্রথার স্মারকপট্ট। পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের মতো আমাদের দেশেও আত্মাহুতি অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। মৃত স্বামীর চিতার আগুনে জীবিতা স্ত্রীর আত্মাহুতি সতীদাহ প্রথা হিসাবে পরিচিত। সাহিত্যের পাতায় সহমরণের অগণিত দৃষ্টান্ত ও বর্ণনা রয়েছে। ধর্মশাস্ত্রীদের বিধানে সহমরণ প্রশংসিত ও প্রশয় না পেলে বহুদিন আগেই এই নৃশংস প্রথার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটত। ইতিহাস বলে, মুঘল সম্রাটেরা এই প্রথা নিষিদ্ধ করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে ইংরেজ আমলে আইনের সাহায্যে দীর্ঘকালের সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ হয় এবং এই পর্বে ছেদ পড়ে।

উভয় বাংলার গ্রামাঞ্চলে অগণিত সহমরণের সাক্ষী রয়ে গেছে বাঁধানো চত্বর এবং স্মারকপট্টগুলি। এগুলিতে আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদান যেমন আছে তেমনি কোনো কোনোটির সাহিত্যরস উপেক্ষার নয়। চুঁচুড়ার সেই বিখ্যাত ফলক প্রসঙ্গত স্মরণে আসে :

'আরো তুমি এইস্থানে, দেখিয়াছ সন্নিধানে,
কত সতী লয়ে মৃত পতি।

স্বামীভক্তি অনুবলে, চিতার জ্বলন্তানলে,
হাস্যমুখে হইয়াছে সতী।।"

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে বালী ঘোষপাড়ার একটি স্মারকপট্ট নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছিল। বর্তমানে উক্ত ফলক ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়ামের বাংলার ঘরে রক্ষিত রয়েছে। কোনো এক ব্রজনাথের মৃত্যুতে সতী হয়েছিলেন জনৈক বিমলা। ফলকটির একপিঠে আছে বিমলার বাঁ হাতের এবং ব্রজনাথের ডানহাতের ছাপ। অন্যদিকে নাম-তারিখ। ফলকটি ১২০৬ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত সতীদাহের সাক্ষ্য বহন করছে।

ভারতবর্ষে মৃতের সৎকার ও তৎসংশ্লিষ্ট কৃত্যাদি পালন বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। প্রথা হিসাবে একটি প্রাক্‌বৈদিক বলে অনুমান করার যথেষ্ট যুক্তিসম্মত কারণ রয়েছে। বিভিন্নযুগের সমাধি উৎখননে ও সাহিত্যের নজিরে অনুমান করা যায়, অন্তিমপর্বের এই কাজে তিনটি পদ্ধতি মোটামুটি অনুসৃত হয়ে এসেছে এবং সর্বকালে আত্মায় বিশ্বাস প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। প্রথমে প্রোথিত করা প্রাধান্য পেয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে দাহ অন্তের অবশেষ প্রোথিত করা এবং সর্বশেষ পর্বে সম্পূর্ণ দাহ করার রীতি প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। তিনটি পদ্ধতির আবির্ভাব ও কোনো কোনোটির তিরোধান রহস্য আজ আর স্পষ্ট নয়। সমাজশাস্ত্রীদের অনুমান এ বিষয়ে পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছে।

গতশতকে আমাদের দেশে প্রাক্‌ ও প্রায়-ইতিহাসপর্ব সম্পর্কিত গবেষণায় সমাধিক্ষেত্র তেমন গুরুত্ব পায়নি, যেমনটি পাওয়া উচিত ছিল। একা কানিংহাম নন্‌ আরো কিছুসংখ্যক তৎকালীন পুরারত্ন এই দুই অন্ধকারপর্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত অন্যমনস্ক ছিলেন। এরই মধ্যে মেডজ টেলর আসেন দক্ষিণভারতের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র নিয়ে কাজ করতে। কিন্তু তাঁর আসপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এই কাজের চাইতে অন্যান্য প্রত্নসামগ্রী নিয়ে অনেক বেশি চিন্তা করেছেন। উৎখননের ঊষালগ্নে সমাধিক্ষেত্র যদি উপযুক্ত গুরুত্ব পেত তাহলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির পারম্পর্যধারা তথা পুরা-ইতিহাস সম্ভবত অন্যভাবে লিখিত হত।

পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যান্যস্থানের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষে প্রাক্‌ ও প্রায়-ইতিহাসপর্বের চর্চা গুরুত্ব পেতে থাকে। বিগত কয়েকবৎসরে ভারতীয় প্রত্নসমীক্ষার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্ব পায় এবং তদনুসারে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে কার্যক্রম অনুসৃত হতে থাকে।

বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে প্রাক্‌ ও প্রায়-ইতিহাস পর্ব নিয়ে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব গতশতকে আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফলে প্রভূত প্রত্নসামগ্রী উদ্ধার হয়েছে ঠিকই, সংগ্রহশালার গ্যালারির সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির যথার্থ প্রকৃতি ও সম্যক্‌ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়নি। লিখিত সাহিত্যের উপাদানকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিনা পরীক্ষায় নিতান্ত অজ্ঞতাবশত উদ্ভট

কল্পনা হেঁয়ালি এবং স্ববিরোধী বলে পরিত্যাগ করা হয়েছে। সমাধিকথা উপস্থাপনায় এই আক্ষেপটিও প্রাসঙ্গিক।

প্রাসঙ্গিকী

১. কার্লো লেরিসি :

প্রায় বছর কুড়ি আগের কথা। ইতালীর এক ধনী ব্যবসায়ীর মাথায় অদ্ভুত ঝোঁক চাপল। তিনি ঝোঁকের মাথায় কবরখানার এক লট পাথর কিনলেন। মৃত্যুর পর তাঁর এবং স্ত্রীর সমাধিস্থল অবিস্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে তিনি পাথরগুলি নিয়ে চিন্তা শুরু করলেন। কিন্তু যে পাথর তিনি কিনেছেন সেগুলি নেহাতই মামুলি স্মৃতিফলক মাত্র। এই পাথরের ফলক দিয়ে তাঁর সাধের সমাধিস্থল সাজানো অসম্ভব ব্যাপার। এগুলিতে উৎকীর্ণ লেখার সাহিত্য রসেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আসলে স্টেনলেস স্টীলের ফলাও কারবারী কোটিপতি কার্লো লেরিসি এবং লিসার স্মৃতিরক্ষার পক্ষে এই পাথর ছিল নিতান্ত নিম্নবিত্ত আয়োজন।

বৃদ্ধ লেরিসি তাঁর অন্তিম ইচ্ছার কথা অন্তরঙ্গদের কাছে বারবার প্রকাশ করেছেন। একদিন তাঁর এক বন্ধু বললেন, রোমের একটি সংগ্রহশালায় পোড়া মাটির একটি কফিন আছে যেটিতে এক দম্পতির অসাধারণ মূর্তি খোদিত। খবর শুনে লেরিসি আর কালবিলম্ব না করে ছুটলেন স্বচক্ষে ঐ কফিনটি দেখার জন্য। দেখা মাত্র চমকে উঠলেন লেরিসি। এই সেই সৌধসম্ভার যার সন্ধানে তিনি সর্বত্র হন্যে হয়ে ঘুরেছেন কিন্তু কাউকে মুখে বলে যা বোঝাতে পারেননি। আহা কি প্রশান্তি ঐ দম্পতির চোখের ভাষায়! লেরিসি ঐ মূর্তি দুটি বিশেষ বন্দোবস্ত করে ব্রোঞ্জে ঢালালেন।

লেরিসির বন্ধু রোমের ভিল গিলিয়া সংগ্রহশালার এই মূর্তির সন্ধান দিয়ে শুধু যে লেরিসির উপকার করেছিলেন তা নয়, পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে লেরিসিকে উৎসাহিত করায় ঐ সংবাদ অপিরসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। পুরাক্ষেত্রের প্রাক্-খনন নিরীক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারে যে যে পদ্ধতির কথা এ পর্যন্ত আমরা জেনে এসেছি তাতে বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ, চৌম্বক অবস্থিতি, বসিং ও বর্মা, যান্ত্রিক উপায়ে গর্ত করা এবং আকাশ থেকে প্রত্নস্থলের আলোক চিত্র গ্রহণ ইত্যাদি সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থা হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। এখন পেরিঅস্কোপ ফটোগ্রাফার সাহায্যে প্রত্নক্ষেত্রেব প্রাক্-খনন নিরীক্ষায় লেরিসি বিশ্বের তাবৎ পুরাতাত্ত্বিকদের একজন হিসাবে গণ্য হলেন।

লেরিসি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মূর্তির সন্ধান পেয়ে ব্যবসার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে ঐ ধরনের মূর্তি সম্বলিত সমাধি খোঁজার কাজে লাগেন। তাঁর যন্ত্রপাতি যেহেতু অন্য

কাজের জন্য তৈরি তাই পুরাক্ষেত্র পরীক্ষার কাজে সেগুলির তেমন উৎসাহ সৃষ্টি করার কথা নয়। কিন্তু প্রথম প্রথম তিনি ঐ যন্ত্রেই কিছুটা এগোলেন। হাতেকলমে কাজে নেমে তিনি সহজেই তাঁর যন্ত্রপাতিগুলির কার্যক্ষমতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সজাগ হলেন। এবং নিজস্ব সন্ধানপদ্ধতির একটি সরলীকৃত কাঠামো তুলে ধরলেন। জীবনে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনের পর ইতালীর এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক পুরোপুরি পুরারসে মজে গেলেন। লেরিসি এবার ইচ্ছা করলে ভূপৃষ্ঠ থেকে মাটির তলাকার বস্তু দেখতে পারেন, খননের আগে সঠিক সন্ধান দিতে পারেন ভূগর্ভে কি আছে না এবং থাকলে কোথায় আছে। প্রত্নপরীক্ষার যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে মার্টিন ও ক্লার্কের একচেটিয়া খ্যাতির অংশে আকস্মিকভাবে এক ভাগীদারের নাম শোনা গেল : ইতালীর অশীতিপর বৃদ্ধ কার্লো লেরিসি।

ভিলা গিলিয়ার সংগ্রহে খ্রিস্টজন্মের পাঁচ-ছশো বছর আগেকার এট্রুস্কান সংস্কৃতির পরিচয়জ্ঞাপক বহু মূল্যবান্ সামগ্রী ছিল! লেরিসি সেগুলি যত দেখেন ততো তাঁর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। একদিন সংগ্রহশালার দেওয়ালে একটি চার্ট তাঁর নজরে পড়ল। তাতে ভূগর্ভস্থ কবরখানা এবং চতুষ্পার্শ্বের বালি, মাটি, পাথরের আবরণ দেখলেন যা থেকে তাঁর অনুমান হল যে, ধাতু ও তেল সন্ধানের যা যা যন্ত্রপাতি তাঁর আছে তা দিয়েই তিনি এট্রুস্কান সমাধির সন্ধান সুরু করতে পারেন। যথারীতি কাজ শুরু হল, প্রাথমিক অসুবিধা দূর করে বছরখানেকের মধ্যে ইলেকট্রনিক শব্দতরঙ্গ পদ্ধতিতে তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জন করলেন। অবিশ্বাস্যরকম স্বল্পসময়ে তিনি আট হাজার এট্রুস্কান সমাধি, তিরিশ হাজার ধাতবমূর্তি থালাবাসন ও অন্যান্য প্রত্নসামগ্রীর সন্ধান দিলেন।

এ পর্যন্ত এট্রুস্কান সংস্কৃতি বিষয়ে যা যা জানা ছিল তার সঙ্গে লেরিসির কর্মদক্ষতা ও পর্যবেক্ষণ যোগ হওয়ায় অন্তত আড়াই হাজার বছর আগেকার লুপ্ত সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গরূপে ফুটে উঠল। এট্রুস্কানদের দৈনন্দিন জীবনধারা, আনন্দোৎসব ইত্যাদির চিত্র সম্বলিত সমাধিক্ষেত্রের সন্ধান দানে লেরিসি বিশ্বের প্রধানতম এট্রুস্কোলজিস্ট হিসাবে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বন্দিত হলেন। ঐ সংস্কৃতির সূত্রপাত থেকে বিস্তৃতি ও প্রভাবসীমা সব কিছুতেই বিশেষজ্ঞ হিসাবে একটিই নাম, কার্লো লেরিসি। তাঁর সন্ধানের ফলে যা যা তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে বহু প্রত্নতাত্ত্বিকের অন্নে টান পড়েছে। ইন্দ্রজালের দৈত্যের মতো একের পর এক ধাক্কায় যুগযুগান্তের জমাট অন্ধকারে তিনি আলো ফেলেছেন। এমনকি যে অসাধারণ সমাধিক্ষেত্রগুলির তালিকা তিনি দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ খনন দূরের কথা আংশিক খননও আদৌ সম্ভব হবে কিনা বলা কঠিন। বিপুল অঙ্কের অর্থের প্রশ্ন আছে, তাছাড়া রয়েছে আরো কিছু বাস্তব অসুবিধা। লেরিসির এক বন্ধু শেষ বয়সে এই খ্যাতি ও কীর্তির জন্য একবার প্রস্তাব করেন, লেরিসির সমাধিক্ষেত্রে যেন এট্রুস্কান ভাষায় ওঁর নাম খোদাই করা হয়। কিন্তু তা কি সম্ভব? এমনকি তিনি ভেবেছেন ঐ মৃত ভাষায় লেরিসি নামের বানানটি কেমন হওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞরা সে

বানান বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবেন কিনা তা নিয়েও তিনি ভেবেছিলেন। সব শুনে হেসেছিলেন কার্লো লেরিসি। মুখে বলেছিলেন, বয়েস হয়েছে তবু অনেক কাজ অল্প সময়ে করে যেতে হবে। আড়াই হাজার বছর আগেকার মানুষগুলো এবং তাঁদের কীর্তি আমাকে নেশায় মাতিয়ে রেখেছে। বিশ্বাস করুন, ওরা আমাকে যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছে। দেখছেন না আশি পার করে দিয়ে কেমন তাজা আছি।

২. অজয় উপত্যকার সমাধি :

অজয় উপত্যকায় পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে প্রায় বারোবছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ যে খনন কাজ চালান তাতে অন্তত ৫।৬টি উল্লেখযোগ্য সমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানকার সমাধিস্থ দেহগুলি পূর্ব পশ্চিমে শায়িত অবস্থায় ছিল। মৃৎপাত্রাভ্যন্তরস্থ সমাধির সন্ধান দুটি পাওয়া গেছে। বাদামি লাল ও কালো রঙের এই পাত্রগুলির ওপরে ঢাকনার মতো কিছু ছিল। আরেকটি সমাধিতে হাত-পা বাঁধা একটু সঙ্কুচিত অবস্থায় নরকঙ্কাল পাওয়া যায়। এছাড়া পূর্ব-পশ্চিমে রাখা আরেকটি সমাধির খোঁজ পাওয়া গেছে। এরই সঙ্গে মৃৎপাত্রাভ্যন্তরস্থ সমাধির সন্ধান মিলেছে। সেখানে সমাধিস্থ কঙ্কালের চোয়ালে লাগানো ছিল তামার ও এ্যাগেটের মাল্যদানা। এছাড়া অশ্মীয় আয়ুধ, তামার আংটি, অঞ্জন শলাকা, একধরনের পাকানো তামার চুড়ি এবং চিত্রিত মৃৎপাত্রের সন্ধানও পাওয়া গেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সুদৃশ্য গ্রন্থপ্রকাশ সত্ত্বেও এই খনন কাজ কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রতিবেদন দেশবাসীর অবগতির জন্য না রাখায় এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখা দেয়নি।

৩. মধ্য ও পরমধ্য যুগের রাজা বাদশার সমাধি সৌধ :

ভারতবর্ষে মধ্য ও পরমধ্যযুগে শাসক তথা গণভাগ্যবিধাতাদের অভিরুচি অনুসারে অন্তত দশ-বারোটি সমাধিসৌধ নির্মিত হয় যা এদেশের পরবর্তীকালের স্থাপত্যশিল্পে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পাঠান সুলতানদের আমলে যেসব সমাধিসৌধ, প্রাসাদ ও ধর্মীয় সৌধ গড়ে উঠেছিল তাতে একদিকে যেমন পেলবতার অভাব অনুভূত হয় তেমনি অপরদিকে বলা যায় এই স্থাপত্যের মূল ভিত্তি দৃঢ় বলিষ্ঠতার ওপর স্থাপিত ছিল। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি পির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধিস্থানে যে জুমায়েৎখানা নির্মাণ করান সেটি সুলতান আমলের স্থাপত্যশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আরেকটি নমুনা হল দিল্লীর তুঘলকসৌধ। ঘিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সমাধির ওপর গড়ে উঠেছিল এটি। সুলতানী কীর্তির একটি দাক্ষিণাত্য নমুনার সন্ধান পাওযা যায় বিজাপুরে। যে আদিল শাহ বিজাপুরে শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই শাহের নিজের সমাধিক্ষেত্রের গোলগম্বুজী সৌধটি দক্ষিণী স্থাপত্যের একটি নিখুঁত নমুনা। সৌন্দর্যের কথা বাদ দিয়েও গোলগম্বুজের বিরাটত্বের দিক থেকে বলা যায় এ ব্যাপারে বিজাপুর দ্বিতীয়রহিত।

একই সময়ে গোলকুণ্ডায় সুলতানী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুতব শাহ। কুতব

শাহের সমাধিসৌধটির আকৃতি প্রায় গোলাকার গম্বুজ স্থাপত্যের নিদর্শন, তবে সম্পূর্ণ গোল নয়। এইভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় সুলতান আমলে উত্তর ভারতের সমাধিসৌধ থেকে দক্ষিণীসৌধ আকৃতি ও প্রকৃতিকে যথেষ্ট পার্থক্য বজায় রেখে চলছিল। এই পার্থক্য থেকে কয়েকটি চিহ্নিত স্থাপত্যধারার জন্ম হয়েছিল যেখানে মূল কথা ছিল আঞ্চলিকতা। জৌনপুরী, মালবী, গোলকোণ্ডাই, গৌড়ী, গুজরাটি এবং বিজাপুরী প্রভৃতি আঞ্চলিক ধারায় সুলতান আমলে সমাধিসৌধগুলি নির্মিত হয়েছিল।

এরপর যে সমাধিসৌধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি, হল, সাসারামে শেরশাহের সমাধি। পাঠানশাহ জীবিতাবস্থায় পাঞ্জাবী বাস্তুবিদ্ আলিওয়াল খাঁকে দিয়ে নিজের জন্য এই সৌধটি নির্মাণ করান। বিরাট একটি জলাশয়ের মাঝখানে সাসারামের এই সমাধিসৌধ সন্ধিপর্বের হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত শিল্প-শৈলীর নমুনা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে হিন্দু ও পারসীক রীতির মিশ্রণের নিদর্শন হল হুমায়ুনের সমাধিসৌধ। পারসীক শিল্পী মির্জা গিয়াসের অসাধারণ পরিমিতি জ্ঞানের পরিচায়ক এই সৌধশিল্প। মুঘল স্থাপত্যের জনক সম্রাট আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকের সৃষ্টি সাক্ষ্য হুমায়ুনের সমাধিসৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন সম্রাটের বিমাতা হাজী বেগম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল ফতেপুরসিক্রির সাধু সলিমচিস্তির সমাধিসৌধ। সম্রাট আকবর শ্বেতমর্মর স্থাপত্যের সূত্রপাত করেন এই সৌধ দিয়ে। তাছাড়া সুলতানী আমলের জালি-জাফরিকাজ একটু বাঁক নিল সমাধিতে এসে। এই কাজ পরবর্তীকালে মুঘলশৈলীর স্থাপত্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হয়েছে।

আকবরও তাঁর জীবিতকালে নিজের জন্য এক সমাধিসৌধের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু জীবদ্দশায় তার কাজ শুরু করতে পারেননি। এটির বাস্তব রূপদান ঘটেছিল জাহাঙ্গীরের আমলে। এই সময়ে নূরজাহাঁ তাঁর পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে ইতিমাৎদৌলার সমাধিসৌধ নির্মাণ করান যমুনার অপর পারে। চতুর্দিকে উদ্যান পরিবেষ্টিত এই দ্বিতল সৌধটিকে কেউ কেউ ভারতের শ্বেতমর্মরে রচিত প্রথম স্থাপত্যকাব্য বলে বর্ণনা করেছেন। ইতিমাৎদৌলার সমাধির শ্বেতমর্মরে পারসীক ঢঙের শ্বেত কারুকর্ম পরবর্তী সম্রাট ভুবনখ্যাত সৌন্দর্যরসিক শাহজাহানকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। স্থাপত্যজগতের শেষ গীতিকবি শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমার যে সমাধিসৌধ যমুনার তীরে গড়ে তোলেন, সারা বিশ্বের সমাধিক্ষেত্রের স্থাপত্যে আজও তা এক এবং অদ্বিতীয় আসন নিয়ে আছে। এই একটি সৃষ্টির পেছনে ভারতসম্রাট ২২ হাজার শ্রমিকের ২১ বছরের শ্রম কাজে লাগান। সমাধিক্ষেত্রের এই আশ্চর্য সফল সৌধটিকে অনুসরণ করে আরও দুটি নকল তাজমহল নির্মাণ করা হয়েছিল। স্ত্রী রাবেয়ার মৃত্যুতে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর মনের মতো বাস্তুবিদ্দের ডেকে বলেছিলেন রাবেয়া দুরানীর কবরের ওপর আর একটি তাজমহল গড়ে তোলার চেষ্টা কর। লক্ষ্ণৌর এক নবাবের সমাধির ওপর নির্মিত হয়েছিল তিন নম্বর তাজমহল। বলাবাহুল্য, এতে মূল তাজমহল এতটুকু ম্লান হয়নি,

রাবেয়ার সৌধ এবং লক্ষ্ণৌর নবাবের সমাধিসৌধকে এখনো তাজমহলের বিকৃত ও অক্ষম অনুকরণ বলেই চিহ্নিত করা হয়।

তথ্যসূত্র

১. Archaeological evidence on cremation and post-cremation burial in India—D.R. Das. (Journal of Ancient Indian History vol. III. 1969-70).

২. Disposal of the dead and Physical Types in Ancient India—S.P.Gupta (1972).

৩. Early India and Pakistan—R.E.M. Wheeler (1960).

৪. Excavation at Pandu Rajar Dhibi. The—P.C. Dasgupta (1964).

৫. Indain Archaeology—A Review.

৬. Iron Age in India N.R. Banerjee (1965).

৭. List of Inscriptions on Tombs or Monuments in Bengal possessing Historical or Archaeolegical Interest—C.R. Wilson (1895)

৮. Origin and Development of Ancestor Worship in India—D.R.Shastri (1963).

৯. Preshistoric Background of India Culture—D.H Gordon (1958)

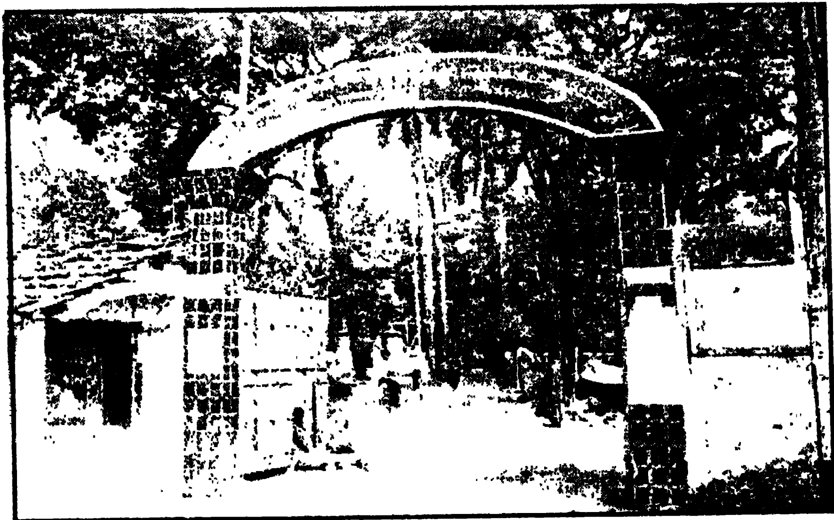
১০. Rajputana Desert—Its-Archaeological Aspect. The—A Ghosh. (Bulletin of the National institute of Sciences of India. No 1. 1948)



নিউজীল্যাণ্ডের মাওরিদের মৃতের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ

❑ রচনাটি শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত অন্বিষ্ট পত্রিকার—১৭, ১৯৭৫ বিশেষ 'প্রয়াণ' সংখ্যা থেকে অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত। সৌজন্যে : কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র।

স্মৃতির এ্যালবাম



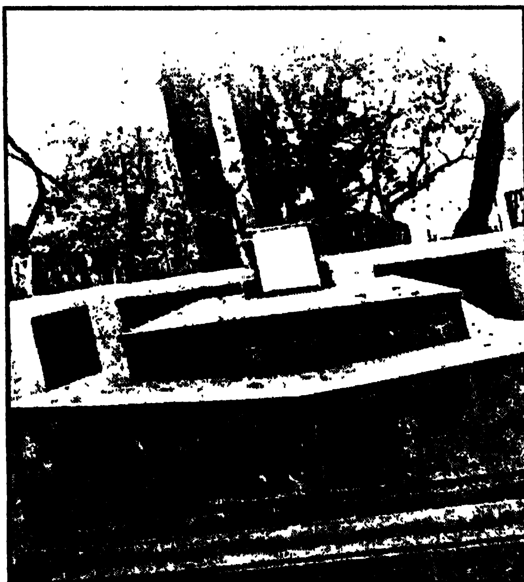
তিলজলা মুসলিম কবরস্থান ছবি : কালিকানন্দ মণ্ডল



তরুদত্তের সমাধি, মানিক তলা ছবি : অভিজিৎ রায়

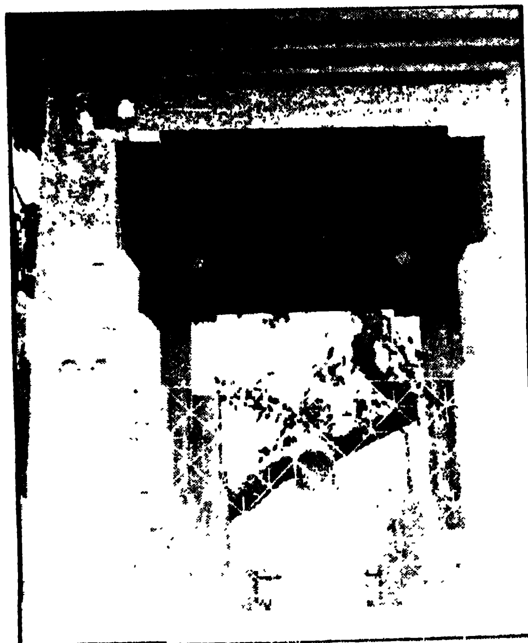


মধুসূদন দত্তের সমাধি, মল্লিক বাজার   ছবি : অভিজিৎ রায়



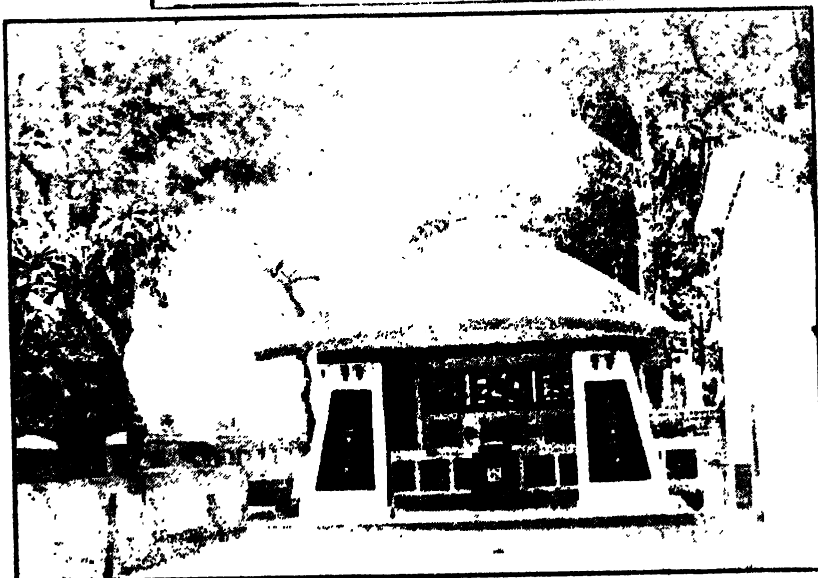
মুজাফ্ফর আহমেদের কবর, গোবরা   ছবি : অভিজিৎ রায়

স্মৃতির এ্যালবাম



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতিবেদী, নিমতলা

ছবি : অভিজিৎ রায়



রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি মন্দির, নিমতলা

ছবি : অভিজিৎ রায়

পুরাতনী

পিতৃপূজা

বেলা চক্রবর্তী

সত্যানুসন্ধী নচিকেতা একদা যমরাজের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, মৃত্যু কী? অমরতা কাকে বলে? তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয়কাণ্ডের একাদশ প্রপাঠকে সেই নচিকেতার একটি উপাখ্যান আছে। ঋষি বাজশ্রবসের পুত্র নচিকেতা নেহাতই ছেলেমানুষ। বিশ্বজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে বাজশ্রবস তাঁর যা-কিছু বিষয়আশয় দিয়ে থুয়ে যাবেন। পুত্র নচিকেতা জানতে চাইল, বাবা আমাকে তুমি কার কাছে দিয়ে যাবে? একবার বলল, দুবার বলল, তিনবারের বার বাজশ্রবস বললেন, বাছা তোকে দিয়ে যাব যমের কাছে।

ঠিক হল যম যখন বাড়ি থাকবেন না নচিকেতাকে সে সময় যেতে হবে। সেখানে কিছু খাওয়া-দাওয়া চলবে না। যম যদি জিজ্ঞেস করেন, ক'রাত এভাবে কাটালে? নচিকেতার জবাব হবে, তিনরাত। প্রথম রাতে কী খেলে? জবাব হবে, আপনার ছেলেপুলে। দ্বিতীয় রাত? আপনার যত পশু। তৃতীয় রাত? আপনার সুকর্ম।

যম যখন বাড়িতে নেই এমন সময় নচিকেতা উপস্থিত হল। সে তিনরাত না খেয়ে কাটাল। যম বাড়ি এসে নচিকেতাকে দেখতে পেয়ে যেসব কথা বলতে পারেন ভাবা গিয়েছিল, সে-সবই জিজ্ঞেস করলেন। যেমন শেখানো হয়েছিল নচিকেতা যথারীতি সেইমত উত্তর দিল।

যম বললেন, ব্রাহ্মণ তুমি নমস্য অতিথি, তোমাকে প্রণাম। আমি সন্তুষ্ট হয়ে বলছি, তুমি তিনটি বর প্রার্থনা কর। আমি পূরণ করব। নচিকেতার তখন মনে হল, তাকে হারিয়ে তার বাবার মন বোধ হয় অনুতপ্ত। তাই তার প্রথম প্রার্থনা : জীবিত অবস্থায় যেন বাবার কাছে ফিরে যেতে পারি। নচিকেতার দ্বিতীয় প্রার্থনা : স্বর্গলোকগমন—যেখানে ভয় নেই, জরা নেই। লোকে যেখানে খাওয়া-দাওয়া ভুলে পরমানন্দে শোকাতীত হয়—সেই স্বর্গে যে অগ্নির উপাসনা করলে যাওয়া যায়—হে যমদেব, আমায় তার সন্ধান বলে দিন।

যমদেব নচিকেতার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তথাস্তু। নচিকেতা এবার তার শেষ প্রার্থনা নিবেদন করল : মানুষ মারা গেলে কেউ বলে সে থাকে, কেউবা বলে সে থাকে না—এই দুটির মধ্যে কোনটা ঠিক আপনি তাই আমাকে বলে দিন এবং আপনি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে আমি মৃত্যু জয় করতে পারি।

যম নচিকেতাকে যাচাই করবার জন্য বললেন, মানুষের আর কথা কি, দেবতাদেরও এ-বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। মৃত্যুঞ্জয় হওয়া বড় কঠিন কাজ। তুমি বরং অন্য কিছু চাও। শতায়ু পুত্র-পৌত্র চাইতে পার, ধনমানযৌবন ইত্যাদিও চাইতে পার, কিন্তু দোহাই তোমায়, মৃত্যুঞ্জয় হতে চেও না। নচিকেতা কিন্তু প্রলোভনে পা দিল না। নচিকেতা বলল, ধনমানযৌবন ওসব ঠুনকো জিনিস আমি চাই না, আমি চাই অমরত্ব।

নচিকেতার কথায় যমরাজ তুষ্ট হলেন। বললেন, পৃথিবীতে দুটি জিনিস আছে। একটি শ্রেয় আর একটি প্রেয়। শ্রেয় আমাদের ভালো করে, আর প্রেয় দেয় প্রীতি। এদের প্রয়োজন আলাদা আলাদা। এ দুটি জিনিসই মানুষের কাছে আসে। যে মানুষ এদের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তার ভালো হয়, আর যে প্রেয়কে বরণ করে সে প্রায়শই লক্ষ্য থেকে চ্যুত হয়।

কঠোপনিষদেও নচিকেতার বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে। তবে তফাৎ এই যে সেখানে নচিকেতার যমালয়ে রাত্রিবাসের প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে সারা হয়েছে। বরং জোর দেওয়া হয়েছে বরদানের ব্যাপারটিতে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে পাওয়া এই উপাখ্যানটির বীজ কিন্তু লুকিয়ে আছে ঋক্ সংহিতার একটি সূক্তে। অনুক্রমণিকাকারের মতে সূক্তটির ঋষি যমগোত্রীয় কুমার। দেবতা যম। সূক্তটি রূপকের ভাষায় রচিত। এই রূপকের পিছনে আচার্য সারণ নচিকেতা-উপাখ্যানের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। সূক্তটির নিহিতার্থ এই রকম ঃ ব্রহ্ম-বৃক্ষের তলায় যমের সভা বসেছে। দেবতাদের নিয়ে যম আনন্দ করছেন সেখানে। মানুষ মৃত্যুর পরে সেইখানে যায়। আমাদের পিতৃপুরুষগণও সেখানেই আছেন। মৃত্যুর দ্বারাই তাঁরা অমরত্ব লাভ করেছেন।

কৌষীতক্যুপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে দেবযান ও পিতৃবাস অর্থাৎ দেবপথ ও পিতৃপথের বিষয়ে আলোচনা আছে। অধ্যায়টির সূত্রপাত একটি উপাখ্যান দিয়ে। ঋষি আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু রাজা চিত্র গাঙ্গ্যায়নির কাছে গেলে রাজা তাকে বললেন, বিশ্বে একটা তত্ত্ব আছে এবং তা অর্জনের একটা পথও আছে—তুমি কি আমাকে সে পথের হদিশ দিতে পার? রাজার প্রশ্নে হতবাক শ্বেতকেতু বাবার কাছে ফিরে এল। বাবাও প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেলেন। পিতাপুত্র তখন শলাপরামর্শ করে ফের ফিরে গেল রাজার কাছে। অকপটে নিজেদের অজ্ঞতার কথা খুলে বলল। বিনত শিষ্যের মত রাজার কাছ থেকে তারা তখন জেনে নিল দেবযান এবং ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য।

এই কাহিনীটিই একটু অন্যভাবে পাওয়া যায় ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যকে। দুটি উপনিষদেই রাজার নাম প্রবাহন জৈবলি। তিনি পাঞ্চালদের রাজা। আরুণি এবং শ্বেতকেতুর প্রসঙ্গ আছে ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। প্রসিদ্ধ তত্ত্বমসি-র উল্লেখও আছে এখানেই। আরুণি এখানে মৃত্যুর পরের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন।

কৌষীতক্যুপনিষদে চিত্র গাঙ্গ্যায়নি মৃত্যুর রূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরুণি এবং

শ্বেতকেতুকে বললেন, মৃত্যুর পর সবাই চন্দ্রমাতে যায়। চন্দ্রমা হলেন স্বর্গলোকের দ্বার। তাঁর কাছে গেলে তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? যে যে সঠিক জবাব দিতে পারে তাদের তিনি ছেড়ে দেন। যারা পারেনা তাদের আবার বৃষ্টিধারার সঙ্গে মর্ত্যের মাটিতে পাঠিয়ে দেন। চন্দ্রমার প্রশ্নের জবাবে স্বর্গযাত্রীদের বলতে হয়, হে ঋতুগণ, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে বিদ্যা অবিদ্যার মাঝে কেবল দোল খেয়েছি—এখন আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে যাও। সত্য আর তপস্যারে জোরে বলছি, আমিই ঋতু আবার আমিই ঋতুজাত। চন্দ্রমাকে আবার বলতে হয়, তুমি কে? তাকে বলতে হয়, আমি আসলে তুমিই। চন্দ্রমা এবার তাকে পথ ছেড়ে দেন। মুক্ত আত্মা তখন দেবযানের পথ ধরে অগ্নি বায়ু ইন্দ্র ও প্রজাপতির লোক পার হয়ে ছুটে চলে ব্রহ্মলোকের দিকে। ব্রহ্মলোকে আছে অরি হ্রদ, বিজরা নদী, ইল্য বৃক্ষ, সালজ্য নগর, অপরাজিত পুরী, বিচক্ষণ বেদী ইত্যাদি। আর আছে, আছেন মানসী আর চাক্ষুসী নামে দুই প্রিয়া যাঁরা বিশ্বভুবনের কুসুম নিয়ে মালা গাঁথছেন। মুক্ত আত্মা বিজয়া নদীতীরে আসলেই ব্রহ্মা তা জানতে পারেন। তখন অপ্সরা ছুটে এসে তাঁকে ব্রহ্মালংকারে অলংকৃত করে। তারপর তিনি মনোবলে একে একে পার হন অরি হ্রদ, বিজয়া নদী তখন তাঁর পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ ঘুচে যায়। ক্রমে তিনি ব্রহ্মদর্শন লাভ করেন।

বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্যে, আগেই বলেছি, রাজার নাম প্রবাহন জৈবলি। জৈবলির সভায় সহসা শ্বেতকেতু উপস্থিত হলে রাজা প্রশ্ন করলেন, জান এই লোক ছেড়ে জীব কোথায় যায়? কেমন করে ফিরে আসে? দেবযান পিতৃযান কোথায় পৃথক হয়ে গেছে? শ্বেতকেতু এইসব প্রশ্নের একটিরও ঠিকমত জবাব দিতে পারল না। রাজা কটাক্ষ করে বললেন, তোমার বাবা তাহলে তোমাকে কি শিখিয়েছেন?

শ্বেতকেতু বাবাকে এসে সবকথা বলল। আরুণি বললেন, এসব তো আমিও ঠিক ঠিক জানি না। জানলে নিশ্চয় তোমাকে বলতাম। তারপর পিতাপুত্রে ছুটল রাজার কাছে।

প্রবাহন বললেন : যাঁরা গ্রামে যজ্ঞ জনহিতকর কাজ এবং দানের অনুষ্ঠান করেন তাঁরা মৃত্যুর পরে ধুমে রূপান্তরিত হন। ধূম থেকে হন রাত্রি। রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষ। কৃষ্ণপক্ষ থেকে দক্ষিণায়ন। তাঁরা আর আদিত্যজ্যোতিরূপ লাভ করেন না। দক্ষিণায়ন থেকে তাঁরা গমন করেন পিতৃলোকে। সেখানে তাঁরা আকাশ হন। আকাশ থেকে চন্দ্রমা। সেখানে কিছুদিন থেকে আবার আকাশ হন। আকাশ থেকে হন বায়ু। বায়ু থেকে ধূম। ধূম থেকে জলীয় বাষ্প, জলীয় বাষ্প থেকে মেঘ। মেঘ থেকে বৃষ্টি। বৃষ্টি থেকে উদ্ভিদ—উদ্ভিদ থেকে রেতঃ, তা থেকে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ। সুকর্মের ফলে কারুর সুযোনিতে জন্ম হয়—অন্যথা হীনযোনিতে। এমনকি পশুজন্ম হওয়াও অসম্ভব নয়।

প্রবাহন বলতে লাগলেন : এই দুটি পথের কোনটিতেই যায় না এমন মানুষও আছে। তারা ক্ষুদ্র প্রাণী হয়ে শুধু বারংবার আবর্তিত হয়। জন্ম গ্রহণ করা এবং মৃত্যুমুখে পতিত

হওয়াই তাদের কাজ। তাদের জন্যে একটি তৃতীয়গতি আছে—একে এড়িয়ে চলা উচিত। চোর মাতাল গুরুপত্নীকামী ব্রহ্মঘাতী—এরা পতিত। এদের সংসর্গে যারা থাকে তারাও পতিত। এদের গতি নির্ঘাৎ নরক তথা ভূবর্লোকে।

নরক কেমন? বেদ উপনিষদে অবশ্য নরকের ভয়ঙ্কর কোনো বর্ণনা নেই, পুরাণে আছে। যমরাজের অধীনে যে ঠিক কটি নরক আছে এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন হাজার হাজার, কেউবা বলেন আঠাশটি, আবার কেউ কেউ বলেন মাত্র সাতটি। কিন্তু যে কোন নরক মানেই ঘোর অন্ধকার। সর্বদাই নিরানন্দ। অশেষ যন্ত্রণা। পাপীদের যন্ত্রণার কথা শোনবার জন্যে কেউ নেই। সেখানে কেবল কালানল অনুজ্জ্বল নীলশিখা বিস্তার করে। নরলোক অবশ্যই কষ্টকর, কিন্তু নরকলোকের কষ্টের কথা ভাবা যায় না। যারা পার্থিব জীবনে নিষ্ঠুর তাদের ফুটন্ত তেলের কড়ায় ফেলে দেওয়া হয়। যারা অকারণে জীবহত্যা করে তাদের রাক্ষসের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাক্ষসরা তাদের একবারে না মেরে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। যারা ব্রাহ্মণঘাতী তাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। অত্যাচারী রাজাকে যাঁতায় পিষে মারা হয়। যে রাজা বা তার মন্ত্রীরা ধর্মীয় কাজে বাধা দেয় তাদের কুমীর-কামটে ভরা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। সেখানে পতিত হওয়ামাত্র তাদের ওইসব হিংস্র জলজ প্রাণীরা খেয়ে ফেলে। এইভাবে যমালয়ে শাস্তিবিধানের তালিকা আরও অনেক বাড়ানো যায়। কিন্তু সে থাক। কথা হচ্ছিল প্রবাহনের বর্ণনা বিষয়ে। প্রবাহন বলতে লাগলেন, মৃত্যু কেমন? সুপ্তির মতন। সুপ্তিতে বাহ্যচেতনা লোপ পায়, কিন্তু কোন চেতনাই কি থাকে না?

উপনিষদ বলে, থাকে। প্রাণের আগুন তখনো দেহকে আশ্রয় করে জেগে থাকে। এই প্রাণচৈতন্যের বোধ হল একটা প্রসন্ন স্নিগ্ধতা। সুষুপ্তিতে মনের অগোচরে নিশ্চয় তার অনুভব হয়—ঘুম থেকে জেগে উঠলে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমের রেশ থেকে যায়।

প্রাকৃত চেতনায় ঘুম কিন্তু অন্ধকার। মৃত্যুও তাই। এই অন্ধকারে বিষয়-বিষয়ী সব একাকার। কিন্তু যদি যথার্থ ধ্যান করা যায় তবে সমস্ত বিষয় কেন্দ্রীভূত হয় বিষয়ী-তে। কেবল বিষয়ীই তখন জেগে থাকে। বিষয়ীর এই জাগ্রত অবস্থার নাম আলো। অন্ধকার সমাগত তবু তারই মধ্যে আলো জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টাকে বলা হয় সাধনা। কে কতখানি আলো জ্বালিয়ে রাখতে পারবে তা নির্ভর করে সাধনার ঐকান্তিকতার ওপর। যেই নিদ্রাগত হই অমনি মৃত্যু। মরলোকে সব কিছুই অন্ধকার। উপনিষদের ভাষায় এরই নাম রাত্রি। কিন্তু রাত্রি নামবার আগে আছে গোধূলির আলো-আঁধারি। উপনিষদ তাকে ধূম বলছেন।

প্রবাহনের কথামত, পিতৃযানে যাঁদের যেতে হয় তারা প্রথমে হন ধূম, তারপর রাত্রি। সেই রাত্রিতে ওঠে পূর্ণচন্দ্র, কিন্তু তার জ্যোৎস্না ক্রমে ম্লান হয়ে অমাবস্যার অন্ধকার নেমে আসে। তারপর উত্তরায়ণের চরম দিনের একটি ঝলক আসে, কিন্তু সে আলোও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে যায়—আলোর সঙ্গে অন্ধকার মিশে থাকে। এই অবস্থায় তাদের যেখানে কাটে তাকে বলে পিতৃলোক। তারপর আবার আকাশের শূন্যতা, তার মধ্যে জ্যোৎস্না—দিব্যধামের যেন

কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু তারপর আবার সব ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার। পিতৃযানে যে রাত্রি সেটাই হল তৃতীয় স্থান। এর ওপর যারা উঠতে পারেনা তারা ধূমের ভিতর দিয়ে আবার নেমে আসে। ধূম পিতৃযানীরাও পান। এখান থেকে জীবজন্মের ধাপগুলি সকলের পক্ষে সমান।

অধ্যাত্মবাদীদের অন্যতম অভিপ্রায় এই জীবনান্তে স্বর্লোক তথা স্বর্গপ্রাপ্তি। স্বর্গের অসীম প্রশান্তির কথা ভেবে তাঁরা ইহজগতের সকল দুঃখকষ্টকে অক্লেশে তুচ্ছজ্ঞান করেন। তাঁদের এই পরম অভিপ্রেত স্বর্গধামের রূপটি কেমন? সুখশান্তি চিরবিরাজিত, মধুর পবন প্রবাহিত, মধুর সঙ্গীত মুখরিত। হিংসা নেই, দ্বেষ নেই—পরনিন্দা নেই, পরচর্চা নেই, প্রতারণা নেই, নেই কোনো ছলনা, নেই ধনী-নির্ধনের বিভেদ। এখানে জ্যোতিঃ চির অম্লান। ফুল ফোটে কিন্তু ঝরে না—বহে নিরন্তর আনন্দধারা।

এই সদানন্দময় স্বর্গধামও কিন্তু একাধিক। এমনকি যম, যাঁকে আমরা নরকপতিরূপেই জেনে এসেছি, গোড়ার দিকে তিনিও ছিলেন একটি স্বর্গের অধিপতি। জাকজমকে ঐশ্বর্যে সুখে শান্তিতে তাঁর স্বর্গই ছিল আদিতে সর্বোত্তম। বিশ্বকর্মানির্মিত স্বর্ণবর্ণ প্রাসাদে 'পিতৃপতি' রূপে তিনি বিরাজ করতেন। আর তার চতুষ্পার্শ্বে বসে তাঁকে বন্দনা করতেন দেব এবং পিতৃগণ। তাঁরা সকলেই পরিধান করতেন সাদা পোষাক, গায়ে থাকত নানাবিধ সোনার অলংকার। আর থাকত কিছু অনুচর যারা সর্বদাই মরণশীল মানুষের আয়ুর হিসেব নিকেশ করত। প্রাসাদটি সবসময়েই থাকত সুগন্ধী দ্রব্যের গন্ধে ভরপুর, ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা। সর্বদাই সুমধুর সঙ্গীতে মুখরিত।

যমের স্বর্গের পরই উল্লেখ করতে হয় বরুণ এবং ইন্দ্রের স্বর্গ দুটির কথা। বরুণ গোড়ার দিকে ধর্মরাজ যমের বিচারসভায় তাঁর সহযোগী ছিলেন, কিন্তু পরে ক্রমে হয়ে উঠেছিলেন সমুদ্রাধিপতি। তাঁর স্বর্গও ছিল সমুদ্রের ভিতর। এটিও নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা। তাঁর স্বর্গ বেষ্টিত ছিল শ্বেতবর্ণ প্রাচীরে। প্রাচীরের গায়ে ছিল নানান ধরনের অলংকারের সূক্ষ্ম কাজ। আর ছিল সুন্দর সুন্দর গাছ গাছালি। পাখিরা সেখানে মিষ্টি সুরে গান গাইত। স্বর্গাধিপতি বরুণ তাঁর শ্বেতবর্ণ প্রাসাদে রানীকে পাশে নিয়ে বসতেন তাঁর রাজসিংহাসনে। তাঁরা উভয়েই নানাবিধ স্বর্ণালংকার ও পুষ্পালংকারে ভূষিত থাকতেন। তাঁদের ঘিরে থাকত আদিত্য, নাগ দৈত্য, দানব প্রমুখ।

ইন্দ্রের স্বর্গ ছিল মেরুশৃঙ্গে। এটিও বিশ্বকর্মা তৈরি করেছিলেন। অন্য দুটি স্বর্গ রথের ন্যায় ইচ্ছেমত স্থানান্তরিত করা যেত, এটি কিন্তু ছিল স্থির। অন্য দুটি স্বর্গের মতো এটিও পুষ্পগন্ধামোদিত এবং পাখির কাকলিতে পূর্ণ ছিল। ইন্দ্র তাঁর সিংহাসনে রানীকে নিয়ে বসতেন শাদা পোষাক পরে, গলায় থাকত ফুলের মালা। তাঁর রাজমুকুটে শোভা পেত নানাবিধ কারুকার্যখচিত মণিরত্ন। সেখানে ছিল না কোনো দুঃখ শোক জরা ভয়। ইন্দ্রের স্বর্গের এই ঐশ্বর্যের রূপ এখনো আমাদের মনে শিকড় গেড়ে আছে। বস্তুত স্বর্গ এই শব্দটির সঙ্গে

আমাদের আবহমান কল্পনার যোগ সবচাইতে বেশি এই ইন্দ্রের স্বর্গেরই। মানুষের স্বর্গাভিপ্রায়ের সঙ্গে গোড়ার দিকে যমের নিকট সম্পর্ক থাকলেও পরে তা ইন্দ্রের স্বর্গের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরমারাধ্য পিতৃগণের গম্যলোকও, লেখাবাহুল্য, এই ইন্দ্রের স্বর্গ।

কিন্তু কেমন করে যাওয়া যায় এই অভীষ্টলোকে? সকলেরই কি সৌভাগ্য হয় এই বাঞ্ছিত স্বর্গপ্রাপ্তির? নাকি সেখানেও কড়াক্কড় কোনো নিয়ম আছে? আমাদের শাস্ত্রীয় কৃত্যের বিধি-বিধানে এ সবেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। মানুষ মারা গেলে তার প্রিয়জনের কী কী করণীয় এবং কী কী নিষিদ্ধ—সবকিছুই বিস্তৃতভাবে সেখানে বলা হয়েছে।

মৃত্যুর পরবর্তী অস্তিত্ব বিষয়ে বিশদ আলোচনায় যাওয়ার আগে তাই যে চিন্তা স্বভাবতই আমাদের মনে আসে তা হচ্ছে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে পরিচিত এবং প্রিয় দেহটি মৃতদেহ বলে ঘোষিত হল তার সদগতির কী উপায় আমরা গ্রহণ করব। তাকে কী সমাধিস্থ করব না অগ্নিদগ্ধ করব? অথবা দাহ-পরবর্তী সমাধি? কিংবা গুহাসমাধি অথবা সলিলসমাধি? অথবা দেহের কিছু পক্ষীকুলের আহারের জন্য উৎসর্গ করে বাকি অংশ কূপে নিক্ষেপ? কোন্‌টি প্রশস্ত হবে? কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মৃতকে যথাযোগ্য সম্মান দেখানো হবে?

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে মৃতদেহের সংকারের জন্য সমাধি এবং দাহ—এই দুই রীতিরই প্রচলন ছিল প্রাচীনকালে। সমাধি অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী ব্যবস্থা এবং অগ্নিসংকার পরবর্তী—এরকমই মনে হয়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই অগ্নিসংকারের নিদর্শন পরবর্তীকালের। সাইথিয়ান রাজাদের মধ্যে এবং পারস্য রাজাদের মধ্যেও প্রাচীনকালে কেবলমাত্র সমাধি ব্যবস্থারই প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রীসেও তাই পরে হোমারের যুগে অগ্নি সংকারের সূচনা হল। রোমান কেল্ট এবং টিউটনদের মধ্যেও সমাধিই ছিল প্রাচীনতম রীতি। ভারতবর্ষে অবশ্য বহু আগে থেকেই সমাধি এবং অগ্নিসংকার দুই-এরই প্রচলন দেখা গেছে।

সমাধি এবং অগ্নিসংকার—এই দুই রীতির পাশাপাশি আরেক ধরনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানে শবদাহের পর দগ্ধ দেহের অংশবিশেষ বা অস্থি কিংবা ভস্ম সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা ছিল।

একেবারে প্রাথমিক যুগে, পৃথিবীর নানা জায়গায় নানারকম সংকার ব্যবস্থা দেখা গিয়েছে। কোথাও শবদেহ খাওয়ান হত পাখি বা অন্যান্য জীব দিয়ে, কোথাও আকাশের নীচে শূন্যে শবদেহ রেখে দেওয়া হত, কোথাও আবার গুহা সমাধির প্রচলন ছিল, কোথাও বা সলিলসমাধির। কোথাও কোথাও এখনও এই সমস্ত রীতি যতটা সম্ভব পালন করা হয়, কোথাওবা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। দেশভেদে এবং জাতিভেদে যেমন ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের ভেদ দেখা যায় তেমনি ভেদ লক্ষ্য করা যায় এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যেও। হিন্দুরা দাহ করে। মুসলমানরা, খ্রিস্টানরা সমাধি দেয়। পার্শীরা পাখিদের দিয়ে মৃতদেহ খাইয়ে দেয়, আবার প্রতিবাসী তিব্বতীরা সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পদ্ধতিতে শবদেহের সংকার করে। এদের সংকারের

রীতি কিন্তু সব থেকে জটিল। কোন তিব্বতীর মৃত্যু হলে তারা গণৎকার লামাদের ডাকে। এই গণৎকারের গণনানুসারে দাহ, কবর অথবা পাখিদের দিয়ে খাইয়ে মৃতদেহের সৎকার করা হয়। এছাড়া অনেক সময়ে নদীর জলেও মৃতদেহ ফেলে দিয়ে সৎকার করে তিব্বতীরা। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এরা সৎকার করে না। তিনদিন পর্যন্ত একটি কম্বলের ওপর লবণ এবং বালি বিছিয়ে তার ওপর মৃতদেহ রেখে দেয়। তারপর সৎকার করে।

ভারতবর্ষের মৃতদেহের সৎকার অনুষ্ঠানের ব্যাপারটি বহুদিন আগে থেকে, হয়তো বা প্রাক্‌বৈদিক যুগ থেকেই প্রচলিত রয়েছে। সময়ান্তরে এর আনুষ্ঠানিক নানা পরিবর্তন ঘটলেও, এ দেশের মাটিতে এই সৎকার ব্যবস্থাটি কখনই একেবারে লোপ পায়নি। সিন্ধুসভ্যতার যুগে এবং গৃহ্য ও পৌরাণিক যুগেও এই অনুষ্ঠানের নিদর্শন আছে।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার খননের ফলে আমরা জানতে পারি যে সিন্ধুসভ্যতার যুগে মৃতের উদ্দেশ্যে নানারকম উপহার দ্রব্য উৎসর্গ করা হত। এই সঙ্গে থাকত একটি শবাধার অথবা দগ্ধ অস্থি ও ভস্ম রাখার পাত্র। কিন্তু এদের মধ্যে অস্থি পাওয়া যেত না। দগ্ধ অস্থিগুলি তবে কি হত? হয়তো চূর্ণ করা হত, হয়তোবা অন্য কোনও উপায়ে এর সদগতি হত। বেলুচিস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে স্যার অরেল স্টেন অনুরূপ কয়েকটি শবাধারের সন্ধান পান। এ থেকে মনে হয় মৃতদেহ দাহ করে তারপর সমাধি দেওয়ার এক ধরনের নিয়ম তখন প্রচলিত ছিল।

বৈদিক যুগেও এই নিয়মের নিদর্শন পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অনেক সূক্তই সৎকার অনুষ্ঠান বিষয়ে রচিত হয়েছে। যজুর্বেদ-সংহিতাতেও এরকম কিছু সূক্ত পাওয়া যায়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের মতে ব্যবহারবিধি বিষয়ক এই সমস্ত মূলগ্রন্থে দাহ এবং দাহ-পরবর্তী সমাধি-ব্যবস্থা—মৃতদেহের এই দুরকম সৎকার পদ্ধতিই বর্ণিত হয়েছে।

ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে সূত্রগুলি পারম্পর্য অনুসারে দেওয়া হয়নি। সূক্তের অর্থ থেকে অথবা মূলগ্রন্থ থেকে আমরা এই ব্যবস্থাগুলি অনুমান করে নিতে পারি মাত্র। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অবশ্য সূত্রগুলি পারম্পর্য অনুসারে দেওয়া হয়েছে।

ঋগ্বেদের (১০) অন্ত্যেষ্টিসূক্তের অর্থ অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাব, এই সময়ে সমাধি এবং দাহ—দুই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। একটি ছাগল এবং একটি গরুকে মৃতের সঙ্গে দগ্ধ করা হত। শবদেহটি গরু অথবা ছাগলের চামড়া, চর্বি এবং মজ্জা দিয়ে এমনভাবে আচ্ছাদিত করা হত যাতে আগুন দেহটিকে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করতে না পারে। সোমযাগের যিনি যজমান তাঁর যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে দগ্ধ করা হত। মৃতদেহটিকে যমরাজের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্নিকে আহ্বান জানান হত। পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান পরিচিত ছিল। মৃতদেহের নিরাপত্তার জন্য এবং পিতৃলোকে মৃতের উত্তরণের জন্য পূষণ, বায়ু, অগ্নি এবং সবিতৃদেবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানান হত। জীবিতদের নিরাপত্তার জন্য একটি প্রস্তরখণ্ড দিয়ে গণ্ডী আঁকার নিয়ম ছিল।

এই সমস্ত তথ্য থেকে মনে হয়, এ সময়ে সমাধি এবং দাহ-পরবর্তী সমাধির প্রচলন ছিল। সমাধিব্যবস্থার মধ্যে মৃতের দেহটিকে যতদিন সম্ভব রক্ষা করার একটা ইচ্ছা প্রকাশ পেত। অথবা মৃতদেহটিকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আবদ্ধ রাখার আরেকটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, দেহের সঙ্গে মৃতের আত্মাও আবদ্ধ থাকুক ঐ নির্দিষ্ট স্থানটিতে। নতুবা ওই অশুভ আত্মা অন্য জীবিত স্বজনদের হয়তো ক্ষতিসাধন করতে পারে। সে যাই হোক, সমাধির একেবারে বিপরীতমুখী ব্যবস্থা দাহপ্রথার অনুষ্ঠানে মৃতদেহকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করার মধ্যে যে একটি আমূল পরিবর্তিত মানসিকতার আভাস পাওয়া গিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্রমে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসেরও পরিবর্তন হল। দাহপ্রথার স্বপক্ষে মানুষ নানারকম যৌক্তিকতা খুঁজে পেল।

কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করার সবচেয়ে ত্বরিত এবং সহজতম উপায় হচ্ছে দাহব্যবস্থা। এঁদের মতে যতদিন দেহ রক্ষিত থাকে, আত্মাও ততদিন আবদ্ধ থাকে। এতে আত্মার মুক্তি যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি ঐ আত্মার পক্ষে অন্যান্য জীবিতদের ক্ষতিসাধনও সম্ভব হতে পারে। সুতরাং মৃতের এবং জীবিতদের—উভয়ের স্বার্থেই দাহব্যবস্থা সবচেয়ে প্রশস্ত।

কোনো কোনো পণ্ডিত এও মনে করেন, যে সমস্ত জাতির কোন নির্দিষ্ট বাসভূমি নেই তাদের পক্ষে দাহব্যবস্থাই প্রশস্ততম। কারণ এদের পক্ষে মৃতদেহ সুরক্ষিত রাখা অসুবিধাজনক, আর অরক্ষিত মৃতদেহের সাহায্যে অমঙ্গলসাধন সম্ভব—এ বিশ্বাস তাদের বদ্ধমূল ছিল। দাহব্যবস্থা প্রবর্তনে সে সম্ভাবনা দূর হয়ে গেল।

নির্দিষ্ট বাসভূমি থাকা সত্ত্বেও যাদের জনসংখ্যা অনুপাতে বাসস্থান যথেষ্ট নয় তাদের পক্ষেও বোধ হয় দাহব্যবস্থা একই কারণে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ব্যবস্থা।

দাহব্যবস্থা প্রসারের আরও কতকগুলি কারণ আছে। আদিম আর্যরা পরিবার এবং গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করতেন। ঐ পরিবার এবং গোষ্ঠীর অন্তর্গত মানুষদের মৃত্যুর পর বাসস্থানের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমাধিস্থ করা হত। তাঁরা বিশ্বাস করতেন মৃতের আত্মা ঐ সমাধিস্থানেই বাস করেন। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠীগুলি এক একটি রাজ্যে পরিণত হল। রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই সময়ে পরিবর্তিত বিশ্বাস নিয়ে মানুষ ভাবতে চাইল মৃতের আত্মা একটি নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে কোন দূরবর্তী লোকে গমন করে এবং স্থানটি বিশেষ কোন শক্তিমানের দ্বারা শাসিত হয়। স্বর্গগমনের এই বিশ্বাস পোষণের পক্ষে দাহব্যবস্থাই বেশি অনুকূল। দাহপ্রথার প্রসারের হয়তো এও একটি কারণ।

অধ্যাপক কীথ অবশ্য মনে করেন, আত্মার স্বর্গগমনের জন্য দাহ প্রয়োজন—এ বিশ্বাস ঠিক বৈদিক যুগের নয়। ঋগ্বেদে একথা স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, সমাধি অথবা দাহ—যে কোনও উপায়েই হোক মৃতব্যক্তি স্বর্গলাভ করেছে; তাঁর মতে, স্বাভাবিক নিয়মেই দাহপ্রথার সূচনা এবং প্রসার হয়েছে। যে অগ্নিকে মানুষ এবং দেবতাদের সংযোগকারী বলে মনে করা

হত সেই অগ্নির পূজা হিসাবেই এই দাহপ্রথার সূত্রপাত। কিন্তু ভারতবর্ষে এই প্রথার সর্বপ্রথম সূচনা হয়েছিল সম্ভবত যুদ্ধের প্রয়োজনে। কারণ যুদ্ধের সময়ে শত্রুর হাতে মৃতদেহের সব থেকে বেশি ক্ষতি এবং অসম্মান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অধ্যাপক কীথ্ মোটামুটি এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ অবশ্য এমন কথাও বলেছেন যে জ্বালানি কাঠের প্রাচুর্যের জন্যই ভারতবর্ষে দাহব্যবস্থা একমাত্র প্রচলিত রীতি হয়ে উঠেছিল।

তবে কেবলমাত্র কতকগুলি সুবিধাজনক কারণেই ভারতবর্ষে দাহপ্রথার প্রসার হয়েছে একথা মেনে নেওয়া কঠিন। দাহপ্রথার প্রসারের মধ্যে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রভাবই গভীরভাবে কার্যকর হয়েছে বলে মনে হয়।

ঋগ্বেদের একটি সূক্তে বলা হয়েছে যে মৃতদেহকে আমরা অগ্নিদেবতায় আহুতি দিই (হে অগ্নে যঃ প্রেতঃ তে আহুতঃ চিতৌ মন্ত্রেণ সমর্পিতঃ)।

ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে পিতৃমেধ যজ্ঞের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং অথর্ববেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য বলেছেন মৃতের দাহ অনুষ্ঠানই 'পিতৃমেধ'। ঋগ্বেদে আমরা 'পিতৃযজ্ঞ' নামে একটি অনুষ্ঠানের বিষয়েও জানতে পারি। মৃতদেহের পিতৃলোকে উত্তরণের জন্য প্রার্থনা জানানো হত এমন একটি তথ্যও আমরা জেনেছি। এখন ঋগ্বেদে নির্দেশিত এই পিতৃযজ্ঞ কি, পিতৃলোকই বা কি—এ সমস্ত প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে আসতে পারে।

পিতৃযজ্ঞ এবং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ বৈদিক অনুষ্ঠান। পিতৃদেবতাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত। বৈদিক চিন্তাধারায় অন্ত্যেষ্টির অব্যবহিত পরেই মৃতব্যক্তি পিতৃত্বলাভ করে এবং পার্বণশ্রাদ্ধে অর্চিত হওয়ার অধিকার পায়।

কালক্রমে এই বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়েছিল। গৃহ্যযুগে দেখা যায় মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মৃতব্যক্তি প্রেত হয় এবং এই প্রেতের মুক্তির জন্য কিছু অনুষ্ঠানাদি না হওয়া পর্যন্ত প্রেত পিতৃত্ব লাভ করে না। এই প্রেত থেকে পিতৃত্বে উন্নীত হওয়ার জন্য সাধারণত এক বৎসর সময় লাগে।

গৃহ্যযুগের এই চিন্তাধারায় বৈদিক বিশ্বাসের কিছুটা সংরক্ষণ, কিছুটা আবার সংশোধন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মৃতব্যক্তির আত্মা 'পিতৃ' হয় এই বৈদিক ধারণাও পোষণ করা হত, আবার কোনো ব্যক্তি যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পিতৃত্বলাভ করে না এরকম একটি সংশোধিত মতবাদেও বিশ্বাস ছিল গৃহ্যযুগে। এই সময়ে এরকম বিশ্বাস ছিল যে মৃতব্যক্তির আত্মা প্রথমে 'প্রেত' এবং সাধারণত এক বৎসর পরে এই আত্মা পিতৃস্তরে উন্নীত হয়। এই কষ্টকর প্রেত অবস্থা থেকে মৃতের মুক্তিলাভের জন্য 'মাসিক একোদ্দিষ্ট' এবং 'সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হল। সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠান পালন করা হলেই মৃতব্যক্তি পিতৃস্তরে উন্নীত হয় এবং পার্বণশ্রাদ্ধে অর্চিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। শ্রৌত এবং গৃহ্য পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ থেকেই এই পার্বণের উৎপত্তি।

পৌরাণিক যুগে আতিবাহিক দেহ সম্পর্কে একটি নূতন চিন্তা বা কল্পনার প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। বৈদিক সাহিত্যে প্রেত এবং আতিবাহিক শরীরের কল্পনা প্রায় অপরিজ্ঞাত ছিল। পৌরাণিক চিন্তাধারায় মৃতব্যক্তির স্থূল দেহ ভস্মীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা একটি সূক্ষ্মদেহের আশ্রয় নেয়। এই দেহ গৃহ্যসূত্রের প্রেতদেহের থেকে সূক্ষ্মতর এবং এই সূক্ষ্মতর দেহের নামই আতিবাহিক দেহ। এইভাবে দেহ ধারণ করে আত্মা শীতে তাপে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় একান্তভাবে কষ্ট পায়। এই আতিবাহিক স্তর প্রেতস্তর থেকে বেশি কষ্টকর। এই কষ্টকর অবস্থা থেকে আত্মার মুক্তিলাভের জন্য 'পূরকপিণ্ডদান'-এর ব্যবস্থা ছিল। সৎকার অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রাথমিক সূক্ষ্মদেহ তৈরি হয়। পুরকপিণ্ড দান দ্বারা এই প্রাথমিক সূক্ষ্মদেহ বিনষ্ট হয়ে প্রেতশরীর তৈরি হয়। পুরকপিণ্ড দান দ্বারা এই প্রাথমিক সূক্ষ্মদেহ বিনষ্ট হয়ে প্রেতশরীর নামে এক মাধ্যমিক দেহের সৃষ্টি হয়। আবার মাসিক একোদ্দিষ্ট এবং সপিণ্ডীকরণের দ্বারা এই প্রেতশরীর বিনষ্ট হলে তখন মৃতব্যক্তির আত্মা পিতৃত্বলাভ করে এবং পার্বণানুষ্ঠানে অর্চিত হয়। এই পার্বণানুষ্ঠানই পিতৃপূজা বা শ্রাদ্ধ নামে সাধারণ্যে প্রচলিত।

প্রসঙ্গত যমরাজ-সংক্রান্ত চিন্তায় যুগে যুগে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা-ও এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বিবস্বৎ-সন্তান যম ও যমী যমজ ভাই-বোন, আবার পুরাণকথা অনুসারে প্রথম পুরুষ এবং নারী। প্রথম স্বামী এবং স্ত্রী। মানবজাতির সৃষ্টিলগ্নে যমই হলেন তাদের পথ-প্রদর্শক। পিতৃযানের প্রথম পথিক তিনিই, অন্যান্যদের পথিকৃৎ-ও তিনিই। মানুষ মারা গেলে এই পিতৃযানের পথেই স্বর্গলোকগমন করে। পৃথিবীর প্রথম স্বর্গগামী যমই হলেন স্বর্গলোকের রাজা। তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে যে-কেউ মারা গেলে স্বর্গগমন করতে পারত। কিন্তু পরে এ-বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটে। যম নন, অগ্নিই তখন স্বর্গগমনের কর্ণধার হন। তাঁর আমলে কোনো লোক মারা গেলে অগ্নিসৎকার আবশ্যিক বলে গণ্য হয়। তখন মানুষের মনে এই বিশ্বাস কাজ করে যে পাপী-তাপীর মৃতদেহ আগুনে ছাই হয়ে গেল আর তার আত্মা অগ্নিসংযোগে পরিশুদ্ধ হয়ে ছুটে চলল স্বর্গের পথে—যমরাজ যেখানকার রাজা—যেখানে তারা সানন্দে মিলিত হবে তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে।

প্রারম্ভে মানুষ মারা গেলেই স্বর্গগমন করে এই ধারণা থাকলেও, ক্রমে এই চিন্তা পরিবর্তিত হতে শুরু করে। মানুষের তখন মনে হয় স্বর্গগমন অত সরল ব্যাপার নয়। যমরাজকে তখন সে 'ধর্মরাজ' শিরোপা দিয়ে রীতিমত বিচারপতি বানিয়ে ছেড়েছে। তাঁকে বিচারের কাজে সাহায্য করেন বরুণ। দুজনেই গাছের তলায় বসে সভা বসান। রাখালদের মত বাঁশি বাজান আর আনন্দে সোমরস পান করেন যমরাজ। মৃতজনেরা যারা আসে তাদেরই পান করান ঐ সোমরস। সোমরসপানে তারা সবাই অমরতা লাভ করে। ক্রমে এই ধারণা পরিবর্তিত হয়। তখন বলা হয় অগ্নিসৎকারই মৃতমানুষের স্বর্গগমনের একমাত্র ছাড়পত্র হতে পারে না। পৃথিবীবাসের সময় মানুষের সুকৃতি এবং কুকৃতিই তার স্বর্গপ্রাপ্তির আসল রহস্য। ইতিমধ্যে নরকচিন্তাও মানুষের মাথায় ঢুকেছে। পৃথিবীতে কুকাজ যারা করে এসেছে, মারা

গেলে তাদের গতি অবধারিতভাবে ঐ নরকে। সেখানে এক এক অপরাধে এক এক রকম শাস্তি। মৃতমানুষের মধ্যে কে কেমন কাজ করে এসেছে সে বিষয়ে যমরাজকে অবহিত করে একটি পায়রা, একটি পেঁচা এবং আর দুটি চারচোখো কুকুর। পরে অবশ্য তিনি এবিষয়ে সহায়ক হিসেবে পান চিত্রগুপ্ত এবং তাঁর কয়েকজন সহকারীকে।

ধাপে ধাপে স্বর্গরাজ যম নামতে নামতে শেষকালে নরকরাজ রূপেই স্থিত হলেন। পাশাপাশি তাঁর বিচারসভার সভ্য বরুণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গ ঐশ্বর্যে সুখে স্বচ্ছন্দ্যে ভরপুর হয়ে উঠল। সত্যিকারের হয়ে উঠলো কিনা কে জানে, অন্তত তখনকার মানুষ ভাবলো তাই-ই। এবং এখনো 'যমরাজ' কথাটি বললে আমাদের চোখের সামনে স্বর্গের কোনো ছবি ভাসে না, ভেসে ওঠে নরকের নানাবিধ বীভৎস শাস্তির নিষ্ঠুর দণ্ডদাতার ছবি! যমরাজের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে পারলৌকিক কৃত্যের নিবিড় সম্পর্কের কথা ভেবেই এত-সব বলা।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে বৈদিক চিন্তাভাবনারই একটি বিবর্তিত রূপমাত্র গৃহ্যমতবাদ, এবং পৌরাণিক মতেও সেই একই বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি ভিন্ন সুস্পষ্ট চিন্তাধারাই কিন্তু একটি বিষয়ে একমত। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানে অথবা এ থেকেই উদ্ভুত অন্য কোনও অনুষ্ঠানে অর্চিত হওয়ার আগেই যে মৃতব্যক্তির আত্মা পিতৃত্বলাভ করে এ বিষয়ে কারোরই মতভেদ নেই। বৈদিক মতে, মৃত্যুর পরেই মৃতের আত্মা সরাসরি 'পিতৃ' হয়।

গৃহ্যযুগে বিশ্বাস করা হত আত্মা প্রেত শরীর নামে একটি মাধ্যমিক দেহের সাহায্যে পিতৃ হয়ে ওঠে। পৌরাণিক মতে আবার মৃতব্যক্তির আত্মা প্রথমে একটি প্রাথমিক সূক্ষ্মদেহের (initial body) আশ্রয় নেয়। তাবপর একটি মাধ্যমিক (inter midiate) সূক্ষ্মদেহের আশ্রয় গ্রহণ করে। এক বৎসর পরে এই আত্মা পিতৃত্ব লাভ করে। এইভাবে বেদ, গৃহ্যসূত্র এবং পুরাণগুলি বিভিন্ন চিন্তাধারার অনুসরণ করেছে; যদিও সকলেরই এক এবং অভিন্ন লক্ষ্য হচ্ছে মৃতের আত্মার পিতৃস্তরে উত্তরণ।

যে মৃতব্যক্তির দেহ যথাযথভাবে দাহ করা হয়নি, সাধারণত তার জন্য শ্রাদ্ধাদি কোনো অনুষ্ঠানেরই নির্দেশ নেই। সম্ভাব্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দেহ দগ্ধ করতে হবে। যদি কোনো কারণে সম্পূর্ণদেহ পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে অস্থিগুলি অন্তত দগ্ধ করা প্রয়োজন। এমনকি, যে ক্ষেত্রে অস্থিও দুষ্প্রাপ্য হবে সে ক্ষেত্রে কুশতৃণ দ্বারা গঠিত মনুষ্যসদৃশ একটি আকৃতিকে দগ্ধ করতে হবে। যেভাবেই হোক দাহকার্য অবশ্য কর্তব্য। এই দাহই হচ্ছে মৃতের জন্য শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের প্রাথমিক কাজ। এই দাহকার্যকে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অন্ত্যেষ্টি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেভাবেই হোক না কেন, মোটের উপর সৎকার ব্যবস্থাটি ভারতবর্ষে কেবল বৈদিক যুগ থেকেই নয়, একেবারে আদিযুগ থেকেই প্রচলিত রয়েছে। বলাবাহুল্য, এই অনুষ্ঠানে বরাবরই একটি পবিত্র, গম্ভীর পরিবেশ রক্ষা করা হত। অবশ্য ব্যতিক্রম অদন্তক শিশু এবং সন্ন্যাসী। এদের জন্য সৎকার নয়, সমাধিরই ব্যবস্থা। বোধহয় নিষ্পাপ শিশু এবং সন্ন্যাসীর দেহ শুদ্ধিকরণে অগ্নিসংযোগের প্রয়োজন ছিল না।

স্মার্তমতে স্থূল ভৌতিক দেহ বিনষ্ট হলে, সদ্য মৃতব্যক্তির আত্মা তিনটি সূক্ষ্ম উপাদানে তৈরি আতিবাহিক শরীর নামে একটি সূক্ষ্মশরীরের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই আতিবাহিক শরীর গঠনের জন্য অন্ত্যেষ্টি ভিন্ন অন্য কোনো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। এই শরীর থেকে মুক্তিলাভের জন্য পূরকপিণ্ডদান করা হয়ে থাকে। পূরকপিণ্ডদানের ফলে আতিবাহিক শরীর নামে এই নবগঠিত প্রাথমিক সূক্ষ্মদেহটি ক্রমে বিনষ্ট হয়। পূরকপিণ্ডদান দ্বারা এই প্রেতশরীর গঠিত না হওয়া পর্যন্ত মৃতব্যক্তির আত্মা আতিবাহিক স্তরেই অবস্থান করে এবং এই অবস্থায় নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে আকাশে বিচরণ করতে থাকে। মৃত্যুর পর প্রথম দশদিন পূরকপিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে।

এই ভাবে নূতন যে প্রেতশরীরটি গঠিত হল তার পুষ্টিসাধনের জন্য আবার একোদ্দিষ্ট প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর দিন থেকে ধরে মৃত্যুর পর এক বৎসর পর্যন্ত প্রতি মাসে মাসিক একোদ্দিষ্টগুলি পালন করতে হবে। একটি একোদ্দিষ্ট একজনের উদ্দেশ্যেই নির্দিষ্ট। একোদ্দিষ্টের ফলে মৃতব্যক্তির তৃপ্তিসাধন হয় এবং প্রেত অবস্থা থেকে মুক্তি ঘটে। সপিণ্ডীকরণের ফলে প্রেত পিতৃস্তরে উন্নীত হয়। এই পিতৃত্বলাভ হলে তবেই মৃতব্যক্তি শ্রাদ্ধাদি পরবর্তী অনুষ্ঠানে অর্চিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিই পরস্পর সংযুক্ত। সংকার না হলে আতিবাহিক শরীর গঠিত হয় না; আতিবাহিক দেহ গঠিত না হলে মৃতব্যক্তি অনুকূল অথবা প্রতিকূল কোনও অবস্থাই ভোগ করতে পারে না। আতিবাহিক দেহ বিনষ্ট না হলে প্রেতশরীর গঠিত হতে পারে না। প্রেতশরীর গঠিত না হওয়া পর্যন্ত মৃতের আত্মা শীতে তাকে নিদারুণ কষ্ট পায় এবং নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে আকাশে বিচরণ করে। আবার এই প্রেতশরীর বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মৃতব্যক্তি পিতৃস্তরে উন্নীত হয় না এবং মৃতব্যক্তি পিতৃত্বলাভ না করা পর্যন্ত শ্রাদ্ধাদি-পরবর্তী অনুষ্ঠানে অর্চিত হওয়ার অধিকারী হয় না।

মাধব আবার একোদ্দিষ্টগুলিকে তিনটি শিরোনামায় বিভক্ত করেছেন। নব অথবা প্রাথমিক, নব মিশ্র অথবা মাধ্যমিক এবং পুরাণ অথবা পরবর্তী। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর এগারোদিনের মধ্যে যে একোদ্দিষ্টগুলি করা হয় তা প্রাথমিক এগারোদিনের পর থেকে প্রত্যেক মাসে একবৎসরব্যাপী যে একোদ্দিষ্টগুলি করা হয় তা মাধ্যমিক, আর প্রত্যেক বছরে মৃত্যুর দিনে যে একোদ্দিষ্ট হয় তাকে পরবর্তী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই তিন রকমের একোদ্দিষ্টই পরস্পর সম্পৃক্ত। প্রত্যেক পরবর্তী অনুষ্ঠান পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান থেকে উদ্ভূত। নবমিশ্র একোদ্দিষ্টের জন্য নব একোদ্দিষ্টের প্রয়োজন এবং পুরাণ একোদ্দিষ্টের জন্য আবার নবমিশ্র একোদ্দিষ্ট অনুষ্ঠানের প্রয়োজন।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক একোদ্দিষ্টগুলি প্রেতের উদ্দেশ্যে এবং পরবর্তী একোদ্দিষ্ট 'পিতৃ'র তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পিতৃর তৃপ্তিসাধনের জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে

দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শ্রৌত এবং গৃহ্য। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, পিতৃর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শ্রৌত অনুষ্ঠানাদির প্রধান অঙ্গস্বরূপ। এই অনুষ্ঠানে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ এই তিন পুরুষানুক্রমকে যথাক্রমে পিণ্ডদানের দ্বারা পূজা করা হয়ে থাকে।

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞানুষ্ঠান কেবলমাত্র যে শ্রৌত তা নয়; এর একটি গৃহ্যভাগও আছে। এই অনুষ্ঠানের গৃহ্যভাগে ব্রাহ্মণভোজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোহিল পিণ্ডপিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানকে শ্রাদ্ধেরই সমান বলে মনে করেন। গোহিলের একজন টীকাকার মনে করেন যে পিণ্ড বলে যদি কিছু নাও থাকে তথাপি ব্রাহ্মণভোজন অবশ্য কর্তব্য। গৃহ্যভাগে ব্রাহ্মণভোজনকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণভোজন শ্রাদ্ধের একটি প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য কেউ কেউ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকেই শ্রাদ্ধ বলে মনে করেন। শ্রৌতভাগে কিন্তু ব্রাহ্মণভোজনের কোনো নির্দেশ দেখা যায় না।

অন্বাহার্য বা পার্বণ সম্পূর্ণভাবেই একটি গৃহ্য অনুষ্ঠান। এবং এই অনুষ্ঠানই প্রকৃত শ্রাদ্ধ। কারণ এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণভোজন একটি অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করা হয়। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের গৃহ্যরূপের সঙ্গে এই অন্বাহার্য বা পার্বণের ঘনিষ্ঠযোগ আছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের শ্রৌতভাগের সঙ্গে আবার পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্চনাদি ব্যাপারে গার্হস্থ্য এবং শ্রৌত অনুষ্ঠানগুলির একটি বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে এবং এটি সত্যিই লক্ষ্য করার মতো। স্পষ্টই বোঝা যায় যে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ নামে বৈদিক পিতৃপূজা থেকেই শ্রাদ্ধের উৎপত্তি। মূলত এই অনুষ্ঠান বৈদিক।

মহাভারতে বলা হয়েছে নিমি শ্রাদ্ধের আদি অনুষ্ঠাতা। নিমির পুত্র শ্রীমৎ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যার পর মারা যান। নিমি তখন পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে শ্রাদ্ধের কল্পনা করেন। তিনি কিছু ফলমূল এবং শস্য সংগ্রহ করে কয়েকজন অর্চনীয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সাতজনকে লবণশূন্য শ্যামাক অন্ন প্রদান করে ভোজনরত ব্রাহ্মণদের পাদদেশে দক্ষিণাগ্র কুশমুষ্টি বিস্তৃত করলেন এবং মৃতপুত্রের নামগোত্র উল্লেখ করে কুশোপরি পুত্রের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করলেন। এই কাজ করে তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে ভাবতে লাগলেন—হায়! এ কি করলাম। মুনিরা পূর্বে কখনো এই অনুষ্ঠান করেন নি। এই অভিনব অবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণেরা যদি আমাকে অভিসম্পাত করেন? নিমিকে পুত্রশোকে বিহ্বল দেখে তাঁর আদি বংশকর্তা অত্রি তপোবনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন—তুমি যে অনুষ্ঠানের কল্পনা করেছ তাই 'পিতৃযজ্ঞ'। সুতরাং ভীত হবার কারণ নেই। ব্রহ্মা নিজেই এর বিধান দিয়েছেন। 'শ্রুতিরেষা সনাতনী'—অত্রির এই কথাটি থেকে বোঝা যায় ব্রহ্মা এই পিতৃপূজা অতি প্রাচীনযুগেই প্রবর্তিত করেছেন। সুতরাং বেদ যেমন নিত্য ও সনাতন, বৈদিক পিতৃঅনুষ্ঠানও তেমনি নিত্য ও সনাতন। নিমি এই পিতৃপূজার প্রবর্তক নন।

তবে নিমি যে তাঁর প্রবর্তিত কর্মকে অভিনব বলেছেন তার প্রথম কারণ সম্ভবত এই যে, মৃতপুত্রের উদ্দেশ্যে পিতার কর্মানুষ্ঠান এর আগে আর কখনো হয়নি। শাস্ত্রান্তরে বরং

এই কাজ নিষিদ্ধই করা হয়েছে।

তাছাড়া পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞাদি যা বিহিত হয়েছে তা ত্রিপুরুষাত্মক। নিমি যা করলেন তা এক পুরুষাত্মক। অর্থাৎ পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ এই তিন পুরুষকে পিণ্ডদানাদিদ্বারা অর্চনা না করে কেবলমাত্র পুত্রের উদ্দেশ্যে কর্মানুষ্ঠান করলেন। সে হিসাবেও তাঁর কর্মকে অভিনব বলা যেতে পারে। এই একপুরুষাত্মক শ্রাদ্ধকে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলা হয় এবং এই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের প্রবর্তক নিমি এমন কথা বলাই হয়তো ভারতকারের ইচ্ছা ছিল।

অথবা, প্রাচীন পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে অগ্নৌকরণ বা পিণ্ডদানই প্রধান। নিমি প্রবর্তিত শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজনই প্রধান। এই জন্যই হয়তো নিমির কর্মানুষ্ঠানকে অভিনব বলা হয়ে থাকবে।

যাই হোক, কঠোপনিষদে (অধ্যায় ১, বল্লী ৩, শ্লোক ১৭) পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে (৫, ২, ৮৫) আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (৪, ৭, ১) এবং এই রকম অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পিতৃপূজা প্রসঙ্গে শ্রাদ্ধ শব্দটি পাওয়া গিয়েছে। শ্রাদ্ধ শব্দটি কোন বৈদিক সংহিতা বা ব্রাহ্মণে দেখতে পাওয়া যায় না।

রঘুনন্দনের 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব'-এর মতে শ্রাদ্ধ কথাটির সংজ্ঞা হল, মৃতব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভরে কোন কিছু দান করা। কিন্তু সংজ্ঞাটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শাস্ত্রকারেরা সর্বদা সেই ব্যাপক মানসিকতার ছাপ রাখতে পারেন নি। নানাবিধ বিধানের কূটকলায় তাঁরা সংজ্ঞার ব্যাপক অর্থ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। আপস্তম্বের মতে, মৃতজনের আত্মার উদ্দেশ্যে কোনো দ্রব্য ত্যাগ থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সেইসব ত্যক্ত দ্রব্য গ্রহণ পর্যন্ত যাবতীয় কাজকেই বলা হয় শ্রাদ্ধ। বঙ্গীয় স্মৃতিকার শূলপাণি অবশ্য শ্রাদ্ধের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেননি। তিনি আপস্তম্বের সংজ্ঞার সমালোচনা সূত্রে বলেছেন, শ্রাদ্ধকর্মের অন্ন তো কেবল ব্রাহ্মণদেরই দান করার বিধান নেই—অগ্নি কিংবা জলেও দান করার বিধান আছে। এমনকি, গোরু বা ছাগলকেও তা দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং আপস্তম্বের প্রদত্ত সংজ্ঞায় প্রথমেই এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকে এক ধরনের শ্রাদ্ধ বলেই ভাবা হয়। কিন্তু আপস্তম্বের সংজ্ঞানুসারে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকে শ্রাদ্ধই বলা যায় না। কেননা, এই যজ্ঞে কোনো দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করার ব্যবস্থা নেই। এইসব ত্রুটি লক্ষ্য করেই শূলপাণি শ্রাদ্ধের একটি নতুন সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, 'সম্বোধনপদোপনীতান্ পিত্রাদীন্ চতুর্থ্যান্তপদেনোদ্দিশ্য হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্'—সম্বোধন পদদ্বারা আহূত উপস্থিত পিত্রাদির আত্মাকে চতুর্থীবিভক্তি অন্ত পদের সাহায্যে হবিত্যাগের নাম শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধ কাকে বলে এই নিয়ে যেমন নানা মুনির নানা মত তেমনি এর প্রকার ভেদ নিয়েও তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। শূলপাণি তাঁর 'শ্রাদ্ধ বিবেক' গ্রন্থে যে-সব শাস্ত্রকারদের মতামত আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশ্বামিত্রের মতে শ্রাদ্ধ মোট বারো রকমের। 'ভবিষ্যপুরাণ'ও সংখ্যার দিক থেকে শ্রাদ্ধকে অনুরূপ ভাগে বিভক্ত করেছেন, কিন্তু কার

কার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে সে-বিষয়ে উভয় মতে বিস্তর ফারাক আছে। বৃহস্পতি আবার সংখ্যার দিক থেকে শ্রাদ্ধকে কমিয়ে পাঁচ প্রকারের ভাগ করেছেন—১. নিত্য, ২. নৈমিত্তিক, ৩. কাম্য, ৪. বৃদ্ধি, ৫. পার্বণ।

শূলপাণি বিশ্বামিত্র-বর্ণিত বারো রকমের শ্রাদ্ধকে বৃহস্পতি-বর্ণিত পাঁচ প্রকার শ্রাদ্ধের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

'নির্ণয়সিন্ধু' প্রণেতা কমলাকারের মতে শ্রাদ্ধ প্রধানত চার প্রকার। ১. পার্বণ ২. একোদ্দিষ্ট ৩. বৃদ্ধি এবং ৪. সপিণ্ডীকরণ। মাধব আবার এগুলিকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। ১. পার্বণ এবং ২. একোদ্দিষ্ট। বৃদ্ধি পার্বণেরই অন্য একটি রূপ। আর সপিণ্ডীকরণ হচ্ছে পার্বণ এবং একোদ্দিষ্টের সংমিশ্রণ। পার্বণই সমস্তপ্রকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রকৃতিস্বরূপ। এরপর একোদ্দিষ্টের স্থান। এই দুই প্রকার শ্রাদ্ধ থেকেই অন্যান্য শ্রাদ্ধগুলির উৎপত্তি। এই হচ্ছে মাধবের সুচিন্তিত অভিমত।

হেমাদ্রির মতে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের তিনটি প্রধান উপাদান হচ্ছে ১. অগ্নৌকরণ অথবা অগ্নিতে জ্বালানি এবং পিণ্ড প্রদান ২. পিণ্ডদান এবং ৩. ব্রাহ্মণভোজন।

শূলপাণি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থল সম্পর্কে তাঁর 'শ্রাদ্ধ বিবেক' গ্রন্থে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে নিম্নলিখিত স্থানগুলি শ্রাদ্ধকার্যের জন্য প্রশস্ত—১. পুষ্কর নামক স্থান, ২. সকল তীর্থস্থান, ৩. নদীতীর, ৪. নদীর সঙ্গমস্থল, ৫. নদীর উৎপত্তিস্থল, ৬. দ্বীপ, ৭. নিকুঞ্জ, ৮. প্রস্রবণ, ৯. উদ্যানবাটিকা, ১০. বন, ১১. গোময়-লিপ্ত ঘর, ১২. মনোজ্ঞ স্থান, ১৩. গঙ্গা ও সরস্বতী নদীর তীরবর্তী স্থান, ১৪. গয়া, ১৫. কুরুক্ষেত্র, ১৬. প্রয়াগ, ১৭. নৈমিষ, ১৮. পর্বত বা তার সানুদেশ।

রঘুনন্দন কিম্বা গোবিন্দানন্দ যদিও উপরের ঐ তালিকার সঙ্গে নতুন কোনো নাম সংযোজন করেননি কিন্তু শেষোক্ত স্মৃতিকার বলেছেন যে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত বৃত্রের মেদে সমগ্র পৃথিবী অপবিত্র হয়েছিল বলেই পৃথিবীর আর এক নাম মেদিনী। সুতরাং শ্রাদ্ধস্থান পঞ্চগব্য ও উল্মুক প্রভৃতির সাহায্যে শোধন করে নেওয়া উচিত। তাঁর মতে বারাণসীতে শুধু গোময় ভিন্ন অপর কোন শোধক দ্রব্য ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের যেমন উপযুক্ত স্থল আছে তেমনি নিষিদ্ধ স্থানও বিদ্যমান। যে-সব স্থানে শ্রাদ্ধকার্য নিষিদ্ধ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—১. ম্লেচ্ছদেশ (চতুর্বর্ণের লোক যেখানে বাস করে না), ২. ত্রিশঙ্কুদেশ, (মগধের দক্ষিণে মহানদীর উত্তরে দ্বাদশ যোজনব্যাপী দেশ) , ৩. কারস্কর দেশ. ৪. সিন্ধুনদের উত্তরস্থ দেশ, ৫. বালুময় স্থান, ৬. কীট-পতঙ্গ বহুল স্থান, ৭. কর্দমাক্ত স্থান, ৮. সংকীর্ণ স্থান, ৯. অনিষ্টগন্ধিক স্থান, ১০. অপর ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত স্থান, (যদি এইরকম স্থানে শ্রাদ্ধকার্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে তবে ভূস্বামী জীবিত থাকলে তাকে ভূমি-মূল্য দিতে হবে, মৃত হলে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে অগ্রভাগ দিতে হবে।)

যেদিন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় সেদিন শ্রাদ্ধকারীর কতগুলি বিশেষ কর্তব্য থেকে যায়।

শ্রাদ্ধদিবসের কর্তব্যগুলি মোটামুটি এইরকম—

১. প্রাতঃস্নানের পরে ধৌতবস্ত্র পরিধান ২. শ্রাদ্ধীয় অন্নের রন্ধন (নিজে অক্ষম হলে পত্নী করতে পারেন। পত্নী অভাবে সপিণ্ডও এই কার্যে সক্ষম। এই রন্ধন মাটি বা তাম্রপাত্রে করাই বিধেয়।)

শ্রাদ্ধদিবসে করণীয় কার্যের কথা যেমন বলা হল তেমনি নিষিদ্ধ কার্যগুলিও এখানেই উল্লেখ করি—১. পরান্ন গ্রহণ ২. ক্রোধ ৩. পদব্রজে, নৌকাযোগে বা অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ ৪. অক্ষক্রীড়া ৫. বেদপাঠ ৬. দারাভিগমন ৭. দান ৮. প্রতিগ্রহ ৯. সন্ধ্যা ১০. দিবানিদ্রা ১১. ভারবহন ১২. দন্তধাবন ১৩. তাম্বুল ভক্ষণ।

শ্রাদ্ধের পূর্বদিনে শ্রাদ্ধকারীর নিম্নলিখিত কার্যগুলি করণীয়—১. বস্ত্রাদি শোধন ২. ক্ষৌরকর্ম ৩. শ্রাদ্ধস্থানের শোধন ৪. ইন্দ্রিয় সংযম ৫. একবার মাত্র নিরামিষ আহার ৬. শ্রাদ্ধদিনের জন্য ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ।

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অযুগ্ম হবে এবং সে সংখ্যা নির্ধারিত হবে শ্রাদ্ধকারীর সামর্থ্যের উপর (আভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সংখ্যা যুগ্ম হওয়া বাঞ্ছনীয়।)

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্যতা তাঁদেরই আছে যাঁরা 'বিশুদ্ধ মাতা-পিতৃকত্বম্'—অর্থাৎ যাঁদের মাতাপিতা কলুষিত নন। 'সৎকর্মশালিত্বম্'—অর্থাৎ যাঁরা সৎ কর্ম করেন। আত্মানাত্মবিবেচনশক্তি—অর্থাৎ সার ও অসার বস্তুর মধ্যে যিনি প্রভেদ বিচার করতে সক্ষম। উল্লিখিত গুণাবলি ছাড়াও তাঁরা হবেন বেদপাঠনিরত ও নির্লোভ। দূরে থাকেন এমন গুণী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকটস্থ তুলনায় অল্প গুণান্বিত ব্রাহ্মণগণই নিমন্ত্রণযোগ্য। শ্রাদ্ধকারীর দৌহিত্র, জামাতা এবং ভাগিনেয়দের কোন গুণ যদি নাও থাকে তথাপি তারা অবশ্যই নিমন্ত্রণযোগ্য বলে গণ্য হবেন। শ্রাদ্ধকারীর মতো নিমন্ত্রিতগণেরও ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদি পালন করা উচিত।

এর আগে শ্রাদ্ধের যোগ্য স্থান এবং নিষিদ্ধ স্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এবার তার যোগ্য সময়-অসময় সম্পর্কে কিছু বলব। এ বিষয়ে প্রথমেই জানান প্রয়োজন যে শ্রাদ্ধের সময়-অসময় বিষয়ে সকল স্মৃতিকারগণ একমত নন। তথাপি তাঁদের মতামতের সারাংশ থেকে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায় তা নিম্নরূপ—১. মাতৃক শ্রাদ্ধ—পূর্বাহ্ন ২. পৈতৃক শ্রাদ্ধ—অপরাহ্ন ৩. একোদ্দিষ্ট—মধ্যাহ্ন ৪. বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ—প্রাতঃকাল।

শ্রাদ্ধের জন্য নিম্নলিখিত সময়গুলি বর্জনীয়—১. রাত্রি ২. উষা ৩. সূর্যোদয়ের ঠিক পরক্ষণ। বিশেষ করে 'রাক্ষসী বেলা' বলে রাত্রিকাল অবশ্যই নিষিদ্ধ।

সাধারণত পিতার বর্তমানে পূর্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধে পুত্রের কোন অধিকার নেই। কিন্তু পাতিত্য, সন্ন্যাস, দুরারোগ্য ব্যাধি, বার্ধক্য প্রভৃতি কারণে পিতা অক্ষম হলে পুত্রই শ্রাদ্ধ করবে—এটাই শাস্ত্রবিধি। পিতা সক্ষম হলে তিনি যে যে পুরুষের শ্রাদ্ধ করতেন, পুত্র শুধু সেই সেই পুরুষের শ্রাদ্ধ করবে। পিতার বর্তমানেও পুত্র নিজের সন্তানের সংস্কারাঙ্গ শ্রাদ্ধাদির

অধিকারী বলে গণ্য হবে।

আমরা যদি এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি ভাল করে লক্ষ্য করি তবে তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় দেখতে পাব।

১. প্রথম পর্যায়ে এই অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র অগ্নৌকরণ অর্থাৎ জ্বালানি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি অগ্নিতে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা ছিল। এই অনুষ্ঠানটি অনেকটা যজ্ঞানুষ্ঠানের মতই। সম্ভবত ঋগ্বেদের পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা এই সময়েই হয়েছিল।

২. এই যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা প্রচলিত হল। যজুর্বেদে, ব্রাহ্মণে এবং শ্রৌতসূত্রে বর্ণিত পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠানেই এই দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩. তৃতীয় অথবা শেষ পর্যায়ে ব্রাহ্মণভোজনকে একটি অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে আমরা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরিচয় পাই। ভারতবর্ষে পিতৃপূজার যতোরকম অনুষ্ঠান এবং উপাদানের নির্দেশ ক্রমে সংযোজিত হয়েছে তার সবকিছুর নিদর্শন পাওয়া যায় এই শ্রাদ্ধে। এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এমনকি একজনও ব্রাহ্মণ যদি না পাওয়া যায় তবে কুশতৃণদ্বারা গঠিত একটি ব্রাহ্মণ যুবার বিকল্প মূর্তি তৈরি করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে—এমন নির্দেশ রয়েছে।

রঘুনন্দ মৃতের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানগুলিকে তিনটি ক্রমিক ধারায় বিভক্ত করেছেন (১) পূর্বক্রিয়া (২) মধ্যমক্রিয়া (৩) উত্তরক্রিয়া। টীকাকার কাশীরাম এগুলিকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

দাহকার্য, পূরকপিণ্ডদান, অশৌচান্তে জলস্পর্শ—এগুলি পূর্বক্রিয়া।

অশৌচের পরদিন থেকে করণীয় প্রথম একোদ্দিষ্ট এবং সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত মাসিক একোদ্দিষ্টগুলি মধ্যমক্রিয়া।

সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠানের পর পিতৃর উদ্দেশ্যে করণীয় কাজগুলি উত্তরক্রিয়া।

পিতৃপূজার এই পর্যায়গুলি আলোচনা করলে রঘুনন্দনের অনুষ্ঠান বিভাগ যথেষ্ট দৃঢ়ভিত্তিক বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে বৃষোৎসর্গবিষয়ে রঘুনন্দনের অভিমতটি উল্লেখযোগ্য। রঘুনন্দন তাঁর 'শুদ্ধিতত্ত্বে' বৃষোৎসর্গকে একটি যাগ বলেই বর্ণনা করেছেন। পিতৃপূজায় বৃষের উৎসর্গানুষ্ঠানকে কেউ কেউ গৌণার্থে যাগ হিসাবে স্বীকার করলেও মুখ্যার্থে করেননি। তাঁদের মতে, বৃষোৎসর্গকে ত্যাগকর্ম হিসাবে গৌণার্থে যাগ বলে স্বীকার করা যেতে পারে মাত্র। এই অনুষ্ঠানে দেবতার উদ্দেশ্যে বৃষ উৎসর্গ করা হয় না। কাজেই এটি মুখ্যার্থে যাগ নয়।

রঘুনন্দনের মতে, আপাতদৃষ্টিতে বৃষোৎসর্গে দেবতা দৃষ্ট না হলেও মন্ত্রণাত্মক রূপে তাঁরা বর্তমান। মন্ত্র, দ্রব্য এবং অগ্নির সংযোগকেই যজ্ঞ বলা হয়। বৃষোৎসর্গে যজ্ঞের এই তিনটি অঙ্গ সংযুক্ত হয়েছে। সুতরাং বৃষোৎসর্গ মুখ্যার্থেই যাগ।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকা মিতাক্ষরার মতেও বৃষোৎসর্গ একটি যাগ। সাধারণত ইষ্টিযোগে

আভ্যুদয়িক অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু বৃষোৎসর্গ একটি ইষ্টিযাগ, তাই এতেও আভ্যুদয়িকের অনুষ্ঠান কর্তব্য।

উশনার মতে মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে বৃষোৎসর্গ অনুষ্ঠিত হলে তাতে বৃদ্ধির অনুষ্ঠান করতে হবে না। কিন্তু সপিণ্ডীকরণের পর অনুষ্ঠান হলে অবশ্যই আভ্যুদয়িকের অনুষ্ঠান করতে হবে। আভ্যুদয়িক ইষ্টিযাগেরই অঙ্গ। বৃষোৎসর্গেরও অঙ্গ হল আভ্যুদয়িক। সুতরাং বৃষোৎসর্গ ইষ্টি।

পারস্কর তাঁর গৃহ্যসূত্রে শূলগব এবং গোযজ্ঞের বর্ণনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে গোযজ্ঞের দ্বারা বৃষোৎসর্গও ব্যাখ্যাত হল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বৃষোৎসর্গও শূলগব এবং গোযজ্ঞেরই সমতুল্য একটি যাগ।

বৃষের অভাবে মৃত্তিকা নির্মিত বৃষ, পিণ্ড অথবা কুশও বৃষের প্রতীক হতে পারে। যদি এদের কোনটিই না পাওয়া যায় তাহলে যজমান হোমযাগের অনুষ্ঠান করবেন। বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠানে হোমই প্রধান অঙ্গ। সুতরাং বৃষোৎসর্গ যে একটি যাগ এবং বৈদিক অনুষ্ঠান এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং এ প্রসঙ্গে রঘুনন্দনের অভিমতটিও তাই খুবই যুক্তিপূর্ণ মনে হয়।

যদিও স্মার্ত এবং পৌরাণিক মতে প্রেতত্ব পরিহারের জন্যই বৃষোৎসর্গ বিহিত হয়েছে, কিন্তু কালান্তরে পশু ও শস্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান ছিল। পরবর্তীকালে, যাদের জন্য নব এবং নবমিশ্র শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয়নি তাদের প্রেতত্ব পরিহারে জন্য এই যাগ অনুষ্ঠিত হয়। আরও পরবর্তীকালে নব এবং নবমিশ্র শ্রাদ্ধের মতো সকল মৃতব্যক্তির প্রেতত্ব পরিহারের জন্যই এটিকে গ্রহণ করা হয়। যদি কেবলমাত্র বৃষোৎসর্গের সাহায্যেই প্রেতত্ব পরিহার সম্ভব হত তাহলে তো নব নবমিশ্র শ্রাদ্ধের কোনো দরকারই থাকত না। মনে হয়, বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান নব এবং নবমিশ্রশ্রাদ্ধে সহায়ক মাত্র। তাই সপিণ্ডীকরণের পর নব ও নবমিশ্র শ্রাদ্ধের দ্বারাই প্রেতত্ব ঘুচে গেলে বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়েছে।

পুরাণ পরবর্তী যুগে পিতৃপূজানুষ্ঠান শ্রাদ্ধরূপে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের মূলে একশ্রেণীর পুরোহিত সম্প্রদায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং বহু রূপান্তর সাধনও করেছিলেন। কালক্রমে এই অনুষ্ঠান একটি বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য হয়ে উঠতে পেরেছিল। শ্রাদ্ধের মূলসূত্রগুলি অবশ্য বৈদিকযুগেরই অন্তর্গত এবং ভাববিচারে শ্রাদ্ধকে বৈদিক ভাবধারারই বাহক বলতে হবে।

বেদের অস্তিত্বে, পরলোকে বা আত্মার অবিনশ্বরত্বে অবিশ্বাসী লোকায়ত দর্শনে আস্থাবান ব্যক্তিরা মৃতের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এই শ্রাদ্ধাদি বিষয়েও অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। সকল দেশেই মৃতের অর্চনা আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকারের উপরই নির্ভরশীল। আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকৃত না হলে মৃত পিতৃপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হতে পারে না। মৃত্যুর পর পিতৃপুরুষদের যদি কোন অস্তিত্বই না রইল তবে কার উদ্দেশ্যেই বা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান

হবে? এই লোকায়ত পন্থীদের মতে—'মৃতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণং। নির্বাণস্য প্রদীপস্যস্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েৎ শিখাম্।। তাঁরা বলেন ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুত? সুতরাং—'মৃতানাং প্রেতকার্যানি ন ত্বন্যদ্বিদ্যতে কচিৎ। নস্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।। এই সমস্ত পারলৌকিক কাজকর্ম তাই এঁদের মতে ব্রাহ্মণদের জীবনোপায় মাত্র। এছাড়া এর আর কোনো সার্থকতা নেই।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই নানা যুক্তি বলে এই মত খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। সে সমস্ত যুক্তিতর্কে না গিয়েও আমরা বলতে পারি শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্যের মূল হচ্ছে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা—শ্রাদ্ধে যতোমূলম্। মৃত্যুভয়, মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মৃতের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস—এ থেকেই পিতৃলোকের ধারণা সম্ভব হয়েছে। এই বিরাট পিতৃ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনপুরুষের উদ্দেশ্যে তিনটি পিণ্ডদান করতে হয়। পিতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রথম পিণ্ডটি সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীর প্রতীক, পিতামহর উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পিণ্ডটি অন্তরীক্ষ বা আকাশের প্রতীক এবং প্রপিতামহর উদ্দেশ্যে তৃতীয় পিণ্ডটি দ্যুলোকের প্রতীক। শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতার পিতা হলেন পৃথিবী, পিতামহ অন্তরীক্ষ এবং প্রপিতামহ দ্যুলোক। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের সঙ্গে, অগ্নি, বায়ু ও রবিমণ্ডলের সঙ্গে শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতার 'জন্য জনক' সম্পর্ক। এখানেই ছোট করে বলে রাখা ভালো, আমাদের শাস্ত্রানুসারে মানুষের ভোগভূমি সাতটি। এই সাতটি স্থান হল—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ এবং সত্যলোক। এই সত্যলোকেরই আর এক নাম ব্রহ্মলোক। বিষ্ণু পুরাণে এই লোকগুলির সীমারেখা। এইভাবে টানা হয়েছে—সর্বোচ্চ পর্বতশিখর পর্যন্ত পাদগম্য স্থান হল ভূর্লোক। ভূমি এবং সূর্যের মধ্যবর্তী গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে বিরাজিত লোকসকল হল ভুবর্লোক। এরই আর এক নাম হল অন্তরীক্ষ বা মরীচিলোক। কেউ কেউ একেই বলেন নরক। সূর্যমণ্ডলের ওপরে ধ্রুবনক্ষত্র পর্যন্ত স্বর্লোক। ধ্রুবের উপরে মহর্লোক, তার উপরে তপোর্লোক এবং তার উপর নানান্ স্তরে বিভক্ত সত্যলোক। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে বিবরণের সামান্য তারতম্য আছে। সেখানে বলা হয়েছে স্বর্লোক ধ্রুবেরও উপরে। যাই হোক, এই বিরাট বিশ্বের সঙ্গে এই পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অনুষ্ঠাতা এক পরম আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ—এটিই হল মূল ভাব।

বৈদিক ভাবধারায় যে উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার আসল উদ্দেশ্য পরিদৃশ্যমান বিরাট বাহ্যজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং ক্ষুদ্র আমিকে বিরাট আমিতে পরিণত করা। বৈদিক পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে স্মার্ত পৌরাণিক তর্পণাঞ্জলি পর্যন্ত সমস্ত পৈতৃক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যও তাই।

মনু বলেছেন—'পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্'। অর্থাৎ তর্পণই পিতৃযজ্ঞ। যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত হয়েছে, তর্পণের দ্বারাও সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। তর্পণানুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতা 'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তংজগৎ তৃপ্যতাম' এই বলে জলগণ্ডুষ দান করেন। এর দ্বারা পিতৃগণ

থেকে শুরু করে সমস্ত মনুষ্যজগতের সঙ্গে—বৃক্ষলতা থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্ম পর্যন্ত সমস্ত নিখিল বিশ্বের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করার ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে। আর এই সম্বন্ধ স্থাপনই হচ্ছে পিতৃ যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় দেবযজ্ঞাদিতে যে পঞ্চমহাযজ্ঞের উল্লেখ আছে পিতৃযজ্ঞ তারই একটি। এই পাঁচটি যজ্ঞেই গৃহস্থকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ব্যাপক অর্থে এই ত্যাগের নামই যাগ। দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে একখানা সমিৎ ফেলে দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে অন্ততঃ এক গণ্ডুষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এইভাবে পশুপক্ষীদের উদ্দেশ্যে সামান্য অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু ভোজ্য দিলেই মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, বেদাধ্যয়ন করলে অন্তত একটি ঋক, একটি যজুঃ বা একটি সাম অধ্যয়ন করলেই সম্পন্ন হয় ঋষিযজ্ঞ। এই সমস্ত পিতৃযজ্ঞাদি নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো দ্রব্যের বাহুল্য নেই, জটিলতাও কিছু নেই—এর অন্তর্নিহিত ভাবটিই প্রধান। সমস্ত বিশাল জগতের সঙ্গে ক্ষুদ্র মানুষের যে সম্পর্কসূত্র রয়েছে, সমস্ত জগৎ যে একযোগে তাকে স্থির প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, জগতে যাকিছু আছে সবই দেবতা, আমরা যা কিছু ত্যাগ করি এর উদ্দেশ্যে তাই যজ্ঞ—এই হচ্ছে আসল বক্তব্য। সুতরাং এই পিতৃপূজা বা শ্রাদ্ধের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলি এর আংশিক রূপ মাত্র, এই অনুষ্ঠানের ভাবকল্পনার দিকটি বুঝতে পারলে তবেই আমরা পিতৃপূজার প্রকৃত তাৎপর্য অনুভব করতে পারব।

ভাবতে ভালো লাগে যে মৃত্যুর পরেও এই বিশ্বসংসারের সঙ্গে আমার একটি সূক্ষ্মযোগ থেকে যাবে; হয়তো অন্য কোথাও অন্য কোনো সূক্ষ্মশরীরে আমি ভেসে বেড়াবো আর স্বজনেরা আমারই উদ্দেশ্যে, আমারই তৃপ্তিসাধনের জন্য কিছু কর্তব্য করবে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার সকল অস্তিত্ব একেবারে লোপ পেয়ে যাবে না, অন্তত কিছুকাল এই সংসারের সঙ্গে আমার একটি যোগসূত্র থেকে যাবে। এই চিন্তা সত্যিই কি সান্ত্বনা দেয় না?

ভারতবর্ষে যে সময়ে মুনিঋষিরা অমরতার স্বরূপ জানতে চেয়েছেন তখন থেকেই মৃত্যুচিন্তা বারবার তাঁদের ভাবিয়েছে। কেউ বলেন মানুষ মৃত্যুর পরেও থাকে, কেউ বলে থাকে না। মৃত্যুর পরেও যা থাকে তার নামই কি আত্মা? আর এই আত্মা কি সত্যই অমর?

বস্তুত অমরতা বলতে আমরা এমন কিছু বুঝি যা অপরিবর্তনীয়। অথচ স্থান, কাল ও কার্যকারণের নিয়মে আবদ্ধ এই পার্থিব দেহ তো অমর হতে পারে না, অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। বিশেষ একটি সময়ে এই দেহের জন্ম, বিশেষ স্থানের সীমার মধ্যে এর অবস্থান, তাই এর বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। তাহলে অবিনাশী বা অপরিবর্তনীয় যদি কিছু থাকে তবে তা কি এই দেহের অতীত কোনো অস্তিত্ব? বাস্তবিক পক্ষে এই সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে গেলে যুক্তিতর্ক থেকে বেশি প্রয়োজন যে বস্তুটির সেটি হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা মৃত্যুর গহন অন্ধকার থেকে আমাদের নিয়ে যেতে পারে পরলোকের

জ্যোতির্ময়ধামে।

পরলোকের জ্যোতির্ময়ধামে যদি বা নাই-ই যেতে পারে, ইহজগতেই মৃত্যু রূপান্তরিত হয় মৃত্যুত্তীর্ণ শিল্পে। পৌরাণিক নরকের বীভৎস বর্ণনার কথা তো আগেই বলেছি। কিন্তু বলা হয়নি যা তা হল, এই পুরাণ-কথা নরক বর্ণনার অন্যতম ফলশ্রুতিই বাংলার যমপট। বিষ্ণুপুরাণের নরক-বর্ণনার কথা এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে। মনে পড়ে যায় গীতার ২৮টি নরকের কথা, কিম্বা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ৬৮টি নরককুণ্ডের কথা। বৈদিক সাহিত্যে নরকের কথা না থাকলেও মহাভারতের যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে নরকদর্শন করানো হয়েছে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত যে, পটুয়ারা বেদ-নির্ভর সাহিত্য অপেক্ষা বরাবরই পুরাণ-কথায় বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছে। আমাদের অনুমান, এর পিছনে বেদোত্তর ভারতীয়দের অতিরিক্ত সংরক্ষণশীল মনোভাবই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। স্ত্রীলোকদের তো বটেই, যে কোনো অব্রাহ্মণেরই বেদপাঠ নিষিদ্ধ ছিল। অথচ ধর্ম-প্রধান সমাজজীবনের অনেক কিছুই সাধারণ মানুষকে পালন করতে হত বা তাদের পালন করানো হত। অগত্যা বেদ-ব্যতিরেকে পুরাণের মাধ্যমেই এই কাজ করা হত। পুরাণ-কথায় বিবিধ নরকের যে বীভৎস বর্ণনা আছে নিরক্ষর পটুয়াদের উপর তা মন্ত্রবৎ কাজ করেছিল। যেহেতু লোকরঞ্জন এবং লোকশিক্ষা দান তাদের নেশা ও পেশা ছিল, স্বভাবতই তাই নরকের চিত্র অঙ্কন করে তারা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চাইত ঃ পাপ কোরো না, এই এই ধরণের শাস্তি পাবে।...

নরক-বর্ণনার এই ভয়াবহতা যে কেবল আমাদের ধর্মেই আছে, তা কিন্তু নয়। খ্রিস্টীয় 'হেল' কিম্বা 'পারগেটারি'-র যে চিত্র আছে তা কী কম ভয়ঙ্কর? বৌদ্ধদের ধারণায় পাপের প্রকারভেদে ১৩৬টি নরক আছে। জৈন সাহিত্যে নরক বর্ণিত হয়েছে মোট ৭ রকমের। ঐশ্লামিক সাহিত্যের জাহান্নামের কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে আসে। সারগরপারে হোমার-দান্তে-মিল্টন থেকে মিকেল আঞ্জেলোর চিত্রে পর্যন্ত এই ভয়াবহ নরক জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

দেশি পটুয়ারা বোধ হয় সর্বধর্মের সারাংশ নিয়ে কিংবা সমস্ত ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যমপটে এক বিচিত্র রসসৃষ্টি করেছেন। সরলবিশ্বাসে তাঁরা বলেছেন : দক্ষিণে, আরো দক্ষিণে যাও। সেখানে নামো, অনেক অনেক তলায় মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সূর্যপুত্র ধর্মরাজ যম রয়েছেন। উনি ইহলোকের কৃতকর্ম বিচার করে যাকে যেমন দণ্ড দেওয়া উচিত মনে করেন তাকে সেই দণ্ড দেন। ওই যে দণ্ডভোগের জন্য অপেক্ষা করছেন যাঁরা তাঁরা হলেন প্রেত. এই মহিষটি হল ধর্মরাজ যমের বাহন, আর এই জলধারার নাম বৈতরণী।

বাংলার আদিবাসীদের মধ্যে দুয়ারী পাটকার, যাদু পাটকার প্রভৃতি নামে যে চিত্রকর সম্প্রদায়কে দেখা যায় মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়ে তাদের আচার-আচরণও এই সূত্রে স্মরণীয়। এই সম্প্রদায়-সমূহের জীবিকা যেহেতু পটচিত্র-অঙ্কন তাই নানান্ কায়দায় তারা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের কাছে অর্থ সংগ্রহ করে। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলার পাথ্‌রা অঞ্চলের সাঁওতাল অধিবাসী জনৈক কানাই মুর্মুর অভিজ্ঞতা বিবৃত হল : *আমার পিতার মৃতদেহ দাহের দুইদিন*

পরে অবসন্ন দেহ ও মনে গৃহে শুইয়া আছি। সহসা এমন সময় শুনিলাম গৃহে এক পাটকার আসিয়াছেন। তিনি একটি কাগজে আমার মৃত পিতার এক চিত্র অঙ্কিত করিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু উহাতে চক্ষুদ্বয় অঙ্কিত হয় নাই। ঐ চক্ষুদ্বয়ের অভাবে পিতা নাকি প্রচণ্ড কষ্টভোগ করিতেছেন। ইহাতে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। সকলে পাটকারকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন উপায়? পাটকার বলিলেন একটি তৈলপূর্ণ নূতন ধাতুপাত্র দান করিলে তিনি চক্ষুদ্বয় অঙ্কিত করিবেন এবং তাহা হইলেই স্বর্গত পিতা সকলই দেখিতে পাইবেন। আমি পাটকারকে ঐ ধাতুপাত্র দেওয়ার পর তিনি যথাকর্তব্য করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে অস্থিভস্ম লইয়া আমরা দামোদরে তাহা নিক্ষেপ করিবার সময় পাটকারের আঁকা সেই যাদু পটটিও বিসর্জন দিয়াছিলাম।...

মৃতব্যক্তির অস্থিভস্ম হয়তো বিসর্জন দেওয়া যায়, এমনকি তার পটচিত্রও। কিন্তু হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ মায়া-মমতা দিয়ে তিলে তিলে গড়া আমাদের এই প্রিয় জীবন ছেড়ে যাওয়া কি সহজ কথা? অথচ যখন ভাবি এই জীবনই শেষ নয়—আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অন্য এক মহৎ জীবন, অন্য এক দিব্য লোক, যেখানে আমাদেরই প্রয়াত পিতা পিতামহ প্রপিতামহরা আমাদের অপেক্ষায় উন্মুখ, তখন সহসা আর নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় না। নচিকেতার মত আমরাও তখন মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার রহস্য জেনে ফেলতে পারি। সামান্য মানুষ হয়েও প্রাচীন ঋষিদের মত তখন বলে উঠতে পারি ঃ মা ম্রিয়স্ব, মা জহি, শক্য চেৎ মৃত্যুমতলোপয়—মোরো না, মেরো না, পারতো মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর। পিতৃপূজার মাহাত্ম্য এখানেই।

প্রাসঙ্গিকী

১. *বেদ* : মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুয়ের নাম বেদ। মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনাম ধেয়ম্ (আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র ২৪।১।৩১) মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চ বেদঃ (শাবরভাষ্য ২।১।৩৩)।

২. উপনিষদ্ : শব্দটির ব্যুৎপত্তি উপ নি—সদ্ (বসা) থেকে। নিহিতার্থ দাঁড়ায়, কাছে নিবিড় হয়ে বসা। এর থেকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই মানে করেছেন, অরণ্যে আচার্যের কাছে বসে একান্তভাবে যে বিদ্যা গ্রহণ করা হয় তার নাম উপনিষদ্। Oldenberg অবশ্য উপনিষদ্ বলতে বুঝেছেন উপাসনা। Bodus প্রথম সংজ্ঞাটিকেই গ্রহণ করে এইটুকু যোগ করেছেন : বসাটা আচার্যের কাছে নয়, যজ্ঞাগ্নির কাছে। Hauer জেনেছেন, তপস্যা এবং ধ্যানলভ্য রহস্য জ্ঞানই উপনিষদ্। Deussen উপনিষদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেছেন রহস্যবিদ্যা। আমাদের দেশের শঙ্করাচার্য ব্যুৎপত্তির দিকে না তাকিয়ে এর সংজ্ঞা করেছেন : যা বিদ্যা নাশ করে।

৩. পুরাণ : পুরাণের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ আছে। সেগুলি এই ঃ সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশ মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।

৪. যম : বিবস্বৎ-সন্তান। ইন্দ্র ও বরুণের মত এঁরও আগে একটি স্বর্গ ছিল। কিন্তু

পরে কিভাবে কেমন করে যে তিনি নরকপতি হলেন সে ইতিহাস বিশেষ কৌতূহলের বিষয়। 'যম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংহরণ ও ব্যাপ্তি দুই-ই।

৫. নচিকেতা : নচিকেতার বাবার নাম বাজশ্রবস্। তাবৎ বৈদিক-সাহিত্যে নচিকেতা একটি জনপ্রিয় চরিত্র। কঠোপনিষদ্ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের নচিকেতা উপাখ্যানে যম ও নচিকেতার প্রশ্নোত্তরমালা ভারতীয় মৃত্যু চিন্তার এক একটি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড। ঋক্‌সংহিতায় একটি সূক্তে (১০।১৩৫) এই নচিকেতা উপাখ্যানের বীজ লুকিয়ে আছে। নচিকেতা কথাটির মানে : যে জানেনি অথচ যার মধ্যে বিদ্যার অভীপ্সা আছে। কথাটির আর একটি ব্যঞ্জনা এরকম হতে পারে : জানতে গিয়ে যে জানার বাইরে চলে গেল।

৬. পিতৃগণ : পিতৃলোকবাসী মুনিগণ যাঁরা মানুষের আদিপুরুষ (অগ্নিষ্বাত্ত ইঃ সপ্ত)।

৭. পিতৃযাণ : পিতৃগণ যে-পথে চন্দ্রলোকে যান।

৮. শ্রাদ্ধ : মৃতব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাভরে কোন কিছু দান করা।

৯. একোদ্দিষ্ট : এক প্রকার শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধে একাধিক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা যায়।

১১. পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ : পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের একটি বৈদিক যজ্ঞ। বৈদিক ধারণায় কোনো ব্যক্তি গত হলে তাঁর মৃতদেহ সংকার করা হলেই প্রয়াত আত্মা 'পিতৃ'ত্ব প্রাপ্ত হয়। 'প্রেত' কিংবা 'অতিবাহিক শরীর'-এর ধারণা বৈদিক যুগে অবিদিত ছিল। বেদোত্তর যুগের কৃত্যানুসারে কোন ব্যক্তি মারা গেলে মৃত্যুর এক বৎসরে প্রতি মাসে তাঁর একোদ্দিষ্ট এবং সপিণ্ডীকরণ সমাপ্ত হলে মৃতব্যক্তির আত্মা 'প্রেত'-দশা থেকে মুক্তি পায় এবং 'পিতৃ'-ত্ব লাভ করে।

১২. প্রেত্য : উপনিষদের একটি বহুব্যবহৃত শব্দ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল; এগিয়ে গিয়ে। প্রাণের ধর্মই হল অগ্রগতি—যেমন সূর্যের উদয়ন। আপাতদৃষ্টিতে এই অগ্রগতি ব্যাহত হয় মৃত্যুতে। মধ্যাহ্নের সূর্য ক্রমে অস্তাচলে ঢলে পড়ে। অবশেষে ডুবে যায়। কিন্তু বিদ্বানের অন্তর্জ্যোতি মৃত্যুতেও অনির্বাণ থাকতে পারে। তাহলে অবিদ্বানের ক্ষেত্রে প্রেত্যের তাৎপর্য দাঁড়াল 'মরে গিয়ে' আর বিদ্বানের ক্ষেত্রে 'লোকান্তরে উত্তীর্ণ হয়ে'। চেতনার এই উত্তরণকেই ঋক্‌সংহিতায় বলা হয়েছে 'প্রেতি'।

১৩. পুষ্কর : অধুনা যাকে আজমীর বলা হয় তার পোখর নামক স্থান। বিষ্ণুর মতে তিনটি পুষ্কর আছে। যথা—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।

১৪. পিণ্ড : মৃতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খাদ্য।

১৫. মৈথুন : আটরকমের। যথা—স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুপ্ত-ভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি।

১৬. পঞ্চগব্য : দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময় এবং গোমূত্রের সংমিশ্রণ।

১৭. উল্মুক : জ্বলন্ত অঙ্গার।

তথ্যসূত্র

১. Origin and Development of the Rituals of Ancestor Worship in India. Dr. Dakshinaranjan Shastri

২. কর্মিগণের গম্য চন্দ্রলোক (উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩৭৬) স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

৩. বেদ-মীমাংসা (১ম খণ্ড)—অনির্বাণ

৪. স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



যমপট—সভাসীন যমরাজ ও অনুচরবৃন্দ।

❑ বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'অন্বিষ্ট' পত্রিকার (১৭ সংখ্যা, ১৯৭৫) প্রয়াণ সংখ্যা থেকে অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত। সৌজন্যে : কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র।

স্মৃতি রক্ষার প্রাচীন এক প্রথা ঃ সন্ধান ও সংরক্ষণ

তারাপদ সাঁতরা

বঙ্গ-সংস্কৃতি ভাণ্ডারের বহুবিধ ঐশ্বর্য নিয়ে অদ্যাবধি বিচিত্র সব আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ সমাজজীবনের এমন অনেক অনালোচিত আচার-আচরণ ও প্রথাকে কেন্দ্র করে একদা যেসব লৌকিক ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিল তার সবকিছু বিবরণ আজও সংস্কৃতি-অভিমানীদের দৃষ্টির নাগালে পৌছয় নি। এর কারণ কিন্তু খুবই স্পষ্ট। হয় সেসব তুচ্ছ বিষয়গুলি নিয়ে ইংরেজ সাহেবরা ইতিপূর্বে তেমন কিছু বিবরণ রেখে যাননি, নয়তো বা দেশের ছোট-বড় কোন সংগ্রহশালাতে এই সব লৌকিক ধ্যানধারণা-প্রসূত সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগৃহীত হ'য়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণের সহায়ক হ'য়ে উঠতে পারে নি বলেই এত অনীহা। এই অবস্থায় আঞ্চলিক ও গ্রামীণ সংগ্রহশালাগুলির শুধুমাত্র মূল্যবান সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংগ্রহের উপর দৃষ্টি দেওয়া ছাড়াও, আমাদের লৌকিক ধ্যান-ধারণাসঞ্জাত এই সব অবহেলিত উপকরণগুলিরও সন্ধান ও সংগ্রহের উপর জরুরীভাবে দৃষ্টি দেওয়া একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। 'জরুরী' বলার কারণ এজন্যই যে, গ্রামাঞ্চলের দ্রুত রূপান্তরের জন্য আমাদের গ্রাম্য-সমাজের যেভাবে আধুনিকীকরণ পর্ব চলেছে, তার ফলে ভবিষ্যতে সেই গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হ'য়ে উঠবে।

বঙ্গ-সংস্কৃতির যে অবহেলিত উপকরণটি নিয়ে এই প্রসঙ্গের অবতারণা সেটির মূল বিষয় হল, মৃতের প্রতি নিবেদিত স্মারকস্তম্ভের এক প্রাচীন প্রথা। এখন উদাহরণ দিয়েই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা যেতে পারে। সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার পুরাকীর্তি সম্পর্কিত এক গ্রন্থ রচনার কাজে জেলার বিভিন্ন গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সময় অনেকগুলি ঝামা-পাথরের মুর্তি অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় নজরে আসে। মেদিনীপুর সদর থানার এলাকাধীন জোয়ারহাটি গ্রামে পুরাতন কটক রোডের ধারে এমন একটি মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়াতে হয়। মূর্তিটি আয়তাকার ঝামা-পাথরের এবং সেটির গায়ে এবড়োখেবড়োভাবে খোদিত হয়েছে তলোয়ার হাতে এক যোদ্ধার অশ্বারূঢ় মূর্তি। এছাড়া এখানে আরও কতকগুলি এই ধরণের মূর্তি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে দেখা যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা এগুলিকে জোয়ারবুড়ী ঠাকুর বলে পুজো করে থাকেন এবং এই ঠাকুরের নামানুসারে নাকি সে গ্রামের নামকরণও হয়েছে জোয়ারহাটি। কাছাকাছি হরিশপুর গ্রামের কাছেও এই ধরণের বেশ কিছু মূর্তি দেখা যায় যা স্থানীয় ভাবে চাঁইবুড়ি ঠাকুর নামে পরিচিত। খড়্গাপুর থানার বেনাপুরের নিকটবর্তী কাশীজোড়া ও শ্যামলপুর গ্রামের কাছে রাস্তার ধারে ও

এই থানা এলাকার সুলতানপুর গ্রামের কুমরেশ্বর শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে ও নারায়ণগড় থানার চকমকরামপুর, হিরাপাড়ী ও পাকুড়সেনী গ্রামেও এই রকম ঢাল-তলোয়ারধারী অশ্বারূঢ় যোদ্ধার পাথর খোদাই মূর্তিও বেশ কিছু দেখা যায়।

কিন্তু এই মূর্তিগুলি যে কিসের মূর্তি সে সম্পর্কে কেউই কোনো আলোকপাত করতে পারেন নি। মূর্তিগুলি ঝামাপাথরে তৈরী; সুতরাং সেগুলির উপর খোদাই ভাস্কর্য যে কোনক্রমেই মনোরম হতে পারে না সেকথা অনস্বীকার্য। তাই এই এলোমেলো তক্ষণের কাজ দেখে আমাদের দেশের নান্দনিক শিল্প সংগ্রাহকরা এগুলিতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। অথচ মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পাথর-খোদাই যোদ্ধাদের মূর্তি কেন যে পথে-প্রান্তরে অর্ধপ্রোথিত করে রাখা হয়েছিল তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে জানা নেই। অন্যদিকে, যদিও বা এই ধরণের কোন মূর্তি সম্পর্কিত বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলি এতই বিভ্রান্তিকর যে তা কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না। বিলেতী সাহেবদের লেখা ইতিহাস ও গেজেটিয়ারে এই জেলার নয়াগ্রাম থানার খেলাড়গড়ে রক্ষিত এমন একটি ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত পুরুষ ও নারীর অশ্বারূঢ় মূর্তি সম্পর্কে এক বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার, এ-মূর্তি প্রতিষ্ঠার সমাজতত্ত্ব নিয়ে গভীরে প্রবেশ করার বদলে স্থানীয় ইতিহাস-রচয়িতারা (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বসু ঃ মেদিনীপুরের ইতিহাস) এটিকে পারসীক ও শক প্রতিমূর্তির অথবা ভারতীয় দেবতা কামদেব ও রতিমূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন, বা একান্তই অবাস্তব চিন্তাভাবনা।

যাই হোক, পূর্ব-বর্ণিত ঐ ক'টি মূর্তিই নয়, এই জেলার নানাস্থানে অনুরূপ আকৃতির ভিন্ন ভিন্ন আরও অনেক মূর্তি নজরে পড়েছে। মেদিনীপুর শহরের আবাসগড়ে যাবার পথে প্রায় ছ'ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এমন একটি ঝামাপাথরে খোদাই নারীমূর্তি অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় দেখা যায়। এই বিশালাকার মূর্তিটি সম্পর্কে স্থানীয় কেউ কোনো আলোকপাত না করলেও কাছাকাছি বাড়ুয়া গ্রামে খোঁজ পাওয়া গেল যেখানে নাকি এমন বহু মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আবাসগড় থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার উত্তরে বাড়ুয়া গ্রামের সাতনারাণীতলা নামে কথিত এক গাছতলায় দক্ষিণমুখী করে বসানো এমন ন'টি মূর্তি নজরে পড়ে। স্থানীয়ভাবে এ মূর্তিগুলিকে বলা হয় সাতনারী বা সাতভগিনী বা সাতবোনী। আবার কেউ কেউ বলেন সাতরাণী, যা থেকে বেশ বোঝা যায়, আধুনিক ধর্মকর্মের প্রলেপ নিয়ে এরাই সাতরাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এখানে নারী বা বোন অথবা রাণী যাই হোক না কেন, সেগুলি সংখ্যায় সাতের বদলে ন'টি। এমনও হতে পারে, প্রথমে সাতটি মূর্তি স্থাপনের পরই নামকরণ হয়ে গেছে সাতবোনী বা সাতরাণী। কিন্তু পরে আরও দু'টি যুক্ত হলেও নামের হেরফের ঘটে নি। এখানকার ঝামাপাথরের উপর খোদাই

মূর্তিগুলিতে দেখা যায়, তীরন্দাজ, ছত্রধারী, ঢাল-তালোয়ারধারী প্রভৃতির প্রতিকৃতি। আয়তাকার পাথরের উপর উৎকীর্ণ এ মূর্তিগুলির উচ্চতা কোনোটি দু'ফুট বা চারফুট, আবার কোনো কোনোটি পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচফুট। প্রতি বছর মাঘ মাসের চার তারিখে গ্রামবাসীরা এখানেই উনুন খুলে মাটির হাঁড়িতে দুধ, চাল আর গুড় দিয়ে পরমান্ন তৈরি করে এইসব মূর্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। এই উপলক্ষে এখানে একটি মেলাও বসে থাকে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য যে তাঁরা বহুদিন ধরেই এইসব মূর্তির উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করে আসছেন, কিন্তু এগুলি যে কোন্ দেবতা বা কি উদ্দেশ্যে এখানে এগুলিকে বসানো হয়েছে তা তাঁদের জানা নেই।

তবে, মূর্তিগুলের সনাক্তকরণ সম্ভব না হলেও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম প্রান্ত জুড়েই এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার এলাকা চিহ্নিত করা যায় এবং এই সীমানা ছাড়িয়ে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বিহারের সিংভূম জেলা পর্যন্ত এই এলাকাকে যে বিস্তৃত করা যায় তার প্রমাণ হ'ল, ঐ সব জেলার নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত এই প্রকারের মূর্তির সমাবেশ। দেখা যায়, এহেন মূর্তি স্থাপনের প্রথা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা বিহারেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব মধ্যপ্রদেশ থেকে সৌরাষ্ট পর্যন্তও বিস্তৃত হয়েছে।

সম্প্রতি জানা যায়, মধ্যপ্রদেশের দুরগ্ জেলার নারীটোলা গ্রামেও এই প্রকৃতির প্রায় শ'দেড়েক মূর্তি এক জঙ্গলের মধ্যে উঁচু ঢিবিতে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় রয়েছে এবং ঐ মূর্তিগুলির বর্ণনার সঙ্গে পূর্বোক্ত বাড়ুয়া গ্রামের মূর্তিগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্যও আছে। এখানকার অধিকাংশ মূর্তিগুলিও ঢাল-তালোয়াধারী অশ্বারূঢ় সৈনিক এবং কতগুলি নারীমূর্তিও রয়েছে যাদের দু'টি হাত উপরের দিকে প্রসারিত। নারীটোলা গ্রামটির আশেপাশে গোন্ড ও হলবা প্রভৃতি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বসবাস, যাঁরা বিশেষভাবে এই মূর্তিগুলিকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন এবং তাঁদের ধারণায় কোনো এক অতীতকালে একদল যোদ্ধা স্থানীয় কোনো এক রাজার রাজ্য আক্রমণে এসে অতিপ্রাকৃত শক্তিবলে পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যান। সেজন্য বৎসরের এক নির্দিষ্টদিনে বাৎসরিক উৎসবে এইসব মূর্তির কাছে জনসাধারণ নারকেল ও মুরগী মাংস নিবেদন করে থাকে। (দ্রঃ Monthly Bulletin of the Asiatic Society : September, 1971)

অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে মানুষ বা যোদ্ধা যে পাথরের স্তম্ভে পরিণত হয় নারীটোলার এ উদাহরণের মত আমাদের পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া জেলার ছাতনাতেও তেমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। ছাতনার চার-পাঁচফুট উচ্চতাবিশিষ্ট অনুরূপ ধরণের শিলাস্তম্ভ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেখানেও এইসব মূর্তি নিয়ে যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তার সারমর্ম হল, কোনো এক সময়ে শত্রুপক্ষ সামন্তভূমের রাজধানী ছাতনা আক্রমণ করায় রাজার কুলদেবী বাসুলী যে মায়াসেনা সৃষ্টি করে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেছিলেন তারাই প্রভাতের আলোকে পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায় (দ্রঃ

বিনয় ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি)। সুতরাং শিলাস্তম্ভগুলি যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, এগুলিকে ঘিরে বহু কাহিনি ও কিংবদন্তি রচিত হয়েছে, তা তথ্য নির্ভরতার অভাবে যথেষ্ট কল্পনাপক্ষ বিস্তার করেছে।

মধ্যপ্রদেশের মত সৌরাষ্ট্রের জুনাগড় জেলার রটাডি গ্রামেও এই ধরনের মূর্তি স্থাপনের বেশ কিছু উদাহরণ পাওয়া গেছে। এখানে শুধু মূর্তির সমাবেশই নয়, এখনও পর্যন্ত এই প্রকৃতির মূর্তি নিবেদন করার প্রথাও সেখানে প্রচলিত রয়েছে, যার আলোকে আমরা পশ্চিমবাংলার এইসব পাথরের ফলক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পারি। সৌরাষ্ট্রের এই রটাডি গ্রামেও দেখা যায়, অপঘাত মৃত্যুজনিত কারণে মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় পাথরের মূর্তি নিবেদন করা হয়। সেজন্য যুদ্ধে মারা যাওয়ার কারণে, মৃতের উদ্দেশ্যে অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্তি বসানো হয়েছে। এছাড়া কোন দুর্ঘটনায়, সাপের কামড়ে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে, সতীরূপে সহমরণে বা আত্মহত্যা করে মারা গেলেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পাথর খোদাই 'খাম্ব' বসানোর রীতি আজও সেখানে প্রচলিত রয়েছে। 'খাম্ব' বা বাংলায় 'খাম্বা' কথাটির অর্থই হল স্তম্ভ যা এখানে স্মারক-স্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এইসব মূর্তির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর দেওয়ালীর সময় নারকেল এবং ভাতের ভোগও নিবেদন করেন গ্রামবাসীরা। যে স্মারকস্তম্ভ প্রস্তুত করা হয়েছে সেটিতে রয়েছে খোদাই করা হাতের চিহ্ন। (দ্রঃ Eberhard Fischer & Haku Shah : Rural Craftsmen And Their Work, pp. 39-45)

সুতরাং এসব স্মৃতিস্তম্ভ প্রোথিত করার উদাহরণ দেখে আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, স্মারকস্তম্ভ নিবেদন করার এ প্রথা যথেষ্ট সুপ্রাচীন। সিংভূম জেলায় কোলদের সমাধিতেও এমন সাদামাঠা পাথর পুঁতে দেওয়ার রীতি আজও প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া ভারতের অন্যান্য জাতি-উপজাতির মধ্যেও, বিশেষ করে নীলগিরি পাহাড়ের আদিবাসীরা এইসব স্মৃতিস্তম্ভকে বলে থাকেন 'বীরকল্লু', অর্থাৎ কল্লু কথার অর্থ পাথর হলে, তা হয় বীরের পাথর বা বীরস্তম্ভ। পশ্চিমবাংলার হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চলে এইসব স্মৃতিস্তম্ভকে বলা হয় 'বীরকাঁড়' (দ্রঃ বিনয় ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি)।

স্মৃতিস্তম্ভ বা বীরস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার পিছনে যে সমাজতত্ত্ব আত্মগোপন করে আছে, সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা গেলেও, পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এখনও বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান আবশ্যক। তবে সৌরাষ্ট্রে সতীর সহমরণে মৃত্যুর কারণে সেখানে পাথরফলকে হাত খোদাই করে দেওয়ার রীতি আবহমানকাল ধরে প্রচলিত এবং সেই প্রথাটির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সতীর সহমরণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্মারকস্তম্ভেরও যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেও সহমরণে মৃতাদের স্মৃতিরক্ষায় একদা যে ফলক ব্যবহারের রীতি ছিল তাতেও পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে। কয়েক

বৎসর আগে হাওড়া জেলার বালী থানার এলাকাধীন বালীর ঘোষপাড়ায় একটি বেশ বড়ো আকারের পোড়ামাটির ফলক মাটির ভেতর আবিষ্কৃত হয়। সেটির একপিঠে লেখা আছে ঃ

"ব্রজনাথ
বিমলা
সতীদাহ
১২০"।

এবং অন্য পিঠে দু'টি হাতের ছাপের নক্সার সঙ্গে "শ্রী ম সু ঘো" ও "সন ১২৮৫" এই কথাগুলি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বেশ বোঝা যায়, আঠার-শতকের শেষদিকে একসময় সহমরণ অনুষ্ঠানের স্থানে এহেন সতীদাহের স্মারকফলক প্রতিষ্ঠা করার রীতি প্রচলিত ছিল।

সুতরাং স্মৃতিরক্ষার এই প্রাচীন প্রথাটি কিন্তু একস্থানেই বা একসময়েই থেমে থাকেনি এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তারই এক রকমফের দেখা যাচ্ছে। এছাড়া ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে এবং সভ্যতার আধুনিকীকরণের পাল্লায় পড়ে অনেকক্ষেত্রে এমনই পরিবর্তন হয়েছে যে এর আসল রূপটি চেনা বড় দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সেজন্যই দেখা যায় একদা যেখানে সতীর সহমরণের মত অপঘাত মৃত্যুর হাতের ছাপ খোদাই পাথরের স্তম্ভ বা ফলক নিবেদনের প্রথা প্রচলিত ছিল, সেখানে পরবর্তীকালে বিশেষ করে আমাদের গ্রাম-বাংলায়, মৃতের স্মৃতিরক্ষায় ছোটোখাটো মন্দির নির্মাণের রীতি অনুসৃত হয়েছে। এরই সূত্র ধরে দেখা যায়, মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানায় হরিনারায়ণপুর গ্রামে আগুনখাগীর মাড়ো নামে সতীর সহমরণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এমন একটি মন্দির নির্মাণ করে তাতে লিপিফলকও নিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা থেকে আমরা স্মৃতিরক্ষার সেই প্রাচীন প্রথার ধারাটিকে অনুসরণ করতে পারি।

সুতরাং কেবল পাথরের স্তম্ভের বদলে এই স্মৃতিমন্দির নির্মাণটি যদিও উপরতলার দান, কিন্তু স্মৃতিরক্ষার এই প্রথাটি বহুকালের এক প্রথা, যা মানবসংস্কৃতির অনেক নীচুতলার দান। তাই মৃতের উদ্দেশ্যে পাথরখোদাই স্তম্ভ নিবেদন করার যে আবহমানকালের প্রথা তা ভারতের প্রায় সর্বত্রই এক খাতে বয়ে এসেছে এবং সে হিসেবে মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে রক্ষিত এইসব পাথরের মূর্তিগুলিও সেই প্রাচীন প্রথারই এক দৃষ্টান্ত।

তবে এই পাথুরে স্মারকস্তম্ভ সংস্কৃতির ধারা যে আবার অন্য খাতেও প্রবাহিত হয়েছে তার উদাহরণ প্রসঙ্গত তুলে ধরা না হলে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। এ জেলার কেশিয়াড়ী থানার কিয়ারচাঁদ নামক এক প্রান্তরে এমন বহু পাথরের স্তম্ভ দেখা যায় এবং একসময়ে নাকি এমন পাঁচ-ছশো পাথরের স্তম্ভ ছিল। ফলে এগুলি সম্পর্কেও কল্পনানির্ভর বহু কিংবদন্তি গজিয়ে উঠেছে। যোগেশচন্দ্র বসু তাঁর লেখা 'মেদিনীপুরের

ইতিহাস' গ্রন্থে এ সম্পর্কে দু'টি অনুমাননির্ভর ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে, হয়ত বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম নিবাসীদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের সমাধিস্তম্ভ, অথবা আঠার-শতকের জহর সিংহ নামে কোন স্থানীয় ভূস্বামী কর্তৃক এই ধরনের হাজারখানেক স্তম্ভ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহপূর্বক শত্রুপক্ষের বিভ্রম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আসলে এখানকার এ স্তম্ভগুলি কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত স্তম্ভগুলির মত আয়তাকার নয় বা এর গায়ে তেমন কোন মূর্তিও খোদাই করা নেই। মূলতঃ এটি দেখতে ওড়িশা রীতি প্রভাবিত শিখর-দেউলের আকৃতিসদৃশ এক ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং বিশেষভাবে সেগুলিতে দেউল-মন্দিরের আমলক অংশটির ভাস্কর্যর পরিস্ফুটিত। একসময়ে কোন মনস্কামনা পূরণের জন্য সেই দেবতার মন্দিরচত্বরে এই প্রকৃতির ক্ষুদ্রাকার মন্দির নিবেদন করার রীতি প্রচলিত ছিল, যে প্রথা আজও ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। জৈনধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও একদা এইরকমের সুদৃশ্য খোদাই করা আমলকযুক্ত ক্ষুদ্রাকার নিবেদন-মন্দিরের অবস্থাপন। সুদূর পূর্বভারতের নাগাল্যাণ্ডের ডিমাপুরে একদা কাছারী রাজদের রাজত্বকালেও (১৩-১৬ শতক) এমন অনেক পাথর খোদাই নিবেদন-মন্দিরের অস্তিত্ব দেখা যায়, যা আকৃতিতে দাবার ঘুঁটির মত। উদ্দেশ্য যে একই ধরনের মানত নিবেদনের প্রথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এছাড়া পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থানা এলাকার টুইসামা গ্রামের এক মন্দিরচত্বরে এই প্রকার বহু ছোট ছোট দেউলাকৃতি স্তম্ভও যে এই মানত উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হয়েছিল তাতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু আলোচ্য কিয়ারচাঁদের কাছে বর্তমানে কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব না থাকলেও একসময়ে যে এখানে এক বিরাট মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল সেটির পাথরের আমলকসহ ভগ্নাবশেষ এখানে লক্ষ্য করা যায়।

মানত হিসাবে ক্ষুদ্রাকার দেউল-মন্দির নিবেদন করার প্রথা কিয়ারচাঁদ ছাড়াও এ জেলার অন্যত্রও যে প্রচলিত ছিল তার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। সম্প্রতি অনুসন্ধানকালে ডেবরা থানার ডিঙ্গল গ্রামের নরসিংহ শিবমন্দির, পিঙ্গলা থানার নয়া গ্রামের শীতলা মন্দির এবং নারায়ণগড় থানার গোবিন্দপুরের শিবমন্দিরেও অনুরূপ ক্ষুদ্রাকার ঝামাপাথরের নিবেদন মন্দিরও দেখা গেছে, যা কোনোসময় হয়ত মানত হিসেবেই প্রদত্ত হয়েছিল। এছাড়া পূর্বোক্ত বাড়ুয়া গ্রামের নিকটবর্তী কলাইচণ্ডীর মাঠেও এই প্রকারের বেশকিছু স্তম্ভের অবস্থিতি এই মানত প্রথার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে এই প্রথারই আর একটি মার্জিত সংস্করণ আমাদের এই পশ্চিমবাংলাতেই দেখা যায়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর, যেখানে এই ধরণের অসংখ্য ছোট বড় মন্দির নির্মাণ করে দেওয়ার রীতি একদা প্রচলিত ছিল।

সুতরাং আলোচিত এইসব তথ্য থেকে আমাদের কাছে যে তিনটি প্রাচীন প্রথাগত রীতির পরিচয় উদঘাটিত হয়, তার মধ্যে প্রথমটি হল, আদিবাসীদের মৃতদেহ সমাধিস্ত

করার পর পাথরের সাধারণ স্তম্ভ প্রোথিত করা, যা প্রত্নতত্ত্বের কথায় বলা যেতে পারে 'মেনহির'। দ্বিতীয়টি হল, প্রিয়জনের মৃত্যুতে বা অপঘাত মৃত্যুতে আত্মার শান্তিলাভের জন্য মূর্তিখোদিত স্মারকস্তম্ভ দেবার এক প্রাচীন প্রথা এবং সব শেষেরটি হল, মানত হিসাবে ক্ষুদ্রাকার দেবালয় সদৃশ স্তম্ভ উৎসর্গ করার প্রথা। তবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাবিধ আঞ্চলিক সংস্কৃতি সংঘাতের দরুন এ আচার-অনুষ্ঠানের এতই পরিবর্ত ঘটেছে যে, আসল রূপটিকে চিনে বের করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সুতরাং এ পরিবর্তনের সেই তারতম্যের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার এই স্মৃতিস্তম্ভ নিবেদনের প্রথাটি অংশীভূত হলেও সেগুলি আজও অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ টিকে রয়েছে।

সেজন্যই আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এগুলি সম্পর্কে জেলাভিত্তিক যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করে সেগুলির সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে আরও গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করা। পরিশেষে, এ বিষয়টি নিয়ে যদি আঞ্চলিক বা গ্রামীণ সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন ধরণের স্মারক বা স্মৃতিস্তম্ভ ও নিবেদন-মন্দির সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধানপূর্বক এলাকাগত ব্যাপ্তি দেখিয়ে একটি মানচিত্র প্রণয়ন করেন তাহলে এবিষয়ে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভবিষ্যৎ গবেষকরা যে যথেষ্ট উপকৃত হবেন, তা বলাই বাহুল্য।



দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতে প্রাচীন সমাধিতে প্রাপ্ত মৃৎশিল্পের নিদর্শন।

❑ মেদিনীপুর ঃ 'সংস্কৃতি ও মানব সমাজ' গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

একটি দশটাকার কবর

নিখিল সরকার

না: পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুজি হল, কিন্তু কিছুতেই পাওয়া গেল না কবরটাকে। দশ টাকার চুন-বালি-ইটের সেই করুণ ইতিহাসটাকে।

পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপো অথবা বেগবাগান থেকে কাসিয়া-বাগানের পথে কাসিয়াবাগান কবরখানা। ইংরেজদের যেমন সাউথ পার্ক স্ট্রীট সিমেট্রি, মুসলমানদেরও তেমনি কাসিয়াবাগান। দুই জায়গায় মাটির নীচে ইতিহাসের দুটি অধ্যায়। একই যুগ একই দেশ। শুধু দুটি ভিন্ন জাতি। একটি বিজয়ী, অন্যটি বিজিত। সাউথ পার্ক স্ট্রীট কবরখানায় নিদ্রিত সেই বিজয়ীদলের নায়কেরা, কাসিয়াবাগানে পরাজিত নবাবেরা।

সাহায্য করতে এগিয়ে এল দীন মহম্মদ। পাশের বস্তির একটি ছেলে। কবরখানাটা সে চেনে। এখানে যে নবাবদের মাটি দেওয়া হয়েছে তাও জানে। কোথাকার নবাব তা অবশ্য তার জানা নেই, কিন্তু দীন মহম্মদ উর্দু পড়তে পারে। সুতরাং উৎসাহের সঙ্গেই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সে আমাদের।

কাসিয়াবাগান কবরখানা। বলতে গেলে কলকাতার আদি বনেদী মুসলিম কবরখানা। কিন্তু আজ তার দিকে তাকিয়ে কারও মনে হবে না সেকথা। মনে হবে না, এখানে মাটির নীচে ঘুমুচ্ছেন মহীশূরের নবাবজাদারা, অযোধ্যার খোদ নবাবেরা এবং এমনি আরও বড় মানুষেরা।

বিরাট এলাকা। কিন্তু কবর মোট কয়টি। নবাবদের বেওয়ারিশ কবরখানায় আজ অবহেলার রাজত্ব। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্লাইউড-এর শয্যা বিছিয়েছে পাশের করাতকল, ফাঁকে ফাঁকে ঘুঁটের আলপনা দিয়েছে প্রতিবেশী বস্তিবাসীর দল। দীন মহম্মদ মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পেরেছে, এর নীচ থেকে কোন নবাবকে খুঁজে বের করা তার কাজ নয়।

তবুও খুঁজলাম। খুঁজতে খুঁজতে ভোরের সূর্য এসে পৌঁছল অফিস-টাইমে। কিন্তু তবুও পাওয়া গেল না দশ টাকার সেই ঐতিহাসিক ইমারতটিকে। হয়ত এই সামান্য অর্থের বলে দেড়শ বছর একটানা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি বেচারা। অস্বাস্থ্য আর অবহেলায় ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কোন কালে। কিংবা এমনও হতে পারে, হয়ত এই সামান্য কয়টি জীবিত কবরের মধ্যে সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে আজও বেঁচে আছে সেই ঐতিহাসিক অবজ্ঞাটি।

ওয়াজির আলীর বিয়ের খরচা হয়েছিল তিরিশ লাখ টাকা, আর শেষকৃত্য মাত্র সত্তর টাকা। কবর খরচা বেশী হলে দশ টাকা।

১৭৯৪ সন। মহা ধূমধাম করে নবাব আসফউদ্দৌলা বিয়ে দিলেন ওয়াজির আলীর। ওয়াজির তার ছেলে নয়, পোষ্যপুত্র। তাই বলে বা কেন খরচা করবেন নবাব আসফউদ্দৌল।

ওয়াজির আলী তাঁর উত্তরাধিকারী। অযোধ্যার ভবিষ্যৎ নবাব। সুতরাং, মাস ভরে উৎসব হল। দেশ-বিদেশের লোকেরা নেমন্তন্ন পেল। ওয়াজির আলীর বিয়েতে পাকা তিরিশ লাখ টাকা খরচ হল।

তিনি বছর পরে, ১৭৯৭ সনে বিদায় নিলেন আসফউদ্দৌলা। অযোধ্যার সিংহাসনে বসলেন তরুণ নবাব ওয়াজির আলী। হয়ত, নবাবের মতই বেঁচে থাকতেন তিনি, হয়ত মৃত্যুর পর কবরস্থ হতেন রাজকীয় মর্যাদায় কিন্তু ওয়াজির আলী ছিলেন সিরাজ-উদ্দৌলার মতই অসহিষ্ণু নবাব।

সুতরাং, সিংহাসনে ভাল করে বসতে না বসতেই ইংরেজরা জানতে পেলেন, ওয়াজির আলী তাদের শত্রু। ইংরেজদের পরাজিত করতে না পারলেও অপদস্থ করাই তাঁর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

সময় থাকতে ইংরেজরা সাবধান হলেন। তাঁরা ওয়াজির আলীকে সহসা সিংহাসনচ্যুত করলেন। বিগত নবাবের পুত্র সাদত আলী এ ব্যাপারে সহায়ক হলেন তাঁদের পুরস্কার স্বরূপ সাদত আলী অযোধ্যার সিংহাসন পেলেন, ওয়াজির আলী পেলেন নির্বাসন দণ্ড।

অসহায়ের মত ওয়াজির আলী মেনে নিলেন সে দণ্ড। লখনউ থেকে তিনি বেনারস এলেন। বেনারসের রেসিডেন্ট মি. জর্জ চেরীর দরবারে ডাক পড়ছে এর পর তিনি কোথায় যাবেন!

যথাসময়ে মি. চেরীর দরবারে ডাক পড়ল পদচ্যুত নবাবের। সেদিন ১৪ই জানুয়ারী, ১৭৯৯ সন। ওয়াজির আলীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য মি. চেরী বাইরে এসেছেন। এসেই চমকে উঠলেন তিনি। ওয়াজির আলী একা আসেনি তাঁর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। সঙ্গে এসেছে রাশি রাশি 'সোয়ারী', নবাবের অনুগত ফৌজ। পালাবার আর তখন পথ নেই সামনে। মি. চেরী সোয়ারীদের হাতে প্রাণ হারালেন—মারা গেলেন, ক্যাপ্টেন কনওয়ে এবং মি. গ্রাহাম।

ওয়াজীর আলীর ক্ষিপ্ত অনুচরেরা চলল তখন জজ সাহেবের কুঠীর দিকে। অসীম বীরত্বের সঙ্গে শুধুমাত্র একটা বর্শা দিয়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন বিচারপতি মি. ডেভিস। অনুচরদের নিয়ে ওয়াজীর আলী পালিয়ে গেলেন বেরার।

বেরারেই ইংরেজদের হাতে অবশেষে বন্দী হলেন তিনি। সেখান থেকে তাঁকে চালান দেওয়া হল কোম্পানীর রাজধানীতে কলকাতায়। তারপর শুরু হল সেই লজ্জাকর শেষকৃত্যের প্রস্তুতি।

ইংরেজদের তথাকথিত বিচারে কলকাতায় অযোধ্যার ভূতপূর্ব নবাবের স্থান হল ফোর্ট উইলিয়ামের একটা অন্ধকার ঘরে, একটা লোহার খাঁচায়। চরম অবহেলার মধ্যে আজন্ম ঐশ্বর্যলালিত নবাব বন্দী জীবনযাপন করে চললেন। রাজকীয় বন্দীর জন্যে সামান্য মানবিক কর্তব্যগুলোও পালন করা সঙ্গত মনে করলেন না ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। এমনকি, সময় মত পাহারাদারের বন্দোবস্তটুকুও করেননি তাঁরা। ওয়াজির আলী পেট ভরে খেতে পেতেন না,—

বরাদ্দের বেশী এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেওয়া হত না তাঁকে।

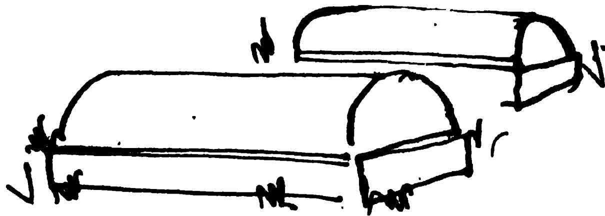
তবুও ইংরেজদের তৎকালীন বর্বরতার সাক্ষী হয়ে দীর্ঘ সতের বছর কয়েক মাস ফোর্ট উইলিয়মে বেঁচে ছিলেন আসফউদ্দৌলার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী। অবশেষে ১৮১৭ সনের মে মাসে ছত্রিশ বছর বয়সে লোহার খাঁচাটিকে ফাঁকি দিয়ে চিরকালের মত ইংরেজদের নাগালের বাইরে চলে গেলেন বিদ্রোহী নবাব।

মৃত্যুর পরেও যেন ইংরাজরা শান্ত হলেন না। ওয়াজির আলীর উপর তাঁদের প্রতিশোধের তখনও কিছু বাকী। কাসিয়াবাগান কবরখানায় এই সেদিন অবধিও ছিল তাঁদের সেই শেষ নৃশংসতার সাক্ষীটি। দীন মহম্মদ জানে না—সেটিকে মুছে ফেলে ইংরেজের কত উপকার করেছে তারা।

মৃত্যু সংবাদ শোনা মাত্রই ফোর্টউইলিয়ম কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন ওয়াজীর আলীর শেষকৃত্যে যেন সত্তর টাকার বেশী খরচা না হয়। ইংরেজরা জাতন, তেইশ বছর আগে—এই তরুণটি যখন বিয়ে করে, তখন খরচ হয়েছিল নগদ তিরিশ লাখ টাকা। অনেক বড় বড় সাহেব নেমন্তন্নও পেয়েছিল সেই বিয়েতে। সুতরাং, এবার হুকুম হল, সত্তর টাকার বেশী নয়! — অর্থাৎ আর আর খরচ মিটিয়ে কবরের জন্য শেষ পর্যন্ত দশটা টাকাও থাকবে কিনা সন্দেহ।

অযোধ্যার নবাবকে দশ টাকায় কেন কবর দিতে চেয়েছিলেন ইংরেজরা? মানুষকে মানুষের নিয়তির কথা শেখাতে চেয়েছিলেন কি তাঁরা? অথবা মর্ত্যে ঈশ্বরের বিচার দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁরা? কিংবা ইতিহাসকে নিজেদের হীনতা দেখাতে!

কাসিয়াবাগানের কবরখানা অনেকদিন অনেক মানুষকে দেখিয়েছে তা। আজ যদি একান্তই তা নজরে না পড়ে আপনার, তাতেও বোধ হয় ক্ষতি নেই তেমন। কেননা, ওয়াজীর আলীর সেই দশ টাকার কবরটি না থাকলেও তাঁর ইতিহাসটি আছে আজও। —হয়ত থাকবে চিরকাল।



সৌজন্যে : রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত 'এই অচেনা কলকাতা', প্রকাশক—বিশ্ববাণী হতে সঙ্গে গৃহীত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কবরগাহ

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

মানুষের জীবনে তিনটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা আছে—জন্ম-কর্ম-মৃত্যু। মৃত্যুর পর নশ্বর দেহের লয়প্রাপ্তি হয় সৎকার করা সামাজিকভাবে বাধ্যতামূলক কর্তব্য বলে গণ্য হয়। হিন্দুদের শবদাহ, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের সমাধি বা কবর আর পার্শিরা সাইলেন্স টাওয়ারে রেখে মৃতদেহের সৎকার করে। সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসেও দেখা যায় বিভিন্ন দেশের মানব সভ্যতায় এরূপ ধর্মীয় ও সামাজিক বিধান ছিল। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় মমি প্রথায় সমাধিস্থ করে তার উপর পিরামিড নির্মিত হত। আবার ইখামেনিয়ান সভ্যতায় উন্মুক্ত প্রান্তরে অথবা উঁচু জায়গায় মৃতদেহকে রেখে জীবজন্তুর আহার্যের জন্য মৃতদেহ রেখে দেওয়ার প্রথা ছিল। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষের প্রথম পর্বে শবদাহ ও শবদেহ সমাধিস্থ করার উভয় প্রথা প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ মিলেছে মোহেনজোদারো ও হরপ্পার প্রত্নক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গ খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার বিকাশ লাভ ঘটেছিল। তাম্রপ্রস্তর যুগের মনুষ্য সমাজে শব সমাধি প্রথার প্রমাণ পাওয়া গেছে বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও বীরভূম জেলার হাটটিক্‌রা গ্রামে। আবার সাঁওতাল ডাঙায় আংশিক দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে মৃৎপাত্রের মধ্যে। হিন্দুদের মধ্যে অপর একটি প্রথার প্রচলন ছিল। মৃতদেহ দাহ করার পর একটি তাম্রপাত্রে আংশিক দেহভস্ম রেখে সেটিকে সমাধিস্থ করে স্মৃতিবেদী বা সৌধ নির্মাণ করা হত। যা হোক বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শবদেহ দাহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে।

মুইজুদ্দিন মুহম্মদ সাম বা মুহম্মদ ঘুরীর ভারত বিজয় ও স্থায়ী মুসলমান আধিপত্যের পর ভারতে মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অনুরূপভাবে মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক অর্ধবঙ্গ বিজয়ের পর এবং এদেশে পির ও দরবেশগণ-এর ইসলাম প্রচারে উৎসাহিত হয়ে বহু হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল। সুতরাং বঙ্গদেশেও গড়ে উঠল অপর একটি প্রভাবশালী সমাজব্যবস্থা। ইসলামের বিধান অনুযায়ী মৃতদেহ সমাধিস্থ বা কবর দেওয়ার প্রথা বঙ্গদেশেও চালু হল। আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হল মধ্যযুগে বঙ্গদেশে সমাধি ও সমাধিসৌধ সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা। বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার খলজি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নিহত হওয়ার পর এবং মধ্যযুগের ইতিহাস রচনাকার গোলাম হোসেন সলিম জৈইদপুরীর সমাধি নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধের পরিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

মুসলমান সমাজে মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রথা অনুযায়ী দেহকে সমাধি বা কবরস্থ করা হয়। পারিবারিক সামর্থ্য অনুসারে আড়ম্বর অথবা অনাড়ম্বরভাবে শবদেহ মৃত্তিকাগর্ভে প্রথিত করাকে কবর দেওয়া বলে। ইসলামে অনাড়ম্বরভাবে কবর দেওয়ার কথা বলা হলেও

অনেক সময় জাঁকজমক সহকারে সমাধিস্থ করে তার উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু ইসলামে স্থায়ী সমাধিসৌধের স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। অনেকে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের মধ্যে ইসলাম বিরোধী মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এতে নির্মাতার দম্ভই প্রকাশ পায়। তাই ইসলাম বিশ্বাসী মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর অনাড়ম্বর সমাধির জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। একথা বিশ্বাস করতে দ্বিধা জন্মে যে প্রবল প্রতাপান্বিত ভারত সম্রাট মহারাষ্ট্রের দৌলতাবাদে সামান্য দীনজনের ন্যায় সমাহিত আছেন। অথচ তাঁর অধীনস্থ সুবাদার জাফর খাঁ (মুর্শিদকুলি খান) বহু অর্থ ব্যয়ে মৃত্যুর পূর্বে জাঁকজমকপূর্ণ মুর্শিদাবাদ শহরে কাটরার মসজিদ ও সমাধিকক্ষ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

স্থায়ী কবর বা সমাধিসৌধ নির্মাণের বিপক্ষে অনেকে মন্তব্য করেছেন যে এর মধ্যে কবর পূজার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে বহুল প্রচারের ফলে কবর ও স্মৃতিসৌধগুলি এক ধরনের পূজা-অর্চনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'দিল্লীতে হুমায়ুন, সেকেন্দ্রায় আকবর ও লাহোরে জাহাঙ্গীরের কবরে ঠিক পূজা না হলেও তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, কবরের স্থায়ীরূপ ও তার গায়ে শিলালিপি রাখা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ইসলাম সম্মত নয়। ফতেপুরসিক্রিতে সেলিম চিশতীর সমাধিতেও এখন পূজা করা হয়—মঈনউদ্দীন চিশতী আর নিজামউদ্দীন আউলিয়ার-কবর পূজার পদ্ধতিতেই।' মধ্যযুগে আস্তানাগুলি প্রধানত স্থাপিত হয়েছিল পির, সুফি ও দরবেশগণের সমাধিকে কেন্দ্র করে। 'এটি গুরুবাদী ধ্যানধারণা ও শিক্ষার উপর ভিত্তি করেছিল—গুরুর স্মৃতি, পরম্পরা, আচরণ ও কবরকেন্দ্রিক সাধনাকে স্বীকার করে যা তাঁদের পৌত্তলিকদের পূজার মানসিকতার স্তরে পৌঁছে দেয়।' দরগা, মাজার, আস্তানাগুলি অনেক সময় বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে হিন্দুদের ধর্মীয় মানসিকতাকে প্রভাবান্বিত করা যায়।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই প্রধান প্রধান সুফি-দরবেশগণের কবরগুলিকে ঘিরে পূজার বা উপাসনার কেন্দ্র করে তোলা হয়েছিল। কবরগাহগুলি তৈরি হয়েছিল সমাধিস্থ ব্যক্তির গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য এবং 'তাতে জিয়ারতের নামে উপাসনা, প্রার্থনা, মানত করা, উপহার দেওয়া, ধর্ণা দেওয়া, জিকর করা, সিজদা দেওয়া প্রভৃতি অনাদর্শকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য'। আবার অনেক আস্তানায় খানকাহ নির্মাণ করে সেখানে বিদ্যালয়, পান্থনিবাস, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল জনসাধারণের সেবার জন্য।

যা হোক এরূপ ধর্মীয় বাদানুবাদে কোনো লাভ নেই এবং প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তা নয়। প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু হল বঙ্গদেশে যে সকল কবর ও কবরগাহ-এর ঐতিহাসিকতা আছে অর্থাৎ শিলালিপি বা অপর কোনো ঐতিহাসিক উপাদানের দ্বারা সমর্থিত, কেবলমাত্র যে সব সমাধি স্মৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কবর সম্বন্ধ অলৌকিক কোনো বিষয়বস্তু বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হয় নি। বঙ্গদেশের দূরদূরান্তরে এখনও বহু সুলতান, প্রশাসক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সুফি, দরবেশ ও বহু সম্ভ্রান্ত ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সমাধি ও সমাধিসৌধ রয়েছে, যেগুলির মধ্যে বেশ

কিছু হারিয়ে গেছে বা এক সময়ে হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনার এ সকল উপাদানগুলির সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করাই বর্তমান প্রবন্ধে প্রধান উদ্দেশ্য।

নদীয়াহ্ ও লক্ষ্মৌতি বিজয়ের পর এবং তিব্বত আক্রমণের পূর্বে মহম্মদ বখতিয়ার খলজি দিনাজপুর জেলার জেবকোটে নতুন প্রশাসন কেন্দ্র স্থাপন করেন। প্রথম বঙ্গবিজেতারূপে বখতিয়ারের ক্ষমতা ও খ্যাতি চরম শীর্ষে উপনীত হলেও তিব্বত অভিযানের ফলে সৈন্যবল-সহ প্রচুর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় ও সেইসঙ্গে শারীরিক অসুস্থতাবশত তিনি দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে অসুস্থতার সময়ে আলি মর্দান নামক একজন খলজি আমিরের ছুরিকাঘাতে দেবকোটে তিনি নিহত হন। কাজী মিনহাজের তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বখতিয়ারের একান্ত আমির মহম্মদ শিরাণ এই সংবাদে ব্যথিত হয়ে লক্ষ্মৌর থেকে (নগৌর, জেলা বীরভূম) দ্রুত দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করে মহম্মদ বখতিয়ারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালনপূর্বক শোকপালন করেন। অনুমান করা যায় যে, যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশে অশান্তি-অরাজকতার সময়ে তাঁকে দেবকোটেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

অতঃপর আলি মর্দান কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকারের পূর্বে দেশে অরাজক অবস্থা ও খলজি আমিরগণের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবকের দৃষ্টিগোচর করা হলে তিনি আউধের শাসনকর্তা কাত্রমাজ্ রুমীকে বঙ্গদেশ অধিকার করতে আদেশ করেন। যুদ্ধে খলজি আমিরগণ পরাজিত হয়ে দেবকোটে প্রত্যাবর্তন করেন। খলজি আমিরগণ পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করার সময়ে মহম্মদ শিরাণ নিহত হন। আত্রেয় নদীর তীরে খালেদ সন্তোষ নামক স্থানে মহম্মদ শিরাণ সমাহিত আছেন। সম্ভবত এই ঘটনার সময়কাল ছিল ১২০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে।

বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের পূর্ব হতে পির-দরবেশগণ ইসলামের প্রচার ও ধর্মান্তরকরণের বিষয়ে অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন। পরবর্তীকালে শাসক শ্রেণীর ছত্রছায়ায় অপ্রতিহত গতিতে তাঁরা এই কার্যে উৎসাহিত হয়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। শিলালিপি প্রমাণের দ্বারা আবিষ্কৃত স্মৃতিসৌধগুলির মধ্যে বীরভূম জেলার সিয়ান গ্রামে মখদুম শাহজালালের খানকাহ ও কবর হল প্রাচীনতম। অবশ্য সৈয়দ আব্দুল হালিম এই খানকাহ ও কবরকে শেখ জালালুদ্দীন তাব্রিজীর বলে উল্লেখ করলেও অধ্যাপক ড. দীনেশচন্দ্র সরকার এই খানকাহটিকে মখদুম শাহজালালের বলে উল্লেখ করেছেন এবং স্থানীয় অঞ্চলের অবসরপ্রাপ্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ড. সরকারের মতকে সমর্থন করেন। তাছাড়া শেখ জালালুদ্দীন তাব্রিজীর সমাধি ছিল হজরত পাণ্ডুয়ায় এবং তিনি ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সিয়ান গ্রামে প্রাপ্ত শিলালিপি ১২২১ খ্রিস্টাব্দে খোদিত হয়েছিল এবং এই শিলালিপিতে আলীশির আইয়াজের পুত্র সুলতান গিয়াসউদ্দীন আইয়াজের (১২১১-২৬ খ্রিস্টাব্দে) নামোল্লেখ আছে। অপরপক্ষে পাণ্ডুয়ার সমাধিসৌধের নির্মাতা ছিলেন আলাউদ্দীন আলিশাহ।

লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা মহম্মদ আরশালাম তাতার খানের সময়ে (১২৬৫-৬৭ খ্রিস্টাব্দে) সুলতান শাহ নামক কাবুল হতে আগত এক দরবেশের সমাধিলিপি (১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে) আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং আরও জানা যায় যে তাতার খান তাঁর পিতার (সুলতান তাজউদ্দীন আরশালাম খান) সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু বগুড়া জেলার মহাস্থানগর হতে একটি সমাধিলিপি আবিষ্কার করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষণের জন্য প্রদান করেন। সুলতান রুকুনুদ্দীন কাইকাউসের সময়ে মিল নামওয়ার খান নামক একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছিল। সমাধিলিপির ইংরাজি অনুবাদ হল—'This shrine is built for the exalted and reserved Khan, Mir Namwar Khan in the month of Shautwal, in the year Seven hundred (1300 A.D.)'

দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হল হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে জাফর খান গাজীর মসজিদ ও সমাধিসৌধ। রুকুনুদ্দীন কাইকায়ুসের শাসনকালে মুসলমানগণ কর্তৃক মহানাদ, পাণ্ডুয়া ও ত্রিবেণী অঞ্চলে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। এই বিজেতা দলের নেতা জাফর খান গাজী। জাফর খান স্থানীয় অঞ্চলের প্রায় সমুদয় হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে ওই সকল উপাদানের দ্বারা মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজার প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। একটি আরবি লিপি হতে জানা যায় যে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে জাফর খান গাজী কর্তৃক মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল এবং মৃত্যুর পূর্বেই সমাধিসৌধ নির্মাণ করিয়ে রেখেছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, স্থানীয় হিন্দু রাজা ভূদেবের সঙ্গে যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যাধক্ষ্য জাফর খান গাজী নিহত হন। কিন্তু তাঁর পুত্র উগওয়ার খান বা উলুখ খানের সঙ্গে যুদ্ধে রাজা ভূদেব পরাজিত হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন এবং উলুখ খানের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে জাফর খান গাজীর মৃত্যু হলে ত্রিবেণীর সমাধিগৃহে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। সমাধিসৌধের প্রথম ভাগে জাফর খান গাজী, তাঁর পুত্র বরা খান এবং বরা খানের দুই পুত্রের সমাধি আছে এবং অন্তরালে আরও চারটি সমাধি দৃষ্ট হয়। 'কেম্‌ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' (৩য় খণ্ড) গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, *'curiously enough, hou it is not at your, but at the Hoogly District, that the oldest remains of Muslim buildings have survived. These are the tomb and mosque of Zafar Khan Ghazi. The former is built largely out of the materials taken from a temple of Krishna, which formerly stood on the same spot but is now so mutilated as to have lost most of its architectural value.'* একথা সত্য যে ইহা অপেক্ষা কোনো প্রাচীন মসজিদ বা সমাধিসৌধ সমগ্র বঙ্গদেশে এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

ত্রয়োদশ শতকে বাগদাদ হতে আগত দরবেশ মখদুম শেখ জালালুদ্দীন তাব্রিজী পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন। তিনি বাগদাদের আবু সৈয়দ তাব্রিজী শেখ শিহাবউদ্দীন সুহরা ওয়ান্দির শিষ্য ছিলেন। উত্তর ভারতে তিনি সুফি সম্প্রদায়ের সুহরাওয়ান্দি মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেন যে জালালুদ্দীন বখতিয়ার খলজীর বঙ্গদেশ জয়ের পূর্বে এদেশে আগমন

করেন। তিনি পাণ্ডুয়ায় অবস্থান করতেন এবং ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন এবং পাণ্ডুয়ায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। লক্ষ্ণৌতির শাসনকর্তা আলাউদ্দীন আলি শাহ কর্তৃক এই দরবেশের সমাধি ও তার পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আলি শাহের রাজত্বের ১০০ বছর পূর্বে জালালুদ্দীন তাব্রিজী পরলোকগমন করেন। আবার পাণ্ডুয়ায় একটি প্রবাদ আছে যে জালালুদ্দীন তাব্রিজী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আলি শাহ এই মাজারটি নির্মাণ করেছিলেন। এই মাজারে বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি সম্বলিত পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। মনে হয় আলি শাহ সমাধিগৃহের সংস্কার সাধন ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আবার মাজারের মাতওয়ালির মতে মহারাষ্ট্রে ঔরঙ্গাবাদে জালালুদ্দীনের আসল কবর বর্তমান এবং পাণ্ডুয়ার কবর কৃত্রিম। শেখ শুভোদয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে তিনি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং রাজা তাঁকে অত্যন্ত মান্য করতেন। এ সকল বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বিষয় বলে মনে করি। একটি শিলালিপি হতে জানা যায় ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে জনৈক চাঁদ খান শেখ জালালুদ্দীনের সমাধির পাশে একটি ভাণ্ডারখানা নির্মাণ করেছিলেন।

চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে শেখ আখি সিরাজউদ্দীন উসমান বালকী দিল্লিতে নিজামউদ্দীন আউলিয়ার নিকট আগমন করেন। নিজামুদ্দীনের নির্দেশে তিনি ফকিরউদ্দীন জারদারীর নিকট বিদ্যার্জন লাভ পূর্বক বঙ্গদেশে আগমন করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে হিন্দুস্তানের দর্শন আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল। সমসাময়িক কালে বঙ্গদেশের রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং ইলিয়াস শাহ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হফৎ ইক্‌লিমের মতে ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন এবং সম্ভবত ইলিয়াস শাহের দ্বারা সমাধি গৃহ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম শদুল্লাহপুরে অখিসিরাজউদ্দীনের সমাধি ভবনের সম্মুখে ইটের উপর খোদিত লিপি দৃষ্টে অনুমান করেছিলেন যে সমাধি ভবনটি গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। লিপি খোদিত ইটগুলি কানিংহাম ভারতীয় জাদুঘরে প্রদান করেন। সমাধি ভবনের তোরণ দ্বারে প্রোথিত শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায় যে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহ সমাধিভবনের নির্মাতা ছিলেন। মনে হয় সুলতান হোসেন শাহ সমাধি ও সমাধি ভবনের সংস্কার করে তোরণদ্বারটি নির্মাণ করেছিলেন। সমাধি ভবনের উত্তরদিকের তোরণ দ্বারটি সুলতান নসরৎ শাহের আমলের, একথা প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায় এবং এই তোরণদ্বারের নির্মাণকাল ছিল হি. ৯৩১ অব্দ (১৫২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দ)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এই বংশের তিনজন দরবেশ সুলতানি আমলে বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, যথা, অখিসিরাজউদ্দীনের পুত্র শেখ আলাউল হক এবং আলাউলের পুত্র নূর-উল-কুতুব।

সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ একজন ধর্মান্ধ ও নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তাঁর সময়ে শেখ রজা বিয়াবানি ও পীর সিরাজউদ্দীন নামক দরবেশদ্বয় পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন। ইলিয়াস

শাহ শেখ বিয়াবানিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এমনকী তিনি দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলকের দ্বারা একডালা দূর্গে অবরুদ্ধ থাকাকালীন সময়ে বিয়াবানির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ছদ্মবেশে শেখের শবানুগমন করেন। মৃতদেহ সমাধিস্থ হলে ইলিয়াস শাহ সুলতান ফিরোজ শাহের শিবিরে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন বলে জানা যায়।

বঙ্গদেশে পির ও দরবেশগণের মধ্যে শ্রীহট্টের দরবেশ শেখ শাহ জালালের খ্যাতি হল সর্বাধিক। এমনকী বিদেশীয় পর্যটক ইবনে বতুতা তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনি থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে শাহ জালালের সঙ্গে দেখা করেন এবং ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন। শাহ জালালের জীবন ও সাধনা সম্পর্কিত বহু কিংবদন্তী ও ইতিহাস আশ্রিত উপাখ্যান গড়ে উঠেছিল। শ্রীহট্টে শাহ জালালের দরগাহে প্রাপ্ত শিলালিপিতে জানা যায় যে ফিরোজ শাহের সময়ে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট বিজিত হয় এবং সিকন্দর গাজীর সঙ্গে শাহ জালাল এখানে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। বর্তমানে এই দরগাহ একটি তীর্থস্থান; হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং দরগাহে আগমন করে থাকে।

শরিয়তের বিধান মতে মুসলমানেব পাকা কবর তৈরি করা নিষেধ। শাহ জালাল সে নির্দেশ জানতেন এবং সে কারণে তাঁর কবর পাকা নয় ও কোনো সৌধও নির্মিত হয় নি। সম্ভবত ঐই জন্য পির মহল্লায় অন্যান্য কবরগুলিও পাকা নয়। শাহ জালালের কবরের উপর এত অত্যধিক পরিমাণে চুনের প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল, যা হঠাৎ দেখলে পাকা বলে ভ্রম হয়। এই সমাধির পাশে দরবেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সুলতান ইউসুফ শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহ 'দরুল ইশান' নির্মাণ করে শাহ জালালের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তবে এখানে অপর একটি আদিনা মসজিদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তা মোগল আমলের কীর্তি।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় মাজারটি কোথায় অবস্থিত। ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন হজরত শাহ জালাল একটি অনুচ্চ পাহাড়ের গুহায় বসবাস করতেন। শ্রীহট্ট শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি টিলার উপর প্রাচীর ঘেরা আঙিনার মধ্যে শাহ জালালের মাজাব আছে। সিঁড়ির ডান দিকে একটু দূরে মহিলাদের জন্য নির্মিত একটি ছোট ইমারত দেখা যায়। মহিলারা এখান থেকে মাজারে জিয়ারত পর্ব সম্পন্ন করেন। কারণ শাহ জালালের নির্দেশানুসারে কোনো মহিলা পাহাড়ে উঠে জিয়ারত করতে পারেন না।

চট্টগ্রাম শহরের অনতিদূরে পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়তলি নামে একটি স্থান আছে। ওই স্থানে বায়াজিদ বস্তামী নামক একজন দরবেশের কবর ও দরগা আছে। সম্ভবত বায়াজিদ বস্তামী চতুর্দশ শতকে চট্টগ্রামে এসেছিলেন। সমাধিগাত্রে প্রোথিত শিলালিপিটি পাঠোদ্ধার করা যায় নি।

দিনাজপুর জেলার দেবীকোটে মখদুম মৌলানা আতা শাহের সমাধি আছে। আতা শাহের দরগায় প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে হি. ৭৬৫ অব্দে (১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে) সিকন্দর শাহ

দরবেশ আতা শাহের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। আতা শাহ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী দরবেশ ছিলেন এবং সিকন্দর শাহ তাঁর খুব অনুরাগী ছিলেন। মজফর শাহ ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সমাধির পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং এই সময়ে সমাধির সংস্কার করা হয়েছিল। গৌড়ের ফিরোজপুর অঞ্চলে দরবেশ শাহ নিয়ামতউল্লার আস্তানা আছে। তবে তিনি কোন সময়ে গৌড়ে এসেছিলেন তা অজ্ঞাত এবং তাঁর সমাধি নির্মাণের কোনো সূত্র জানা যায় নি। সম্ভবত তিনি চতুর্দশ শতকে এই স্থানে আগমন করেন। তাঁর সমাধির পাশে ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দীন জালাল শাহের আমলে (১৫৬০-৬৩ খ্রিস্টাব্দে) জনৈক খান জাহান একটি তোরণ নির্মাণ করেন। প্রাপ্ত শিলালিপি তার সাক্ষ্য বহন করছে।

ইলিয়াস শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৮-৯৩) সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশ শাসন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল আদিনা মসজিদ নির্মাণ এবং এতে সুলতানের শিল্পানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। আয়তনের বিশালতা ও স্থাপত্য-ভাস্কর্যের জন্য হজরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের অতুলনীয় নিদর্শন। অষ্টম শতকে নির্মিত দামাস্কাসে খলিফা ওমরের মসজিদের সঙ্গে আদিনা মসজিদের তুলনা করা চলে। চার বছরে (১৩৬৫-৬৯) এই মসজিদের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছিল। আদিনা মসজিদের পশ্চিম ভাগের উত্তর অংশে একটি বৃহৎ কক্ষ তাঁর সমাধির জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এই সমাধিভবন নির্মিত হয়েছিল। প্রায় ছাব্বিশ বছর বঙ্গদেশ শাসন করার পর শেষ জীবনে তাঁর শোচনীয় পরিণতি ঘটে। বিদ্রোহী পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় সুলতান সসৈন্যে বাধা দিতে অগ্রসর হলে পাণ্ডুয়ার অদূরে গোয়ালপাড়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সিকন্দর নিহত হন। সুলতানের ইচ্ছানুসারে তাঁর নির্মিত সমাধি সৌধে সমাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইংরেজ আমলে এই সমাধিভবন সংস্কারের সময় অজ্ঞতাবশত সুলতান সিকন্দর শাহের দেহাবশিষ্ট অন্যান্য জঞ্জালের সঙ্গে নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

ঢাকা জেলার সোনারগাঁও অঞ্চলে মোগরাপাড়া বা মগপাড়ার প্রায় ২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কালপাথরে তৈরি মাজারটি সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের মাজার নামে পরিচিত। মুসলিম স্থাপত্যবিদগণ মনে করেন যে এই মাজারের অলঙ্করণ আদিনা মসজিদ ও সিকন্দর শাহের মাজারের অলঙ্করণের ন্যায়। এই ইমারতের ছাদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই স্থানে গিয়াউদ্দীনের ভ্রাতা দ্বিতীয় সিকন্দরের সমাধি ছিল বলে অনুমান করা হয়। তাছাড়া সমাধি চত্বরের ভিতরে আরও পাঁচটি কবর আছে, যা পাঁচ পিরের কবর নামে পরিচিত। মোগরাপাড়ায় নহবতখানা নামে একটি সৌধের ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে চারটি কবর ছিল। কানিংহাম তাঁর রিপোর্ট উল্লেখ করেছেন এগুলি হল ইব্রাহিম দানিশমন্দ, তাহলে ইসলাম, সৈয়দ মহম্মদ ইউসুফ ও আয়েশা বানু নামে একজন স্ত্রীলোকের মাজার বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে আখি সিরাজুদ্দীনের পুত্র বিখ্যাত দরবেশ শেখ আলাউল হক

পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন এবং সুলতান তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখতেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে রচিত মুসলমান সন্তদের জীবনীগ্রন্থ 'অখবার অল অখিয়ার'-এ পাওয়া যায় সিকন্দরের জীবনের শেষভাগে আলাউল হকের সঙ্গে সুলতানের মতবিরোধ হয়। মত-বিরোধের মূল কারণ ছিল দরবেশের ধর্মীয় প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা। তাছাড়া পাণ্ডুয়ার খানকাহে ছাত্র, ভিক্ষুক ও পথিকগণের খাওয়া-দাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল, যার সিংহভাগ রাজকোষ থেকে ব্যয়িত হত। সুতরাং আলাউল হক সুলতানের আদেশে সোনারগাঁও যেতে বাধ্য হন। সোনারগাঁও-এ তিনি সিকন্দরের অবাধ্যপুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের অনুগ্রহ ও সম্মান লাভ করেন এবং গিয়াসউদ্দীন খানকাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ দিতেন। সিকন্দরের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বকালে আলাউল হক পাণ্ডুয়ার প্রত্যাবর্তন করেন এবং পরিণত বয়সে পরলোকগমন করায় তাঁকে পাণ্ডুয়ায় সমাধিস্থ করা হয়। আলাউল হক, শেখ নূর-উল-কুতুবও এই পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে পাণ্ডুয়ার ছোট দরগায় সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এই দরবেশের মৃত্যুর তারিখ হি. ৮০০ অব্দ ১ রজব বা ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ। আলাউল হকের সঙ্গে শেখ আবদুল হক নামে অপর একজন দরবেশ পাণ্ডুয়ায় এসেছিলেন এবং তাঁকেও সোনারগাঁও-এ নির্বাসিত করা হয়েছিল। তিনিও বৃদ্ধ বয়সে পাণ্ডুয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে আবুদল হকের মৃত্যুর পর পাণ্ডুয়ার ছোট দরগায় সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

হুগলি জেলার বৈদ্যবাটি রেল স্টেশন থেকে ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে মোল্লাসিমলা গ্রাম অবস্থিত। এখানে মহম্মদ কবির সাহেবের সমাধিগৃহ রয়েছে। এই দরবেশ সাধারণের কাছে আলেপ্পোর শাহ আনোয়ার কুলি নামে প্রসিদ্ধ। সমাধিগৃহের প্রবেশদ্বারে যে শিলালিপি আছে [illegible] হি. ৭৭৭ অব্দে (১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে) এখানে একটি মসজিদ ও সমাধিভবন নির্মিত হয়েছিল। উলুখ মুসলিম খান নামে একজন আমির এই সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। এই সমাধিতে চশমা নিবেদন করার প্রথা ছিল। কারণ তৎকালে আলেপ্পো সুন্দর সুন্দর চশমা নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সম্ভবত শাহ আনোয়ার আলোপ্পেবাসী ছিলেন বলে এ ধরনের নিবেদন-প্রথা প্রচলিত হয়েছিল।

বায়াজিদ শাহের পুত্র নাবালক সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সরিয়ে ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গণেশ হি. ৮১৮ অব্দে (১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে) গৌড় অধিকার করেন। গণেশ রাজ্য অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে দরবেশগণের সঙ্গে বিরোধ বেধে ওঠে। 'রিয়াজ-উস-নালাতিন' গ্রন্থ হতে জানা যায়, দরবেশ বদর-উস-ইসলাম রাজা গণেশকে মান্য না করায় উভয় ভ্রাতাকে হত্যা করা হয়। অন্যান্য দরবেশগণকে নদীতে নৌকায় চড়িয়ে জলমগ্ন করে মৃত্যুর ব্যবস্থা করে রাজা গণেশ তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিলেন। অবশ্য দরবেশগণকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব।

শেখ আখি সিরাজউদ্দীনের পৌত্র ও শেখ আলাউল হকের পুত্র নূর-উল-কুতুব আলম

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত দরবেশ এবং সমসাময়িক রাজ্য শাসন বিষয়ে তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীনের সহপাঠী ছিলেন। আলাউল হকের মৃত্যুর পর ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে গিয়াসউদ্দীনের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। নূর-উল-কুতুবের জন্ম লাহোরে এবং শৈশবে পিতার সঙ্গে বঙ্গদেশে আগমন করেন। ব্লকম্যানের মতে তাঁর পুত্রদ্বয়ের নাম ছিল রুফৎ আতাউদ্দীন ও শেখ আনোয়ার। তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্য হাসামুদ্দীন মানিকপুরী গুরুর বাণী ও উপদেশ সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

গণেশের রাজত্ব লাভের পর নূর কুতুব বঙ্গদেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে লিখিত তিনটি পত্রে (এই পত্রটি বঙ্গানুবাদ ধৃত আছে, সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'দু'বছর স্বাধীন সুলতানী আমল গ্রন্থে, পৃষ্ঠা ১০৯-১১১)। পত্র তিনখানি থেকেই বোঝা যায় তিনি কীরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং এই সময়ে বিহার ও বঙ্গদেশের অন্যান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ও দরবেশগণকে রাজা গণেশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ তাঁকে গুরুর ন্যায় সম্মান করতেন।

নূর-উল-কুতুব আলমের মৃত্যুর পর পাণ্ডুয়ার ছোট দরগায় তাঁর পিতার পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এই সমাধি চত্বরের মধ্যে সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে একটি রসুইখানা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে মজফর শাহ কর্তৃক সমাধি সৌধ নির্মাণে দাবি সম্বলিত শিলালিপি প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি সম্ভবত সমাধিটি সংস্কার করেছিলেন মাত্র। ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহের রাজত্বকালে উলুখ তাহির খান একটি চিল্লাখানা (ধর্ম উপদেশ গৃহ) নির্মাণ করেন। অপর একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে নসরৎ শাহের আমলে মজলিসী সিরাজ নামক একজন পদস্থ আমির কর্তৃক চিল্লাখানার সংস্কার সাধন করা হয়েছিল।

রাজা গণেশের পুত্র যদু, জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ পূর্বক হি. ৮২১ অব্দে (১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে) গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬ বৎসর রাজত্ব করার পর তিনি হি. ৮৩৬ অব্দে (১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে) ইহলোক ত্যাগ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মসজিদ বলে মনে হলেও এটি একটি সমাধিসৌধ এবং তাঁর জীবদ্দশায় এই সমাধিগৃহ নির্মিত হয়েছিল। যেহেতু এই সমাধিভবনের স্থাপত্যশৈলী ছিল গৌড়ের চিক মসজিদের ন্যায়, সে কারণে মসজিদ বলে মনে করা হত। স্থাপত্যশৈলীর নিরিখে সমাধিসৌধটি বঙ্গদেশের এক অনবদ্য ও অতুলনীয়। এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট এবং গম্বুজের ব্যাসের পরিধি ৭৮ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ৮টি স্তম্ভের উপর স্থাপত্যটি দণ্ডায়মান। সমাধিভবনের অভ্যন্তর ভাগে হিন্দু স্থাপত্যরীতিতে অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। আবার অনেকের মতে রাজা গণেশের প্রতিষ্ঠিত একলক্ষী নামক চণ্ডীদেবীর মন্দিরটি নূর-উল-কুতুবের প্ররোচনায় সমাধিগৃহে রূপান্তরিত করা হয়। শোনা যায় একলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত হওয়ায় ইহা 'একলাখী সমাধিভবন' নামে পরিচিত। অভ্যন্তরে সুলতান, তাঁর পুত্র ও

পত্নী শায়িত আছেন। কিন্তু মুন্সী ইলাহী বক্সের 'মুরসিদ-ই-জাহান-নামা' মতে সর্বাপেক্ষা উঁচু বেদীতে সুলতান জালালুদ্দীন, মধ্যেরটি বেগমের এবং পূর্বভাগেরটি সুলতানের একমাত্র পুত্র শামসুদ্দীন আহম্মদ শাহের সমাধি।

বঙ্গদেশে প্রভাবশালী পির, দরবেশ ও শাসকগণের কবর বহুস্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বহু অনামী পির ও দরবেশগণের কবর সারা দেশে ছড়িয়ে আছে, ইতিহাস ও শিলালিপির দ্বারা সে সকল কথা সমর্থিত হয়। হুগলি জেলার সপ্তগ্রামের অনতিদূরে বর্তমান আদি সপ্তগ্রামে (অতীতের ত্রিশবিঘা রেল স্টেশন) শেখ জামালউদ্দীনের সমাধিলিপি পাওয়া গেছে, যার লিপিকাল ছিল ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দ। সমাধির পাশে জনৈক তরবিয়ত খান কর্তৃক শেখ জামালউদ্দীনের জন্য একটি বাসগৃহ নির্মিত হয়েছিল। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ায় মিনারের বিপরীত দিকে শাহ সৈফুদ্দীনের সমাধিগৃহ আছে। জনশ্রুতি এই যে তিনি দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের ভ্রাতুস্পুত্র (মতান্তরে ভাগিনেয়) ছিলেন। সৈফুদ্দীনের মৃত্যুর পর এখানে একটি সমাধিগৃহ নির্মিত হয়েছিল। তবে সমাধিসৌধটি প্রাচীন বলে মনে হয় না। সমাধিসৌধের সন্নিকটে যে মসজিদটি রয়েছে তার মজলিস-উল-মজলিস কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। মনে হয় সমাধিসৌধ ওই সময়ে নির্মিত হয়। হজরত পাণ্ডুয়ার ছোট দরগায় রক্ষিত একখানি শিলালিপি হতে জানা যায় ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে লতিফ খান কর্তৃক জনৈক অজ্ঞাতনামা মুসলমান সাধুর সমাধি নির্মিত হওয়ার সংবাদ জানা যায়। দিনাজপুর জেলার মহীসন্তোষের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কয়েকটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছিল। মহীসন্তোষ প্রথম জীবনে হিন্দু হলেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে মহীসন্তোষ ও তাঁর কন্যা সমাধিস্থ আছেন। সমাধি সংলগ্ন মসজিদটি সুলতান বারবক শাহের আমলে নির্মিত হয়েছিল।

বীরভূম জেলার লোহাপুর স্টেশনের সন্নিকটে বড়-কসবা বা বালানগরে শেখ মখদুম হোসেনের সমাধি রয়েছে। মামুদ শাহী বংশের প্রথম সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের সময়ে হি. ৮৫৪ অব্দে (১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে) উলুখ আহমদ খান নামক জনৈক আমির মসজিদ ও সমাধিগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। রাজশাহী শহরে হেতমখান মসজিদের কাছে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই শিলালিপিটি হল বিখ্যাত দরবেশ মখদুম মৌলানা আতা ও দরবেশ বাহিউদ্দীনের সমাধিলিপি। হি. ৮৮৭ অব্দে (১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে) সুলতান জালালুদ্দীন ফতে শাহ কর্তৃক সমাধিসৌধটি নির্মিত হয়েছিল। কানিংহামের মতে শিলালিপিটি প্রথমে দিনাজপুর জেলার দেবীকোটে আতা শাহের সমাধিতে ছিল; মনে হয় উহা দেবীকোট থেকে রাজসাহীতে কোনো সময়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অপর একজন আতা সাহেবের সন্ধান পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদ জেলার মোর গ্রামে। মোরগ্রামের মসজিদ ও সমাধি তৈরি হয়েছিল উলুখ আতা মালিকের স্মৃতিরক্ষার্থে, যিনি হোসেন শাহের পদস্থ আমির ছিলেন। দেবীকোটে একটি দরগার শিলালিপিতে মখদুম মৌলানা আতার নাম উল্লেখ আছে। এই তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে মজ্জফর শাহ সমাধিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু ইয়াজদানির মতে

মজ্জফর শাহ্ সমাধিসৌধের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না; তিনি সংস্কার করেছিলেন মাত্র। মনে হয় সংস্কারের সময় ফতেশাহ্ প্রদত্ত শিলালিপি খোলা হয় এবং তা রাজশাহীতে আনীত হয়েছিল।

বর্ধমান জেলায় মানকর-গুণকরা পাকা রাস্তার উপর ফুয়াতা গ্রামের অবস্থিতি। এই গ্রামের বহির্ভাগে অনুচ্চ একটি ঢিবির উপর পির বহমন শাহের সমাধি ও সমাধিগৃহ দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি এরূপ যে বহমন পির এতদঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারে সফলতা লাভ করায় নিকটবর্তী অমরাগড়ের সদগোপ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে বহমন পির নিহত হন এবং সুয়াতায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। এই পিরের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি ও উত্তরায়ণ দিবসে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমাধিসৌধের ভিতর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শিলালিপি আছে। শিলালিপিগুলিতে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় যে নিকটস্থ কোনো স্থানে সুলতান হোসেন শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। সুয়াতা গ্রামের মসিদডাঙায় ভগ্ন মসজিদের নিদর্শন ও শিলালিপিগুলি পাওয়া গেছে। অনেকে দাবি করেন যে ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে শহীদ মাহমুদ শাহ বাহমনী দাক্ষিণাত্য থেকে প্রচারের উদ্দেশ্যে গোপভূমে এসেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের বহমনী বংশের সুলতান আলাউদ্দীন বহমন শাহের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বর্ধমান জেলার কালনা শহরে শামপুর পল্লিতে মজলিস শাহ্ নামক একজন পিরের মাজার আছে। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকে বদরুদ্দীন বদরে আলম ও তাঁর শিষ্য শাহ্ মজলিস বিহার হতে কালনায় আগমন করেন। পরবর্তীকালে বদরুদ্দীন কালনা ত্যাগ করলেও আস্তানা নির্মাণপূর্বক মজলিস শাহ্ অত্র স্থানে অবস্থান করেন। মজলিস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর অনুগত ব্যক্তিগণ মজলিস দিঘির তীরে মৃতদেহ সমাহিত করার ব্যবস্থা করে এবং পরে একটি সৌধও নির্মিত হয়েছিল, যা বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে পিরের উরস উৎসব উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয় এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষ উৎসবে যোগদান করে। কালনা শহরে মিশনহাউস পার হয়ে শহরের দিকে অগ্রসর হলে একটা ঘেরা চত্বরের মধ্যে আজম শাহের মাজার দেখা যায়।

ঢাকা শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে তুরাগ নদীর তীরে মীরপুরে শাহ্ আলি বাগদাদীর মাজার আছে। জনশ্রুতি যে তিনি বাগদাদের শাহজাদা ছিলেন। শাহ আলি বাগদাদী মীরপুরে সুলতানি আমলের একটি জীর্ণ মসজিদে তাঁর আস্তানা তৈরি করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর এখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি যেখানে সমাহিত আছেন ওই সৌধের গায়ে একটি শিলালিপি হতে জানা যায় সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে অত্র স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এই মাজার গৃহের আয়তন ৩৬′ x ৩৬′ এবং দেওয়াল ৮′ ফুট চওড়া।

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও পুরাকীর্তির নিদর্শন হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটি সভ্যতার নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশ ঘটেছিল। মধ্যযুগে মুসলমান অধিকারের সময় মঙ্গলকোট ‘আঠার আউলিয়ার দেশ’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইসলামধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে

আঠারোজন ধর্মযোদ্ধার অত্র স্থানের রাজা বিক্রমকেশরীকে যুদ্ধে পবাজিত ও নিহত করেন। এ সকল ঘটনার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া না গেলেও কয়েকজন আউলিয়ার কবর মঙ্গলকোটে আছে বলে সনাক্ত করা হয়। ড. এনামূল হকের 'সুফীজম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে মখদুম শাহ মাহমুদ গজনভী সর্বপ্রথম এখানে আসেন এবং এতদঞ্চলে তিনি রাহী পির নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাহী পির ও মখদুম শাহ আবদুল্লাহ গুজরাটির সমাধি দৃষ্ট হয়। শাহ সুলতান আনসারী আনুমানিক হি. ৯০০ অব্দে (খ্রিস্টাব্দে) মঙ্গলকোটে বসবাস করতেন এবং এখানে তাঁর ও ওই বংশীয়গণের কবর আছে। সৈয়দ বংশীয় মীর জাকির আলি, পির পাঞ্জাতন, গোরা শহীদ পিরের স্থানও দেখানো হয়। আগ্রা নিবাসী কাজী দিলওয়ার হোমেনের পুত্র শেখ হামিদ দানিশমন্দ বাঙালি এখানে বসবাস করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে সম্রাট শাহজাহানের নাম একটি শিলালিপিতে খোদিত আছে। ওই মসজিদ প্রাঙ্গণে দানিশমন্দ বাঙালি সমাহিত আছেন।

বীরভূম জেলার মহম্মদবাজার থানার মখদুম নগর গ্রামে শাহ মখদুম জাকিউদ্দীনের সমাধিফলক বিনষ্ট হওয়া একটি নতুন ফলক স্থাপন করা হয়। 'খুরমিদ-ই-জাহাননামা' মতে সৈয়দ শাহ নিমাতুল্লাহ দিল্লির নিকটস্থ কারনাল হতে বঙ্গদেশে এসে প্রচুব সম্মান লাভ করেন। প্রথমে রাজমহল ও পরে গৌড়ের কাছে ফিরোজপুরে খানকাহ নির্মাণ করেন। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর ফিরোজপুরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

মালদহ শহরের মুগলটুলিতে অবস্থিত জামি মসজিদ থেকে ০.৫ কিলোমিটার দূরে একটি দরগাহে দরবেশ শাহ গদার সমাধি আছে। প্রাচীর বেষ্টিত এই দরগাহে শাহ গদা ব্যতীত মস্তান মিয়া লঙ্গত বন্দ, শাহ গদার বিবি ও তাঁর ধাইমার সমাধি পাওয়া যায়। এই সমাধি চত্বরের মসজিদটি দরগাহের ভৃত্য খাদেম হিলাল কর্তৃক সুলতান মহম্মদ শাহের আমলে ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুদূর কাবুল থেকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পির খক্কর সাহেব বর্ধমান শহরে এসেছিলেন। বর্তমান রাজবাড়ি চত্বরের দক্ষিণাংশে পায়রাখানা গলিতে এই দরবেশের সমাধিতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা জানান। সম্ভবত তিনি পঞ্চদশ শতকে বর্ধমানে আগমন করেন এবং দেহত্যাগের পর বর্ধমান দুর্গের একাংশে সমাহিত করা হয়েছিল।

অতীতে খুলনা জেলার বাগেরহাটের নাম ছিল খলিফতাবাদ। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা সদর শহরে রূপান্তরিত হওয়ার পর এই শহর বাগেরহাট নামে পরিচিতি লাভ করে। খলিফতাবাদে খান জাহানের কবর, মসজিদ, বড় বড় দিঘি প্রতিষ্ঠিত আছে। মধ্যযুগের ইতিহাসে চারজন খান জাহানের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে সুন্দরবন অঞ্চলের শাসনকর্তা খান-ই-জাহানের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাগেরহাটের ৬০ গম্বুজ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মসজিদ থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে একটি সমাধিসৌধে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, খান-ই-জাহান হি. ৮৬৩ অব্দে বা ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর দেহত্যাগ করেন। শিলালিপি হতে প্রমাণিত হয়

খান জাহান মৃত্যুর পূর্বেই সমাধিভবন নির্মাণ করেছিলেন। একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের মধ্যভাগে মাজারটি অবস্থিত এবং এই সৌধের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ৪৬ ফুট এবং ভিত্তিস্থল হতে গম্বুজের শীর্ষদেশের উচ্চতা ৪৭ ফুট। ১৪ ফুট x ৮ ফুট আয়তনের সমাধি বেদীটি মিনা করা ইটের দ্বারা নির্মিত ছিল। এতদঞ্চলের মানুষ খান-ই-জাহানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। প্রকৃত ইতিহাস অপেক্ষা তাঁর নাম প্রচারিত প্রবাদ বা জনশ্রুতিই অধিক। এই মাজারের পশ্চিমভাগে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত একটি সমাধি আছে, যা খান জাহানের বন্ধু পির আলি মোহম্মদ তাহেবের সমাধি নামে পরিচিত। সুন্দরবনের ইতিহাস রচয়িতা আবদুল জলিলের মতে তাহের ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান এবং তাঁর পূর্বনাম ছিল গোবিন্দলাল রায়। এই মাজারের উত্তর-পশ্চিমে ৩৫০'x৩৩০' আয়তন বিশিষ্ট একটি প্রাচীর ঘেরা স্থানে বহু কবর আছে, তন্মধ্যে জিন্দাপিরের মাজার ও মসজিদটি প্রসিদ্ধ।

বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে পির ইসমাইল গাজীর নাম। অনেকের মতে তিনি সুলতান বারবক শাহের সেনাপতি আবার কেউ কেউ অনুমান করেন যে তিনি আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু রিসামৎ-উল শুহাদা নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে ইসমাইল গাজী কোরেন বংশীয় আরব দেশের লোক ও মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন কুশলী ব্যক্তি ও বড় যোদ্ধা ছিলেন। যৌবনে ভাগ্যান্বেষণে সুলতান বারবক শাহের সৈন্যাপত্যের পদ গ্রহণ করেন। উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী গড় মান্দারণ, আসাম, শ্রীহট্ট ও অন্যান্য অঞ্চল ইসমাইল গাজীর দ্বারা বিজিত হয়েছিল। ছুটিয়া পুটিয়া পরগনায় খরস্রোতা নদীর উপর সেতু নির্মাণে কৃতকার্য হওয়ায় বারবক শাহ কর্তৃক পুরস্কৃত হন এবং তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু সুলতানের অপর একজন হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায় অভিযোগ করেন যে ইসমাইল কামরূপের রাজার সঙ্গে চক্রান্ত করে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। ইসমাইলের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পর সুলতানের আদেশে হি. ৮৭৮ অব্দে ১৪ শ্রাবণ (৪ জানুয়ারি ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে) তারিখে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। হুগলি জেলার আরামবাগের কাছে গড় মান্দারণ দুর্গের ধ্বাংসাবশেষের মধ্যে একটি সমতলক্ষেত্রে প্রস্তর নির্মিত একটি বৃহৎ সমাধিবেদী আছে, যা বড় আস্তানা নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে ইসমাইল গাজীর মস্তকবিহীন দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল। বাংলাদেশের রংপুর শহর হতে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে কাঁটাদুয়ারির সন্নিকটে ছোট মির্জাপুর গ্রামের বড় দরগায় তাঁর মস্তকটি সমাধিস্থ আছে। এই সমাধিক্ষেত্রে সুলতান হোসেন শাহের আমলে খান আজম নামক কোনো পদস্থ ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু শিলালিপিতে কোনো তারিখ নাই। মুর্শিদাবাদ জেলার চুনাখালিতে পির মসনদ আউলিয়া ও পির মখদুম শাহের দরগা ও কবর আছে। এইস্থানে গৌড়ের সুলতান ২য় মহম্মদ শাহ ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

গৌড় শহরের প্রাসাদ সংলগ্ন বাইশগজী প্রাচীরের পাশে বাঙ্গলাকোট নামে পরিচিত অংশে একটি বড় তেঁতুলগাছের কাছে দুটি কবর ছিল। মুন্সী ইলাহী বক্সের বিবরণ থেকে জানা যায়

যে, বড় কবরটি ছিল সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং অপরটি ছিল তাঁর প্রধানা বেগমের। তবে মতান্তরে দ্বিতীয় কবরটি সুলতান নসরৎ শাহের সমাধি বলা হয়। যে বৃহৎ কালো পাথরটি হোসেন শাহের সমাধির উপর চাপা দেওয়া ছিল সেটি কোনো সময়ে নিকটবর্তী খিরকীগ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সম্ভবত ধনদৌলতের আশায় দস্যুগণ কর্তৃক কবর খোঁড়াখুড়ির ফলে সমাধিগুলি বিনষ্ট হয়ে গেছে। সমাধিবেদীটি একসময়ে নানা রঙের ইটের দ্বারা সজ্জিত ছিল। সমাধির উত্তরভাগে একটি মসজিদ আছে। এই বৃহৎ সমাধি চত্বরে প্রায় শতাধিক কবর ছিল, যার অধিকাংশই হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের পরিবার পরিজনদের বলে অনুমান করা হয়।

মালদহ শহরে একটি সমাধি চত্বর 'দরগা-ই আউলাদ সুলতান আদম বালকি' নামে পরিচিত। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহের আমলে মজলিস রাহাৎউল্লাহ্ নামে একজন পদস্থ আমির উক্ত দরবেশের সমাধিভবন ও মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। মালদহ শহরের মোনাতলি বা মৌলানাতলি মহল্লায় পির সুলতান শিহাবুদ্দীনের সমাধি আছে। উক্ত সমাধির পাশে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একটি মসজিদ দেখা যায়। ওয়েস্টম্যাকট সাহেব শহরের দক্ষিণ প্রান্তে শেখ নঙকাপতি সাহেবের সমাধিলিপি আবিষ্কার করেছিলেন। শিলালিপিতে খোদিত আছে যে, সমাধি ও সংলগ্ন মসজিদটি সুলতান নসরৎ শাহের রাজত্বকালে মজলিস করার তুর্ক-এর পুত্র খলপ খান কর্তৃক ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

নবদ্বীপ শহরের বিপরীত ভাগে বামুনপুকুর মৌজায় সুলতান হোসেন শাহের আমলে নবদ্বীপের কাজীর সমাধি সাধারণকে দেখানো হয়। অনেকের মতে তিনি চাঁদকাজী নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ব্লকম্যান সাহেবের মতে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মৌলানা সিরাজউদ্দীন। কাজীসাহেবের সমাধি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। প্রথমত প্রশ্ন জাগে যে যে সময়ে বিধ্বংসী বন্যার প্রকোপে প্রাচীন নবদ্বীপের সমগ্র এলাকা ধ্বংস হয়েছিল, সে ক্ষেত্রে কাজীসাহেবের সমাধি কীভাবে রক্ষা পেয়েছিল। যাঁরা এই সমাধিটিকে কাজীসাহেবের বলে প্রচার করেন তাঁরাই দাবি করেন যে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহদেবতা ২৫ ফুট মাটির তলায় আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু ব্লকম্যান সাহেবের মতে কাজীসাহেবের নাম ছিল মৌলানা সিরাজউদ্দীন এবং তাঁর সমাধি ছিল হুগলি জেলার মায়াপুরের সংলগ্ন গ্রামে, যা আধুনিক সার্ভে মানচিত্রে সিরাজবাদ নামে পরিচিত (Survey Map 1930-31)। ব্লকম্যান সাহেব মন্তব্য করেছেন—*'Naira seems to be a mistake of Baira, a large pargana in Hoogli District adjacent to Bhursut. To Baira belongs the little town Mayapur (near Burdwan boundary) where I am told the tomb exists of one Maulana Sirajuddin who is said to have been the teacher of Hussain Shah, king of Bengal.'*। এরূপ মন্তব্যের পর বামুনপুকুরে কাজীসাহেবের সমাধি বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক।

মোগল আমলে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম যে সমাধিগৃহটি নির্মিত হয়েছিল তা বর্ধমান শহরে

পুরাতন চক মহল্লায় অবস্থিত। পুরাতন চকের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে পির বহরাম সমাহিত আছেন। বহরাম সক্কার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বায়াজিদ বিয়াদ-এর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, তুরস্কের তাব্রিজ শহর থেকে শাহওয়ার্দি (বহরামের পূর্ব জীবনের নাম) ও বায়াজিদ আগ্রায় আগমন করেন। শাহওয়াজি আগ্রায় তৃষিত মানুষকে জলদান করতেন। সময়ে সময়ে সম্রাট আকবরও তাঁর কাছে জলপানের নিমিত্ত আসতেন। পরিণত বয়সে সিংহল যাত্রার জন্য তিনি বর্ধমান শহরে আগমন করেন এবং এইখানেই দেহত্যাগ করেন। বহরামকে তদীয় হিন্দু শিষ্য যোগী জয়পালের বাগানে সমাহিত করা হয়েছিল। দরবেশের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর সমাধিগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। সমাধিগৃহের প্রাপ্ত শিলালিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হি. ১০১৫ অব্দে (১৬০৬-৭ খ্রিস্টাব্দে) কর্তৃক প্রদত্ত শিলালিপিতে পির বহরামের জ্যোতির্ময় সমাধির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাজারপুর, আনোয়ারপুর ও ফকিরপুর মৌজা দান করা হয়েছিল। শিলালিপিতে খোদিত আছে—ধন্দে গানে হজরত শাহেন শাহিয়ে অর্থাৎ মহামহিমান্বিত শাহেন শাহের (সম্রাট জাহাঙ্গীর) গৌরব বর্ধিত হউক। সমাধিক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে পির বহরামের ধর্মান্তরিত হিন্দু শিষ্য যোগী জয়পালের সমাধি আছে।

পির বহরামের সমাধিক্ষেত্র অপর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। এই স্থানে রক্ষিত একটি সমাধিকে কেন্দ্র করে উত্তরকালে সারা হিন্দুস্থানে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত কেঁপে উঠেছিল। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পূর্ব নাম ছিল মেহেরউন্নিশা এবং বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু মেহেরউন্নিসার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে লাভ করার জন্য সম্রাট বাংলার সুবাদার কতুবুদ্দীন কোকাকে বর্ধমানে প্রেরণ করেন। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ মোগল সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে শের আফগান যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুত্বরূপে আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই যুদ্ধে কুতুবুদ্দীনও নিহত হয়েছিলেন। শের আফগান বর্ধমান শহরে পির বহরাম সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ আছেন এবং বাংলার সুবাদারও শায়িত আছেন একই সমাধিচত্বরে। শের আফগান নিহত হলে মেহেরউন্নিসা ও তাঁর কন্যা লাডলি বেগমকে রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাতে ফতেপুরসিক্রিতে ইৎমদ-উদ্-দৌল্লার আশ্রয়ে রাখা হয়। উত্তরকালে মেহেরউন্নিসা ভারত সম্রাজ্ঞী নূরজাহান রূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করলেন।

বর্তমানে রাজশাহী জেলার ফিরোজপুরে ছোইসোলা মসজিদের সন্নিকটে শাহ নিয়ামত উল্লাহর মাজার আছে। তিনি শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে নিয়ামতুল্লার মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব সুলতান সুজার বিরুদ্ধে সেনাপতি দিলীর খানকে রাজমহলে প্রেরণ করেন। দিলীর খানের সঙ্গে তাঁর দুই পুত্রও এসেছিল। কিন্তু রক্তবমনের ফলে ফতে খানের মৃত্যু ঘটায় কদমবসুল চত্বরের মধ্যে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ফতে খানের সমাধিভবনটির স্থাপত্যশৈলীতে অভিনবত্ব আছে। সমাধিভবন ওই দোচালা হিন্দু মন্দিরের ন্যায় এবং আনুমানিক ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার বালিঘাটায় সাহ গোলাম হোসেন কুদ্রির

সমাধিলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে—তারিখ হি. ৪৬ অব্দ। অনুরূপভাবে কেবলমাত্র সমাধিলিপি পাওয়া গেছে ইনায়েৎউল্লার—১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে খোরামানবাসী তাহির মহম্মদ-এর নাবালক পুত্রের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার ওই উদ্দেশ্যে কবর নির্মাণ করেন।

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে বরা খাঁ বা বঙ্গ বরাখান সেলিমাবাদের জায়গীরদার ছিলেন। তিনি মনসামঙ্গলের রচনাকার কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বরা খাঁ নিহত হলে কবির গ্রাম ত্যাগের ঘটনা জানা যায়,—

'রণে পড়ে বারাখাঁ বিপাকে ছাড়িয়ে গাঁ
যুক্তি করে জননী জনক।'

চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পুত্র শিবরাম ২০ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর লাভ করেছিলেন এবং ওই দানপত্রের শীর্ষদেশে বরা খাঁর নামোল্লেখ আছে। মোটামুটি এ সকল ঘটনা ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল। বর্ধমান জেলার রায়না থানার অধীনস্থ কোটনিমূল গ্রামে বঙ্গ বরা খান ও তৎপুত্র খানজাদ খানের সমাধি আছে। রাজশাহী শহরে দরগাপাড়ায় শাহ মখদুমের আস্তানা ছিল। তিনি ইরানের শাফাবী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আলীকুলি বেগ নামক পদস্থ ব্যক্তি ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাজার গৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সমাধি গৃহে ফার্সি ভাষায় রচিত শিলালিপি হতে এ সকল কথা জানা যায়। ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে তাণ্ডা শহরে সুলতান সুলেমান কররাণ্য বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করেন এবং তাঁকে রাজধানী তাণ্ডায় সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে তাণ্ডা ও সমাধিবেদী উভয়ই গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত।

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর রহিম খানকে দমনের জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজীম-উন্-শানকে বঙ্গদেশের সুবাদার পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে আজীম-উস্-শান বর্ধমান শহরে অবস্থানরত ছিলেন। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী দলের নেতা রহিম খাঁ সন্ধির অছিলায় সুবাদারের উজির খাজা আনোয়ারকে পাঠান শিবিরের মধ্যে হত্যা করেন। একটি পার্সি বয়াতে খাজা আনোয়ারকে শহিদ বলে গণ্য করা হয়েছে—'আহ্, আনোয়ার শহিদ-ই-আকবর সুদ'। আজিম-উস্-শানের পুত্র ফারুক শাহ সম্রাট হওয়ার পর খাজা আনোয়ার যে স্থানে নিহত হয়েছিলেন তথায় একটি বড় সমাধিসৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর কন্যাবংশীয়দের উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করা হয়েছিল। বর্ধমান শহরে যে স্থানে সমাধিসৌধটি অবস্থিত তা খাজা আনোয়ার বেড় নামে পরিচিত বা বেড়ের নবাববাড়ি বলা হয়। এই চত্বরের মধ্যে পুষ্করিণী, ইমামবাড়া, বাগিচা, মসজিদ, জলটুঙ্গী ও বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্ধমান শহরের বসবাসের সময় (১৬৯৯-১৭০২ খ্রিস্টাব্দে) সুবাদার পুত্র যুবক ফারুখ শাহ বর্ধমানের দরবেশ শেখ বায়াজিদের অনুগ্রহভাজন ছিলেন। তাই সম্রাট হওয়ার পর বর্ধমান শহরের পূর্বপ্রান্তে (বর্তমান অবস্থিতি কালনা রোডের রেলগেট পার হয়ে) সুবিশাল বনমসজিদ ও শেখ বায়াজিদের কবর নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, খাজা আনোয়ার ও শেখ বায়াজিদের সমাধিসৌধ ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির লালকিল্লার অভ্যন্তরে সম্রাট জাহান্দার শাহ্ ও তাঁর উজির জুলফিকার আলি খান নসরৎ জঙ্গকে হত্যা করা হলে জুলফিকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ্ আলম খান প্রাণভয়ে আত্মীয়-স্বজনসহ দিল্লি থেকে পলায়নপূর্বক কাটোয়া শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহ্ আলম নতুন সম্রাট ফারুক শাহের আনুগত্য স্বীকার করায় সম্রাট তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে ১৭ হাজার টাকা ও ১১টি মৌজা দান করায় ওই অর্থের দ্বারা আলম খান কাটোয়া শহরে বাগানেপাড়ায় একটি মসজিদ ও গড় নির্মাণ পূর্বক বসবাস করতেন। আলম খানের মৃত্যুর পর মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মসজিদে প্রাপ্ত ৩টি শিলালিপি হতে জানা যায় হি. ১১২৭ অব্দে নির্মিত হয়েছিল।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁর তৃতীয় পুত্র শাহজাদা মহম্মদ আজম ঢাকা শহরে লালবাগ দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণকার্য অসমাপ্ত রেখে দিল্লি চলে যান এবং সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনকালে তা সমাপ্ত হয়। শায়েস্তা খান ছিলেন নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খানের পুত্র এবং শায়েস্তা খানের কন্যা পীরবেগমের সঙ্গে শাহজাদা মহম্মদ আজমের বিবাহ হয়। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে পরীবেগম বা পরীবিবির মৃত্যু হলে পিতা শায়েস্তা খান লালবাগ দুর্গের মধ্যে সমাধি নির্মাণ করেন। সমাধিসৌধে শিলালিপি আছে। সোনারগাঁও-এর সন্নিকটে হাজীগঞ্জদুর্গের পাশে শায়েস্তা খানের অপর কন্যা বিবি মরিয়ম সমাধিস্থ আছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ শহর মধ্যযুগে বঙ্গদেশ বা সুবা বাংলার শেষ রাজধানী। অতীতের মুক্‌সুদাবাদ নবাব জাফর খান বা মুর্শিদকুলি খানের শাসনকালে মুর্শিদাবাদ নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। এই শহরে বহু পুরাকীর্তি নির্দশন ছড়িয়ে আছে, তন্মধ্যে বাংলার নবাবগণের ও তাঁদের পরিবারবর্গে সমাধি ও সমাধিসৌধগুলি দেখে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলার দেওয়ান জাফর খান ঢাকা থেকে দেওয়ানের সদর কার্যালয় মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করার পর এই স্থানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বিদেশীয়গণের বিবরণ হতে জানা যায় যে, তৎকালে লন্ডন শহর অপেক্ষা মুর্শিদাবাদ শহর অধিক সমৃদ্ধশালী ছিল। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে জাফর খান সুবা বাংলার নায়েব নাজিম বা সুবাদার পদে নিযুক্ত হন এবং ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুপূর্বে তিনি কাটরা নামক বাজারের কাছে একটি সুবৃহৎ মসজিদ ও সমাধির স্থান নির্মাণ করার ইচ্ছায় মুরাদ ফরাস নামক একজন পদস্থ কর্মচারীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। মুরাদ ফরাস এক বছরের মধ্যে নিকটবর্তী হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করে উক্ত উপাদানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। শোনা যায় এই কার্যের জন্য পরবর্তী নবাব মুরাদ ফরাসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কাটরার মসজিদ হল বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ। মসজিদের প্রবেশপথে সিঁড়ির নীচে জাফর খান সমাহিত আছেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে এই স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল, যাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমান দর্শনার্থীদের পদধূলি সমাধির উপর বর্ষিত হয়। রেলস্টেশন হতে ১.৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে

কাটরা মসজিদের অবস্থিতি এবং মসজিদে সন্নিকটে পড়ে আছে 'জাহানকোষা' বা 'জগৎজয়ী' নামক বিখ্যাত কামান। মুর্শিদকুলি খানের একমাত্র সন্তান ও নবাব সরফরাজ খানের জননী আজিমউন্নিসা বেগমের সমাধি কেল্লা থেকে ১ কিলোমিটার উত্তরে শ্যামপুর-হায়দরগঞ্জের সমাধিক্ষেত্রে।

১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলার দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। হাজারদুয়ারির বিপরীত তীরে এবং ডাহাপাড়ার দক্ষিণে রোশনীবাগে তাঁর স্মৃতিসৌধ আছে। সমাধিগৃহটি ৪০'x ৩৮' ফুট আয়তন বিশিষ্ট এবং সমাধিবেদী ১০ ফুট দৈর্ঘ্য। রোশনীবাগের নির্মাতা ছিলেন নবাব স্বয়ং, কিন্তু নবাব আলিবর্দী খান সমাধিগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে সমাধিগৃহের বারান্দায় সুজাউদ্দীনের পালিতা কন্যার কবর এবং রোশনীবাগের দক্ষিণ প্রাচীর গাত্রের কাছে দরবেশ সফীউদ্দীন চিস্তি, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা শায়িত আছেন। মুর্শিদকুলি খানের দৌহিত্র এবং সুজাউদ্দীনের একমাত্র পুত্র সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে) গিরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দী খান কর্তৃক নিহত হলে মৃতদেহ হাতির পিঠে চাপিয়ে গোপনে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের কাছে নাগিনাবাদ নামক আম্রকাননে সেই রাত্রেই সাধারণভাবে সমাহিত করা হয়। অতীতে ওই স্থানে নেকট'খালি নামক একটি প্রাসাদ ছিল। নবাব সরফরাজের সঙ্গে তাঁর সেনাপতি গওস খান এবং মহম্মদ কুতুব ও মহম্মদ পির নামক সেনাপতির পুত্রদ্বয়কে গিরিয়ায় সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু গাওস খাঁর গুরু সা হায়দারী কবর তিনটিকে উত্তোলন কর্তৃক পুনরায় ভাগলপুরে সমাহিত করার ব্যবস্থা করেন।

মুর্শিদাবাদ-এ গঙ্গা পার হয়ে ১ কিলোমিটার দক্ষিণে খোসবাগ উদ্যানের মধ্যে নবাব আলিবর্দী খান ও তাঁর পরিবারস্থ কয়েকজনের সমাধি আছে। সর্বপ্রথম নবাব আলিবর্দীর জননীকে খোসবাগে সমাধিস্থ করা হয় এবং নবাব একটি সুবৃহৎ উদ্যান তৈরি করেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আলিবর্দী ইহলোক ত্যাগ করার পর খোসবাগ উদ্যানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল এবং এই বেদীটি একটি কৃষ্ণপ্রস্তরে আচ্ছাদিত আছে। নবাবের একমাত্র পত্নী বেগম সরফউন্নিসার কবর আছে নবাবের দক্ষিণে। সিরাজের ভ্রাতা মীর্জা মহম্মদকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর এই চত্বরের মধ্যে সমাহিত করা হয়েছিল। সে সময়ে তিনি ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র। এইস্থানে ১৯টি কবরের সকলের পরিচয় জানা যায় না। তবে আলিবর্দীর তিন কন্যার সমাধি খোসবাগে নেই। জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম ও কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমকে (সিরাজদৌল্লার মাতা) ঢাকা শহরে বন্দি অবস্থায় অবস্থানের সময় মিরণের আদেশে জলে ডুবিয়ে (কথিত আছে নৌকার তলা ফুটো করে) হত্যা করা হয়। আলিবর্দীর মধ্যম কন্যা ময়মানা বেগম ও তৎপুত্র শওকৎ জঙ্গ বিহারের পূর্ণিয়ায় বসবাস করতেন এবং সেখানে তাঁদের মৃত্যু হয়। এই উদ্যানের পশ্চিমপ্রান্তে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি আলিবর্দী নির্মাণ করিয়েছিলেন।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন বৃহস্পতিবার। মীর্জাফর ও অন্যান্যদের চক্রান্তে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজদৌল্লা বেগম লুৎফান্নেসা সহ ছদ্মবেশে পলায়ন করেন। ৩০ জুন রাজমহলের

কাছে দানা শাহ নামক এক ফকির মিরণের চরদের কাছে ছদ্মবেশী নবাবের পরিচয় জ্ঞাপন করায় সিরাজকে বন্দি করে ২ জুলাই মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয় এবং জাফরগঞ্জে মীর্জাফরের প্রাসাদে বন্দি করে রাখা হয়। মুর্শিদাবাদের নিজামত কেল্লা থেকে ১.৫ কিলোমিটার উত্তরে জাফরগঞ্জ প্রাসাদের অবস্থিতি এবং এই প্রাসাদেই ক্লাইভের সঙ্গে মীর্জাফরের গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জুলাই শনিবার মধ্যরাত্রি। প্রাসাদের মধ্যে বন্দি অবস্থায় হতভাগ্য সিরাজদৌল্লাকে মিরণের আদেশে মহম্মদী বেগ (একদা নবাব আলিবর্দী কর্তৃক অনুগৃহীত) ছুরিকাঘাতে নিহত করেন। ৩ জুলাই সকালে সিরাজের খণ্ডখণ্ড দেহ হাতির পিঠে চাপিয়ে মুর্শিদাবাদ শহর প্রদক্ষিণ করানোর পর খোসবাগে অতি সাধারণভাবে মাতামহের পাশে সমাহিত করা হয়। সিরাজদৌল্লাকে যে স্থানে হত্যা করা হয়েছিল তা রেলিং দিয়ে ঘেরা আছে। বেগম লুৎফান্নেসা সিরাজ ও আলিবর্দীর সমাধির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে বেগমের মৃত্যুর পর সিরাজের সমাধির কাছে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, জাফরগঞ্জের প্রাসাদে মীর্জাফরের আদেশে মিরণ মীর্জা মহম্মদকে দুটি কাঠের তক্তার মধ্যে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেন, যাতে আলিবর্দীর একমাত্র উত্তরাধিকারীর কোনো দাবি না থাকে।

মুর্শিদাবাদ শহব থেকে ১ কিলোমিটার দক্ষিণে মতিঝিল নামক উদ্যানে আলিবর্দীর জেষ্ঠ্য ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওজেন মহম্মদ ও তাঁর পালিত পুত্র আক্রাম-উদ্-দৌল্লার সমাধি আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগর রেলস্টেশন হতে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে ফরিদপুরে অবস্থিতি। পলাশীর যুদ্ধের অন্যতম নায়ক ও নবাব সিরাজদৌল্লার একান্ত অনুগত সেনাপতি মীরমদনের সমাধি আছে ফরিদপুর গ্রামে। মীরমদনের শেষ ইচ্ছানুসারে পির ফরিদ সাহেবের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধে নিহত বহু ইংরাজ সৈন্যের সমাধি ছিল ফরিদপুরের কাছে দাদপুর গ্রামে। আর মীর্জাফরকে কবর দেওয়া হয়েছিল কুখ্যাত জাফরগঞ্জ প্রাসাদ অঙ্গনে এবং তাঁর পত্নী মণিবেগম ও বব্বু বেগমের সমাধি আছে প্রাসাদ চত্বরে। মীরণ নিহত হয়েছিল ইংরেজদের কুটকৌশলের দ্বারা। মীরকাশিম খানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্য মীরণকে জীবন দিতে হল। প্রচার করা হল যে বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু ঘটেছে। রাজমহলে সরিফাবাজারে তাঁর কবর আছে।

মধ্যযুগের প্রথম বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনাকার গোলাম হোসেন সলিমের সমাধি বিষয়ে প্রবন্ধে উপসংহারে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। গোলাম হোসেন সলিম ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' রচনা করেন। ইতিপূর্বে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে গোলাম হোসেন তাবাংবাই 'সিয়র মুতাক্ষরিণ' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অনেকে সিয়র মুতাক্ষরিণের রচনাকারকে বাংলার প্রথম ইতিহাস রচনাকার বলে শিরোপা দিয়েছেন। মনে হয় এরূপ উল্লেখে রিয়াজ-উস-সালাতিনের গ্রন্থাকারের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'-এর গ্রন্থকাব গোলাম হোসেন সলিম জিয়াদপুরী অযোধ্যার অধিবাসী

ছিলেন এবং কর্মসূত্রে তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন। পরিণত বয়সে তিনি মালদহ শহরে বসবাস করতেন বলে জানা যায় এবং মালদহ রেশমকুঠিতে ডাক মুন্সীর পদে নিযুক্ত হন। তাঁর সাহিত্য ও ইতিহাস জ্ঞানে প্রীত হয়ে ওই রেশমকুঠির অধ্যক্ষ জর্জ উডনী বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনার জন্য অনুরোধ করেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে, গোলাম হোসেন সলিম পার্সি ভাষায় 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' বা সুলতানদের উদ্যান (gardens of the sultans) রচনা করে ইকতিয়ার-উদ্-দীন বখতিয়ার খলজীর নোদিয়াহ বিজয় হতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ মধ্যযুগের ৫৬২ বছরের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এদেশে বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ তাঁর গ্রন্থ থেকে বহু তথ্যসূত্র গ্রহণ করেছেন। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে গোলাম হোসেন তাবাৎবাই-এর সিয়র মুতাক্ষরিণ গ্রন্থে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭০-৭২ বছরের ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু রিয়াজ-উস্-সালাতিনের লেখক সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনা আর মুর্শিদাবাদের নবাবগণের ইতিহাসকে একই দৃষ্টিকোণে বিচার করা উচিত নয় এবং বঙ্গদেশের প্রথম ইতিহাস রচনাকার রূপে গোলাম হোসেন সলিমের সম্মান পাওয়া উচিত।

গোলাম হোসেন সলিম মালদহ শহরের সার্কিট হাউসের কাছাকাছি যে নীলকুঠি ছিল যেখানে বসবাস করতেন, যা বর্তমানে C.M.O. (H) অফিসে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রথম ইতিহাস লেখকের মৃত্যুর পর ইংরেজ বাজারের মীরচক এলাকায় ফুন্দন মসজিদের সম্মুখে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। বর্তমানে একটি আবেষ্টনীর মধ্যে সমাধিবেদী সুন্দরভাবে সংস্কার করা হয়েছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের নেতৃত্বে মালদহের জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কাজটি সম্পন্ন করেন। শিলালিপিতে খোদিত আছে — 'The Munshi left the world' (1233 A.H : 1818 A.D.).

গ্রন্থপঞ্জী

১. History of Bengal, Vol. 2,Ed. Sir Jadunath Sarkar, Dacca, 1948.
২. Inscriptions of Bengal, Vol. IV - Samsud-din Ahmed, Rajshahi, 1960.
৩. Tabkat-i-Nasiri-Eng. Iran. & Ed. I.N. Resurty, Calcutta, 1880.
৪. Contributions to the Geography and Ristory of Bengal, Calcutta, 1968, H. Blochmann.
৫. Memoirs of your and Pandua–Abid Ali Khan, Calcutta, 1931.
৬. Report of a Tour in Bihar and Bengal, Vol. XV–Sir Alexender Cunningham, New Delhi, 2000.
৭. History of Bengal–Charls Stuart, Calcutta, 1903.
৮. Riyazu-s-Salatin–Eng. Tram & Ed. Abdus Salam, Calcutta, 1903
৯. The Seir-Mutagherin (in 4 Vols.)–Eng. Tran Raymond, Calcutta, 1902.

১০. ইসলামের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—সৈয়দ আবদুল হালিম, কলকাতা, ১৯৮০।
১১. তবকাত-ই-নাসিরী—বা.অনু. আবুল কালাম মোহম্মদ যাকারিয়া, ঢাকা, ১৯৮৩।
১২. বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল—ড. আবদুল করিম, ঢাকা, ১৯৭৭)
১৩. বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)—ড. সুশীলা মণ্ডল, কলকাতা, ১৯৬৩।
১৪. বাঙলাদেশের প্রত্ন সম্পদ—আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ঢাকা, ১৯৮৪।
১৫. গৌড়ের ইতিহাস (নূ.সা.)—রজনীকান্ত চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৯৯৯।
১৬. বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খণ্ড)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৭১।
১৭. বাংলার মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব—সুখময় মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮৮।
১৮. সুলতানী আমলে দু'শ বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮৮।
১৯. মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়, কলকাতা, ১৯৮৩।
২০. মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—নিখিলনাথ রায়, কলকাতা, ১৩০৯।
২১. বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য় ও ৩য় খণ্ড)—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, কলকাতা, ১৯৯১ ও ১৯৯৪।
২২. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি—প্রদ্যোত ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯৭।
২৩. পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ : মুর্শিদাবাদ—বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮২।
২৪. বাঙ্গালার ইতিহাস—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা - ১৩১৫।
২৫. ইতিহাসের আলোকে গড়মান্দারন—ড. গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান, ১৩৯৬।
২৬. কৌশিকী পত্রিকা (নব পর্যায়), কলকাতা, ১৯৯৫।


স্কেচ : পার্থ ভট্টাচার্য

❑ লেখক পরিচিতি : প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার।

সৎকার—সদ্‌গতি : শাস্ত্রীয় ও লৌকিক প্রথা

শিবেন্দু মান্না

'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?'

আমাদের দেশে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হলে পরিবারের গণ্ডির মধ্যে পালিত হয় জাতক-অশৌচ; আবার যখন পরিবারের কোনো সদস্য চিরবিদায় গ্রহণ করেন অর্থাৎ পরিবারের কোনো সদস্যের মৃত্যু ঘটলে পালিত হয় মৃতাশৌচ। আত্মীয়ের জন্মজনিত বা মৃত্যুজনিত দেহাশুদ্ধির প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে অশৌচ (সংস্কৃত ন + শৌচ = দেহগত শুচিতার অভাব: গ্রাম্যভাষায় বলা হয়, অশুধ হওয়া)। এই প্রথার প্রচলন রয়েছে এদেশের হিন্দুদের মধ্যে। এর অর্থ হচ্ছে, হিন্দু সমাজভুক্ত কোন পরিবারে, কোনো আত্মীয়ের জন্ম অথবা মৃত্যুজনিত কারণে দেহাশুদ্ধি একটা আবশ্যকীয় শাস্ত্রীয় প্রথা ও লৌকিক আচার।

এই দেহাশুদ্ধির কথা বহুক্ষেত্রে লোকাচার ও জাতিভেদে এবং এলাকাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

হিন্দুদের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মৃত্যু-পরবর্তী কয়েকটি প্রথা

এইক্ষেত্রে আচরণীয় শাস্ত্রীয় প্রথার উৎস হচ্ছে, স্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (খ্রি. ১৫ শতক) বিরচিত ''শ্রাদ্ধতত্ত্বম্'' এবং ''শুদ্ধিতত্ত্বম'' আর শূলপাণি রচিত ''শ্রাদ্ধ বিবেক'' প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে বর্ণিত নির্দেশাবলী।

স্মার্তপণ্ডিত রঘুনাথ রচিত 'শ্রাদ্ধতত্ত্বম' অনুসারে শ্রাদ্ধ বলতে বোঝায়, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভরে কিছু দান করা। প্রকৃতপক্ষে, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া বা মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের নিমিত্ত যে ধর্মাচরণ তার অনেক কূটকচাল, বিতর্ক রয়েছে—বিতর্ক রয়েছে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের রীতিনীতি নিয়ে, এমনকী 'শ্রাদ্ধ'র সংজ্ঞা নিয়েও কূট তর্ক রয়েছে। —যেমন, একটা মত হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে কোনো দ্রব্যের স্বত্ব-স্বামীত্ব ত্যাগ করা থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ কর্তৃক গৃহস্বামীর ওই সকল ত্যক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করা পর্যন্ত যাবতীয় ধর্মীয়/শাস্ত্রীয় আচরণকেই বলা হবে 'শ্রাদ্ধকর্ম'। কিন্তু 'শ্রাদ্ধাবিবেক' রচয়িতা 'শূলপাণি' প্রশ্ন তুলেছেন, শ্রাদ্ধকর্মের ভোজ্যদ্রব্যাদি বা অন্নাদি কেন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদেরই দান করতে হবে? শূলপাণি-র মতে, শ্রাদ্ধে প্রদত্ত দ্রব্য বা ত্যক্ত দ্রব্যাদি, অগ্নি কিংবা জলে অথবা যে-কোনো প্রাণীকেই দেওয়া যেতে পারে—এতে আপত্তি কোথায়? ফলে শূলপাণি শ্রাদ্ধ সম্পর্কে একটা সংজ্ঞা দিলেন এইভাবে : 'সম্বোধনপদোপনীতান্ পিত্রাদীন চতুর্থ্যন্তপদেনোদ্দিশ্য হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্''—অর্থাৎ, সম্বোধন পদ দ্বারা আহুত উপস্থিত পিত্রাদির আত্মাকে চতুর্থী বিভক্তি-অন্ত পদের সাহায্যে হবিত্যাগের নাম হল শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধ অর্থাৎ মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের শাস্ত্রীয় রীতিনীতি ও তার কূটকচাল ব্যাখ্যার অরণ্যে পথ না হারিয়ে, বরং জিজ্ঞাসা করা যাক্—'শ্রাদ্ধ' কত রকমের হতে পারে? এখানেও বলা বাহুল্য, পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, শ্রাদ্ধ বারো রকমের হয়ে থাকে। তবে 'নির্ণয় সিন্ধু' প্রণেতা কমলা করের মতে, শ্রাদ্ধ চার প্রকার। যথা—(১) পার্বণ (২) একোদ্দিষ্ট (৩) বৃদ্ধি এবং (৪) সপিণ্ডীকরণ। সপিণ্ডীকরণ এক অর্থে পার্বণ ও একোদ্দিষ্টের সমাহার।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় রয়েছে। যথা—(১) পিণ্ডপ্রদান, (২) পিণ্ডদান, (৩) ব্রাহ্মণভোজন, (৪) জ্ঞাতি-কুটুম্ব ভোজন ইত্যাদি।

শ্রাদ্ধকর্মের জন্য উপযুক্ত স্থান সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নির্দেশ হচ্ছে—(১) নদী তীর, (২) নদীর সঙ্গমস্থল (৩) নদীর উৎপত্তিস্থল, (৪) তীর্থস্থান, (৫) গয়া তীর্থ, (৬) কুরুক্ষেত্র তীর্থ, (৭) প্রয়াগ তীর্থ, (৮) পুষ্কর তীর্থ, (৯) পর্বতের সানুদেশ (১০) গোময় লিপ্ত গৃহ ইত্যাদি হচ্ছে উপযুক্ত স্থান।

শ্রাদ্ধদিবসে ও তার পূর্বদিনগুলিতে শ্রাদ্ধকারীর ও তার পরিবারের করণীয় হল নখচ্ছেদন ও ক্ষৌরকর্ম সাধন, ইন্দ্রিয় সংযম, সারাদিনে একবারমাত্র হবিষ্য গ্রহণ, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও আত্মীয়বর্গকে আমন্ত্রণ করা ইত্যাদি।

শ্রাদ্ধকর্মে নিমন্ত্রিত হওয়ার অধিকারী কারা হতে পারেন, সে সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নির্দেশ হচ্ছে : "সৎকর্মশালিত্বম" অর্থাৎ যিনি সৎকর্ম করে থাকেন; "বিশুদ্ধমাতাপিতৃকত্বম্" অর্থাৎ যাঁদের পিতা-মাতা পুণ্যাদি অর্জন করেছেন; এছাড়া, শাস্ত্রজ্ঞানী ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, শ্রাদ্ধকারীর দৌহিত্র জামাতা ও ভাগিনেয় প্রমুখ শ্রাদ্ধকর্মে নিমন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য।

শ্রাদ্ধকর্মের প্রশস্ত সময় সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নির্দেশ হচ্ছে : মাতৃশ্রাদ্ধ—পূর্বাহ্নকাল; পিতৃশ্রাদ্ধ—অপরাহ্নকাল, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—প্রাতঃকাল।

শ্রাদ্ধকর্মে লোকাচার ও লৌকিক প্রথা

শাস্ত্রীয় নির্দেশের পাশাপাশি, আমাদের দেশে, লোকাচার, লৌকিক প্রথার গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও জাতিবিশেষ বা এলাকাবিশেষে লৌকিক প্রথা অনুসরণের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়।

হাওড়া জেলায় মাহিষ্য জাতিবর্গের মধ্যে অনুসৃত কয়েকটি প্রথা আমার নজরে এসেছে।

মৃতদেহ বাড়ি-ঘর বের করে নিয়ে আসার সময় মাথার দিকটা থাকে ঘরের পানে। মৃতদেহটিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে (তুলসীতলায়) শোয়ানো হয় তুলসীগাছের দিকে মৃতের মাথা রেখে। মৃতদেহটিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে দেওয়া হয় একটি তুলসীগাছ এবং সেটি থাকে মৃতের মাথার একপাশে। তাছাড়া মৃতদেহের কোলের পাশে দেওয়া হয় একটি কলার মোচা।

মৃতদেহের সঙ্গে তুলসীগাছ দেওয়ার ব্যাখ্যা সহজবোধ্য—তুলসী, ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক—বিষ্ণুলোকে মৃতের স্থান হবে, তাই সপত্র তুলসীগাছ সঙ্গী হল মৃতের। কিন্তু কলার মোচা

দেওয়ার অর্থ কী হতে পারে? —এর ব্যাখ্যা হল, মোচার ক্ষেত্রে যেমন পরতে পরতে ফুল থেকে ফল ধরে, তারপর প্রাকৃতিক নিয়মেই ফল ধরা বন্ধ হয়ে যায়, একদিন গাছটি হয়ে যায় নিষ্ফলা—মানুষের জীবনও সেইরকম নিষ্ফলা বা মূল্যহীন হয়ে পড়ে অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে কোনো একদিন, জীবনের তাৎপর্য যায় হারিয়ে।

শ্মশানঘাটে 'মৃতদেহ' উপস্থিত হলে প্রথমে 'মড়িপোড়া' ব্রাহ্মণের সাহায্যে পিণ্ডদান পর্ব সমাধা হয়, তারপর মৃতের মুখাগ্নি ইত্যাদি সম্পন্ন করতে হয়। দাহকাজ সম্পূর্ণ হলে মৃতের অস্থি বা নাভিকুণ্ডলী গঙ্গা বা অন্য কোনো পবিত্র নদীতে বিসর্জন দিতে হয়। মৃতের পুত্র শ্মশানঘাট বা কোনো পবিত্র জলাশয়ে শুচিস্নান সেরে নববস্ত্র পরিধান করে, গলায় লোহার চাবিসহ উত্তরীয়/উত্তীয় ঝোলায়।

শ্মশান, সাধারণ কোনো নদীতীরে অথবা জলাশয়ের তীরে হয় বলেই, চলিত ভাষায় মৃতদেহ দাহ করার স্থানকে বলা হয় শ্মশানঘাট। শ্মশানঘাটে জলের প্রয়োজন হয় মৃতদেহ দাহ করার পর চিতাগ্নি নেভানোর জন্য। চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার স্থানকে বলা হয় ''কুয়ে''। চিতাগ্নি নিভে গেলে, প্রচুর পরিমাণ জল ঢেলে আগুন নেভানোর পর অবশিষ্ট কাঠকয়লাগুলিকে দিয়ে একটা মানুষের আকার দেওয়া হয়, তারপর ওই মনুষ্যাকৃতি 'নকশা'র উপর দুধ মিশ্রিত গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। লোক প্রচলিত ধারণা যে, পরবর্তী জন্মে ভস্মীভূত মানুষটি সদ্‌বংশে জন্মাবে, ও গায়ের রং হবে ফরসা।

দাহকাজের পরদিন থেকে পরবর্তী দশ-বারো দিন মৃতের উদ্দেশ্যে অন্ন-জল দেওয়ার রীতি রয়েছে—এই কারণে গৃহ-সংলগ্ন কোনো জলাশয়ের তীরে অথবা গৃহস্থের আঙিনার একপাশে মাটিতে পোঁতা হয় একগোছা বেনাঘাস—তারপর ওই বেনাতলি গোবর দিয়ে নিকিয়ে কলাপাতায় হবিষ্য ও মাটির গেলাসে জল দেওয়া হয়। এসব ভোগে লাগে কাক-পক্ষীদের-উচ্ছিষ্ট জলে ফেলে দেওয়া হয়। প্রতি সন্ধ্যায় বেনাতলিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হয়। ধারণা করা হয় যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা স্বাভাবিক অবস্থায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করতে না পেরে বেনাগাছতলিতে আশ্রয় নিয়েছে—তাই তাকে দেওয়া খাদ্যদ্রব্য, ধূপ-দীপ প্রভৃতি।

মৃতদেহ দাহ করে শ্মশানঘাট থেকে ঘরে ফিরে এলে প্রথমে অগ্নিশুদ্ধ হতে হয় সকলকে, লৌহদ্রব্য স্পর্শ করে 'দোষ' কাটাতে হয়, তারপর নিমপাতা, ভিজে ছোলা ও জল-বাতাসা খেতে হয় এবং মৃদু স্বরে ''হরিধ্বনি'' দিতে হয়। এরপর নির্দিষ্ট দিন অন্তে ক্ষৌরকর্ম, পরদিবসে শ্রাদ্ধ তারপরের দিবসে 'নিয়মভঙ্গ' অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনে প্রবেশাধিকার ঘটে।

শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, অর্থকৌলীন্য অনুসারে তিন প্রকার শ্রাদ্ধকর্ম হয়ে থাকে — (১) তিল কাঞ্চন, (২) ষোড়শ, (৩) বৃষোৎসর্গ। বলা বাহুল্য, বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ।

অন্ধকার থেকে আলোকের পথে যাত্রা

অমরত্ব বা অমরতা বলে পৃথিবীতে কিংবা মানুষের মৃত্যু-পরবর্তীকালের জগতে সত্যিই কিছুর

অস্তিত্ব আছে কিনা, জানা নেই; তবে দেহ থাকলে দেহীর জীবনাবসান যেমন ধ্রুব সত্য, তেমনি সত্য মানুষের অমরত্বলাভের বাসনা।

সাধারণভাবে অমরত্ব বললে যদি বোঝায় যে, উত্তরপুরুষ বা অধস্তন বংশধররা মৃত। প্রয়াত ব্যক্তিটিকে স্মরণে রাখবে, তাহলে দেখা যাবে যে, হাওড়া জেলার মাহিষ্য জাতিবর্গ একটা বিচিত্র প্রথা এ বিষয়ে অবলম্বন করে থাকেন।

মৃত ব্যক্তির অস্থি-অবশেষ একটি মাটির কলসিতে ভরে, তারপর সেটি গঙ্গা-মাটি দিয়ে ভর্তি করে একটি উন্মুক্ত স্থানে রেখে, তার উপর 'স্মৃতিসৌধ' নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ওই স্মৃতিসৌধে একটি তুলসী বৃক্ষ স্থাপন করা হয়, তারপর প্রতি সকাল/সন্ধ্যায় জল দিয়ে সৌধটি পরিষ্কার করার পর, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। স্মৃতিসৌধের গাত্রে মৃত ব্যক্তির নাম, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ ইত্যাদি সহ মার্বেল ফলক লাগানো হয়—বহু ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী প্রমুখের নাম তালিকাও দেওয়া হয়ে থাকে। এর ফলে মৃত ব্যক্তির পরিচয় বহুকাল ধরে অধস্তন বংশধরদের স্মরণে রাখারও সুবিধা হয়ে থাকে। হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে শ্মশানঘাটে, নদীতীরে এ ধরনের নূতন ও পুরাতন স্মৃতিসৌধ প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। এই বিচিত্র প্রথা সম্পর্কে "হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার" (খ্রি: ১৯৭২) গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে : "A quaint practice of the Mahisyas of the district is to cremate their dead on homestead land or in fields close to the villages and erect small memorial pillars or temples on the spot with the names and dates of birth and demise of the deceased inscribed on them. Some other castes have also taken to this practice now." (P -133)

আলোকতীর্থের পথে নিঃসঙ্গ এক পথিকের যাত্রা

পরিশেষে বলি, কান্না-হাসি, দুঃখ-সুখ, মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি উপচার দিয়ে তিল তিল করে গড়া, আমাদের প্রিয় পরিবার-পরিজনে ভরা পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা কারই-বা হয়? মুমূর্ষু ব্যক্তির চোখের তারায় যে আকুলতা-ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে, তার ভাষ্যপাঠ বড় কঠিন। মনে মনে কেউ কি ভাবেন যে, এই জীবনই শেষ নয়, —আমার জন্য অপেক্ষা করছে ভিন্ন এক জগৎ, অন্য এক জীবন, বিচিত্র এক দিব্যলোক,—যেখানে রয়েছেন আমার/আমাদেরই পূর্বপুরুষেরা—আমাদের পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রমুখেরা—তাঁরাই আমাকে অন্ধকার থেকে আলোকতীর্থে নিয়ে যাবেন? বোধহয়, এমন একটা ভাবনাই দেখা দেয় মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের মনে—তাই তাঁর আর নিঃসঙ্গ পথিক বলে নিজেকে মনে হয় না—নির্ভয়ে যাত্রা করে ভিন্ন এক লোকে, অপর এক জগতে।

❑ লেখক পরিচিতি : তারাপদ সাঁতরার প্রিয় শিষ্য, সহযোদ্ধা, গ্রন্থ প্রণেতা, গবেষক।

খ্রিস্ট জনসমাজের সমাধি প্রসঙ্গ

শ্রীহর্ষ মল্লিক

এক

'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে/তিন বিধাতা নিয়ে'-জীবনচর্যার এই তিনটিই যদি প্রধান হয়, তবে তার লোকাচার-লোকপ্রথা-লোকবিশ্বাস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণও তবে এক নির্দিষ্ট লোকজীবনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের অন্যতম মাপকাঠি হতে পারে। এ বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য হল, জন্মকালীন বা মৃত্যুকালীন প্রথা-আচারগুলি সেই ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেই ঘটে থাকে —শুধুমাত্র মধ্যপর্যায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানটিই হয় তার উপস্থিতিতে। এমনকী জন্মকালীন প্রথা-আচার সম্বন্ধ ব্যক্তি হয়তো পরে কিছু জানতে পারে তার বয়সকালে। এবং মৃত্যু-পরবর্তী লোকাচারগুলিও অনুরূপভাবে সে পরোক্ষভাবে দর্শন করে।

এদেশে খ্রিস্টান জনসমাজের বসবাস বহুদিনের—এমনকী সম্রাট আকবরের সময়ে জেসুইট ধর্মপ্রচারকদের ভারতে আগমন এ সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক দলিল বলে গণ্য হতে পারে। দক্ষিণ ভারতে পশ্চিম উপকূলে কেরালা প্রভৃতি অঞ্চলে একশ্রেণির খ্রিস্টান মিশনারির আগমন ও ধর্মপ্রচার কাহিনিটি এ প্রসঙ্গে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। পরন্তু খ্রিস্টশিষ্য সাধু টমাস যে মাদ্রাজ অঞ্চলে এসেছিলেন — এই ঘটনাটি আজ প্রায় কিংবদন্তীরূপে বিভিন্ন জন উল্লেখ করেছেন। এরপর ভারতের ইতিহাসে বৃটিশ যুগের কথা এখন স্মরণকালের মধ্যেই পড়ে এবং এর পরবর্তী কাহিনিও এখন সর্বজনবিদিত।

দীর্ঘদিন ধরে এই জনগোষ্ঠী ভারতে আছেন—বঙ্গদেশেও তার প্রসার নিতান্ত কম নয়। খ্রিস্টকেন্দ্রিক নানা উৎসব-লোকাচারে এই জনসমাজ আজ ভারতের সংস্কৃতিতে নিজেদের একটি স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে নিয়েছেন। ভারতের নানা ধর্মের পটভূমিতে তাই খ্রিস্টানদের নানা প্রথা-লোকাচার আজ অনেকের কাছেই পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষত জাতীয় সংহতির পক্ষেও তা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এই সূত্রে এই জনসমাজের মৃত্যু-পরবর্তী প্রথা আবার তাই বৃহত্তর সমাজের পটভূমিতে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যময় বলে মনে হবে। বিশেষত সংবাদপত্রের ও অন্যান্য নানা মাধ্যমে 'কফিন' শব্দটি আজ এত বেশি ব্যবহার হচ্ছে, বাংলা বাক্যের গঠনে এক বিশেষ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করার জন্য 'কফিন' শব্দটি এক বিচিত্রভাবে অর্থবহ রূপে প্রয়োগ করা হয়েছে এই সমাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানানোর এটিই হল প্রকৃষ্ট সময়।

এই জনসমাজে সমাধি প্রথার অন্তিম পট হল কফিনের ব্যবহার। প্রাক-খ্রিস্ট যুগ বা খ্রিস্টোত্তর যুগের কোনো প্রকার প্রথাই এখন আর অনুসৃত হয় না। মূলত প্রাকৃতিক, পারিবেশিক, জনস্বাস্থ্য, দেশীয় রীতি প্রভৃতি কারণের জন্যই তা পরিবর্তিত হয়েছে—বৈদেশিক প্রভাবও তার একটি গুরুত্বপূর্ণ

কারণ। তবু পৃথিবীর খ্রিস্ট জনসমাজে আবহমান কাল ধরে প্রচলিত 'কফিন ব্যবস্থা' সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন এইজন্যই যে অচিরেই এই প্রথা উচ্ছেদের কোনো ইঙ্গিত দেখা যায় না। বরঞ্চ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতির আশ্রয় না নিলে কার্যোদ্ধার হয় না—তা-ও ইদানীং গণ-মাধ্যমগুলিতে বেশ প্রচারিত হতে দেখা যায়।

খ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্বে ভিন্নধর্মী এক অন্ত্যেষ্টি প্রথার উল্লেখ দেখা যায় বাইবেলে —অবশ্যই তারা খ্রিস্ট জনসমাজের নয়, ইহুদি ধর্মের। তবে পরবর্তী উদ্ধৃতি থেকে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সেটি বোধহয় 'ম্যমি' পদ্ধতিরই একটি প্রকরণ : 'যোষেফ একশত দশ বছর বয়সে মরিলেন; আর লোকেরা তাহার দেহে ক্ষয় নিবারক দ্রব্য দিয়া তাহা মিশর দেশে এক শবাধারের মধ্যে রাখিল।' 'ক্ষয় নিবারক দ্রব্য' ধারণাটি এখানে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রথা সম্বন্ধে একালের বাইবেল টীকাকার বলছেন :

সম্ভবত এটি সেই প্রকারের কোনো বাক্স - যা সে যুগে 'ম্যমি বক্স' (Mummy Box) নামে অভিহিত হত। কেননা নৃতাত্ত্বিকগণের মতে 'কফিন' শিল্প বা প্রথা ইস্রায়েলীয়দের কাছে অজ্ঞাত ছিল। তারা বড়জোর একটি সমান কাঠের তক্তায় দেহটি বিছিয়ে তাকে সমাধিস্থ করত। বাইবেলীয় চরিত্রদের মধ্যে বহুখ্যাত ও উল্লেখিত চরিত্র হলেন যোষেফ —তাঁর মৃত্যু হয় মিশর দেশে। তাঁর শবদেহ যে উপরোক্ত মতে সমাহিত করা হয়েছিল তার একমাত্র কারণ বোধহয় সে দেশীয় লোকাচার। তবু উল্লেখযোগ্য যে মিশরীয়েরা একজন বিদেশি ও বিধর্মী ব্যক্তিকেও তাদের দেশীয় প্রথায় সমাধি দিয়েছিল—এ বিষয়ে তারা কোনো ভিন্ন প্রথা অবলম্বন করেনি।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে বাইবেলোক্ত উদ্ধৃতিতে 'শবাধার' বস্তুটি তাহলে কী? গ্রিক শব্দ 'KOPHINOS' থেকে উদ্ভূত হয়েছে খ্রিস্টীয় 'কফিন' শব্দটি। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'BASKET' বা চলতি ভাষায় 'পেটিকা'— অবশ্য বাস্কেট এখন একটি প্রচলিত বাংলা শব্দই এবং সাহিত্যগতভাবে তার সমার্থক শব্দ হল 'A raised crust, like the lid of a basket.'

সমাধিদান প্রথা এ দেশে আরও কোনো কোনো জনসমাজে প্রচলিত আছে যে সব সম্প্রদায়ের কথা এখানে আলোচিত হবে না। স্পষ্টতই এখানে মুসলমান সমাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতি এবং হিন্দু সমাজের দু-একটি শাখা গোষ্ঠীর অন্তিম ধর্মাচার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। বৃহদর্থে এগুলি সবই সমাধিপ্রথা বলে পরিচিত হতে পারে। তবে আলোচনার প্রসারকালে বোঝা যাবে—এগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কীরূপ এবং কেন খ্রিস্ট জনসমাজের কথাই এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করা হল।

যে ধর্মাচার বা ধর্ম যত প্রাচীন হয়ে ওঠে, তার মধ্যে তাত্ত্বিক বাঁধন তত শিথিল হয়ে তার একটি লোকরূপ বিকশিত হয়—এই সরল ও প্রায় বিতর্কিত সত্যটি স্বীকার করে নিলে খ্রিস্ট জনসমাজ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, খ্রিস্ট জনসমাজের যাবতীয় রীতি-আচারের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ এদেশে নয় হয়েছে পশ্চিম মহাদেশের ভূখণ্ডে—যেখানে এই ধর্মাচার আরও প্রাচীন। তাই ইউরোপীয় ভূখণ্ডের যে-কোনো

ভাষার সাহিত্যগ্রন্থে এ জাতীয় লোকাচার ইত্যাদির সমৃদ্ধ দৃষ্টান্ত মিলবে।

যে সকল জনসমাজ মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সমাধি প্রথা অবলম্বন করে, তার পিছনে হয়তো কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় কারণ যা ধর্মাদর্শও কাজ করে। তবে খ্রিস্ট জনগণের ক্ষেত্রে যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান, যিশুর দ্বিতীয় আগমন, শেষ [illegible]য়ের দিন প্রভৃতি বিশ্বাস বিশেষ কার্যকরী বলে মনে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্তত সমাজের সমাধিপ্রসার [illegible] তুলনামূলক আলোচনার ফল ভাবা যেতে পারে।

পশ্চিমী দেশসমূহে—খ্রিস্টধর্ম ও ধর্মাচার যেখানে বেশ প্রাচীন—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি বেশ দীর্ঘ ও তার লোকাচার প্রথাও যথেষ্ট আলোচনাযোগ্য। কিন্তু ভারতীয় কাঠামোয় তা তত প্রসারিত নয়—এদেশে তার এক সরলীকরণ রূপ দেখা যায়। এদেশীয় সাহিত্যগ্রন্থে এই সমাজের মৃত্যুকালীন দৃশ্য খুব বেশি চিত্রিত হয়নি, তবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' উপন্যাসে এ জাতীয় একটি ক্ষীণ বিবরণ আছে—যা থেকে সেই সময়ে নবগঠিত খ্রিস্ট জনসমাজের মৃত্যু পরবর্তী লোকাচার বিষয়ের একটি অস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। পরবর্তী আলোচনায় প্রবেশের জন্য সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রূপে এগুলি মনে রাখার প্রয়োজন।

দুই

বাঙালি খ্রিস্টান সমাজের মৃত্যু ও সংশ্লিষ্ট নানা আচার অন্তত সমাজের মতোই অনুসৃত হয়। মৃত্যুকালীন সময়ে তারা যে সকল প্রথা পালন করেন, তা বহুলাংশে ধর্মানুসারী বা কিছুটা বিধিবদ্ধ আচরণ। তবে তাকে কেন্দ্র করে সামান্য কিছু লোকাচার পালিত হয়—যার এক অংশ সমাধিপ্রথার মধ্যেও দেখা যায়। পরবর্তী বিবরণীতে তাই নিতান্তই ধর্মমূলক বিষয়গুলি পরিহার করে শুধুমাত্র লোকাচারের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রপাঠ, ধর্মীয় ব্যাখ্যা, প্রার্থনা, স্তবপাঠ, সঙ্গীত প্রভৃতি যুক্ত হলেও সমগ্র সমাধি অনুষ্ঠানটির একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যেতে পারে।

সমাধিপ্রথায় বিশ্বাসী হওয়ায় খ্রিস্ট জনসমাজে শবাধারকে কেন্দ্র করে আরও কিছু প্রথা রীতির উদ্ভব হয়েছে তবে সেগুলি প্রায়শই ইতিবাচক সংস্কার বা রীতি। এখনও এদেশের এই সংখ্যালঘু সমাজে কুসংস্কার ততটা প্রবেশ করেনি—কেননা 'বাইবেলে' এ জাতীয় কোনো নির্দেশ নেই এবং খ্রিস্ট জনসমাজ এ জাতীয় কুসংস্কারকে ধর্ম বলতেও দ্বিধা করেন—প্রধানত বৃহত্তর সমাজের রীতি-নীতির জন্যই। বিশেষত যিশুখ্রিস্টের মৃত্যু ও সমাধি পরবর্তী বিবরণ নিতান্তই স্বল্প ও একপ্রকার অপূর্ণাঙ্গও বলা যেতে পারে। তবে সেটি বেশ সরল ও সংস্কার বর্জিত বলেই বোধহয় এদেশি খ্রিস্ট জনগণ সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।

এখানে সংক্ষেপে কিছু প্রকাশ্য রীতি-নীতির উল্লেখ করা হয়, যা থেকে উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার করা যাবে। বিভিন্ন চার্চে বিভিন্ন উপাসন পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার মূল লোকাচার প্রায় সর্বক্ষেত্রে একই প্রকার এবং তার ভিন্নতা খুব বেশি হওয়া কেন সম্ভব নয়, তা পরবর্তী সূত্রানুসারে বোঝা যাবে :

১. মৃতের দেহ শবাধারে পুষ্পসজ্জিত অবস্থায় তার গৃহ থেকে সেই ব্যক্তি যে চার্চের সদস্য, সেখানে নিয়ে আসেন তার প্রিয়জনবর্গ—তার পূর্বে চার্চের এক বিশেষ ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা এ সংবাদ সকলকে জানানো হয়—যার সংকেতধ্বনিতে সকলে বুঝতে পারে এই অসময়ে চার্চের ঘণ্টার অর্থ কোনো মৃত্যুজনিত ঘটনা।

২. কখনও বা শবাধারটি সরাসরি সমাধিভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হয় (শবযাত্রার এই মিছিলে কোনো প্রকার ধ্বনি দেওয়া হয় না) পরিবর্তে দেখা যায়, শোকাকুল ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় শোকসঙ্গীত গাইতে গাইতে সমাধিভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই গীতগুলি চার্চে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হয়।

৩. এই শোক মিছিলের পুরোভাগে থাকেন সংশ্লিষ্ট চার্চের পুরোহিত—যে চার্চে ওই মৃত ব্যক্তি নিয়মিত উপাসনা করতেন। প্রতিবেশীগণ তাদের পরে। তারপরে শববাহকের দল, সর্বশেষে মৃতের গৃহ পরিজন ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

৪. সমাধিস্থান মৃতের গৃহের নিকটবর্তী না হলে বা চার্চের সন্নিকটস্থ না হলে তবে সরাসরি একটি অগ্রবর্তীবাহিনী কাচের গাড়ি করে তা সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যান—খ্রিস্ট জনসমাজে এই প্রথা বৃটিশ রাজত্বেই প্রচলিত হয়। শহরাঞ্চলে এই পদ্ধতি দীর্ঘদিন অনুসৃত হয়ে আসছে।

৫. সূর্যাস্তের পরে সমাধিকরণ হয় না। সেক্ষেত্রে মৃতের পরিবারবর্গ ওই রাত্রিটা প্রভাত হওয়া পর্যন্ত শবাধারসহ নিজগৃহেই রাত্রিযাপন করেন। তাই মৃতের পরিবারবর্গ রাত্রি জাগরণ করেন ও নানাবিধ ধর্মীয় গান, শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রালোচনা, প্রার্থনায় অতিবাহিত করেন।

৬. সমাধিক্ষেত্রের সকল কাজ স্থানীয় চার্চের পুরোহিত এবং মৃতের পরিবারবর্গের নির্দেশে পরিচালিত হয়—তবে এ বিষয়ে স্থানীয় প্রবীণদের মতামত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে বয়োকনিষ্ঠরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

৭. সমাধি প্রক্রিয়ার সময়ে চার্চে ও সমাধিক্ষেত্রে বাইবেল থেকে মৃত্যু, পুনরুত্থান, অনন্তজীবন, মানুষের পাপ শেষ দিনের বিচার, যিশুর দ্বিতীয় আগমন প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রপাঠ-সহ ব্যাখ্যা হয়। সকল ক্ষেত্রেই পুরোহিত মহাশয় ব্যতীত সমবেত অন্যান্য ব্যক্তিকেও প্রার্থনায় অংশ নিতে দেখা যায়।

৮. শবাধার ভূ-প্রোথিত করার সময়ে 'ধূলিতে ধূলি, মৃত্তিকায় মৃত্তিকা' তত্ত্বানুযায়ী সমবেত শোকাকুল ব্যক্তিবর্গ মাটির ঢেলা শাবাধারের উপর নিক্ষেপ করেন। এ বিষয়েও বাইবেলের প্রথম গ্রন্থ 'আদিপুস্তক'-এ মানব সৃষ্টির কাহিনি স্মরণ করা হয়।

৯. মৃতের সমাধিকরণ হয়ে যাবার পরে তাঁর আত্মার মঙ্গলকামনায় সেই গৃহে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। তিনি যদি সেই সমাজের বিশেষ মস্ত ব্যক্তি হন, তবে তাঁর স্মরণে চার্চে বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা হয় এবং সেখানে পুরোহিত, চার্চের সকল সদস্য ছাড়াও মৃতের পরিচিত ব্যক্তিদেরও উপস্থিতি আহ্বান করা হয়।

১০. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় কর্মের পর মৃতের গৃহের লোকজন সাধারণত তৃতীয় দিনে এক

পারিবারিক প্রার্থনা সভার আয়োজন করেন। সেখানে তাঁর চার্চ ভুক্ত সদস্যরা আমন্ত্রিত হয়ে আসেন, এবং পুরোহিত ছাড়াও মৃতের অন্যান্য পরিচিতবর্গ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সম্ভবত খ্রিস্ট তাঁর মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন—এই বিশ্বাসে করা হয়, তবে সেটি খুব বিধিবদ্ধ আচার নয়।

১১. একই কাজ একই উদ্দেশে কোনো কোনো পরিবার করেন চল্লিশ দিন পরে। এর তাৎপর্য হল 'রাজদ্রোহী' (?) রূপে 'ধরা পড়ার' পূর্বে যিশুখ্রিস্ট নির্জন প্রান্তরে চল্লিশ দিন উপবাসে ও প্রার্থনায় ছিলেন। দ্বিতীয় একটি যুক্তি হল তাঁর ক্রুশারোহণে মৃত্যু পুনরুত্থানের পরেও তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত আত্মারূপে পৃথিবীতে বিরাজ করেছিলেন—এই বিশ্বাসে। তবে এটিও খুব বিধিবদ্ধ আচার নয় এ বিষয়ে পারিবারিক ইচ্ছাই শেষ ফল।

১২. অবিবাহিত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার শবাধারের জন্য শুভ্রবস্ত্র আচ্ছাদন দেওয়া হয়। অপরপক্ষে বিবাহিত ব্যক্তির শবাধারের বহির্ভাগে কৃষ্ণবস্ত্রের অবয়ব দেওয়া হয়।

১৩. সমাধির শিরোদেশে একটি কাঠেব ক্রুশ প্রোথিত করা হয়। তাতে ব্যক্তির নাম-পরিচয়-মৃত্যু-তারিখ ইত্যাদি উল্লিখিত হয়। কখনও বা বাইবেলের একটি ক্ষুদ্র চয়ন উৎকীর্ণ হয়।

১৪. পাথরের বা ইটের বাঁধানো কবরে কেউ বা মৃত্যুলিপি জাতীয় ক্ষুদ্র কবিতা খোদাই করে দেন। পরবর্তী কালে এ জাতীয় কবিতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাহিত্যরূপে গৃহীত হয়, যার প্রচলিত নাম হল 'এপিটাফ' টমাস গ্রে-র 'এলিজি' এ জাতীয় একটি সাহিত্য। এ প্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের সেই বিখ্যাত এপিটাফের কথাও মনে করা যায়।

১৫. প্রতি বছরে সেই ব্যক্তির মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে মৃতের আত্মীয়স্বজন সেই সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে তাঁর স্মরণে সুগন্ধি দ্রব্য, মোমবাতি, ফুল ইত্যাদি দিয়ে আসেন এবং যতদিন পারেন তাঁর স্মরণে নিজ গৃহে মৃতের স্মরণে প্রার্থনাসভার আয়োজন করেন।

১৬. বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে সকল উপাসকমণ্ডলী তাঁদের আত্মীয়-পরিজনের সমাধি দর্শনে আসেন। সাধারণত ২ নভেম্বরের এই দিনটিকে বলে সর্বসাধুর দিন (All saints Day) বা সর্ব আত্মার দিন (All souls day) (ওই দিনে প্রত্যেকে নিজের ও অপরের সমাধিভূমি পরিষ্কার করে অনুরূপভাবে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন ও সেদিন ওই সমাধিভূমিতেই বিশেষ উপাসনা হয়।

১৭. সমাধিভূমির ভূখণ্ডটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে কিনে রাখারও প্রচলন আছে। এর দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে : ১. সেখানে যেন অন্য কোনো ব্যক্তির সমাধি না হতে পারে, এবং প্রিয়জনের আত্মা সেখানেই শান্তিতে থাকতে পারে। ২. যদি পরবর্তী কালে আপনজনের দেহ সমাধি দেবার জন্য ভূমি-সংকট হয়, তবে পূর্বের সমাধিক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে, অর্থাৎ পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে সেটি পারিবারিক সমাধিভূমিতে পরিণত হবে।

১৮. মৃতের জীবদ্দশায় ব্যবহৃত কক্ষটিতে মৃত্যুকালীন যাবতীয় প্রথা পালিত হয়ে গেলে প্রতি সন্ধ্যায় অন্তত প্রার্থনা সভার দিন উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মোমবাতি জ্বালানো ও ধূপ দেওয়া হয়।

তিন

শব্দটি অতি প্রাচীনকালেই শব্দাভিধানে গৃহীত হয়েছিল। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত একটি অভিধানে এর অর্থ দেখা যায় : 'A chest in which a corpose is burried — যার সরল অর্থ হল, 'শবাধার'। তবে আদিতে গ্রিক হলেও ফরাসি ও ল্যাটিন ভাষায় এটির নমুনা হল যথাক্রমে 'COFIN' এবং 'COPHINUS' । চেম্বার্সের অভিধানে এই শব্দকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বাগধারার সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে এই শব্দটি ব্যবহার হওয়ার ফলে সাহিত্যে ও কথায় এর নানারূপ প্রয়োগ দেখা যায়। শেক্সপীয়ারের 'টেমিং অব দ্য শ্রু' নাটকে বলা হয়েছে : 'Custared coffin'। তাঁর 'টাইটান অ্যান্ডোনিকাস' নাটকে আছে : 'of the paste as coffin will I rear'। এ সকল সাহিত্যিক প্রয়োগ দ্বারা এই শব্দটিকে বহুমাত্রিক করে তোলার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে।

এই শব্দটি রূপকার্থে প্রয়োগ করে তাকে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় বা বাগধারার মাধ্যমে বিচিত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হল : ১. Coffin ship—সমুদ্র গমনের অনুপযোগী জাহাজ। এই শব্দ দ্বারা নৌবাহকদের মধ্যে প্রচলিত একটি সংস্কারের ইঙ্গিত পাওয়া যায় অর্থাৎ যে জলযান প্রকারান্তরে সকলের মৃত্যু ঘটিয়ে দেয়। ২. To drive or put a nail into one's coffin- যার বঙ্গ ায় ব্যাখ্যা হল, অমিতাচার প্রভৃতি দ্বারা মৃত্যু নিকটবর্তী করা। ৩. Coffin bone —'A bone endorsed in a horsis host। এ সকল প্রয়োগ দ্বারা শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা শব্দটির রূপকার্থ যে বহু বিস্তৃত - তা বোঝা যায়।

এ প্রসঙ্গে এক বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত শব্দটি যে কীভাবে বঙ্গীয় শব্দ তথা বাক্যভাণ্ডারে বৃহত্তর সমাজেও আপন ঠাঁই করে নিয়েছে এবং তা আজ বৃহত্তর সমাজের ব্যবহার্য ভাষা হয়ে গেছে, সে বিষয়েও কিছু তথ্য নিবেদন করা প্রয়োজন। 'কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা' নামে একটি বহুল প্রচলিত বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের উল্লেখ ইদানীং প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায়। এটি একটি খাঁটি খ্রিস্ট জনসমাজের সংস্কৃতিজাত শব্দ, যা ইংরাজিতে সুপরিচিত। এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের প্রয়োগের দ্বারা শবাধার মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত করার পূর্বে শেষ বারের মতো তার ঢাকনা শক্ত করে পেরেক দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়। তার পূর্বে সেটি একপ্রকার অস্থায়ীভাবে বন্ধ থাকে লোকজনদের শেষ দর্শনের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য। শেষবারের মতো পেরেক ঠুকে স্থায়ীভাবে এই শবাধারের ঢাকনি বন্ধ করা প্রক্রিয়াটি হয় সমাধিস্থলেই।

সমগ্র পদ্ধতিটি ও আলোচ্য বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির রূপকার্থ হল : কোনো প্রস্তাব, পরিকল্পনা বা প্রকল্প চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া—যা প্রায় 'আগুনে জল দেওয়ার' সমতুল্য বলে মনে হতে পারে। সমাধিস্থিত ব্যক্তি যেমন কোনোদিনই ভূগর্ভ থেকে উঠে আসতে পারে না এমনকী তার শবাধার দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে গেলেও—কোনো প্রকল্প (Project) চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হলেও এর প্রায় একই ভাবের উদয় হয়। অবশ্য এই প্রবাদটির জন্ম যে বাইবেল-বাক্যাংশ দিয়ে নির্মিত হয়নি—তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বাইবেলের প্রথম গ্রন্থে এ বিষয়ে যে বিবরণ আছে

তা থেকে কফিনের ধারণা পাওয়া যায় না।

কবর-কেন্দ্রিক আর একটি জনপ্রিয় বাক্যাংশ এখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছে—যেমন : ১. নিজের কবর নিজে খোঁড়া। নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তি না হলে কাউকে এই কাজ করতে হয় না। করে তার একান্ত প্রিয়জনরাই। তবে ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ পর্বে দেখা যায় যে রাজা-বাদশারা তাদের সমাধির জন্য তাদের অনুগত ক্রীতদাস ও ভৃত্য সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল হতেন। তাই সমাধির উপরি কাঠামো তারা পূর্ব হতেই নির্মাণ করে রাখতেন। বিশেষত মোগল যুগের ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনা একাধিকবার পাওয়া যায়)

সমাধি বা কবরকে কেন্দ্র করে আর কিছু জনপ্রিয় বাক্যাংশ উদ্ধৃত করে পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়া যেতে পারে। ১. কবর খুঁড়ে বের করা ২. কবর খোঁড়া। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে—কবরে পাশ ফিরে শোওয়া' বাক্যাংশটির সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা যায়।

বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহযোগে এসব বাক্যাংশ বা প্রবাদতুল্য সৃজনগুলি ব্যাখ্যা করতে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধরূপে করা প্রয়োজন। তবু বৃহত্তর সমাজ শব্দগুচ্ছটির অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বলেই সেটিকে অচ্ছ্যুৎ করে না রেখে বরং তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে স্থায়ীভাবে ঠাঁই দিয়ে সঠিক কাজ করেছেন। এই সকল প্রবাদতুল্য বাক্যাংশ যে ভাব বহন করে, তার তুলনীয় শব্দ প্রচলিত সমাজে নেই, তাই বিভিন্ন প্রবাদ সংকলনেও তা দেখা যায়। তবে তুলনামূলক আলোচনাযুক্ত প্রবাদ সংকলন গ্রন্থে এ জাতীয় আরও বহু বাক্যাংশ পাওয়া যায়—যা পৃথিবীর বহু দেশেই প্রচলিত আছে। আশা করা যায় একদিন বাংলা ভাষাও এভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। একটি বিশেষ সমাজের লোকাচার যে পরোক্ষভাবে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করছে এটাই এখানে পর্যবেক্ষণের বিষয়।

চার

বৃহত্তর সমাজের প্রভাবে নিতান্ত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীরূপে এ বঙ্গে শুধু নয়, সারা ভারতেই খ্রিস্ট জনসমাজ ছড়িয়ে আছেন। যেহেতু এই ধর্মগোষ্ঠীর লোকাচার-লোকপ্রথা এখনও ততটা প্রকাশিত বা আলোচিত নয়, তাই বৃহত্তর সমাজের পটভূমিতে এই ধর্মগোষ্ঠীকে হয়তো কিছুটা লোকাচারহীন বলে মনে হতে পারে, বিশেষত শহরাঞ্চলে তো বটেই তবে দক্ষিণবঙ্গের অঞ্চলগুলির মধ্যে দিয়ে জেলার রানাঘাট-কৃষ্ণনগর-চাপড়া প্রভৃতি স্থানে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কেওড়াপুকুর-ঝাঁঝরা-রাঘবপুর-বিষ্ণুপুর-খড়িবেড়ে প্রভৃতি স্থানে, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলার আদিবাসীপ্রধান গ্রামগুলিতে যে সকল খ্রিস্টধর্মী আছেন, সেখানে অনুসন্ধান করলে হয়তো আরও বিচিত্র তথ্য পাওয়া যাবে।

লোকাচারসর্বস্ব যে ধর্মবিশ্বাস তার পূর্ণ প্রকাশ হয়তো পাওয়া যাবে পশ্চিমী দেশগুলিতে। সেখানে খ্রিস্টধর্মের বয়স বেশি তাই নানারূপ লোকাচার, লোকবিশ্বাস সহজেই আপন ঠাঁই করে নিয়েছে। বঙ্গীয় খ্রিস্টজনসমাজে যদি কখনও এই ধর্মগোষ্ঠীর তেমন সংখ্যাধিক্য ও প্রাচীনতা আসে তবে সেদিন হয়তো এখানে তথাকথিত লোকাচার-লোকপ্রথা-লোকবিশ্বাস অন্বেষণ করা অনেক সহজ হবে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালনের মাধ্যমে এই জনসমাজের সাংস্কৃতিক প্রকাশ আজ স্থায়ী হয়ে গেছে, তার অন্যতম হল 'এপিটাফ' জাতীয় শোক কবিতা। শোককেন্দ্রিক খুব সংহত আবেগময় যে কবিতা রচিত হয়ে এক বিচিত্র কবিতা প্রকরণ সৃষ্টি করেছে, বাংলা সাহিত্যে তার প্রকাশ হয়েছে অনেক পরে। এ প্রসঙ্গে খ্রিস্ট জনগণের সমাধিভূমির বাইরে যে সকল নমুনা আজ সবার মনে আসে, তার মধ্যে মাইকেল মধুসূদনেরটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলেও রবীন্দ্র রচিত শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি ব্যক্তির জন্য কবির কবিতাগুলি আজ বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বলেই বিবেচিত হবে।

তবু এখানে এপিটাফ সাহিত্যের আদর্শ রূপে কয়েকটি বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করা হল, যার দ্বারা মৃত্যুশোকের সংহতরূপটি যে সাহিত্য-সম্মতরূপে উদ্ভাসিত তা হয়তো স্বীকার করে নিতে অসুবিধা হবে না।

১. *Quickly and quietly came the call*
Her sudden death surprised us all
Those who have lost can only tell
The loss of a loved one without a farewell
চকিতে নীরবে এল অসীমের ডাক;
সহসা মরণ করে দিল হতবাক।
বেদনা যে কি সেই সে বুঝিবে, হায়!
বিনা বিদায়েতে প্রিয়জন যার যায়।

২. *You are not dead to me*
But as a star unseen
I hold that you are ever near
Though death intrudes between
হারিয়ে তুমি যাওনি আমার মনে
আছো তুমি অলখ তারার মত।
জানি, তুমি আছো আমার মনে
মৃত্যু শুধু বাধায় বাধা যত।

এ জাতীয় কবিতা ইংরাজিতে প্রচুর। বাংলায় তার দৃষ্টান্ত নিতান্তই কম। কেননা সমাধিপ্রথা খ্রিস্ট জনসমাজে যতটা পরিচিত ও যে দৃষ্টিতে তাকে বিচার করা হয় অন্ত সমাজে তার সে আসন নেই। তাই 'অশ্রু শিলালেখ' (Tears on Tombstone') জাতীয় গ্রন্থের প্রচার এ সমাজে আজও ততটা হয়নি। তবে বিশুদ্ধ শোক সাহিত্য রূপে রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করতেই হবে। এখানে অবশ্যই মহাজন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যে শোক কবিতা আসরে পাঠ করা হয়—সে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে না।

খ্রিস্ট জনসমাজের এই বিশিষ্ট প্রথার আর এক অবদান হতে পারে—শোকসঙ্গীত রচনা। তথ্যানুসন্ধানের জন্য শুধুমাত্র ইংরাজি গানের উপর নির্ভরশীল না হয়ে এদেশের চার্চসমূহে প্রচলিত অসংখ্য গীতিগ্রন্থ অনুসন্ধান করলেও এ জাতীয় প্রচুর গান দেখা যাবে—যা আজও বিশেষ সমাদরে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গীয় খ্রিস্ট জনসমাজ যে এ জাতীয় সঙ্গীত রচনাতেও দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা স্বীকার করতেই হবে। এই ধারা এখনও বেশ সক্রিয়। শোকপ্রকাশ, শোককে অন্যতর ব্যথায় উন্নিত করা, শোক থেকে কোনো ঈশ্বরীয় তত্ত্বের সন্ধান করা—এসব চিন্তা থেকেই এগুলি রচিত হয়।

কোনো দক্ষ পর্যবেক্ষক অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে এদেশের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রগুলি ভ্রমণ করলে এ জাতীয় অনেক উৎকৃষ্ট শোক কবিতা সংগ্রহ করতে পারবেন যা হয়তো গবেষকমনে নতুন কোনো চেতনার সন্ধান দেবে। নচেৎ আমাদের হয়তো বরাবর 'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই/নয়নের মাঝগানে নিয়েছো যে ঠাঁই'—জাতীয় দু'একটি কাব্য পংক্তি নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে—যা ইদানীং সংবাদপত্রে 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে শেষ সংবাদরূপে প্রচারিত হয়।

এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে খ্রিস্ট জনসমাজের প্রচলিত একটি প্রথার খুব সংহত রূপটিই প্রকাশ করা হল। সমাধিপ্রথার উপজাতরূপে বাংলা ভাষা যে স্থায়ীভাবে কতগুলি বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ নির্মাণ করে দিয়েছে এবং বৃহত্তর সমাজ তা গ্রহণ করেছে—এতেই ভাষার বহমানতা আর একবার প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ে এখনও অনেক অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে যার শেষে বলা যাবে যে এই প্রথাও হয়তো এক বিশেষ সংস্কৃতির প্রসারে সহযোগিতা করেছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. দি নিউ কমপ্যাক্ট বাইবেল ডিক্সনারী। সম্পাদক টি. এ ট্রায়ান্টা ক্রুসেড সংস্করণ (১৯৬৭)
২. ডিকস্‌নারী অব ফ্রেজ অ্যান্ড ফেবলস্‌। রেভারেণ্ড এফ ব্রায়ার। ১৯০০
৩. বিচিত্র বিশ্বাস। অমিতাকুমারী বসু। ১৩৮৯
৪. বিশ্বের প্রবাদ। ইবনে ইমাম। ১৯৮১
৫. লোকসাহিত্য ও খ্রিস্ট জনসমাজ। শ্রীহর্ষ মল্লিক। ১৯৯৭
৬. দ্য এনসাইক্ল অ্যাংলো—বেঙ্গলি ডিক্সনারী। চারুচন্দ্র গুহ (১৯১৫)
৭. অশ্রু শিলালেখ। সুধাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ১৯৭১
৮. বাইবেল। আদিপুস্তক। ৫০ অধ্যায়। ২৬ পদ
৯. বাইবেল। নতুন নিয়ম : মথি ২৯ অধ্যায়।

❑ লেখক পরিচিতি : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বহুবিধ গ্রন্থ প্রণেতা।

কবর : বাঙালি সংস্কৃতির মিলন সেতু

নাসিম-এ-আলম

ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষজন বিশ্বাস করেন মৃত্যুর পর মানুষের জন্য অনন্ত জীবন অপেক্ষা করে আছে। পৃথিবীতে সৎকর্ম করলে পরকালে স্বর্গলাভ অর্থাৎ জান্নাত আর অসৎ কাজের জন্য নরক অর্থাৎ জাহান্নম। সামাজিকভাবে মানুষ ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত। ফলে শৈশব অবস্থা থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান, উপকথা, সত্যকাহিনি, এবং পরকালের পরিণাম সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে নেয়। একজন মুসলিম মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অধিক স্পর্শকাতর। ক্ষুদ্র পার্থিব জীবনের সুখভোগের চেয়ে অনন্তকাল স্বর্গলাভ তার কাছে শ্রেয়তর।

বাইবেল ও কোরাণে পৃথিবীর আদি মানব ও মানবী সম্পর্কে সহমত পোষণ করা হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত অ্যাডাম ও ঈভ ইসলাম ধর্মাবলম্বীর কাছে আদম ও মাহাওয়া। প্রচলিত কাহিনি হিসাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে অথচ কোরাণ, হাদীস শরীফে উল্লেখ নেই। সেগুলিকে কাহিনি বা উপকথা হিসাবে উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত। পৃথিবীতে প্রথম কবর দেবার কাহিনি পাই হাবিল-কাবিলের গল্প থেকেই। আদি পিতা আদমের দুই সন্তান কাবিল ও হাবিল। গ্রিক উপকথায় যে ভাবে ভাইবোনের বিবাহের নানা ঘটনা পাই সৃষ্টির প্রথম পর্বে ইসলাম ধর্মেও ভাইবোনের বিবাহ প্রচলিত ও বৈধ ছিল। পরমা সুন্দরী আকলিমার সঙ্গে হাবিলের বিবাহ দিতে আদম প্রস্তুতি নিলে কাবিল বাধা দেয়। কাবিল আকলিমাকে বিয়ে করতে চায়। এই সংঘাতের অনিবার্য পরিণতিতে কাবিল হাবিলকে হত্যা করে। কিন্তু হাবিলের মৃতদেহের কী হবে? কথিত আছে মুশকিল আসান করতে স্বয়ং ঈশ্বর দুজন ফেরেশেতাকে কাক রূপে প্রেরণ করেন। কাবিলের সামনে তারা ঝগড়া ও মারামারি করতে থাকে—শেষে একটি কাক মারা গেলে অন্য কাকটি ঠোঁট ও পায়ের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে কাকটিকে মাটিতে চাপা দেয়। কাবিল কাকের অনুসরণে মাটি খুঁড়ে হাবিলকে প্রোথিত করে। বিশ্বের প্রথম নারীঘটিত হত্যার থেকে এভাবে মৃতদেহকে কবর দেবার পদ্ধতি চালু হয়।

ভারতে মুসলিম প্রবেশ ও শাসন এক দীর্ঘ অধ্যায়। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের ব্যাপক মিশ্রণ ঘটেছে। ধর্মীয় আচার আচরণে, সমাজে, ভাবনায় ও মানসিকতায় এই মিলন এক যৌথ সাধনার জন্ম দিয়েছে। বনবিবির উপাখ্যান, বাউল-ফকিরের গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি বিয়ের আসরের আচার সংস্কার, পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে দুই সমাজ মিশে যায় একস্রোতে।

মৃত্যু যেহেতু মানুষের এক অনিবার্য পরিণতি এবং উভয় সম্প্রদায় নিশ্চিতভাবে পরকাল এবং পরলোকে বিশ্বাসী তাই কবরস্থান এবং শ্মশান বাঙালি জীবনের নানান ভাবনায়, সংস্কারে,

বোধে ওতোপ্রোতোভাবে মিশে আছে।

ইসলাম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, অর্থাৎ ঈশ্বর বা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং হজরত মুহম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসুল অর্থাৎ ধর্মপ্রচারক। মূর্তি বা প্রতীকের কোনো পূজা ইসলামে প্রচলিত নেই অথচ ভারতীয় তথা বাঙালি জীবন ব্যবস্থায় ইসলামের কাছে পরোক্ষে প্রতীক উপস্থিত হয়েছে। কারণ ধর্মের পাশাপাশি আমরা সমাজ নিয়েও বসবাস করি তার প্রভাব পড়ে জীবনে। প্রশ্ন উঠতে পারে কীভাবে এসেছে প্রতীকের অবস্থান। উত্তরে যাবার আগে কবরের লোকাচার কী কী ভাবে আমরা পালন করি তার তালিকাটি প্রস্তুত করি—

১. শবেবরাত অনুষ্ঠানে কবরে বা পুরো কবরস্থানে প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালানো।

২. একজন পিরসাহেবের কবর কেন্দ্রিকতা যাকে দরগাহ্ নামে অভিহিত করা হয় সেখানে মিলিত হয়ে চাদর চাপানো, তাঁকে স্মরণ, মেলা, বাউল ও ফকিরের সম্মিলন, মানত করা ইত্যাদি ...।

৩. মহরমে হাসান হোসেনের কৃত্রিম কবর নির্মাণ।

৪. কবর জিয়ারত করে মৃতের উদ্দেশ্যে মোনাজাত বা প্রার্থনা।

কীভাবে এসেছে 'কবর' কেন্দ্রিক এই লোবাচার যাকে ঘিরে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সমগ্র লৌকিক ব্যবস্থাকে আলোড়িত করেছে যুগ যুগ? শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' থেকে জানতে পারি যে দীপ প্রজ্বলন করে কোনো কিছুকে স্মরণ করার রীতি এসেছে বৌদ্ধ সংস্কৃতি থেকে, বৌদ্ধরা উঁচু মাটির ঢিপি নির্মাণ করে গুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, বৌদ্ধ সংস্কৃতি থেকে তা সংক্রামিত হয় হিন্দু জীবনে। দীপাবলিতে গৃহে গৃহে দীপ জ্বেলে অশুভের বিরুদ্ধে প্রার্থনা সঙ্গে আগামী বছরের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে নতুন দিনকে আহ্বান করা হয়। বাঙালি হিন্দু লোকাচার সংক্রামিত হয়েছে মুসলিম লোকাচারে। শবেবরাতের অনুষ্ঠানে দীপ জ্বেলে গৃহের শান্তি-আগামী বছরের সুখ ও শান্তির প্রার্থনা করে মুসলিম মন তৃপ্তি পায়। সঙ্গে কবরে দীপ জ্বেলে মৃতের জন্য পারলৌকিক সুখ তথা স্বর্গ কামনা করা হয়।

কবর জিয়ারত করে মৃতের পারলৌকিক সুখের কামনা অন্যতম পদ্ধতি। হাদীস শরীফ থেকে কবর জিয়ারত সংক্রান্ত নির্দেশ এসেছে।

ক) 'কবর জিয়ারত' আমাদের ইহলোকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেয় এবং পরলোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—ঈবনে খাজা।

খ) যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবারে মাতা পিতা বা তাঁদের কোনো একজনের কবর জিয়ারত করবে সে ক্ষমা লাভ করবে এবং বাধ্য বলে গণ্য হবে।—বায়হাকী

ইবনে খাজা ও বায়হাকী'র বর্ণিত হাদীস থেকে উক্ত তথ্য জানতে পারি। সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই কবর বা সমাধি ইহকালে ও পরকালের মধ্যে সেতু স্বরূপ। ক্ষণিকের জন্য হলেও ব্যস্ত জীবন থেকে দূরে এসে আমরা স্মরণ করতে পারি মৃত্যু অবধারিত এবং নিশ্চিত।

অধিকাংশের যৌথ উদ্যোগে বাংলার মাঠে ঘাটে যে অজস্র মেলা তার অধিকাংশের সূত্র

কোনো পির বা সাধুর স্মরণ। হাজার বছরের বাঙালি জীবনের মিলিত সাধনার অনেকখানি এই মেলা, আশ্রম, বাউল, ফকিরের গানে ছড়িয়ে আছে। নিবিড় সাধকটির কাছে মানুষ পার্থিব সুখ, সমৃদ্ধি কামনা করে, কোনো ঈপ্সিত জিনিস কামনা করে। রোগমুক্তির কামনাও তার মধ্যে রয়েছে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যিনি কবরে শায়িত এবং আরাধ্য তাঁর কাছে মানত করে সন্তান লাভ হয়েছে, রোগমুক্তি হয়েছে কারও চাকরি বা ব্যবসায়ে সাফল্য এসেছে এই গল্প বা সত্য ঘটনা বা বিশ্বাস নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন দলে দলে আরও ভক্ত নতুন নতুন কামনা নিয়ে আসেন। ভক্তরা আসেন, কামনা করেন, ফকিরি গান শোনেন, কেউ চাদর চাপান শরীরে কবরে আর বিনম্র চিত্তে ফিরে যান নিজ গৃহে।

বঙ্গভূমিতে প্রথম পির সাহেবের অনুপ্রবেশ ঘটে আরবের উমাইয়া বংশের সমাপন্তে এবং আব্বাসিয়া বংশের সূচনায়। তখন চট্টগ্রাম বন্দর আরব উপনিবেশে পরিণত হয়। হজরত সুলতান বায়জিদ মুস্তামী নবম শতকের শেষার্ধে ইসলাম প্রচারের জন্য চট্টগ্রামে আসেন। তাঁর প্রেম ও ভক্তির বাণীতে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, বাংলার পির বা সুফিবাদের সেই সূচনা।

পিরের সমাধি বা মাজার ঘিরে যে লোককথা, গল্পগাথা তা সাহিত্যেও প্রবেশ করেছে। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর 'লালসালু' এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে বাস্তব, পরাবাস্তবতার যে আলো অন্ধকার পাই গতানুগতিক উপন্যাসের ফর্ম ভেঙে সেই কাহিনি বাঙালি পাঠককে এক অচেনা জগতের স্বাদ দিয়েছে।

অন্যভাবে নাটক, কাব্য ও লোকসাহিত্যে, বাংলার পির, সুফি, সাধক কেন্দ্রিক মেলা, উৎসব, লোকাচারের নানা বর্ণনা চোখে পড়ে। মানুষ সমাধিকে পরকালের সোপান মনে করে। হয়তো তার ভাবনায় ইহকালের সুখ ও পরকালের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাধ্যমের কাজ করতে পারে ওই সমাধিতে শায়িত আত্মা। মানুষ ভাবে ওই আত্মা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী। ধর্মের বিভেদ ভুলে সবধর্মের মানুষ তখন সমাধি ঘিরে একত্রিত হল বা 'একসুরের গান' হয়ে ওঠেন।

ব্যতিক্রমী উদাহরণ আছে। কখনও মানুষটি পির সাধক নন। একজন গৃহী। স্কুল শিক্ষক। বীরভূমের বোলপুর-শান্তিনিকেতনের থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে শিয়ান-তিলুটিয়া গ্রাম। ওই গ্রামের মানুষ এনায়ুল হক। সৎ, ধার্মিক মানুষ। একদিন নিজের ধর্ম ত্যাগ করে নিজের বিষয় সম্পত্তি দান করে প্রতিষ্ঠা করলেন উদয়ন কেন্দ্র। নিজেকে পরিচয় দিলেন শ্রীশূদ্রোত্তম নামে। ছেলের নাম শ্রীবিশ্বজিৎ, নাতনির নাম শ্রীছন্দা। স্বাভাবিকভাবে হিন্দু মুসলিম সমবেত হলেন। গড়ে উঠল শিষ্যদল। তাদেরও নাম দেওয়া হল—শ্রীপ্রণব, শ্রীনরেন ... ইত্যাদি। মৌলবাদীদের সংঘাতে শূদ্রোত্তমের কারাবাস হল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার হাত লাগালেন সমাজ গড়ার কাজে, তাঁর মৃত্যুর পর সমাধিকেন্দ্রিক মেলার সূচনা হল, এখনও প্রতিবার দোল উৎসবের সময় তিনদিনের মেলা, শিশু উৎসব, সেমিনার হয়ে থাকে। সেমিনারে

বক্তৃতা দিতে আসেন অম্লান দত্ত, সৈয়দ হাসমত জালাল, শ্যামলী খাস্তগীরের মতো সুধী মানুষজন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কবর বা সমাধিকেন্দ্রিক যে চাওয়া, পাওয়া। অলৌকিক ঘটনা বা রটনা, পরকাল ... এর আদৌ কি কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে? কিংবা যুক্তিবাদী মন যদি মানতে না চায় যাবতীয় অলৌকিকতা বা অতিবাস্তবতা। কিংবা নাস্তিকের দৃষ্টিতে—যার কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই সুতরাং অস্তিত্বহীনের কাছে আবার কীসের চাওয়া?

খোদ মুসলিম সমাজের মধ্যে 'আহলে হাদীস' গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজন পিরতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তাদের সকল বিশ্বাস, প্রার্থনা এক ঈশ্বরে। মহরমের শোক পালনে মিছিল মূলত 'শিয়া' মুসলিমদের অনুষ্ঠান পরবর্তীকালে 'শুন্নি' মুসলিম সমাজের 'হানাফি' গোষ্ঠীর মধ্যে তা দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

মতভেদ যাই থাক, বিশ্বাস, অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব থাক, সব মেনে নিয়ে বলি বর্তমানে নতুন করে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িকতার সময়ে আমাদের যৌথ জীবন ব্যবস্থাকে ধরে রাখতে পারে একমাত্র এই পির, সাধু, সুফিদের যৌথ সাধনা। একটি সমাধি যার নীচে শুয়ে আছেন সাধক পুরুষ—তার ধর্ম পরিচয়ের চেয়ে বাঙালি সমাজে বড় হয়ে ওঠে তার আধ্যাত্মিকতা। তাই মুসলিম পিরের সমাধিতে চাদর চড়ান হিন্দুভক্ত। তাঁর কাছে প্রদীপ জ্বেলে সন্তান কামনা করেন। মেলায় মিলিত হন লক্ষাধিক হিন্দু-মুসলিম নরনারী: বাউলের গানে অশ্রুসিক্ত হন মুসলিম নারী। ফকিরি গানের দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে হিন্দু যুবকের মনে বৈরাগ্য জাগে। এই যৌথ সংস্কৃতি কম পাওয়া নয়। এরা বাঁচলে তবেই বাঁচবে বাঙালি তথা ভারতবর্ষের যৌথ সমাজ।

আমার বেড়ে ওঠা, জন্ম সবকিছু বীরভূম ঘিরে, তাই বীরভূমের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পিরের খাজার এবং পিরসাহেবের মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উরস্ উৎসবের তালিকা দিলাম—

১. আলিনগর গ্রামের (থানা-মহম্মদ বাজার) চাঁদপীরের মাজার। মাঘ মাসে পিরের উরস উৎসব হয়। চারদিন ধরে মেলা বসে।

২. পাথর চাপড়ীর (থানা-সিউড়ি) দাতা মহবুব শাহের মাজার। প্রতি বছর চৈত্রের ১০ তারিখে পিরের উরস উৎসব হয়। সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে। অজস্র ফকির, সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। পিরের সমাধিতে চাদর চড়ানো বিশেষ পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হয়।

৩. বাহাদুরপুরে আছে জঙ্গলীপিরের আস্তানা। মহরম মাসে পিরের উরস্ উৎসব হয়। জায়গাটি মুরারই এর কাছে।

৪. কীর্ণহারের কাছে সাদিনগরে আছে হেক্সি সাহেবের সমাধি। হেক্সিসাহেবের পুরো নাম শাহনূর আনোয়ার আলি চিস্তি। প্রতি বছর ১৪ চৈত্র এখানে মেলা বসে।

৫. নলহাটির কাছে বাড়াগ্রামে আছে আশিজন মুসলিম পিরের সমাধি। তিনবছর অন্তর ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে গ্রামের বুড়ো পিরের ফাতেহা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া মাজারে প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক মানত করতে আসে।

৬. পারুই-এর কাছে কুষ্ঠিগিরির কেরমানি সাহেবের সমাধি। এখনও তার উরস উৎসব অনুষ্ঠানে পিরসাহেবের সমাধিতে চাদর চড়ানো হয়। ভক্তরা আত্মনিবেদনে শান্তি লাভ করে।

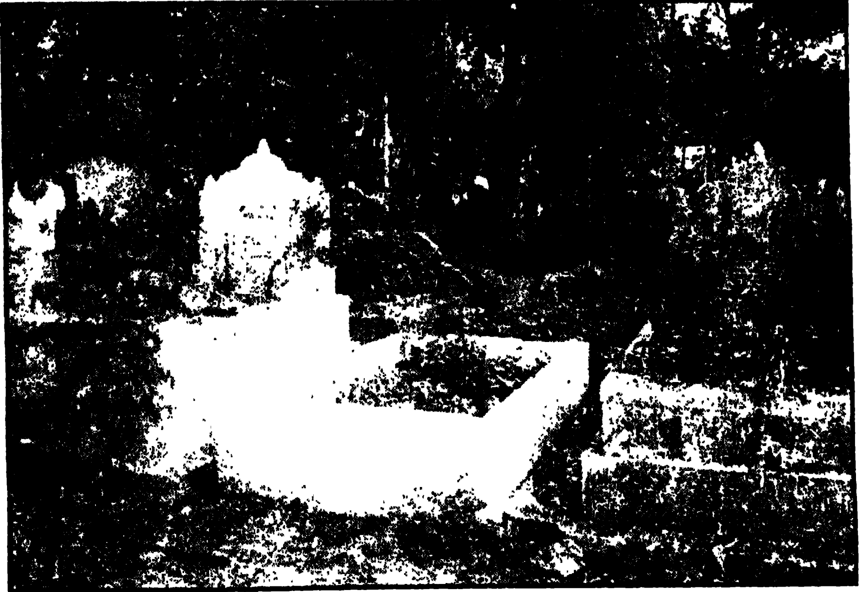
প্রবন্ধটি রচনা করতে যে সমস্ত বই ও পত্রিকার সাহায্য পেয়েছি তার তালিকা :

১. ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি—ড. ওসমান গণি

২. দাতা মহবুব শাহ—এম আবদুর রহমান

৩. হেক্সি সাহেবের ইতিকথা—আবদুল আলিস

৪. লোক সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা (বাঙালি মুসলমান ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা) সম্পাদক—সনৎকুমার মিত্র।



পার্কসার্কাসে কাজী নজরুলের পুত্রদ্বয়ের (সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ) সমাধি। ছবি : কালিকানন্দ মণ্ডল।

❑ লেখক পরিচিতি : কবি, প্রাবন্ধিক, উৎসব পত্রিকার সম্পাদক।

মৃত্যুর খতিয়ান

বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়

মৃত্যু, শোক, শ্মশানঘাট, কবর প্রভৃতি আলোচ্য বিষয় সামান্য বা তুচ্ছ ব্যাপার নয়। এই সম্বন্ধীয় বিষয় নিয়ে আলোচনার কলেবর সুবৃহৎ হতে পারে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই চর্চায় এমনিতেই অনেক বিষয় এসে যায়। আলোচ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত লোক-বিশ্বাস। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অনেক বিধিনিষেধ এর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

এইসব বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অনেক ছড়া, গান, কবিতা, পাঁচালি প্রভৃতি। আলোচনায় সেগুলি অন্তর্ভুক্ত না করলে চর্চা হবে অসম্পূর্ণ। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রান্তে বিবিধ ধর্মগ্রন্থ সমূহের নির্দেশাবলীর প্রতি ভক্তিমান এবং বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা প্রচুর। তাছাড়া অনেক আদিম সমাজের ধর্মীয় বিধিনিষেধ পরম্পরাক্রমে অনেকে পালন করে আসছেন।

বাংলার একটি পার্বনের নাম—ভাইফোঁটা। এই পার্বণে বোন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়। ছড়া কেটে বলে : 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাটা।' মৃত্যু যেন ভাইকে স্পর্শ করতে না পারে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর :

অধিকাংশ ভারতবাসী দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করে এসেছে, বিশ্ব-জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা—চতুরানন। ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা। বিশ্বজগতের স্থিতিশীল করেন—বিষ্ণু। বিষ্ণু জগৎপালক। বিনাশ, মৃত্যু, প্রলয় ধ্বংসের দেবতা—মহেশ্বর। শিব ঠাকুরের আর এক নাম মহাকাল। মহাকাল শিব ঠাকুরের রুদ্ররূপ। নটরাজ-নৃত্যরত শিব। মহাকাল ভৈরব অর্থাৎ শিবঠাকুর। গদাহাতে মহাকাল যেন ধ্বংস করতে চলেছেন। আর এক হাতে করোটি ভরা রুধির। (১)

স্বামী নির্ম্মলানন্দ লিখেছেন : 'শিব কি বৈদিক দেবতা? অনেকে বলেন—শিব প্রথমে অনার্য্যগণ কর্তৃক পূজিত হতেন। তাই বৈদিক যাগযজ্ঞ শিবের হবিঃভাগ ছিল না। দক্ষ এ জন্যই তাঁর আয়োজিত যজ্ঞে শিবের নিমন্ত্রণ করেননি। ...' (২)

তিনি আরো লিখেছেন : 'শিবের একনাম ভূতনাথ। ভূত অর্থে প্রাণী। প্রাণী মাত্রেই তাঁর প্রজা বা সন্তান, তাই তিনি ভূতনাথ। তাঁকে ভূত পাবনও বলা হয়। কারণ প্রাণী মাত্রেরই ত্রাণকর্ত্তা তিনি। তাঁর কাছে উচ্চাবচ ভেদ নেই। সকল প্রাণীকেই তিনি সমভাবে কৃপা করেন। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী। সমাজে চণ্ডাল বা অন্ত্যজ বলে যারা ঘৃণিত ও অবহেলিত, যাদের দিকে কেউ তাকায় না, তাদের প্রতিও শঙ্করের পরম ঔদার্য্য। সামান্যতম ভক্তির সূত্র ধরেই তিনি তাদিগকে পরম অভীষ্ট দান করেন। তাঁর মত এমন বদান্যই বা জগতে আর কার আছে?

কঠোর যোগ-যাগ-তপশ্চরণের ফলেও যে বস্তু লাভ করা যায় না, চণ্ডক রুরুদ্রহ এবং সুন্দর সেন নামক তিন নিষাদকে অকৃপণ ভাবে শিব সেই বস্তুই দান করেছিলাম। চণ্ডাল বলে তাগিদকে বঞ্চিত করেননি। ...' (৩)

শিবঠাকুর যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করেন। শিবঠাকুর নিয়ে পল্লীকবিদের রচিত অনেক গান আজও শোনা যায়।

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচনা করেন, শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন। কিছু অংশ হলো এই :

সৃষ্টি কালের দেবতা

'সৃষ্টির প্রথম কালে মহাবিষ্ণু মহাজালে
ভাসিয়া কৌতুক হইল মনে।
সুশিক্ষার অভিলাষে সৃজন পালন আশে
তিন মূর্ত্তি হইলা আপনে।।
রজোগুণে সৃষ্টি কর্ম্মা দক্ষিণাঙ্গে হইল ব্রহ্মা
বামাঙ্গে বাহির হইলা হরি।
যত গুণে হৈল তবে সকল পালক ভাবে
শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী।।
মহারুদ্র মধ্যভাগে সংহারের ভারলাগে
তমোগুণে মহাতেজ ময়।
পুরুষের জন্মজান্যা আদ্যাশক্তি সুখমান্যা
তেনিহ হইলেন মূর্ত্তিত্রয়।।' (৪)

স্বামী নির্ম্মলানন্দ ব্রহ্মা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

'ধ্যানমন্ত্রে আমরা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার যে অলৌকিক মূর্ত্তির দর্শন পেলাম, তা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অন্যায় হবে না যে, ব্রহ্মা পুরাপুরি বৈদিক সংস্কৃতি ও বৈদিক সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহ। যদিও ব্রহ্মার নামটী স্পষ্টতঃ বেদে পাওয়া যায় না, ইতি প্রধানত ঃ পুরাণেরই দেবতা, তথাপি ইনি বেদমূর্ত্তি। ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব—এই চারখানি বেদ ব্রহ্মার চারিমুখ থেকে বিনিঃসৃত। বস্তুতঃ বেদবক্তা রূপেই ইনি চতুর্ম্মুখ। ...' (৫)

মৃত্যুর দেবতা যম

মঙ্গলকাব্য বলতে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলের কথা সর্বপ্রথম মনে পড়ে। তাছাড়া বাঙালী সাহিত্য পাঠকের কাছে এবং বাংলার লোকজীবনে ষষ্ঠী মঙ্গল খুবই পরিচিত। দেবী ষষ্ঠী সন্তানের রক্ষয়িত্রী। পল্লীগ্রামে যে অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষতলে ষষ্ঠীদেবীর পূজা হয়, তা ষষ্ঠীতলা নামে পরিচিত। শিশু জন্মের পর তার কল্যাণ কামনায় ষষ্ঠীপূজা, ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য পাঠ গ্রাম বাংলায় আজও হয়ে থাকে।

স্বামী নির্ম্মলানন্দ লিখেছেন ঃ

'যমও কি বৈদিক দেবতা? উত্তর হাঁ। তবে বেদে তাঁকে কোথাও দেবতা বলা হয়নি, তিনি রাজা বলেই বেদে স্তুত। ... ' (৬)

তাঁর কথায় ঃ ' ... যমকে বলা হয়েছে—'মহাকায়'। যম দেবতারূপে আখ্যাত না হলেও তাঁকে আমরা ধর্ম্মরাজ বলেই উচ্চ সম্মান দিয়ে থাকি। মৃতব্যক্তির আত্মা স্বর্গে গিয়ে রাজা যম ও রাজা বরুণের দর্শন লাভ করে—ঋগ্বেদের ইহাই অভিমত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের তিনটি সূক্তে যমের স্তুতি আছে। এছাড়াও ঋগ্বেদের অন্তত, অর্দ্ধশত স্থান যমের উল্লেখ দেখা যায়। ... ' (৭)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, অনেকদিন আগে বর্ধমান জেলার একটি লোকনাট্য 'লেটো-গানে'র পালায় যমের ভয়ের কথা শুনেছিলাম। সেই ছড়ার দুটি লাইন হলো এই ঃ

'হে দেবী শঙ্করী অন্নদাতা।
শমনস্য ভয়ে সদা রক্ষ মাতা।।'
(শঙ্করী— দেবী দুর্গা / শমন—মৃতর দেবতা যম)



সাবিত্রী সত্যবান/ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও-১৮৮০

কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্য থেকে 'বেহুলার রোদন'-এর কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো :

বেহুলার রোদন :

'কালিনী খাইল পতি। প্রাণনাথ কোলে সতী।।
কি হৈল কি হৈল মোরে। কান্ত কেন হেন করে।।
বদন চাঁদের জুতি। কালিয়া হইল অতি।।
বদনে নাহিক বাণী। অভাগিনী কিবা জানি।।
প্রভুর বদন চায়্যা। দগধে দারুণ হিয়া।।
কপালে কি মোরে ছিল। বিভারাতি পতি মৈল।।
মরলোকে কব কি। বেহুলা বান্যার ঝি।।
মঙ্গল বিভার নিশি। মুখ পূর্ণিমার শশী।।
খাইল এ হেন পতি। কে মোরে বলিব সতী।।
বদনে বদন থুয়্যা। নয়ানে নয়ান দিয়া।।
চরণ যুগলে ধরি। ক্ষেণে ক্ষেণে কান্দে নারী।।
কখন শ্রবণ-মূলে। মোরে সাথে লহ বলে।।
তোমা বিনে জীলে আমি। কলঙ্কে পূরিব ভূমি।।
পতিহীন যেই জীত্র। কবে করি বিষ পিত্র।।
ধরিতে না পারি ছাতি। উঠ উঠ প্রাণপতি।।
তোমা বিনে নহে ভাল। এহকাল পরকাল।।
তোমা বিনে নাঞি জানি। তুমি মোর নীলমণি।।
কুবেশ আকার রামা। মনে নাঞি দেই ক্ষমা।।
করুণা করিয়া কান্দে। কেশপাশ নাহি বান্ধে।।
ক্ষেমানন্দে কহে কবি। রাজীবে রক্ষহ দেবী।
মনসা-চরণ আশে। রচিল কেতকী দাসে।।' (৮)

মহাভারতে উল্লেখ আছে যম প্রসঙ্গ :
সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকট সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি

'চৈতনরহিত হ'ল রাজার তনয়।
ক্রমে ক্রমে আয়ু শেষ হইল তথায়।।
দেখিয়া নৃপতি-সুতা ভাবে মনে মন।
কাল পরিপূর্ণ হ'ল রাজার নন্দন।।
অবশ্য আসিবে হেথাকৃতান্ত-কিঙ্কর।
দেখিবে কেমনে লয় আমার ঈশ্বর।।
সাবিত্রী এতেক ভাবি রহে ঘোর বনে।
হেথায় ডাকিল যত যমদূত গণে।।
সত্যবানে আনিবারে কহে ধর্ম্মরাজ।

আজ্ঞাতে আসিল সব দূতের সমাজ।।
যথায় কাননে পড়ি নৃপতি-নন্দন।
তাহার নিকটে গেল যমদূতগণ।।
পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে।
নিরস্ত হইয় দূত কহে ধর্ম্মরাজে।।
দূতমুখে ধর্ম্মরাজ পাইয়া বারতা।
আপনি আসিল শীঘ্র সত্যবান যথা।।
দেখিয়া সাবিত্রী বলে, ২০ মূরতি অদ্ভুত।।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর।
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর।।
দেখিয়া পতির দশা হয়ে দুঃখমতি।
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি।।
দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে।
কে তুমি, কি-হেতু বল যাবে কোথাকারে।।
কালেতে হইল তব পতির মরণ।
তার জন্য বৃথা চিন্তা কর কি কারণ।।
জগতে নিয়ম আছে সবে এই মত।
কালপূর্ণ হৈলে সবে যায় মৃত্যুপথ।।
আমার বচনে ঘরে যাহ গুণবতি।
ত্বরায় স্বামীর এবে চিন্ত ঊর্দ্ধগতি।।
ধর্ম্মরাজ-মুখেশুনি এতেক উত্তর।
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড়কর।।
যে-কিছু কহিলেন প্রভু সব জানি আমি।
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে করে বিচার-সংযোগ।।
স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে এবে মম এই পতি।
আমার কি সাধ্য করি তাঁর ঊর্দ্ধগতি।।
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম্ম।
ধর্ম্মরাজ-মুখেশুনি এতেক উত্তর।
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড়কর।।
যে-কিছু কহিলে প্রভু সব জানি আমি।

কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে করে বিচার-সংযোগ।।
স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে এবে মম এই পতি।
আমার কি সাধ্য করি তাঁর ঊর্দ্ধগতি।।
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম।।
সুখ-দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর আছে এই নীতি শাস্ত্র মত।।
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি।।
পৃথিবীতে সাধ্বী তুমি নৃপতির সুতা।
তোমার জননী ধন্যা ধন্য তব পিতা।।
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য-সুধারস।
বর লহ গুণবতি, হৈনু তব বশ।।
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর।
যাহার ইচ্ছা মাগি লও আমার গোচর।।
সাবিত্রী কহিল যদি হরে কৃপাবান্।
অপুত্রক আছে পিতা দেহপুত্র দান।।
যম বলে তারে আমি দিনু পুত্রবর।
যাহ শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর।।
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
তব সঙ্গ ছাড়িবারে নাহি চায় মন।।
সতের সংসর্গ যেন কাশীতে নিবাস।
আমারে করিতে চাহ ইহাতে নিরাশ।।
পূর্ব্ব পিতৃপুণ্য বলে নিজ-ভাগ্যবশে।
তোমা-হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে।।
ইহা হতে কর্ম্মবন্ধ না হইল ক্ষয়।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয়।।
এতশুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি।
অমৃত-অধিক শুনি তোমার ভারতী।।
পুনঃ পুনঃ মহানন্দ জন্মাতেছ মনে।

বরমাগি বিনা সত্যবানের জীবনে।।
সাবিত্রী কহিল, যদি কৃপা কৈলে মোরে।
শ্বশুর আছেন অন্ধ, চক্ষু দেহ তাঁরে।।
শমন কহেন, চক্ষু হইবে তাহার।
রজনী অধিক হয়, যাহ নিজাগার।।
বাজার নন্দিনী কহে, সব জান তুমি।
সংসার-বাসনা কভু নাহি করি আমি।।
... ...
এতবলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে।
আনন্দ বিধানে যায় আপনার স্থানে।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।' (৯)

ছড়া, গান, কবিতায় মৃত্যু প্রসঙ্গ

একটি হেটো ছড়ায় পাওয়া যায় যমের কথা। কিছু অংশ হলো এই ঃ

'তৈরি থাক সব নিজের বলতে কিছুই যাবে না সঙ্গে।
এই কথা সার সাধক অনেক বলেছে সোনার বঙ্গে।।
এই জ্ঞান হলে লোভের রোগটি রবেনা মনের কোণে।
মৃত্যুভয় নয় যেতেই হবে যে আজানা যমের বনে।।'

অনেক পল্লীকবি মৃত্যু নিয়ে রচনা করেছেন ছড়া, গান। অনেক ছড়া প্রবাদ হয়ে মুখে মুখে ঘুরছে। একটি হেটোছড়ায় বলা হয়েছিল ঃ

জেনে রাখ ভাই সব মৃত্যু হলো বন্য।
সব ছেড়ে মনে রেখ ঐ মৃত্যু আসন্ন।।
ভয় নয় হেসে বলো করিনাকো ভয়।
জানি মোরা ঘিরে আছে শুধু মায়াময়।।
আজ আছি কাল নেই ইহাই নিয়ম।
সংসার মায়াময় বড়ই কর্দম।।
মায়া, লোভ পাঁক থেকে নিয়ে যাবে যম।
হেসে বলো খুশি মনে তৈরি হরদম।।'

করুণানিধি বন্দ্যোপাধ্যায় 'মহাপ্রয়াণে আশুতোষ' কবিতায় উল্লেখ করেন ঃ

'ওঠে হাহাকার আকাশের ঐ গম্বুজ বিদারিয়া,
শ্মশানের নীল-পিঙ্গল-জ্বালা কলসিয়া দেয় হিয়া।'

জসীমউদ্দীন লিখিত 'কবর' কবিতার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

'এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।।
এতটুকু তারে ঘরে এনিছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক। (১০)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখিত 'শ্মশান' কবিতা ঃ

'বড় ভালবাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু-তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
বিকট অধীর হাসি, যেন ঠাট ছলে।
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে, বায়ু উড়ায়ে যেমতি
পত্র-পুঞ্জ, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি।' (১১)

তিনি 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় উল্লেখ করেন :

'প্রবাসে দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে।
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবন-নদে?' (১২)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ

'আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো
নূরজাহান।
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক-পোকায়
স্পন্দমান।
বাংলার থেকে দেখতে এলাম মরুভূমির

গোলাপ ফুল,
ইরাণ দেশের শকুন্তলা। কই সে তোমার
রূপ অতুল?
পাষাণ-কবর-বোরখা খোলা
দেখব তোমায় সুন্দরী
দাঁড়াও শোভায় বৈজয়ন্তী ভুবন-বিজয়
রূপধরি।' — ইত্যাদি

সৈয়দ এম্‌দাদ্ আলী লিখিত 'সেকেন্দ্রা' কবিতার কিছু অংশ :

'এইখানে মোগলের মুকুট-রতন
শায়িত শান্তির মাঝে; পথিক সুজন
নেহারিয়া এ সমাধি ভক্তিপ্লুত মনে
সম্ভ্রমে নোয়ায় শির; হৃদয় গগনে
ভাসে তার কত ছবি, কত পুণ্য-কথা,
কত বরষের-হায়, কত শতব্যথা।'

নবীনচন্দ্র সেন রচিত 'বুদ্ধের উপদেশ' :

'একদিন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তি নগরে
আছেন সশিষ্যে বসি' পবিত্র বিহারে,
মৃত শিশু বুকে কৃষ্ণা গৌতমী জননী
আসি' শোকাতুর কহে,—"নর-নারায়ণ।
অতুল ঐশ্বর্য্য মম হউক অঙ্গার।
বৈজয়ন্ত সম পুরী হউক চূর্ণিত
দাও বাঁচাইয়া মম বুকের সন্তান,
এক মাত্র শিশুসসম। —একমাত্র ধন
চাহি তব পদে ভিক্ষা। দয়াময় তুমি,
কর দয়া এ দাসীরে। আছে মা তোমার।
পুত্রহীনা মার দুঃখ কে ঘুচাবে আর?
দেহ এই ক্ষুদ্রপ্রাণ। দাও দুটি প্রাণ।
নহে, তব পদতলে লও প্রাণ আর।"
দেখিলেন বুদ্ধদেব করুণ নয়নে
কি গভীর পুত্রশোক। ভাবিলেন মনে—
'হায়। মায়াবদ্ধ জীব কি দুঃখ দারুণ
সহে এইরূপে। সহে জন্ম-জন্মান্তরে।'

কহিলেন,—"মাতঃ। জানি ঔষধ ইহার।
অচিরে করিব তব শোক-নিবারণ।"
আনন্দ মায়ের প্রাণ উঠিল নাচিয়া,
শুষ্কহৃদে প্রবাহের হইল সঞ্চার।
আনন্দ—অশ্রুতে ভাসি' ধুলি-ধুসরিতা
পড়িল চরণে পুনঃ আনন্দে বিবশ।
কহিলেন বুদ্ধদেব,—উঠ মাতঃ। যাও,
আন গিয়া মুষ্টিমেয় সরিষা কেবল।"
সামান্য সরিষা মাত্র। দ্বিগুণ অধীর
হইল আনন্দে প্রাণ কৃষ্ণা গৌতমীর।
চলিল সে রুদ্ধশ্বাসে আছে স্তূপাকার
সরিষা তাহার গৃহে। কহিলেন দেব,—
"সর্ষপ সে গৃহ হ'তে আনিও কেবল
যেই গৃহে কেহ, মাতঃ মরেনি কখন।"
মৃত-পুত্র-বক্ষে কৃষ্ণা মাগিলা সরিষা
গৃহে গৃহে; কিন্তু হায়। মিলিল না গৃহ,
যেইখানে মৃত্যু নাহি করেছে প্রবেশ,
জ্বালায়েছে শোকানল। হইল অতীত
নিষ্ফল ভিক্ষায় দিবা। ধীরে নিশীথিনী।
অবসন্না শোকাতুরা নির্জ্জন প্রান্তরে
বসিল উদাস প্রাণে। খুলিল তাহার
জ্ঞানের নয়ন ধীরে। দেখিল জগৎ
নিশীথিনী-ছায়া-মত কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী
মৃত্যু-ছায়া-সমাচ্ছন্ন। কত শত পুত্র
মরিয়াছে, মরিতেছে। কত পুত্র-চিতা
জ্বলিছে মানব-বক্ষে, শত সংখ্যাতীত,—
ওই মহানগরের দীপালোক-মত।
ধীরে ধীরে নিশীথিনী হইল গভীর।
নিবিল সে দীপালোক। মৃত্যু-পুত্র ক্রোড়ে
উদাসিনী আছে বসি' পূর্ণ আত্মহারা।
দৈববাণী-মত কণ্ঠ কহিল গম্ভীরে,—
"দেখ মাতঃ। হায়। ওই দীপালোক-মত

মানব-জীবনালোক জ্বলি' কিছুক্ষণ,
যায় মিশাইয়া পুনঃ গভীর আঁধারে,
আপনার কর্ম্মফলে। কর্ম্মফলে তব
গিয়াছে চলিয়া পুত্র। যাইবে আপনি
আপনার কর্ম্ম-চক্র কর অনুসার।"

কলকাতায় ভবানীপুরে একটি রাস্তার নাম : নফর কুণ্ডু রোড। নফর কুণ্ডু ছিলেন এক পরহিতৈষী সমাজ সেবক। তিনি ছিলেন ইণ্টালি অঞ্চলে, দেবলেনের 'রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ে'র একজন ভক্ত। ১২ই মে ১৯০৭ সালে তিনি এই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখতে পান, ড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে দু-জন শ্রমিক ম্যানহোলের ভিতর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে। তিনি তাদের টেনে তোলার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই ম্যানহোলের ভিতর নামেন। কিন্তু উঠতে পারেননি। মারা যান। তাঁর পরহিত সেবাকর্ম আত্মাহুতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এক স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি কবিতা লেখেন : 'নফর কুণ্ডু'। কবিতাটি হলো এই :

"নফর নফর নয়,—একমাত্র সেই তো মনিব
নফরের দুনিয়ায়, দীনহীন প্রতি জীবে শিব। (১৩)

একদা 'বসন্তক' সাময়িক পত্রে সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছড়া এবং ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশিত হতো। কলকাতার অনেক ঘটনার কথা 'বসন্তক' কাগজে পাওয়া যায়। 'বসন্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো :

'সবে জলের জন্যে; জ্বলে মরতো,
করতো হাহাকার।
সিদ্ধিরগোলা পচা জল
করতো ব্যবহার।।
তাতে ওলাউঠা দেবীর বড়
হতো কেরামত।
ঘরে ঘরে কান্নাহাটি,
খুলতো যমের বাড়ীর পথ।।
নিমতলার ঘাট হতো,
অতি গুলজার।
কত লোক পুড়তো তার
সংখ্যা করা ভার।। (১৪)

কলকাতায় অনেকে গান গায়। বহু গানের রচয়িতা যে কে জানা যায় না। দেশ স্বাধীন হবার আগে কয়েকটি গান গেয়ে ভিক্ষারিরা ভিক্ষা করত। যেমন, 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। আর

একটি গান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরে কলকাতায় অনেক ভিক্ষারিকে গান গেয়ে ভিক্ষা করতে দেখা যেত। গানটি হলো এই ঃ 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—প্রাণধন, তেজিলেন জীবন, দার্জ্জিলিং-এ গিয়ে'। এই রকম বেশ কিছু গান কলকাতায় ভিখারিরা গেয়ে ভিক্ষা করত। আর একটি গানের কথা 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় উল্লেখ পাওয়া যায়। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো : 'এই মহাশয়ের নাম আর গোপন রাখিতে পারিলাম না, তাঁহার নাম ডেবিড্ হেয়ার সাহেব, এই মৃত মহাত্মা এতদ্দেশের যেরূপ হিতকারী বন্ধু ছিলেন তাহা আবাল বন্ধু বণিতা প্রভৃতি কাহারো অগোচর নাই, ইনি আমারদিগের কুশলের কার্য্যে আপনার সমুদয় সম্পত্তি সংহার করিয়াছিলেন তথাচ সংহারের সময় পর্য্যন্ত স্বীয় মানসিক কল্পনা সুসিদ্ধ করণে বিরত হয়েন নাই, বোধ করি তিনি চরম কালে মৃত্যু চিন্তায় চিন্তিত মাত্র না হইয়া পুত্রতুল্য বালকদিগের চিন্তায় অধিক ব্যাকুল হইয়াছিলেন। উক্ত মহাশয় লোকান্তরিত হইলে কলিকাতাস্থ কোন ব্যক্তি কাতর চিত্তে এক গীত রচনা করেন, ভিখারিরা ভিক্ষাছলে সেই গান গাইয়াছিল।

যথাগীত

কৃপানিধি ডেবিড হ্যারকে কল্লে হরণ।
মরণের, বুঝি নাই কো মরণ।। (১৫)

ডেভিড হেয়ার প্রসঙ্গে অঞ্জলি বসু সম্পাদিত গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

'হেয়ার, ডেভিড (১৭.২.১৭৫৭—১.৬.১৮৪২) ' ... মৃত্যুর পর খ্রীষ্টান গোরস্থানে তাঁক কবরস্থ করা যায়নি। তাঁর প্রিয় কর্মস্থল হিন্দু কলেজ ও পটলডাঙ্গা স্কুলের সামনে কলেজ স্কোয়ারে তাঁর মরদেহ সমাহিত হয়। ...' (১৬)

লালন ফকির একটি গান উল্লেখ করেন জন্ম, মৃত্যু এবং যম প্রসঙ্গে। কিছু অংশ হলো এই :

'জাত গেল জাত গেল বলে
একি আজব কারখানা।।
সত্য কাজে কেউ নয় রাজী
সবই দেখি ত না না না।।
আসবার সময় কি জাত ছিলে
এসে তুমি কি জাত নিলে
যাবার সময় কি জাত হবা
একবার ভেবে তা বলো না।।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মেথর মুচি
এক জলে সবাইতো শুচি
দেখে শুনে হয় না রুচি

যমে তো কাউকে ছাড়বে না।।' (১৭)

কাঙাল হরিনাথের গান :

।। এক ।।

'ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার,
দেখরে আমার মন পামরী।
১। আত্মীয় ডাক্তার বন্দী,
নিরবধি ঔষধ আদি দেবে তারা,
যখন তোর হাত ধরিতে, তর্জ্জনীতে,
না করিবে নড়াচড়া।
২। যখন তারা সবশ অঙ্গ অবশ হ'য়ে,
পড়ে রবে ধ'রে ধরা,
যখন তোর আত্মলোকে,
ডেকে ডেকে
না পাইবে কথার সাড়া।
৩। যে গলায় মধুর স্বরে,
জগতেরে মাতাস্‌
ওরে ঘটে পড়া,
যখন তোর নেই স্বরেতে থেকে থেকে
রব করিবে ঘড়াৎ ঘড়া।
৪। তাই বলি, যাই দেখি চল সত্য পথে
নিত্য নগরেতে ঘোরা,
শুনেছি সেই ধামেতে এই রূপেতে
মরে না রে মানুষ যারা।'

।। দুই ।।

রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন,
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
১। এই যে আমার আমার, সব
ফক্কিকার,
কেবল তোমার নামটী রবে,
হবে সব লীলা সাঙ্গ, সোনার অঙ্গ
ধুলায় গড়াগড়ি যাবে।
২। সংসারের মিছে বাজী, ভোজের বাজী,

সব কারসাজি ফুরাইবে,
তখন রে এক পলকে, তিনি ঝলকে,
সকল আশা ঘুচে যাবে।
৩। তোমার এই আত্ম স্বজন, ভাই পরিজন,
হায় হায় করে কাঁদবে সবে,
তারা ত পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা,
তুমি কথা না কহিবে।
৪। তোমার সব টাকা কড়ি ঘরবাড়ী
ঘড়ি গাড়ি পড়ে রবে,
আবার রে পা থাকিতে, হাত রহিতে,
পরের কাঁধে যেতে হবে।
৫। আগে যে করে হেলা,
গেল বেলা,
সন্ধ্যাবেলা
আর কি হবে,
জগতের কারণ যিনি,
দয়ার খনি,
তিনিই 'মশার' ভরসা ভবে।'

।। তিন ।।

গানের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো)
আছে কি কোন ঠিক তার,
কখন তোমার
নথী উঠে পেশ হইবে।
১। কিবা রাত কি সকালে,
সাঁজ বিকালে,
যে কালে সে মন করিবে,
তখনই নথী ধ'রে অবোধ তোরে,
জবাব দিতে তলব দিবে।
২। সে তলব চিঠি লয়ে
হুকুম পেয়ে।
যখন ধেয়ে দূত আসিবে,
তখন তোর আত্ম স্বজন,

স্ত্রী পরিজন,
করে যতন যে ঠেকাবে।
৩। তখন সেই আদালতে
জজের হাতে,
তখন তোর সপক্ষেতে সাক্ষী দিতে
দুটো কথা কে বলিবে।
৪। যাদের তুই ভেবে আপন,
করিস যতন,
তারা আপন না হইবে,
দেখিস তোর বিপক্ষেতে ছয় সাক্ষীতে,
তাঁর সাক্ষাতে সাক্ষ্য দেবে।
৫। যাদের তুই হেলা করিস,
দেখতে নারিস,
দেখিস রে বিষ শত্রু ভেবে,
হয়ত তাঁর কেহ গিয়ে,
তোমার হয়ে
দুটো কথা তাঁর বলিবে।' (১৮)

পিতৃপুরুষের উপাসনা এবং মৃত্যু প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন :

'আধুনিক পণ্ডিত-সমাজে এ সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে—একটি ধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, অপরটি অনন্ত ঈশ্বরের ক্রমবিকাশ। এক পক্ষ বলেন, পিতৃ পুরুষদের উপাসনা হইতেই ধর্মীয় ধারণার আরম্ভ। অপর পক্ষ বলেন, প্রাকৃতিক শক্তি সমূহে মানবধর্মের আরোপ হইতেই ধর্মের সূচনা। মানুষ তাহার মৃত আত্মীয়-স্বজনের স্মৃতি রক্ষা করতে চায় এবং ভাবে যে, মৃত ব্যক্তিদের দেহ নাশ হইলেও তাহারা জীবিত থাকে। এবং সেই জন্যই সে তাহাদের উদ্দেশে খাদ্যাদি উৎসর্গ করিতে এবং কতকটা তাহাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এই ধারণার পরিণতিই আমাদের নিকট ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে।

মিশর, ব্যাবিলন ও চীনবাসীদের এবং আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের বহু জাতির প্রাচীন ধর্মসমূহ আলোচনা করিলে পিতৃপুরুষের পূজা হইতেই যে ধর্মের আরম্ভ, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। প্রাচীন মিশরীয়দের আত্মা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম ধারণা ছিল—প্রত্যেক দেহে তদনুরূপ আর একটি "দ্বিতীয়" চেতন-সত্তা থাকে। প্রত্যেক মানুষের দেহে প্রায় তাহারই অনুরূপ আর একটি সত্তা থাকে; মানুষের মৃত্যু হইলে এই দ্বিতীয় সত্তা দেহ ছাড়িয়া যায়, অথচ তখনও সে বাঁচিয়া থাকে। যতদিন মৃতদেহ অটুট থাকে, শুধু ততদিনই এই দ্বিতীয় সত্তা বিদ্যমান থাকিতে পারে। সেই জন্যই এই দেহটাকে অক্ষত রাখিবার জন্য মিশরীয়দের এত আগ্রহ

দেখিতে পাই। এই জন্যই তাহারা ঐ-সব সুবৃহৎ পিরামিড নির্মাণ করিয়া ঐগুলির মধ্যে মৃতদেহ রক্ষা করিত। কারণ তাহাদের ধারণা ছিল যে, মৃতদেহের কোন অংশ নষ্ট হইলে দ্বিতীয় সত্তারও অনুরূপ অংশটি নষ্ট হইলে দ্বিতীয় সত্তারও অনুরূপ অংশটি নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা স্পষ্টতই পিতৃপুরুষের উপাসনা। প্রাচীন ব্যাবিলোন বাসীদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এই দ্বিতীয় জীবসত্তার ধারণা প্রচলিত ছিল। তাহাদের মতে—মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবসত্তায় স্নেহবোধ নষ্ট হইয়া যায়। সে খাদ্য, পানীয় এবং নানারূপ সাহায্যের জন্য জীবিত মনুষ্যদিগকে ভয় দেখায়। এমন কি, সে নিজ সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীর প্রতিও সমস্ত স্নেহ-মমতা হারাইয়া ফেলে। প্রাচীন হিন্দুদের ভিতরেও এই প্রকার পূর্বপুরুষদের পূজার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। চীনজাতির মধ্যেও এই পিতৃগণের পূজাই তাহাদের ধর্মের মূলভিত্তি বলা যাইতে পারে এবং এখনও এই বিশ্বাস ঐ বিরাট দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচলিত। বলিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পিতৃ-উপাসনাই সমগ্র চীনদেশে ধর্মাকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে যাঁহারা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন যে, পিতৃপুরুষের উপাসনা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের ধারণা সুষ্ঠুভাবে সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।' (১৯)

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন ঃ

'আদিম মানুষের নিকট প্রথমত: সব কিছুই জীবন্ত, এবং মৃত্যু যে বিনাশ-ইহা তাহার কাছে একেবারেই অর্থহীন। তাহার দৃষ্টিতে মানুষ আসে, চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে। কখন কখন তাহারা চলিয়া যায়, কিন্তু ফিরিয়া আসে না। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষায় মৃত্যুকে বলা হয়, এক প্রকার চলিয়া যাওয়া। ইহাই ধর্মের প্রারম্ভ। এই ভাবে আদিম মানুষ তাহার এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল—তাহারা সব যায় কোথায়?' (২০)

বেদান্তদর্শন-প্রসঙ্গে আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন :

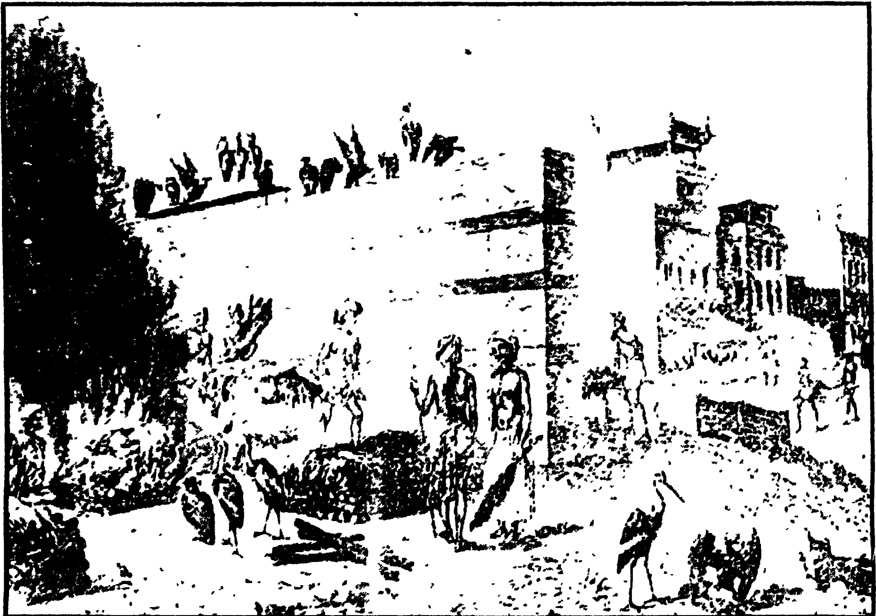
'বেদান্তবাদী বলেন যে, মানুষ জন্মায় না বা মরে না বা স্বর্গেও যায় না এবং আত্মার পক্ষে পুনর্জন্ম একটা নিছক কাহিনী মাত্র। দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যায় যে, যেন একটি পুস্তকের পাতা উলটানো হইতেছে। ফলে পুস্তকটির পাতার পর পাতা শেষ হইতেছে, কিন্তু পাঠকের উহাতে কিছুই হইতেছে না। প্রত্যেক আত্মা সর্বব্যাপী; সুতরাং উহা কোথায় যাইবে বা কোথা হইতে আসিবে? এই-সব জন্ম-মৃত্যুতে প্রকৃতিরই পরিবর্তন হয় এবং আমরা ভুলক্রমে উহাকে আমাদের পরিবর্তন বলিয়া মনে করি। ... ' (২১)

স্বামীজী লিখেছেন :

'চার্বাকেরা ভারতের একটি জাতি প্রাচীন সম্প্রদায়—তারা সম্পূর্ণ জড়বাদী ছিল। এখন সে-সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে, আর তাদের অধিকাংশ গ্রন্থও লোপ পেয়ে গেছে। তাদের মতে আত্মা-দেহ ও ভৌতিক শক্তি থেকে উৎপন্ন ব'লে দেহের নাশে আত্মারও নাশ, এবং দেহনাশের

পরও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তার কোনও প্রমাণ নেই। তারা কেবল ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার ক'রত—অনুমান দ্বারাও যে জ্ঞানলাভ হতে পারে, তা স্বীকার করত না।' (২২) অধ্যাপক সুকুমার সেন উল্লেখ করেন, 'ভাটয়ালী' দেহতত্ত্ব গান। এই গানেও আছে, একা আসা একা যাওয়ার কথা :

'ভবের বাজার ভেঙে গেল রে মন আমার
ও তুই ভবের হাট কি করিলি রে পার।
খোদা যখন শুধাইবে
তুই তখন কি জবাব দিবে
শাস্তি হলে কি ভেস্তে পারে ভেলকী দুনিয়ার।
লেড়কা লেড়কি কবিলা খসম
কেউত মন রে নয় রে আপন
একা আলি একা যাবি ভোজের বাজি এ সংসার।
যদি করতে চাইস ফতে
তবে চল ধরম পথে
খোদাতাল্লার কুদরতে খএর হবে তোর এবার।।' (২৩)



সেকালের হিন্দু সৎকার

সঙের ছড়ায় শ্মশান ঘাট :

বছরের গেজেটের মতো শ্রীরামপুরের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে বটতলার সঙের গান রচিত হত। কখনও সমাজ সংস্কার বা শিক্ষার উদ্দেশ্যেও নতুন-নতুন গান ও ছড়ায় অবতারণা করা হত সঙের মাধ্যমে। মিউনিসিপ্যালিটির কাজের ক্রটি হলে কটাক্ষপাত ও শ্লেষ করে গান রচিত হত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'টুনিমুনি শ্মশান ঘাটের" কথা। শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভের স্নানের ঘাটের পাশে 'টুনিমুনির শ্মশানঘাট।" পূর্বে ঘাট বাঁধানো ছিল না। এমন কি রাতে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। সেই কারণে শ্মশানযাত্রীদের যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে শবদাহ করতে হত।

বটতলার সঙের মুখ দিয়ে শ্মশানঘাটের অসুবিধার কথা উল্লেখ করে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তাদের বলা হয়েছিল ঃ

যাও যাও যাও যাও সবে যাও
টুনিমুনির ঘাট।
প্রত্যয় না হলে কথায়
গিয়ে দেখ কেমন ঠাট।।

উক্ত গান গাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই মিউনিসিপ্যালিটির প্রচেষ্টায় এবং জনৈক ব্যবসায়ীর বদান্যতায় পাকা ঘাট, শবযাত্রীদের বিশ্রামের জায়গা এবং আলোর ব্যবস্থা হয়েছিল।' (২৪)

একসময় আহিরীটোলার সঙে বলা হয়েছিল, নিমতলায় আগুন লাগার কথা। যেমন,

'কলিকাতায় আগুন জ্বলে,
পুড়ে গেল নিমতলা।
নিমতলাতে মানুষ পোড়ে,
যায় পুড়ে কাঠগোলা।।' (২৫)

সেকালের কলকাতার অবস্থা ঃ

কলকাতায় ইংরেজ আগমনের শুরুতে এই অঞ্চলের অবস্থা জানা যায় গ্রাঁপির লেখায়। তিনি উল্লেখ করেন :

'১৭৯০ সালে গ্রাঁপির কলকাতার বর্ণনায় জানা যায় যে, তখন লোকেরা রাস্তার নর্দমায় সমস্ত ময়লা ও আবর্জনা নিক্ষেপ করতো। জীব-জন্তুর মৃতদেহ নর্দমা ও রাস্তায় পড়ে পচতো, এবং তাঁর বাড়ির দরজায় সামনে একটি মৃত নরদেহ দুই রাত ধরে শৃগাল-কুকুরে টেনে ছিঁড়ে খেয়েছিল।

সেকালের কলকাতার ওই রকম বহু বিবরণ পাওয়া যায়। পার্ক স্ট্রীটের পুরাতন সমাধিক্ষেত্রের পাষাণ ফলকগুলি দেখলে চোখে পড়ে বহু নর-নারী সেকালে অতি অল্প-বয়সে অকালে প্রাণ হারিয়েছিলেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে, তখনকার কলকাতায় ডাক্তার এবং কবিরাজের যথেষ্ট অভাব ছিল। বিভিন্ন পল্লীতে বসন্ত, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি রোগ ব্যাপক আকারে মাঝে

মাঝে দেখা দিত ... ।' (২৬)

কলকাতায় কয়েকটি শ্মশান ঘাটে শবদাহ করা হয়। যে স্থানে শবদাহ করা হয়, সেই স্থানকে বলা হয় চিতা। শ্মশানধ্যক্ষ অর্থাৎ চণ্ডাল। শবদাহ কালে প্রয়োজন হয় কলস। প্রবাদ আছে : শ্মশানে লজ্জা থাকে না। মৃত্যুর অধিষ্ঠাতা দেবতা-যম। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে বাঙালী সমাজে অনেক নিয়ম পালন করা হয়। একটি হলো : গলায় কাছা লওয়া। সেই কাছার সঙ্গে একটি লোহার চাবি বেঁধে রাখার সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত আকারে অটুট রয়েছে।

কলকাতায় চিত্রগুপ্তের পূজা :

চিত্রগুপ্ত ইনি যমের কেরাণী। একসময় কলকাতায় কায়স্থ সমাজে চিত্রগুপ্তের পূজা হতো। প্রতি বছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সকালে কলকাতায় ২২নং রাধানাথ মল্লিক লেনের 'বসু মল্লিক' পরিবারের বাড়িতে চিত্রগুপ্তের পূজা হতো। মূর্তি মৃত্তিকায় গড়া হতো। চতুর্ভুজ মূর্তি, গদা, অসি, লেখনী এবং দোয়াত থাকতো হাতে। সামলে থাকতো বাহন মহিষ। পূজার পরে চিত্রগুপ্ত ঠাকুরের বিসর্জন দেওয়া হতো। ... ' (২৭)

কলকাতার বিখ্যাত শ্মশানঘাট ১. নিমতলা. ২. কেওড়াতলা, ৩. সিরিটি, ৪. কাশীমিত্র ঘাট, ৫. কাশীপুর শ্মশান ঘাট।

এইসব শ্মশানঘাটের বিশদ বিবরণ অত্র প্রবন্ধের বিষয় নয়, তাই একটু অন্য প্রসঙ্গ। নিমতলা ঘাটের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঃ

'য়ুরোপের যারা অসামান্য লোক, তাঁদের কথা আমরা বইয়ে পড়েছি, তাঁদের কাছে দেখিনি। কাছে যে দুই একজনকে দেখেছি, য়ুরোপের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁরা স্থান পাননি। অনেকদিন হোলো, একটি সুইডেনের মানুষকে দেখেছিলুম, তাঁর নাম হ্যামারগ্রেন। তিনি সেই দূর দেশে বসে দৈবক্রমে রামমোহন রায়ের কী একটু পরিচয় কোনো একটা বইয়ে পেয়েছিলেন। তাতে তাঁর মনে এমন একটি ভক্তি জেগে উঠেছিল যে, তাঁর দারিদ্র্য সত্ত্বেও দেশ ছেড়ে তিনি বহু কষ্টে সমুদ্র পার হয়ে এই বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হলেন। এখানকার ভাষা জানতেন না, মানুষকে চিনতেন না, তবু বাঙালির বাড়িতেই আশ্রয় নিয়ে এই রামমোহন রায়ের দেশকেই তিনি বরণ করে নিলেন।

যে অল্প কয়দিন বেঁচে ছিলেন, কী দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করে কী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে , অথচ কী সম্পূর্ণ নম্রতার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে এই দেশের হিতের জন্য তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনই ভুলতে পারবেন না। আশ্চর্যের কথা এই, নিমতলার ঘাটে তাঁর মৃতদেহ দাহ করা হয়েছিল, তদুপলক্ষে হিন্দুর শ্মশান কলুষিত করা হোলো ব'লে আমাদের কোনো সাপ্তাহিক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।' (৩৫)

রাধারমণ মিত্র লিখেছেন ঃ

'বাংলাদেশের সুসন্তানদের মধ্যে অকেনেই ছিলেন খ্রীষ্টান—প্রথম যুগে মাইকেল মধুসূদন

দত্ত, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়), কুমারী তরু দত্ত—শেষের দিকে ডাক্তার প্রাণধন বোস, রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর একজন খ্রীষ্টান ছিলেন অপূর্বকুমার ঘোষ। ইনি ব্যারিস্টার, বঙ্গভঙ্গের যুগে শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ও কট্টর সমাজতন্ত্রী ছিলেন। এঁকে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। আর মিঃ রাহার নাম তো কেউ বোধ হয় শোনে নি, সুতরাং ভোলার প্রশ্নই ওঠে না।

মিঃ রাহার নাম ছিল র‍্যানডল্‌ফ ওগিলভি রাহা (Randolph Ogiluie Raha)। এঁর পিতার নাম কমলকৃষ্ণ রাহা। পিতার সমাধি লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে আছে। মিঃ র‍্যানডল্‌ফ রাহা রণেন রাহা নাম নিয়ে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হস্টেল ও মেসের পরিদর্শক হন। তিনি বিবাহ করেন নি। ৩১/১ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেন্ট পল কলেজের হস্টেলে থাকতেন। তিনি মৃত্যুর আগে ১৬-১-১৯৩৯ তারিখে একটি উইল ক'রে যান। তাতে এই নির্দেশগুলি দিয়ে যান ঃ

১. তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর দেহ কোনো হিন্দু শ্মশানে দাহ ক'রে চিতাভস্ম যেন তাঁর পিতার কবরে পুঁতে দেওয়া হয়। ... ' (৩৬)

শব নিয়ে বাজনা :

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কলকাতায় তপসে অঞ্চলে 'হিন্দুগোরস্থান' নামক সমাধিক্ষেত্র আছে। কয়েকটি সম্প্রদায় এই কবরখানায় মৃতদেহ কবর দেবার জন্য নিয়ে যান। কবরখানায় যাবার সময় নানা রঙের কাগজের পতাকা এবং ফুল দিয়ে শবাধার সাজিয়ে রওনা হতেন। কোন কোন শবযাত্রীর সঙ্গে ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা শোনা যেত। কয়েকজন শবযাত্রীকে এই ব্যবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন জনের প্রায় একরকম বক্তব্য শুনেছিলাম। তাঁরা বলেন, এই পৃথিবীতে প্রথম আসার দিনে মানুষ মাটি স্পর্শ করে কাঁদে, নবজাত শিশুর কান্না প্রথম শোনা যায়। তারপর দুঃখ-বেদনার বোঝা নিয়ে চলা হয় শুরু। দুঃখ-বেদনা নিয়ে কেটে যায় সারা জীবন। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার দিনটি এই কারণে তাঁদের কাছে সত্যি আনন্দের মনে হয়। যে যাবার চলে যাচ্ছে। মানুষটিকে আর কোন কষ্ট ভোগ করতে হবে না। অপমান সহ্য করতে হবে না। দুঃখ-বেদনা কিছুই আর স্পর্শ করবে না। পৃথিবী থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। তার কথা এইভাবে চিন্তা করে আনন্দের দিন হিসাবে গান-বাজনা সহ তাকে বিদায় জানায়। (৩৭)

মৃত ব্যক্তিদের নিয়ে লোক বিশ্বাস :

১৯৫০/৫১ সালের কথা। কলকাতায় মানিকতলা খালের পাশ দিয়ে সকাল প্রায় দশটায় আমরা দু-জনে অর্থাৎ আমি এবং অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু যাচ্ছিলাম। খালের ধারে ভিড় দেখে অধ্যাপক বসু বলেন, 'চলো কি হয়েছে দেখে আসি।' আমরা দু-জনে ওখানে ভিড় ঠেলে গিয়েছিলাম।

এক বিহারী ডোম সম্প্রদায়ের মৃতদেহ ঘিরে বহু লোক ছিল দাঁড়িয়ে। মৃতদেহের কাছে কোন মহিলাকে দেখা যায় নি। শুনেছিলাম, মেয়েদের ওই মৃতদেহের কাছে যেতে নেই।

ডোম সম্প্রদায়ের একজন মাটি দিয়ে মৃতের মুখ তৈরি করছিলেন। অধ্যাপক বসু তাঁদের একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মাটির মুখ তৈরি করে কি হবে?' এই রকম আরও কয়েকটি প্রশ্নের পর তাঁরা জানিয়েছিলেন, মৃত ব্যক্তি একজন ভূতের ওঝা ছিলেন। তা' ছাড়া সাপের মন্ত্র জানতেন। তাই ওই মাটির মুখ নিয়ে মূর্তি গড়ে পরে তাঁরা ওই পুজো করবেন। লোকটির মূর্তি পুজো করলে ভূত ধরবে না, সাপ কামড়াবে না।' (৩৮)

গিধোর মুঙ্গের জেলায়, বিহারে। এখানে এক সামন্ত রাজা আছেন। তিনি গিধোরের মহারাজা নাম পরিচিত। নাম—শ্রী প্রতাপ সিং। ইনি বলেন, গিধোরে বেশ কিছু গ্রামঠাকুরের পূজো প্রচলিত। যেমন : ১. সওয়ালাখ, ২. যকরাজ, এঁদের কোন মূর্তি নেই। মাটির বেদির ওপর ধ্বজা থাকে। যাঁদের কোন আত্মীয়-স্বজন বাঘের আক্রমণে মারা গেছেন, তাঁরা পূজা করেন। উদ্দেশ্য, বাঘের আক্রমণ থেকে গ্রামঠাকুর সওয়ালাখ এবং যকরাজ যেন রক্ষা করেন। ওই দুই গ্রামঠাকুরের থান জঙ্গলের কাছে। ঠাকুরের থানে ছাগ, মুর্গি বলি দেওয়া হয়। ফল এবং মুর্গির ডিম গ্রামঠাকুরের নৈবেদ্যতে নিবেদন করার প্রথা আছে। তা' ছাড়া পূজোয় খৈনি, গাঁজা এবং মদ দেবার নিয়ম রয়েছে। পথিক জঙ্গলে যাবার সময় একটু খৈনি বের করে ওই দুই দেবতাকে নিবেদন করেন। কোন গ্রামবাসীর গরু, ছাগল হারালে অথবা অসুস্থ হলে সওয়ালাখ এবং যকরাজ-এর বিশেষ পূজোর ব্যবস্থা করেন। সে সময় ছাগ, মুর্গি বলি দেওয়া হয়। প্রচুর খৈনি, গাঁজা এবং মদ নিবেদন করতে দেখা যায়।

গিধোর রাজপ্রাসাদে সাতজনের উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়। বিশেষ করে উপবীত গ্রহণের সময় এবং ছেলে-মেয়ের বিবাহের আগে ওই সাতজনের উদ্দেশ্যে পুজো দেবার প্রথা গিধোর রাজবাড়িতে বহুদিন প্রচলিত আছে। মহারাজা শ্রীপ্রতাপ সিং জানিয়েছিলেন ঠাকুরের নাম ঃ ১. বিক্রম কেশরী, ২. ঘনশ্যাম, ৩. কোকিল চন্দ্র ইত্যাদি। এঁরা যোদ্ধা ছিলেন। গিধোর রাজপরিবারকে রক্ষার জন্য সেকালে তাঁরা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। রাজপ্রসাদের প্রাচীরের সঙ্গে তুলসীমঞ্চ আছে। সেখানে তাঁদের উদ্দেশ্যে পূজা হয়। তাঁদের বংশধরেরা বংশ পরম্পরায় পূজা করেন। পূজারীদের 'চটিয়া' বলা হয়। বিশেষ পূজার সময় ছাগ বলি দেওয়ার নিয়ম আছে। মৃতের স্মৃতির অনুষ্ঠান নানা ভাবে বিহারে প্রচলিত আছে। ... ' (৩৯)

সুবোধ ঘোষ, 'পূর্ব-পুরুষ পূজা' প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'মৃতের প্রতি সংস্কার এবং পূর্বপুরুষ পূজার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হলো উর্বরতাবাদ। গঞ্জাম জেলার শবরেরা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে, কিন্তু তার উদ্দেশ্যে একটা আত্মামূর্তি বা বৃষকাষ্ঠ তৈরি করে রাখে। খেত থেকে ফসল তোলার সময় এই বৃষকাষ্ঠ ফেলে দিয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে একটি এক-প্রস্তর (Monolith) স্থাপিত হয়। দেখা যাচ্ছে যে, ফসল তোলার (Havest) সম্বন্ধে সংস্কার আর মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে সংস্কার—উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের

শবরের মৃতদেহ ভূপ্রোথিত করার প্রথা আছে। তারা সারা বছরের মৃতদেহগুলিকে একটা জায়গায় ভিন্ন করে সরিয়ে রাখে। বীজ-বপনের সময় এলে সব মৃতদেহগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূপ্রোথিত বা সমাধিস্থ করা হয়। মৃতের আত্মা-বস্তু যথাসময়ে মাটির মধ্যে প্রবেশলাভ করল। ফলে মাটির উর্বরতা বা শস্য প্রসূতা নিশ্চয় বাড়লো। বীজবপনের পূর্বে মৃতের আত্মা-বস্তু দ্বারা ভূমিকে যেন উর্বর করে নেওয়া হলো—শবরের শব-সংস্কারের প্রথার মধ্যে এই উর্বরতার সংস্কার সুস্পষ্ট দেখা যায়।

খেতে শস্যের শিষ যখন দেখা দিয়েছে, ছোটনাগপুরের ওরাওঁরা সেসময় মৃতদেহকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাধিস্থ করে না। ভিন্ন একটা জায়গায় সাময়িকভাবে পুঁতে রাখে। পরের বছর, খেতে শস্যের শিষ দেখা দেবার আগে মৃতদেহকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাধিস্থ করা হয়। এটাও আত্মা-বস্তুকে অপচয় থেকে রক্ষা করার ও সার্থক করার সংস্কার। শস্যের শিষ যখন দেখা দিয়েই ফেলেছে তখন আত্মা-বস্তুকে মাটিতে মিশিয়ে অকারণ উর্বরতা প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন নেই। বীজবপনেন সময়ই ভূমিকে উর্বর করার জন্য আত্মা-বস্তুকে ভূমিশ্রিত করা প্রয়োজন।

এটা হলো একটা দিক, মৃতের আত্মা-বস্তু ও ভূমির মধ্যে উর্বরতাগত সম্পর্ক। মৃতের প্রতি প্রাচীন মানুষের আর একটা সংস্কার হলো জলের সম্পর্কে। সাঁওতালেরা মৃতের অস্থি দামোদরের জলে নিক্ষেপ করে, হিন্দুরা গঙ্গার জলে ফেলে, কাছাড়ীরা কপিলি নদীর জলে ফেলে এবং পানোয়ার আদিবাসী নর্মদার জলে মৃতের অস্থি নিক্ষেপ করে। রেংগামা নাগারা মৃতের সমাধির ওপর ক্ষুদ্র একটা জলাধার রচনা করে। প্রায় প্রত্যেক আদিবাসী গোষ্ঠী মৃতের সমাধির ওপর জল ছিটায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শব সংস্কারের সঙ্গে মাটির মতো জলেরও একটা সম্পর্ক রয়েছে। এটাও যে উর্বরতাবাদের সংস্কার সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মাটির মতো জলকেও আত্মা-বস্তু দ্বারা উর্বর করার প্রক্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায়, বৃষ্টিকে আহ্বান করার প্রক্রিয়া, যাতে শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায় বা অক্ষুণ্ণ থাকে।

জলের সঙ্গে উর্বরতার সংস্কার খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে। জল উর্বরতার প্রতীক। ... ' (৪০)

মৃত্যু, শোক, শ্মশানঘাট, কবর প্রভৃতি সামান্য পরিসরে এতগুলো দিক আলোচনা করতে গিয়ে এই নিবন্ধটি পূর্ণতা হয়তো পায়নি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কী কী আচারের মধ্যে যেতে হয়, তার বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টাও এই নিবন্ধে। এর সঙ্গে উল্লেখ করা হলো নানারকম লোকবিশ্বাস। সামাজিক, পারিবারিক, আঞ্চলিক এবং সম্প্রদায়গত শবসৎকার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রধান দুটি অঙ্গ-মৃতদেহের ব্যবস্থা ও ধর্মীয় কার্যকলাপ। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা আছে। হিন্দুরা অশৌচ পালন এবং শাস্ত্রীয় মতে। শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য, নিমন্ত্রণ পত্রে প্রথমে লেখা হয় 'গঙ্গা। মৃত্যু, শোক প্রসঙ্গে আছে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক। তাঁর বিহঙ্গচারণা গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো :

· 'ঘুঘু ও কপোত পুরাণে খুব বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। শ্বেত কপোত নানা কাব্যময় অনুভূতির প্রতীক। লাল এবং গাঢ় বর্ণের ঘুঘু কপোত নানা ভালো-মন্দর মিশ্রিত অনুভূতির প্রতীক। ঋগ্বেদে যে ধূসর এবং গাঢ় বর্ণের কপোতের কথা বলা হয়েছে, সে কপোত মৃত্যু-বোধের সঙ্গে জড়িত। প্যাঁচা, যা মৃত্যুর সঙ্গে নিশ্চিত ভাবে জড়িত, সেই তার সঙ্গে যখন কপোতের উল্লেখ করা হয়। তখন কপোতের মধ্যেও মৃত্যুর উৎসঙ্গ এসে পড়ে। ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের ১৬৫-সংখ্যক সুক্তে কপোতকে নিবুতি ও যমের দূত বলা হয়েছে। কপোত অগ্নিস্পর্শ করলে তা মহা অমঙ্গলের সূচনা করে বলেও উক্ত হয়েছে। ... ' (৪১)

ড. ভৌমিক আরো লিখেছেন :

'মৃত্যু মানেই পূর্বপুরুষের সঙ্গে যোগ, হাওড়ার লক্ষ্মী প্যাঁচা সংক্রান্ত আচারটি লক্ষ করলে সহজেই মনে হয় লক্ষ্মী প্যাঁচা এখানে ধনদেবীর সঙ্গে যতখানি যুক্ত, তার চেয়ে বেশি সে পূর্বপুরুষের প্রতীক। বস্তুত সেই পথেই লক্ষ্মীপ্যাঁচা এখানে দেবত্ব অর্জন করেছে।

কাকও পিতৃপুরুষের প্রতীক। কাকের মাধ্যমেই, পশ্চিম ভারতে, প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে পিতৃপক্ষের সূচনা হলে, মৃত পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি নিবেদিত হয়ে থাকে।

পূর্ববঙ্গে মৃতাশৌচকালে কাকের উদ্দেশে দেওয়া হয় "কাকলি" (কাকবলি)। মরণের পর আশ্রাদ্ধ দিবস প্রতিদিন গৃহাঙ্গণে কেউ দেয় শুকনো চাল, কেউ বা কলা পাতায় করে রাঁধা ভাত। কাক না খেলে অশৌচ পালনকারীও খেতে পারে না। কাকের মাধ্যমেই মৃতাত্মা অন্নগ্রহণ করে বলে বিশ্বাস। কাকের প্রতি এই "বলি" দানপ্রথা বাঙলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই চলিত আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বিশেষত্ব হলো—অশৌচ পালনকারী জানতে চায়, মৃতাত্মা কাকের মাধ্যমে নিবেদিত খাদ্যগ্রহণ করছে কি না। দূরে হাত জোড় করে শ্রদ্ধাবিনত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অশৌচ পালনকারী কাককে সেই খাদ্যগ্রহণ করতে বারংবার অনুনয় করে। কাকে কোনো কারণে তা গ্রহণ না করলে কোনো অনিয়ম বা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে বলে মনে করা হয়। সন্ধ্যা পর্যন্তও কাক যদি তা গ্রহণ না করে তবে অশৌচ পালনকারী অনাহারেই থাকে।' (৪২)

ড. ভৌমিক লিখেছেন :

'এই কারণেই সাদা মুরগীর ডাককে নিশাচর ভূত-প্রেত নাকি মোটেই আমল দেয় না, কালো মুরগীর ডাকে শয়তান নাকি উড়ে পালায়। মৃতের পরলোকে যাত্রাপথ দৈত্যশূন্য করবার জন্যে চীনদেশে শবাধারের ওপর একটি সাদা মোরগ দেওয়া হয়; এখানে কালো রঙের বদলে সাদা রঙটি লক্ষণীয়। ইংলণ্ড ও ইউরোপের বহু অঞ্চলেই বিশ্বাস আছে, অনেক ডাইনীই কালো মুরগী নিয়ে ঘোরে। .... ' (৪৩)

তিনি আরো লিখেছেন :

প্যাঁচা অশুভ পাখি, কারণ প্যাঁচার বাচ্চারা নাকি মা-কে খেয়ে ফেলে। সেই জন্যে প্রবাদ

আছে : "The owl is an unfilial bird," চীনে বিশ্বাস আছে : প্যাঁচার কণ্ঠস্বর হল—এক দৈত্য ও প্রেতাত্মা কর্তৃক অপর দৈত্যকে আহ্বান। ইউরোপে মনে করা হয়, চার্চ বা গীর্জা সন্নিহিত অপদেবতারা প্যাঁচা ও বাদুড়ের রূপ ধারণ করে। বেদুয়িনরা মনে করে, প্যাঁচা এক নির্দয় বৃদ্ধা রমণীর আত্মা, আপন সন্তানকে একটি ঝাঁঝরি বা চালুনি আনতে ভুল করায় যে হত্যা করেছিল। প্রতি রাত্রে সে প্যাঁচা হয়ে উড়ে বেড়ায়, বেদুয়িনদের ভয় চামড়ার তাঁবুতে যদি প্যাঁচা এসে বসে, তবে ভেতরের শিশুর মৃত্যু হবে। এই জন্যে বেদুয়িনরা চামড়ার তাঁবুর ওপর একটি ঝাঁঝরি বা ফুটো করা সসপ্যান উল্টো করে রেখে দেয়, যাতে আপন সন্তান হত্যার কাহিনী মনে পড়ায় সে সেখান থেকে চলে যায়। রোমানদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, প্যাঁচা (The screech owl) অল্প বয়সী শিশুদের রক্ত চুষে খায়। স্ত্রী প্যাঁচার চেয়ে পুরুষ প্যাঁচান ইটালি, জার্মানি, রাশিয়া ও হাঙ্গেরীতে অধিকতর ভয়ঙ্কর, অশুভ এবং মৃত্যুর আসঙ্গপূর্ণ। তাতারেরা প্যাঁচাকে দূরে রাখবার জন্যে প্যাঁচারই পালক পরিধান করে।' (৪৪)

ড. ভৌমিক উ: বঙ্গের রাজবংশীয় প্রসঙ্গ এনে লেখেন :

'উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে "মাশান" (< শ্মশান) নামে আঠারোটি অপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে। তার মধ্যে একজন "মাশানে"-র নাম—"কুহুলীয়া মাশান"। কোকিলকে উত্তরবঙ্গে বলে "কুহুলী"; যে মাশান গাছের ডালে বসে, কোকিলের মতো মিষ্ট কণ্ঠের অনুকরণে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিপদে ফেলেন, তিনি "কুহুলীয়া মাশান"। (৪৫)

মহুয়া ভট্টাচার্য লিখেছেন 'কলকাতার শ্মশান ও করবস্থান'। কিছু অংশ হলো এই : '১৯৮৫ সালের আগে পর্যন্ত কলকাতা করপোরেশন এলাকায় শ্মশানঘাট ছিল চারটি। ১৯৮৫ সালে যাদবপুর, বেহালা ও গার্ডেনরীচ এই তিনটি মিউনিসিপ্যালিটি করপোরেশনে যুক্ত হওয়ায় এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরও তিনটি নাম। ১. গড়িয়া মহাশ্মশান, ২. সিরিটি শ্মশান (বেহালা) এবং ৩. বিরজুনালা (গার্ডেনরীচ)।' (৪৬)

মহুয়া ভট্টাচার্য চুল্লী প্রসঙ্গে লেখেন :

'১৯০৩ সালে ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রীটে তৈরি হয়েছিল একটি গ্যাস ক্রিমেটোরিয়াম। এখানে গ্যাস চুল্লীতে শবদাহ হত।' (৪৭)

পার্ক স্ট্রীটের এক সময় নাম ছিল বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড। লোয়ার সার্কুলার রোড এবং পার্ক স্ট্রীটের বেশ কিছু অংশের দু-পাশে ছিল কবর। ভবানীপুরে আছে ওল্ড মিলিটারি সেমিট্রি। তা' ছাড়া আরও আছে কবরখানা যেমন—খ্রিস্টীয় ধর্মীয় ধর্মাবলম্বীদের কবর : ১৮৪, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, ২৫৯, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬। তা' ছাড়া আছে আরও কয়েকটি।

গোবরায় আছে মুসলিম বেরিয়াল গ্রাউণ্ড, সার্কুলার রোডের পূর্বদিকে মানিকতলায় এবং একবালপুরে। খিদিরপুরের কবরখানার আর এক নাম : ঘোলমানা কবরখানা। একটি মসজিদের সঙ্গে একই বেষ্টনীর মধ্যে কবরখানা। মসজিদের নাম : জাম-এ-মসজিদ। টিপুসুলতানের

পরিবারের কবরখানা টালিগঞ্জ এলাকায়। কালীঘাট সতীশ মুখার্জী রোজে প্রিন্স গোলাম মহম্মদের পরিপারের কবরস্থান। তা' ছাড়া কলকাতায় আরও কয়েকটি কবরস্থান আছে।

চীনাদের বসতি আছে চায়না টাউনে। এখানে চীনাদের সমাধিক্ষেত্র আছে। মহুয়া ভট্টাচার্য লিখেছেন :

'এরপর আলাদাভাবে উল্লেখ করা যায় পার্সীদের 'Tower of Silence'-এর কথা। পার্সীরা অগ্নিউপাসক। এঁদের ধর্মে নিয়ম হল মৃতের শরীরকে কোনও উঁচু খোলা জায়গায় ফেলে রাখা, যাতে শকুন ইত্যাদি এসে তার মাংস খেয়ে যেতে পারে। ... ' (৪৮)

পার্সীদের "Tower of Silence" প্রসঙ্গে 'The Encyclopedia of Religion' গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

'While fire temples have their own endowments and boards of trustress, most other parsi institutions are usually managed on a citywide basis by the anjuman, or community organization, in Bombay, Poona and Surat, the anjuman council is known as the panchayet. A community's properties include the dakhmas, or "towers of silence," cylindrical walled structures open to the air, in which the corpses of the dead are placed so that their flesh may be consumed by vultures. ...' (49)

সূত্রনির্দেশ :

১. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেব-দেবী ও লোক বিশ্বাস (২০০১), পৃষ্ঠা ৭৩।
২. স্বামী নির্মলানন্দ, দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন, (১৩৭৩), পৃষ্ঠা ২১৭।
৩. স্বামী নির্মলানন্দ, দেব-দেবীও তাঁদের বাহন, (১৩৭৩), পৃষ্ঠা ২৩২।
৪. রামেশ্বর, শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন, অধ্যাপক যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, প্রকাশক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, (১৯৫৭), পৃষ্ঠা ২০।
৫. স্বামী নির্ম্মলানন্দ, দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন, (১৩৭৩), পৃষ্ঠা ৬৭।
৬. স্বামী নির্ম্মলানন্দ, দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন, (১৩৭৩), পৃষ্ঠা ১৬৫।
৭. স্বামী নির্ম্মলানন্দ, দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন, (১৩৭৩), পৃষ্ঠা ঐ।
৮. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত, মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত, (১৩৮৪), পৃষ্ঠা ২৫৭।
৯. কাশীরাম দাস-এর কাশীদাসী মহাভারত,—তীর্থপতি দত্ত সম্পাদিত (১৯৮৫) বনপর্ব, পৃষ্ঠা ৪৩৭।
১০. জসীমউদ্দীন, কবর, সুচয়নী, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা (১৯৯২), পৃষ্ঠা ১৯।
১১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্মশান, মধুসূদন রচনাবলী, ডক্টর ক্ষেত্রগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, (১৯৮৫), পৃষ্ঠা ১৭০।

১২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'বঙ্গভূমির প্রতি', ঐ।
১৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবিতা সংগ্রহ, (১৯৮৮), পৃষ্ঠা ১৮০, প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
১৪. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা প্রসঙ্গে : ছড়া, গান, কবিতা (১৯৮৮), পৃষ্ঠা ৮৪।
১৫. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ৮৭।
১৬. অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, (১৯৭৬), পৃষ্ঠা ৬১১।
১৭. লালন-গীতি, সুশান্ত হালদার সম্পাদিত, লালন প্রয়ান শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, মহাত্মা লালন ফকির তিরোভাব শতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি। আসাননগর, কদমখালি ভীমপুর, নদীয়া (১৯৯০), পৃষ্ঠা ১০২।
১৮. কাঙাল হরিনাথ, অমর দত্ত—সম্পাদনা, কাঙাল হরিনাথের গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, (১৩৯৭), পৃষ্ঠা ১১৮, ১২০, ১২৩।
১৯. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড (১৯৯৫), পৃষ্ঠা ৮৫।
২০. স্বামী বিবেকানন্দ, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ১৬৯।
২১. স্বামী বিবেকানন্দ, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ২৩৩।
২২. স্বামী বিবেকানন্দ, ঐ, চতুর্থ খণ্ড (১৯৯৬), পৃষ্ঠা ১৮২।
২৩. সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, (১৪০০), পৃষ্ঠা ১৩৯।
২৪. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে (১৯৭২), পৃষ্ঠা ৭৮, প্রকাশক : এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।
২৫. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা প্রসঙ্গে : ছড়া-গান-কবিতা, (১৯৮৮), পৃষ্ঠা ৩১।
২৬. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, হেটোবই-হেটোছড়া, (১৯৮৪), পৃষ্ঠা ৬৭।
২৭. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার মাটি ও মানুষ (১৯৮৯), পৃষ্ঠা ১৮৭।
২৮. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা—দর্পণ, (১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২৫৭।
২৯. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা—দর্পণ, (১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২৬৪।
৩০. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা—দর্পণ, (১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২৬৫।
৩১. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা—দর্পণ, (১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২৬৮।
৩২. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা—দর্পণ, (১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২৬৯।
৩৩. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা—দর্পণ, (১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২৬৯।
৩৪. হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের (১৯৯১), পৃষ্ঠা ৫৭৬।
৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পথের সঞ্চার (১৩৪৬), পৃষ্ঠা ৩, প্রকাশক : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
৩৬. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা-দর্পণ (১৯৯৭), পৃষ্ঠা ১৪২।
৩৭. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবনে লোক সংস্কৃতি (১৩৯৭), পৃষ্ঠা ৪০।
৩৮. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবনে লোক সংস্কৃতি (১৩৯৭), পৃষ্ঠা ৫৪।
৩৯. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবনে লোক সংস্কৃতি (১৩৯৭), পৃষ্ঠা ৫৪।
৪০. সুবোধ ঘোষ, ভারতের আদিবাসী, (১৯৯৪), পৃষ্ঠা ১০৬।

৪১. ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক, বিহঙ্গচারণা (১৯৮৫), পৃষ্ঠা ১৬৩।
৪২. ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক, বিহঙ্গচারণা (১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৪০১।
৪৩. ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক, বিহঙ্গচারণা (১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৪১৭।
৪৪. ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক, বিহঙ্গচারণা (১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৪১৮।
৪৫. ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক, বিহঙ্গচারণা (১৯৮৫), পৃষ্ঠা ৪২০।
৪৬. মহুয়া ভট্টাচার্য, কলকাতার শ্মশান ও কবরস্থান, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত—বিষয় কলকাতা, (১৯৯৩), পৃষ্ঠা ৬৪১।
৪৭. মহুয়া ভট্টাচার্য, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ৬৪২।
৪৮. মহুয়া ভট্টাচার্য, ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ৬৫২।
৪৯. Mircea Eliade, editor in chief, The Encyclopedia of Religion, volume-11, (Page 200), Published by Macmillan Publishing company, NewYork. □



স্কেচ : রমাপ্রসাদ দত্ত

❑ লেখক পরিচিতি : লোক-সংস্কৃতি গবেষক, গ্রন্থকার, স্বাধীনতা সংগ্রামী।

শ্মশান : সৎকার, ভূত- প্রেত,মন্ত্রতন্ত্র

সুভাষ মিস্ত্রী

এক

'শ্মশান'—শবদাহ স্থান, মশান। মৃত্যুতে পৃথিবী নামক এক মহাজাগতিক দ্বীপে মানুষ 'শব' হয় জীবের অনিবার্য পরিণতি শব হওয়া বা মৃত্যু। মৃত্যু নামক আশ্চর্য অমোঘ সত্যে বিলীন হয়ে যায় শরীর নামক মহান সৃষ্টি বা স্মারক চিহ্ন। কৃত্যানুযায়ী সাময়িক ও ন্যূনতম স্মৃতি ব্যতিত অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। শূন্য শূন্য শূন্য ক্ষিতি-মরুৎ-ব্যোম্। জলও মৃত্যুর পুন পুনঃ পথপরিক্রমণে অবশেষে 'আত্মা' লীনপ্রাপ্ত হয় পরমব্রহ্মে।

'শ্মশান' বলতে বর্তমানে শবদাহ নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট স্থানকেই সনাক্ত করা হয়। যদিও, জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নতর। মৃত্যুর পর মৃতদেহ সৎকার পরম কর্তব্য রূপে বিবেচিত। কিন্তু, সৎকারের পরম কতব্যটুকু নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী। খ্রিস্টান ও মুসলমান ধর্মালম্বীগণ শবদেহ ভূনিম্নে প্রোথিত করে। পার্শিরা পাহাড় বা টিলার চূড়ায় রেখে আসে শকুন জাতীয় পক্ষীর ভক্ষ্য হিসাবে। আন্দামানীরা দীর্ঘ ক্রন্দনের পর মৃতের দেহে সাদা ও লাল রং মাখায় এবং ১০/১২ ফুট উঁচু গাছের মাথায় মৃতদেহ রেখে স্থান ত্যাগ করে। গারোরা মৃতের পায়ের আঙুলে মোরগ বেঁধে দেয় ও স্বর্গে যাবার পথ খরচা দিয়ে দেয়। নাথ ও যুগী সম্প্রদায় মৃতদেহ অর্ধেক পুঁতে রাখে। হিন্দুধর্মাবলম্বী অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃতদেহ দাহ করলেও কোনো কোনো সম্প্রদায় ভূনিম্নে প্রোথিত করে। বহু ক্ষেত্রে দাহ ইত্যাদি খরচ সংকুলানে অক্ষম ব্যক্তিগণ মৃতদেহ পবিত্র স্রোতস্বিনীতে ভাসিয়ে দেয়। অতীতে মৃত্যুপথ-যাত্রী গঙ্গাতীরে আনিত হত। অধিকাংশ মৃতের সৎকার হয় গঙ্গা বা গঙ্গা প্রতীকে যে-কোনো নদীতীরে। প্রথানুযায়ী মানুষের 'অস্থি' নিয়ে আসা হয় গঙ্গা বা সাগরসঙ্গমে। এমনকী মৃত্যুর অপর নাম 'গঙ্গাযাত্রা' বা 'গঙ্গ াপ্রাপ্তি' লোক বিশ্বাস অনুযায়ী পতিত পাবনী গঙ্গার পবিত্র জলস্পর্শে নিখিল মানবের সকল মালিন্য হিংসা দ্বেষ পাপ তাপ মুছে যায়। নির্বাণের যাত্রাপথ হয় সুগম। আত্মার অক্ষম স্বর্গলাভ ঘটে। গঙ্গা একাধারে দেবী ও জননী, গঙ্গানদী প্রবহমান জীবন দ্যোতক—পার্থিব সকল শুদ্ধকরণের মূলাধার।

যে অর্থে শ্মশানকে শ্মশান রূপে চিহ্নিত করা হয়, তামাম সুন্দরবনে তা লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। ব্যতিক্রম মুসলিম ও খ্রিস্টান অধ্যুষিত পাড়া। সর্বত্র না হলেও মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়দের জন্য গোরস্থান বা সমাধিস্থল নির্দিষ্ট আছে। সমস্ত হিন্দুগণ মূলত নদীতীর, কিছু খাল কিনারায় অথবা বাস্তু সংলগ্ন নির্বাচিত স্থানে দাহকর্ম সুসম্পন্ন করে।

দুই

শ্মশান সাধারণত নির্জন, ফাঁকা ও জনবসতিশূন্য। ইতস্তত গাছগাছালি, ভগ্নমন্দির কোথাও

কোথাও থাকে। একটা গা ছমছমানি চাপা দীর্ঘশ্বাস যুক্ত পরিবেশে ছড়ানো ছিটানো পোড়া কাঠ, কয়লা,ভাঙা কলসি, পোড়া বা ছিন্ন বিছানাপত্র, শবভূক পশুপাখি ইত্যাদির বিচরণ স্বাভাবিক ব্যাপার। শ্মশান মন্দিরে অধিষ্ঠিতা থাকেন শ্মশানচারিণী কল্পিত কালিকামূর্তি। শ্মশানচারী অর্থে শিব ও শিবানুচর ভূত-প্রেতের অবস্থিতি শ্মশানপুরীকে মৌনমুখর করে তোলে। শবাগম ঘটলে নিটোল স্তব্ধতা মুহূর্তে জঙ্গমতা পায়।

শবদাহের জন্য প্রয়োজন অগ্নিকুণ্ড বা চিতা। চিতায় দাহ হিন্দু বা বাঙালির সুদীর্ঘ ঐতিহ্য লালিত একটি প্রথা। আয়তকার ৩১/২ হাত দৈর্ঘ্য, ২ হাত প্রস্থ ও ৩ হাত গভীর গর্তের চারকোণে চারটি মজবুত খুঁটি পুঁতে তার মধ্যে একটার উপর একটা কাঠ আড়েদৈর্ঘ্যে রেখে চিতা রচনা হয়। প্রাচীন অতীতে চন্দন কাঠের চিতা রচনার প্রথা ছিল। ঘটমান বর্তমানে চন্দনকাঠ ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় অগ্নিপ্রজ্বলন সহায়ক সাধারণ কাঠই ব্যবহার হয়। সুন্দরবনের গাঁ পাড়ায় মৃতের বাড়ির গাছ কেটে বা আত্মীয়ের দেওয়া কাঠে শবদাহ হয়ে থাকে।

প্রতিটি মানুষ নিজেকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসে এবং মানুষ প্রথম তার জীবন সম্বন্ধে ভাবতে শেখে জীবনেরই অবসানে। মৃত্যু যেন এক দুর্বোধ্য রহস্যে ভরা। চেতনার গভীরে মৃত্যুই হঠাৎ অনুভব করতে শেখায় পরিচিত প্রাত্যহিক ভাবনা চিন্তার বাইরে আহার আশ্রয় নিদ্রার অতিরিক্ত অন্যতর অস্পষ্ট এক আভাস। দুর্বোধ্য রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বিস্মিত, বিহ্বল, উদ্‌ভ্রান্ত। কিছুক্ষণ আগে যে ছিল অথচ এখন নেই এই অনুভূতি বিস্ময়ের বিপ্লব ঘটায়। বক্ষবিদীর্ণ হাহাকার তাকে দুমড়ে-মুষড়ে দেয়। স্বজন-সুজন ও শোক ক্রন্দন করে। তারপর একসময় দার্শনিক উপরোধে সান্ত্বনা খোঁজে মৃত্যুতে মৃতের সবকিছুর মৃত্যু হয় না। প্রথাকে মান্য করে হরিধ্বনি সহ সযতনে মৃতদেহ ঘরের বাইরে আনা হয়। আঙিনায় কাটা হয় যমপুকুর। আগুন, তুলসি, ধূপ, চন্দন,পুষ্প ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। মাথা উত্তর দিকে রেখে শোয়ানো শব ফুল দিয়ে সাজানো চৌকি বা দোলায় করে সমাধিক্ষেত্রে আনা হয়। চৌকি বা দোলায় কাঁধ লাগায় পুত্র বা পুত্রস্থানীয়গণ। অথবা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সঙ্গে শ্মশানবন্ধু, পরিবার পরিজন থাকে। হরিধ্বনি বা নামকীর্তন গাইতে গাইতে পথে পথে খই ও পয়সা ছাড়ানো হয় মৃতের পরিবারের পক্ষে। চিতায় মৃতদেহ শোয়ানোর পূর্বে স্নান করিয়ে তেল হলুদ-ঘি-চন্দন ইত্যাদি মাখানো হয়। নতুন বস্ত্র পরানো হয়। দু পায়ের ছাপ রাখা হয় কিংবা ছবি তোলা হয়।

চিতায় মৃতদেহ উত্তর দিকে মাথা রেখে শোয়ানোর সংস্কার সুবিদিত। তবে ক্ষেত্রবিশেষে দক্ষিণদিকেও মাথা রক্ষিত হচ্ছে। মূলত মৃতদেহ চিতায় শুইয়ে অগ্নিদাহের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সূচনা 'মুখাগ্নি' নামক লোকাচার পালন প্রক্রিয়ার। মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্রই প্রথম মুখাগ্নি করার অধিকারী । অন্যরা ছুঁয়ে থাকে বা ক্রমান্বয়ে অগ্নিসংযোগ করে। পুত্রের অবর্তমানে দত্তক বা ভ্রাতুষ্পুত্র এমনকী কন্যাও মুখাগ্নি করে থাকে। নগ্নপায়ে মুখাগ্নিকারী মৃতের দিকে না তাকিয়ে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে। শ্মশানবন্ধুদের একজন ঘি মাখানো মশাল সাতবারের মাথায় হাতে ধরিয়ে দিলে মুখাগ্নিকারী মশালটি মৃতের মুখে স্পর্শ করে। এরপর অন্যান্যরা পরিপূর্ণভাবে

চিতার অগ্নিসংযোগে ব্রতী হয়। শবদাহকালীন সময়ে হরিনাম সংকীর্তন, স্মৃতিচারণ ইত্যাদি চলে। এক সময় চিতায় ভস্মীভূত দেহ থেকে একটুকু 'অস্থি' সংগ্রহ করে মাটির আধারে রাখা হয় যা প্রথানুগত্যে পরবর্তী পর্যায়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

শবদাহ সম্পূর্ণ হলে পার্শ্বস্থ নদীর জল দ্বারা চিতা নিভিয়ে দেওয়া হয়। ম্রিয়মান চিতায় বসিয়ে দেওয়া হয় পূর্ণ কলস। পুত্রগণ স্নান করে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণান্তে উক্ত কলস অতিক্রম করে দুপায়ের মধ্যদিয়ে কলসির গায়ে কুঠারাঘাত করে সোজা গৃহাভিমুখী হয়। একবারও পিছন ফিরে তাকাবার নিয়ম নেই। পারলে শ্মশানে অথবা বাড়ি ফিরে পুকুরঘাটে জ্যেষ্ঠপুত্র বা পুরোহিত বা নাপিত দ্বারা মৃতের স্ত্রীর হাতের শাঁখা নোড়া বা শিলার আঘাতে ভেঙে সিঁদুর মুছিয়ে দেয়। তারপর স্নানাদি সমাপনান্তে উত্তরীয় ধারণ, নতুন বস্ত্রপরিধান, যমপুকুর প্রণামাদি ক্রিয়া সারা হয়। শুরু হয় 'অশৌচ' পালন। অবশ্য বিদ্যুৎচুল্লিতে মৃতের সৎকার প্রক্রিয়া সম্পাদন ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে।

তিন

ভূনিম্নে প্রোথিত 'কবর' প্রথার সূচনা আনুমানিক ৬০,০০০ বছর পূর্বে নেআনডার্টাল মানবের করালে। এঁরা গুহার মাটি খুঁড়ে সযত্নে শব রক্ষা করত। শব রক্ষিত হত পূর্ব-পশ্চিম বরাবর, কখনও বা হাঁটু মুড়ে, সঙ্গে দেওয়া হত পশুর হাড়, চকমকির ফলক, ফুল ইত্যাদি। নব্যপ্রস্তর যুগেও একই প্রথায় প্রচলিত কবরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তবে খাদ্য, পানীয়,সরঞ্জাম ও বিবিধ সাজ-সরমজাম ক্রমশ বর্ধিত হয়েছে। মিশরের মৃতের সঙ্গে ব্যবহারের উপকরণ, অস্ত্র,খাদ্য পানীয়, প্রসাধন সামগ্রী চিত্রিত ঘট ও ঘটি রাখা হত। আফ্রিকায়ও 'মমী'র সাহায্যে মৃতদেহ অবিকৃত রাখার প্রথা লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সুমেরীয় রাজবংশীয়দের প্রচলিত প্রথানুযায়ী রাজার প্রয়াণ হলে সেবক সেবিকাগণ মৃতদেহের সঙ্গে সমাধিতে প্রবেশ করে সংকেত মোতাবেক বিষপান করত দক্ষিণ ভারতে লৌহযুগে জনপদ ভূমিতেই 'মেগালিথ সমাধি' প্রথা প্রচলিত ছিল। কবরগুলি উন্মুক্ত এবং এমনভাবে কাষ্ঠশয্যা বা প্রকোষ্ঠ নির্মিত হত যাতে কঙ্কাল মাংসমুক্ত হয়ে যায়। ব্রহ্মগিরিতে এই প্রথায় হাড়গুলি বড় বড় কলসিতে রেখে গর্তে গোর দেওয়া হত।

আমাদের দেশে সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটলে কলার মান্দাসে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেবার রীতি প্রচলিত। মেলানেশীয়ায় উপজাতিগণ মৃতদেহ একটি ডোঙায় রেখে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। কলেরা-বসন্ত রোগাক্রান্ত মৃতদেহ, সাপেকাটা মৃতদেহ সমাধিস্থ করা, দাহ করা, কখনও বা ফাঁকা জায়গায় নিক্ষেপ করার নিয়ম প্রচলিত। সিংহলের ভেদ্দা উপজাতিরা মৃতদেহের বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে চিরদিনের জন্য সে স্থান পরিত্যাগ করে। পূর্বে আসামের কিছু কিছু আদিবাসী সম্প্রদায় মৃতদেহকে কিছুদিন শুকিয়ে নেবার পর সৎকার করত। মহেনজোদাড়োতে মাটির বিরাটাকার ভাঁড়ে মৃতের সমাধি রচনার প্রয়াস দেখা যায়। পা-যুক্ত এমন পোড়ামাটির বাক্স 'সারকোফেগাস'।

হিন্দুধর্মালম্বীগণ দাহ করার সময় মৃতের ব্যবহৃত প্রিয় দ্রব্যগুলি চিতায় দিয়ে থাকে। আদিবাসী সমাজে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি মৃতদেহ দাহ করে। টোডারা পাথরের মণ্ডপ নির্মাণ করে মৃতদেহ দাহ করে এবং দাহের পূর্বাহ্নে খাবার, গয়না-পত্র, টাকাকড়ি সহ মহিষ বলি দেয়। ছোটনাগপুরের ওঁরাও ও আসামের খাসিয়াদের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করার পর দগ্ধাস্থি মাটির ভাঁড়ে রেখে গোত্রের পাত্রে জমা দেয়। নীলগিরির টোডারা দাহের পর কিছু পোড়া হাড়, চুল রক্ষা করে দ্বিতীয়বার দাহ করে। এখানকার সাঁওতালরা মৃতদেহ দগ্ধ করার পর দগ্ধ হাড় দামোদরে জলে নিক্ষেপ করে। দক্ষিণ ভারতীয় চেনচু উপজাতিরা প্রধানত কবর প্রথায় বিশ্বাসী হলেও হিন্দুদের কাছ থেকে দাহকৃত্যাবলির ধারণা পেয়ে মৃতদেহ সৎকার করছে। লোধারা কবর ও দাহ উভয় প্রথায় বিশ্বাসী, তবে তা জঙ্গলাকীর্ণ কোনো পতিত জমিতে। টোটোরা বনের মাঝে নির্দিষ্ট কবরে মৃতদেহের মাথা পূর্বদিকে রেখে উত্তরমুখে কবর দেয়। সঙ্গে দেয় পান, সুপারি, তির ধনুক। গারোরা কুষ্ঠরোগীকে দাহ না করলেও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্য মৃতদেহগুলি দাহ করে।

চার

মৃতদেহ সৎকারের পর মৃত্যু সংশ্লিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানই 'শ্রাদ্ধ'—মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক দান। এর সঙ্গে জড়িত একই সমাজে বা বিভিন্ন জাতি-উপজাতি আশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রথা ও আচার বিশ্বাস। সাধারণত ত্রিরাত্তির শ্রাদ ও অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ প্রচলিত। মৃতের বিবাহিত কন্যাগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয় ত্রিরাত্তির শ্রাদ্ধ—মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে পালিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান চতুর্থদিনে সম্পন্ন হবার দরুন 'চতুর্থি' বা 'চৌথ' অশৌচান্ত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালিত হয় মৃতের পুত্রগণ কিংবা নিকট আত্মীয় বা সগোত্রীয়দের দ্বারা।

দুর্ঘটনা, অকাল ও অপঘাতে মৃত্যুর জন্য তিনদিনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিয়ম প্রচলিত।

পূর্বে একমাসব্যাপী অশৌচান্ত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। ঘটমান বর্তমানে তা ত্রয়োদশ দিবসে কমিয়ে আনা হয়েছে। এমনকী অশৌচ পালন প্রথার পরিবর্তে 'শোকপালন' ব্যাপকতা পাচ্ছে। পুত্র-কন্যাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান একই দিনে, একই সময়ে, একত্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অশৌচ বা শোকপালন যে প্রথাই হোক না কেন দিগন্তে হবিসান্ন আহারই বিধেয়। পুত্রদের অশৌচপালন লবণ, আমিষ তেল ইত্যাদি ব্যবহার, খাওয়া অথবা ক্ষৌরকর্ম থেকে বিরত থাকতে হয়। কুশাসনই উপবিষ্ট অথবা শয়নশয্যা। হাতে ধারণ করতে হয় কঞ্চি জাতীয় লাঠি। সহবাস নিষিদ্ধ। চামড়ার জুতো পরা বা ব্যবহার চলে না। একলা একলা রাত-বেরাত চলা অনুচিত। এমনকী কঠোর কায়িকশ্রম থেকে দূরে থাকে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পূর্বদিন পুকুরপাড়ে নাপিত দ্বারা ক্ষৌরকর্মানুষ্ঠান, নতুন বস্ত্র পরিধান প্রচলিত। অশৌচ পালনের মূল লক্ষ্য দেহ-মন-আত্মা শুদ্ধাচারে রেখে নিজেকে যথাপোযুক্তভাবে প্রস্তুত করা। শ্রাদ্ধ বা শ্রদ্ধা নিবেদনের মূল প্রক্রিয়া মৃতব্যক্তির ধ্যান, স্মরণ, মনন, বন্দনা, আবাহন, ভোগ নিবেদন ও সর্বোপরি আশীর্বাদ প্রার্থনা।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার পিণ্ডদান। পিণ্ডদান না হলে প্রচলিত বিশ্বাস যে, মৃতব্যক্তির

আত্মার সদ্‌গতি হয় না। পিণ্ডদান গয়া, গঙ্গাতীরেও সম্পন্ন সম্ভব। শ্রাদ্ধাকৃত্যে পিণ্ড জলে সম্প্রদানের নিয়ম। পূর্বে ব্রাহ্মণরাই পিণ্ডগ্রহণ করত। শ্রাদ্ধে মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাসহ যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী গো-ভূমি ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য।

মৃতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রস্তরফলক প্রোথিত প্রয়াস নব্য প্রস্তরযুগের সমজসংস্কৃতির স্মারক। খাসিয়া, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি উপজাতিসহ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেও ফলক প্রথা প্রচলিত। প্রস্তর ফলকের পরিবর্তে সুন্দরবনের গাঁপাড়ায় 'বৃষকাষ্ঠ' বা বেরেষ প্রোথিতপ্রথা সুবিদিত। নদীতীর, খাল-দিঘি পাড়ে প্রোথিত করা হয় বৃষকাষ্ঠ, বিশেষ করে গরু যাতায়াতের পথে। আর্য-অনার্য পুষ্ট বৃষকাষ্ঠ যজ্ঞডুমুর, মাদার, পলাশ, হিমে, শিরিশ, পাকুড় প্রভৃতি গাছের উৎকৃষ্ট হয়। ঘনত্বে চার-পাঁচ ইঞ্চি ও উচ্চতায় পাঁচ-ফুট বৃষকাষ্ঠের শিল্পী সূত্রধর বা কামার। বৃষকাষ্ঠে যাকে মৃতের মূর্তি, জপমালা হাতে মূর্তি, ষাঁড়ের পিঠে শিবদুর্গা, বারদুয়ারি ও নানা নক্সা। অবস্থাপন্ন মৃতের পরিবার শ্রাদ্ধের দিন যজ্ঞে বিষ বা ষাঁড় উৎসর্গ করার সময় তামাকৃতি তপ্ত লোহার চিহ্ন এঁকে দেয় ষাঁড়ের পশ্চাৎদেশে। এই ষাঁড়ের মৃত্যুতেও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রচলিত। শ্রাদ্ধের পরপরই নিয়মভঙ্গ, রামায়ণ গান শ্রবণ, ভোজ ইত্যাদি। পারলৌকিক এই ক্রিয়াদি ব্যতিত কোনো কোনো সমাজে মৃতের আত্মাকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে আনার আচার-বিধিও বর্তমান।

প্রমাণভিত্তিক ইঙ্গিতে বাস্তবে না পেলেও আমরা জন্মান্তরবাদকে বিশ্বাস করি। ইহলোক-পরলোকে শুভাশুভ কর্ম ও বাসনার নিরিখে আত্মার অবস্থান যে স্থানে হোক-না-কেন, আসলে শ্রাদ্ধকর্ম-তর্পণাদি স্বর্গত স্বজনকে শ্রদ্ধাপ্লুত বিনম্র চিত্তে স্মরণ করার বিশেষ পদ্ধতি। ব্যক্তি অনুপাতে আপেক্ষিক এই ব্যাপারের গুরুত্ব সতত পরিবর্তনশীল। জীবের দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলির ধারক ও বাহক যে 'জীন' তা মূলত জীবদেহের সাংগঠনিক এক কোষ মধ্যস্থিত নিউক্লিয়াস অন্তর্গত ক্রমোজোম মধ্যস্থিত অদ্ভুত এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বিস্ময় সৃষ্টিকারী এই জৈব রাসায়নিক পদার্থই পিতা-মাতার দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত করে। পিতৃপুরুষগণের এককালের অস্তিত্বের অধিকারী বর্তমান বংশধরগণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানাদি তাই তর্পণ বা শ্রাদ্ধ বা শ্রদ্ধাকর্মরূপে বিবেচিত।

পাঁচ

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কিত অকপট স্বীকৃতি বিকল্পহীন। কিন্তু একটু চিড় ধরলে সংশয় উৎপন্ন হলে ফললাভ সুনিশ্চিতভাবে ব্যাহত হয়। মানুষ তার আদিম অবস্থা থেকেই নিরন্তর প্রকৃতির সঙ্গে অসম সংগ্রামে লিপ্ত। স্বীয় শরীর ও প্রকৃতির নিয়ত দ্বন্দ্বে অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে নানারকম সংকেত ও চিহ্নের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই সংকেত বা চিহ্ন বিশেষ কোনো-না- কোনো পরিণতির কারণ বলেই মানুষ এরই সঙ্গে অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার কার্যকারণ সম্বন্ধ কল্পনা করে, শুভাশুভ যুক্ত করে এবং ক্রমশ জনজীবনে সুদৃঢ়

নোঙর গেড়ে বসে। প্রাজ্ঞজনের ভাষায় বললে দাঁড়ায়—একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক, নৈতিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশে-প্রতিবেশে একই আচার-আচরণ ও জীবনচর্চায় অভ্যস্ত সংহত এক জনগোষ্ঠী যে বিশেষ আচার-আচরণ ও শুভাশুভবোধ জড়িত করে দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য-অকর্তব্য বিবেচনা করে সাধারণভাবে তাই লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। লোকবিশ্বাস খুব সাম্প্রতিক কালের, সুদীর্ঘকালের বা দীর্ঘস্থায়ীও হয়। বিশ্বাস বা সংস্কার সমাজদেহে সম্প্রসারণের জন্য যে বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব বিভিন্ন যুগে ঘটেছে পারতপক্ষে তাঁরা মুনি-ঋষি, গুরু-গুণিন, পির-ফকির প্রভৃতিরূপে অভিহিত।

আদি মানুষ প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নকরূপে মার খেতে খেতে একদিন রুখে দাঁড়াতে শেখে। অমোঘ এই চিন্তা-চেতনাই মানুষের প্রথম বিপ্লবমন্ত্র। জীবনের অত্যাশ্চর্য অঘটনগুলির সম্যক ব্যাখ্যানে অথবা ভীতিতে অশরীরী অতিপ্রাকৃত অলোকিক ও অনৈসর্গিক শক্তির কল্পনায় নিবিষ্ট, অতিবিশ্বাসীও আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশকে এক একটি শক্তির কল্পনা করে মানুষ প্রকৃতিকে শান্ত অথবা বশ করতে বিভিন্ন শক্তির শরণাপন্ন হয়েছে আদর ও তোষামদ করেছে, কখন প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো শক্তিকে দাঁড় করিয়ে আত্মরক্ষায় ব্রতী হয়েছে। ফলশ্রুতি জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ে সংযোজিত হতে থাকে নানাবিধ সংস্কার, বিধি-বিধান, রীতি-নীতি, কর্ম অভিব্যক্তি, অনুশাসন। সৃষ্টি হয় অলৌকিক ক্ষমতার শক্তিকে বিশ্বাস—না ধর্মী, হাঁ ধর্মী, সংস্পর্শমূলক, শুভকারী বিশ্বাস ইত্যাদি। এবং প্রকৃতির প্রতি আধিপত্য বিস্তারের বাসনা দুর্দমনীয় হবার প্রেক্ষিতে এগুলিরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু, এহ বাহ্য যে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন করতে না পারলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার ক্ষমতাকে স্থানান্তরিত করেছে। যেখানে অসম্ভব হয়ে উঠেছে সেই না পারা অব্যক্ত অনির্দেশ্য ব্যাখ্যাহীন রহস্যকে অশরীরী অলৌকিক শক্তির দ্বারা অর্জন করতে চেয়ে আকাঙ্ক্ষার ব্যবহারিক প্রতীক ধর্ম, ধর্মীয়, অনুষ্ঠান, ধর্মের দেবতা, যাগযজ্ঞ, বিভিন্ন জাদুপ্রক্রিয়া ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে। ব্যবহারিক দিক থেকে জ্ঞানকেন্দ্রিক, শ্রদ্ধাকেন্দ্রিক ও কামনা-বাসনা কেন্দ্রিক সংস্কার বিশ্বাস পৃথকভাবে, কখনও বা একই সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে অচ্ছেদ্য থাকে অথবা একে অপরের পরিপূরক। বিশ্বাস বাস্তবে সত্য বলে গৃহীত হলে সামাজিক অনুমোদন লাভে লোকসংস্কারে পরিণতি পায়। ক্রিয়া ইত্যাদি বিধিবিধানকে কার্যকরীভাবে সার্থকতা মণ্ডিত করার পদ্ধতি। উৎসব ও অনুষ্ঠান আসলে অনেকগুলি ক্রিয়ারই যুগপৎ সম্মেলন। ধর্ম বিশ্বাসের মূলে বর্তমান জীবন যুদ্ধের ব্যর্থতা বা জীবনের অনিশ্চয়তাকে প্রতিহত করার সুকৌশলী অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি বা শক্তি প্রতিহত করার চেতন-অচেতন, স্থূল-সূক্ষ্ম সর্বত্র অনুপস্থিত। এই শক্তিকে খুশি কবার অর্থ জীবনে যা কিছু কাম্য, চাওয়া-পাওয়া অথবা শঙ্কা-বিপদ সবই উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। এমনতর চিন্তা বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে মানুষ বিভিন্ন কারণ শক্তি অর্থাৎ আত্মা বা প্রাণশক্তি বা দৈবশক্তিকে স্তব-স্তুতি, আবেদন-নিবেদন, উপাচার-উপাদান সহযোগে খুশি, শান্ত, বশ ও বিতাড়ন করতে সচেষ্ট।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ধর্মই মানুষের সম্পর্কের নিয়ামক নিয়ন্ত্রক। এই বিশ্বাস থেকে জাত সর্বশক্তিমান দেবদেবী, অধনস্ত দেবদেবী স্থানীয় ও আঞ্চলিক দেবদেবী; অদেহী শক্তি, নৈর্ব্যক্তিক শক্তি, অর্ধনৈর্ব্যক্তিক শক্তি ইত্যাদি। সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জেনে আসছে বা বিশ্বাস করে—মানুষও অপরাপর জীবজন্তু ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটলেও দেহস্থিত আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা অমর, অবিনশ্বর, জলে ডুবে না, অস্ত্রে ক্ষত হয় না, আগুনে পোড়ে না। শুধু শরীর নামক এক জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য বস্ত্র সদৃশ অপর দেহে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু জাগতিক পৃথিবীর অচরিতার্থ আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা বর্তমান থাকায় সদ্য জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এদেরকে এড়াবার উদ্দেশেই মৃতের যথাবিহিত সৎকার নিয়ম প্রচলিত। মৃতকে যথপোযুক্ত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাহিত করতে না পারলে তার আত্মা থাকে ক্ষুধার্ত, অতৃপ্ত। এরা ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব-পিশাচে রূপান্তরিত হয়ে, সাপ ব্যাঙ, কাক, চিল, বিড়াল, কুকুর, শিয়াল হয়ে চলাচলের পথে, ঝোপেঝাড়ে, আনাচে-কানাচে, খালে-বিলে, ডোবায়, পাহাড়ে-গুহায়, নির্জনপ্রদেশে, ভাঙা মন্দির, পতিত বাড়ি, শ্মশান—যে-কোনো স্থান থেকে অনিষ্ট করতে পারে, বারংবার স্বপ্নে ফিরে। প্রকাশিত, অপ্রকাশিত এই দেব-দেবকল্প বা প্রেতশক্তি যাবতীয় রোগ-ব্যাধি ও অপরাপর অমঙ্গলকর অমানবিক কার্য সংঘটনের জন্য এমনকী মৃত্যুর জন্যও দায়ী। মানুষের সব কিছুর মূলেই দেহ। এরা এই দেহ বা দেহাভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়ে রোগ উৎপত্তি ঘটায়। পরিণতিতে মৃত্যু ঘটে। রোগ ও মৃত্যুর দেবদেবীর কোপ বা অভিশাপ ও যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা আছে। মানুষের ব্যক্তি বিশেষের কর্মফলবাদ বা পাপজনিত কারণও রোগ-মৃত্যুর কারণ। বয়সোচিত জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর স্বাভাবিকতা ব্যতিরেকে দেহের আত্মা বাইরে এসে আটকা পড়লে অথবা ভ্রাম্যমাণ কোনো আত্মা দেহে ঢুকে পড়লে, ধর্মীয় বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে, মানুষ ব্যাধিআক্রান্ত হয়ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবন যেখানে অনিত্য মৃত্যু সেখানে অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। এই অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবীকে জয় করার জন্যই জীবাত্মার পরিকল্পনা—যা বিনষ্ট হয় না অথবা মৃত্যুর অতীত। তাই মৃত্যুর কারণ, মৃতের বয়স, কীরকম মৃত্যু, মৃতের স্থান-কাল নির্ণিত ও নির্দিষ্ট হয় মৃতদেহ সৎকারের বিধি ব্যবস্থায়।

ছয়

মৃতদেহ ঘর থেকে শ্মশান ও দাহকর্ম সমাপনান্তে অন্যান্য ক্রিয়াচার সংক্রান্ত ব্যাপারে গুনিনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কোথাও কোথাও স্বীকৃত। গুনিন মৃতের বাড়ি যাবার পূর্বে অশুভশক্তিকে প্রতিহত করতে নিজ দেহ সুরক্ষিত করার প্রয়াস পান। দেহ সুরক্ষার মন্ত্রের নাম 'আত্মসার'।

আত্মসার মহামন্ত্র সুর দিল মোরে।/তাঁহারে সন্তোষ করি নমস্কারে।।/ হ্রীং মন্ত্রে পাহাড় টলে /হ্রীং মন্ত্র জলস্থলে/হ্রীং মন্ত্র অন্তরীক্ষে/হ্রীং মন্ত্রে আছেন মোর কাঁউর কামিক্ষে।/হাট বন্ধম বাট বন্ধম ঘাট বন্ধম ভূত/প্রেত বন্ধম পেতিনী বন্ধম বন্ধম দৈত্য দান/যক্ষরক্ষ বন্ধম বন্ধম মাতা কালী/সপ্ত সমুদ্র বন্ধম তেত্রিশ কোটি দেব/সাপ খোপ ডান ডাকিনী বন্ধম রাত দিন/আমার দেহ বন্ধম মাসকাবারি/দিয়ে লৌহ গড়/শিঘ্র শিঘ্র লাগ নরসিংহগরুর দোহাই/হাড়ির ঝি চাড়ী

মাই।। (৩)

—নগেন্দ্রনাথ বর্মণ

মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করার পর গুনিন নিজের গায়ে ফুঁ দেন। এরপর বাড়ির বাইরে পা রাখেন। মৃতের পরিবার ও স্বজন-সুজনদের সুরক্ষিত রাখতে গুনিন মন্ত্রের বর্ম পরিয়ে দেন। একটুকরো আলো মাটি অভিমন্ত্রিত করে প্রত্যেকের মাথায় ছড়িয়ে দেন। 'মাটি পড়া' মন্ত্র।

হিমালয় পর্বতে করিলাম ধেয়ান/শুনহ শুনহ
কালীমাতা ব্রহ্মজ্ঞান/চুমুচ চলনে
চলেন দেবী কাটামুণ্ড হাতে/নিজমূর্তি
ধরেন মাতা নিজ আঁধার রাতে/স্বহস্তে
বান কেটে দেবী দিলেন বর/অমুকির শরীর
বেড়ে পড়ল লোহার গড়/একমাস
একদিন থাক/লাগে তুক লাগে তাক/
অমুকের গড় কেটে কি ছেঁড়ে/মহাদেবের
জটা কেটে ভূমিতে পড়ে/দোহাই হ্রীং হ্রীং
দুর্গা দুর্গে রক্ষণী স্বাহা।। (৩)

— মহাদেব মণ্ডল

অভিমন্ত্রিত ক্রিয়াচারে গুনিন মৃতের বাড়িটিকেও দূর্গের রূপ দেন। 'বাড়ি বন্ধ' মন্ত্র।

আদ্য রুহিনী অমূল্য ধরণী/রুহিনী মোহিনী শঙ্করী তুমি আমার মা/উপরি ফাঁপরি বাও বাতাস/যক্ষরক্ষ কাঁটা খোঁচা ডান দানব দৈত্য/ভূত-প্রেত ডাকিনী যোগিনী/আমার এই বাড়ি যে আসিবি তারে খা/ যে মড় মড়ায় যে শড় শড়ায় যে ভাঙে খড়ি/এক কোঁকতায় ভাঙি তার নাড়ি/কার আজ্ঞে সীতে সীতামার আজ্ঞে/আমার এই বাড়ি বন্ধম সাড়ে সাত দিন থাকগে।

— নগেন্দ্রনাথ বর্মণ।

বার-তিথি-নক্ষত্র-সময় অনুযায়ী মৃতে গৃহদোষ ঘটে। মৃতের গ্রহদোষ বিমুক্তির জন্য গুনিন শবাধার বা খাটিয়ার দৌহদ্দি বেড়ে মন্ত্রের গণ্ডী এঁকে দেন।

ওঁ ওঁ হ্রীং হ্রুঃ হ্রুঃ ফট্ স্বাহা।
অনেন সর্ষপসভিমন্ত্রিতং কৃত্বা/
মৃতং প্রহারয়েত্তদা সর্ব্বে/গ্রহাঃ পলয়ন্তে।। (৩)

— ঐ

সাত

মানুষ মরলে ভূত-হয় বা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় এমনতর বিশ্বাস আবহমান কালের। মানব সমাজে ভূত একটি বিশেষ সমস্যা। স্থূল শরীরীস্থিত যে সূক্ষ্ম শরীর বর্তমান, মানুষের মৃত্যু হলে জীবাত্মা উক্ত স্থূল শরীর ধারণ করে পরলোকে গিয়ে বসবাস করে। সূক্ষ্ম শরীরই জীবাত্মাগণের

মধ্যে কর্মদোষে ভূত-প্রেত হয়। সাধারণত যারা পাপী, গলায় দড়ি দেয়, বিষ পান করে, ডুবে মরে, আত্মঘাতী হয়, অকাল মৃত্যু, অস্ত্রাদির আঘাত, বজ্রাঘাত, সর্পাঘাত, দস্যুহাতে বা অসংযত অবস্থায় মৃত্যু হয় তারাই ভূতপ্রেত হয়। গড়ুর ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে ভূত বায়ুরূপে দেহ যুক্ত ও ক্ষুধাতুর হয়ে থাকে এবং আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে শতশহস্র বৎসর পৃথিবীতে বসবাস করতে থাকে। এদের অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্তদানের জন্য পিণ্ড সম্প্রদানের মাধ্যমে সদ্গতি করা হয়।

শাস্ত্র-তন্ত্র-মন্ত্র যাই বলুক প্রত্যেক বিষয়ের মতো ভূতেরও জন্মের ইতিহাস আছে। গুনিনের মন্ত্রের খাতায় লেখায় আছে তার ইতিহাস।

আসমান থাক্যা পড়িল হালি/তাতে উঠিল গাছগাছালি/শ্বেত পীত কালো সরিষা/দশ দিক ভরাইলা আইস্যা/এক গাছের তিন তিন পাতা/শুন ভূত প্রেতের জন্ম কথা/কালিকা মালিকা বর/খালের পাড়ে দিগম্বর/ধিয়া ধিয়া দিগম্বর নাচে/ল্যাংটা হইয়া/ইহার পানিপড়ে পর্বতের মাথা বাইয়া/না ছিল খাট পালং না ছিল আসন/ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর তিনে আপন/ত্রিশূল হানিলেন শিব সমুদ্রের জলে/ নড়িল বসুমাতা ব্রহ্মাণ্ড উঠিল দুলে/নড়ে পর্বত থর থর সমুদ্রেতে পানি/তাতে জন্মিল ভূত আর পেতিনী/পাড় ভাঙে গাছ ভাঙে শুকায় সাগর/ভূতের ভয়ে দেয় দুর্গা শ্মশানের দোর/দোহাই শিব (৩)।।

— মহাদেব মণ্ডল

ভূতেদের স্ত্রীপুরুষ ভেদ বর্তমান। অধিকাংশ ভূতই ভূতনাথ বা শিবের অনুচর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিবানী অর্থাৎ মহাকালীর সহচরী শিষ্য-শিষ্যা শিব-শিবানীর অবস্থান মহা শ্মশান হওয়ায় ভূতগণ শ্মশান-মশান, কবর-গোরস্থানে থাকতে ভালোবাসে। অবস্থা ভেদে গাছের মগডাল, ফাঁকাবাড়ি, তিনরাস্তার মোড়, জলের ঘাটে অবস্থান করে। ব্রহ্মদৈত্য, মামদো, গৌরাঙ্গ, গোভূত, একানড়ে ভূত, তালবেতাল, পেঁচো, যক্, হাঁড়াভূত, নিশা ভূত, বাঁতুল ভূত, ঝেড়ু ভূত, কর্তা ভূত, দানো, কবন্ধ প্রভৃতি পুরুষ ভূত। ডাকিনী যোগিনী, শাঁকচুন্নি, পেতিনী, পিশাচীরা স্ত্রীভূত। এছাড়া শ্মশান ভূত, গেছো ভূত, বাস্তু ভূত, মেছো ভূত, কৃষ্ণ ভূত, কেঁসেরা ভূত, গণ্ডকোণ্ডর, বাঘরাই, কাদামেবান নিম্ন সম্প্রদায়ের ভূত বর্তমান। হিন্দুস্থানী ভূত, ঘ্যাঘোঁ, নাকেশ্বরী, গোঁ গোঁ, চুড়েল, সবুজ ভূত, লুল্লু ভূত, পান্তা ভূত, উড়িয়া ভূত প্রভৃতি সাহিত্যের পাতায় বিধৃত। স্কাল, স্কেলিটন, স্পূক, স্পিকি, গাবলিন প্রভৃতি বিলিতি ভূত। জিন, জান, আফ্রিদ, মারীদ প্রভৃতি আরবি-কাবুলি ভূত। লুবারী, মুকুসা আফ্রিকায় ওয়াগাণ্ডা ও নায়েঞ্জাদের দৈত্যভূত। সাঁওতালদের বোঙ্গাবুঙ্গি; লোধাদের চিরগুণ, কালপুরুষ; ওঁরাওদের মহাদানিয়া, কুনন্ত্র, চাওভূত, জলের জঁকাভূত ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাচীন বৈদিক ধর্মের সঙ্গে ভূত-প্রেতের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস জলে প্রাক্অর্ঘ্য অধিবাসীদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে। বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা উপাসনা প্রচলিত, উচ্চবর্ণেও। বৈদিক গৃহাশ্রমে পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম 'ভূত যজ্ঞ'। তন্ত্রশাস্ত্রে 'ভূতশুদ্ধির' উল্লেখ

তাকে পর্যময় রূপে প্রতিভাত। ভূতপক্ষ (কৃষ্ণপক্ষ), ভূত পূর্ণিমা (কোজাগরী) ও প্রচলিত আছে সমাজে। গৃহস্থ মানুষ কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিকে 'ভূত চতুর্দশী' হিসাবে পালন করে। প্রতিটি পূজা-উৎসবাদিতে ভূতপূজা ও ভূতশুদ্ধি অবশ্যকৃত্য।

ওঁ শীতলোহত্ত সমাযুক্ত সকণ্টক দলান্বিত।
হর পাপসপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ শুণঃ শুণঃ।।

—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পুরোহিত দর্পণ, ১৩৮১)

ভূতশুদ্ধির মন্ত্র :

১. *ওঁ মূলশৃঙ্গাট্টশ্চিরঃ সুষুম্মা পথেনজীবশিবং*
পরম শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।

২. *ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।*

৩. *ওঁ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা।*

৪. *ওঁ পরমশিব সুষম্মাপথেন*
মূলশৃঙ্গীটমল্লামোল্লম জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল
হং সঃ মোহাহং স্বাহা।

— ঐ

আট

মৃত্যু সংক্রান্ত আচার-বিশ্বাস প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে উপস্থিত। 'চিতা' প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে—

চর্যাপদে : চারিবাস ভাইলারেঁ দিআঁ চঞ্চালী
তঁহি তোলি শবরো হক এলা কন্দশ সগুণ শিআলী।

বিদ্যাপতি : সুন সেজ হিয় সালয়েরে
পিয়া এবিনু মরব সোঁয়ে আজি।

কৃত্তিবাস : করিলেন চিতা রাজা উত্তর শিয়রে
তিনজনে শোয়াইল চিতার উপরে।

মালাধর বসু : চিতা এ তুলি রাজাত্র কান্দেরানি উভরাত্র
রাজার করিল সতকার।

বিপ্রদাস : তবে সর্ব দেবগণ চণ্ডিকার বোলে
করিল বিচিত্র চিতা ক্ষীরোদের কূলে।

দ্বিজমাধব : কংস নদীর তটে আছে বড় রম্যস্থল
নানা কাষ্ঠ কুড়াইয়া জ্বালিল কূলে।

মুকুন্দ চক্রবর্তী : বঞ্চিল আমারে বিধি চিতাশত জ্বালি যদি
ছয় মাসে পোড়ে বহুজন।

কাশীরাম দাস : অগ্নিহোত্র রাজার করিল দাহ ক্রিয়া।

জগজ্জীবন : ছয় চিতা নিম্মাইল আনল জ্বালই।

ঘনরাম : বেদের বিধান কুণ্ড করিল রচনা
পাতিল চন্দন কাষ্ঠ পরিপাটি তুনা।

মৃতদেহে চন্দন ও ঘৃত লেপন প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে :

বিষ্ণুপলি : চন্দনের চেলারে ফেলায় সারি সারি
ঘৃত ঢালিল তালে কলসি কলসি।

বিপ্রদাস : দিলেন চন্দন কাষ্ঠ ঘৃতবহু তরে
করাইয়া স্নান শোয়াইল গঙ্গাধরে।

কৃত্তিবাস : রাবণেরে করাইল স্নান সিন্ধুজলে
সুগন্ধি চন্দন লেপে কণ্ঠে বাহু মুলে।

মুখাগ্নি প্রসঙ্গে উল্লিখিত :

দ্বিজমাধব : প্রদক্ষিণে অগ্নি দিল মুখের উপর।
বিষ্ণুপাল : সনকা জালিয়া কৈল এ সুখ আগুন।

বিবাহিতা কন্যার তেরাত্রি শ্রাদ্ধের উল্লেখ করেছেন :

বিজয়গুপ্ত : সোমাই পণ্ডিত বলে স্থির কর মন
তেরাত্রি শ্রাদ্ধ হবে বেবস্থার বচন।

ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথা কাশীরাম দাস বলেছেন :
ত্রয়োদশ দিবসে করে শ্রাদ্ধশান্তি দান।

গয়ায় পিণ্ডদান প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন :
শ্রাদ্ধ করি প্রভু পিণ্ড ফেলে সেই জলে
গয়ালি ব্রাহ্মণ সব ধরি ধরি গিলে।

কাশীরাম : পঞ্চভাই দিল পিণ্ড ক্ষত্রিয় বিধান।

শ্রাদ্ধান্তে গোদান প্রসঙ্গে তন্ত্রবিড়াতিতে উল্লেখ আছে :
বিধিমত বৎসগাবি উৎসর্গ করিল।

কাশীরাম : স্বর্ণদান ভূমিদান করে গাবী দান।

জগজ্জীবন : শ্রাদ্ধকর্ম করে চান্দো বিবিধ বিধান
দানধ্যান বৃষোৎসর্গ করে বিধিমতে।

আলোর পথে :

১. মৃত্যুঞ্জয় গুহ—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস। ১৯৯২
২. কার্তিকচন্দ্র শাসমল—সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ১,২। ১৩৮৫, ১৩৮৭
৩. শচীন্দ্রনাথ বসু—সভ্যতার আগে। ১৯৮৩
৪. ঐ—প্রাগৈতিহাসের মানুষ। ১৯৮৪
৫. সুভাষ মিস্ত্রী—দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র।
৬. লোকশ্রুতি ১৩ সংখ্যা ১৯৯৭
৭. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বর্মণ : বাবা মৃত গঙ্গাহরি। গ্রাম ও ডাকঘর হরিশপুর, গোসাবা, দ. ২৪ পরগনা। জন্মস্থান-হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে শিতালিয়া গ্রামে। চতুর্থ শ্রেণী। হিন্দু-তপসিলি, কাশ্যপগোত্র। চাষাবাদ পেশা। নেশা—মন্ত্রচিকিৎসা। মাসিক আয় ২০০ টাকা। যাত্রাপালায় বিবেকের পাঠ করেন। বাবার কাছে প্রথম মন্ত্র শেখা। কবচ-মাদুলি দেন। ২ টাকা সম্মান-দক্ষিণা নেন। সতীমায়ের ভক্ত। ৭২ বছর বয়স। শেষ মন্ত্র গ্রহণের তারিখ ১৩-১২-'৮৪।
৮। শ্রীমহাদেব মণ্ডল : বাবা মৃত পাঁচুগোপাল। বয়স ৪৫। গ্রাম-দ. তারানগর, ডাক-তারানগর, গোসাবা থানা, দ. ২৪ পরগণা। হিন্দু তফসিলি, পেশা কৃষিকাজ, নেশা-মন্ত্র চিকিৎসা। অষ্টম শ্রেণী। সাবেক নিবাস বাংলাদেশের খুলনা জেলার শ্যামনগর যশোর আটুলিয়া গ্রাম। কাশ্যপ গোত্র। মাসিক আয় ৪০০ টাকা। চণ্ডাল-বৈদ্য-ওড়িয়া ৫ জন গুরু। মনসাপূজারী ও সেবক। মন্ত্র নেবার শেষ তারিখ - ২৪-০৩-'৮৭।



শোকে সান্ত্বনা। শিল্পী : শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২৪।

❑ লেখক পরিচিতি : কলকাতার একটি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। গ্রন্থ প্রণেতা, সুন্দরবনের ভূমিপুত্র সুন্দরবন বিষয়ে গবেষণারত।

স্মৃতির তর্পণ, মহাকালের কোলে

অশোক কুমার কুণ্ডু

মৃত্যু! কী আছে পথের শেষে? কী আছে জানা নেই বলেই মেঘলা-পথের দিকে তাকিয়ে মানুষ কল্পনা করেছে, সপ্তাকাশ। বিভাজন করেছে অমৃতলোক, দেবলোকের সঙ্গে এই ধরাধামকে। বারে বারেই অধরা থেকেছে মৃত্যুর পরের পথে। স্বর্গ ও নরকের এমন কল্পনা মানুষ নামক প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব। অসম্ভব নয় বলেই পথের কবি বিভূতিভূষণ রচনা করেছেন 'দেবযান'। যে মানুষ লিখতে পারত না, তারা যে কখন সূচনা করেছিল মৃত্যু নামক অপ্রতিরোধ্য ঘটনার পরে, অদ্ভুত রূপক-বিশ্বাসের। হাজার এক বিধি, ট্যাবু ও টোটেম নিয়ে চলতে চলতে, সমাজ সময় পার হয়ে চলে এল এতটা পথ। গড়ে উঠল স্মৃতিচিহ্ন এই মৃত্তিকার ওপরে। ফলকে, বৃষকাঠে, স্মৃতিস্তম্ভে এবং স্মৃতির 'বাস্তব' চিহ্ন না রাখার দর্শনও গড়ে উঠল দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী তত্ত্বে। মায়াবতীতে বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত আশ্রমের 'স্বপ্ন' গড়ে উঠল এক সাহেব দম্পতির ভালবাসায়। এঁরা ক্যাপটেন সেভিয়ার এবং তাঁর স্ত্রী, মিসেস সেভিয়ার। ক্যাপটেন সেভিয়ার প্রয়াত হয়েছিলেন ময়াবতীর মাটিতেই। তাঁকে দাহ করা হয়েছিল মায়াবতী আশ্রমের অনেকটা নীচে, গড়ানে পথে, ছোট্ট পাহাড়ি নদী, মায়াবতীর কোলে, হিন্দু মতে। এমনটাই ছিল সাহেবের অন্তিম ইচ্ছা। অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসীদের মৃত্যুর পরে কোনও স্মৃতিচিহ্ন দাহস্থলে থাকে না। ক্যাপটেন সেভিয়ারেরও নেই। ভ্রমণপিয়াসী মানুষ মায়াবতীতে গেলে, গহীন অরণ্যে ওই পাহাড়ী, ছোট্ট নদীর কোলে দেখতে পাবেন কোথাও কোনও চিহ্ন নেই সেভিয়ারের। তথাপি, কয়েকটুকরো পাথর রেখে, কারা যেন 'স্মৃতি'কে চিহ্নিত করেছেন। তবে দোহাই, একা ওই জঙ্গলে যাবেন না। কারণ জঙ্গলে বন্য জন্তুর ভয়। আর গাছের ডাল-পাতা থেকে বড় বড় জোঁক পড়ে গায়ে। সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু, 'কি হবে মনে রেখে' অথবা প্রয়াত কবির বাণী, 'কিছু লাভ আছে মনে রেখে' (পূর্ণেন্দু পত্রী)। বাক্যটির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে ইচ্ছে করে মহাকালের 'পূর্ণ' গ্রাসের আগে, অবশ্যই লাভ আছে সুপ্রচুর। 'মন' আছে বলেই মনে রাখা। তা না হলে তো, জন্ম-মৃত্যু দু'টোই অহেতুক হয়ে যায়। লোকঅভিধায় এমন বাস্তববাদী জ্ঞান আর কোথা পাই? 'আজ ম'লে, আজ বাদে কাল দু'দিন।' তবুও বেঁচে থাকা এবং বাঁচিয়ে রাখার অন্তহীন আয়োজন। আর সে কারণেই রাঢ়ের কবি তারাশঙ্কর লিখতে পারেন, 'ভালবেসে মিটিল না আশ/জীবন এত ছোট কেনে?'

মৃত্যুর পরে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা আর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দু'ধরনের আয়োজন, হিন্দু লোকমানসে। স্মৃতি-ভ্রমণের সুবিধের জন্যে পথটি একটু খাটো করে, সীমায়িত করে নেওয়া যাক, পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের উঠোনে। মৃত্যুর স্মৃতি চিহ্ন এক : স্মৃতি-বেদী এবং দুই : বৃষকাঠ। সম্ভবত স্মৃতি বেদী, যা শ্মশানে, হিন্দু মৃতদেহ সৎকারের পরে যা বানানো হয়, তা এসেছে অনেক পরে। কারণ, পুরো একটা বেদির গঠন, ইট-সিমেন্ট-বালি দিয়ে গড়ার জন্য ভাবনাটা এসেছে নিশ্চিত পরে। আগে এসেছে স্মৃতি কাঠ-বৃষকাঠ। যদিও আমার জোরালো বিশ্বাস, বৃষকাঠটি দেশজ স্মৃতি-তপর্ণে যুক্ত হয়েছে অশাস্ত্রীয় ভাবে, যুক্ত হয়েছে শিল্পের জোরে। তা না হলে, ছুতোরের হাতে তৈরি একটি কাঠ কেমন করে ঢুকে গেল শ্রাদ্ধবেদীতে? ঢুকে গেল বোধ করি তার আকারের জন্যই। স্থান করে নিল শিল্পের জোরে, শাস্ত্রীয় বাধা পেরিয়ে।

বৃষের সঙ্গে হিন্দু শ্রাদ্ধের পুণ্যার্জন পদ্ধতি যথেষ্টই প্রাচীন। ষাঁড়তো জীবিত প্রাণী, শিবের বাহন, কোথাও ভিন্নভাবে শ্বেত পাথরের বৃষও পূজিত। কিন্তু প্রাণহীন বৃষকাঠ? সে তো ছুতোরের, অন্ত্যজ মানুষের তৈরি। ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় এলাকায় শূদ্রের প্রবেশ অসম্ভব। একইভাবে অসম্ভব, ছুতোরের তৈরি বৃষকাঠের স্থান পাওয়া শ্রাদ্ধবেদীতে। কথায় বলে, 'টাকার জোর থাকলে মরা মানুষও বেঁচে থাকে।' এমন ধাবা রূপাশ্রিত, আপাত সরল বাক্যের সার সত্য হ'ল : মৃত মানুষ বেঁচে থাকে তার বহু সুকর্মের ভিতর দিয়ে। মানুষ এবং জীবিত আত্মীয়রা তাকে বাঁচিয়ে রাখে, স্মরণে-বরণে সভা-সমিতিতে, এবং শ্মশানের স্মৃতি-স্তম্ভে ও বৃষকাঠে।

এক্ষেত্রে স্মরণীয়, বৃষকাঠ সাধারণত পোঁতা হয় রাস্তার মোড়ে, 'জীবিত' মন্দিরের গায়ে। জীবিত শব্দটি বললাম, কারণ, শ্মশানের স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মৃতিমন্দির পূজিত নয়। প্রত্যহ পূজিত দেবালয়ের কোণে বা দেবালয় সংলগ্ন ছোট মাঠে। উদ্দেশ্য: আনজন, পথিক, পুণ্যপ্রার্থী মানুষের আনাগোনার পথে, চোখে পড়বে বৃষকাঠটি। স্মরণ করবে মৃত মানুষটিকে। এই হলো বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে বৃষকাঠের লৌকিক দিক। অবশ্যই ধনী মানুষের স্মৃতি বন্দনার দেশজ পদ্ধতি।

একটি বৃষকাঠ লম্বায় ছ' থেকে সাড়ে ছ' ফুট। বৃষকাঠের ভূমি, মাটিতে কারুকাজহীন পোঁতা বেস, দেড় থেকে দু'ফুট। বাকি অংশে, একটি পুরো মানুষের আকৃতি, প্রধানত পুরুষের। তার মাথার ওপর দু'টি বড় চৌকা। একটিতে বৃষ বা ষাঁড়। তার ঠিক ওপরের চৌকো ঘরে, শিবলিঙ্গ। তারপরের অংশগুলিতে শিল্পীর স্বাধীনতা। কোথাও রাজবাটীর থাম। চারদিকের থামের গায়ে ঝুলন্ত টিয়াপাখি। ওপরের অংশগুলি ছোট হতে হতে, কৌণিক বিন্দুতে, লোহার ত্রিশূল পোঁতা। মূর্তির (লোকভাষায় পুতুল বলে) সামনের দিকেই কারুকাজ। অনেকটা হিন্দু দেব-দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির মতই। পুরুষ মূর্তির হাতে জপমালা, কোথাও কমণ্ডলু, গলায় পৈতে (মৃত মানুষটি ব্রাহ্মণ না হলেও)।

পুরুষশাসিত সমাজে বৃষকাঠে, নারী মূর্তি এসেছে ঢের পরে। পুরুষের পরণে কোঁচান ধুতি, গ্রামবাংলার আটপৌরে ধুতি পরার স্মৃতি। আর নারীর ক্ষেত্রে, লাল পেড়ে শাড়ি, (লাল রঙের বর্ডার, মাথায় কাপড়) এবং এয়োতীর চিহ্ন হুগলি হাওড়া-মেদিনীপুরের বৃষকাঠে বর্তমানে চড়া তেল-রং ব্যবহার করতে দেখেছি। দক্ষিণবঙ্গের বৃষকাঠে কোনও রং দেখিনি। শ্রাদ্ধের দিনে বৃষকাঠে শুধু বাটা হলুদ মাখাতে দেখেছি। পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার তৈরি বৃষকাঠে বিশেষ শিল্পের ছোঁয়া চোখে পড়েনি। একটি বেল অথবা নিম গাছের কাণ্ড থেকে ডালপালা ও ছাল তুলে ফেলে দিয়ে, সমস্ত শিল্পকর্ম করা হয়। ছুতোর শিল্পীরা সময় পান মাত্র আট দশ দিন (পনের দিনে শ্রাদ্ধ)। খোলা আকাশের নীচে একটি বৃষকাঠের পরমায়ু মাত্র ৭/৮ বছর। শ্রাদ্ধের দিন, পুরুষ বৃষকাঠের চূড়ায় পরানো হয় বিয়ের শোলার টোপর এবং স্ত্রী বৃষকাঠে পরানো শোলার সিঁথি ময়ূর। সাধারণত জীবিত মানুষের বিয়েতে যেমন পরানো হয়।

সমস্ত কাঠটি কোঁদাই করে তৈরি হলেও, মূর্তির মাথার ওপরের চৌকো খোপে যে ষাঁড় এবং তার ওপরের চৌকো খোপে যে শিবলিঙ্গ এবং তার ওপরে ঝুলন্ত টিয়াপাখি, এগুলি সব আলাদা আলাদা করে তৈরি করে, 'সেট' করে দেওয়া হয় মূল বৃষকাঠে। খুউব অভিজ্ঞ শিল্পী হলে মূল কাঠটি কুঁদে, মূল কাঠের শরীর থেকেই করতে পারেন। মাত্র দু'টি বৃষকাঠে এরকম পেয়েছি। বেশি সংখ্যক বৃষকাঠ দেখতে পেয়েছি চাঁপাডাঙ্গা, মায়াপুর, কাবলে, অঞ্চলে। কারণটা, কৃষিভিত্তিক সংসারী মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা। কানা দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বরের পলি বিধৌত সমভূমির বহুফসলী মৃত্তিকার কল্যাণে। পশ্চিমবাংলার অনেক জেলাতেই অবশ্য বৃষকাঠের প্রচলন আছে।

স্মৃতিমন্দির বা স্মৃতিঘর যা শ্মশানেই তৈরি হয়, তা সাবেককালের হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলার চার অথবা আটচালার গড়নের। এমনও নজরে পড়েছে, মাটি থেকে চৌকো বেদি উঠেছে। বেদির ওপর চারটি থামের ওপরে ছোট্ট ঢালাই ছাদ। বাংলা চালঘরের আদলকে মেনে, ভিন্ন ধরনের। তবে কোথাও আবার তুলসী মঞ্চের রূপ। কোথাও ভূমি থেকেই উঠেছে সলিড বেস। সামনের দিকে ছোট্ট কুলুঙ্গী। প্রতিষ্ঠা দিনে প্রদীপ জ্বলে। স্মৃতি ফিকে হলে, কুলুঙ্গীতে আঁধার। কোথাও আবার চালার নামগন্ধ নেই। সটান লম্বা আয়তাকার সলিড ইট-সিমেন্টের পাকা বেদি। গরু চরাতে গিয়ে 'শ্রীকান্ত'-র সঙ্গে আরাম করে, ওই বেদির ওপর বসে বৈচি-টোপা কুল-শালুক গেঁড়ো পুড়িয়ে খাওয়ার স্মৃতি। তবে, স্মৃতিমন্দিরের যতই পাকা ভিত হোক না কেন, তার স্থায়িত্বে অমরতার পরমায়ু থাকে না। যতটা থাকে, মেঘালয়ের অধিবাসীদের স্মৃতিস্তম্ভে। মেঘালয় ভ্রমণের সে স্মৃতি বেশ উজ্জ্বল।

চেরাপুঞ্জির আশেপাশে ঘরের উঠোনেই দেখেছি বিশাল বিশাল পাথর পোঁতা। দেখলে মনে হয়, এ কাজ জীবিত মানুষের কম্ম নয়। বেড়ানোর সময় মনে পড়েছিল, বটানিস্ট স্যার জোসেফ ডালটন হুকারের কথা। যা তিনি লিখেছিলেন 'দ্য হিমালয়ান জার্নাল'-এ। সময়টা ১৮৫০ সাল।

মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া তখন ইংরেজের অধীন। হুকার সাহেব এখানে এসেছেন উদ্ভিদের নমুনা খুঁজতে। পাহাড়ি শহর জোয়াই থেকে উত্তর-পূর্বে ১৫০০ মিটার উঁচু পাহাড়ি গ্রাম, নারটিয়াং-এ। হুকার সাহেব দেখলেন অসংখ্য পাথরের বিশাল বিশাল ফলক। পাথরগুলোর ব্যাস ৭/৮ থেকে ২০/২৫ মিটার। সাহেব তাঁর দেশের বিখ্যাত স্টোনহেঞ্জের প্রাচীন নিদর্শনের কথা ভেবে এগুলোর নামকরণ করেন নারটিয়াং স্টোনহেঞ্জ। শিলং থেকে জোয়াইয়ের রাস্তায় ৪০ কিলোমিটার। ডাইনে বাঁক নিয়ে, যেতে হবে আরও বিশ কিলোমিটার পাহাড়ি ভাষায় এগুলো 'খারফালিংকি।' বাংলা করলে, লম্বা লাঠি বা ছড়ি। এমন করে কত স্মৃতি ফলক ছড়িয়ে আছে দেশের নানা স্থানে।



নারটিয়া গ্রাম।

❑ **লেখক-পরিচিতি**— গল্পকার, প্রাবন্ধিক, 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত

শেষের কথা

শামিমা নাসরিন

"জন্মিলে মরিতে হবে"—বিদগ্ধ কবির এই মন্তব্য যথার্থ এবং চিরন্তন।

মৃত্যু হলেই সৎকার জরুরি। আর সৎকার করার পদ্ধতি ধর্ম ও সম্প্রদায় ভেদে আলাদা।

মুসলমান মৃতদেহ সৎকার করা হয় 'কবর' দিয়ে। মৃতদেহের আকার অনুপাতে কবরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা হয়।

খ্রিস্টানরাও অনুরূপ পদ্ধতিতে 'কবর' দেয়। আবার হিন্দু বৈরাগী সম্প্রদায়-এর 'কবর' হয় অন্য পদ্ধতিতে। কবরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেখে মাটি চাপা দেয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ শবদেহের কবর দিয়ে সৎকার করে থাকে। আর কিছু মানুষ অন্য পদ্ধতি বা 'দাহ' করে সৎকার করে। শ্মশানে সাজানো কাঠের সজ্জায় শবদেহ রেখে আগুন দিয়ে দাহ করা হয়।

'কবর' বা সমাধি হলে তার উপরে স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করার রেওয়াজ বিশ্বজুড়ে প্রতীয়মান হয়। সম্রাট, বাদশা বা ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ কবর বাঁধিয়ে রাখে বা তার উপর স্মৃতিসৌধ গড়ে। 'তাজমহল', হুমায়ন টুম্ব', শের-শাহের সমাধি, আকবরের সমাধি—সেকেন্দ্রা ইত্যাদি তার উদাহরণ।

কখনও বা কবরে স্মৃতিফলক লাগানো হয়—সমাধিস্থ ব্যক্তির নাম, পিতা, জীবনপঞ্জি ফলকে লিপিবদ্ধ করা থাকে।

বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কবর বিশ্বময় বিভিন্ন স্থানে আছে। তা বাঁধানো হয়ে আছে এবং কোথাও কোথাও স্মৃতিফলকও লাগানো হয়েছে।

মুসলিম শবদেহকে যত্ন-সহকারে সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে সুগন্ধি ছড়ানো নতুন কাপড় বা 'কাফন' পরিয়ে সমাধিস্থ করা হয়। উদ্দেশ্য পরিবেশ দূষণ রোধ করা এবং পারিবারিক একটা শান্তি সীমায় পৌঁছানো—যাতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আবার ফিরে আসে।

মুসলমান সম্প্রদায় এর 'কবর' দান প্রথা বাধ্যতামূলক এবং ধর্মীয় অনুশাসন স্বীকৃত।

ধনী বা ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ 'কবর' বাঁধাতে পারে এবং স্মৃতিসৌধও নির্মাণ করতে পারে। কিন্তু নির্ধন গরিব মানুষেরা তা পারে না, করে না।

মিশরের 'পিরামিড' কবর বা কবরের উপরে নির্মিত স্মৃতিসৌধ। মিশরের ফারাওদের শবদেহ 'মমি' করে এই পিরামিডে রাখা হয়। এই স্মৃতিসৌধও বিস্ময়কর।

ধর্মাশ্রয়ী মানুষের বিশ্বাস সযত্নে 'কবর' দিলে বা শবদেহ 'দাহ' করলে আত্মা শান্তি পাবে। পরলোকে আত্মা সুখে স্বাচ্ছন্দে বিরাজ করবে।

সাধ্য অনুসারে নিজ নিজ ধর্মাশ্রয়ী মানুষ তার ধর্ম ও প্রথা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেও দান-ধ্যান, খাদ্য বিতরণ ও বস্ত্র বিতরণ করে থাকে, এবং নিজ তৃপ্ত হয়।

মুসলমান ব্যক্তির মৃত্যু হলে শবের চারিদিকে বসে মহিলারা কান্না করে এবং মৃত ব্যক্তির গুণ ও ভালোবাসা কান্নার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে। একপ্রকার শোক-সুরে এই কান্না ধ্বনিত হয়।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনায় সমৃদ্ধ। তাই ক্রিয়া এবং সৎকার্যের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটছে।

সাধু, সন্ত বা সাধক কিংবা দরবেশগণের 'কবর' বা 'রওজা'য় স্মৃতিসৌধ জনগণই গড়ে তুলেছে। আজমির শরিফ, দেশ শরিফ, নিজামদ্দিন প্রমুখ মনিষীদের 'মাজার' তার উদাহরণ।

ইসলাম ধর্মে কবরে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা উচিত কি উচিত নয়—তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

বহু মুসলমান ধর্মাশ্রয়ী মানুষের ধারণা মসজিদের পাশে কবর হলে মৃত ব্যক্তি স্বর্গীয় সুখ পায়—পরলোকে শান্তিতে থাকে।

"মসজিদেরই পাশে আমার
কবর দিও ভাই
যেন কাছে থেকে মোয়াজ্জিমের
আজান শুনতে পাই।"

যত বড়ই পণ্ডিত বিদগ্ধ ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রনায়ক হোন না কেন সকলকেই মরতে হবে। মৃত্যুই মুক্তি। মরণের পথেই জীবনের বিকাশ।

নানাভাবে নানা পদ্ধতিতে নানা প্রক্রিয়ায় মানুষের মৃত্যু ঘটে। আত্মহত্যা, দুর্ঘটনা, রোগ-শোক, বা বয়ঃবৃদ্ধজনিত কারণে মৃত্যু হয়।

ধর্ম ও সম্প্রদায় ভেদে তার পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম নানা মুখীনতা লাভ করে বা প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ ঘটে।

আত্মহত্যা-জনিত কারণে বা অপঘাতে মৃত্যু ঘটলে বিশেষ পূজা, গীতাপাঠ, কীর্তন-গান যেমন করা হয়, সকল মসুলমান মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় 'মিলাদ' বা 'কোরাণ' পাঠ করা হয়। মিষ্টি বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ ও খাদ্য বিতরণের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

'গোর' বা 'কবর' দেওয়ার কাজকে 'দাফন' বলে। 'দাফন' সমাপনসূচক শব্দ। মুসলিম নারীদের 'দাফন' প্রক্রিয়া বয়স্ক নারীরাই করে থাকে। যেমন—গোছল, তলগোছল, কাফন, পরানো, সুগন্ধী প্রদান ইত্যাদি।

'গোছল' অর্থাৎ 'স্নান' করানো। মৃতদেহের নাকে তুলো দেওয়া, আচ্ছাদন আবরণী প্রদান করা মেয়েদেরই কাজ।

'জানাজা'র সময় মেয়েরা অংশ গ্রহণ করে না। কোথাও কোথাও আঞ্চলিক ভিত্তিতে কবরস্থানে কবরে দেওয়ার জন্য মাটি পাঠায়। কবরে সে মাটি দেওয়া হয়ে থাকে।

মেয়েদের মাটি পাঠানোর ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি নেই বলে অনেকে অভিমত পোষণ করে থাকে। কখনও কখনও মেয়েরা 'দাফন' কার্যের কয়েকদিন পরে আত্মীয়জনের কবর দেখতে গোরস্থানে যায়। মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করে।

'চাহারম' প্রক্রিয়ায় রান্না-বান্নার কাজে মেয়েরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। গরিব মানুষদের

খাওয়ানো, দান করা, বস্ত্র-বিতরণ, ফল বিতরণ ইত্যাদি কাজ মেয়েরাই বেশিরভাগ করে থাকে।

মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। 'কবর' জীবন প্রক্রিয়ার সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের সর্বশেষ ঐতিহ্য এবং পরিবেশ ও বায়ুদূষণ রোধের বাস্তব প্রক্রিয়া।



আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার "মাথাল" খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।

❑ লেখক পরিচিতি : সাংস্কৃতিক কর্মী, সমাজ গবেষিকা।

সতী, সহমরণ ও রামমোহন

সুব্রত চক্রবর্তী

রামকান্ত আর তারিনীদেবী সাধারণ এক দম্পতি। পয়সা আছে—আছে প্রতিপত্তি। সজ্জন ধার্মিক। অষ্টাদশ শতকের এক নামী পরিবার। রাধানগরে বাস। এই রকমই মনে হতে পারে। এর অন্তরালে আর এক ব্যাপার আছে। এটি হচ্ছে যুগ প্রয়োজন সাধন। তাঁরা এক মহামানবকে আনতে চলেছেন ইতিহাসে। তাঁরাও জানেন না। যা জানেন, সংসারধর্ম পালন করতে এসেছেন। জীবন শেষ, সংসার শেষ। নদীতে স্নান সেরে ঘাটে উঠে ঘরে ফেরা। প্রথমে একটি কন্যা। নামটি হারিয়ে গেছে। বিবাহ হয়েছিল শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শ্রীধরের পিতা ১২৫ বছর বেঁচে ছিলেন—এও এক ইতিহাস। কন্যার পর এক পুত্র নাম জগন্মোহন। তারপর তৃতীয় পুত্র—রামমোহন। কবে এলেন—সাল তারিখের মতভেদ। কেউ বলেন—১৭৭৪ কেউ বা ১৭৮০। অবশেষে আর এক সিদ্ধান্তে সাল ও তারিখ দুটিই পাওয়া গেল। ১৭৭২ সালের ২২ মে। জননীর কোলে শিশু সন্তান। ওই যে বীজের উপমা! কেউ জানে না, মায়ের কোলে ওটি কে? এইটুকুই জানে—অতি আদরের—অতি সুশ্রী একটি শিশু।

ছেলে হাঁটতে শিখল—কথা কইতে শিখল। শিশুর বিকাশ হচ্ছে। কনিষ্ঠ সন্তান, তাই পিতা মাতার অতি আদরের। ছেলেটি শুধু সুন্দরই নয়—অসাধারণ তার বুদ্ধি, অদ্ভুত তার স্মৃতিশক্তি।

শিশুটিকে নিয়ে ফুলঠাকুরানী চাপড়ায় বাপের বাড়িতে এসেছেন। পণ্ডিত দাদুর সঙ্গে নাতির খুব দহরম-মহরম। উৎসব এসেছে। খুব ঘটা করে পূজা করলেন দাদু শ্যাম ভট্টাচার্য। কালীপূজা। দাদু মায়ের পা থেকে একটি বেলপাতা নিয়ে মঙ্গলকামনায় নাতির মুখে পুরে দিলেন। ফুলঠাকুরানী দেখে ভীষণ রেগে গেলেন। বৈষ্ণবের মুখে শাক্তর বেলপাতা। আঙুল দিয়ে টেনে বের করে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। মুখটা ভালো করে কুলকুচি করে দিলেন। মেয়ের কাণ্ড দেখে প্রবীণ পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। পূজার আসনে বসেই অভিসম্পাত দিলেন—'এই ছেলেকে নিয়ে তুই কোনোদিন সুখী হতে পারবি না। এই ছেলে তোর বিধর্মী হবে।'

ফুলঠাকুরানী চমকে উঠলেন। পূজার আসনে বসে অভিসম্পাত বাবার পা ধরে কাঁদছেন আর বলছেন—'এ তুমি কী করলে? আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি শাপ ফিরিয়ে নাও।'

'তা হয় না। আমার কথা অব্যর্থ। তবে তোর পুত্র রাজপূজ্য অসাধারণ এক মানুষ হবে।'

রামমোহন কোন সময়ে ভারতে এলেন! আকাশটা তখন কেমন! শিশুর বোঝায় উপায় নেই। সে বোধটাই তার হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন : '*রামমোহন যখন ভারতে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল।*'

নাদির দিল্লির বাদশাহীকে 'খড়া কাত'' করে গেছেন। মারাঠা শক্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে। হিন্দু সাম্রাজ্য কি তাহলে তৈরি হতে চলেছে পেশোয়া বালাজী বাজিরাও কি উদিত সূর্য?

না, ভারতের 'ভাগ্য অন্যরকম হতে চলেছে। মধ্যযুগের শেষ শিখা। সব আশা হুড়মুড়িয়ে' ভেঙে পড়ল পানিপথের যুদ্ধে। তৃতীয় যুদ্ধ। ১৭৫৭ পলাশি।.ইংরেজ ঢুকে পড়েছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার। ১৭৭০ সাল -এল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ—যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত। বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গেলেন। ১৭৭২-এই বছরই রামমোহন এলেন—আর ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে গেলেন।

দাদু বলেছিলেন তোর এই ছেলে বিধর্মী হবে। কিন্তু তার তো কোনো প্রমাণ দেখা যাচ্ছে না। মায়ের কোলে বসে—গৃহদেবতার গোপীনাথের পূজা দেখেন। পালা গানে কৃষ্ণলীলা শুনতে শুনতে চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না। হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর নিষ্ঠা। হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু ব্যাপারে তাঁকে কষ্ট দিত। পিতা, পিতামহ-মাতামহর সঙ্গে যখন বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান নিয়ে যখন বিরোধ বাধত তখন দুঃখ পেতেন। তিনি পাঠশালায় ভর্তি হলেন। সেখানে তিন ধরনের শিক্ষা চলল। গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠী আর মৌলবিদের মোক্তব। পারসি আর আরবি শিক্ষালয়।

সেকালে অদ্ভুত হিন্দু বিধানে, ৮ থেকে ৯ বছর বয়সের মধ্যে তাঁকে তিনবার বিয়ে করতে হয়েছিল। ১৭৮০-১৭৮১ তাঁর জীবনের বিবাহবর্ষ মনে লিখে রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে এই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে—আপাতত শিক্ষা। ...

কোরান ও সুফি, গণিত ও পাশ্চাত্য দর্শন, আরিস্টটল ও প্লেটোর যুক্তিবাদ, চোখের সামনে দেখা হিন্দুধর্মের বিচিত্র ভণ্ডামি। বিভিন্ন বিশিষ্ট ধর্মের উত্তর সাধকদের ভ্রষ্টাচার, তন্ত্রের নামে ব্যাভিচার, সমস্ত কিছু একত্রিত করে রামমোহন ব্যক্তিত্বকে একটি শিলাখণ্ডের মতো কঠিন করে তুলল।

কাশীর মনিকর্ণিকার শ্মশানে সারি সারি চিতা জ্বলছে। অনির্বাণ শ্মশান বিধবাদের দেহ। কঙ্কালসার। ধর্মে সমর্পণ করলে ত্বরায় চিতারোহণ। ব্যবসায়ীর হাতে সমর্পণ করলে দেহ হৃষ্টপুষ্ট কিন্তু ধর্মনাশ। বঙ্গ ললনার এ কী নিয়তি। তুর্কির হারেমে—পর্তুগিজদের দাস ব্যবসার শৃঙ্খলে আরাকানদের চালানে মগের মুলুক। বাল্যবিবাহ, বাল্য-বিধবা, নির্জলা-একাদশী। একবেলা আহার। ভাইয়ের সংসারে দাসীবৃত্তি। এই কাশীতেই বসে বালক রামমোহন প্রতিজ্ঞা করলেন, হিন্দুধর্মের ভেতরে বসেই যুগসঞ্চিত তেলকালি ঝুল মার্জনা করবেন। চামচিকে তাড়াবেন। সংহিতার আবরণ সরিয়ে বেদের আলোক জ্বালাবেন।

এবারের ঘটনা রংপুরের। রামমোহনের নিজস্ব বাড়ি। একটি দিঘিও খনন করলেন সর্বসাধারণের জন্য। গোঁড়া হিন্দু ছাড়া আর সকলেই তাঁকে সম্মান করতেন।

রাত বাড়ছে—রংপুরের নিশুতি রাত। সময় ঢুকে পড়েছে ঊনবিংশ শতকে। সভ্যতা তখনও এত আলো ঝলমলে নয়। রামমোহন চোখ বুজছেন—আর ভেসে উঠছে তাঁর চোখে সেই

বীভৎস দৃশ্য।

গ্রামে শ্মশান। চিতা সাজানো হচ্ছে। দাদা জগমোহনকে চিতায় তোলা হয়েছে। চারপাশে আত্মীয়-স্বজন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, টুলো পণ্ডিত, সাধারণ মানুষ গিজগিজ করছে। যমদূতের মতো কয়েকজনের হাতে মোটা লাঠি। এই জমায়েত শুধু জগমোহনকে চিরবিদায় জানাবার জন্য নয়, বাড়তি একটি মজা আছে, জগমোহনের জ্বলজ্যান্ত স্ত্রীকে চিতায় তোলা হবে। বউদিকে সতী করা হবে।

সে এক আলাদা আয়োজন। সদা সতর্ক বংশ দণ্ডধারীরা কে জানে কখন চিতা থেকে লাফ দেবে 'সতী'।

রামমোহন বউদিকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বউদিকে সহমরণে যেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু সমাজপতিরা এই বিধর্মীকে পাত্তাই দিলেন না।

চিতায় দুটি শয্যা। মৃত স্বামীর পাশে জীবিত স্ত্রী। সতীকে পূজা করা হয়। পরাশর সংহিতায় বলেছেন—

তিস্র কোট্যোহর্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে।
তাবং কাল বস্যে স্বর্গে ভর্তারং সানুগচ্ছতি।।

(সাড়ে তিন কোটি লোম আছে মানবদেহে। যে নারী স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হন, তিনি সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গে বাস করেন)

শ্মশানে তিলধারণের জায়গা নেই—ঢাক-ঢোল বাজছে—কড় কড় শব্দে কাড়া-নাকড়া—সতীর শেষ কার্য সমাপ্ত। দেবীর মতো লাগছে রাঙা চেলিতে—নতুন বস্ত্রে। শাঁখা আর সিঁন্দুরে। ঠিক যেন—

'খয়ের রাশি ছড়িয়ে পথে,
চলল নিয়ে শবের সাথে—
যেথায় শ্মশানঘাট।
গুড়িয়ে শাখা, সবাই মিলে
চিতায় মোরে বসিয়ে দিলে,
বাজল শতেক শাঁখ;
লোকের ভিড়ে ভরেছে ঘাট —
ধোঁয়ায় চিতার আধ-ভিজা কাঠ
উঠল গর্জে ঢাক'। (সহমরণ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

অনেক দর্শক, রামমোহনও দর্শক। শ্রদ্ধেয়া বৌদি অলকামঞ্জরী চিতা প্রদক্ষিণ করছেন। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করছেন। বৌদি চিতায় উঠলেন। স্বামীর মাথাটা কোলে তুলে নিলেন। ডান হাতে একটি আম্র-পল্লব। চিতা জ্বালাবেন গোবিন্দপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠপুত্র।

পুরোহিতের নির্দেশ, মুখে থাকবে হাসি আর যতক্ষণ পারবে আম্রপল্লব নাড়বে। তুমুল

বাদ্যবাজনা। লকলকে আগুন ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে। চন্দন কাঠের গন্ধ। দেহ-মাংসের পোড়া-পোড়া গন্ধ। সাড়ে তিন কোটি বছরের জন্য স্বর্গযাত্রা। 'সদ্য প্রজ্বলিত চিতার অজস্র' ধুয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালির মা— ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা। চুড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভেতরে কে যেন বসিয়া আছে—মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাহার সিঁদুরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো। (অভাগীর স্বর্গ—শরৎচন্দ্র)

রোমকূপে শিরায় শিরায় জ্বালা ধরে। প্রাণ বেরিয়ে যায় বাঁচার তাগিদ। বংশ দণ্ডধারীরা চেপে ধরে। সমবেত জনতার চিৎকারে অলকমঞ্জরীর আর্ত চিৎকার চাপা পড়ে যায়...।

ছাপ মারা, সারা দেহে বোবা কান্নার মতো বউদির সতী হওয়ার বুকের মধ্যে ছবি আঁকা হয়ে গেল।

চিতা ছুঁয়ে রামমোহন প্রতিজ্ঞা করলেন—'দেখে নোব'। এই অমানবিক প্রথাটি এল কোথা? আলেকজান্দারের আমল থেকে? সেলুকাসের রচনায় জানা যায় কোনো এক অনার্য রমণী স্বামীর মৃত্যুর পর—স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সহমরণ—কালক্রমে হল সতীদাহ।

গুপ্তযুগে একটু তাকানো যাক। সে যুগে সমাজে সতীদাহের প্রচলন ছিল না। এমন কথা বলা যাবে না। তবে তখন এর প্রচলন কতটা ছিল এবং কতটা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সতীদাহের প্রথম নিশ্চিত প্রমাণ গুপ্ত যুগেই পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ৫১০ খ্রি.-এর এরনে শিলালেখর কথা উল্লেখ করা যায়। ওই লেখতে বিধৃত হয়েছে যে, গুপ্তরাজ ভানুগুপ্তের সহযোগী হিসাবে তাঁর সামন্ত প্রধান গোপরাজ এক ভয়াবহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ওই যুদ্ধে গোপরাজ নিহত হন এবং তাঁর স্ত্রী আত্মাহুতি দেন। সুতরাং গুপ্তযুগে সতী হবার এটি একটি আকর উপাদান এবং যে ক্ষুদ্র স্তম্ভে এটি বিধৃত হয়েছে তা সম্ভবত এই ঘটনার স্মারক। এ যুগের অন্যতম স্মৃতি শাস্ত্রকার বৃহস্পতি বিধবাদের সতী হবার নির্দেশ দিয়েছেন। বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতায়—(৭৪.১৪-১৬) সতীপ্রথার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সতীদাহের ব্যাপক প্রচলন বোধহয় সে যুগে ছিল না। এক্ষেত্রে দুটি কারণ দেখানো যেতে পারে প্রথমত স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে বিধবাদের বৈধব্যজীবনে কঠোর সংযম অনুসরণ করার উল্লেখ আছে। যদি সতীদাহ প্রথা থাকবে তা হলে কঠোর বৈধব্য জীবনের প্রশ্ন ওঠা অবান্তর। দ্বিতীয়ত যদি এই প্রথার বহুল প্রচলন থাকতো তা হলে চিনা পর্যটক ফা-হিয়েনের বিবরণে স্থান পেত। তবুও সে যুগে ছিল এবং তা সীমিত। (ভারতবর্ষের ইতিহাস : গোপালচন্দ্র সিনহা)

শাস্ত্রে সতী বলতে বোঝায় :

আর্তাতে মুদ্রিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।।

কালক্রমে এর অর্থ সংকোচন ঘটে গেল। আপন সতীর্থ প্রমাণে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হাজার হাজার বছর ধরে অগণিত ভারতীয় হিন্দু নারীকে চিতাগ্নিতে আত্মাহুতি। বিষ্ণু-সংহিতায় রয়েছে 'মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্য; তদন্বারোহনং বা'' অর্থাৎ পতির মৃত্যু হলে ব্রহ্মচর্য কিংবা স্বামীর সহগমন বা অনুগমন স্ত্রী লোকের ধর্ম। আলিয়া প্রমুখ ঋষিদের উদ্ধৃত করে এই কুখ্যাত প্রথা সম্বন্ধে দেওয়া হত শাস্ত্রীয় দোহাই :

মৃতে ভর্তরী যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং
সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটি চ যানি লোমনি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি সঃ স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।

এভাবে শাস্ত্রের নাম করে জগদ্দল পাথরের মতো আমাদের সমাজ-জীবনে একটা বর্বর প্রথা বা অনুশাসন চেপে বসত। আদিম যুগ থেকে শ্লাভদেশ, স্কান্ডিনেভিয়া, গ্রিস, মিশর, চিন ইত্যাদি পৃথিবীর নানা জায়গায় কোনো-না-কোনো-ভাবে এই আত্ম-বলিদান প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই হতভাগ্য ভারতবর্ষ ছাড়া আব কোনো সভ্য দেশে এই প্রথা—আধুনিক যুগের সূচনা পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। সুপ্রাচীন কাল থেকে আর্য-অনার্য সব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। এক সময় তা ছিল স্বেচ্ছাধীন আপন শোকাবেগ সংবরণ করতে না পেরে অনেক পত্নীই সহমরণে যেতেন। রামায়ণে কৌশল্যা জ্ঞাপন করেছিলেন—একবার সহমৃতা হবার অভিলাষ :

সাহমাদৈব দৃষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা।
ইদং শরীর মালিঙ্গ্য প্রবেক্ষামি হুতাশনম্।।

মহাভারতে পরিলক্ষিত হয় রাজা পাণ্ডুর চিতায় তার দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রী সতী হয়েছেন। তাছাড়া মহাভারতে এও উল্লেখ আছে যে, যে সব স্ত্রী প্রথমদিকে স্বামীর ঘৃণার চোখে দর্শন করে অথবা যারা পতির প্রতিকূলে বর্তমান হয়, তারা সকলে যদি যথাসময়ে কামবশে বা ক্রোধ বশে কিংবা ভয়হেতুও সহমরণ করে, তা হলে তারা পবিত্র হয়।

অবশেষে ফিরে আসি আধুনিকের সূচনা পর্বে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে ''পতির পায়ে যাহার মন তারে বলি সতী''।

খুব ভালো কথা। অতি উত্তম কথা। ঘটনাগুলো একটু সাজান যাক বাঘনাপাড়ার ঘটনা এক ব্রাহ্মণের ১০০ স্ত্রী। সতী তো হতেই হবে প্রথম দিন চিতায় উঠল তিনজন, দ্বিতীয় দিন পনেরোজন, তৃতীয় দিন উনিশজন। মোট সাঁইত্রিশজন স্ত্রী সহমৃতা হলেন। চিতা জ্বলেছিল তিন দিন। ধন্য-ধন্য পড়ে গেল।

আরও আছে। উলা এ গ্রামের নাম। মুক্তারাম মারা গেলেন তেরো স্ত্রী-কে রেখে। তাঁরা সহমৃতা হবেন। মণ মণ কাঠ দিয়ে চিতা সাজানো। ঢাক-ঢোল-কাঁসরের আওয়াজ। সমবেত জনতার মাঝে পবিত্র শাঁখের আওয়াজ। লেলিহান শিখা। একে একে এগারোজন স্ত্রী সহমৃতা হলেন। শেযে বারো ও তেরো নম্বর স্ত্রী সদ্য যুবতী, তাদের মনোবলে চিড় ধরল। তারা ছুটতে

শুরু করল। আর পেছনে পেছনে ধাওয়া করল হিন্দু ধর্মের লগুড়ধারীরা। তাদের ছেলেরাও ছুটছে। মাকে চেপে ধরল। চেপে ধরল আগুনও। ধর্মের নামে তৃপ্তির হাসি।

সব দেখলেন বিবেকবান রামমোহন। তাঁর জীবনটাকে তৈরি করলেন—বলিষ্ঠ—প্রতিষ্ঠ - শিক্ষিত—চরিত্রবান। মনের ভেতরে আনলেন শৃঙ্খলা। কারণ মন যদি বিশৃঙ্খলা করে তবে সব কাজেই হবে অকাজ।

১৮২৩ সালে বাংলা সরকারের কাছে পুলিশ রিপোর্ট। মোট সহমৃতা হয়েছিল ৫৭৫ জন। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিল ২৩৪। ক্ষত্রিয় ৩৫। বৈশ্য ২৪। শুদ্র ২৯২।

রামমোহন রায়ের বন্ধু আডাম সাহেব বিলেতের এক সভায় বলেছিলেন—১৭৬৫ সালে বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপন অবধি—সরকার ও তার কর্মচারীদের চোখের সামনে—প্রতিদিন অন্তত দুটি একটি হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হত। আর প্রতিবছর অন্তত ৫-৬ শো অনাথ রমণীকেও হত্যা করা হত এইভাবে।

দেশের নিয়ম অনুসারে পাদরিরা এর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতেন না। ১৮২৮ সালে ৯ মার্চ জে. পেগস একটি বই প্রকাশ করলেন। বল প্রয়োগ করে পুড়িয়ে দেবার ঘটনা প্রতিটি ছত্রে। এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। ফ্যানী পার্কস প্রকাশ করেছিলেন বলপূর্বক সতীদাহের বীভৎস কয়েকটি ঘটনা।

১৮৩০ সাল। কানপুর। ধনী ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। স্ত্রী সতী হবেন। চিতা প্রস্তুত। গঙ্গার ধার। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং উপস্থিত। চিতার পাশে সিপাহি খোলা তরোয়াল হাতে দণ্ডায়মান। যেন সতী হতে জোর না করা হয়। সতী উপযুক্ত পোশাকে তৈরি। স্বামীর মাথা নিজের কোলে নিয়ে চিতায় বসলেন। লকলকে আগুন। সেই তাপ সহ্য করতে না পেরে সতী গঙ্গায় ঝাঁপ মারেন আর কি! সিপাহী কর্তব্য ভুলে কাটতে গেলেন তরোয়াল দিয়ে। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে কয়েদ করে রাখলেন। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সতী ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গায়। লোকজন জোর করে চিতায় বসাতে গেল সতীকে। কিন্তু বাধা দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সতীকে সঙ্গে সঙ্গে পালকিতে তুলে হাসপাতালে পাঠানো হল।

যাই হোক, সতীদাহ চলছে—চলবে। তবুও কিছু নিয়ম বেঁধে দেওয়া হল। যেমন বলপ্রয়োগ চলবে না। মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য খাওয়ানো চলবে না। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা যে বয়স বেঁধে দিয়েছেন তা মানতে হবে। গর্ভে সন্তান থাকলে সতী করা যাবে না। পাল্টা চাল চালালেন গোঁড়া হিন্দুরা এই বিধি নিষেধ তুলে নেবার আবেদন করলেন। রামমোহনও আবেদন করলেন যেন এই নিয়ম বলবৎ থাকে। "নিবর্তক" দুটি বই লিখলেন রামমোহন। এবার আর লেখা নিয়েই পড়ে থাকলেন না। যেখানে সতীদাহ হত সেখানে ছুটে যেতেন রামমোহন। বোঝাতেন সেই পরিবারকে। ১৮৩০ সাল। প্রকাশিত হল 'সংবাদ কৌমুদী'। এবং সহমরণ বিষয়ে তৃতীয় প্রস্তাব।

১৮২০-২৮। লর্ড আমহার্স্টের শাসনকাল। হ্যামিলটন ও বেলী সাহেব সতীদাহ রদের

পক্ষপাতী। কিন্তু আমহার্স্ট সতীদাহ রদের বিরোধী। যাইহোক - এল বেন্টিঙ্কের কাল। সতীদাহের সমর্থনে একশো পাতার একটি বই লেখা হল। তাতে ছিল অঙ্গীরা, পরাশর হারিত ও বিভিন্ন শাস্ত্রকারের বচন ও শ্লোক। রুখে দাঁড়ালেন রামমোহন। যুক্তির জাল বিছিয়ে দিলেন। তিনি



সহমরণ/সতীপুকুর, ইসলামপুর। ছবি : বাণীপ্রসাদ নাগ।

লিখলেন : Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Right of Females. ইংরেজ ও পার্লামেন্টে বিরাট বিতর্ক। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বহু মানুষ এই প্রথার বিরোধ জানালেন। ইংরেজদের শাসককালে এই গণ নারীমেধ যজ্ঞ। আর যে মান থাকে না! বেন্টিঙ্ক ডেকে পাঠালেন রামমোহনকে জিজ্ঞেস করলেন শাস্ত্রেই তো লেখা আছে সতীদাহ প্রথা—এসম্বন্ধে আপনার মত কী?

স্পষ্টবক্তা রামমোহন জানালেন—শাস্ত্র মানুষের তৈরি ভগবানের নয়। বিধবার প্রচুর সম্পত্তি থাকলে তাকে ছলে-বলে কৌশলে—সতী সহমরণ অক্ষয় পুণ্য ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে সতী করা হয়। স্বার্থপর আত্মীয়-স্বজন, লোভী ব্রাহ্মণ এতে জড়িত। স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা রমণী যখন শোকাহত—কিংকর্তব্যবিমূঢ়—বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য তখন এইসব হীন ব্রাহ্মণদের এগিয়ে দেওয়া হয় তাকে রাজি করানোর জন্য। স্বাভাবিকভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর রমণীটি থাকে অনাহারে। তার মস্তিষ্ক বিকৃতির সুযোগ নিয়ে তাকে উত্তেজক দ্রব্য খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে দিয়ে তাকে বলানো হয় 'আমি সতী হব'।

বেন্টিঙ্ক শুনলেন। উপলব্ধি করলেন বিষয়টি। —আশ্বাস দিলেন রামমোহনকে।

১৮২৯ সাল। শীতের কলকাতা। ইংরেজের কলকাতা। ডিসেম্বরের সকাল। "একটু অন্যরকম" আজকের হাওয়াটা একটু নরম। বিধবা নারীরা এই সকালে নিঃশ্বাস নিলেন বুক ভরে। বেন্টিঙ্ক আইন করে ভারতভূমি থেকে সতীদাহ রদ করে দিলেন। গোঁড়া হিন্দুরা বলতে লাগলেন ঘোর কলি। রামমোহন ব্যাটাকে মেরে ফ্যাল।

প্রিভি কাউন্সিল সতীদাহ প্রথা বাতিল করে দিলেন। রামমোহন স্বপ্ন একে একে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বয়স হচ্ছে। শরীর ভাঙছে। দেহে পক্ষাঘাতের লক্ষণ। যতক্ষণ জেগে থাকেন ততক্ষণ বলেন ওঁ।—

১৮৩৩ সাল, ২৭ সেপ্টেম্বর। ভারী সুন্দর রাত। পরিপূর্ণ চাঁদ। শেষ হয়ে গেল একটা অধ্যায়।

ওঁ শাঁন্তি—ওঁ শাঁন্তি ও শাঁন্তি।

তথ্যসূত্র :

রামমোহন রায়ের জীবনী, উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি : বাংলাদেশে কৌলীন্যপ্রথার অত্যাচার।

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক।

বৃক্ষনামা অথবা সৎকার বৃক্ষ

অনিল ঘোষ

ফিরে যেতে হবে আমাদের সেই সময়ে, যখন মানুষের অন্তিম সৎকারের জন্য না ছিল কোনও নির্দিষ্ট স্থান বা শ্মশানঘাট, না ছিল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। নদীমাতৃক বাংলার দুর্গম গ্রামাঞ্চলে মানুষ মৃত্যু-পরবর্তী ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছে—এ সেই সময়ের কথা। বেশি দূরের কথা নয়, ঘর থেকে অদূরেই হয়তো আমাদের সকলের মধ্যেই।

জন্ম মৃত্যু—জীবনের স্বাভাবিক ব্যাপার। জন্মে যেমন আনন্দ, মৃত্যুতে তেমন শোক দুঃখ বিষাদ। এটাই স্বাভাবিক। জীবন দু-দিন বই তো নয়। বাউল গানে আছে, যেতে হবে সকল খোলস ছেড়ে। লিউ টলস্টয়ের গল্পে আছে, মানুষের শেষমেষ প্রয়োজন সাড়ে সাত হাত জমি। যেখানে তার নশ্বর দেহ শায়িত থাকবে চিরদিনের মতন। সেইকালে আমাদের পূর্বপুরুষ, যাঁরা এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, কিছুকাল কাটিয়েছেন হাসি কান্নায়, কর্মে অবসরে। তারপর যখন যাওয়ার সময় হল, কিংবা যাওয়া সম্পূর্ণ হল—পিছনে থাকল শুধু দেহটা। শীতল প্রাণহীন দেহটা। যার সৎকার জরুরি। এখানেই আসে প্রথার প্রশ্ন, সম্প্রদায় ভেদে আচার-বিচার, সংস্কারের কথা। প্রথা মেনে কেউ যান মাটিতে, কেউ ওঠেন চিতায়। এইসব প্রথা, ধর্মীয় পোশাকের আবরণে। আবার সৎকারের লৌকিক আচারও চোখে পড়ে, যেমন সাপে কাটা মৃতু ব্যক্তিকে কলার ভেলায় নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, মনসা-মঙ্গলের লখিন্দরের মতো সে-ও যদি বেঁচে ফেরে!

হিন্দু সমাজে শবদাহ একটা প্রথা। এখন দাহকাজের নির্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন। প্রয়োজন দাহ-উপযোগী উপকরণের। এর মধ্যে প্রধান হল কাঠ। বিশেষ করে তেঁতুল কাঠ।

আজকের দিনেও বাংলার অঞ্চল আছে যেখানে দাহ কাজের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি নেই। নেই উপযুক্ত কাঠের ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে মৃতদেহ সৎকারের জন্য নদীই একমাত্র সহায়। সাধারণত নদীতীরবর্তী নির্জনস্থান দাহ কাজের উপযোগী হিসেবে বিবেচিত হয়। যা পরে শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়। বাংলার শ্মশান মূলত লোকালয়ের বাইরে অবস্থিত। সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে দেখেছি নদীর ধারে, খালপাড়ে, পুকুরপাড়ে অথবা মাঠের ধারে শবদাহ করা হচ্ছে। এরজন্য যে কাঠ লাগছে, তা আনা হচ্ছে মৃতের বাড়ির থেকেই। দেখা যায় বাড়িতে মৃত্যুর ক্রন্দন রোল উঠেছে, আর একদল শোকার্ত মানুষ কুড়ুল কাটারি নিয়ে বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ, বাড়ির তেঁতুল বা অন্য গাছ কাটা হচ্ছে সৎকারের উদ্দেশ্যে। এমনও শোনা যায় মৃত ব্যক্তি স্বয়ং ওই গাছ পুঁতেছিলেন, যাতে মৃত্যুর পরে গাছের কাছে শবদাহ করা সম্ভব হয়। এগুলোকে বলা হয় সৎকার বৃক্ষ।

সারা বাংলায় সেখানে যোগাযোগ চিত্র খুব করুণ, দুর্গম প্রায় বিচ্ছিন্ন বলা চলে—সেইসব

স্থানে শবদাহের নিমিত্ত গাছগুলি যে কত প্রয়োজনের, কত জরুরি—না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। চোখে দেখা সীমানার বাইরে পা রাখতে চাই না। মূলত বসিরহাট-সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামে সীমাবদ্ধ থাকছি। এখানে সৎকারের যে চিত্র, হয়তো এর বাইরেও একই দৃশ্য দেখা যাবে।

সুন্দরবনের গ্রামাঞ্চলে যেখানে মাইলের পর মাইল ফাঁকা মাঠ, সেই মাঠের পাশে যে সব গ্রাম—সেখানে অন্য গাছ থাকলেও তেঁতুল গাছ থাকবেই। শুনেছি, তেঁতুল কাঠে দাহ কাজ ভালোভাবে আর দ্রুত করা যায়।

একজন হিন্দুর মৃত্যুতে গাছের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। মিশরে ফারাওদের মৃত্যুর পর দেহ মমি করা হত, সেই সঙ্গে তাদের প্রিয় বস্তু, দাসদাসী এমনকী প্রিয় কুকুরকে পর্যন্ত মমি করে দেওয়া হত। এখানে প্রিয় শব্দটির পরিবর্তে প্রয়োজন বললে উপযুক্ত হবে। হিন্দুর মৃতদেহর সঙ্গে গাছেরও মৃত্যু অনিবার্য। কেননা মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে গেলে চালি করতে হবে। চালি হবে বাঁশের। সংস্কার আছে, নতুন বাঁশ ছাড়া চালি হবে না। তারপর মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য কাঠ আসবে গাছ থেকে। শ্মশানে মৃতদেহ আসছে, সেইসঙ্গে আসছে গাছের শবদেহ। অর্থাৎ গাছ আর মানুষ যেন একে অপরের পরিপূরক। দুজনই মরণশীল। একজনের হয়তো স্বাভাবিক মৃত্যু হল, কিন্তু অন্যজনকে মরতে হল, সেটাও মানুষের হাতে। অধিকাংশ গ্রামের শ্মশানে কোনো কাঠের আড়ত দেখিনি, যেখান থেকে মানুষ কাঠ কিনে দাহকাজ করতে পারে। যিনি পরলোকে যাবেন তিনি বা বাড়ির লোককে দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করতে হয় এবং সেটা গাছের মৃত্যু দিয়ে।

আমরা বলছি সেইকালের কথা। যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের মতো ছিল না। সেইরকম সময়ে গ্রামের মানুষ, হয়তো অবস্থাপন্ন গৃহস্থ নিজের নামে একটি তেঁতুল গাছ পুঁতে রাখলেন। বাড়ির সবাইকে বলে রাখলেন, এই গাছের গাঠ দিয়ে তাঁকে যেন সৎকার করা হয়। একটা পূর্ণ বয়স্ক তেঁতুল গাছ তৈরি হতে সময় লাগে। এমনও হয়েছে, যাঁর নামে গাছ, তিনি মারা গেছেন অকালে। এবারে অন্য কেউ হয়তো তাঁর বাড়ির গাছ দিলেন সৎকারের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে একটা অলিখিত শর্ত হয়ে গেল, মৃতের বাড়ির গাছ তিনি পাবেন। এই বিনিময় প্রথার মধ্যে কোনও টাকা পয়সার লেনদেন নেই। মানুষের মৃত্যুতে ঝাড়ের বাঁশ আর দাহর কাঠ—এসব নিয়ে কেউ দরদাম করে না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টাকা পয়সা ছাড়াই এসব পাওয়া যায়। বিপদ আপদে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামজীবন গড়ে ওঠে।

একটি গ্রামের কথা বলি। নাম কুমারজোল। মিনাখাঁ থানায়। এই গ্রাম সম্পর্কে একটি ছড়া আছে, যে যায় কুমারজোল/সে ছাড়ে মায়ের কোল। আসলে গ্রামটির অবস্থান এমনই দুর্গম ও দুরূহ ছিল যে, পায়ে হাঁটা ছাড়া সেখানে পৌঁছনোর অন্য কোনো উপায় ছিল না। কোন এক কালে এই গ্রামের পাশ দিয়ে ছোটো একটি নদী বয়ে যেত। নাম শ্যামলী। সে নদী আজ নেই। পড়ে আছে বিস্তীর্ণ চর ফসলের শ্যামলিমা নিয়ে। এককালে এই নদীর পাড়ে শ্মশান ছিল। আজও শ্মশান আছে, তবে পাশে আছে একটি গভীর পুকুর। লোকে বলে শ্মশান পুকুর। এর

জল কালচে। তবে সারাবছরই জল থাকে। কালের নিয়মে শ্মশানের চারপাশে পাকা পাঁচিল উঠেছে। হয়েছে বিশ্রামাগার। তবে কোনো ডোম নেই। নেই কোনো কাঠের আড়ত, পাশেই স্থায়ী হাটখোলা থাকলেও। আজও সেখানে মৃতদেহ দাহ করা হয় গাছ কেটে। এজন্য এখানে গাছ পোঁতা হচ্ছে, গাছ কাটাও হচ্ছে। এক একটা গাছ যেন এক একটা মানুষের জীবন। এই গাছের ইতিহাস শুনলে মানুষের জীবন-ইতিহাস পাওয়া যাবে। এখানে প্রতিটি গাছের (মূলত তেঁতুল গাছ) গায়ে কোনো-না-কোনো মানুষের নাম লেখা আছে। এ এক বৃক্ষনামা। বৃক্ষের মধ্যে মানুষের পরিচয়।

তবে অন্য চিত্রও আছে। যেমন গ্রামের মধ্যে বৃহৎ তেঁতুল গাছ দেখিয়ে হাটের এক দোকানদার বলেছিল, ওটা হচ্ছে দাসেদের মায়ের নামে। তিনি নব্বই বছর বেঁচেছিলেন। তিনি যখন মারা যান, ততদিনে এই অঞ্চলে পাকা রাস্তা হয়েছে, কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। বৃদ্ধার মৃতদেহ কেওড়াতলার শ্মশানে দাহ করা হয়। গাছটি কিন্তু রয়ে গেছে শরিকি সংঘর্ষের নিমিত্ত হয়ে। দাসেরা পৃথকান্ন হয়েছে, কিন্তু গাছের মালিকনা আজও নির্ধারিত হয়নি। যে ভাই গাছ কাটতে গিয়েছে, বাধা দিয়েছে অন্য ভাইরা। আক্ষরিক অর্থে লাঠিসোটা নিয়ে। এইরকম অনেক গাছ পড়ে আছে ইতিহাসের খোরাক হয়ে। তারা ছায়া দেয়, ফল দেয়।

আবার বড়ো কোনো দুর্ঘটনা, মহামারী, মড়ক—এরকম সময়ে গ্রামের মানুষ কী করত? এই প্রসঙ্গে গ্রামেরই এক প্রবীণ মানুষ জানালেন, তখন নদীর স্রোতই ভরসা। কাঠ কোথায় পাবে মানুষ! নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। শুধু প্রথা মেনে মুখে পাঠকাটির আগুন ছুঁইয়ে মৃতদেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া।

এখন অবশ্য চিত্রটা বদলেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি যেখানে বেড়েছে, সেখানকার মানুষ মৃতদেহ হয় কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে কিংবা যাচ্ছে কোনো বড়ো শ্মশানে। যেখানে কাঠের আড়ত আছে। ফলে সৎকার বৃক্ষগুলি নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর গায়ে এখন আর কারও নাম লেখা হয় না। তবে মহাজনের লোভের হাতে যে তাদের মৃত্যু অনিবার্য—এও তো সত্য। নির্দিষ্ট না হলেও অনির্দিষ্ট শবের দাহকাজের জন্য গাছগুলোর মরণ অবশ্যম্ভাবী।

❑ লেখক পরিচিতি : গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সহ সম্পাদক স্বদেশচর্চা লোক।

বাউলের সমাধি এবং ...

মৌসুমী চন্দ্র

বিশ্বায়নে বাউল আজ পণ্য; বিশ্বভ্রমণ, সফেদ-রমণী বিলাস, ডলার, স্কচ, গ্ল্যামারের কবলে প'ড়ে জড় ভোগবাদী দর্শনের আশ্চর্য শিকার। বাউল আজ উধাও, বেড়েছে বাউল গায়কদের সংখ্যা হু হু করে। সাধনাও তেমন করে আর নেই। ভাবের ঘরে চোর সিঁধাইছে, ব্যবসা জমেছে ভালোই।...' খাঁটি কথা লিখেছেন মুসাফির বাউল। ১৯৯৬ সালের জুন থেকে আমার বাউল প্রেমিক স্বামী ড. সুব্রত চন্দ্রের সঙ্গে বীরভূমের সমগ্র পশ্চিম ও আংশিক দক্ষিণ অংশের ক্ষেত্র-সমীক্ষার ভিত্তিতে আমরা দেখেছি, গ্রামের প্রাচীন আখড়াগুলি বর্তমানে প্রায় অবলুপ্ত। সাধক বাউলেরা গ্রাম ছাড়তে নারাজ হলেও সাজা বাউল বা নিছক গায়ক বাউলেরা মূলত শহরমুখী। আখড়া বা আশ্রম ছেড়ে জীবনের মূলস্রোতে মিশে যেতে নিছক গায়ক বাউলরা উদ্‌গ্রীব। বাউল সনাতন দাসের কথায়, 'বাউল জীবন সাধনার জীবন। সকলের পক্ষে তা সম্ভব নয়।' তবে প্রকৃত 'জ্যান্তে মরা' না হতে পেরেও যারা আখড়া অনুরাগী, তাঁরা প্রকাশ্য পার্বণে থাকেন না বলে গ্রামীণ আখড়াগুলি মূলত মাধুকরীর মাধ্যমে বেঁচে আছে। বাউলতীর্থ জয়দেব কেন্দুলিতে স্থায়ী আখড়া মোটামুটি ৫০টি। কেবলমাত্র মাধুকরী বৃত্তির দ্বারাই সুধীর দাস বাউল (৬০) ১৩৭৩ থেকে এই আশ্রম চালনা করেছেন (সমীক্ষা : ১৯৯৭)। 'অউম' পত্রিকার ১৪ই জানুয়ারি, ২০০১ সংখ্যাটি তাঁর প্রয়াণে উৎসর্গ করা হয়েছে (তমালতলা, কেন্দুলি)।

প্রায় সব আখড়াতেই থাকে গুরুদের সমাধি। অবলুপ্তপ্রায় খয়রাডিহির 'বৈষ্ণব গোঁসাই আখড়ায়—সেবাদাস ও তাঁর মাতাজী, ভগবান দাস ও তাঁর মাতাজী, বিলাসীমাতা ও লবঙ্গ লতিকা মাতা প্রমুখদের সমাধি প্রত্যক্ষ করেছি। রাজনগরের কুণ্ডীরাতেও দেখেছি অসংখ্য সমাধি। ছোরামাঠ, কোটাসুর, কাঁটাপালন, দুবরাজপুর (দরবেশ আশ্রম কিংবা মাধব দাসের আখড়া), কড়িধ্যা—ছোটোবাজার (রাজনগর) যেখানেই গেছি সমাধি ছাড়া আখড়া চোখে পড়েনি। বাউল তীর্থ কেন্দুলিতেও তাই।

সমাধির আকার প্রকার ঃ

ছোট-বড়-লম্বা; বর্গাকার (স্কোয়ার), আয়তাকার (রেক্ট্যানগেল), কোণাকৃতি (কোণ সেপ্), গোলাকার (সার্কেল), তাঁবুর মতন (টেন্ট সেপ্), ত্রিকোণ (ট্রানগেল্), ডিম্বাকৃতি (ওভাল্) প্রভৃতি নানা আকার (সাইজ) ও আকৃতির (সেপ্) বাউলের সমাধি দেখে প্রশ্ন কারো মনে জাগতেই পারে যে এর পিছনে কি কোনো রূপক (অ্যালিগোরি) আছে কিনা?

এর উত্তরে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাউল বলেছিলেন, 'কৃষ্ণ কেমন? না, যার মন

যেমন। এর বেশি কিছু বলব না, বুঝে নাও।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসী বলেছিলেন, 'গহীন জলে ডুব না দিলে লাভের ঘরে শূন্য হয়—বাউলের তত্ত্ব বোঝে, তাহলেই সব বুঝবে, এ হল.যোনি সাধনা।' 'ভগ মানে আমার ... টা, বান মানে সাধুবাবার ....টা' বলেছিলেন এক বাউলের মাতাজী (অর্থাৎ সাধন-সঙ্গিনী)। 'বাউল-গুরুরা ভগবান—বুঝে নাও, তোমরা তো ঘুরছো—তা বাবা মায়েরা ঘোর, কথায় আছে, ''ঘুরে ফিরে বারো/ঘরে বসে তেরো/যদি করতে পারো''—এমন কথাও শুনেছি।

সত্যেন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন, 'কীর্তন আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি,/মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।' উপরের কথাবার্তায় এর উল্টোটাই হয়তো মনে হবে। সত্যি বলতে কি বিষয়টি নিয়ে অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে কথা বলেও কোনো সদুত্তর মেলেনি।

মৃত্যুর পর হয় বাউলের সমাধি, কিন্তু মৃত্যুর আগেই তো বাউলকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। বাউল গানে আমরা শুনেছি একথা— ''আগে রাস্তা ধর মন/ভজ সেই গুরুর চরণ/... গুরু ধরিয়া তুমি শিখিয়া লইও/ মরণের আগে যদি একবার মর।/... প্রেমের ফুল যদি ফুটাইতে পার/ মরণের আগে যদি একবার মর।''

আমাদের সমীক্ষিত অঞ্চলটি হল ২৪ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখার দক্ষিণে এবং ৮৭ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৮৮ ডিগ্রি পূর্বদ্রাঘিমা রেখার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত (বীরভূম জেলার সমগ্র পশ্চিম ও আংশিক দক্ষিণ অংশ)। খয়রাশোল, রাজনগর, দুবরাজপুর এবং সিউড়ি (১,২) এই চারটি ব্লক বা পঞ্চায়েত সমিতি পশ্চিম অংশের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে বোলপুর, শান্তিনিকেতন, কোপাই, ইলামবাজার, কেন্দুলি প্রভৃতি স্থানগুলি আংশিক দক্ষিণের অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহ্যশালী প্রাচীন আখড়াগুলি বর্তমানে অবলুপ্ত, যেমন—খয়রাশোল ব্লকের জাহিদপুর আখড়া কিংবা রাজনগর ব্লকের খয়রাডিহির বৈষ্ণব-গোঁসাই আখড়া। রাজনগর থানার বলরাম দাস মহান্ত (৪০) আখড়ার নিয়ম অনুসারে মহোৎসব আয়োজন করেন ৬ পৌষ, তবে এঁদের বর্তমান বৃত্তি চাষবাস। রাজনগর ব্লকের তাঁতিপাড়া গ্রামের শ্রীশ্রীগোপাল জিউ-এর মন্দির যেটি, সেখানে গোড়াতে বাউল আখড়া ছিল। কোটাসুর আশ্রমটিতে বর্তমানে কোনো বাউল বসবাস না করলেও অতীতের স্মারক হয়ে সেটি সন্তু সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে বাউলতীর্থ হয়ে উঠেছে। বহু মানুষের যাতায়াত ছাড়াও মহোৎসবের মাধ্যমে এই আখড়ার অতীত গৌরব এখনও সম্মানিত হচ্ছে। আশ্রমটির নাটমন্দিরেব ভিতরে ১৬টি সমাধি আছে। বাইরে আছে আরও ৩টির বেশি। মাধবীতলার পাশে আছে 'পঞ্চমুণ্ডি' (কাচের জানালা দেওয়া ঘর), মাঠে উন্মুক্ত ১৬টিরও বেশি সমাধি—গুনে শেষ করা যাবে না। কাঁটাপালন গোপাল আশ্রমে আছে ১৬৫জনের সমাধি। দুবরাজপুরের দরবেশ আশ্রমে দেখেছি ১৯টি সমাধি। কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত কালিপুর গ্রামের গোদর গোস্বামীর আশ্রমে কম করে ১৫০টি সমাধি আছে। খয়রাডিহির লুপ্ত প্রায় 'বৈষ্ণব গোঁসাই আখড়া'তে ৭টি সমাধি আছে। সাধু গুরু বা আখড়ার প্রয়াত প্রাণপুরুষের সমাধি কিংবা দেবদেবীর মূর্তি দেখে ভক্তরা অখুশি হন না।

আখড়ার বাউলবাবাজীরাও বিগ্রহে বিশ্বাসী না হয়েও ভক্ত সন্তানদের জন্যই এগুলি রাখার পক্ষপাতী। বাঁকুড়ার খয়েরবনির জগবন্ধু আশ্রমের প্রাণপুরুষ সনাতন দাস বাউলের কথায়, 'বাউলদের আশ্রমে এবং মন্দিরে যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, এসব কেবল ভক্ত সন্তানদের জন্য। এতে বৈদিক ভক্তের ভক্তি প্রগাঢ় হয়। যখন মানুষ আত্মতত্ত্বের সন্ধান খুঁজে পায়, তখন তাদের মন কেবল শ্রীগুরুর সেবায় নিযুক্ত হয়। আর কোন দেবদেবীর সেবায় প্রয়োজন হয় না।' দেবদেবীর বিগ্রহে আগ্রহী না হয়েও বাউল গানে বাউল বন্দনা করেন গুরুর চরণের পাশাপাশি গৌরাঙ্গদেবকে; লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, ষষ্ঠী — খোদাতাল্লা, রসুলআল্লা, ইমাম হোসেন সকলেই বাউলের উপাস্য হয়ে ধরা দেয় গানে। যদিও বাউল 'আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ' (রবীন্দ্রনাথ) তবু বাউল আখড়ায় রাধা-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গদেব প্রভৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন বাউল গুরুর ছবিও দেখা যায়। প্রখ্যাত বাউল গানের শিল্পী পূর্ণচন্দ্র দাসের ভাই লক্ষ্মণচন্দ্র দাসের আখড়ায় (সিউড়ি) দেখেছি মা-কালীর ছবি, প্যাঁচার মূর্তি। প্রয়াত সুধীর দাস বাউলের আশ্রমে (তমালতলা, কেন্দুলি) মা-কালীর মূর্তি (১৯৯৭)। কয়েক বছর আগে ফরিদপুরের বাউল পাগলা বাবলু গান শোনাতে শোনাতে 'জয় মা সরস্বতী' বলে উঠেছিলেন। পাগল নজরুল, সুফিয়া কাঙালিনী থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য গায়ক-গায়িকারা ব্যাপারটিকে উন্মুক্ত মনেই গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ক্ষিতিমোহন সেনের কথা, 'ইঁহারা গানে সাধনা করেন ... খানিক বৈষ্ণব খানিক সুফীভাবে ইঁহারা অনুপ্রাণিত।'

মনে রাখা দরকার বাউল গানের শিল্পী আর সাধক বাউল এক নয়। প্রকৃত বাউলের কণ্ঠে গান অবশ্যই থাকে কিন্তু গানকেও তিনি অতিক্রম করে যান। প্রকৃত বাউলের বিশ্বাস, 'নারী হল নরের রাজা, নারী ভজলে হরি মেলে, কথা খুব সোজা।/নারীর সঙ্গে যে করে মজা, সাজা পায় সে আখের'। —'ভবসাগরে নাও ভাসাইয়া' প্রকৃত বাউলেরা, সাধকেরা 'জন্মের মত পাড়ি দিয়াছে' বলে আক্ষেপ করার চেয়ে বরং শোনা যাক সনাতন দাস বাউলের কথা—

''আমি চোখে না দেখলেও, আমি গুরুস্থানীয় সাধকদের কাছে শুনেছি, সাধকরা ইচ্ছা-মৃত্যু বরণ করতে পারেন। সেইসব মহাপুরুষদের দু-একটা সমাধি এখনও পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলায় এরকম মহাপুরুষদের একটা দুটো সমাধি মন্দির এখনও আছে। আমার আশ্রমের চার কিলোমিটারের মধ্যে, পাত্রহাটি গ্রামে, ঐ গ্রামের সাধুবাবা ভক্তবৃন্দদের ডেকে হরিবাসলে সকলকে বলে দেহত্যাগ করলেন। এবং আমাদের খয়েরবুলি গ্রামের এক সাধক আশ্রমের এক সাধুবাবা এইভাবে দেহ রেখেছিলেন।

এঁর নাম অবধূত গোস্বামী। সংসার জীবনের নাম ছিল অতুল চক্রবর্তী। বয়স হয়েছিল ৯৫ থেকে ১০০-র ভিতরে।

একদিকে যেমন শাস্ত্রবিদ, অন্যদিকে শারীরিক সাধনায় উনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। হঠাৎ একদিন উনি আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি গেলাম। উনি আমাকে বললেন, ''সনাতন, আমি আর থাকব না; আমার চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তুই পারিস তো একবার এসে

আশ্রমটার দেখাশোনা করবি।'

তখন সময় ছিল কার্তিক মাসের শেষ। আমি তখন বললাম, দেখুন সাধুবাবা, আপনি একদিকে যেমন শাস্ত্রবিদ, অন্যদিকে আপনি যোগী। আপনি ভীষ্মের শরশয্যার কথা ভুলে গেছেন। তখন উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কোন মাস চলছে? আমি বললাম, কার্তিক মাস এবং দক্ষিণায়ন। দশই পৌষ থেকে উত্তরায়ণ শুরু। এরপর আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।' উনি আমাকে আর কিছু বললেন না, একটুকু হাসলেন। তারপর দেখা গেল, একুশে পৌষ ও শুক্লপক্ষ, উনি পরলোক গমন করলেন দিবাভাগে।'' (পৃ. ৯৩, বাউল প্রেমিক, ১৪০৩)

সমাধিগুলি দর্শন করতে করতে মনে পড়া স্বাভাবিক একথা যে বাউল গুরুমুখী সাধনা। প্রেম সাধনা ছাড়া বাউলের সিদ্ধিলাভ হয় না। এর জন্যই প্রয়োজন গুরুর মধ্যস্থতা। এঁদের দেহাত্মবাদ ভোগকেন্দ্রিক নয়। অন্তরতম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে গিয়ে তাঁরা শাস্ত্র বিরোধী এবং দেহ থেকে দেহাতীতে পৌঁছাতে যোগ সাধনার পথের পথিক। তাই একটি বিশেষ দর্শনের পরিচয় বাউল গানে পাই। সেই দর্শনটি হল 'জীয়ন্তে মরা হয়ে দেহ সাধনা করে অধরাকে ধরার প্রচেষ্টা।' কীভাবে অধরাকে ধরা উচিত? 'অধরাকে ধরবি যদি মন সাধু সঙ্গ কর'। সম্ভবত শেষ কথা হল, 'তত্ত্ব বিরহ অনলে পুড়িলে অধরাকে যায় জানা।' বাউল কথা বলেন— 'ইশারায়'। তাই প্রশ্ন ওঠে কোন্ তত্ত্ব বিরহ অনল? এই তত্ত্ব হল মানব তত্ত্ব। 'সে কি অন্য তত্ত্ব মানে? মানব তত্ত্ব যার সত্য হয় প্রাণে'! 'মানুষ' শব্দটিকে বাউলেরা গানের মধ্যে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। বাউল গানে শুনি, 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে'। তখন বুঝতে পারি সর্বসত্যের ধারক মানবদেহের মধ্যেই আছে 'সেই অধরা মানুষ বা মনের মানুষ।' বাউল সাধনার সঙ্গে যুক্ত যে-কোনো ব্যক্তি 'গুরুর ভজন বড় ল্যাঠা, গুরুভজন করবি যদি/ তবে ছাঁচার জল মরকচাতে ওঠা'। —এই গান শুনে বলে দেবেন এ হল দেবাদিদেব মহাদেবের উর্ধ্বরেতা সাধনার কথা, এই ব্যাপারটির সঙ্গে প্রাণায়াম যুক্ত। এতে তিন প্রকার শ্বাসবায়ু নাসিকায় প্রবাহিত হয় (ঈড়া—পিঙ্গলা—সুষুম্না)। গুরু ছাড়া এই শ্বাসবায়ু প্রাণালী দেখা সম্ভব নয়। সেই জন্যেই বাউল জানান, 'না জেনে মোজোনা পিরীতে/ জেনে শুনে করবে পিরীত/ শেষ ভালো দাঁড়ায় যাতে।' 'ছয় আঙ্গ ল ছেলের নয় আঙ্গুল মাথা'—বাউল গানের এই অংশটির অর্থ সনাতন দাস বাউল জানিয়েছেন, ''সকাম প্রেম আর নিষ্কাম প্রেম। যেখানে নিষ্কাম প্রেম সেথায় কিন্তু রতি দান নেই। সকাম প্রেম যেথায় সেথায় সৃষ্টি হয়, সন্তান-সন্ততি হয়। এই শৃঙ্গার কৌশল যে গুরুর কাছে জেনে সাধন করে তারা প্রতিদিন এর সঙ্গে থেকে, গুরুর ভজন করে। বলা চলে, এদের রতিদানও নেই আর বিশ্রামও নেই। এই শৃঙ্গার সাধনায় যে যার ব্রহ্মবস্তু ঠিক রেখে সাধন করে সেই ক্রমে একটি ফল প্রসব করে—সেইটি হ'ল মোক্ষ ফল। এই ফল হল' চারটি—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ছয় আঙ্গুল ছেলে, নয় আঙ্গুল মাথা। সাধুভাষায় বলছে, ষড়রিপু আর নবদ্বার এদের যোগাযোগে জন্ম হয় মদনের বা কামের।'' (বাউল প্রেমিক, ১৪০৩)

প্রসঙ্গত বলে রাখি, কোটাসুর আশ্রম যদিও পশ্চিম বা দক্ষিণ বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত নয় তবু

বাউলচর্চার ইতিহাসে কোটাসুরের নাম আসবেই। অন্যদিকে বাউল সনাতন দাস ঠাকুরের (সংক্ষেপে সনাতন বাউল) আশ্রমের ঠিকানা বাঁকুড়া (ডাকঘর, রাধামোহনপুর, গ্রাম-খয়েরবনী, ভায়া সোনামুখী) হলেও তাঁকেও বাউল সংক্রান্ত আলোচনায় বাদ দেওয়া যায় না। ঋত্বিক ঘটকের পুত্র ঋতবানের তৈরি করা সনাতন দাসের উপর তথ্যচিত্রটি না দেখলেও বাউলের অনেক কিছুই অজানা রয়ে যাবে।

বাউল গুরুদের সমাধির প্রত্যক্ষ করতে করতে মনে পড়ে লালনের গান :

"দেখো, জীবের এই শরীরে
ঈশ্বর অংশ বলি কারে
লালন বলে, চিনলে তারে
মরার ফল তাজায় (?জ্যান্তেই) ফলে।।"

আখড়ার বাউল যখন সমাধিতে প্রণাম করেন (সাধারণ মানুষেরাও প্রণাম করেন) তখন মনে আসে বাউলেরই গান, "কাদের প্রণাম করবি মন?/তোর অধিক গুরু, পথিক গুরু/গুরু অগনন।" কিংবদন্তীর লালনকে প্রণাম করতে আজও মানুষ বাংলাদেশের ছেউড়িয়ায় যান। অথচ মৃত্যুকালে লালনেরই ইচ্ছা অনুসারে তাঁর অন্তিম কাজ হয়নি। আখড়ার একটি ঘরে তাঁর সমাধি হয়েছিল। লালন তো লালনই কিন্তু তাঁর পথে পথিকেরা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেভাবে আচারভিত্তিক ধর্মকে অগ্রাহ্য করেছেন তাতে প্রণাম তারা পাবেনই। আমরা সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র 'মানুষ-মানুষ' করি। তাঁরা করেছিলেন 'তার অন্বেষণ'। বাউল শিখিয়েছেন আমাদের 'এই মানুষে মিলত মানুষ চিনিতাম যদি'। কিংবা 'আপন ঘরের খবর নে না।/অনায়াসে দেখতে পাবি/কোনখানে তার বিরামখানা।'

বাউলের সমাধিগুলি কি নিছক স্মারক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? মনে পড়ে যায় ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথা, 'বাউলের দল এল গেল চিনলে না।' কেউ চিনলে না, মনে হয় বড় বেশি অভিমানের কথা—কেউ কেউ তো তাঁদের নিশ্চয়ই চিনেছেন। নইলে সুধীর চক্রবর্তীর মতন মরমী গবেষক কেন আমাদের সতর্ক করে দেবেন, বাউলধারা আর সহজিয়া ধারা সমার্থক নয়। বাউলতত্ত্বের সঙ্গে সুফি-ইসলাম-ফিকির ও তত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে একাত্ম হয়ে আছে। সহজিয়া মতে মিশে আছে তন্ত্র—বৈষ্ণবধর্ম—নাথপন্থ; তবে সে প্রসঙ্গ আলাদা। বাউলধর্ম লোকধর্ম। আমাদের দেশে লোকধর্ম নিয়ে অনেক অপব্যাখ্যা হয়। লোকধর্মকে অনাচারবাদী, বিকৃতরুচি ও দেহসর্বস্ব বলে অপব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। সঠিকভাবে এদের পরস্পরকে অনুধাবন করলে দেখা যাবে শাস্ত্র, মন্দির-মসজিদ বাউলের ঘৃণার সামগ্রী। এঁদের আস্থা মুর্শিদ (মুর্শেদ?) ও মারফতিতে। অমিত গুপ্ত লিখেছেন, 'বাউলের প্রেম একদিন যেমন একতারার মত একটি বিন্দুর তির্যক সাধনা, অন্যদিকে বিভিন্ন রূপ, রাগ এবং অনুরাগের সম্মিলিত সমাজবোধ।' আমার মতো একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষিকা-গবেষিকাকে প্রণববাবু লেখার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে লেখাটির জন্য আমার অতৃপ্তি থেকেই গেল, লেখাটা অ্যাকাডেমিক তো হলই না—তবু বাংলা ভাষার স্বদেশচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপত্র 'লোক' বিশেষ

বার্ষিক সংখ্যায় লিখছি এটা ভেবে ভালো লাগছে—ভয়ও পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, 'স্থান দিও গো আমায় সবার নিচে'। লিখছি যখন তখন এক প্রতিবেশির ফ্ল্যাট থেকে গান ভেসে আসছে, 'আমি কোনো বাউল হবো, এটাই আমার অ্যাম্বিশন।' বাউলের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে কেই-বা পেরেছেন? রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, মুকুন্দদাস, কাঙাল হরিনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলালের গানেই শুধু নয়—অতি সাম্প্রতিক সুমন (''খাতা দেখে গান গেও না') চট্টোপাধ্যায়ের গানেও আছে বাউলের প্রভাব। বাউল বেঁচে থাকবে ঠিক কীভাবে জানি না, সমাধিতেই বাউলের শেষ কিনা জানি না; তবে দেশজ ঐতিহ্যের এই বড় মাপের সংস্কৃতিতে ঘুন যে ধরেছে—তা কয়েকবছর ঘুরেই টের পেয়েছি। বাউলের সমাধিগুলির পাশে দাঁড়ালে টের পাই, কেউ যেন বক্রেশ্বরের রাধাকুঞ্জ সেবাশ্রমের নিতাই বাবাজীর মতো বলছেন, 'ব্রহ্মচর্যকে না জেনে বাউলের তত্ত্বও নয়, বাউলও নয়।' এই লেখা শেষ করার পর আমার বাউল প্রেমিক স্বামী লিখে ফেললেন একটি বাউল গান (!?), সেটির ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই—লেখা শুরুর মুসাফির বাউলের কথার প্রতিধ্বনি সেটা, সুর প্রচলিত; কথা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। গানটি—''আমি বাউল হলাম গান শোনালাম/সাধক হতে আমার বয়েই গেছে—/সাজা বাউলের সম্মান এখন অনেক আছে।/ত্রিভঙ্গ খ্যাপার নাম কজন জানে?/ কিন্তু আমি আর্টিস্ট হলাম লোকে চেনে!/ নামের আগে কিংবা পরে বাউল আমিও লিখি,/বাড়ি-গাড়িই কোরে শেষে আমি হলাম মেমী!/যুগ বদলে গেছে শুনে রাখ সেকেল আউল/বিন্দুর তত্ত্ব বাতিল, বাউলের বাউল।/নকল বাউল (আমি), তুই বলতেই পারিস/ পাবলিক আমার গানেই নাচে, যতই গুলতানি মারিস/ বিদেশ ঘুরে এলাম, মানুষ চিনে নিলাম/ সবসে বড় রূপাইয়া-তত্ত্ব, জানিয়ে দিলাম/আমি বাউল হলাম আমি গান শোনালাম।''

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি শিল্পী বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৫১-১৯৩২) ১৯২৪ সালে আঁকা বাউলের ছবি (OIL PAINTING ON CANVAS; SIZE 69.5CM X 50CM) সিমা আর্ট গ্যালারির 'আর্ট অফ বেঙ্গল' প্রদর্শনীর প্রথম পর্বের শেষ দিনে (২১/৩/২০০১) ছবিটি দেখি। প্যাটেল নগরের শিল্পী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাউল গুরুদেব প্রতিকৃতিগুলিও বাউল চর্চার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাউলের সমাধিগুলি আখড়াবাসীদের নীতিবোধকে জাগিয়ে রাখে, সাধারণ মানুষের কাছেও এগুলি নিছক স্তম্ভ বা স্মারক নয়। গত ২/৬/৯৭ তারিখে বোলপুরের ওঁড়িপাড়ার 'রাধাগোবিন্দ আশ্রমে' অনেক কথা হয়েছিল বিশ্বনাথ দাসের গুরুমা বিনোদিনী গোস্বামীর সঙ্গে। অনেক আলোচনাব মধ্যেও তাঁরা জানাতে ভোলেননি, বিশ্বনাথের আদি আশ্রম সরিষায় অনেকগুলি বাউল-বৈষ্ণব পূর্বপুরুষদের সমাধি আছে।

'যেখানে' বাউল 'মনের লয় হয়, তাইতো সমাধি।' বলেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। 'বাংলার লোকজীবনে বাউল' গ্রন্থের লেখক অমিত গুপ্ত জানিয়েছেন, 'মন থেকে বাউলের শুরু হয় জিজ্ঞাসা ও জীবনচর্চা।' বাউলগানেও তো শুনি, 'মনপাখি তোর ভাবনা কিরে/গুরুর কাছে খবর নেনা/তোর দেহের ভিতর শিকল আছে/গুরুর কাছে সব জানা/' কিংবা 'আছে একমনের মানুষ পরম পুরুষ/ দেহের মাঝে বিরাজ করে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে লিয়াকত আলির কবিতা—

"সেঁওড়িয়া আশ্রমে এলে মনে হয়/ লালন ফকির হাতের চিমটে আকাশে তুলে/অমাবস্যাকে শাসন করছে।" 'প্রতিভার গুণে' যিনি হিন্দু মুসলমানের সমন্বয় সাধন করেছিলেন সেই পাথরচাপুড়ির দাতাবাবার মাজারে শুনেছি জাতধর্মের উর্ধ্বে মানুষ ভজনার কথা, 'এই মানুষকে ভালোবেসে সেই মানুষের কোরে নাও সাধন।'

ভারতবর্ষ ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন একতারা সম্বল করে পবিভ্রমণ করেছেন এমন একজন সাধক মানুষ (যিনি নিজেকে বাউল-বাসুদেব বলে পরিচয় দিতেন) 'একতারা' গ্রন্থে (বার্তা প্রিন্টার্স, ডি ৪৪/১৬৯ রামাপুরা, বারণসী, ১৯৮৩) লিখেছিলেন,

"আলো আঁধারের ইতিহাস কে অগ্রাহ্য করে
উদাসী বাউল বাধ্য বাধ্যকতার শেষ সীমাকেও
অস্বীকার করে চলে যায় দুরে আরও দূরে,
যেখানে নেই পৃথিবীর কোলাহল। সেই কোলাহল
যেখানে শেষ, সেখানেই সে জ্বেলে দিয়েছে আলোক
মালার প্রীতি উপহার। দিয়েছে সত্যের আনন্দঘন
নির্মল যুগল মূর্তি।"

'একতারা' গ্রন্থের (পৃ ৫৪) একটি গানে শুনি 'কে বা রাখে বাউল মনের খবর/চায় যে দিতে এই ভুবনে কবর।' আমার ছোটবেলা কেটেছে আপার আসামের মরিয়ানীতে— মরিয়ানী কালিবাড়িতে শোনা একটি পংক্তি কানে এখনও বাজে—'তারে দেখিতে না দেখিতে/বুঝিতে না বুঝিতে/ কোথায় হারিয়ে গেলো সমাধিতে।' কীর্তন এসে পড়ল বাউল প্রসঙ্গে—তা আসতে বাধা থাকার কথাও তো নয়—সাত বছর আগে কাঁটাপালন গোপাল আশ্রমের নির্মলকুমার দাস বৈষ্ণব বলেছিলেন; 'বাউল গান কাগজি লেবুর রস। কাগজীর ছাল হলো লীলাকীর্তন।'



কালিপুরের গোদুরে গোঁসাই আশ্রমের সমাধি।
ছবি : মৌসুমী চন্দ্র



দুবরাজপুরের চঞ্চলা গোঁসাই-এর আশ্রমের মন্দির।
ছবি : মৌসুমী চন্দ্র

❑ লেখক পরিচিতি : শিক্ষিকা, গবেষিকা



স্কেচ : তপন কর

নাথ সমাধি : বিহঙ্গ চারণা

শ্যামল বেরা

প্রাক্ কথন

'নাথ সমাধি' বলতে বোঝায় নাম যোগীর সমাধি। নাথ যোগীদের সাধন-ক্ষেত্রের অঙ্গন জুড়েই নাথ সমাধিগুলি বিদ্যমান। নাথ সমাধি এবং সাধনাক্ষেত্র মিলে মিশে একাকার হয়ে রয়েছে—তা বোঝা যায় মহানন্দ মঠ, গোরক্ষবাসী মঠ কিংবা সিদ্ধকুণ্ড মঠ পরিদর্শন করলে। উল্লেখ্য, শেষোক্ত মঠ দু'টি মহানন্দ মঠের অধীনে শাখা মঠ। শাখা মঠ দু'টির বর্তমান মোহন্ত হলেন বৃহস্পতি নাথ। মহানন্দ মঠের অবস্থান হুগলি জেলার মহানন্দ বা মহানাদ গ্রামে। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নাথ যোগীদের এই মঠ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব থেকে বড় এবং বহু প্রাচীন। এখানে নাথ যোগীদের সমাধি রয়েছে। কথিত আছে, যোগীদের একাধিক জীবন্ত সমাধি রয়েছে। দমদমের অনতিদূরে অর্জুনপুরে গোরক্ষবাসী মঠের ক্ষেত্রে একই চিত্র লক্ষ করা যায়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানা এলাকার সিদ্ধকুণ্ড মঠ-চত্বরেও অনেকগুলি সমাধি রয়েছে। সিদ্ধকুণ্ড মঠের অবস্থান কংসাবতীর উত্তর দিকে। অনুমান করা যায়, গোরক্ষবাসী মঠের কাছেপিঠে নিশ্চয়ই কোন নদী ছিল, যা বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। কোন-না-কোন নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে মঠগুলি এবং মঠ-চত্বরেই সারি সারি অবস্থান করছে সমাধিগুলি।

নাথ : নাথযোগী

নাথ সমাধি নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা একবার দেখে নিতে পারি 'নাথ' এবং 'নাথযোগী' বলতে কি বুঝবো। এপ্রসঙ্গে কল্যাণী মল্লিক-এর 'নাথপন্থ' বই-এ উল্লেখিত হয়েছে—*'প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে নাথ-সম্প্রদায় নামক যোগীদের ভারতব্যাপী খ্যাতি ছিল। এই যোগীগণের আসমুদ্রহিমাচল গতিবিধি থাকায় তাঁহাদের কীর্তি ও কাহিনী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অদ্যাপি বর্তমান। এই যোগী-সম্প্রদায়ের দীক্ষান্তে 'নাথ' পদবী যুক্ত করিবার রীতি ছিল।'* যাই হোক, বর্তমানে নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত যে কোন মানুষই 'নাথ' এবং নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি যোগ সাধনা করেন তিনি 'নাথ-যোগী'। নাথ সম্প্রদায় শৈব ধর্মের একটি শাখা। এদের গোত্র শিব। নাথদের অতীত গৌরব এবং ঐতিহ্য আজ ফিকে হয়ে গেছে। তা হলেও সারা বাংলা জুড়ে নাথ সম্প্রদায়ের মানুষজন রয়েছেন এবং নাথ যোগীরাও রয়েছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় 'নাথ সমাধি'।

সৎকার ক্রিয়া : দাহ ও সমাধি

নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃতদেহকে 'দাহ' এবং 'সমাধি' দু'টি রীতিই লক্ষ করা যায়। সমাধি দেওয়া হয় যোগী, তথা সন্ন্যাসীদের। এঁদের কেউ কেউ রয়েছেন মঠের মোহন্ত। যার যোগী নন, অর্থাৎ যারা গৃহী তাদের শব দাহ করা হয়। যোগীদের সমাধিস্থ করার নেপথ্য কারণ রয়েছে। 'মহানির্বাণ তন্ত্রে' রয়েছে—

সন্ন্যাসিনাং মৃতংকায়ং দাহয়েন কদাচন।
সং পূজ্য গন্ধপুষ্পাদৌনিখনোদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ॥

ভাবার্থ করলে হয়—সন্ন্যাসীদের মৃতদেহকে দাহ না করে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করে মাটিতে, বা জলে ডুবিয়ে দেবে।

আবার যোগীশাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে—

যোগিদেহং ভস্মংকৃত্বা সযোগী নরকংব্রজেৎ।

অর্থাৎ কোন যোগী যোগীর দেহকে ভস্মে পরিণত করলে তার নরক বাস হবে।

শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ মত সন্ন্যাসীদের তথা যোগীদের মৃতদেহ দাহ করা হয় না। সমাধি দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আরও একটি তত্ত্ব হল—যোগীদের দেহ যজ্ঞের অগ্নিতে যেহেতু একবার দাহ করা হয়, তাই দ্বিতীয়বার দাহ করা শাস্ত্রসম্মত নয়।

সমাধির প্রকার :

সমাধি দু'প্রকার। জল সমাধি এবং মৃত্তিকা সমাধি। জল সমাধি হল জলে ভাসিয়ে দেওয়া। বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলে জল সমাধির প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। যাইহোক, জল সমাধির ক্রিয়া পদ্ধতি এরকম—যোগীর নিথর দেহকে ভেলায় রেখে, উপযুক্ত ভার চাপিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া। যতদূর জানা যায়—এ প্রথা আজ নেই।

মৃত্তিকা সমাধি আবার দু'প্রকার। জীবন্ত সমাধি এবং মৃত্যুর পর সমাধি। যোগী বা সন্ন্যাসীর মৃত্যু হলে তাকে পদ্মাসনে বসিয়ে সমাধি দেওয়ার রীতিই অধিক প্রচলিত। 'জীবন্ত সমাধি' রয়েছে মহানন্দ মঠ এবং গোরক্ষনাথ মঠে। 'জীবন্ত সমাধি' হল যোগী এক সময় বুঝতে পারেন তাঁর মৃত্যু নিকট মুহূর্তে। তখন তিনি যে যোগাসনে বসেন, তা থেকে আর ওঠেন না। ঐ অবস্থায় তাঁর শরীর নিথর এবং নিষ্প্রাণ হতে থাকে। অবশেষ, তাঁর প্রাণ বায়ু চলে গেলে শিষ্যরা ঐ ধ্যানরত যোগাসনে বসা অবস্থায় শবদেহকে সমাধিস্থ করেন। এ ধরনের সমাধিকেই জীবন্ত সমাধি বলা হয়।

সমাধির বিবরণ :

ধ্যানরত অবস্থায় যোগীকে স্নান করিয়ে ভস্ম মাখানো হয়। তারপর নতুন কাপড় পরিয়ে চন্দন চর্চিত করা হয় এবং পৈতা পরানো হয়। এরপর রীতি অনুযায়ী কড়ি দিয়ে জমি কেনার পর চারকোনা গর্ত করা হয়। গর্তের গভীরতা প্রায় সাড়ে তিন হাত থেকে চার হাত করা হয। গর্তের ভেতরে একটি দেওয়াল কেটে আর একটি কুলুঙ্গীর মত কাটা হয়। এই কুলুঙ্গীতে শবদেহকে বসানো হয়। একটি অন্যমতও রয়েছে—কুলুঙ্গীতে ধূপ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয় আর গর্তের মধ্যে শবদেহকে বসানো হয়। মৃতের মুখ থাকে উত্তর দিকে। গর্তের মধ্যে লাউ খোলায় জল এবং কিছু ভোজ্যদ্রব্যও রাখা হয়। এছাড়া যোগীর ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র রেখে দেওয়া হয়। কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় একটি ঝুলি। শেষ পুত্র বা অগ্নি দেওয়া অধিকারী অন্য কেউ কুশ জ্বালিয়ে মুখে তিনবার অগ্নি সংযোগ করে। তারপর মাটি দেওয়া শুরু হয়। তবে মাটি দেওয়ার পূর্বে নুন বা চিনি প্রচুর পরিমানে ঢালা হয়। শ্মশানযাত্রীরা হরিবোল দিতে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁর 'যোগি জাতি' নামক প্রবন্ধে লিখছেন—"এটি যে মুসলমানের প্রথা নয়, এই বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রাখিবার জন্য ওষ্ঠাধারে অগ্নিস্পর্শ করান হয়। শবের গলদেশে তুলসীমালা পরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার দক্ষিণ হস্তে একটি জপমালা দেওয়া হয়।"

লোকাচার : অশৌচ পালন

হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার সমীক্ষা থেকে জানা যায় - স্বগোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ দিয়ে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করা হতো। বর্তমানে স্বগোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ অপ্রতুল হওয়ায় যে-কোন ব্রাহ্মণ দিয়ে কাজ সমাধা করা হয়। সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড হয় সামবেদের বিধি মতে। অশৌচ পালন হয় দশ দিন। শ্রদ্ধেয় পূর্ণেন্দুনাথ নাথ জানাচ্ছেন—নদীয়া জেলায় অশৌচ পালন হয় পনের দিন ধরে, কিন্তু পূর্বে ছিল এক মাস।

দাহ বা সমাধির পর শ্মশানযাত্রীরা চিড়া, কিংবা মিষ্টি খান। চারদিন পর গৃহের নির্জন-অঙ্গনে বেলগাছ বা বেলডাল পোঁতা হয় এবং কলাপাতা মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে অন্ন পিণ্ড দেওয়া হয়। বিবাহিত কন্যা এবং ভাগ্নেদের অশৌচ পালন এদিন পর্যন্ত। দশ দিন পর শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন হয় এবং তেরো দিনের দিন আমিষ খায়ানো হয়। এক্ষেত্রে, একটি কথা বলার আছে—তা হল, যোগীদের মধ্যে দুটি প্রকার রয়েছেন—সন্ন্যাসী-যোগী এবং গৃহস্থযোগী। উভয়েরই সমাধি দেওয়া হয়। তবে, গৃহস্থযোগী এবং নাথ জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই লোকাচারের খুটিনাটি দিকগুলি অধিক।

দাহ দৃশ্য : নাথ সাহিত্যে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'গোপীচন্দ্রের গান' গ্রন্থের 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' অংশের 'পিতৃ-শোক' অংশে (পৃষ্ঠা ৩৩৭) রাজা মানিকচন্দ্রের শবদেহ দাহ করার দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। অংশটির কিছুটা তুলে ধরা যাক—

কান্দেন গোপীচন্দ্র লোটায় ধরনী।
মহলের মধ্যে কান্দের তাহার চারি রানী।
অদুনা পদুনা আর চন্দনা কন্দনা।
শ্বশুরের কারণে কান্দে করিয়া করুণা।।
প্রজা আছি কান্দে আর পাত্র মনোহর।
কান্দিতে লাগিল রাজার খেতুয়া নকর।।
পাত্রমিত্র দেখিল যদি আইল মা মুনি।
কান্দিয়া আকুল সবে লোটায় ধরনী।।
ময়না বলে শুন পাত্র কান্দ অকারণ।
শীঘ্র করি লহ রাজাক করিতে দাহন।।
মানিকচন্দ্র রাজা যোল রাজ্যের ঈশ্বর।
রজত কাঞ্চন তার আছে হাজার ঘর।।

যে সকল ধন ময়নার রহিল পড়িয়া।
একখানি ডুলতে লইল বান্ধিয়া।।
বুকে বাঁশ দিয়া রাজার করিল বন্ধন।
গঙ্গার কূলে লইন রাজার করিতে দাহন।।
উত্তর শিওরে এক চুলি খুঁড়িল।
গঙ্গাজল দিয়া রাজার স্নান করাইল।।
আপনি ময়নামতী করিলেক স্নান।
পরণে থাকিল মায়ের ভিজা বস্তখান।।
উত্তর শিয়রে রাজার চুলীতে রাখিল।
রাজার বাম পাশে ময়না আসন করিল।।
চতুর্দিকে কাষ্ঠ খড়ি দিলে সাজাইয়া।
ময়নার আজ্ঞাতে অগ্নি দিল জ্বালাইয়া।।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি ব্রহ্মা হুতাশন।
নিজ নামে জপ ময়না করিয়া আসন।।
মাণিকচন্দ্র পুড়িয়া হইল ভস্মধূল।
ভিজা বস্ত্রে উঠিল ময়না লয়া ভিজা চুল।।
সপ্ত দিন রাত্র যদি হুতাশন জ্বলে।
কি করিতে পারে ময়নার নিজ নামের বলে।।
অগ্নিতে পুড়িয়া রাজা হইল সংহার।
মেহের কুলে চলিল ময়না পুত্র বুঝাইবার।।
গোপীচন্দ্র দেখিল যদি আইল জননী।
কান্দিতে লাগিল রাজার চারি রানী।।
অকারণ কান্দ বাছা শুন দিয়া মন।
মনুষ্যের উদরে আছে যম নিদারুণ।।
মনুষ্য হইয়া যেবা গুরু নাহি ভজে।
প্রহার করিয়া তাহাকে লইবে যমরাজে।।
সুকুর মামুদে ভণে অপূর্ব কাহিনী।।

রাজা মাণিকচন্দ্র গন্ধবেনে। পত্নী ময়নামতী। গোরক্ষনাথের বরে ময়নামতীর এক পুত্র হয়। ময়নামতী স্বামীর ঘর না করে গুরু গোরক্ষের সেবক হিসেবে সাধনা করে। এদিকে পুত্রের ভাগ্য গণনায় বলা হয় তার আয়ু আঠারো বছর। পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র। তার বয়স যখন বারো বছর তখন মাণিকচন্দ্র গোপনে তার বিবাহের আয়োজন করে। গোপীচন্দ্রের বিবাহের পরেই পিতা মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তখন ময়নামতী গুরুর কাছে অবস্থান করছে। এক নকরের কাছে সে সংবাদ পেয়ে ময়নামতী রাজ্যে ফিরে আসে এবং স্বামী শব সৎকার করে। এই সৎকার তথা

দাহ দৃশ্য হিন্দুরীতি অনুসারী। সে যাইহোক, এখানে যে কথা বলা হয়েছে, তা হল মানুষ হয়ে গুরু না ভজনা করলে যম তাকে অকালে নিয়ে যাবেন। এ কাহিনি সুকুর মামুদের রচনা। এ রচনা নাথ সাহিত্য হিসেবে পরিচিত।

গোরক্ষবাসী মঠের সমাধিক্ষেত্র :

গোরক্ষবাসী মঠের অবস্থান দমদম নাগের বাজারের পূর্বদিকে দু-কিমি. দূরে। মঠের সম্মুখে ডান দিকে পড়বে সারি সারি নাথ যোগীর সমাধি। কথিত আছে মূল মন্দিরের সামনে এক মোহন্তের জীবন্ত সমাধি আছে। ২৩ নভেম্বর ২০০৩ দমদম-গবেষক গৌরকুমার মৌলিকের সঙ্গে দুপুর দুপুর পৌঁছলাম মঠে। মূল ফটকের ভেতরে প্রবেশ করতে বোঝা গেল স্কুল-পৌরসভা-ক্লাব ইত্যাদি খাতে নাথদের বহু জায়গা হয়তো বেদখলে গেছে। যাই হোক, গোরক্ষনাথে সাধনা ক্ষেত্রে পৌঁছে মনে হল যেন আমরা পুরাতন ভারতবর্ষে পৌঁছি গেছি।

সারি সারি সমাধি। সমাধির উপরেই কয়েকটি ছেলে বল নিয়ে খেলছে। সমাধির উপরেই পৌরসভার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবার, সমাধি পাশে ছোট ছোট ঘরগুলিকে অফিস বানানো হয়েছে। যাই হোক, এখানের সমাধিগুলির উপর অংলকরণ বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে নজর কাড়ে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যোগীদের সমাধি দেওয়া হয়েছে। পবে কোন শিষ্য সেই সমাধির উপর অলংকৃত বেদী বা ক্ষুদ্র মঠ তৈরি করে দিয়েছেন। এসব সমাধি কার তা আমরা জানতে পারি না। কয়েকটি সমাধির অলংকৃত সৌধে নির্মাণ-কর্তার নাম লেখা রয়েছে। যেমন, একটি সমাধিতে হিন্দি হরফে লেখা রয়েছে—'ইহ সমাধি শ্যাম সাহা দ্বারা বানায়া গয়া'।

সমাধি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বর্তমান মোহন্ত বৃহস্পতি নাথ জানান পরবর্তী কোন সময় বলবেন। ফলে, গোরক্ষবাসীর মন্দির, ধূনি ঘর, শিব মন্দির দেখে সমাধিস্থানের আলোকচিত্র তুলে এবং কিছু স্কেচ করে সেদিনের মত কাজ শেখ করতে হল। স্কেচ করলেন গৌর দা। এক একটা সমাধির অলংকরণ এক এক রকম। এগুলির পৃথক পৃথক ছবি বা স্কেচ করা প্রয়োজন। ঠিক হল পরে আর একদিন যাওয়া হবে। ফেরার সময় চোখে পড়ল মঠ চত্বরেই অর্থাৎ মোহন্তের গদীঘর সংলগ্ন স্থানে বসেছে কথকতার আসর। সাত বছর ধরে ওখানে বিকালে ভাগবত পাঠের আসর বসে। সংগঠক হলেন প্রমোদ চক্রবর্তী। পাঠকের নাম সন্তু দাস, পাশ্চিমপাড়ায় থাকেন। যাই হোক, এখানেও সাধনা ও সমাধিক্ষেত্র মিলে মিশে একাকার হয়ে রয়েছে—তা দেখলেই বোঝা যায়।

সিদ্ধিকুণ্ড—মঠ—সমাধি এবং ইতিহাস :

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানা এলাকায় এই সমাধিস্থান অবস্থিত। দক্ষিণ পূর্ব রেল পথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে উত্তর দিকে পুরাতন বাজার পেরিয়ে কংসাবতীর তীর ধরে ১২/১৩ কিমি দূরে এর অবস্থান। গ্রামের নাম শ্যামসুন্দরপুর পাটনা। কথিত আছে গোরক্ষনাথের শিষ্য সিদ্ধিনাথ এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে যে পঞ্চরত্ন মন্দিরটি রয়েছে তা সিদ্ধিনাথের সমাধির উপর নির্মিত হয়েছে। মঠের বর্তমান মোহন্ত বৃহস্পতি নাথ। তার আগের তিনি মোহন্ত হলেন—নুয়ানাথ, বুধনাথ এবং রবিনাথ। প্রথম মোহন্ত ছিলেন সিদ্ধিনাথ। কথিত আছে,

কাশীজোড়ার রাজাদের ভূমি ও অর্থদানে এই মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরে প্রচুর টেরাকোটার কাজ ছিল। বছর ১৫ আগে মন্দির সংস্কার করার সময় সেসব টেরাকোটার কাজ খুলে ফেলে দেওয়া হয়। এখনো দু-একজনের সংগ্রহে কিছু টেরাকোটার ফলক রয়েছে। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বে সমাধির পাশাপাশি কেবল মাটির ঘর ছিল। গঙ্গাসাগরে যাওয়ার সময় এখানে সাধুরা বিশ্রাম নিতেন। কিছু দিন আগেও নেপাল ও উত্তর প্রদেশ থেকে সাধুরা আসতেন। এখন আসেন না। বর্তমান মোহন্ত বৃহস্পতি নাথ পৌষ সংক্রান্তিতে মেলার সময় আসেন। পৌষ সংক্রান্তি হল সিদ্ধনাথের তিরোধান দিবস। তাঁর স্মরণে এক মাস ধরে মেলা হয়। বর্তমানে মেলা পরিচালনা করেন গ্রামবাসী। সিদ্ধকুণ্ড মঠের বর্তমান জমি ৫২ বিঘা। স্থানীয় মানুষেরাই এসব জমি চাষাবাদ করেন।

সিদ্ধিকুণ্ড সমাধিস্থলের বিবরণ :

২৫ ডিসেম্বর ৯ পৌষ ১৪১০ কোলাঘাট থেকে পাঁশকুড়া হয়ে কংসাবতীর বাঁধ ধরে ট্রেকারে চলেছি শ্যামসুন্দরপুর পাটনার দিকে। উদ্দেশ্য সিদ্ধকুণ্ড মঠের সমাধি পরিদর্শন। মঠে পৌঁছলাম বেলা ১১টার দিকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে মঠ-মন্দির-সমাধি। একটু এদিক ওদিক তাকালেই প্রথমে চোখে পড়বে ভৈরবনাথ। স্থানীয় মানুষজন জানালেন ওটি ভৈরবনাথের সমাধি। টালির চালের ধূনিঘরের সম্মুখে উত্তরমুখো দৃশ্যমান ভৈরবনাথের সমাধি। ছোট টিলার (উচ্চতা ৪/৫ ফুট) মত অংশকে সিন্দুরে মাখানো। মধ্যে মধ্যে ৪/৫টি করোটি এবং চারটি ত্রিশূল প্রোথিত। তান্ত্রিক ক্রিয়া-পদ্ধতির প্রভাব বোঝা যায়। ব্রাহ্মণ মদনচন্দ্র পতি দূর থেকে দাঁড়িয়ে পূজা সারলেন। তার আগে ধূনিঘরে কাঠ দিয়ে পূজা-পদ্ধতি সেরেছেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘুরছি। পাশের ঘরেই পঞ্চমুণ্ডির আসন। যোগী ছাড়া কেউ এই আসনে বসতে পারেন না। আসন ছুঁতেও পারেন না। এখানেও দূর থেকে পূজা সেরে বেরিয়ে এলেন। একে একে সব সমাধিতে ফুল দিয়ে পূজা সারলেন। তবে সবার আগে পূজা হয় সিদ্ধনাথের। একটি সৌম দর্শন কৌপিন পরা বালকের তৈল চিত্র সিদ্ধনাথ হিসেবে পূজিত হতেন। সে চিত্রটি রয়েছে। তবে, পাথরের একটি কল্পিত সিদ্ধনাথের পূজা হয়। সিদ্ধকুণ্ডের সামনে নহবৎখানার নিচে কথা হচ্ছিল স্থানীয় মনোরঞ্জন বেরার সঙ্গে। এরপর এলেন সুকুমার বেরা। কথায় কথায় জানা গেল। ঐতিহ্যবাহী এতবড় নাথ-সমাধিক্ষেত্রে নাথ সম্প্রদায়ের কোন মানুষ নেই। বর্তমানে ট্রাস্টি দেখাশুনা করছে।

সিদ্ধিকুণ্ড সমাধি নিয়ে কিংবদন্তী :

১. সমাধি নিয়ে কিংবদন্তী তো রয়েছেই—তবে কতটা সত্য কতটা মিথ্যা জানি না—বললেন সুকুমার বেরা। টেপ রেকর্ডারের সুইচ অন করে বললাম যা জানেন বলুন। সুকুমার বেলা বলতে শুরু করলেন—এক নিঃসন্তান দম্পতি ছিল। তাদের অনেক বয়স হয়েছে। একদিন এক সাধু এখানে আসেন। সাধু সেই দম্পতির দুঃখের কথা শোনেন। তারপর বলেন—পুত্র হবে। তবে সাবধান—পুত্রকে যখন চাইবো তখনই দিয়ে দিতে হবে। তার আগে যদি পুত্র মারা যায়, তাহলে আমি যতক্ষণ না আসবো ততক্ষণ সৎকার করা যাবে না। তারপর সাধু তো

চলে গেল। কিছুদিন পর সেই দম্পতির একটি ছেলে হল। ছেলেটির বয়স যখন দশ-বারো তখন সে হঠাৎ মারা যায়। মৃত পুত্রকে নিয়ে সেই দম্পতি দিশেহারা। স্থানীয় মানুষ বলল, মড়া বাসী করা যাবে না, পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অগত্যা চিতা সাজিয়ে সেই ছেলের মৃতদেহ চিতায় তুলে আগুন দিয়ে দেওয়া হল। এমন সময় সেই সাধু এসে পৌঁছালেন। সব জেনে বললেন—আমার কথা অমান্য করা হলে কেন। যাই হোক, আমি তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। এই বলে সেই সাধু তিনবার সিদ্ধনাথ বলে ডাক দিলেন। জ্বলন্ত চিতা থেকে সিদ্ধনাথ উঠে এলে পার্শ্ববর্তী কুণ্ডে স্নান সেরে আসতে বললেন। ছেলে ফিরে এল। সাধু বললেন—তোমার ছেলে এইখানেই থাকবে। যখনই ডাকবে তখনই পাবে। তারপর সেই চিতার উপর মঠ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীকালে, পঞ্চরত্ন মঠ টেরাকোটার কাজ দিয়ে অলংকৃত করা হয়। এই মঠের তলায় রয়েছে সিদ্ধনাথের সমাধি।

২. মনোরঞ্জন বেরা বললেন—সিদ্ধনাথ এই কুণ্ডের জলের স্নান সেরে পুনর্জীবন পেয়েছিলেন। তাই যার যা মনস্কামনা তা এখানে এলে পূর্ণ হয়। বিশেষ করে যারা অপুত্রক তারা এখানে আসেন। নতুন কাপড় পরে ভোরবেলা এই পুকুরে স্নান করে সেই কাপড় এই ঘাটে ছেড়ে যান। এবং মানত করেন। অনেকেই ফল পেয়েছেন। এছাড়া, যারা তুক-তাক করেন, তারা ভোরবেলা জল-কেটে নিয়ে যান।

৩. বিশ্বনাথ সামন্ত বর্তমানে এই এস্টটের দেখাশুনা করেন। তিনি কিংবদন্তীটিকে একটু অন্যরকমভাবে বললেন। নিঃসন্তান দম্পতি সাধুর বরে তিনটি পুত্র লাভ করেন। এরা তিনজন হলেন—সিদ্ধনাথ, ভৈরবনাথ এবং বদ্যিনাথ। তিনজনের সমাধি এখানে রয়েছে। পুরো এলাকাটাই শ্মশান। তবে, বিশ্বনাথ সামন্তের কথা মত ভৈরবনাথের সমাধিটির - সত্যতা বিচারের অপেক্ষা রাখে।

রবিনাথের সমাধি : এক স্থানীয় অধিবাসীর অভিজ্ঞতা

সিদ্ধকুণ্ডের চত্বরে মাদুর পেতে বসা হয়েছে। পাশাপাশি মানুষজন এসেছেন। প্রশ্ন ছিল—আপনারা কেউ সরাসরি সমাধি করার দৃশ্য দেখেছেন। অনেকেই সদর্থক উত্তর দিলেন। কয়েক বছর আগেই রবিনাথের সমাধি অনেকেই দেখেছেন। রবিনাথ যখন মারা গেলেন, স্থানীয় মানুষ তখন গোরক্ষবাসী মঠে খবর দেন। তারপর নানাস্থান থেকে রবিনাথের শিষ্যরা আসেন।

রবিনাথের হাতের আঙুলে কয়েকটা মূল্যবান আংটি ছিল। সেগুলি খোলা হল না। হাতের ঘড়িটিও রাখা হল। তারপর কমণ্ডুল ও ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এরপর সিদ্ধকুণ্ডের সামনে একটি বড় চৌবাচ্চার মত গর্ত করে। ভেতরের একটি দেওয়ালে কুলুঙ্গী করা হল। সেই কুলুঙ্গীর মধ্যে যোগীর মত ধ্যানস্থ অবস্থার মত করে বসানো হল। তারপর প্রায় দেড় বস্তা চিনি দিয়ে চাপা দেওয়া হল। অবশেষে সবাই মাটি দিয়ে তা বুজিয়ে দিলেন। পরবর্তী সময়ে সমাধির উপর রবিনাথজির প্রস্তর মূর্তিটি বসানো হয়েছে। প্রতি বছর ১০ই বৈশাখ তাঁর তিরোধান দিবস পালন করা হয়। বিকালে বাচ্চাবাচ্চা ছেলের খাওয়ানো হয়, অর্থাৎ 'ভাণ্ডারা' করা হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ :

ভবনাথ সরকার তাঁর 'নামধর্ম : সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন— 'মঠের জমিগুলোর চাষ আবাদ করেন উক্ত মঠের শিষ্য স্থানীয় নাথযোগী সম্প্রদায়ের মানুষ।' কিন্তু বর্তমান প্রতিবেদকের সমীক্ষায় জানা গেছে এখানে নাথ জনগোষ্ঠীর কোন মানুষজন নেই। স্থানীয় গ্রামবাসীরাই শ্রদ্ধার সঙ্গে সব কিছু দেখাশোনা করেন। কেবল পৌষ মাসে বিভিন্ন এলাকার নাথ মানুষেরা আসেন। তবে, পীতপুরের অমর নাথ (৫৫) মাঝে মাঝে এখানে আসেন।

মঠ দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন বিশ্বনাথ সামন্ত। কথায় কথায় বললেন—বুধনাথের অনেক শিষ্য ছিল। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাও ছিল অনেক। আজ তাঁর তিরোধান দিবস। তাঁর স্মরণে আজ প্রসাদ বিলানো হবে। বেলা গড়িয়ে তখন ৩টা। কয়েকজন আটা-ময়দা মাখতে শুরু করেছেন। লুচি মিষ্টি দিয়ে প্রসাদ তৈরি হবে। বুধনাথের সমাধিতে সেই প্রসাদ দিয়ে পূজা হবে। তারপর ছোটছোট ছেলেদের খাওয়ানো হবে। প্রসাদ পাবেন সবাই।

নাথ সমাধির ক্ষেত্রে মনে হল—এই আমার ভারতবর্ষ। বুধনাথের তিরোধান দিবসে কোনো 'নাথ' নেই। বেরা, সামন্ত ইত্যাদি পদবিধারী মানুষজন তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর আয়োজনে কোনো কার্পণ্য করেন নি। আমাকেও থাকতে বললেন—প্রসাদ নিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু ফেরার সমস্যা—তাই উঠতে হল।

উঠার সময় আমার সহপাঠী তাপস পাড়ই আমন্ত্রণ জানালো—পৌষ সংক্রান্তিতে সিদ্ধিনাথের মেলায় যেন আসি। কিংবা চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের সময়। এই চত্বরেই রয়েছে শিবমন্দির— শিতলানন্দ শিব। এখনো জিভ ফোড়া, পিঠ ফোড়া হয়। চড়ক গাছে আজও মানুষ ঝুলে। দুর্গা পূজার সময় কুমারী পূজা হয়। সব কিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে রয়েছে—এই সাধনা ও সমাধিক্ষেত্র। তবে, সমাধিক্ষেত্র থাকলেও সাধনা নেই—নেই সেইসব ধারা স্নাত মানুষজন।

বিকেলের আলো ফুরোতেই উঠতে হল। ততক্ষণে বেশ কিছু বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেরা ভিড় করেছে। 'ভান্ডরা' হবে। অর্থাৎ বুধনাথের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রসাদ বিলানো হবে। তাই নিয়ে বাচ্চাদের আনন্দের ধূম পড়েছে। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কয়েকজন পড়শী যুবক। এসব দেখতে দেখতেই আমার ফেরার পালা। ট্রেকারে চেপে কিছু দূর গিয়েই গাড়ি থেমে গেল। হেল্পার দৌড়ে গিয়ে রাস্তার পাশে এক প্রণামীর বাক্সে পয়সা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন। কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম—কি ব্যাপার। অপর এক যাত্রী বললেন—দেখছেন না পীর সাহেবের মাজার। সত্যি সত্যি রাস্তা থেকে দেখা গেল এক বড়সড় মাজার—শুধু মুসলিমরাই নয়, হিন্দুরাও চলেছেন সেই মাজারে—দূর থেকে দেখে মনে হল বেশ ভিড় জমেছে। মাজার দেখতে আবার আসতে হবে—মনে বাসনা মনে রইল—কংসাবতীর তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমাদের গাড়ি তখন এগিয়ে চলেছে।

শেষের কথা :

নাথ যোগীদের বিরাট অংশ ছিল বাংলাদেশে। শ্রী রাজমোহন নাথ সম্পাদিত 'বঙ্গীয় নাথ-পন্থের প্রাচীন পুঁথি' গ্রন্থে ২৪টি পুঁথি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, আরো ৭টি পুঁথি এবং নাথ

সম্পর্কিত ৯৬টি গ্রন্থের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সারা বঙ্গ জুড়ে যে নাথ জনগোষ্ঠী বা নাথ যোগীদের বসবাস ছিল—তা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল। এক স্থানের রীতিনীতির সঙ্গে অন্যস্থানের কিছু কিছু পার্থক্য ছিল বা আছে। বহু বিবর্তন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নাথ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতি, তথা বৌদ্ধ, মুসলিম, তন্ত্র ইত্যাদির প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। এ নিয়ে পূর্ববর্তী গবেষক লেখকরা যা লিখেছেন, সেসব লেখার মধ্যে মৌল বৈশিষ্ট্যের মিল লক্ষ করা গেলেও স্থান বিশেষে লোকাচার বদলেছে। শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রেও দেখা যায় মূলত সামবেদের রীতি অনুযায়ী কাজ হলেও দু'এক জায়গায় যজুর্বেদের রীতির কথা উল্লেখিত হয়েছে। নাথ সমাধি নিয়ে আরও গভীর ও নিবিড় গবেষণার প্রয়োজন আছে। নিতান্ত কৌতূহল বশত দেশের ইতিহাসকে জানার বাসনায় 'নাথ-সমাধি' নিয়ে কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া হল। এ অতি কঠিন এবং জটিল বিষয়। সমাধিস্থানগুলিতে গেলে বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। সাধনাক্ষেত্রে এখন বহু দেব-দেবীর অবস্থান লক্ষ করা যাচ্ছে। আবার পূর্ব মেদিনীপুরের সিদ্ধিকুণ্ড মঠে এবং আশেপাশে কোন নাথের দেখা পাওয়া যায় না। যাই হোক, এটুকু বুঝেছি যে, 'নাথ-সমাধি' চর্চার মধ্যে ভারত-ইতিহাসের অনেক অজানিত তথ্য নিহিত রয়েছে। এ ইতিহাস রচনায় 'নাথ' এবং 'অ-নাথ' সকলের সমান প্রয়োজন রয়েছে।



নাথ সমাধি/শ্যামসুন্দরপুর-পাটনা। পূর্ব মেদিনীপুর। চিত্র : শ্যামল বেরা।

তথ্যসূত্র : গ্রন্থ ঋণ

১. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ) ১৯৯২—বিনয় ঘোষ
২. নাথ ধর্ম : সমাজ ও সংস্কৃতি, ১৯৯২—ভবনাথ সরকার
৩. বঙ্গীয় যোগিজাতি (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৯২—রাধাগোবিন্দ নাথ
৪. নাথপন্থ, ১৩৫৭—শ্রী কল্যাণী মল্লিক
৫. নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালি, ১৯৫০—শ্রী কল্যাণী মল্লিক
৬. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড, ১৯৯০)

প্রবন্ধ
১. ইতিহাস আর কিংবদন্তীর মহানাদে—সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বদেশ চর্চা লোক, বাংলার দীঘি-জলাশয়-২)
২. পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নাথ জনগোষ্ঠী—শ্যামল বেরা (লোকশ্রুতি, জুন ২০০৩)

তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন :

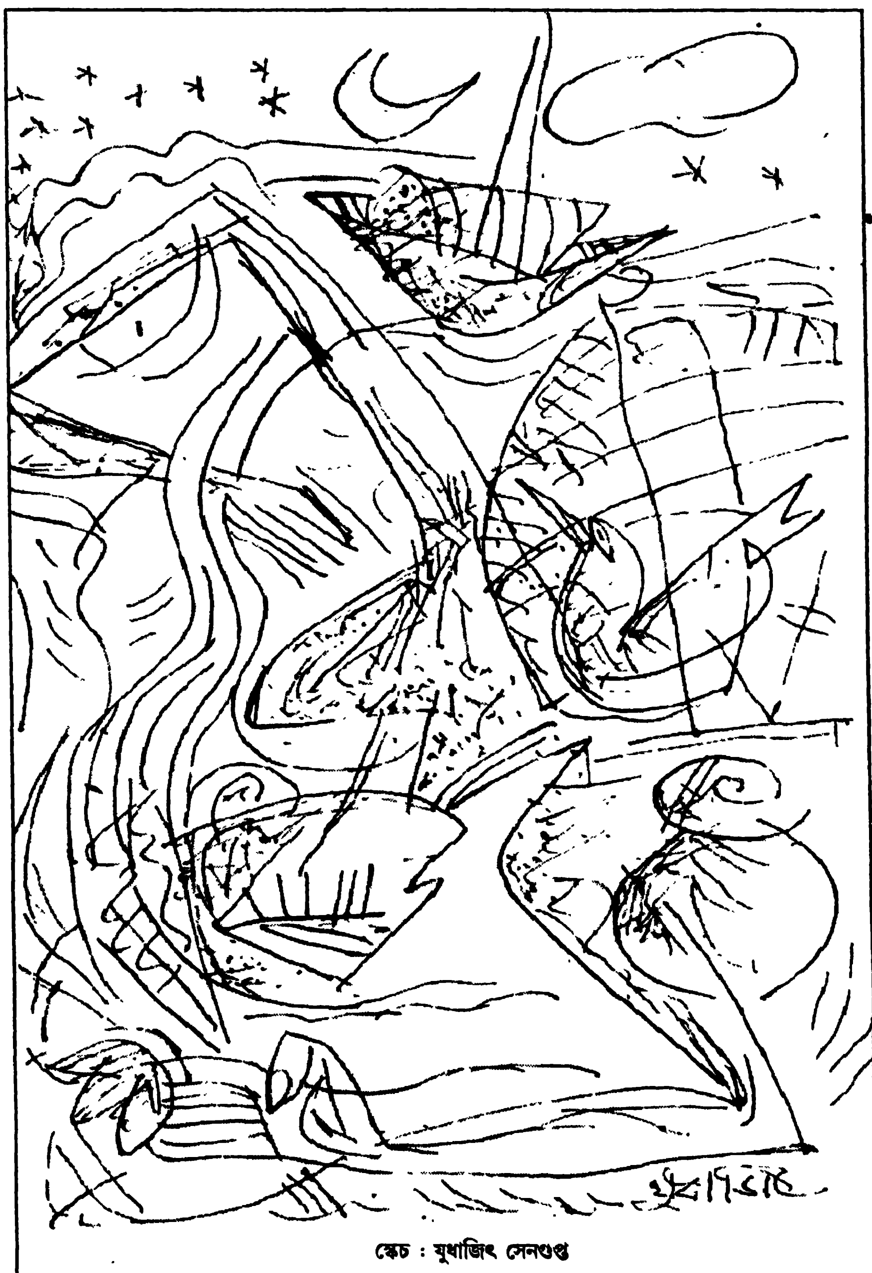
গৌরকুমার মৌলিক (দমদম), সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় (চুচুড়া), স্বদেশরঞ্জন বেরা (নন্দীগ্রাম), চন্দন ওঝা (ঘড়িনেৎ), তাপস পাড়ই, মনোরঞ্জন বেরা, সুকুমার বেরা, বিশ্বনাথ সামন্ত (শ্যামসুন্দরপুর, পাটনা), পূর্ণেন্দুনাথ নাথ (শান্তিপুর) এবং বিভিন্ন নাথপল্লীর মানুষজন। কৃতজ্ঞ সকলের কাছেই।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল প্রত্নতত্ত্ববিদ 'রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে লেখেন :

"প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মহানাদ পুণ্যতীর্থ। মহামুনি বশিষ্ঠ তারাপীঠ হইতে মহানাদে আসিয়া আশ্রম স্থাপন পূর্বক শেষ জীবনযাপন করিয়াছিলেন। ...

আদি তীর্থঙ্কর শ্রীশ্রী গোরক্ষনাথ স্বীয় ধর্মমত প্রচারকালে মহানাদে শুভাগমন করেন। তাঁহার সময় হইতে এই আশ্রমটি 'নাথমঠ' নামে অভিহিত হইয়াছে। জিয়ৎকুণ্ডের দক্ষিণতীরে যোগীগণের সমাধি রহিয়াছে, তন্মেধ্যে একটি 'জীবন্ত সমাধি' নামে বিদিত। কোন হঠযোগী জীবন্ত অবস্থায় সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এইপ্রকার নামকরণ হইয়াছে। রাজপুতনায় এই প্রকার জীবন্ত সমাধি পরিদৃষ্ট হয়। ('ভারতবর্ষ/শ্রাবণ ১৩৪৬)

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার, শিক্ষক, সম্পাদক : সমীক্ষাপত্র, লোকায়ত।



স্কেচ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

শ্মশান : সাহিত্য, লোকসাহিত্যের আঙিনায়

মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী

'শ্মশান' শব্দের অর্থ হল—শব শয়ন স্থান বা শবদাহ স্থান বা প্রেতভূমি ইংরাজিতে 'Burning Ghat'। শ্ম (= শব) + শান (= শয়নস্থান) মিলে শ্মশান শব্দের উৎপত্তি। Webster's third New International Dictionary তে Burning Ghat সম্পর্কে বলা হয়েছে—the space in a ghat where the Hindus cremate their dead. হিন্দুদের যে স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাই হল শ্মশান। স্কন্দপুরাণে রয়েছে—

"শশব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শনং শয়নমুচ্যতে।
শেরতেহত্র শবা ভুত্বা শ্মশানন্ত ততো ভবেৎ।।"

মুসলমানদের ক্ষেত্রে সমার্থক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াস্থল হল—গোরস্থান, কবরিস্তান বা কবরগা। ফার্সী 'গাহ' শব্দের অর্থ হল 'স্থান', প্রাদেশিক বাংলাতে কবরগা হয়ে দাঁড়িয়েছে কবরজা বা কবরডাঙ্গা। আরবি 'কব্‌র্‌' শব্দের অর্থ সমাধি বা গোর। কবর শব্দটি প্রাদেশিকতায় গ্রাম্য মুসলমানী বাংলায় 'কয়বর' হয়েছে। রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে 'কবরডাঙ্গা' শব্দটির উল্লেখ পাচ্ছি—"অপরাংশে মুসমানদিগের কবরডাঙ্গা ও কাজি সাহেব পীরের স্থান ছিল।" কবরের গঠনগত বিবরণ বাংলা ধাঁধাতে পাওয়া যায়—

১. যোল হাইত্যা বাঁশের ঘর
না, কুলাইল জনম ভর,
অ, খোদা তুই বড় কারিগর। (চট্টগ্রাম)

২. ঘর আছে দুয়ার নাই
মানুষ আছে রাও নাই। (নেত্রকোণা)

৩. চাইরো পাকে নোহার ব্যাড়া
কোন্ জাগা দিয়া যামো কামারপাড়া। (রংপুর)

খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে সমার্থক ইংরাজি শব্দটি হল 'Cemetery–the term has been appropriately applied in modiern times to the burial grounds, generally extramural that have been substituted for over crowed churchyard of popular parishes. গ্রীক 'Tumbos' কথাটি থেকে এসেছে 'Tomb' যার অর্থ—a burial place consisting of a stone structure above ground on a large under ground vault

কিংবা a monument to a dead person, built over their burial place.

নশ্বরদেহ শ্মশানে দাহ হয়। অন্তের এই অনিবার্য অন্তঃসার শূন্যতা। শ্মশান শব্দটিকে দিয়েছে বিভিন্ন ব্যঞ্জনাধর্মী অর্থ। সবক্ষেত্রেই শ্মশানের অর্থ মূল্যহীনতা অথবা অন্তঃসারশূন্যতা। শ্মশান শব্দটি যে বেদনাকে বয়ে আনে তা কখনো কখনো হয়ে দাঁড়ায় চিত্ত অশুদ্ধির ব্যঞ্জনা দ্যোতক। সোনালি ফসল আমাদের যেমন আনন্দ দেয়, ভূমিকে তেমনি গর্বিত করে তোলে। ভূমির গর্ব তাই তার ফসল। শ্মশানভূমি কিন্তু এই সুখে বঞ্চিত। নিত্যই এ জমিতে শ্মশানযাত্রীদের আনাগোনা হলেও চিরকালই সে উৎপাদনহীন, কখনো কখনো এই অর্থটিও শ্মশান শব্দের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। সেখানে নিষ্ফলা মানবজমিন লোক-কবির কল্পনার শ্মশানের সঙ্গেই তুলনীয়—

১. মরিরে যার কণ্ঠে হরিনাম নাই দেহ শ্মশান সমান।

২. ওনা গুরুর মন্ত্র হইলে মাইগে
দেহ হবে তোর ফুল বাগান
তোর দেহটা ওগে শ্মশানের সমান।

৩. হায়রে মরি দারুণ বিধি কথা শুন নয়নসরি
গুরুর মন্ত্র না হইলে মাইগে
দেহটাতো শ্মশানের সমান। (বর্মোশোরী, শান্তোরী; উত্তরবঙ্গের লোকনা)

অমোঘ নিয়তির মতো শ্মশানযাত্রা সকল মানুষের জীবনে সত্য। শ্মশান মায়াহীন, উদাসীন, নিষ্ঠুর রুদ্রের মত। তাই অনেক সময় কবির কল্পনায় শ্মশানের সমর্থক শব্দ হয় মায়াহীনতা—"শ্মশান ভালোবাসিস বলে মা শ্মশান করেছি হৃদি।" শ্বাসপ্রশ্বাস যেদিন বন্ধ হবে সেদিন শ্মশানই একমাত্র ঠাঁই। প্রত্যেক প্রাণীরই জীবনের চরম সত্য হল অন্তিমে শ্মশানযাত্রী হওয়া। শ্মশান যাত্রী কে? একটি গানে আছে—"পবন পাখি উড়ে গেলে শ্মশান হবে বাসা।"

শ্মশানযাত্রী আবার শ্মশানবাসী থেকে অনেকটাই পৃথক। অভিধানিক অর্থে যে শ্মশানে বসতি করে, সেই শ্মশানবাসী পৌরাণিক দেবতা শিবশম্ভু স্বয়ং শ্মশানবাসী। সেখানে শ্মশান পেয়েছে এক উন্নতমাত্রা। বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—"প্রেতের সনে/শ্মশানে থাকে/মাথায় ধরে/নারী। সবাই বলে/পাগল পাগল/কত সৈতে পারি।" 'শবের শোকে শিব কাঁদে' প্রবাদ বাক্যটির মধ্যে শিবের শ্মশানপ্রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গলে পাচ্ছি—

"শ্মশানে বেড়ায় ছাই মাখে গায়
গলে মুন্ড অস্থিমালা
বলদ বাহক সঙ্গে ভূতগণ
পরে ব্যাঘ্রহস্তিছালা।"

অন্নদামঙ্গলেরই অন্যত্র (শবনামাবলী) রয়েছে :

"জয় পিনাকপণ্ডিত পিশাচমণ্ডিত
বিভূতিভূষিত কলেবর।"

আর শ্মশানবাসিনী হচ্ছেন শ্যামা মা—"শ্মশানবাসিনী, শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।"

সুতরাং শিব ও শ্যামা আছেন বলেই বোধহয় শ্মশান তার আপন মহিমায় উদ্ভাসিত। "...তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান।" শ্মশান দেবতা বিশ্বাসে পঞ্চানন্দ পূজিত হন—কলকাতা নিমতলা ও মেদিনীপুর জেলার ক্ষেপুত(দাসপুর), নির্ভরপুর প্রভৃতি স্থানে। কোনো কোনো শ্মশানে বনদুর্গারও অধিষ্ঠান। "... বড়ই নিরালা স্থান, শ্যাওড়া গাছ এবং বেতঝোপ বোঝাই, সামনেই অপর পারে শ্মশান। জায়গাটা বেশ নিচু এবং নিতান্তই ভীতিপ্রদ, দিনমানে কেউ সেখানে বিশেষ যায় না, মানত ইত্যাদি থাকলে বা বিশেষ প্রয়োজনে, দলবদ্ধ অবস্থায় কখনো কখনো মহাজাগ্রতা দুর্গাদেবীর পূজা দিতে সামান্য লোক সমাগম হয়। বনদুর্গার স্থানীয় নাম বুড়াঠাকুরাণী।" (অ্যালবাম—নীরেন রায়)। মনে এমনও প্রশ্ন জাগে শারদীয়া দুর্গাপূজায় শ্মশানের মাটি ব্যবহারের প্রথা এই বনদুর্গার ধারণাজাত নয় তো?

শ্মশানবাসী আর কারা? অন্নদামঙ্গলের শিববন্দনাতে পাই—

"ডাকিনী যোগিনীগণ প্রেত ভূত অগণন
সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়।"

অর্থাৎ অতিলৌকিক আত্মার উপস্থিতি শ্মশানকে করে তোলে ভয়াবহ। আর ওই ভয়াবহস্থানে ভয়ঙ্কর পিশাচ সাধনায় নিয়ত থাকেন তন্ত্রসাধক যারা ঘোর অমাবস্যার নিগূঢ় অন্ধকারে শবদেহের উপর বসে মুখরিত করেন মহাশ্মশান, যাকে বলা হয় শ্মশান জাগান। 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে যে কাপালিকের বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা এইরকম—"জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। ...সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষ মালাটিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে।" 'পুত্রেষ্টি' গল্পেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্মশান সন্ন্যাসীর অবতারণা করেছেন যিনি মড়া খান, থাকেন শ্মশানের টিনের চালায় এবং যিনি ভীমকায় উগ্রদর্শন "শ্মশানের বুকে নামিয়া দেখিলেন, জনশূন্য শ্মশানে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে সন্ন্যাসী গঙ্গার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন।"

শ্মশান শব্দটির মধ্যে নিরন্তর একটা নেই নেই ভাব। যেমন সদর্থক বাগ্‌ধারা 'শ্মশানের শান্তি'র মধ্যে দিয়ে মৃত্যুজনিত না থাকার ভাব প্রকাশিত হয়। শ্মশান মানে যেন এটা মরুপ্রায় ঊষর ভূমি, unproductive land। শ্মশানে শবদাহকালে জীবনের নশ্বরত্ব ও সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করে যে বৈরাগ্যের উদয় হয় তাকে বলে 'শ্মশান-বৈরাগ্য'। সে এক বিচিত্র ভাবানুভূতি। "কেবা কার পর, কে কার আপন,/কাল শয্যা' পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে,/দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন। (দ্র. দেবযান/বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।) দেহ থাকে পার্থিব পরিমণ্ডলে আর মন রয় অপার্থিব জগতে। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় পাচ্ছি—"গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউয়ের ঈষৎ দোলায় কারু কারু শ্মশান বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে।" শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকারান্তরে শ্মশান বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন—"পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক,

এই সংসার নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়া হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে-দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস ও বিষয়রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। আর পানকৌটির মতো, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত ...।"

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—'শ্মশানঘাটের শুকনো বাঁশ'। যখন কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত ছিল তখন অতিবৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে বিয়ে দেওয়া হত। এইরকম বিবাহে পাত্রকে বলা হত 'শ্মশানঘাটের শুকনো বাঁশ'। 'শ্মশান পর্যন্ত চিকিৎসা'—প্রবাদ বাক্যটির মধ্যে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে অন্তিম চিকিৎসা দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলার লোকৌষধের উপকারিতা এমন যে গঙ্গাযাত্রার (প্রায় শ্মশানযাত্রা) থেকেও ফিরে আসে রোগী—"নিম নিসিন্দা বেলের পাত, আমঘোড়স আর কল্পনাথ।/বজ্রদণ্ড ইসবগুল, এ থাকতে কেন রোগী যায় গঙ্গার কূল।"

বাংলা প্রবাদে নানাভাবে শ্মশানের প্রসঙ্গ এসেছে—

১. 'হলে রসান/না হলে শ্মশান'। পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে এই প্রবাদে শ্মশান শব্দটির মাধ্যমে ব্যক্তি চরিত্রের চরমপন্থা স্বাভাবটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

২. 'দই চিড়া খাবি ন শ্মশানবাড়ি যাবি।' অর্থাৎ সংসারে প্রবেশ বা সংসার বিমুখ হওয়ার মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের এই প্রবাদটিতে।

৩. 'অচেনা পথ আর জঙ্গল সমান।
অজানা জল আর জানা শ্মশান।' এই প্রবাদের মধ্যে জীবনের ভীতিপ্রদ দিকগুলি উল্লেখ করে বলা হয়েছে শ্মশান পরিচিত হলেও তা ভয়ঙ্কর।

শব অনুগমনকারী এবং শবদেহে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে বলা হয় শ্মশানবন্ধু। চাণক্যশ্লোকে আছে—"শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" অর্থাৎ প্রকৃতবন্ধু তিনিই যিনি শ্মশানেও বিচ্ছিন্ন হন না। সাহিত্যে এইরকম বন্ধুর উদাহরণ প্রচুর। এমন একজন "গোপাল খুড়ো তাঁর নাম, জীবনের ব্রত ছিল মড়া-পোড়ানো।" (লালু- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

শ্মশানকে কেন্দ্র করে অনেক বিশ্বাস ও সংস্কার জড়িয়ে আছে। একটি লোকবিশ্বাস এই যে মৃত ব্যক্তির শবদেহের পাশে মোচা রাখলে দোষ কাটে কেননা শনি ও মঙ্গলবার মৃত্যু হলে মানুষ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। নবজাতকের কানে পুঁজ হলে শ্মশানের পরিত্যক্ত হাঁড়িকুড়িতে বৃষ্টির জমা জলে রবিবার শিশুকে স্নান করিয়ে, পিছনে না তাকিয়ে চলে আসতে হয়। 'স্থলপদ্ম' গল্পে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্মশান সম্পর্কিত একটি সংস্কারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন—

একজন প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিল, "লসো, তু যেন যাস না বাবা, তোর আবার মাদুলি আছে, তোকে শ্মশানে যেতে নাই।"

মুখরা বেলে হাসিয়া কহিল, "তা তুও একটা মাদুলি নিলি না কেনে লসোর মা, যম এলে বলতিস—বাবা আমাকে শ্মশানে যেতে নাই, আমার মাদুলি আছে!"

শ্মশানযাত্রার বিবিধচিত্র সাহিত্যে মেলে। অভাগীর অন্তিমে তার ছেলের মাতৃ শবদাহের চিত্র আর রক্ষোকূলগর্ব মেঘনাদের অন্তিম সংস্কারের চিত্রের কথা পাঠক স্মরণ করলেই বুঝতে পারবেন। তবুও পাঠকের সুবিধার্থে দৃষ্টান্ত দিলাম। সেখানে "নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তার পরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালির মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।" (অভাগীর স্বর্গ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

সেখানে "উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে/যথাবিধি চিতা রক্ষঃ, বহিল বাহকে/সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।/মন্দাকিনী-পুতজলে ধুইয়া যতনে/শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল/দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িয়া গম্ভীরে/মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ/মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী/খুলি রত্ন-আভরণ বিতারিলা সবে।" (মেঘনাদবধ কাব্য— মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

বাংলায় শ্মশান বলতে যে চিত্র আমাদের মনের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ভেসে ওঠে তা এইরকম—

- লোকালয় থেকে দূরবর্তী জনহীন বিস্তীর্ণ অঞ্চল,
- একটা বহমান কিংবা মজানদীর আঁকাবাঁকা কূল,
- বট, অশ্বত্থ, নিম, তাল, শ্যাওড়ার জঙ্গল, মাঝে মাঝে আসশ্যাওড়া, ঘেঁটু, বুনো ওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ,
- স্তূপীকৃত মড়া পোড়াবার কাঠ, ডোম, পরিবারের সা...ক আস্তানা
- ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছড়ানো আধপোড়া কাঠ, ভাঙ্গা কলসি, ছেঁড়া মাদুর, বালিশ
- মৃতদেহ সজ্জিত জ্বলন্ত অঙ্গার স্তূপের ধ্বকধ্বক জ্বলন, তার রাশি রাশি ধূম পাক আর দগ্ধ নরদেহের গন্ধ
- বাঁশের লাঠি হাতে নিকষকালো বর্ণের ঝাঁকড়া চুলের শ্মশান-প্রহরী চণ্ডাল
- চতুর শেয়ালের লুব্ধদৃষ্টি, শকুন পরিবারের নিত্য যাতায়াত
- কখনো কখনো পঞ্চমুন্ডির আসনে উপবিষ্ট ভয়াল কাপালিক।

'ভুশণ্ডীর মাঠ' গল্পে রাজশেখর বসু যে বিস্তৃত জনমানব শূন্য অঞ্চলের বিবরণ দিয়েছেন তা শ্মশানের বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশ করে। তার উপর অতিমানবীয় চরিত্রের উপস্থাপনা ভুশণ্ডীর মাঠকে করে তুলেছে আরও বেশি শ্মশানমুখী। এই গল্পে বিবৃত জৈব বৈচিত্র্যের চিত্রটিও শ্মশান পরিবেশের সমদৃশ্য—

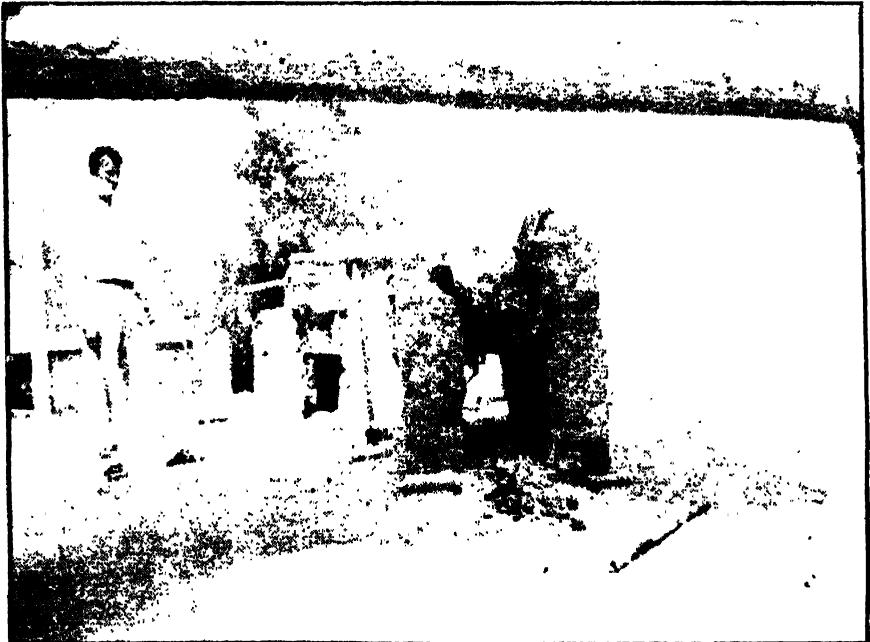
"ঘেঁটু ফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে, ... বেলগাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে, দূরে আকন্দ ঝোপে গোটাকতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলোর আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়শার কঙ্কালের মত ঝিক্মিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগল।" এই গল্পের হলুদ রঙের প্রজাপতি, কাল গুবরে পোকা, বাবলা গাছের দাঁড়কাক, ড্যাবডেবে চোখ

মেলে গুটি গুটি পা ফেলে চলা সদ্য ঘুম থেকে জাগ্রত কট্‌কটে ব্যাং, গলায় সুড়সুড়ি দেওয়ার কাজে মগ্ন কাক এবং মুদিত নয়নে গদ্‌গদ স্বরে ডাক দেওয়া কাকিনী, সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধার কাজে নিমগ্ন ঝিঁঝি পোকা সমস্ত মিলে তৈরি হয়েছে অতীন্দ্রিয় পরিবেশ।

'ভূত পতরীর দেশ' ছড়ায় অবনীন্দ্রনাথ যে ভূতের জমির অবতারণা করেছেন তা বর্ণনা ধর্মীতায় অনেকটাই শ্মশানের ভূতুড়ে পরিবেশকে নির্দেশ করে—

"আলো আধার/শেওড়া গাছ/কালোয় সাদায়/বেরাল নাচ
মরা নদী/বালির ঘাট্/মনসা তলায়/মাছের হাট্।
ভূতের জমি/ভূতের জমি/ভূত্ পেরেতের/ নাইকো কমি।
ঢুলছে কতক/গাছ তলাতে/দুলছে কতক/তাল পাতাতে
দিন দুপুরে/বাদুড় ঘুমোয়/রাত দুপুরে/হুতুম থুমোয়।
ভোঁদড় ভাম/ বেঙ বেঙাচি/টিকটিকি আর/কানামাটি
গঙ্গা ফড়িং/ জোনাক পোকা/ আবশোলা/ ন্যাংটা খোকা
ছুঁচো ইঁদুর/খ্যাক্ শেয়াল/ শুকনো পাতা/গাছের ডাল।

সব ভূতুড়ে/সব ভূতুড়ে/ঘূর্ণি-হাওয়ায়/চলছে ঘুরে।"



উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাট। ছবি : আমিনুল হক।

কঠিন হলেও প্রত্যেক মানুষের জীবনে শ্মশান শব্দটি কোন না কোন সময়ে চরম সত্য হয়ে ওঠে। এই প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতা বাংলা সাহিত্যে এসেছে বারে বারে। উনবিংশ থেকে কল্লোলগোষ্ঠী এবং তারও পরে শ্মশানের বর্ণনা বহু জনপ্রিয় লেখকই নিজ নিজ স্বাতন্ত্রে দিয়েছেন। সে সময় বর্ণনা বিশদভাবে তুলে ধরা আকাশে নক্ষত্র গণনার সমতুল্য। তবুও উল্লেখযোগ্য কিছু বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

রবীন্দ্রনাথ আশার লেখক। তিনি কোনদিনই মরণকে জীবন থেকে আলাদা করে দেখেননি। তাই শ্মশান তথা মরার পরে পরকালে যাবার সিংহদুয়ার তাঁর কাছে পেয়েছে এক অনন্য মাত্রা—

"রানীঘাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহুদূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটির এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ বৃহৎ মাঠে আর কোথাও কিছু নাই। পূর্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে। সেই শুষ্ক জলাশয়ের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্মিত হইয়া এখনকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধি স্বরূপ জ্ঞান করে।" (জীবিত ও মৃত — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শরৎচন্দ্র কল্পনার চেয়ে গুরুত্ব দেন বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতাকে তাই তার আত্ম জৈবনিক উপন্যাসে তাঁর নিজের দেখা শ্মশানের সাবলীল চিত্র পাই—

"... সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ বক্ররেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া কোন সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক একটা মানুষ ... মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ, সংখ্যাতীত গ্রহতারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া অর্থাৎ অনুভব করিবার জো নাই ... এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমুল গাছগুলো দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছু দূরে আসিতেই তাহাদের কালো কালো ডালপালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল। ... শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। ... সে যে মানব শিশু নয়, শকুন-শিশু-অন্ধকারে যাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে ... কালো কালো ঘুড়ির মত শিমূলের ডালে ডালে অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে, এবং তাহাদেরই কোন একটা দুষ্টু ছেলে অমন করিয়া আর্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে। ... সমস্ত স্থানটাই প্রায় নরঃকঙ্কালে খচিত হইয়া আছে। ... হঠাৎ একটা দমকা বাতাস কতকগুলো ধূলা-বালি উড়াইয়া গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল; এবং সেটা শেষ না হইতেই, আর একটা এবং আর একটা এবং আর একটা বহিয়া গেল... ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। ... দেখিতে দেখিতে আশেপাশে, সুমুখে, পিছনে দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোক যেন আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া, অবিশ্রাম হা-হুতাশ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে... সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে অন্ধকার। স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।" (শ্রীকান্ত

- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরেও শ্মশান বর্ণনা এসেছে জীবনের সঙ্গে। শরৎচন্দ্র শ্মশানকে মানুষের সঙ্গে আন্তরিকভাবে জড়িয়ে দিয়েছেন। ছোট গল্পের প্রাণকে শ্মশান বর্ণনায় কখনই শিথিল করে নি। দৃষ্টান্ত পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন। তবুও বলি— "গঙ্গার তীরে শ্মশান অনেক দূর, প্রায় ক্রোশ-তিনেক। সেখানে পৌঁছে যখন আমরা শব নামালাম, তখন রাত দুটো।... শুক্লা দ্বাদশীর পরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় বালুময় বহুদূর বিস্তৃত শ্মশান অত্যন্ত জনহীন। গঙ্গার ওপার থেকে কনকনে উত্তরে হাওয়ায় জলে ঢেউ উঠেছে... শহর থেকে গরুর গাড়িতে পোড়াবার কাঠ আসে, ... আধ-ক্রোশ দূরে পথের ধারে ডোমদের বাড়ি, ... কাছে আশ্রয় কোথাও নেই—একটা বড় গাছ পর্যন্ত না।" (লালু - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বিভূতিভূষণ যদিও রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের লেখক তবুও তিনি কল্লোর গোষ্ঠীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ। বিশ্বযুদ্ধের যে অবক্ষয়, অবসাদ কল্লোলের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিল তা কখনই বিভূতিভূষণের মধ্যে আমরা পাই না। মৃত্যু তার কাছে জীবনের একটি স্বাভাবিক ঘটনারূপে এসেছে। মৃত্যুর তিনি বাড়াবাড়ি বর্ণনা কখনও করেননি। তাই শ্মশান বিভূতিভূষণের রচনায় প্রাধান্য পায়নি। শুধু স্থান বর্ণনার মতই শ্মশান বা সমাধিক্ষেত্রের বর্ণনাও সাবলীলভাবে করেছেন—

"তারপর আরও খানিকটা উঠিয়া এক জায়গায় প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া বড় বড় সরু মোটা ঝুরি নামাইয়া, পাহাড়ের মাথায় অনেকখানি ব্যাপিয়া এক বিশাল বটগাছ।

রাজা দোবরু পান্না বলিলেন—জুতো খুলে চলুন মেহেরবানি করে। বটগাছতলায় যেন চারিধারে বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের আকারের পাথর ছড়ানো।

রাজা বলিলেন—ইহাই তাঁহার বংশের সমাধিস্থান। এক-একটা পাথরের তলায় এক-একটা রাজবংশীয় লোকের সমাধি। বিশাল বটতলার সমস্ত স্থান জুড়িয়া সেই রকম বড় বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো - কোনো কোনো সমাধি খুবই প্রাচীন, দু'দিক হইতে ঝুরি নামিয়া যেন সেগুলিকে সাঁড়াশির মত আটকাইয়া ধরিয়াছে, সে সব ঝুরি আবার গাছের গুঁড়ির মত মোটা হইয়া গিয়াছে—কোনো কোনো শিলাখণ্ড ঝুরির তলায় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সেগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই বটগাছ আগে এখানে ছিল না। অন্য অন্য গাছের বন ছিল। একটি ছোট বট চারা ক্রমে বেড়ে অন্য অন্য গাছ মেরে ফেলে দিয়েছে। এই বট গাছটাই এত প্রাচীন যে, এর আসল গুঁড়ি নেই। ঝুরি নেমে যে গুঁড়ি হয়েছে, তারাই এখন রয়েছে। গুঁড়ি কেটে উপড়ে ফেললে দেখবেন ওর তলায় কত পাথর চাপা পড়ে আছে। এইবার বুঝুন কত প্রাচীন সমাধিস্থান এটা।" (আরণ্যক : বিভূতিভূষণ. বন্দ্যোপাধ্যায়)

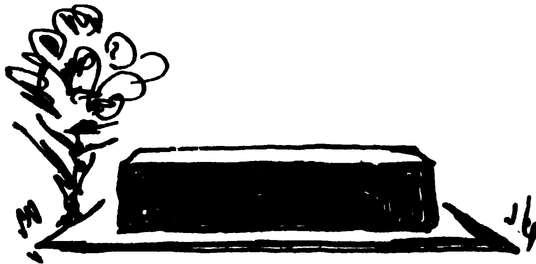
তারাশঙ্করে কিন্তু এই জাতীয় বর্ণনা অন্যরকম। তার মধ্যে রয়েছে বেশ অন্তরের জ্বালা। তিনি সামাজিক অত্যাচারের বিক্ষুব্ধ, আতঙ্কিত; যে অতি প্রতি পদে পদে তার রচনায় প্রকাশিত। তারাশঙ্কর ছিলেন স্বয়ং জমিদার শ্রেণীর মানুষ এবং ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের গল্প তিনি বারে বরে

করেছেন। এই প্রসঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারশ্রেণীর পরিবারগুলিতে যে প্রাণের অপচয় হয়েছে তার বর্ণনায় অনেক সময় মৃত্যু ও মৃত্যুজনিত পরবর্তী ক্রিয়াকলাপগুলির চিত্র পাই—

"গঙ্গার তীরভূমির ঘন বনসন্নিবেশের পশ্চিম পাড় ঘেঁসে একটি স্বল্প পরিসর পথ! পথটি গঙ্গার সহিত সমান্তরাল রেখায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে। স্নানঘাটের উত্তরে কিছু দূরে আর একফালি পায়ে-চলার পথ গঙ্গার গর্ভমুখে নামিয়াছে। ইহার দু'ধারে বুকভরা উঁচু আগাছার জঙ্গ ল। মাথার উপরে বড় বড় গাছের শাখা-প্রশাখা আকাশ ছাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্থানটার একটা তীব্র বিকট গন্ধে বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় খাইয়া উঠে। দগ্ধ নরদেহের গন্ধ। এইটিই শ্মশানঘাট।...

খানিকটা আসিয়াই গঙ্গার কোলে. এক টুকরা সমতল জায়গা পাওয়া যায়। একদিকে রাশীকৃত বাঁশ জড়ো হইয়া আছে; পাশেই তালপাতার চাটাই ও কতকগুলা খাটিয়ায় বোঝা। এখানে ওখানে দুই-চারিটা নরকঙ্কাল পড়িয়া আছে, হাড়ের টুকরায় বুক আচ্ছন্ন।...

নীচে গঙ্গার ঢালু বালুচরের উপর কয়টা শিখাহীন জ্বলন্ত অঙ্গার-স্তূপ নিশীথ অন্ধকারের বুকে ধ্বক্‌ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে। মানুষের দেহ নিঃশেষে আহার করিয়াও আগুনের যেন তৃপ্তি হয় নাই—এখনও সে হা-হা করিতেছে। একটা নতুন চিতায় আগুন দেওয়া হইয়াছে। অগ্নিশিখা সবে আশেপাশে উঁকি মারিতেছে। সেই শিখা প্রভায় দেখা যাইতেছিল; রাশি রাশি ধূম পাক খাইয়া-খাইয়া উপরে উঠিতেছে, নীচে নামিতেছে। চিতার বুকে অনাবৃত একটি শিশুদেহ, বুকে তাহার একখানি কাঠ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শবটির মুখ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল—দশ-এগারো বছরের কচি মেয়ে। ছোট ছোট চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে—কতক তাহার পুড়িয়াছে, কতক এখনও পোড়ে নাই। শবের পায়ের দিকে একটি মানুষ একটা বাঁশের উপর ভর দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পুরা জোয়ান নিকষকালো বর্ণ, মাথার দীর্ঘ বাবরি চুল অগ্নিতপ্ত বায়ুতাড়নায় মৃদু মৃদু দুলিতেছে। সে শ্মশান-প্রহরী চণ্ডাল।" (সন্ধ্যামণি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

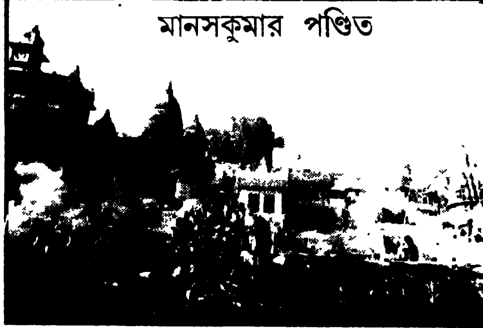


❑ লেখক পরিচিতি : শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও শ্রীচক্রবর্তী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

প্রসঙ্গ : পরিবেশ

কবরে দাও বা চিতায় পোড়াও.

মানসকুমার পণ্ডিত



বেনারস মণিকর্ণিকা শ্মশান।

ছোট্ট একটা কৈফিয়ৎ না দিয়ে লেখাটা শুরু করা সমীচীন হবে না। কারো ধর্মবিশ্বাস কে আঘাত করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়, নয় কোনো সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতিকে কটাক্ষ করা। একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করছি মাত্র।

মৃত্যু মানুষের জীবনে সবচেয়ে নিশ্চিত ঘটনা। মৃত্যুকে আস্বাদ করতে হয় প্রতিটি জীবিত প্রাণীকেই। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত মানুষকে সৎকার করা হয় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে। কাউকে চিতার আগুনে দাহ করা হয়, কাউকে কবর দেওয়া হয়, কাউকে দেওয়া হয় বৈদ্যুতিক চুল্লিতে। প্রাচীন মিশরে মৃত সম্রাট বা রাণীকে 'মমি' করে রাখা হত পিরামিডে। সেই অর্থে পিরামিডও গোরস্থান। সম্ভবতঃ সবচেয়ে ব্যয় ও বিলাসবহুল অন্তিমশয্যা। এক্ষেত্রে অবশ্য মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে বিশ্বাসই সমস্ত বিষয়টির মূল উপলক্ষ্য।

পরিবেশের ভারসাম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রচলিত বিভিন্ন সৎকার পদ্ধতির মধ্যে একটু আধটু দূষণের প্রক্রিয়া থেকেই যায়। হয়তো কোনো একটি বিশেষ দাহকার্য বা গোর দেওয়ার ব্যাপারটা দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে এমন কিছু নয় ; কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে, তা একটা মাত্রা পায় বইকি—বিশেষতঃ ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল সমূহে।

প্রাকৃতিক দূষণের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় কাঠ ব্যবহারের কথা। দাহ করার জন্য ও কফিন তৈরির জন্য প্রতিবছর বেশ ভাল পরিমাণ কাঠের দরকার হয়

এবং বলাবাহুল্য যে, তাতে যথেষ্ট সংখ্যক গাছ কাটার প্রয়োজন পড়ে। শুনেছি আগে, ধনী ব্যক্তিদের চন্দনকাঠ সহকারে দাহ করা হত। অনেকে হয়তো বলবেন দাহকার্যে বা কফিন তৈরিতে তেমন দামি কাঠ ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু প্রশ্নটা দামি বা কমদামি কাঠের নয়—বরং crosion of biomass & biotype-এর। এর সাথে আছে পোড়ানোর ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন গ্যাসের পরিবেশে মিশে যাওয়া। কাঠ বা মানুষের দেহ-এই দুটির দাহনের ফলে মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। সেলুলোজ জাতীয় পদার্থগুলি পুড়ে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে এবং প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থেকে তৈরি হয় সালফার ডাই অক্সাইড। উন্মুক্ত অবস্থায় চিতায় পোড়ানো হলে সর্বদা অক্সিজেন প্রবাহ বেশি থাকবে এবং উপরোক্ত গ্যাসগুলির সর্বোচ্চ অক্সাইডস্ তৈরি হবে। কার্বন ডাই অক্সাইড একটি 'গ্রীণ হাউস গ্যাস' নামে পরিচিত; এবং এর ক্যালোরিফিক মান (Colorific Valuc) বেশি। ফলে এরা তাপ গ্রহণও করে বেশি এবং বিকিরিত করে বেশি। তবে কার্বন ডাই অক্সাইডের Global worming effect নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

এরপর আসি মৃতদেহ দাহ করবার পদ্ধতির বিষয়ে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি চিতায় দাহ করার সময় মৃতদেহ বেশ কিছুটা পুড়ে যাওয়ার পর। যিনি দাহকার্যে সাহায্য করছেন, (শ্মশানের লোক) তিনি (বা তারা), বাঁশ বা লাঠির সাহায্যে মৃতদেহের অবশিষ্ট হতে পা দুমড়ে-মুচড়ে চিতার গনগনে আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। এটা মৃতদেহের অবমাননা কিনা তা বিজ্ঞজন বিচার করবেন, তবে এটা যে দৃশ্যদূষণ অনেকেই তা মানেন। সেই অর্থে 'সতী' প্রথাও সামাজিক ও দৃশ্যদূষণের পর্যায়েই পড়ে। শুনেছি বেনারসের মণিকর্ণিকা ঘাটে* চিতার আগুন কখনও নেভে না। দিবারাত্র চলতে থাকে দাহকার্য। গড়পড়তা হিসেবে একটি দেহ পোড়াতে এক থেকে দেড় কুইণ্টাল কাঠ লাগে। তাহলে একদিন শুধু মণিকর্ণিকা ঘাটে কত কাঠ প্রয়োজন? আর একটা ব্যাপার দূষণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে যেটা হল মৃত দেহের অবশিষ্টাংশ আধপোড়া অবস্থায় নদীতে ফেলে দেওয়া। বিশেষতঃ বর্ষাকাল ও শীতের রাতে এ ঘটনা আকছার ঘটে। পার্সী ধর্মালম্বীদের রীতি মৃতদেহ ফেলে রেখে পাখি দিয়ে খাওয়ানো (Silent tower)। এতেও কিন্তু দূষণের

---

* রোজ প্রায় ৮০টি মৃতদেহ দাহ করা হয়। শবদেহ আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটি চলে যায় ডোমের দখলে। দাহ শেষ হলে দেহ ভস্ম গঙ্গায় সমর্পণ করার কথা। কিন্তু ডোমেদের অত সময় নেই। তারা অপেক্ষা করতে পারে না, শবদেহ ভস্মে পরিণত হওয়া পর্যন্ত। তাই আধপোড়া অবস্থায় দেহগুলি নিক্ষেপ করা হয় গঙ্গায়। বিকট গন্ধযুক্ত ঐ আধপোড়া দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জলে। এর মধ্যেই মৃত ব্যক্তির মুক্তি কামনায় গঙ্গায় স্নান সারেন তাঁর স্বজনেরা। আর এই সঙ্গে চলতে থাকে মন্ত্রোচারণ। এই মৃত ব্যক্তির 'আত্মা' মোক্ষে পৌছল কিনা তা জানার কোনও উপায় নেই। তবে তাদের আধপোড়া শব যে গঙ্গাকে নিরন্তর দূষিত করে ফেলছে, ফলে গঙ্গা হয়ে উঠছে রোগ জীবাণুতে ভরা বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী, তার প্রমাণ মিলেছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়।

(সুনীল মিত্র/তোমার আকাশ, তোমার বাতাস পৃঃ ১৬৯-১৭০)।

ব্যাপারটা থেকে যায়। সংক্রামক রোগে মৃত কোনো মানুষকে দাহ করলে অনেকটা সুবিধে হয়, কারণ আগুনে পোড়ানো এক ধরনের Strerilization পদ্ধতি। এক্ষেত্রে গোর দেওয়া হলে সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকেই যায় ; বিশেষতঃ কোন মৃত্যু তেজস্ক্রিয়তা জনিত কারণে হয়ে থাকলে তো কথাই নেই। তেজস্ক্রিয়তার কারণে মৃতদেহ দাহ করলেও বিকিরণ থেকে রেহাই নেই। কারণ আগুনে পুড়ে ওইসব তেজস্ক্রিয় মৌল ধাতব অক্সাইড তৈরি করে বাতাসে থেকে যাবে এবং তাদের বিভিন্ন Halflife পার করতে থাকবে, তেজস্ক্রিয়তা ছড়াতে থাকবে। ওই সব ধাতব অক্সাইড খুবই সক্ষম তেজস্ক্রিয় পদার্থ হিসাবে কাজ করে যাবে। তাতে জীবিত প্রাণীকূলের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে—বিশেযতঃ ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার পড়েছিলাম তেজস্ক্রিয়তায় কারণে মৃত তিনজন মানুষকে কবর তেজস্ক্রিয়তা নিরোধক পদার্থ বা Sheet দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটা ব্রেজিলের। অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তার জন্য মৃত্যুতে কবর দেওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং কবর খুব ভালভাবে সুরক্ষিত করতে হবে যাতে, ঐ গোরস্থানে আসা অন্য মানুষ যেন আক্রান্ত না হন।

সামাজিক দুষণ সম্পর্কে এবার দু একটা কথা বলা যাক। প্রথমতঃ মৃতের ব্যবহৃত অনেক কিছুই, যেমন লেপ, তোষক বা বালিশের তুলো বা কোনো কোনো পোষাক মায় ফুলের তোড়া ঘুরপথে আবার বাজারে চলে আসে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। কারণ পরবর্তী ভোক্তারা জানতেই পারেন না। তারা যেটা নতুন বলে কিনছেন তার উৎস কী!

দ্বিতীয়তঃ শ্মশান-গোরস্থান অনেক ক্ষেত্রে অসামাজিক ও বেআইনি কাজকর্মের অকুস্থল। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক যাতায়াত থাকে না এই সব জায়গায়। সেই সুযোগটাই কাজে লাগায় এই সব অপ-সামাজিকরা। প্রশাসনই পারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে এই সব ব্যাপারগুলোকে হঠিয়ে দিতে—তবে স্থানীয় সাধারণ মানুষের সাহায্য লাগবে—বলাবাহুল্য।

তৃতীয়তঃ মনুষ্যেতর প্রাণীর মৃতদেহ অপসারণের একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্তা হওয়া দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই, নালা-নর্দমা বা খাল-নদীতে এদের মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়। ফলাফল সেই দূষণ। ভাগাড় বা ঐ জাতীয় কিছু, শহরাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় না—কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনও আছে। এগুলো এখনও তেমনভাবে পরিবেশ দূষণগত কারণে চিন্তার ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। তবে এদের নিয়েও ভাবা শুরু করা দরকার।

শেষের শুরু বৈদ্যুতিক চুল্লীতেই সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ভাবে হয়। প্রায় ২০০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সবকিছুই পুড়ে যায় অক্লেশে। মৃত্যুই মনে হয় মানুষের সবচেয়ে নিবিড় অনুভব—তাই প্রিয়জন বিয়োগে বিহ্বল মানুষ জনকে সব কিছু আচার, পরিবেশ-বিধিসম্মত ভাবে করিয়ে দেবেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং তাদের প্রতিনিধিরা।

❑ **লেখক-পরিচিতি**— লেকচারার, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

দুয়ারে আইস্যাছে পালকি

আমিনুল হক

হায়াৎ মউত :

'আচ্ছালোমো আলায়কুম ইয়া আহলাল কুবুরে ইয়াগ ফেরুল্লাহো লানা অলাকুম আনতুম ছালাকুনা অনাহ্নো বিল আছরে।' বাঙলা অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায়—*'হে কবরবাসীগণ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লা তোমাদের ও আমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের অগ্রবর্তী : আমরা তোমাদের অনুবর্তী।'* বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে এই 'তোমরা' এবং 'আমরা' এই শব্দযুগলকে। তোমরা এখানে মৃত, অর্থাৎ মরা মানুযের দল; আর আমরা এখনও সবল, সচল।

জন্ম এবং মৃত্যু—বিশ্বনিয়মের এক আশ্চর্য উদাহরণ। আজকের পৃথিবীতে দৈনিক যেমন বেশ কিছু নবনব মানব সন্তানের আবির্ভাব হচ্ছে—তেমনই বিপরীতক্রমে বেশ কিছু মানুষের মৃত্যুও ঘটছে। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার এ যে কি নিয়মবিধি! বিশ্বের অত্যাধুনিক বিজ্ঞান থেকে দর্শন, ঘোর নাস্তিক থেকে নিষ্ঠাবান আস্তিক কেউই আসলে জন্ম আর মৃত্যু প্রক্রিয়ার সহজগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারনে নি। তবে একথা সকলেই মিলিতভাবে মেনে নিয়েছেন—জন্ম মানেই মৃত্যু। ঠিক যেমন সৃষ্টি মানেই বিপরীতে লয় বা ধ্বংস।

পাঠকবৃন্দ, বিশেষ অনুরোধ করছি লেখার শুরুতে 'কুবুরে' শব্দটির প্রতি নজরপাত করতে। 'কুবুরে' শব্দটি আসলে 'কবর' শব্দ থেকেই সৃষ্ট। 'কবর' কথার অর্থ চাপা দেওয়া। ইসলামধর্মী মানুষজনের সাধারণ পরিচিতি 'মুসলমান' বলে। আমাদের বাংলায় 'মুসলমান' শব্দটিকে কেউ কেউ 'মুসলিম' বলে থাকেন। কেউ আবার ইংরেজি ভাষাকে বাহন করে বলেন 'মোহামেডান'। ইসলাম, মুসলমান, মুসলিম, মোহামেডান, মহামেডান—সবই আসলে একটি নির্দিষ্ট জনজাতিকে ঘিরে তৈরি। যে গোষ্ঠীর সুলভ পরিচিতি 'মুসলমান' বলে।

মুসলমান সমাজে জন্মের মুহূর্তে যেমন অজস্র নিয়ম মেনে চলতে হয়, তেমনই মৃত্যুও বিশেষ বিশেষ প্রথা-পদ্ধতিতে প্রায় শেঁকলের মতো বাঁধা। বিশ্বাসী যে কোনও একজন মুসলমি ব্যক্তি মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র আরবি ভাষায় উচ্চারণ করেন—'ইন্না লিল্লাহে-অ-ইন্না এলাইহে রাজেউন। বাঙলার্থে—'নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লার জন্য এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।'

আরবি, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় নিরক্ষর হলেও যে কোনও বাঙালি মুসলমান ব্যক্তি বেশ কিছু আরবি এবং উর্দু ভাষার শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে নিজেদের কথাবার্তায় ব্যবহার করেন। হায়াৎ এবং মউত ঠিক এই রকম বহু ব্যবহার্য শব্দ-যুগল। 'হায়াৎ' মানে আয়ু আর 'মউত' মানে মৃত্যু। আর এই 'মউত'-এর পরেই মানুষের শেষ আশ্রয় 'কবর'। কবরকে কোনো কোনো মানুষ 'গোর'

বলে থাকেন। কবরের জন্য নির্দিষ্ট স্থান কবরস্থান। গোরের জন্য নির্দিষ্ট স্থান গোরস্থান। গোরস্থানে এলে সকলেই সবাই সমান। অজানা এবং অজ্ঞাত এক লোককবি কবে যে লিখেছিলেন—

শিয়রে আইস্যাছে পাল্‌কি
নাওয়ারি গায় তোলো রে তোলো,
মুখে আল্লা রসুল সবে বলো।

মৃত্যুর পরে গোরস্থানে যাত্রা। যাত্রার জন্য এসে গেছে পালল্‌কি। পাল্‌কি অর্থাৎ মৃতদেহ বহনের খাট। আর এই খাট কিংবা পাল্‌কিতে করেই মানুষটির সর্বশেষ যাত্রা। খাটকে কোনো কোনো মানুষ 'খাটিয়া' বলেও উচ্চারণ করেন।

এই খাট তৈরি হয় নানান আকারে। ছোট, বড়, মাঝারি ইত্যাদি। স্থানীয় মসজিদে সুনির্দিষ্ট কোনও স্থানে খাট রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মসজিদের বারান্দার অংশে শূন্যের উপর ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। অনেক সময় মৃতদেহের খাটের উপর হালকা আচ্ছাদনের ব্যবস্থা থাকে।

প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিম জনগণ এই ধারণা পোষণ করেন যে এই খাটযাত্রা থেকে কারুরই পরিত্রাণ নেই। মৃত্যু যেন জন্মের পর থেকেই তার আসন গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত। দুয়ারে পাল্‌কি এসে দাঁড়িয়ে আছে। তবু যেন অকারণ বিলম্ব! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাল্‌কি কে সুশয্যায় সাজানো প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিম জনসাধারণের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় ...

জীবনের শুরু মানেই মৃত্যুর সূচনা। মানব সভ্যতার বিকাশে জন্ম আর মৃত্যু যেন পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে রয়েছে। বাঙ্‌লার মরমিয়া এক সাধক সেই কবে—কোন্‌ অতীতে বলে গিয়েছিলেন—খাঁচার ভিতর অচিন এক পাখির কথা। সেই অচিন পাখিকে আজ অব্দি সঠিক চিনতে সক্ষম—এমন মানব—প্রকৃতই বিরল। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে সেই অচিন পাখির রহস্যপূর্ণ অবস্থান। জীবিত থাকাবস্থায় যে মানবশরীর পরম যত্নের আর আদরের; মৃত্যু-পরবর্তী সেই মানব শরীরই হয়ে ওঠে দায় আর দায়িত্বের এক রাশ বোঝা। মৃত্যুরও রয়েছে নানান প্রকারভেদ। পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যু ছাড়াও রয়েছে অপঘাতে মৃত্যু, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, স্বেচ্ছামৃত্যু অথবা অনিচ্ছায় হত্যাজনিত মৃত্যু।

মানুষের স্বাভাবিক গড় আয়ু হিসেবে সাধারণত এখন ধরা হয়—ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বছর। কেউ কেউ জীবন তৃষ্ণায় শতবর্ষ ছুঁয়ে যায়; সে ঘটনা অবশ্যই ব্যতিক্রমী উদাহরণ। মৃত্যুর পরে মৃতদেহে সৎকার করা অন্য সব জীবিতজনের কাছে হয়ে ওঠে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বিশেষ।

কেউ গোরে, কেউ শ্মশানে যায় ...

জনজাতি, ধর্মীয় বাতাবরণ আর পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থান অনুসারে প্রতিটি মৃতদেহের শেষ পরিণতি হয় সৎকারে। কেউ গোরে, কেউ শ্মশানে যায়। সারা বিশ্বের পরিসংখ্যানে দেখা

যায়—পৃথিবীর অধিকাংশ মৃতদেহকে গোর দেওয়ার পদ্ধতি। জনসাধারণের অনেকের ধারণা, গোর দেওয়া হয়তো শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই চলিত। কিন্তু প্রকৃত বিচারে কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। খ্রিস্টান, ইহুদি ছাড়াও পৃথিবীর আরও বেশ কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই গোর দেওয়ার পদ্ধতি বিশেষ প্রচলিত। গোর দেওয়া অর্থাৎ কবর দেওয়া বা সমাধিস্থ করা। যে কোন মৃতদেহই বিশেষ সম্মানের এবং শ্রদ্ধার।

সাধারণ মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই গোর দেওয়া বা কবর দেওয়ার প্রচলন সেই কোন্ সুদূর অতীত থেকে চালু হয়ে আসছে তার সঠিক হিসাব মেলানো কঠিন। অতি সাধারণ একটি ধারণা কবর মানেই মুসলমান জনগোষ্ঠীর এবং শ্মশান মানেই হিন্দু জনগণের জন্য নির্দিষ্ট। সেটা অবশ্যই প্রকৃত সত্য নয়। বড়সড় দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর পর গণ্ডা গণ্ডায় মৃতদেহের গণকবর দেওয়ার সময়—কেউই লক্ষ্য করেন না—'মড়ার কি জাত?' কবরের শেষ বিছানা অথবা আধুনিক ইলেকট্রিক চুল্লির জ্বলন্ত শ্মশানেই হয় মৃতদেহের সর্বশেষ আশ্রয়। জীবনের চরমতম পরিণতি এই মৃত্যু। এই মৃত্যুর কাছে সকল আধুনিক গবেষণা, সকল বৈজ্ঞানিক চিন্তা, চিকিৎসাবিদ্যা সরবে পরাজয় বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। গোর অথবা শ্মশানেই হয় চির প্রশান্তি।

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই

সাধারণ অর্থে একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানুষের চিন্তা হয়—তার মৃতদেহ যেন এমন জায়গায় কবরস্থ করা হয়—যেখান থেকে সমজিদের মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাওয়া যাবে। মসজিদের পাশে হবে সেই চিরকালীন আশ্রয়। তাই বলে এমনটা ভাবা সঙ্গত হবে না যে—প্রতিটি মসজিদের পাশেই থাকবে একটি কবরখানা। প্রশস্ত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ হলে ফাঁকা জায়গায় কিছু কিছু অংশ এই বিশেষ কবরস্থানের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। সমাজের বুকে নানাভাবে মান্যগণ্যদেরই সাধারণত এই মসজিদের পাশে কবরস্থ করা হয়ে থাকে। মসজিদেরই কোন প্রাক্তন ইমাম, মসজিদ-নির্মাণে বিশেষ ভূমিকাধারী কোন মানুষ অথবা অলৌকিক ক্ষমতাশীল কোন কোন অলীক মানুষের মৃতদেহই এই মসজিদের পাশে কবরের জায়গা পেয়ে থাকেন। তবুও বলা যায়—ছোটো থেকে বড়—মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলেরই সর্বশেষ ইচ্ছা—যদি মসজিদের পাশে কবরের স্থানটি হয়।

আত্মীয় বিয়োগ, নাকি মুক্তির নামান্তর!

ধরা যাক, কোনো গৃহস্থ বাড়ির গৃহকর্তা পরিণত বয়সে মারা গেলেন। বেঁচে থাকা অবস্থায় যে মানুষটি ছিলেন পরিবারের সকলের অনুগ্রহ অথবা অনুকম্পার বিষয়; মৃত্যুর ঠিক পরে পরেই সেই বয়স্ক গৃহকর্তার (গৃহকর্ত্রী হতে পারেন) মৃতদেহকে ঘিরে আত্মীয়-পরিজনদের তুমুল শোক-পালন। মৃতদেহের সামনেই চলে এই স-রোদন শোক পালনের ঘটা। বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় এই স-রোদন শোক-পালনে মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা। কান্নারও একটা সুন্দর সুর রয়েছে—তা উপলব্ধি করা যায় এই সব পরিবেশে। গানের সুরের মত কিংবা ছড়া-কাটার ভঙ্গিতে মৃত-ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নানান শোকালাপ। যা শুনলে মনে হতে পারে একটা শোক

কাব্যের অচেনা পাঠ। শুধু মহিলারাই নন, বাড়ির বয়স্ক পুরুষ সদস্য, শিশু, যুবক-শেষ পর্যন্ত এই কান্না-গীতে অংশ গ্রহণ করে ফেলে অনিবার্যভাবেই। পাড়া-প্রতিবেশী, আধো চেনা অনেকেই যুক্ত হয়ে পড়েন—এই শোক বিহ্বল পরিবেশে। শোনা যায়—কেউ কেউ অনাহূত ব্যক্তিও আসেন মৃতদেহের সামনে বসে বসে কান্না-ক্রিয়ার জন্য। এই দেশেরই কোনো কোনো রাজ্যে এমন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে—যাঁরা নাকি অপরের মৃতদেহের সামনে বসে 'ভাড়া' হিসাবে কান্না বিক্রি করে থাকেন। 'রুদালি' নামের সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা আজকের সচেতন পাঠকদের অবশ্যই জানা। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর মানবিক কলমে একদা এই রুদালি সম্প্রদায়ের কথা বহুলভাবে প্রচারিত এবং প্রসারিত। রুদালি সম্প্রদায়ের মানুষজন নাকি কান্নাকেই প্রধানতম জীবিকা বলে মনে করে থাকেন।

জন্মিলে মরিতে হবে

যে কোনো ভূগোলে, যে কোনো স্তরে একটি জন্ম মানেই মৃত্যু সংখ্যার—আপনা থেকে বৃদ্ধি। জন্ম আর মৃত্যুর হওয়া—না হওয়াতেই যথেষ্ট দুঃখ, যথেষ্ট ট্রাজেডি। অনিবার্য জেনেও কোনও মানুষই এই মৃত্যুকাণ্ডকে সহজে গ্রহণ করেন না। অথচ এই সারসত্য সকলের জানা—'জন্মিলে মরিতে হবে'।

কবর! কবর! তোমার প্রাণ নেই মানুষ ...

আজ যে মানুষটি অট্টালিকার সুরম্য প্রাসাদে অথবা ভাঙা কুঁড়ে ঘরে অবস্থান করছেন—সকলের নিশ্চিত আবাস এই কবর। কবর মানেই যেন এক দুঃস্থ আতঙ্ক। মাটির চৌকোনা ঘরে, মাটির বিছানায় শুয়ে চিরকালের জীবনযন্ত্রণার মুক্তি। একটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে কবর খোঁড়ার লোকজন যেন তৈরি হয়েই থাকেন। সাধারণভাবে দেখা যায়—সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত মানুষজনই এই কবর খোঁড়ার কাজে স্বেচ্ছায় নিয়োজিত হন। এর জন্য কোনো মজুরি বা পারিশ্রমিক মেলে না। নিছক সামাজিক দায়িত্ব পালন মাত্র। মৃতদেহের—বিশেষত লম্বাকার কতখানি—তা মেপে নিয়ে কবর শিল্পীরা তৎপর হয়ে ওঠেন কবর খননের কাজে। আল্লার গুনগান করা হয় নানান পদ্ধতিতে। দোয়া-দরুদ পাঠের শেষে যখন কবর-শিল্পীদের দলবল কবর খননের কাজে নেমে পড়েন—তখন তাঁদের মধ্যে থাকে পরম ভক্তি আর নিষ্ঠা। বেশ কয়েক ঘন্টার পরিশ্রমে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে যে কবরগৃহ নির্মাণ করা হয় তা শিল্পেরই সমতুল। নিখুঁত জ্যামিতিক পরিমাপ। প্রথম দর্শনে মনে হতেই পারে এমন সুন্দর বাসগৃহ! কবরের সবদিক এমন সুন্দরভাবে 'ফিনিশিং' করা হয় দেখলেই ভালো লাগে। বাড়ি থেকে যখন মৃতদেহটিকে শেষবারের মতন বাইরে আনা হয়—তখন পরিবারের সকলেই যেন আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ওঠেন। সত্যিই তো, এই শেষ দেখা।

কবরে মৃতদেহ যাওয়ার আগে থাকে ধর্মীয় এবং লোকাচারে নানান দিক। দোকান থেকে সদ্য কেনা সাদা রঙের কাপড় দিয়ে মৃতদেহের সমস্ত শরীর মুড়ে দেওয়া হয়। মুসলমান জনসমাজে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'দাফন'। শরীরের উর্ধাঙ্গ, মধ্যাঙ্গ, নিম্নাঙ্গের জন্য তৈরি করা

হয় আলাদা আলাদা বেশ। পুরুষ মৃতদেহের জন্য দাফন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন পরিবারের নিকটজন কোনও পুরুষ সদস্য। আর মহিলা মৃতদেহের জন্য মহিলারাই আপনা থেকেই নির্বাচিত। ধূপধুনো, আগরবাতি, গোলাপজলের সুগন্ধে চারদিক সুশোভিত। মৃতদেহ বহন করার জন্য যে বিশেষ ঘাট— তা সাধারণভাবে প্রস্তুত থাকে স্থানীয় কোনও মসজিদ। নকশাকাটা চারটি হাঁতলে চার থেকে আটজন অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই শবের খাটকেও সুসজ্জিত করা হয় রঙিন কাগজ কেটে অথবা আগরবাতি জ্বালিয়ে। চারদিকে ঘেরা এই খাটে শুভ্রবেশী মৃতদেহ যখন কবরে নিয়ে যাওয়া হয় তখনকার পরিবেশ থাকে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর। প্রায় সকলেই নিশ্চুপ। তবুও আড়াল থেকে—বিশেষত মহিলা মহলের কান্নার ধ্বনি শোনা যেতে থাকে। ঠিক এই সময় সকলেই হয়ে ওঠেন আবেগ-বিহ্বল। একে অপরকে সান্ত্বনা দেওয়ার নাম করে নিজে নিজেই কেঁদে ভাসান পাড়া। স্থিরমতিত্ব ছাড়া পাড়া সকলেই কেমন নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে যান। বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীতে এই দৃশ্যটি চিরকালের বেদনায় চিহ্নিত।

একমাত্র ক্রন্দন লয়ে সাথে ...

শেষ বেলাকার শেষ মুহূর্তে তখন একমাত্র সঙ্গী আত্মীয় অনাত্মীয়, নিকট পরিজনদের ক্রন্দন ধ্বনি। মৃত্যুর মতন বিয়োগাত্মক ঘটনাকে কেউ সহজে গ্রহণ করতে পারে না।

কবরস্থান নির্দিষ্ট হয় সাধারণত মৃত ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে সম্পন্ন গৃহস্থজনের নিজেরে পারিবারিক ব্যবস্থা থাকে কবরের। আবার অনেক সময় কবরস্থান বা গোরখানা নির্দিষ্ট হয় সর্বজীননভাবে। জন-আবাস থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই কবরখানার অবস্থান। আবার কেউ কেউ নিজের বাড়ির আশপাশে বাগান অথবা ফাঁকা জমিতে কবরের জমি নির্দিষ্ট করে থাকেন।

বাড়ি থেকে মৃতদেহ যখন সাদা কাফনে মুড়ে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়—তখন স্থানীয় গরিব দুঃখীদের সাধ্যমতন দান করা হয়। কবরযাত্রীদের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ ভিড় করেন। শুরু হয় শবযাত্রা। যাত্রাপথে কোরান শরীফের নানান গুরুত্বপূর্ণ সুরা পাঠ করেন শবযাত্রীরা। যাতে মৃতব্যক্তির পরলোকে শান্তি মেনে এই বিশ্বাসে। কবরের কাছাকাছি জায়গায় মড়ার খাট নামানো হয়। এবারে শুরু হয় 'জানাজা'। 'জানাজা' পড়া মানেই যেন মৃতব্যক্তির অর্ধেক 'বেহেস্ত' লাভের ছাড়পত্র। যদি কেউ আত্মহত্যা করে মারা যান—তবে সমাজপতিরা বিধান দেন—এর জন্য 'জানাজা' পড়া হবে না। সে এক দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা। 'জানাজা' হবে কিংবা হবে না—এই নিয়ে চলে তুমুল বাক্-বিতণ্ডা। মুসলমান জনসমাজে এই 'জানাজা'র গুরুত্ব খুব বেশি। সুসজ্জিত খাটে শয়ান মৃতদেহ কিন্তু এ শবের কিছুই টের পান না। কেননা, তাঁর নিষ্প্রাণ শরীর তখন শুধুই মাটি চাপার অপেক্ষায়।

আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো হবো ...

মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ সারা বিশ্বেই দুর্লভ। জন্ম-মৃত্যু একাসনে যেন তার অবস্থান। মৃত্যু পববর্তী কত লোকাচার, কত বিচিত্র নিয়ম পালনের রীতিনীতি। উল্লেখ্য, মুসলমান সমাজে—বিশেষ

করে মহিলাদের কবরদানের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা থাকে না। কোনও কোনও স্থানে আড়াল থেকে পর্দানশীন মহলিারা বালতি, বড় ঝুড়িতে করে মাটি পৌঁছে দেন কবরস্থানে। কবরে যখন মৃতদেহ শেষবারের মতন ঢেকে দেওয়ার মুহূর্ত, তখন নিকটাত্মীয়দের সবাইকে দেখানো হয় শেষবারের মতন মৃতদেহের মুখ।

মান্যগণ্য যেসব ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ব্যক্তিত্ব—যাঁরা পবিত্র মক্কায় হজ করে এসেছেন—তাঁদের পরিচয় হাজি-সাহেব নামে। এই সব হাজি সাহেবের অধিকাংশই মক্কাশরীফ থেকে নিয়ে আসেন পবিত্র জমজমের পানি। এই জমজমের পানিকে ঘিরে ধর্মনিষ্ঠ মানুষজনের বিচিত্র বিশ্বাস। সাদা কাফনে মোড়া মৃতদেহকে জমজমের পানি ছিটিয়ে আরও পবিত্র করা হয়। এইসব হাজি সাহেবদের অনেকেই আবার মক্কা শরীফ থেকেই তাঁদের কাফন কিনে আনেন। জনসমাজে তাঁদের আভিজাত্য এবং সৌখিনতার কথা স্বীকার করে ধন্য ধন্য করেন।

হে মহামরণ ...

কবরস্থ করার পর বাঁশের মাচা দিয়ে ঠিক ঘরের মতই শূন্য করে এর ছাদ তৈরি করা হয়। বাঁশের মাচার উপর কলাপাতা দিয়ে আবরণ দেওয়া হয় যাতে ঝুরো ঝুরো মাটি কবরের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। শেষে একের পর এক মানুষের তিন আঁজল মাটি দিয়ে কবরের নির্মিত হয়। আকারটা দাঁড়ায় অনেকটা ছোটোখাটো বাঁধের মতন। শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি প্রাণী যাবে কবর থেকে মৃতদেহের ক্ষতি না করতে পারে তার জন্য কবরের মাটির উপরে দেওয়া হয় খেজুর ইত্যাদি গাছের কণ্টকপূর্ণ ডালপালা।

অনেকেই কবরের চারপাশ ঘিরে দেন সিমেন্ট আর ইঁটের পাঁচিলে। উপরের দিকে অঙ্কে লেখা হয় '৭৮৬' এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরিণত রাজমিস্ত্রির ভুল বানানে লেখা হয় মৃতব্যক্তির নাম এবং পরিচয়পঞ্জি। এক সঙ্গে জোড়া কবর দেখা যায়—সাধারণত স্বামী-স্ত্রী কিংবা পিতা-পুত্রের। অনেক সৌখিন আত্মীয় পরিজন—কবরের দেয়ালে মিস্ত্রিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নেন নানান নক্‌শা।

সম্প্রতি সরকারি এবং বেসরকারি নানা উদ্যোগে কবরস্থানের জন্য নানান অভিনব পরিকল্পনা কথা দেখা যায়। সরকারি দায়সারা মনোভাবের চাইতে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থাগুলোর নানান পরিকল্পনাই জনগণের কাছে অধিক বেশি গ্রহণীয় এবং মান্য। জীবন-মৃত্যুর সঠিক্ হিসাব কষতে কে বা পারে কতটুকু।

❑ লেখক পরিচিতি : প্রাবন্ধিক, শিক্ষক, সহ-সম্পাদক, স্বদেশচর্চা 'লোক'।

শ্মশান পথের ধারে

রমাপ্রসাদ দত্ত

উত্তর কলকাতায় কয়েকটি রাস্তার ধারে যাঁদের বাড়ি তাঁরা সারাদিনে অনেকবার শোনেন— 'বলহরি হরিবোল'। কখনও কখনও 'রামনাম সত্য হ্যায়'। সকাল দুপুর সন্ধে গভীর রাত্তির যেকোনো সময়েই দেখা যাবে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বন্যা সব সময়েই। সব শববাহকদের চেহারা স্বভাব বা অঙ্গভঙ্গি একরকম নয়। শান্তভাবে অনেকে চলেন। অনেকের চলনে উৎকট উল্লাসের বাড়াবাড়ি থাকে। কখনও বাড়ির লোকজনের কিছু করার থাকে না। তাঁরা অসহায়ভাবে ওই শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় সব মেনে নেন। আবার কখনও কুলশীল গোত্রহীন বা গরিব দুঃখী মানুষের শব পাড়ার ছেলেরা ওইভাবে নিয়ে চলে। যা খুশি বলে চেঁচায়, শান্ত সুরের হরিধ্বনির বদলে। 'বলহরি হরিবোল' শব্দটাই এমনভাবে বলে যে আশপাশের অনেকে বলেন, 'এরা কি একটু ভদ্রভাবে নিয়ে যেতে পারে না?' অনেক সময় কাগজে লেখালেখিও হয়েছে শববাহকদের আচরণ সম্বন্ধে। কিন্তু লিখে এদেশে কারও চৈতন্য ফেরানো এসময় মুশকিল। ওইভাবে মরদেহবাহকরা উল্লাস করলে মজা পাওয়ার লোকও কম নয়। দক্ষিণেশ্বরের ইঙ্গিত গোষ্ঠীর একটা নাটক দেখেছিলাম 'শেষ থেকে শুরু'। নাটকে এই ধরনের ছবিও তুলে ধরা হয়েছিল। নাটকটা বেশি লোক দেখেনি। তারপর সেটার চলচ্চিত্রায়ন হতে অনেক লোক দেখল। কিশোরকুমারের একটা গান বাজার মাত করল 'বল হরি হরিবোল।' ছবিতে গানের মধ্যে অনেক সংযতভাবে শব্দ বসানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কোনো সংযমের পরোয়া করেন না শববাহকরা। কিশোরকুমারের গাওয়া ওই গান কিছুদিন বোধহয় তাদের বাড়তি সমর্থন বা উৎসাহ জুগিয়েছিল। ছবিটা একটু ভাবুন, রাত গভীর, পাড়ার মধ্যে দিয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে একদল শববাহক আসছে। আশপাশের বাড়ির লোকজনের কী মনে হবে? বয়স্কদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হবে? কয়েকজনের মুখে শুনেছিলাম, 'আমাকে মানুষের কাঁধে চড়িয়ে শ্মশানে নিয়ে যেও না। একটা গাড়ির ব্যবস্থা কোর। কাঁচঢাকা না হোক, সাধারণ গাড়ি।' মৃত্যুর পর কি ঘটছে দেখার সুযোগ নেই, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনরা কি বলে প্রিয়জনের শেষযাত্রা ওইভাবে হোক। একটা মানুষ জন্মেছিলেন। জীবনের অনেকগুলো বছর শেষ করে তার জীবনে পূর্ণচ্ছেদ এলো। হিন্দু মতে মরদেহ পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাবার জন্যে দাহকর্ম। একটা শুদ্ধাচার পালনের অনুষ্ঠান। ধর্ম মানি আর নাই মানি, যে মানুষটি ছিলেন তাঁর শেষকৃত্যের বিভিন্ন পর্বে শ্রদ্ধার যেন ঘাটতি না থাকে। এটাই লক্ষ্য করার ব্যাপার। তা থাকে না। মৃত্যুর পরই চেনা অতিআপন মানুষটি পর, তার প্রাণহীন দেহ স্পর্শ করলেই অশুচি। অসুখে কোনোভাবে মৃত্যুতে মরদেহ

বেশি ঘাঁটা বারণ। শাস্ত্রের ব্যাখ্যাটা অন্যভাবে হয়েছে। আসলে ওই শোকের সময়ে যারা জীবিত প্রিয়জন তাঁদের সাবধানে থাকা দরকার। মৃতদেহ নিয়ে বেশি আবেগ বিহ্বল হলে সুস্থ নিকটাত্মীয়দের শরীর অসুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। এই সতর্কতা বা সাবধানতার জন্যে ধর্মীয় বিধিনিষেধের আচার অনুষ্ঠানের রীতি। শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় শেষকৃত্যের দায়দায়িত্ব নিতে হয় বাড়ির লোকজনদের। তখন যে যা বলে তাই-ই শোনেন মৃতের নিকটাত্মীয়রা। আকস্মিক মৃত্যুতে কিন্তু শোক ছড়িয়ে যায় সকলের মধ্যে। কোনো অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে অসুখে ভুগে বা দুর্ঘটনায় মারা গেলে আশপাশের প্রত্যেকের মুখ করুণ হয়ে ওঠে। অনেকের চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। কাঁদার জন্য লোক খুঁজতে হয় না। আগের দিন পাড়ার যেসব লোক বিকট উল্লাসে কোন ৯০ পেরেনো বৃদ্ধাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল, তাদেরই দেখা যায় সম্পূর্ণ অন্য ভূমিকায়। যেন নিজের কোনো আপনজনের মত্যু হয়েছে এই ভেবেই তারা কান্না চেপে সব কাজ করে যায়। সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাবভঙ্গি তাদের। আপত্তিকর অখুশি হওয়ার মতো কোনো ভাষা তাদের মুখে নেই। আসলে কোনো মানুষই তো পুরোপুরি খারাপ বা ভালো নয়। দোষ-ত্রুটি সকলের মধ্যেই থাকে। পাড়ার ওই শববাহক উৎসাহী ছেলেরা দিনে রাতে যখনই ডাক পেয়েছে ছুটে গেছে। পাশে দাঁড়িয়েছে। ওদের দেখে অনেকে ভরসা পেয়েছেন। আবার কোনো জায়গায় পাড়ার ওই ধরনের ছেলেরা শববাহনের আগে চুক্তি করেছে। কত টাকা দেবেন? তাছাড়া মদ, সিগারেট আর খাওয়ার টাকা দিতে হবে। শ্মশানে এক পাড়ার শববাহকদের সঙ্গে অন্য পাড়ার শববাহকদলের কথা কাটাকাটি মারপিটও হয়েছে। এখন সব জায়গাতেই নিয়ম হয়েগেছে—সার দিয়ে অপেক্ষা করতে হয়, চুল্লিতে ঢোকানোর জন্য। পাড়ার অনেক সমাজসেবীর জীবনপঞ্জিতে অলিখিত থাকত—ইনি জীবনে ৩০০টি মৃতদেহ বহন করেছেন। মৃতদেহ বহনকারীদের বলা হয় 'মড়া পোড়ানোর দল'। 'শব পোড়া মড়া দাহকের দল' কথাটা তো বাংলা ভাষায় বেশ চালু ছিল একসময়। শবদাহকদের সংখ্যা কমছে। এখন ওইভাবে পাড়ার ছেলেরা ছুটে যায় না। গেলেও কম। সমাজসেবা বা পাড়া গর্ব ব্যাপারগুলো দ্রুত হারিয়ে গেছে। এখন পাশের বাড়ির কেউ মারা গেলে খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না অনেকে। কলকাতার বহু অঞ্চলে এরকম ছবি দেখবেন। তবে উত্তর কলকাতা এখনও পুরনো ধারা বজায় রেখেছে। আগের মতো না হলেও এখনও বিপদে আপদে অনেককে পাশে পাবেন। কোনো হিসেবের অঙ্ক না কষেই তারা ছুটে আসে। অসুস্থ হলে হাসপাতালে ছোটছুটি করে। মৃত্যু হলে কাঁধে করে বা গাড়িতে করে শ্মশানে নিয়ে যায়। শববাহী শকট চালকরা অবশ্য মরদেহ বহনের রেকর্ড দেখাতে পারবেন। কারণ তাঁদের তো নির্বিকারভাবে কাজ সারতে হয়। এক একটি মৃত্যুর সঙ্গে কত রকম শোকের ছবি জড়িয়ে থাকে। সব লক্ষ করেন। মনে কিছুই কি দাগ কাটে না? হয়তো কোনো অল্পবয়সীর মৃতদেহ দেখলে গম্ভীর হয়ে যান। একমনে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দেন

শ্মশানে। হয়তো মনে মনে বলেন, এভাবে আমাকে বয়ে আনতে হচ্ছে। যদি কোনো অপরাধ হয় ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা কোর। এক কট্টর বামপন্থী অধ্যাপক হঠাৎ মারা গেলেন কয়েক বছর আগে। তখন কলকাতা বইমেলা চলছে। বইমেলার মাঠে শব্দবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা। কত কথাবার্তা হলো। পরিকল্পনাও। রাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অ্যাম্বুলেন্স ফোন করে মিলল না। শেষে অনিচ্ছায় আশপাশের লোককে ফোন করলেন যিনি রাজনৈতিক মতাদর্শে সম্পূর্ণ বিপরীত শিবিরের । তিনি গভীর রাতে ফোন করে বললেন, 'ড্রাইভার তো নেই। ঠিক আছে পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি পৌঁছে যাচ্ছি।' বামপন্থীরা দেখলেন, দশ মিনিট পেরোতেই গাড়ি চালিয়ে ঢুকলেন সেই মানুষটি, যিনি রাজনীতি বিশ্বাসে অন্যমেরুতে থাকলেও বিপদের ডাক শুনে ছুটে এসেছেন। এড়িয়ে যাননি। আশপাশে দাঁড়ান অনেক বামপন্থী বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। সেই দক্ষিণপন্থী নেতা গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে মৃত্যু হলো অধ্যাপকের। অ্যাম্বুলেন্স চালক নেতা অপেক্ষা করছিলেন যদি অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হয় সেজন্য। মৃত্যুর খবর শুনে বেরিয়ে এসে বললেন লোকজনদের, 'আমাকে খবর দিতে দেরি করলেন কেন? একটু তো ব্যবস্থা করা যেত চিকিৎসার।' বামপন্থীরা কিছু বলতে পারলেন না। অ্যাম্বুলেন্সে গিয়ে উঠলেন আস্তে আস্তে চলে গেলেন। পরে শববাহী গাড়িতে অধ্যাপকের মরদেহ চাপিয়ে লাল পতাকা নিয়ে মিছিল গিয়েছিল নিমতলা শ্মশানে।

প্রায় বছর পঁচিশ আগের একটা ছবি মনে ভাসছে। বাগবাজার স্ট্রিট-আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের মোড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম কয়েকজনের সঙ্গে। হঠাৎ নজরে এলো মরদেহ নিয়ে আসছেন কয়েকজন। ছ জনের দল। দুটো মেয়ে কাঁধ দিয়েছে। দুজনেই ফ্রক পরা 'অল্প বয়স। আর রয়েছেন এক বৃদ্ধ আর একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। পিছনে চলেছেন এক বৃদ্ধা। পরবর্তী দৃশ্য ঘটে গেলো' আমরা প্রথম দৃশ্যে হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগে। ক্ষুদিরামের মূর্তির রকে বসে আড্ডা মারছিল ছেলের দল। তাদের মধ্যে চারজন ওই অবস্থায় ছুটে গিয়ে শববাহকদের বলল, 'আপনারা সরে যান। আমরা নিচ্ছি'। শববাহকেরা বিস্মিত, এরা কারা এলো না ডাকতেই! তাঁদের দ্বিধা। ছেলেরা তখন তাদের সরিয়ে মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিয়েছে। সেদিন গর্ব হচ্ছিল বাগবাজারের ওই ছেলেগুলোর জন্যে। তারা বন্ধুদের বলে গিয়েছিল 'বাড়ীতে বলে দিস শ্মশানে যাচ্ছি।' প্রত্যেকেই ভালো পরিবারের ছেলে। তখন কলেজ ছাত্র। শ্মশানে সমস্ত খরচও করেছিল ওই ছেলেরা। কে কি বলবে, কে প্রশংসা নিন্দে করবে এমন ভাবেনি। শবদেহ নিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল। সেজন্যে তারা প্রস্তুত হয়ে যায়। ওইদিন সম্পূর্ণ অন্য রকম অবস্থায় তাদের বোধ বিবেচনা যেন বলেছিল, 'কি দেখছো চুপ করে ছুটে যাও।' তারপর অনেক শবযাত্রী দল দেখেছি কিন্তু ওই ছবিটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। সেদিনের চার যুবক প্রশান্ত, কল্যাণ, হরেন, সুব্রত এখন পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই প্রবীণ। এখনও ওইরকম অবস্থায় ছেলের

দল ছুটে যায় কী? নিশ্চয়ই যায়। আস্থা হারালে চলবে না। এখনও কোনো কোনো তরুণের বাড়িতে খবর যায়, যেতে হবে অমুক মারা গেছেন। সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে কোমরে গামছা বাঁধে। বাড়ির কেউ কেউ একটু অসন্তুষ্ট হলেও হয়তো ছেলেটির মা কিংবা বাবা বললেন, 'ঠিক আছে ও যাবে।' মনে মনে বললেন, 'লোকের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর মজাটা থাকুক। নষ্ট করে দেওয়া ঠিক নয়।' তবে ওই একসময়ে উৎসাহ নিয়ে যারা সমাজসেবা করতেন তাঁরা পরে পারিবারিক কারণে বা ব্যক্তিগত করুণ অভিজ্ঞতায় সরে গেছেন। ফলে এখন শববাহক এবং শবযাত্রী দুয়েরই অভাব হয় প্রায়ই। দিনে-রাতে আগের মতো শোনা যায় না শববাহকদের চিৎকার।

আগে দেখতাম মরদেহের পিছনে খই আর পয়সা ছড়াতে একজন আসছে। এই নিয়মটা শহরে আগে ছিল এখন কমেছে। পুরনো যুক্তি ছিল, বাড়ি থেকে শববাহকরা শ্মশানের উদ্দেশ্যে। বেরিয়ে পড়ার পর যাঁরা আসবেন তাঁরা যাতে পথ চিনে শবানুগামী হতে পারেন সেজন্যেই খই পয়সা দিয়ে চিহ্ন রাখা। খই উঠে যেতে পারে। পয়সা থাকবে। গ্রামের বনপথে ওই রীতির প্রয়োজন ছিল। কারণ সেখানে তো নির্দিষ্ট শ্মশান সবসময় ছিল না। থাকলে অন্যদের জানা থাকত না। কলকাতা শহরে তো নির্দিষ্ট শ্মশান। উত্তরে দুটো। দক্ষিণে দুটো। নিমতলা ঘাট, কাশীমিত্র ঘাট দুটোই পরিচিত জায়গা। নিমতলা আর কাশীমিত্র ঘাট যাওয়ার পথ সোজা। অসুবিধা হয় না শ্মশানে পৌঁছাতে। তবে একটু ভুলও হয়। কেউ হয়তো খবর শুনলেন মরদেহ নিয়ে নিমতলায় গেছে। সেখানে পৌঁছে দেখলেন খুব ভিড়। চেনাশোনা কেউ নেই। কাউকে জিগ্যেস করে, সদুত্তর পেলেন না। শেষে এক চায়ের দোকানকর্মী বলল, দেখুন কাশীমিত্র ঘাট। এখানে ভিড় দেখে ওদিকে চলে গেছে হয়তো। সেখানে ভিড় কম থাকে। তাই-ই দেখা গেলো। সেজন্যে খই পয়সা ছড়াবার দরকার নেই। গঙ্গার ধার দিয়ে দিব্যি আসা যায় নিমতলা ঘাট শেষে কাশীমিত্র ঘাট শ্মশানে। গা ছমছম করার মতো কিছু নেই। তবে কিছু মাতাল-টাতাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। সব শ্মশান মাত্রেই তো এখন মাতালদের আনাগোনা। মরদেহের সঙ্গে মদও বোধহয় জড়িয়ে থাকে। শ্মশানভূমিতে তারা বেশ দাপটে থাকে। মুখে মদের গন্ধ, কিন্তু বেচাল নেই। জানতে চাইলে অনেক কিছু বলে দেবে। সেজন্যে কিছু চাইবে না। চা খাওয়ান যদি খুশি হবে। কিংবা বলবে, চা-টা বলবে না। বুঝতেই তো পারছেন অন্য জিনিস এখন রয়েছে। শববাহক দলেও মদ্যসেবী থাকেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নিমতলা শ্মশানঘাটে পা রাখার জায়গা ছিল না। রবীন্দ্র পরিবারের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি মদ্যসেবন করে এমন অবস্থায় ছিলেন যে তাঁর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। এরকম অনেক ছবিই রয়েছে।

মৃতদেহ একই ভূমিকায় থাকলেও শব বহনকারীরা একরকম নন। নিমতলা ঘাট ও কাশী মিত্র ঘাটে অনেক সময় মহিলারা শব বহন করে আনেন। তাঁরা কারা। আমার আগে একটি

ঘটনার উল্লেখ করেছি সেটি একটি অতি দরিদ্র পরিবারের শ্মশানযাত্রার ছবি। আরেকটি চিত্র দেখা যায় সেখানে মহিলারা শব বহন করেন। কিংবা সঙ্গে থাকেন। শ্মশানে সব মানুষ সমান। সোনাগাছি রামবাগান এবং হাড়কাটা অঞ্চলের বারাঙ্গনাদের সংখ্যা কম নয়। বেশ কয়েক হাজার। সেখানে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক দুরকম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মৃতদেহ আসে। ওইসব নারীর স্বজন নেই। অন্যরা দাহ করে ফিরে যায়। যে চুল্লিতে একটু আগে ঢোকানো হয়েছে এক বারাঙ্গনার দেহ তিনি জীবনে কী কী করেছেন সে হিসেব কেউ করে না। সঙ্গে আসা মানুষরা অপেক্ষা করছেন দাহ শেষ হলে ভগ্নাবশেষ নিয়ে ফিরবেন। গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন। তারপরেই অপেক্ষা করছে এক বৃদ্ধার মরদেহ। যিনি ছিলেন ঘোরতর সংসারী সুখ শান্তিতে জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ করা এক নারী। তার শেষ যাত্রায় এসেছেন পুত্রকন্যা নাতি-নাতনি এবং আরও অনেকে। বারাঙ্গনার মৃতদেহ যে চুল্লিতে শুয়েছে, সেই চুল্লিতে শায়িত·হবেন তিনি। কোথাও বৈষম্য রাখেন না। নির্দিষ্ট অর্থ আর বৈধ কাগজপত্র দেখানোর পর অপেক্ষা। সেখানে কোনো বিচার নেই। চুল্লির আগুন যেন কোলে টেনে নেয় জাতধর্ম কুলশীল অগ্রাহ্য করে সব মানুষের প্রাণহীন শরীরকে। শব দাহ হয়ে যাওয়ার আগে এক অদ্ভুত সাম্য, অতুলনীয় শান্তি। একটু আধটু গোলমাল এলোমেলো দৃশ্য থাকলেও তা আমাদের চোখ মন সইয়ে নিয়েছে। শ্মশানভূমির সঙ্গে আসা আবেগ ব্যথা শোক যন্ত্রণা জড়িয়ে থাকে। তার বহিপ্রকাশ ঘটে নানাভাবে। শ্মশানচারী অভিজ্ঞ মানুষের মনে সেই আবেগ স্পর্শ করে কী? কে জানে! হয়তো কোনো বড় আঘাত পেয়েই কেউ বারবার শ্মশানের সান্নিধ্যে আসে শোকের বিচিত্র রূপ দেখে নিজের মনেরই গভীরের শোক লাঘব করতে চায়। পারে কী? না শোক আরও প্রবল হয়? শ্মশানের ধারে যে মানুষটি থাকে তার মনের কথা কে জানতে চেয়েছে? যে মানুষটি চুল্লি চালান তার মনের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় তা কী কখনও জানবার চেষ্টা করেছি? বড় ও ব্যস্ত শ্মশানের সঙ্গে অনেক স্মৃতি অনেক ঘটনা জড়ানো। মনে ভাসে অনেক ছবি, তারমধ্যে একটি। বহু বছরের জীবনসঙ্গিনীকে শেষ বিদায় জানিয়ে চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর বৃদ্ধ নাতিকে বললেন, 'আমাকে তোরা এখানেই আনিস'। একথা বলেছিলেন তিনি সকাল আটটায়। ওদিন রাত আটটায় তাঁর মৃতদেহ নিয়ে বাড়ির সবাই এসেছিল শ্মশানে।

❑ লেখক পরিচিতি : প্রাবন্ধিক, গবেষক, চিত্রকর,

শ্মশানের সন্তানেরা

রঙ্কু দাস

জীবনের আনাচে-কানাচে আমরা হাঁটাহাঁটি করি সর্বদা, কিন্তু যাদের কথা মাস দুয়েকের অনুসন্ধানের পর আজ লিখতে বসেছি তারা ঘুরে বেড়ায় মৃতদের আনাচে-কানাচে। কোন্ কোন্ সাহিত্যে এ পর্যন্ত ওরা ঠাঁই পেয়েছে বা কোন্ কোন্ সমালোচক ওদের নিয়ে ভেবেছেন--- আলোচনা করেছেন; এই মুহূর্তে সেইসব তথ্য আমার যেমন অজানা মনে হচ্ছে, তেমনই ওই জাতীয় তথ্যের কোনো প্রাসঙ্গিকতাও আমার কাছে নেই। বিশিষ্ট অধ্যাপক বন্ধুর অনুরোধের পর লিখতে গিয়ে অনেক বিষয় চিন্তাতে এসেছে। মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ স্পর্শ আমাদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে বলেই শ্মশান-গোরস্থান নিয়ে থিম্-এর অভাবও তেমন হয়নি। তবু সে সবের মধ্যে যে বিষয়টা মূল্যবান বলে মনে হয়েছে; তা একান্তই ভবঘুরে জীবনের বৃত্তান্ত। এই ভবঘুরেরা ঘুরে বেড়ায় শ্মশানে কিংবা গোরস্থানের জঙ্গলে জঙ্গলে। আসলে ওদের দেখতে দেখতে বারবার মনে হয়েছে ওরা ব্রাত্য, সমাজ অবহেলিত কিংবা মানুষের ভিড়ে ক্লান্ত। তাই ওদের নিয়ে আখ্যান।

নদীয়া জেলার 'শান্তিপুর পৌর মহাশ্মশান' আগে ছিল বর্তমান গঙ্গার প্রায় বুকে। গঙ্গা পাড় ভাঙতে ভাঙতে এখন অনেক এগিয়ে এসেছে। ফলে যে শ্মশান চরিত্রের কথা লিখতে চলেছি সে ভালোবাসত শ্মশানটাকে। দুটো বড় বড় বটগাছ ছিল গঙ্গার গায়ে, মাঝে ছিল দুটো পোড়া লোহার চুল্লি। চুল্লির সামনে একটা ভয়ংকর কালীমূর্তি ও তার মন্দির। মন্দির লাগোয়া একটা বড় ঘর। জানালা- দরজাহীন সেই ঘরে শ্মশানযাত্রীরা বসত, মদ খেত, কাঠ-কয়লা দিয়ে লিখত যা মনে আসে। যে সব ছেলেরা খুব পাকা তাদের ইস্কুলের কিংবা স্টেশনের বাথরুমে যেমন লেখা থাকে ঠিক সেরকম নয়। একজনের সঙ্গে আর একজনের প্লাস-মাইনাস সম্পর্ক, অথবা যিনি মারা গেলেন---গভীর আবেগে তাঁর নাম-ঠিকানা লিখে দিত শ্মশানযাত্রী ছেলেরা। রাম ওই লেখাগুলো কোনোদিন মুখস্থ করেনি। অথচ ওই ঘরটাই ছিল রাম অর্থাৎ রামচন্দ্র মণ্ডলের দিনে প্রায় ১৮ ঘণ্টার আস্তানা। সকাল ৭টা-৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত রামকে পাওয়া যায় শ্মশানে। ২৬-২৭ বছরের যুবক। গরমের দিনে অধিকাংশ সময় আদুল গা, লুঙ্গিটা ভাঁজ করা হাঁটু অবধি। দু-একদিন দুপুরে বাড়ি যায় দু-এক ঘণ্টার জন্য। ও স্নান করে শ্মশানের লাগোয়া গঙ্গায়, মাঝে মাঝে মাছ ধরে এর ওর ছিপ দিয়ে। শ্মশানে আড্ডা মারতে বা মদ খেতে আসে যে সব দলগুলো তাদের থেকে চেয়েচিন্তে খায়। কোনো স্বপ্ন নেই ওর, নিজেকে নিয়ে কল্পনাও নেই। মৃতদেহ সৎকার দেখে ওর কোনো ভ্রূক্ষেপ হয় না---একথা ও নিজেই জানিয়েছে। রাম অপেক্ষা করে চণ্ডী সাধুর, আর কোনো কোনো দিন মড়ার। চণ্ডীসাধু সন্ধ্যার আগে আগে আসে

শ্মশানে, দলবল নিয়ে। বেশ বড় কলকেতে গাঁজা খায়। রাম প্রসাদ পায়। কীসব আলোচনা হয় রাম সেসব বোঝেনি কোনোদিন, গাঁজা খেয়েছে আর গাঁজা চেয়ে রেখেছে পরের জন্য। মাঝে মাঝে সে নিজেও কিনে এনেছে; —এই তথ্য পেতেই ব্যাপারটা স্ট্রাইক করল মাথায়, শ্মশান ভবঘুরে রামের সোর্স অব্ ইনকাম কী? রামই জানিয়েছে : বাড়ি থেকে পয়সা নেওয়ার বা পাওয়ার কোনো উপায় ওর নেই। গঙ্গার চরে ওদের বাড়ি। বাড়িতে বাবা আছে, দুই মা আছে, আর আছে দুটো বোন, একটা ভাই। বাবা মাছ ধরে, ওর নিজের মা অসুস্থ, বাব্যার দ্বিতীয় পক্ষ 'সুতো করে'। সংসার চলে যায়। তবে রামের আয় সংসার থেকে নয়। মাঝে মাঝে শ্মশানযাত্রীদের ফরমায়েশ খেটে সে দু-পাঁচ টাকা রোজগার করে। ওর হাতখরচা চলে যায়। রামের কাছে গিয়ে বসলেও অবাক হয় না, প্রশ্ন করে না, পরিচয় জানতে চায় না, গল্প করে। মাথামুণ্ডু নেই সেসব গল্পের। দূরে যে চড়া উঠেছে তার গল্প, কালরাত্রের শ্মশানযাত্রীদের দৌরাত্ম্যের গল্প, চণ্ডীসাধুর ভরের গল্প—সব কেমন যেন মুখস্থের মতো বলে যায়। রামের মুখস্থ প্রত্যেক দিনের মড়ার সংখ্যা আর শ্মশান মস্তানদের নাম।

বর্তমান কালের মতো করে লিখলেও এ হল বছর চারেক আগের বাস্তব। আজ চিত্রটা কিছু কিছু বদলেছে। তবু সত্যিটা বদলায়নি। আগের শ্মশানটা গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার পর নতুন চক্চকে শ্মশানটাতে রাম এখনও থাকে দিবা-রাত্র। এখনও গাঁজা খায়, একে-ওকে বিক্রিও করে। মা মারা গেছে যেদিন সেদিনও সে শ্মশানেই ছিল। এখন স্থবিরতা বেড়েছে, শরীর জীর্ণ হয়েছে অনেক, দাড়ি-গোঁফ প্রায় কাটে না। বাড়িতে অর্থ দেয় না, তাই খেতেও পায় না। দূরের হোটেলে গিয়ে ধার-বাকিতে পেট চালায়। জীবনের মূল্যহীন মুহূর্তগুলো রাম কাটিয়ে চলেছে এইভাবেই।

বখ্তার ঘাট থেকে (বখ্তিয়ার খিলজি নোঙর করেছিলেন বলে কথিত) নৌকায় উঠলে ওপারে নামিয়ে দেয়। গঙ্গার পাড় ধরে কিছুক্ষণ হাঁটলে নির্জন চাষের খেতের পর একটা শ্মশান পড়ে। ফুলতলা, চরভাঙা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা মারা গেলে এই শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে আসে। এ পাশের লোকেরা শ্মশানটাকে 'মড়িঘাট' বলে। 'মড়িঘাট'-এর ঘাটটা ছোট, কিন্তু দু'পাশে বেশ বিস্তীর্ণ জমি, যেখানে চাষ আবাদও হয় না। ঘাট থেকে হাঁটা পথে মিনিট দুয়েকের দূরত্বে একটা চালা করা আছে। চারপাশে বাঁশের খুঁটি, উপরে খড়ের চালা, আর চালার মধ্যে একটা উঁচু বাঁশের মাচা; বেশ বড়, আট-দশজন অনায়াসে বসে আড্ডা দিতে পারে। চালাটা শ্মশানযাত্রীদের প্রয়োজনে করা হয়েছে বললে বিশ্বাস হবে না। ওটা মূলত লজেনের চালা। একটু ঢোঁক গিলতে হবে, লজেন! সেটা আবার কী!

লজেন প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক এক শ্মশান ভবঘুরে। মিশমিশে কালো শরীর, হাত-পায়ের নখ বড় বড়। দাঁতগুলো কেমন অদ্ভুত রকম ধারালো— যেন কাঁচা মাংস খায়। অনর্গল ইংরাজি বলে, সঠিক শুদ্ধ উচ্চারণ। বাংলা ব্যাকরণ, অঙ্ক, রসায়নে ওর বেশ নলেজ আছে। গায়ে ফাটা-ছেঁড়া কোঁচকানো জামা, পরনে নোংরা ফুল প্যান্ট, তাও বোতামহীন কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা।

ওর পুরো নাম জিজ্ঞাসা করেছি, উত্তর পাওয়া যায়নি। ও বলে ওর নাম লজেন, কিছু দূরের গ্রামের লোকগুলো ওকে লজেন বলেই চেনে। একবছরের বেশি সময় ধরে লজেন চালা ঘরটাতেই থাকে। সকাল-দুপুর-রাত সবসময়ই লজেন চালাঘরটাতেই বসে থাকে। চারপাশ খোলা মাচার উপর থেকে লজেন হয়তো পর্যবেক্ষণ করে আমাদের অদৃশ্য কোনো ভালোলাগার। দিনে একটা-দুটো মড়া আসে মড়িঘাটে। শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে লজেন গল্প করে। অদ্ভুত-অসম্ভব সে সব গল্প। কাল রাতে একটা কুকুর নাকি তাকে আক্রমণ করলে সে কুকুরটাকে আঁচড়ে দেয়, কামড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে; পালিয়ে যায় কুকুরটা। গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দুপুরবেলা খেতে চায় লজেন। প্রায় দিনই খেতে পায়। এছাড়া দু-একটা চায়ের দোকানে জল এনে দিলে মুড়ি পায়, বিস্কুট পায়—দু-এক কাপ চা পায় খেতে। বেঁচে থাকে, লজেন বেঁচে থাকে—মড়িঘাটে।

যে স্থান মৃত্যুর সঙ্গেই সম্পৃক্ত, সেখানেই জীবন কাটে লজেনের। সারাক্ষণ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে, নিজে নিজে বকে, গান গায়, বাবা-মা-বাড়ির নাম মনে করতে পারে না। মৃত্যু সম্পর্কে বা শ্মশান বৈরাগ্য সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ নেই ওর। এ বরং লজেনের নিশ্চিন্ত বাসস্থান। এই বাসস্থানে লজেন কবে, কোথা থেকে এল তার নির্দিষ্ট সাল-তারিখ-তথ্য যেমন আমাদের জানা নেই; তেমনই জানা নেই লজেনের চলে যাওয়ার দিন কবে। শুধু বিস্মিত হতে হয়—লজেনকে দেখে, আর বিস্মিত হতে হয় ওর নাম দেখে। কারণ ভালো ভালো লজেঞ্চুসের একটা নাম ও জানে নাও। জানে তৎসম শব্দের সংজ্ঞা। শেষ যেদিন ওর সাথে গল্প করি সেদিন ও আমাকে তৎসম শব্দের সংজ্ঞা বুঝিয়েছিল।

লজেনের মতো ঝরুপাগ্‌লাও মদ-গাঁজা কিছুই খায় না। হাতে একটা মোটা বাঁশের লাঠি আর কাঁধে এপাশ-ওপাশ ঝোলানো একটা পুরনো রঙচটা সাইডব্যাগ। কীসব থালা-বাটি থাকে ওই ঝোলার মধ্যে। কৃষ্ণনগর শহরের একদন প্রান্ত দেশে জাতীয় সড়কের প্রায় পাশেই একটা ছোট্ট শ্মশান রয়েছে। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, ভিতরে বাঁশঝাড়, দর্মা দেওয়া কালীমন্দির, পাশে সরু নদী (খোরে), আর মৃতদেহ সৎকারের গর্ত। সবটাই পুরোপুরি নির্জন। ঝরুকে লোকে কেন পাগল বলে আমি অনুসন্ধান করতে পারিনি। ওর চরিত্রের সব দিকই শ্মশান ভবঘুরের মতো, পাগলের মতো নয় অন্তত। বাঁশঝাড় তলায় বসে বসে ও ছোট ছোট নুড়ি ফেলে জলে। রাত কাটায় ওই শ্মশানেই। কিন্তু সকাল ন'টা-দশটা বাজতেই ও শ্মশানে থাকে না আর। রাস্তা দিয়ে লাঠি নিয়ে ব্যাগ কাঁধে হন্‌হনিয়ে হাঁটে। সময়ে কুকুর তাড়া করে, সময়ে রাস্তার ছোট ছোট বিচ্চু ছেলেগুলো ঝরুকে খেপায়; ঝরু লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। প্রশ্ন করলে ঝরু কোনো উত্তর দেয় না। কেমন যেন চুপচাপ। কোথায় যায় ঝরু? এই উত্তর জানতে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয় আমাকে।

শ্মশানটিতে শহুরে শব বেশি দাহ হয় না। নিতান্ত দরিদ্র কিংবা একটু দূরবর্তী গ্রামের শব ও শিশু মৃতদেহ পুঁততে আসা ছাড়া শ্মশানে ভিড় বলতে নেই। আশ্চর্য এটাই প্রতিদিন যে ১৬

থেকে ১৮ ঘণ্টা ঝরু শ্মশানে থাকে, তার মধ্যে সে আগত শ্মশানযাত্রীদের খোঁজখবর করে। তাদের বাড়ি-ঠিকানা জেনে নেয়। তারপর অনাহূতের মতো—তাদের শ্রাদ্ধের বাড়িতে আনুমানিক দিনক্ষণ দেখে হন্‌হন্‌ করে পৌঁছে যায়। সারাদিন কাজ করে দেয়, ভোজবাড়ির পাতা ফেলে, দুটো পেট ভরে খায়, দুটো ভাত-ডাল ঝোলার মধ্যে পুরে নেয়, শ্মশানে ফিরে আসে। মা-বাপ-ভাই-বোন কেউ নেই ঝরুর। নেই কোনো অর্থের সংস্থান। শ্মশানে বসে থাকা ওর কাজ, আর কাজ মৃতের বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে সময়মতো সেখানে গিয়ে অধিক শ্রমের পরিবর্তে অল্প খাদ্য নেওয়া। কবে থেকে এই অদ্ভুত পেশায় আক্রান্ত ঝরু? উত্তর মেলে অনেক দিন। বাহান্ন বছর বয়স্ক ঝরু ভুলে গেছে—কবে থেকে সে এভাবে দিন কাটাচ্ছে। ডান গালে একটা ঘা হয়েছে, একটা কষের দাঁত দেখা যায় সেখান দিয়ে, কথা বললে মুখ দিয়ে থুথু ছিটকে আসে। আর দিনের পর দিন শ্মশান ভবঘুরে ঝরু এইভাবেই বেঁচে থাকে।

বেঁচে থাকার পদ্ধতিটা একটু অন্যরকম বুড়োর। বুড়ো মানে শ্মশান বুড়ো, আসল নাম বুদ্ধদেব সরকার। বুদ্ধ বলে ওরা ডোম, মড়াপোড়ানো ওদের প্রাচীন পেশা। যুগ পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে জীবিকাও বদলেছে। ওর এক দাদার চালের দোকান, বাবা বাজারে ফল বিক্রি করে। ছোটবেলা থেকেই বুদ্ধ একরোখা, পড়াশুনো ওর ভালো লাগত না। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় বাবার বকুনিতে সে প্রথমবার পালিয়ে আসে শ্মশানের দিকে। কালনার (বর্ধমান জেলা) শ্মশানটার মধ্যে ঠিক অন্যপ্রান্তীয় ভয়ংকরতা নেই। সবসময়ই শ্মশানের পাশ দিয়ে খেয়াঘাটের রাস্তায় শ'য়ে শ'য়ে লোক-যাতায়াত করে। শ্মশানটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা অনেকটা জায়গা নিয়ে। পরপর সাজানো অনেকগুলো চুল্লি, একপাশে উঁচু করে সাজানো মড়ার ঘাট, আর অন্যদিকে কাঠকয়লার স্তূপ। বিকেল হয় হয় এরকম একটা সময় শ্মশানের তারণ চৌধুরী (ঘাট জমা নিয়েছে যারা, তাদের একজন) জিজ্ঞাসা করে 'কীরে তুই কে? এখানে বসে কেন?' বুদ্ধ উত্তর দেয় 'বুদ্ধদেব সরকার'। তারণ হা হো করে হাসে, বলে—'ওঃ বুদো!' এরপর কখন-কবে বুদ্ধদেব বুদো থেকে বুড়ো হয়ে গেছে, তার কোনো হিসেব পরিসংখ্যান নেই।

সেই শুরু, তারপর বয়স যত বেড়েছে বুড়োর শ্মশানের প্রতি আগ্রহও বেড়েছে। সাংসারিক জীবনের কলহ, বাবা-দাদার ব্যবসা সংক্রান্ত গোলযোগ, বাড়ির অবহেলা সবকিছুকে মাথায় নিয়ে বুড়ো হয়ে গেছে শ্মশান ফুলটাইমার। বলতে গেলে বছর দুয়েক ২৪ ঘণ্টা করেই ডিউটি দিয়েছে শ্মশানে। যে সময় পরিচয় বেড়েছে, মদ-গাঁজা খেতে শিখেছে তখন থেকেই বুড়ো জেনেছে এই শ্মশানটার ভিতর আর একটা অন্য শ্মশান রয়েছে। এখন সে ২৮ বছরের সক্ষম যুবক। শ্মশানে কাটে দিনরাতের প্রায় ১২-১৩ ঘণ্টা। এবারে মড়ার কাঠকয়লাগুলোর 'লিজ' নিয়েছে বুড়ো। একবছরের চুক্তি, বেশ মোটা টাকা লেগেছে, আমদানিও আছে ভালো। এছাড়া কয়লা ধুয়ে ফ্রেস করার কাজ বুড়ো নিজে করে না, দুজনে লোক লাগাতে হয়, তাদের কিছু কিছু টাকা দিলে তারাই করে দেয়।

এটা ভাবলে অবশ্যই ভুল হবে, বুড়োর শ্মশানে আসাটা শুধু পেশার কারণে। বুড়োর

কথায়—'এখন শ্মশান আমার পেট চালায়, তবুও শ্মশান টানে—একবার না আসলে ভালো লাগে না কিছুই'; আসলে বুড়োও এক প্রকৃতির শ্মশান ভবঘুরে। যদিও ও অনেকবেশি স্বাভাবিক, মানসিকভাবে সুস্থ ও উপার্জনশীল। তার কাজ মৃতদেহ পুড়ে যাবার পর জল ঢালা হয়ে গেলে জগু ও হরেনকে বলে কয়লাগুলো বাছাই করে গাদায় ফেলা। আর মদপার্টির সঙ্গে মদ খাওয়া, পাল্লায় পড়ে গাঁজা খাওয়া ও শ্মশানের উটকো ঝামেলা-অশস্তির প্রত্যেক দ্রষ্টা হওয়া। বুড়োর স্বপ্ন এরকমই কাটুক ওর আগামী দিনগুলো।

বড় অদ্ভুত। ঝরু, রাম, লজেন বা বুড়োরা এই রকমভাবে বাঁচতে চায় কেন? কেন প্রায় এরকম শ্মশান ভবঘুরের মতো বাঁচে হরিপুরের 'ব্রহ্ম শাসন' ছাড়িয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে নতুন গজিয়ে ওঠা শ্মশানের ষষ্ঠী, কিংবা চূর্ণির ধারে কালীনারায়ণপুরে ট্রেন থেকে গার্জেনের মতো দেখাতে শ্মশানটার হরি (হরিশচন্দ্র দাস)। হয়তো সামাজিক একটা অবহেলা আছে, পারিবারিক অনটন আছে, মানসিক বিকারও থাকতে পারে। হয়তো এরা উভচর সম্প্রদায়। তাই জীবনের স্বীকৃতি নিয়ে এরা বেঁচে থাকে মৃত্যুর প্রাঙ্গণে। আসলে শ্মশান ওদের ভালো লাগে। ভালো লাগার পিছনে একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা কিংবা জীবন প্রবাহের বাইরে এসে পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করা—এইসব কিছুই কারণ হতে পারে। হতে পারে ওরা কেউ কেউ নেশায় আসক্ত। তবু দলাদলি, মারামারি, খুন-জখম এরা কেউ করে না। শ্মশানকে ভালোবেসেই ওরা শ্মশান ভবঘুরে হয়েছে। ভাবলে অবাক হতে হয় দেশের প্রান্তে প্রান্তে এরকম কত ভবঘুরেই না বেঁচে রয়েছে। অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক চুল্লির সাজানো-গোছানো শ্মশানগুলোতে হয়তো ভবঘুরেদেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তবু ওরা চারিত্রিকভাবে এরকমই। এই মুহূর্তে সমগ্র রাজ্যে বা সারা ভারতবর্ষে ওদের পরিসংখ্যান তৈরি করা একটা বড় গবেষণার কাজ হতে পারে। সংখ্যাটা জানলে অন্তত বোঝা যাবে একটা অবহেলিত, প্রায় সমাজ বহির্ভূত সম্প্রদায়ের শ্রেণি পরিচয়। যে শ্রেণি বা সম্প্রদায় কোনদিন শ্রেণিবদ্ধ আন্দোলন করবে না, দাবি করবে না জীবনের মৌল উপাদানের। মৃতের আস্তানায় প্রায় মৃতদের মতোই ওরা জীবন কাটিয়ে দেবে। তবু আজ ওরা সাহিত্যের সম্পদ হতে পারে, এক নিবিড় সমালোচনার বিষয় হতে পারে। মনোবিজ্ঞানীয় গবেষণার জন্য ওরা হতে পারে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানসিক রোগী।

যে ভবঘুরে সম্প্রদায়ের স্বভাবধর্মী কিছুটা আছে নীলুর মধ্যে। ছেলেবেলায় স্কুল পালিয়ে নীলু গোরস্থানে যেত। স্কুল থেকে হাঁটা পথে আধঘণ্টারও বেশি। জনবসতি সেখানে শেষ। ধু-ধু বিস্তীর্ণ একটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। মাঝে মাঝে দু-একটা কাঁটা গাছ, ঝোপঝাড়। ক্লাস সেভেনের একটা অশান্ত ছেলে দু-একজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে গোরস্থান চষে বেড়াত সারাটা দুপুর। কাঁধে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে উঁকি দিত বসে যাওয়া গর্তের দিকে। মড়ার খুলি দেখতে পেত, বুকের পাঁজরগুলো দেখতে পেত। চরম কৌতূহল নিয়ে মাঝে মাঝে মাটির ঢেলা কুড়োত। মৃতের ফলক পড়ে হিসেব করে দেখত, কে কত বছর বয়সে মারা গেছে। ফেরার সময় হাতে থাকত বুনো ফুলের থোকা। এইভাবেই কেটেছে তিন-চারটে বছর। নীলু যখন এগারো ক্লাসে, সে সময়

বনবিভাগ থেকে সারা গোরস্থানে গাছ লাগানো হয়েছে। বছর দুয়েকের মধ্যেই প্রায় একশো বিঘা ধু-ধু জমি জঙ্গল হয়ে উঠেছে। তারপরও নীলু গেছে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে কোন কোন বিকেলে পৌঁছে গেছে গোরস্থানের ওপারে, ফিরেছে ঘুর পথে। কোনো কোনো সন্ধ্যাবেলা গোরস্থানে ঢোকার মুখে ভাঙা নির্জন ঘরে একা বসে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জীবনের ভালোলাগা-ভালো না লাগা বহু মুহূর্তে নীলু ছুটে গেছে গোরস্থানের বুকে। হয়তো গোরস্থানে কোনো নিষেধ ছিল না, হয়তো গোরস্থানে একটু জোরে গান গাইলে কেউ টিপ্পনী কাটত না, হয়তো গোরস্থানে কাঁদা যেত মন খুলে, চিন্তাভাবনা করা যেত প্ল্যানচেট নিয়ে। এই গোরস্থান নীলুর কাছে এক অন্য অনুভূতি, এক অন্য জগতের সন্ধান এনে দিয়েছে জীবনের দশ-এগারোটা বছর। এই প্রবন্ধ লেখার আগে যখন গোরস্থান গেলাম, সে সুখ পাইনি। তিন-চার বছর আগের গোরস্থান—ভবঘুরে নীলুর সেই গোরস্থান এখন আর নেই। তখন গোরস্থান ছিল শান্তিপুর শহরের উপান্তে। আর এখন ক্রমশ শহর গোরস্থানকে গ্রাস করছে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেক কলোনি হয়েছে, বিদ্যুতের খুঁটি বসেছে রাস্তা জুড়ে, সর্বদা যাতায়াত করছে অজস্র মানুষ। তবু একটু জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মাথার মধ্যে তখন একটাই চিন্তা : গোরস্থান ভবঘুরের এই আংশিক জীবনে কেন এসেছিল তার? উৎস কোথায় এই ভবঘুরে জীবনের? কেন শ্মশান-ভবঘুরে হয়েই বেঁচে থাকে বুড়ো, লজেন কিংবা ষষ্ঠী, হরিশচন্দ্ররা? উত্তর হতে পারে এটাই—

"বনের পাতার মত কুয়াশার হলুদ না হতে,
হেমন্ত আসার আগে হিম হয়ে পড়ে গেছি ঝ'রে!
তোমার বুকের 'পরে মুখ আমি চেয়েছি লুকোতে;
তোমার দুইটি চোখ প্রিয়ার চোখের মত ক'রে
দেখিতে চেয়েছি, মৃত্যু-পথ ঢের দূরে স'রে
প্রেমের মতন হয়ে! —তুমি হবে শান্তির মতন!
তারপর স'রে যাব, —তারপর তুমি যাবে মরে,
অধীর বাতাস লয়ে কাঁপুক না পৃথিবীর বন!
মৃত্যুর মতন তবু বুজে যাক,—ঘুমাক মৃত্যুর মত মন!"

('জীবন'/'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—জীবনানন্দ দাশ)

❑ লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক, ঝাড়গ্রাম কলেজ, প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

শ্মশান পাঁচালি

সুদীপ চক্রবর্তী

লস এ্যাঞ্জেলেসের একটা বিখ্যাত অডিটোরিয়াম, সেখান স্টেজশো করছে Korn, কি গাইছে? না ডুম মেটাল। শুধু লস এ্যাঞ্জেলেস কিংবা ক্যালিফোর্নিয়া নয় এখন সমগ্র পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশাল বাজার ডুমমেটাল আর ডেড মেটালের অর্থাৎ 'নরক যন্ত্রণা' ও 'মৃতদেহ গানে'। গায়ক গাইতে গাইতে ব্লেড দিয়ে চিরে ফেলেন হাত, আর সেই শরীরী ক্ষতের শাব্দিক যন্ত্রণার আওয়াজ মাইক্রোফোন আর বক্সের মাধ্যমে সোজা পৌঁছে যায় দর্শকদের কাছে, তাতেই দর্শকদের এন্টারটেনমেন্ট। ভোকাল, গিটারিস্ট, ড্রামার সবার মুখে চোখেই ভূত সাজার মেক আপ। শব্দে ও সমস্ত পরিবেশে অশরীরী স্পর্শ। যা দেখে দর্শকদের রোমাঞ্চে লোম থেকে কান পর্যন্ত খাড়া হয়ে যায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি বসবাসের জন্য বাড়ি ঘরের থেকে কবরস্থানকে ভীষণ পছন্দ করে। একটু ছোট ছিলাম যখন তখন 'গুপি, বাঘা'কে দেখে বেশ কিছুদিন ভাবতাম একদিন হয়তো আমিও ভূতের রাজার দেখা পাবো। আর আদায় করে নেবো তিনটি মৌলিক অধিকার। যে কোনও কারণে হোক সেই ভূত চর্চায় আমি সফল হইনি। এখন মনে হয় চর্চায় সফল না হয়ে ভালোই হয়েছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এখন থেকে সমস্ত অলৌকিক ভূতের গল্প সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছে। আসলে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর আলোকিত সভ্যতায় ভূতেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই ভূত কালচার চর্চা আর বিশেষ হয় না নাগরিক সভ্যতায়। তবে নবদ্বীপের মায়াপুর যাবার আগে নীদয়া বলে একটা গ্রাম আছে, সেখানকার কৃষক মুসলমান সম্প্রদায় 'জরি গান' বলে একরকম শোক সঙ্গীত গায়। কারবালার মরুপ্রান্তরে হননের ইতিহাস আর লিরিক, সেখানে ভয়ের কিছু নেই। এতটা লেখার পরেই মাথায় গাঁট্টা খেলাম। ও আপনাদের বলা হয়নি, আমার প্রপিতামহ ভূত হয়েছেন কিন্তু বাস্তুভিটার মায়া আর আমার প্রতি কর্তব্যের খাতিরে এখান থেকে যান নি। তাই যখনই আমি বিপথে যাই, উল্টোপাল্টা লিখি উনি আমার মাথার উপর অঙ্কের মাস্টার গুঁথুবাবুর মতো ৫২ কেজি ওজনের গাঁট্টা মারেন। গাঁট্টা খেয়ে আবার আমি সোজাপথে চলতে থাকি।

পূর্বপুরুষের এই গাঁট্টার ভয়ে এখন আমি তাই শ্মশান পরিচিতি দিতে বাধ্য।

নদিয়া জেলার যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ শ্মশান আছে তার মধ্যে নবদ্বীপ অন্যতম। কি কারণে? এক চান্সে বলতে না পারলে ছেড়ে দিন কারণ আমার প্রপিতামহ কিন্তু বেশি ধানাইপানাই পছন্দ করেন না। আসলে স্বাধীনতার আগের মানুষ তো। সোজা সাপটা কথা না বললে আপনারাও আমার মতো মোটা উলের টুপি ব্যবহার করুন, নচেৎ গাঁট্টা। যাই হোক নবদ্বীপ শ্মশান কেবলমাত্র চৈতন্যের জন্য বিখ্যাত নয়, আমাদের নদিয়ার মধ্যে একমাত্র ইলেকট্রিকে

মানুষ পোড়ানো হয় ওখানে। ফলে কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাট প্রভৃতি শহর থেকেও লাশ ওখানে চলে যায় উন্নত সভ্যতার উন্নত প্রযুক্তির লোভে। তাই চা, বিস্কুট, কচুরির ওখানে বেশ রমরমে ব্যবসা। দেখেছেন আবার উল্টোপাল্টা বকছি, এই জন্যই তো গাঁট্টা খাই। আচ্ছা বলুন তো শ্মশানের ঠেক চলে মূলত কাকে কেন্দ্র করে? বলতে পারলে আপনার মৃত্যুর পর সৎকারের দায়িত্ব আমার। আমার ঠিকানা ১/২ ফসফস কলোনি। আসলে নিমতলা, কেওড়াতলা আর শাঁখচুন্নীতলা যে তলাতেই হোক না কেন, সব শ্মশানেরই একমাত্র অপরিহার্য অঙ্গ শ্মশানকালী। তাই শ্মশান কেনার সময় কালী মন্দির দেখে কিনবেন। বছরে একবার শ্মশানের টেন্ডার জমা দিতে হয়। ইলেকট্রিক ছাড়া চুল্লি দেওয়া শ্মশান বিক্রি হয় ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজারের মধ্যে। ইলেকট্রিক চুল্লি একটু বেশি। সবসময় মানুষ একহারে মারা যায় না, ফলে লাভের অঙ্কটাও সর্বত্র এক নয়। সারা শান্তিপুর শহরে প্রতিদিন হয়তো ছটা দেহ লাশ হয়। তার মধ্যে একটা বা দুটো পাশ হয়ে যায় নবদ্বীপের শ্মশানে, বাকি পাঁচটি সাধারণত পাওয়া যায় গড়ে প্রত্যেকদিনই এইরকমই বক্তব্য শান্তিপুর শ্মশানের ভারপ্রাপ্ত ডোমের। তবে মরা পুড়ুক না পুড়ুক, চুল্লি দিয়ে ধোঁয়া উঠুক না উঠুক। সকাল, বিকেল, রাত্রি সব সময়েই সব শ্মশানে ঠেক কিন্তু চালু থাকে। আর গাঁজার ধোঁয়া উড়ে প্রায় সব সময়েই এই ঠেকের পার্টনাররা কেউ পাশের পাড়ার সাইকেল সারাবার দোকানদার তো কেউ চাষি, কেউ আবার ছাত্র, কেউ নেশাখোর ভবঘুরে। তবে এক বিষয়ে এদের সবার অভিমত এক যে শ্মশানের ঠেকের একটা আলাদা টান আছে। এদের মধ্যে কেউ সুন্দর বাউল গান গায়, কেউ বাজায় সুন্দর বাঁশি। আমি একটা রিক্সাওয়ালাকে চিনতাম যে সারাদিন রিক্সা চালাবার পর রাত্রিবেলায় এক ছিলিম তামাক (গাঁজা) খেয়ে ভোররাত্রি অবধি বাঁশি বাজায়। তবে এইরকম মন্দিরওয়ালা, কনস্ট্রাকশন করে দেওয়া শ্মশানের সংখ্যা নদিয়াতে হাতে গোনা চারটি কি পাঁচটি। গ্রামের দিকে গঙ্গার পাড়ে পোড়ো জমিতে মানুষ কাঠ সাজিয়ে মড়া পোড়ায়। এবং না পোড়া দেহের অংশ ভাসিয়ে দেয় গঙ্গায়।

শ্মশান যে শুধু মানুষের অন্তিম মুহূর্তের স্থান তা নয়। তা একটা বাণিজ্য কেন্দ্রও বটে। ছোটখাটো একটা শ্মশানকে কেন্দ্র করে চার, পাঁচটা পরিবারের পেট চলে। প্রধানত কি কি ব্যবসা তার একটা লিস্ট করে দেওয়া যায়। যেমন—

মৃতের খাটের ব্যবসা।

চাদর, কাপড়, গয়না ইত্যাদি মৃতের ব্যবহৃত বস্তুর ব্যবসা।

কাঠ, কয়লার ব্যবসা। ছোট শ্মশানেও একবছরে ৮ হাজার টাকার বিক্রি হয়।

এছাড়াও শ্মশান বাণিজ্যে কিন্তু লক্ষ্মী বেশ ভালো সদয়, হিন্দু মৃতদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় দশভূজার মতো দশকর্মাও। প্রয়োজন ফুলেরও।

লাশ প্রধানত দু ধরনের, যথা—

১) ওয়ারিশন থাকা লাশ। (২) বেওয়ারিশ লাশ।

বেওয়ারিশ লাশের গল্পটা পরে বলতে হবে দাদুর হুকুম। একে অপঘাতে মৃত্যু তার উপর আবার বেওয়ারিশ লাশ। ওয়ারিশন থাকা লাশের পরিজনবর্গের শোকে শিয়াল কুকুরও কাঁদে। হ্যাঁ সত্যি, প্রায় খান সত্তর লোক নিয়ে একটি বিশাল মিছিল যায় মড়া পোড়াতে। এদের মধ্যে বাংলা মদ আর গাঁজার চাষও ব্যাপক। মদ আর গাঁজার পিকনিকের পাশাপাশি কমার্সিয়াল ব্রেকে মড়ার মাথা ফাটানোও চলে। এরপর যখন লাশ ছাই হয়,' ফেরার পথে গঙ্গাস্নান আর কচুরি ভোজ তো আছেই।

শ্মশানের আরও অনেক বিষয় আছে, যা দিয়ে প্রায় পৃথক একটা গবেষণামূলক কাজ করা সম্ভব। কিন্তু আমার স্বল্প পরিসর পাঁচালিতে সব বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবু আলোচনার ইতি টানার আগে হঠাৎ করেই মনে পড়লো আমাদের বাংলা সাহিত্যের ডোমদের কথা। মনে পড়লো 'অন্তর্জলি যাত্রা'র সেই বৈজু ডোমকে। প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়লো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসের চন্দ্রনাথকে। যে শ্মশানে দাঁড়িয়ে শেলীর কবিতা বলে। বিশেষভাবে মনের মণিকোঠায় আজও জীবিত আছে তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের নিতাই ডোম ওরফে নিতাই কবিয়াল।



যমালয়ে বিবিধ ভয়াবহ শাস্তির পটচিত্র।

❑ লেখক পরিচিতি—প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, কালান্তর পত্রিকা।

শ্মশানে শবসাধনা

নবকুমার ভট্টাচার্য

তন্ত্র সাধনার একটি প্রখ্যাত সাধনা শবসাধনা। শবসাধনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একটা ভাসা ভাসা ধারণা রয়েছে কারণ বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের কল্যাণে বাঙালি শিক্ষিত মহলেও এই সাধনা একরকম পরিচিতি।

স্মার্তগ্রন্থে বলা হয়েছে মানুষের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হলে, "*কৃত্বাতু দুস্কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যু কালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্। ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্। দহেদং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছুত।*" এই মন্ত্রে চিতাস্থ শবদেহ ৭ বা ৩ বার প্রদক্ষিণ করে স্বয়ং দক্ষিণমুখ হয়ে শবমুখে অগ্নি প্রদান করবেন। পঞ্চত্বপ্রাপ্তি শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হল পঞ্চত্বকে প্রাপ্ত। পঞ্চত্ব বলতে বোঝায় পঞ্চভূতে পরিণতি। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনমতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের সমবায়ে দেহ নির্মিত। যখন দেহের সেই পঞ্চভূত বিশ্লিষ্ট হয় তখনই জীব পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মরে যায়। পঞ্চত্ব প্রাপ্ত দেহকেই শব বলে।

শাস্ত্রমতে শবসাধনার প্রারম্ভেই সাধনার স্থান ও কাল নির্বাচন করা আবশ্যক। 'ভাব চূড়ামণি'গ্রন্থে বিধান দেওয়া হয়েছে—শূন্যাগারে, নির্জন নদীতীরে, পর্বতে, বিল্বমূলে শ্মশানে শবসাধনা করতে হবে। *শ্যামারহস্য* গ্রন্থে ওই একই কথা বলা হয়েছে তবে মহাশ্মশানে শবসাধনা প্রশস্ত বলা হয়েছে। কিন্তু *কৌলাবলী নির্ণয়* গ্রন্থে শ্মশানেই শবসাধনার কথা বলা হয়েছে। কারণ শ্মশানে কালী বিরাজিতা এবং শিবাবলি দেবার উপযুক্ত স্থান। তন্ত্রসারে বলা হয়েছে — গাঢ় অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ যে কালী সর্বদা শ্মশানে বাস করেন তিনি শ্মশানেকালী। এই দেবীর আরাধনা শ্মশানেই করতে হয় আর কুলচূড়ামণিগ্রন্থে কথিত রয়েছে সাধক সন্ধ্যাকালে শ্মশানে গিয়ে "কালি। কালি।" এই বলে ডেকে মাংস প্রধান নৈবেদ্য নিবেদন করলে শিবারূপিণী উমা পরিবারগণের সঙ্গে পশুরূপ ধারণপূর্বক তথায় আসেন এবং তা ভোজন করেন। *হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে* ও (১/১৬/২১) আছে শিবাকে (শৃগালীকে) উদ্দেশ্য করে মন্ত্র পড়ে তার পুজো করার বিধান। এই শিবাপূজাই তন্ত্রশাস্ত্রে শিবারূপ কল্পনার এবং বিবিধতান্ত্রিক ক্রিয়ার 'শিবাবলি' দেবার বিধানের মূল। অন্যান্য তন্ত্রগ্রন্থেও শ্মশানে শবসাধনার কথা বলা হয়েছে এবং তা মহাফলদায়ক। কৃষ্ণপক্ষ এবং শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী যদি মঙ্গলবারে পড়ে তা হলে সেই মঙ্গলবার রাত্রিতে শবসাধনা করলে উত্তম সিদ্ধিলাভ হয়।

শবসাধনায় কতকগুলি শিব যেমন শাস্ত্রমতে প্রশস্ত তেমনি কতকগুলি শব নিষিদ্ধ। *পুরশ্চর্যার্ণব* গ্রন্থের *বীরতন্ত্র বচনে* বলা হয়েছে—লাঠির আঘাতে, শূলবিদ্ধ, খড়্গাঘাতে, জলমগ্ন হয়ে মৃত, রজ্জুবদ্ধ, সর্প দংশনে মৃত বা সম্মুখ সমরে নিহত তরুণ বীরের শব প্রশস্ত। কিন্তু স্বেচ্ছামৃত, বৃদ্ধা, স্ত্রীলোক, দ্বিজ, অন্নাভাবে মৃত, কুষ্ঠরোগে মৃত, দু-বছর বয়সের মৃত শিশু, সাত

রাতের আগে মৃত এই আট প্রকারের শব বর্জন করতে বলা হয়েছে। শবসাধনা সবাই করতে পারে না। এ সম্পর্কে শাস্ত্রের অভিমত. পুরশ্চরণ সম্পন্ন যে বীর সাধক স্ত্রী পুত্রাদির স্নেহে আসক্ত নন এবং ধনলোভ ও মোহ যার নেই তিনি এই বীর সিদ্ধপ্রদ সাধনার অধিকারী। কুলার্ণবতন্ত্রের বীরের ব্যাখ্যা করা হয়ে যেভাবে—রাগ মদ ক্লেশ কোপ মাৎসর্য এবং মোহবীত অর্থাৎ অপগত হওয়ার জন্য এবং রজঃ তমঃ বিদূরিত হওয়ার জন্য সাধককে বীর বলা হয়। তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে বীরশব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কৌলমার্গ-রহস্যে বলা হয়েছে—যে মানব অদ্বৈতজ্ঞান রূপ অমৃত হ্রদের কণিকামাত্র আস্বাদন পেয়ে, বীরের মতো অবিদ্যার রজ্জুচ্ছেদনে কৃতপ্রযত্ন হয়ে অমৃতের সন্ধানে ধাবিত হতে চায় তার নাম বীর। বীর সাধক অদ্বৈতভাবের সাধক। পরশুরাম কল্পসূত্রের বৃত্তিতে উদ্ধৃত হয়েছে—যিনি প্রতিযোগী ইদং পদার্থকে অহং পদার্থে বিলীন করতে পেরেছেন, যার চিত্ত স্বাত্মানন্দে নিমগ্ন, তাঁর নাম বীর। বীরের মূর্তি সর্বদা তপঃ পরায়ণ। তাঁর আলম্বিত কেশজাল অসংস্কৃত। রুদ্রাক্ষমালা সে ধারণ করবে। কৌপীনধারী হবে। সে অঙ্গে ভস্ম এবং রক্তচন্দন মাখবে। সর্বদা ক্ষমাশীল হবে। দান, ধ্যান তপস্যা করবে। 'কামাখ্যাতন্ত্রে' বলা হয়েছে—বীর সাধক নির্ভয়, অভয়দানকারী, গুরুভক্তিপরায়ণ, বলবান, যুদ্ধ, মহাযোগী, মহোৎসাহী, মহাবুদ্ধি, মহাসাহসী হবে। তাঁর অঙ্গ রক্তচন্দনলিপ্ত, তিনি রক্তকৌপীনধারী। উদারচিত্ত বীর সাধক সর্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপর কিন্তু তাঁর গুহ্য সাধনা কুলাচারের। কুলমার্গে তিনি মহাপণ্ডিত, কুলসঙ্কেতবেত্তা এবং কুলশাস্ত্রবিশারদ। কুলরত্নাবলিতে দিব্যসাধক এবং বীরসাধক প্রত্যেকের বামাচারী এবং কুলাচারী এই দুই শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে।

তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, বীরের সাধনামাত্রই শীঘ্র ফলপ্রদ। যোগিনী হৃদয়ে উল্লেখ করা হয়েছে—বীরসাধনা ছাড়া শীঘ্র সিদ্ধিকর আর কিছুই নাই। এ ধরণের তন্ত্রবাক্য বহু রয়েছে। যেমন 'কৌলাবলী নির্ণয়' গ্রন্থে পাওয়া যায়—বীর সাধনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং শীঘ্র সিদ্ধিদায়ক আর কিছু হতে পারে না। কলিযুগে বীরসাধনায় একদিন রাত্রিতে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। তবে তন্ত্রশাস্ত্রমতে বীরের সাধনা গুহ্য সাধনা। এই সাধনায় মন্ত্র যন্ত্র পুজো প্রভৃতি সব ব্যাপারেই গূঢ় সঙ্কেত রয়েছে। একমাত্র সদ্গুরু মুখেই এসব সঙ্কেতের অর্থ অবগত হওয়া যায়। সেজন্য নিরুত্তরতন্ত্রে বলা হয়েছে—ক্রমসঙ্কেত, পুজো সঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত এবং মন্ত্র ও যন্ত্রের লিখন সঙ্কেত গুরু পরম্পরায় জানতে হবে। যে বীর সঙ্কেতজ্ঞ নয় তার পুজো নিষ্ফল তো হবেই বরং পদে পদে তার বিপদ ঘটবে। সেজন্য এইসব সাধকের পালনীয় নানা বিধিনিষেধ তন্ত্রে-নির্দিষ্ট রয়েছে। দেবীমন্ত্রের সাধক সম্বন্ধে গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে, দম্ভ, মোহ, নিদ্রা, আলস্য বাহ্যচিন্তা কামক্রোধ লোভ হিংসা ও মাৎসর্য বর্জন করতে হবে। প্রখ্যাত তন্ত্র বিশারদ ভাস্কররায়ের শিষ্য উমানন্দ নাথ তাঁর 'নিত্যোৎসব' গ্রন্থে উপাসক ধর্ম ও সাধকের পালনীয় বিধিনিষেধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে, সাধক অন্য দর্শন ও ধর্মের নিন্দা কখনোই করবেন না। নিজের উপাস্য ভিন্ন অন্য দেবতার সম্বন্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বুদ্ধি থাকবে না।

কেবল সৎ শিষ্যের নিকটই সাধনরহস্য প্রকাশ করবেন।

শবসাধনা বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। তন্ত্রে এসব দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হয়েছে। কৌলাবলী নির্ণয় অনুসারে শবসাধনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হল—মৎস্যমাংসযুক্ত অন্ন গুড় ছাগ পিষ্টক পায়সান্ন সুরা মাষকলাই মিশ্রিত অন্ন তিল কুশ শ্বেত সরিসা দীপ ধূপ এলাচ লবঙ্গ কর্পূর খয়ের আদা তাম্বুল পট্টসূত্র মৃগচর্ম কম্বল প্রাদেশ প্রমাণ যজ্ঞকাষ্ঠ পঞ্চগব্য আর স্বকল্পোক্ত পুজোর দ্রব্য। এখানে একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা প্রয়োজন, শবসাধনেচ্ছু সাধককে ভোজন করে তবেই সাধনার স্থানে যেতে হবে। সাধনস্থানে উপস্থিত হবার পর সাধককে তন্ত্রসম্মত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে হয়। যেমন— যাগভূমিপ্রোক্ষণ, গুরু গণেশ বটুক যোগিনী মাতৃকা প্রভৃতির পুজো, সাধনাস্থানে উপস্থিত দেবতা রাক্ষস-পিশাচ সিদ্ধযক্ষ গন্ধর্ব ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যথাবিধি পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান, শ্মশানাধিপতি ভৈরব, কালভৈরব এবং মহাকালের কাছে বলিদান, অঘোর মন্ত্র বা সুদর্শন মন্ত্রে রক্ষাবিধান ও জয়দুর্গামন্ত্র উচ্চারণ করে দশদিকে শ্বেতসরিসা বিকীরণের পর কাজ করতে হবে।

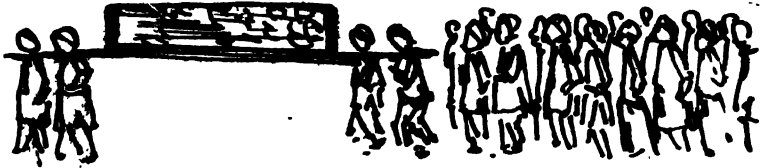
সাধক শবকে যথাশাস্ত্র সুগন্ধি জলে স্নান করিয়ে ধূপ এবং অগুরু চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রলিপ্ত করবেন। মুখে এলাচ লবঙ্গ কর্পূর খদির এবং তাম্বুল দিয়ে শবকে অধোমুখ করবেন এবং তার পিঠে চন্দন মাখিয়ে দেবেন। সাধক শবের বাহুমূল থেকে কটি পর্যন্ত চতুরস্র ভাবনা করবেন তার মধ্যে চতুর্দ্বার অষ্টদল পদ্ম ভাবনা করবেন। তার উপর কম্বলাবৃত মৃগচর্ম স্থাপন করবেন। এবার দ্বাদশ আঙুল মাপের যজ্ঞকাষ্ঠ চারদিকে স্থাপন করে সমস্ত লোক পালদের শবাধিস্থান দেবতাদের, চতুঃষষ্টি যোগিনী ও ডাকিনীদের সামিষ বলি প্রদান করবেন। সাধক শবকে স্পর্শ করে প্রণাম করবেন যে মন্ত্রে—'হে বীর পরমানন্দ-শিবানন্দ কুলেশ্বর। আনন্দ ভৈরবাকার দেবী পর্যঙ্ক সংস্থিত। বীর অহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চনে।' এবার সাধক যথাশাস্ত্র আসনের পুজো করে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে অশ্বারোহণক্রমে শবের উপরে উপবেশন করবেন এবং নিজের পায়ের তলায় কুশ স্থাপন করবেন। সাধক শবের ঝুঁটিতে পিঠপুজাদি করে ষোড়শোপচারে দেবীর পুজো করবেন। তখন শব আর সাধারণ শব নয়। তার মধ্যে দেবতার আবেশ হয়েছে। 'নীলতন্ত্রে' রয়েছে—'ততঃ শবাস্যে বিধিবৎ দেবতাপ্যায়নং চরেৎ।' উল্লেখ্য শবপাঞ্চভৌতিক সত্তার শুদ্ধরূপ। সে নিষ্পাপ বাসনা কামনা হীন। এজন্যই নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাবিদ্যাকে শবদেহে উদ্‌বুদ্ধ করা যায়। শবদেহকে আশ্রয় করে নির্গুণা সগুণা হন। দেবী ভাগবতে নির্গুণা শক্তিকে সংসার বিরাগী সাধকদের পূজ্যা বলা হয়েছে। নিগুর্ণা জ্যোতির্ময়ী পরব্রহ্মসনাতনী।

শব সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সাধক যে প্রার্থনা জানাবেন বীরতন্ত্রবচনে তা জানান হয়েছে—"বশোমেভবদেবেশ মমামুকং পদং ততঃ। সিদ্ধিং দেহি মহাভাগ ভূতাশ্রয়পদামবঃ"। অর্থাৎ হে দেবেশ, অমুক ব্যক্তি আমি আমার বশ হও। সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল হে মহাভাগ, আমায় সিদ্ধি দাও। এভাবে সাধক দেবীর ধ্যান করে মৌনভাবে যথাবিধি জপ

করবেন। শবসাধনা হয়ে গেলে শবকে জলে অথবা গর্তে বিসর্জন করতে হয়। কৌলাবলী নির্ণয় গ্রন্থে বলা হয়েছে শাস্ত্র নির্দিষ্ট বিধানে সাধনা করলে সাধক নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করবেন। তবে শাস্ত্রে সাধককে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির অকল্যাণের জন্য শবসাধনা নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র সমাজের কল্যাণের জন্য তা করতে পারবে।

এ সাধনা সাঙ্গ হোক কি না হোক, সফল কি নিষ্ফল হোক, যিনি এ সাধনা করেন তিনি মহাশক্তির প্রিয়তর হন— 'অসাঙ্গং সাঙ্গমেব বা নিস্ফলং সফলঞ্চ বা। কৃত্বা সাধনমেবৈতৎ শক্তেঃ প্রিয়তরো ভবেৎ।'

এখন প্রশ্ন শবে সাধনা কীভাবে সম্ভব? আদিম মানুষেরাও মনে করত মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা (স্পিরিট) থাকে। মৃতের আত্মার প্রতি এই শ্রদ্ধা ও সম্মানই মানুষের ধর্মের মূল। সাধক তার তপঃশক্তির প্রভাবে এই আত্মাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। অথর্ব বেদে এই শক্তিকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম (১/১০/৩-৪)। এটি তপঃশক্তি। ব্রহ্মের বলে ঋষিরা মুমূর্ষুকে আরোগ্য করতে পারতেন এমনকী মৃতকে জীবনদান করতে পারতেন। আর জীব মুক্তির জন্য প্রয়োজন দেহের। রসেশ্বর দর্শনে মুক্তির জন্য স্থির দেহের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। স্থির দেহ না হলে সরিদানন্দের স্ফূরণই হয় না। আর শিবের কর্তৃত্ব যখন শক্তির উপর নির্ভরশীল তখন শিব মুক্তিও দিতে পারেন না। মুক্তি দেন শক্তি। তাই শবসাধনায় শক্তির উপাসনা করা হয়। যদিও 'গন্ধর্ব তন্ত্রে' বলা হয়েছে—যিনি শক্তি তিনিই শিব। এঁদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। আর শবসাধনার ক্ষেত্রে চরম কথাটি বলা হয়েছে বামকেশ্বর তন্ত্রের ব্যাখ্যায়—বস্তুমাত্রেই স্ব স্ব প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত সামর্থ্য রয়েছে। এই সামর্থ্যই শক্তি। এই শক্তিই আদ্যা শক্তির বিভূতি। শক্তির আধার-শিব প্রত্যেক বস্তুতেই প্রকাশরূপে অবস্থান করছেন। বস্তুত প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম বা গুণ বিমর্শ শক্তির এবং বস্তুর স্বরূপ প্রকাশরূপ শিবের বিভূতি। অতএব প্রত্যেক বস্তুতেই রয়েছে শিবশক্তির অধিষ্ঠান।



❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক, পুরোহিত সমাজের একমাত্র মুখপত্র-র সম্পাদক।

শ্মশানভুলোর পাণ্ডুলিপি

সমীরণ মুখোপাধ্যায়

বারো বছর বয়সে বাবা আর ঠিক একবছরের মাথায় মা দুজনেই চলে গেলেন ভুলেশ্বর আর তুলিকে ছেড়ে। তুলি তখন সবে সাত। বুঝেছিল ঘরে দাপাদাপি হচ্ছে। মায়ের বুকে কান পেতেছিল। বলেছিল, চাড্ডি মুড়ি খাবো তেলপেঁয়াজ দিয়ো মা শোনেনি, পাড়ার লোকেরাই টেনে নিয়ে যায় পাশের বাড়িতে। গুমরে গুমরে কান্না। ভুলেশ্বর কিন্তু একবারও কাঁদেনি। না বাবার বেলায় না মায়ের বেলায়। কেন কাঁদেনি ভুলেশ্বর? টানা কথা বলতে গিয়ে বরাবর মুখটা নামিয়ে নেয় ভুলেশ্বর। বলে, কান্নাটা জমাট বেঁধে ছিল। ঠিকমত বেরুতে পারেনি। তবে এখন কাঁদি, আড়ালে। শ্মশানে বসে। শ্মশানের পাড়ে গঙ্গায় নৌকো ভিড়িয়ে দিয়ে।

হঠাৎ ভুলেশ্বরকে কেন যে মনে হলো আজ বুঝি। ভুলেশ্বর বোধহয়, আজও বাবা-মাকে খুঁজে বেড়ায় শ্মশানে শ্মশানে চক্কর দিয়ে। শুধুই কি বাবা-মা? তা নয়। খোঁজে মৃত মানুষের আপনজনদের। ওরা কে কেমন করছে। কিভাবে কাঁদছে। কিভাবে সৎকার দেখছে। এসবই প্রায়দিন লিখে রাখা, হ্যাঁ এখান থেকেই ভুলেশ্বরের সঙ্গে অন্য আলাপ চন্দননগরের এক শ্মশানে। ভুলেশ্বর কি লেখক টেখক? মোটেই না। একবার বলেছিল, তোমার এই দিস্তে দিস্তে কাগজগুলো থেকে বাছাই করে কিছু একটা লেখো না। নৌকোর পাটাতনে বসে ভুলেশ্বর বলেছিল, কি যে বলেন, আমি সাতক্লাস অব্দি পড়েছি। ওই বিদ্যেতে লেখালেখি। কি বলে যে লজ্জা দেন। বলেছিলাম, আহা তুমি ঐ সাতক্লাস বিদ্যে ধরছো কেন, তুমি জানো এমন অনেক বিখ্যাত সব লেখক আছেন যারা স্কুলের গন্ডি পেরোননি। তুমি পারবে না কেন?

ভুলেশ্বর কেমন যেন গম্ভীর হয়ে এলো। বললো, না ওটি করতে বলবেন না। তাহলে আমার শ্মশান চর্চাই মাটি হয়ে যাবে। অনেকে বলেছে, ভুলেশ্বর তোমার খাতাগুলো দাও। আমরা পত্রিকায় ছাপাবো। আমি দিইনি। দিতে নেই। আরামবাগের এক মাঠ শ্মশানে এক সন্ন্যাসী আমাকে বলেছিল, এসব তোমার একার। হাতছাড়া করো না। প্রচার করতে যেও না।

আশ্চর্য এক মানুষ। বাবা মারা যাবার পর এ শ্মশান ও শ্মশানে সকাল থেকে মাঝরাত। দাঁড়িয়ে দেখতো কিভাবে চিতা জ্বলছে। তবে এই করে তো দিন চলে না। তাই ঘরের মেজকা বলেছিল, বসে বসে ভাত গেলা বন্ধ। তোর যখন এত শ্মশান শ্মশান ঝোঁক ওখানেই ডোমগিরি কর। দুটো পয়সা হবে। তাই দিয়ে ভাত খাবি। কথাটা

খুব মনে লেগেছিল। আসলে ওতো শ্মশানে হারানো বাবা-মাদের খুঁজতে যায়। মেজকার কথা শুনে আর দেরি করেনি। যাতায়াত করতে করতে মদন ডোমের সঙ্গে আলাপ। মদন ভালোও বাসতো ছেলেটাকে। একদিন বললো, আমি শ্মশানে চাকরি করবো। মদন বলেছিল, দূর্ পাগলা। এখানে চাকরি হয় না। তবে একটা উপায় বাৎলেছিল। শ্মশানে যারা মড়া পোড়াতে আসে তাদের টুকটাক দরকার লাগে। এটা ওটা সেটা লাগে। ভুলেশ্বর ওই কাজেই লেগে গেল। বছর পনেরো শ্মশানেই প্রায় 'চাকরি'। এরই মাঝে মদনই একদিন বললো, গঙ্গার পাড়ে আমার একটা চালার ঘর আছে। বোনটাকে নিয়ে আয়। ওখানেই থাকবি। মেজকার মুখ ঝামটা আর খেতে হবে না। ভুলেশ্বর আর দেরি করেনি। তবে শ্মশানযাত্রীদের ফাইফরমাশ খাটলে তো আর ভাইবোনের পেট চলে না। ঠিক করলো ভ্যান রিক্শা চালাবে। দুটো কাজই এক সঙ্গে চললো। এই চলতে চলতেই একদিন মাথায় এলো, এবার আসল কাজ। ভুলেশ্বরই বলেছিল চন্দননগরের এক শ্মশানঘাটের বটছায়ায় বসে। হি-হি করা শীতে তখন। ঠাকুরদা চলে গেলেন এক শীত দুপুরে। অনেকের সঙ্গে আমিও শ্মশানের পথে। সাঁঝ ঘনাচ্ছে। হঠাৎ-ই দেখি শ্মশানের সিঁড়ি বেয়ে একজন উঠে আসছে বিড়ি মুখে। ওই ঘাটেই একলা বসেছিলাম। তখনো চিনি না ভুলেশ্বরকে। আমি ওকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই বলেছিল, জায়গা তো আছে, আপনি বসেন। আপনার কেউ ... বললাম, ঠাকুরদা মারা গেলেন, হঠাৎই জিজ্ঞাসা, মনতো খারাপ কিন্তু আপনার কান্না আসেনি? একটু চমক খেলাম। হঠাৎ এ প্রশ্ন, ওর সঙ্গেই এগোলাম, যেতে যেতে বললো, অনেকদিন পর দেখলাম একজনকে। না কেঁদে আপনজনকে বিদায় দিচ্ছে। আসলে আমিও কাঁদিনি। তখনই পেছনের ঘটনা শুনলাম। নাম ভুলেশ্বর পাত্র। বাড়িটা? কিছুতেই বলতে চায়নি। শুধু বলেছিল, মাছ ধরার একটা নৌকো আছে গঙ্গার ঘাটে বাঁধা। ওটাই ঘরবাড়ি। একটা বোন ছিল। বিয়েও হয়েছিল। হপ্তাদুয়েকের মাথায় গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলেছিল বাড়ির চাপে। ওকেও এখানে দাহ করেছি। আমি কাঁদিনি। সেও অনেক বছর হলো।

এতদিন পর ভুলেশ্বর পাত্রকে কেন যে মনে এলো। ভাবতে পারছি না। মাঝে অনেকবার দেখা হয়েছে। নৌকোর গলুই-এর মধ্যে একগাদা খাতা। বলেছিলাম, ওসব কি লেখো? একটু পড়বো ...। ভুলেশ্বর বলেছিল, আমার মৃত্যুর পর ওগুলো আপনি পড়বেন। এখন নয়। কি লিখি আমিই জানি না, তবে নৌকো নিয়ে যেখানেই যাই একবার না একবার এখানে আসবোই। চিতার গন্ধ আমি মাঝগঙ্গা থেকেই পাই। ছুটে আসি।

কি লেখে ভুলেশ্বর? অনেকবার দেখার পর, কথার পব জেনেছিলাম ভুলেশ্বর শুধু এ শ্মশান নয় এমনি আরো খান পনেরো শ্মশানে পালা করে যায়। ঘুরে দেখে। পয়সা না নিয়েই শ্মশান যাত্রীদের সাহায্য করে। কাঠের ব্যবস্থা করে। টুকটাক জিনিস এনে

দেয়। আর লক্ষ্য করে কে কাঁদছে না। কে চুপচাপ বসে চিতা দেখছে। তার কাছে যায়, গল্প করে, অনেকে পাত্তা দেয়, অনেকে দেয় না। যারা পাত্তা দেয় তাদের কথাই রোজ রাতে খাতায় লিখে রাখে নাম ঠিকানা সহ। এটাই নেশা। বিয়ে থা করেনি। সংসারে নিজের বলতে কেউ নেই। কখন কোথায় থাকে ঠিক নেই। তবে শ্মশানে শ্মশানে ঘোরাফেরা থামে না। আর আছে নৌকোর গলুই। একটা টিনের বাক্স। ওর মধ্যেই সেই গোপন লেখালেখি। যা আজও ঘোর আঁধারে।

বছর চারেক আগে একবার খোঁজ নিতে গেলাম গঙ্গা পাড়ের ভাঙন নিয়ে। চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বরের গঙ্গাপাড় ক্রমশ ভাঙছে। পাথর আর বোল্ডার দিয়ে কোনোভাবে আটকানো হচ্ছে ভাঙন। ঘুরতে ঘুরতে পরিচিত এক মানুষের সঙ্গে দেখা। নৌকো আছে খানচারেক। অনেকদিনের ব্যবসা। কথায় কথায় বললাম, ভুলেশ্বর বলে কাউকে জানেন? প্রথমটায় চমক খেলেন। বললেন, শ্মশান ভুলোর কথা বলছেন? আপনি তাকে চেনেন? কি করে চেনেন? খানিকটা ভেঙে বললাম। শুনলাম, আমার যাওয়ার বছর খানেক আগেই ভুলেশ্বর মারা গেছেন। নৌকোর মধ্যেই এক সকালে অন্য মাঝিরা ভুলেশ্বরের নিষ্প্রাণ দেহটা দেখতে পায়। বলেছিলাম, ওর অনেক খাতাপত্তর ছিল নৌকোয় জানেন? মানুষটি হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, ভুলোকে আর জানবো না। ও নাকি লোককে বলতো, শ্মশান নিয়ে ইতিহাস লিখছে। যত্ত সব পাগলামি বুঝলেন না। খ্যাপা। খ্যাপা। তবে হ্যাঁ, একটা কাজ ও নিজেই করে গেছে। ওর দিস্তে দিস্তে কাগজ ওর সৎকারের কাজেই লেগে গেছে। হেঁ। হেঁ। মনে হলো ভুলেশ্বর ঠিক যেন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে হাসিটা শুনে বলছে, সব ভুল বাবু। খাতাগুলো আমি সঙ্গে নিয়ে গেছি। একটাও পোড়েনি। কে পোড়াবে।



❑ লেখক পরিচিতি — প্রাবন্ধিক, সমালোচক, সাংবাদিক গণশক্তি পত্রিকা।

দেলঘাটা আর হাজরাতলা শ্মশান

যতীন বালা

'শ্মশান' শব্দের অর্থ দাহ-স্থান। প্রেতভূমি। মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায়—জীবনের শেষতম স্থানকে ঘিরে তাই উদ্ভব হয়েছে কত কিংবদন্তি, কত জনশ্রুতি, লোককথা আর গুজব। মরণের পরে মানুষ কোথায় যায় সে রহস্যের আজও উন্মোচন হয়নি।

পুরনো যশোহর জেলার বোকড়ের বিলের কোলে শ্মশান 'দেলঘাটা' আর 'হাজরাতলা'কে নিয়েও কত কিংবদন্তি জনশ্রুতি আর লোককথার উদ্ভব হয়েছে তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। এইসব লোককথায় লোকশিক্ষার সমাজবিবেক আর জীবনসত্য উদ্‌ঘাটনের একটা বড় ভূমিকা থাকে।

চৈত্রমাসের শেষে, চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের নীলপূজা, গাজন আর চড়কের অনুষ্ঠান হয়। যশোহর-খুলনা অঞ্চলে এই নীল পূজাকেই 'দেল' পূজা বলে। 'দেল' উৎসবে 'পাট' (শিবাসন) যে ঘাটে উঠানো হয় এবং নামানো হয় তাই দেলঘাটা। শিবপূজার এই পাট (নৌকার মত দেখতে-কাঠের তৈরি যার ভেতর শিবমূর্তি থাকে, থাকে ছোট্ট একটি ত্রিশূল পোঁতা) বালাইশোলক, নাচ এবং গানের মাধ্যমে যিনি জাগিয়ে তোলেন তিনি হলেন 'বালা'। গাজন আর চড়কপূজারও তিনি মূল সন্ন্যাসী। পাট সন্ন্যাসীর মাথায় 'দেল' বা পাট তুলে দিয়ে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। কুলবধূরা উঠোনে আসন পেতে পাট বা দেলকে বরণ করে নেন। গৃহের অমঙ্গ ল দূর হয়।

'দেল' উৎসবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে হাজরা ঠাকুর কে (শিব) ভোগপ্রদান। এটা প্রস্তুত হয় নিখুঁত চাল ফুটিয়ে, একটা শোলমাছ (গজালমাছ) একটা সাইল (বাইন মাছ) ও একটি সিঙ্গি মাছ পুড়িয়ে। ভোগমুকুট নতুন হাঁড়ি পূর্ণ ভোগ মাথায় নিয়ে ছুটে যান হাজরা ঠাকুরকে শ্মশানে দিতে। কলার মাইজপাতা বিছিয়ে উক্ত ভোগ(প্রসাদ) উৎসর্গ করা হয়। যেখানে এই মহাভোগ বাড়ানো (উৎসর্গ) হয় তার নাম দেলঘাটা। এই শ্মশানের নাম তাই দেলঘাটা, যেখানে শিব ভূতপ্রেত নিয়ে বাস করে।

অতীতে 'দেলঘাটা' শ্মশান ছিলো হরিহর নদীর কূলে। নদী মজে গিয়ে এখন বিল হয়েছে। লোকশ্রুতি আছে হরিহর নদীতে শিবাসন বা পাট জলের ভেতর ছিলো। বালা সন্ন্যাসীরা হরিহর নদীর কূলে (ঘাটে) বালাই শোলক পাঠ, মল পায়ে নাচ ও সুরে গান করে নানা ক্রিয়াকর্মের দ্বারা পাটকে জাগিয়ে ঘাটে (তীরে) তুলে আনেন। তারপর এই দেল-পাটকে পুজো দিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়ে গৃহের সমস্ত অমঙ্গল মুক্ত করে আবার ওই পূত পাটকে নদীতেই ছেড়ে দেওয়া হত। যেখানে এই ক্রিয়াকর্ম হতো সেই ঘাটকে 'দেলঘাটা' বলা হয়। এই ঘাটে শব দাহ করলে, শবের আত্মা স্বর্গে চলে যায়। এই লোকবিশ্বাস থেকে গড়ে ওঠে দেলঘাটা শ্মশান। যে

স্থান পুণ্যভূমি। যে শ্মশানে জাত নেই বর্ণ নেই, সব মানুষই শ্মশানে শব। চিতাভস্মে সবাই সমান। শ্মশান তাই পুণ্যক্ষেত্র।

জনশ্রুতি আছে এই শ্মশানে জুড়ন পাগল শবসাধনা করে সিদ্ধপুরুষ হয়েছিলেন। রোমাঞ্চকর সেই 'কথকথার' গল্প মানুষ এখনও বলে থাকেন। পাশের গ্রাম পাঁচকাটিয়ার অঘোর মণ্ডলের 'আঠারো বছরের যুবতী মেয়ে মালতী হঠাৎ কলেরায় মারা যায়। মালতীর দেহ দাহ না-করে দেলঘাটার শ্মশানে ফেলে রেখে যায়।

অমাবস্যা রাতে জুড়ন পাগলের শিষ্য নিবারণ বিশ্বাস এক ধামা মটরভাজা, দড়িখুটা নিয়ে দেলঘাটার শ্মশানে উপস্থিত হয়। উলঙ্গ যুবতীর শব চিৎ করে শুইয়ে মাটিতে খুটো পুঁতে দুই হাত আর দুই পা দড়ি দিয়ে খুটার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধে। শবের বুকের উপর হাটু মুড়ে বসে তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম শুরু করে। শব জেগে উঠে হা করে খেতে চায়। নিবারন শবের মুখে মটরভাজা দিতে থাকে। শব মটরভাজা কড়মড় করে খেয়ে ফেলে। মটর মুখে ফেলতে ফেলতে একসময় মটর ফুরিয়ে যায়। শব তখন দড়ি-দড়া ছিঁড়ে হাত-পা দিয়ে নিবারণ বিশ্বাসকে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ধরে ঘাড় মটকে বুকে ফেলে রক্ত শুষে খেতে থাকে।

এদিকে জুড়ন পাগল আশ্রমের আসনে বসে জানতে পারেন, শিষ্য শবসাধনা করতে গিয়ে দেলঘাটা শ্মশানে শবের উপর মরে পড়ে আছে। শব তার রক্ত শুষে খাচ্ছে। জুড়ন পাগল দেলঘাটা শ্মশানে অমাবস্যার রাতে ছুটে আসেন। শ্মশানে ঢুকেই জুড়ন পাগল শ্মশানে পড়ে থাকা আধপোড়া কাঠ কয়লা, মাথার খুলি, হাড়গোড় যা সামনে পান তাই জড়ো করে শবের বুকে, মুখে হাড়গোড়-কাঠকয়লা ঢুকিয়ে দিতে থাকেন। মুহূর্ত মধ্যে শবকে জুড়ন পাগল নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসেন। শব তখন দেবীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। দেবী কালিকা জুড়নকে বর দিতে চান।

তিনি জুড়ন পাগলের সঙ্গে জগৎ আর জীবনের আগম-নিগম প্রসঙ্গ বলতে থাকেন। বাকি রাতটুকু জুড়ন পাগল শবের কাছ থেকে পেয়ে যান তন্ত্রের গূঢ় রহস্য। জগৎ আর জীবনের রহস্য তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়। জুড়ন পাগল একরাতেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। গ্রামের মানুষ কঠিন ব্যাধি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে ভালো হয়ে যায়।

জুড়ন পাগল সম্পর্কে নানারকম লোককথা প্রচলিত আছে। জুড়ন পাগল কিছু ফেলে দিতেন না। সবই তিনি খেয়ে ফেলতেন। শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক দু-খানা সাদা থানই শরীরে জড়িয়ে রাখতেন। এ-অঞ্চলে বর্ষাকালে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে গেলে ডিঙি ছাড়া যাওয়া যেত না। জুড়ন পাগল খড়ম পায়ে দিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতেন। তিনি মাঝেমধ্যে কোথায় যে উধাও হয়ে যেতেন কেউ তাঁর খোঁজ পেতো না। তারপর হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হতেন। এ-রকমও শোনা গেছে, দেলঘাটা শ্মশানে মৃত ভেবে ফেলে রেখে গেছে। জুড়ন পাগল নিজে কাঠুরিয়াদের পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যাকে তারা ফেলে রেখে যাচ্ছে তার দেহে প্রাণ আছে। কাঠুরিয়াদের ফিরিয়ে এনে শ্মশানেই চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছেন।

নানারকম গাছ-গাছালি যা শ্মশানেই জন্ম নিয়েছে, সেই সব গাছের পাতা মূল হাতের তালুতে ডলে রস শ্মশানে শায়িত-ব্যক্তিটির মুখে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। দেলঘাটা শ্মশানে শব সাধনা করে জুড়ন পাগল অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন সেকথা এখনও লোকে বলাবলি করে। বিপদে পড়লে জুড়ন পাগলকে তারা স্মরণ করে বিপদমুক্ত হতে চায়।

এ-অঞ্চলে জনশ্রুতি আছে, দেলঘাটা শ্মশানে দেলপুজোর মহাভোগ সরে না অর্থাৎ হাজরা ঠাকুর বা তার আশ্রিত ভুতপ্রেতরা এসে খায় না। সেবার পুজোর যিনি ভোগ মুকুট ছিলেন, সেই বিখ্যাত বালা সন্ন্যাসী—গৌর বালা, অন্ধকার রাতে মাঠে মুখ থুবড়ে পড়ে যান। গ্রামে চড়কতলায় ভোগ মুকুট আর ফিরতে পারেন না। এই ত্রুটির জন্য গাজন সন্ন্যাসীদের কেউ আর হাজরাগাছে চড়ে খেজুর ভাঙতে পারেন না। তখন খোঁজ পড়ে জুড়ন পাগলের। কিন্তু জুড়ন পাগলকে সেই থেকে এ-তল্লাটে আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি।

হরিহর নদী বোকড়ের বিলে ঢুকে প্রথম যে বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকে দেলঘাটা শ্মশান। মাইল খানেক প্রবাহিত হয়ে গিয়ে হরিহর নদী দ্বিতীয় যে বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকে হাজরাতলা শ্মশান। শ্মশানের কোলে বিখ্যাত বেরোইতলার ধাপ। এই ধাপ বহু প্রাচীনকাল থেকে এখানে নদীর ঘোলায় ভাসমান ছিল। জলের মাঝে দ্বীপের মতো এই ধাপের উপর মানুষজন, গরুর বাছুর হেঁটে বেড়াতো। মৃত মানুষের দেহ তখন দাহ করা হত না। মরা মানুষের দেহ ওই ধাপের তলে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। পরবর্তীকালে ধাপ জোবার মাটিতে রূপান্তরিত হয়। আর তার তীরে হাজরাতলা শ্মশানভূমির পত্তন হয়। হাজরাতলায় আসলে বিশাল লম্বা একটি খেজুর গাছ ছিল। গাজন সন্ন্যাসীরা নীলপুজোর সময় ওই খেজুর গাছে উঠে খেজুর ভাঙতেন। (নীলপুজোর বিশেষ অনুষ্ঠান) এই খেজুর গাছটি এতো লম্বা ছিল যে আশপাশের বিশখানা গ্রাম থেকে এ-গাছের মাথা দেখা যেত। নীলপুজোর গাজন সন্ন্যাসীরা গাছের মাথায় উঠে খেজুর ছিঁড়তেন, নাচতেন। আর কাঁচা খেজুর ছুড়ে মারতেন দূর দূর গ্রামে। আশপাশের তিনচারখানা গ্রামে সে খেজুর নাকি ছিটকে গিয়ে পড়তো। সেই পবিত্র খেজুর গৃহের মঙ্গলের জন্য ঘরের, গোলার বাতায় ঝুলিয়ে রাখা হতো। লোকের বিশ্বাস দেলপূজার খেজুর ঘরে থাকলে কোন আপদ বিপদ আসে না।

হরিহর নদীর পাড়ে উঁচু ভিটেয় এই খেজুর গাছটি কবে থেকে যে এতো লম্বা হয়ে আশপাশের সমস্ত গাছের মাথা ছাড়িয়ে আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে, তা এ-অঞ্চলের মানুষ কেউ দেখেনি। এ-অঞ্চলের সব থেকে বয়ো:বৃদ্ধ ব্যক্তিরা বলে থাকেন তারা নাকি সারা জীবন ধরে হাজরাতলা শ্মশানের হাজরা গাছটিকে ওইরকম লম্বাই দেখে আসছেন। অনেকেই বলেন খেজুর গাছটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এ-গাছের বাল্লে অর্থাৎ ডাল হলুদবর্ণ পাতা হলেই মাটিতে আপনি খসে পড়ে। শুকিয়ে গাছের গায়ে বাল্লে ঝুলে থাকে না। প্রতি বছর এ-গাছের খেজুর ডাসা-কাঁচা থাকতেই গাজন সন্ন্যাসীরাই পেড়ে ফেলে। ফলে এর আশেপাশে কী গোটা হাজরাতলা শ্মশানে আর কোন খেজুরগাছই জন্ম নিতে পারেনি। হাজরাতলা শ্মশানে যুগের পর যুগ ওই

একটি আকাশচুম্বী খেজুর গাছই বেঁচে আছে, ঘন সবুজ ডালপাতা মেলে। এই খেজুরটি যেহেতু হাজরাগাছ তাই শ্মশানভূমিরও নাম হয়েছে 'হাজরাতলা' শ্মশান।

হাজরাতলা শ্মশানে আর আছে একটি বহু পুরানো শাড়াগাছ। এ-গাছটিও কতদিনকার এ-অঞ্চলের কোন মানুষ তা বলতে পারেন না। তাঁরা নাকি সারা জীবন দেখে আসছেন হাজরাতলা শ্মশানের শাড়াগাছটি ঘন গাঢ় সবুজ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের তলাটা তকতকে-ঝকঝকে উঠোনের মতো মসৃণ আর পরিষ্কার। গাছটির ডালপালা যতদূর বিস্তৃত, তার মধ্যে অন্য কোন গাছের চিহ্নমাত্র নেই। এই গাছতলায় শ্মশানে প্রায় সারা বছরই ভিন্ন গ্রাম থেকে আসা মহিলারা রোগমুক্তির জন্য, পুত্র সন্তান লাভের আশায় কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত মানত করে ও অন্যান্য কামনা করে, পরনের কাপড়ের আঁচল পেতে বসে থাকেন। যদি কোনো ফল বা ফুল ঐ আঁচলে পড়ে তা নিজের মাথায় ছুঁইয়ে আঁচলের খুঁটে বেঁধে ঘরে নিয়ে যান। তাতে নাকি আকাঙ্ক্ষিত ফলপ্রাপ্তি হয়। প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় এ-ভাবে আঁচল পেতে বসেন মহিলারা।

হাজরাতলা শ্মশানে আর আছে একটি বহু পুরানো শিমুল গাছ। গাছটি দক্ষিণ মুখো কাত হয়ে উপরে উঠে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। এই গাছটির বিশেষত্ব এই যে, গাছটির গোড়ায় দক্ষিণ দিকে দু-পাশে দু-খানা পাবড়া। (ঠেসমূলের মতো চওড়া শিকড়) দুদিক থেকে বেরিয়ে একটি সুরক্ষিত-দুর্ভেদ্য গুহার আকার নিয়েছে। বহুকাল আগে গাছের গুঁড়ির ওই গুহায় এক নেংটা সাধু দীর্ঘদিন ধুনী জ্বালিয়ে বসেছিলেন। গাছের গুঁড়ির ওই গুহায় একজন মানুষ স্বচ্ছন্দে পা-মেলে বসতে, পা-মুড়ে শুতেও পারে। ফলে ওই নেংটা সাধু বহু বছর ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও গাছের ওই খোড়লে বাস করে গেছেন। গ্রামের কোন এক স্বভাব কবি তাঁকে নিয়ে ছড়াও লেখেন, যা কারো মনে আজও আছে—

হাজরাতলায় নেংটা সাধু
শিমুলগাছের খোড়লে তার বাসা।
খায় দায় জটা নানে
ঝড়-জলে সে দিব্যি আছে খাসা।।

হাজরাতলা শ্মশানে আছে একটি বোরোইগাছ (কুলগাছ)। এই বোরোই গাছটি নাকি এ-শ্মশানের প্রাচীনতম গাছ। এই কুল গাছে গোল গোল বড় বড় কুল হয়। এই কুল সুমিষ্ট। এ-অঞ্চলে কুলগাছকে বোরোই গাছ বলে। এই গাছের নামানুসারে হরিহর নদীর ধাপের নাম হয়েছে বেরোই তলার ধাপ। এই বোরোই গাছটি যে বহু পুরানো তা এর গুঁড়ি দেখলেই বোঝা যায়। গাছের ছাল এত পুরানো যে কত বার সে ছাল ঝরে পড়েছে মাটিতে আবার নতুন ছাল হয়েছে। কিন্তু পুরানো ছালও গাছের গার মধ্যে মধ্যে রয়ে গেছে। আর তাতেই এই গাছের প্রাচীনত্ব স্পষ্ট ফুটে আছে।

হাজরাতলা শ্মশান জমির চারপাশে আছে ঘন আকছটি গাছ। গোটা শ্মশানভূমিকে তারা যেন প্রাচীরের মতো বেষ্টন করে আছে। শ্মশানে ঢুকবার সরু পথটির দুধারে আকছটি গাছগুলি

দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এ শ্মশানে জঙ্গল বা আগাছা বলতে ওই আকছুটি গাছেরই জঙ্গল। আকছুটি গাছের জঙ্গল এতো ঘন যে অন্যকোন গাছই জন্ম নিতে পারেনি তার মধ্যে। তাই যুগের পর যুগ হাজরাতলা শ্মশানে ওই আকছুটি গাছের জঙ্গল আর লম্বা খেজুরগাছ (হাজরা গাছ) একটি শিমুল গাছ, একটি বোরোই গাছ হরিহর নদীর তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। বাকি অংশ চিতা জ্বালানোর ফাঁকা জায়গা। শতাব্দী প্রাচীন নদীর গাবিতে কাঠকয়লার গড়ে উঠা ঢালু পাড়। সব মিলিয়ে এক প্রাচীন ভূখণ্ড।

হাজরাতলা শ্মশানকে ঘিরে উদ্ভব হয়েছে কত কিংবদন্তি, জনশ্রুতি, লোককথা আর গুজবের। সেইসব জনশ্রুতি, লোককথা আর গুজবের মধ্যে প্রধান হলো হাজরাতলার 'ভূতের কাছারি'। হাজরাতলা শ্মশান মানে হাজরা ঠাকুর অর্থাৎ স্বয়ং শিবঠাকুর এখানে বাস করেন। হাজরাঠাকুর ভূতপ্রেতের রাজা। তিনি এই অঞ্চলে যত ভূতপ্রেত আছে তাদের বিচারালয় বসান এখানে। কোন কোন অমাবস্যার রাতে হাজরাতলা শ্মশানে কাছারি বসে। আলোয় আলোয় ভরে যায় গোটা শ্মশানভূমি। ভূতের প্রেতের বিচার সভা বসে যায়। দূর থেকেও ভূতেদের-প্রেতেদের কথাবার্তা কেউ কেউ শুনতে পেয়েছেন, তারা গল্প করেছেন গ্রামীণ মানুষের কাছে। সাহসী গ্রামীণ বৃদ্ধরা হাজরাতলার কাছারি দেখতে দেখতে ডিঙি চালিয়ে খাল বেয়ে রাতে বাড়ি ফিরেছেন। সকালে সেই বৃদ্ধরাই হাজরাতলা শ্মশানে গিয়ে কিছুই দেখতে পাননি। অথচ রাতে ওই হাজরাতলা শ্মশানেই ভূতপ্রেতদের বিচার-সভা বসেছিল।

দেলঘাটা শ্মশান আর হাজরাতলা শ্মশান দুটি নিয়ে যে জনশ্রুতি এ-অঞ্চলে প্রচলিত আছে, সেটি খুবই লোমহর্ষক। দেলঘাটা শ্মশানে আছে বহুপ্রাচীন একটি তালগাছ। তালগাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে উঠেছে একটি অশ্বত্থগাছ। আকাশচুম্বী এই তালগাছের মাথায় এক পা এবং হাজরাতলা শ্মশানের আকাশচুম্বী খেজুর গাছের মাথায় আর এক পা দিয়ে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে এক প্রেত বা ভূত। গভীর রাতে নওয়াপাড়া হাট থেকে বাড়ি ফিরতে থাকা হাটুরেরা কোন কোন রাতে ডিঙিতে দাঁড়িয়ে দেখেছেন সেই দৃশ্য। ওই বিকট ছায়া-মূর্তির হাতে নরমুণ্ড আর কৃপাণ। দুই শ্মশানের দূরত্ব প্রায় একমাইল। অথচ ওই প্রেতযোনি দুই গাছে দুই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দুই পায়ের তলা দিয়ে যেই যাক না কেন, তাকে মরতেই হবে। কেউ কেউ এই মূর্তিকে দেখে আকাশে, সারা রাতই বিলের ধান খেতে ডিঙিতে বসে আছেন। সকালে গ্রামে ফিরে সেই মানুষই লোকজনের কাছে রাতে দেখা মূর্তির কথা বলেছেন। এই মূর্তিকে বা বিরাট ভূত অথবা পেত্নীকে প্রত্যক্ষ করেছেন এমন মানুষ এ-অঞ্চলের গাঁ-গঞ্জে সেদিনও নাকি বেঁচে ছিলেন। অথচ হায়! এসব দৃশ্য, কল্পনা, সত্য কিংবা বানানো গল্প যন্ত্রযুগের দাপটে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। শ্মশান আছে নেই তার অলৌকিকতা, মাহাত্ম্য, গা ছমছমে ভূতপ্রেতের গল্পগাথা।

❑ লেখক পরিচিতি : ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, কবি।

নলডাঙার দেবরায় পরিবার এবং কালিকাতলা শ্মশান

মোঃ আব্দুল মতিন

ইতিহাস একটি জাতির জীবনের ধারাবাহিক চলচ্চিত্র এবং তার সভ্যতার স্মারক। মৌন অতীতকে সে যুগের কাছে বাঙ্ময় করে তোলে নির্মোহ নিরপেক্ষতায়। ইতিহাসের এমনি এক ধূসর পথে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার নলডাঙ্গার জীর্ণশীর্ণ বেগবতী নদীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে দোর্দন্ড প্রতাপশালী রাজা প্রমথভূষণ দেবরায়ের অক্ষয় কীর্তি নিবাস। কথিত আছে, 'আখণ্ডল বংশীয়'[১] বিষ্ণুদাস হাজরা নামক এক ব্যক্তি প্রবীণ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাঁর আদিনিবাস ভাবরাসুরা থেকে যশোহরে (বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গা) বেগবতী বা ব্যাঙ্ নদীর তীরে ক্ষাত্রসুনী গ্রামে নির্জন বনের মধ্যে আসন পেতে তপস্যায় নিমগ্ন হন।[২] ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার মুঘল সুবাদার মানসিংহ কেদার রায়ের পতনের পর এ পথেই রাজধানীতে ফিরছিলেন। মানসিংহ রসদ সামগ্রীর অভাব বশত দৈবক্রমে ক্ষাত্রসুনীর পাশে নৌকা লাগিয়ে সৈন্যদের রসদ সংগ্রহের আদেশ দিলেন। বনমধ্যে বিষ্ণুদাসের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি মন্ত্রবলে নবাব সৈন্যদের যাবতীয় অভাব পূরণ করেন। রাজা মানসিংহ ও রাজকর্মচারীগণ সন্ন্যাসীর আচরণে মুগ্ধ হন এবং তাঁর স্থাপিত কালী বিগ্রহের বৃত্তিস্বরূপ পার্শ্ববর্তী পাঁচখানি গ্রাম সন্ন্যাসীকে দান করেন। আর এভাবেই নলডাঙা রাজ্যের উৎপত্তি।

বিষ্ণুদাস হাজরা নবাব কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুত্র শ্রীমন্ত দেবরায়কে নিয়োগ করলেন। শ্রীমন্ত এসময় পাঠানদের পরাজিত করে বাহুবলে মাহমুদশাহী পরগনার অধিকাংশ দখল করেন এবং মানসিংহের কাছ থেকে 'রণবীর খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন। নলডাঙ্গা রাজবংশের শক্তি, সম্মান ও অক্ষয়তা অমরতার দিকে ধাবিত হতে লাগল। এসময় নলডাঙ্গাতে দেবরায় পরিবারের স্থায়ী বসতি স্থাপিত হয়। বর্তমান নলডাঙ্গার সন্নিকটে একটি স্থান 'কালিকাতলা' নামে পরিচিত এবং ওই স্থানে একটি পঞ্চমুন্ডী আসন ও তার পাশে একটি দহ আছে। ওই স্থানে মাঝে মাঝে ব্রহ্মাগুগিরি নামক এক ব্রাহ্মণ আসতেন। যিনি ছিলেন রণবীরের দীক্ষা গুরু। কথিত আছে, কালিকাতলার পাশে কোনো জলাশয় না থাকায় সন্ন্যাসী দীক্ষা বলে শিষ্যের স্নানার্থে মন্ত্রবলে ওই দহের সৃষ্টি করেন। ওই দহ এখনও খুব গভীর এবং কালো জলরাশি হৃদয়কে নাড়া দেয়।[৩] বর্তমানে দহ সংলগ্ন স্থান কালিকাতলার মহাশ্মশান নামে পরিচিত। জানা যায়, অতি প্রাচীনকাল থেকেই কালিকাতলায় একটি মঠ এবং সিদ্ধেশ্বরী মাতার যন্ত্রাঙ্কিত শিলাখণ্ড ও কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, এই মঠে জনৈক জীর্ণশীর্ণ চামড়ায় ঘেরা কাঠামো আবৃত এক ব্রাহ্মণ তপস্যারত থাকতেন। কিন্তু মাঝে মধ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন সেখানে উপস্থিত হয়ে সন্ন্যাসীকে পাগল ভেবে প্রতি নিয়ত উত্ত্যক্ত করত। ফলে তাঁর তপস্যার ব্যাঘাত ঘটত এবং তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠতেন। একবার তিনি এত বেশি ক্রোধান্বিত হন যে, উক্ত

লোকজনকে শাস্তি প্রদানের জন্যে উক্ত মঠে কিছু মূর্তি তৈরি করেন। মূর্তিগুলো অবিকল কলেরায় আক্রান্ত মানুষের মতো। যেখানে মানুষ মারা যাচ্ছে, আক্রান্তদের চিকিৎসা করা হচ্ছে, শবদেহ শ্মশানে দাহ করা হচ্ছে এবং মহামারী রূপে কলেরা দেখা দেওয়ায় শব দেহগুলোর সৎকার পর্যন্ত করার লোক নেই। মূর্তিগুলো অবিকল এরকমভাবেই চিত্রিত হয়। ব্রাহ্মণ যখন উক্ত মূর্তিতে পূজা করলেন তখন দেখা গেল চারিদিকে সত্যি সত্যি কলেরা শুরু হয়ে গেল এবং কলেরা মহামারী রূপ ধারণ করায় গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়তে লাগল। অনেক খোঁজাখুজি করেও পরে সন্ন্যাসীকে আর পাওয়া গেল না। কালিকাতলা শ্মশানে অদ্যাবধি একটি ঢিবি দেখা যায়। যা আজও স্থানীয় লোকজন 'কলেরা ভিটে' নামেই জানে। আর কালিকাতলা শ্মশানটি ওই ঘটনার ফলেই উৎপত্তি হয়েছে বলে স্থানীয় মানুষের ধারণা।

নলডাঙ্গা এবং কালিকাতলা শ্মশান আজ শুধুই এক বিস্মৃত ইতিহাস। শ্মশান, মন্দির এবং সাধুদের আশ্রমের আড়াইশো বিঘা দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তির পাঁচ বিঘাও আজ অবশিষ্ট নেই। সবই এখন আবাদী এবং বসত ভিটার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ শ্মশানের মাটির নিচে গুমরে মরছে এক জীবন্ত ইতিহাস। যে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী দেবরায় পরিবারের সদস্যরা। যে ইতিহাস সাধারণ মানুষের জানা শোনার একেবারেই বাইরে রয়ে গেছে। সমাধি মন্দিরের বাসিন্দারা কে কোন সাম্রাজ্য শাসন করছে সমাধি মন্দিরের অবস্থান দৃষ্টে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ যে বাঁধানো সমাধি মন্দিরগুলো রয়েছে তা খুব বেশি দিনের নয় বলে আমার ধারণা। তাছাড়া উক্ত সমাধিমন্দিরের স্মৃতিফলকগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে জানা যায়, নলডাঙ্গা রাজপরিবারের অনেকেরই কালিকাতলা শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

এই পরিবারের টগবগে তরুণ রণবীরের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীমোহন দেবের পৌত্র চণ্ডীচরণ দেবরায়। যিনি বিশিষ্ট পণ্ডিত, জ্ঞানী, চরিত্রবান এবং প্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন। রাজ্য লাভের পর ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে নিকটবর্তী জমিদার কেদারেশ্বরের সাথে চণ্ডীচরণের মনোমালিন্য শুরু হলে তিনি শত শত যুদ্ধ নৌকা সুসজ্জিত করে কেদারেস্বর জমিদারকে আক্রমণ করেন। রাজা চণ্ডীচরণ দেবরায়ের বাহিনীর হাতে তিনি পরাজিত, ধৃত ও নিহত হন। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা চণ্ডীচরণ দেবরায় রাজমহলে গিয়ে বাংলার সুবাদার শাহসুজার সাথে দেখা করেন এবং বহু উপহার সামগ্রী প্রদান করে শাহসুজাব কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি ও খেলাত লাভ করেন। তিনিই এ বংশের প্রথম রাজা। আজ এই শ্মশানের স্মৃতিমন্দিরের শেষচিহ্নটুকু ধারণ করে নিঃসঙ্গতায় কাল যাপন করছেন নলডাঙ্গা জমিদারির রাজা চণ্ডীচরণ দেবরায়।

কালিকাতলা শ্মশানের আরেক স্মৃতিমন্দির রয়েছে চণ্ডীচরণের পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ দেবরায়ের নামে। তিনি সন্ন্যাসী ব্রহ্মাগুগিরির আদেশে সুদূর কাশী থেকে ভাস্কর আনিয়ে কালী মূর্তি তৈরি করেন এবং পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর নাম ইন্দ্রেশ্বরী। মন্দিরে কোনো লিপি নেই। কিন্তু কালের সাক্ষী হয়ে আজও মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে এবং স্থানীয় একজন পুরোহিত পুনঃসংস্কারকৃত মন্দিরটি ইন্দ্রেশ্বরীর পরিবর্তে সিদ্ধেশ্বরী নাম দিয়ে নিত্য পূজা অর্চনা করে যাচ্ছেন।

ওই বংশের আরেক প্রথিতযশা পুরুষ উদয়নারায়ণ দেবরায়। ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজ্যাধিকারী হন। চঞ্চলমতি, বিলাসপ্রেমিক এই মানুষটি জমিদারি তত্ত্বাবধানের চেয়ে উদাসীন জীবনযাপনই বেশি পছন্দ করতেন। ফলে নবাব সরকারে তাঁর বহু রাজস্ব বাকি পড়ে। প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রে ভ্রাতা রামদেবের প্ররোচনায় নবাব সেনাপতি শমসের খাঁ কর্তৃক ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে উদয়নারায়ণ নিহত হন। কালিকাতলা শ্মশানের দক্ষিণ পুব পাড়ে শেষশয্যা লাভ করেন তিনি। ভ্রাতার মৃত্যুর পর রামদেব খুব মর্মপীড়ায় ভুগতে থাকেন। প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এমনকী শূদ্র ও মুসলমান ফকিরদের মধ্যেও নিস্কর ভূমি বিতরণ করেন। এছাড়াও তিনি রামেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যা বেগবতীর তীরে অগ্নিসাক্ষী হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামদেব প্রজাকুলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে কালিকাতলা শ্মশানকেই স্থায়ী নিবাস হিসাবে বেছে নেন।

কালিকাতলা শ্মশানের আরেক সহযাত্রী রাজা রামশংকরের পুত্র মোহনচাঁদ। পিতার জীবদ্দশায় ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে মোহনচাঁদ মৃত্যুবরণ করেন। জানা যায়, পুত্রের অকালমৃত্যুতে রাজা রামশংকর দুঃখ শোকে জর্জরিত হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে কালিকাতলা শ্মশানে পুত্রের পাশে শয্যা গ্রহণ করেন। এসময় রামশংকরের বিধবা পত্নী রাধামনি শিশুপুত্র শশিভূষণ দেবরায়কে রেখে সতীধর্ম পালন করে স্বামীর চিতায় অনুগমন করেন। নলডাঙ্গা রাজপরিবারের রানী রাধমনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। শশিভূষণ প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি লাভ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু পরপারের ডাকে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে চলে যেতে হয়। রাজা রামদেবের সমাধির সামান্য উত্তরে তাঁর ভস্ম দেহ সমাহিত হয় বলে অনুমতি হয়। রাজা শশিভূষণ অপুত্রক ছিলেন বিধায় এক শিশু সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করে নাম দেন ইন্দুভূষণ দেবরায়। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইন্দুভূষণ ত্রিবেণীতে গঙ্গা লাভ করেন।

নলডাঙ্গা রাজপরিবারের সর্বশেষ কৃতবিদ্য, সুবক্তা, শিল্প, কুশলী ও কর্মদক্ষ নৃপতি ছিলেন ইন্দুভূষণের দত্তক পুত্র প্রমথভূষণ দেবরায়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রমথভূষণ জমিদারি লাভ করেন এবং চল্লিশ বছরের অধিককাল অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। ব্রিটিশ সরকার থেকে তিনি 'রাজা বাহাদুর' উপাধি ও খেলাত পেয়ে ১৯১৩ সালে সম্মানিত হন।[৪] প্রমথভূষণই যশোর-খুলনার একমাত্র সনদধারী রাজা। রাজা প্রমথভূষণ নীলকুঠির অধ্যক্ষ সেলবী (Mr. Selby) সাহেবের আমলে নহাটাকুঠি ও সম্পত্তি খরিদ করেন।[৫] তিনি দেশীয় শিল্পের সমাদর করতেন এবং রাজ বাড়ির প্রাঙ্গণে কলকারখানা বসিয়ে তার প্রমাণ দেন। রাজাবাহাদুর একটি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যাল. যার নাম নলডাঙ্গা ভূষণ পাইলট হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। যা এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। তিনি চতুস্পাঠী ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও তার ব্যয়ভার বহন করেন। পিতার নামে যশোর স্কুলে 'ইন্দুভূষণ' বৃত্তি এবং মাতার নামে দর্শনশাস্ত্রের চর্চার জন্য 'মধুমতি' বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দুই পুত্র-কুমার পন্নগভূষণ ও কুমার মৃগাংকভূষণ উভয়েই কৃতবিদ্যা ছিলেন। স্বদেশ প্রেমিক ও প্রজাভক্ত এই রাজা বাহাদুর প্রমথভূষণ দেবরায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে

পরলোক গমন করেন। হাজার হাজার ছাত্র/ছাত্রী প্রতিবছর তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় থেকে পাশ করে উচ্চ শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ তারা জানেনা এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার সত্যিকারের ইতিহাস। কালিকাতলা শ্মশানে অতি অনাদর অবহেলায় ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে ঘুমিয়ে আছেন দেবরায় পরিবারের এই দত্তক সন্তান রাজা বাহাদুর প্রমথভূষণ দেবরায়।

নলডাঙ্গার 'বেগবতী' নদীর উপর নির্মিত অতি প্রাচীন রংমহল ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকালেই দুই তিনটা মন্দিরের চূড়া পথচারীদের আকস্মিকভাবে থমকে দেয়। প্রাচীন ইট, কাঠ, ভাঙা বাড়ির প্রতি কৌতূহলী মনকে তীব্র আকর্ষণ করে। শ্মশানের দিকে এগোলে স্মৃতি যেন নড়াচড়া করে ওঠে। মাটির নিচে কালিকাতলা শ্মশানের নিঝুম অন্ধকারে নলডাঙ্গা রাজপরিবারের হাজারো বিখ্যাত-অখ্যাত মানুষের অতীত ইতিহাসের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। যে ইতিহাস কেবলই গুমরে মরছে অব্যক্ত বোবা কান্নায়। যা আজ স্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যেতে বসেছে।

টীকা :

১. হলহর ভট্টাচার্যের উপাধি ছিল আখণ্ডল। সে মতে, হলহরই আখণ্ডল ও কুলপতি এই দুটি উপাধি পেয়েছিলেন। কুলপতি উপাধির অর্থ বুঝি কিন্তু আখণ্ডল উপাধি কারও দেখিনি। আখণ্ডলের পিতার নাম পণ্ডিত। তার তিন পুত্র-হল, আখণ্ডল ও কুশল।

২. এখন ওই স্থানের নাম হাজরাহাটি এবং উহার নিকটবর্তী স্থান নলনটায় সমাকীর্ণ বলে নলডাঙ্গ া নামে পরিচিত হয়।

৩. ব্রহ্মাণ্ডগিরি পরে কালিকাতলা মঠে অধিষ্ঠান করেন। সেখানে তৎকর্তৃক সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রণবীর খাঁ ওই দেব মূর্তির জন্য মন্দির ও আশ্রম নির্মাণ করত যথেষ্ট দেবোত্তর দেন।

৪. ১৯১৩ সালের ১ জানুয়ারি রাজা প্রমথভূষণকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধির সনদ প্রদান কালে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল যে প্রশংসা বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন তার কতকাংশ নিম্নরূপ :-

"You has always been ready to help the local authorities with advice based on your ripe experience and intimate knowledge of the district to which you belong, you like the life of a country gentleman of the best type and as a resident land lord you have made good use of your opportunities and have taken and entightened interest in the well being of your tanantry and in the encoragement of indigenous industrian enterprises. You have well merited the higher personal title of 'Raja Bahadur' which I hope you will long live to enjoy".

৫. সেলবী সাহেবের সম্পত্তি অন্য সাহেব কোম্পানির নিকট বিক্রি হয়। রাজা প্রমথভূষণ ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন উক্ত সম্পত্তি E.A. Thurburn, William Lyon and John Thomas & Co-এর নিকট থেকে ১,৬০,০০০/- টাকায় খোস কোবালায় খরিদ করেন।

১. যশোহর খুলনার ইতিহাস-সতীশচন্দ্র মিত্র, পুন.মুদ্রণ. ১ম ও ২য় খণ্ড, ফেব্রুয়ারি ২০০১, রূপান্তর প্রকাশনী, ১৪/১ ফরাজী পাড়া লেন, খুলনা-৯১০০, বাংলাদেশ।

২. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩।
৩. আবু তালিব, মুহাম্মদ, বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়, ১ম সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৬৮, পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ঢাকা।
৪. রহিম, ড.এম.এ. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৫৭৬-১৭৫৭) ২য় খণ্ড, ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৫. আলফারুকী, এম.এম-ঝিনাইদহের ইতিহাস।
৬. হবিব, ইরফান মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭), ১ম প্রকাশ : ১৯৮৫, কে.পি. বাগচি এণ্ড কোম্পানি ২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২।



দাদীর কবর। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রবাসী । ১৩৫২, আষাঢ়।

❑ লেখক পরিচিতি : প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ, চুয়াডাঙ্গা, বাংলাদেশ।

কবরখানার সাথে বন্ধুত্ব

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

এখনও, যখন চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকি দোতলার বারান্দায়, সামনের রাস্তার দিকে, প্রায় নির্জন, তাকিয়ে থাকি, একটি কবরখানা বাংলাদেশ থেকে, ঢাকা থেকে উড়ে আসে, শান্ত মনের মৃদু হাওয়ায়, ঝড়ের দাপটে নয়।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক মাথা বাবরি সাদা চুল, লম্বা সাদা দাড়ি পিরবাবার মতো কথা বলে কবরখানা, 'চিনতে পারছো সুখেন, আমাকে? তোমাদের স্বামীবাগে, ঢাকা শহরের এক প্রান্তে, তোমাদের নিজের বাড়ির সামনে, মাঠের পাশে, আমি থাকি, এখনও থাকি। তোমার বয়স তখন দশ এগারো বা বারো। তারপর তোমরা বাড়ি বিক্রি করে কলকাতায় চলে এসেছ।' এরপর কথা বলে কবরখানার গাব গাছটি, 'চিনতে পারছো সুখেন, আমাকে? ঘুড়ি কেটে আমার গাছের ডালে আটকে থাকলে তুমি সবার আগে ছুটে গিয়ে তরতরিয়ে গাছে উঠে মগডাল থেকে ঘুড়ি পেরে আনতে। সুতোটা অলকা বেগমের জুঁই ফুলের গাছে ঝুলে থাকত। অলকা সুতোটা ধরে থাকত। তুমি চেঁচিয়ে বলতে অলকাদি ছাইর‍্যা দাও ছাইর‍্যা দাও। আমার সুতা নাই। উড়াইতে পারুম না। মনে পড়ে, পাকা গাব পেড়ে তুমি তোমার বন্ধুরা খেতে। কাঁচা গাব ফাটিয়ে গাবের আটা দিয়ে ফাট্টা ঘুড়ি জোড়াতে।' কবরখানার সাথে উড়ে আসা নানারঙের মার্বেল টাইলস দিয়ে বাঁধানো সমাধি বলে, 'মনে আছে, বার্ষিক পরীক্ষার শেষে, শেষ বিকেলে আমার চাতালে বসে তোমরা ছোটবড় বন্ধুরা গল্প করতে। নানাবকম গল্প। ব্যাডমিন্টন খেলার গল্প, ঘুড়ি ওড়াবার গল্প, সাঁতার কাটার গল্প। হঠাৎ বিশুদা জোছনা ছড়ানো কবরখানায় গলা ছেড়ে গান করত, 'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে।' কবরখানার সমাধি থেকে অলকা বেগম উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'দ্যাখ তো সুখী, আমারে চিনতে পারতাছোস কিনা?' আমি ঠিক চিনতে পারি অলকাদিকে, পনেরো বছরের ডাগর-ডোগর শাড়ি-পরা কিশোরীকে। আর সেই মুহূর্তে স্মৃতির ধুলো ঝাড়তেই বেরিয়ে আসে, অলকাদি শীতের এক জোছনা রাতে আমাকে নিয়ে গেছে গাবগাছের ধারে ঘনজঙ্গলে। তারপর গায়ের সাদা চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে জড়িয়ে ধরে গভীর চুম্বনে আমাকে আবিষ্ট করে দিয়ে আমার হাত দুটো নিয়ে ওর বুকের উপর চাপ দিতে থাকে। আমি এর অর্থ সেদিন কিছুই বুঝতে পারিনি। এই কলকাতায় একদিন আমাকে বিশুদা ন্যাশনাল লাইব্রেরির রাস্তায় আমাকে দেখতে পেয়ে ডেকে অলকাদির মৃত্যু সংবাদটি দিয়েছিল এবং বলেছিল আমরা যে কবরখানায় আড্ডা মারতাম, সেখানেই ওকে গোর দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ আমার একসময়ের স্বভূমি ছিল। আগে বলতাম পূর্ববঙ্গ, পরে বলতাম পূর্ববাংলা,

এখন বলতে হয় বাংলাদেশ। বলতে কষ্ট হয়, অলৌকিক যন্ত্রণা অনুভব করি। ভাষার বিভাজন মানেই মনের বিভাজন। যন্ত্রণাটির কষ্টটা সেখান থেকে আসে। যেহেতু আমি একজন বাংলাদেশ থেকে আসা আগা-গোড়া বাঙালি, চিন্তাভাবনায় এবং লেখায় গতিশীলতার জন্য ধুতিপরা পোশাকে নই, সেহেতু 'বাঙলাদেশ' বলতে বুক-হৃদয় চিন্-চিন্ করে এখনও। ভাষা আমার কাছে প্রাণ, ধর্ম নয়। মিলন আমার কাছে প্রাণ খণ্ডিত দেশ নয় বা হিন্দু-মুসলমান নয়।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। সেখানে ছিল আমাদের নিজস্ব দালানবাড়ি স্বামীবাগে, টিকাটুলি উয়াড়ির কাছে। রেললাইনের ধারে একটা বিশাল কবরখানা ছিল। কবরখানার ধারে আমাদের দালানবাড়ি। আমার মনে নেই, কবরখনাটার চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল কি না। তবে আমরা ভাঙা দেওয়ালের পাশ দিয়ে কবরখানার উপর দিয়ে চলে যেতাম উয়াড়ি টিকাটুলিতে। এভাবেই কবরখানার উপর দিয়ে একটা সর্টকাট সরু রাস্তা তৈরি হয়েছিল। আমার এখনও মনে আছে কবরখানার শেষপ্রান্তে অবাঙালি মালিকের বেশ বড়সড়ো একটা গ্লাস ফ্যাক্টরি ছিল। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আগুনের গোলা দেখতাম।

অলকা বেগম, কামালদা বলত গোরস্থান। বিশুদা, আমরা বলতাম কবরখানা। অথচ ওটা বাংলা শব্দ নয়। আরবি-ফারসি থেকে আগত অতিথি শব্দ। তবে অনেক বাঙালি মুসলমানদের মুখে শুনেছি 'মাটি দে বা পুতে দে।' খুবই অল্পবয়সে ছাদ থেকে মা'র বুক জড়িয়ে আমার প্রশ্ন ছিল, 'ওটা কী'? মা তোলা হাতটা নামিয়ে দিয়ে চুমু খেয়ে বলত, 'ওটা কবরখানা। মানুষ মরলে মাটি খুঁড়ে মরা মানুষকে পুঁতে দেয় যেখানে, সেটাকে বলে কবরখানা।' আমার বয়স তখন কত আমি বলতে পারব না, তবে যেটা বলেছিলাম সেটা রঙ-ওঠা ছবির মতো মনে আছে। বলেছিলাম, 'আমি যেমন মাটি খুঁড়ে গাছ পুঁতে দেই সেরকম।' আমার কথা শুনে মা হেসেছিল। মা-ই আমাকে স্বাভাবিকভাবে প্রথম মৃত্যুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। 'মানুষ মরলে, নাকি মুসলমান মরলে' কী বলেছিল মা আমার মনে নেই। বোধহয় মুসলমান কথাটা মা উচ্চারণ করেনি।

এভাবেই মৃত্যু আমার খেলার সাথী হয়ে ওঠে। আমাদের স্বামীবাগের দালানবাড়িটির নাম ছিল 'শাণ্ডিল্যভবন'। আমাদের গোত্র শাণ্ডিল্য। সে মতেই আমার বাবা-জ্যেঠা-কাকারা বাড়ির ওই নাম রেখেছিলেন। দালানবাড়ির সামনে দুটো মাঠ ছিল। প্রতিবেশীরা বলে জোড়া মাঠ। সেই মাঠের একধারে বিশাল কবরখানা। বার্ষিক পরীক্ষা (নভেম্বর-ডিসেম্বর) শেষ হলে সেই মাঠে ঘুড়ি ওড়াতাম চৈত্র-সংক্রান্তি পর্যন্ত। কেটে যাওয়া অনেক ঘুড়ি কবরখানায় গিয়ে পড়ত। ঘুড়ি ধরে আনতে মুলি বাঁশের লগি হাতে অন্যদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে যেতাম কবরখানায়। কবরখানার অধ্যাত্ম নীরবতা আমরা তছনছ করে দিতাম। এভাবেই সারা কবরখানা আমরা চষে বেড়াতাম। সেই কবরখানা ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোনোদিন কোনোখানেও মড়ার খুলি হাড়গোড় দেখিনি। কোনোদিন শিয়ালে টেনে আনা শিশুর মৃতদেহ চোখে পড়েনি। তবে শিয়ালদের পরিবার ছিল, সেটা বুঝতে পারতাম রাতের বেলায় ঘুম না এলে শিয়ালের ডাক শুনে। এই ডাক শুনতে শুনতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, ভয় পেতাম না। কোনোদিন

চোখে পড়েনি, কবরখানায় আড়াল খুঁজে হাগতে বসেছে বা পেচ্ছাব করছে। আমরাও করতাম না স্বাভাবিকভাবেই, কারণ আমাদের মধ্যে পবিত্র-চেতনা পারিবারিকসূত্রে শিকড় গেড়ে বসে আছে মনের মধ্যে। কবরখানাগুলি যেন মন্দির-মসজিদের মতো এক পবিত্র ভূমি। আমরা কবরখানা জুড়ে এত চোর চোর খেলতাম, কত ঘুড়ি যে গাবগাছ থেকে পেড়ে আনতাম তার হিসেব নেই। কিন্তু কোনোদিন বিষ্ঠায় পা লাগেনি, চোখে পড়েনি। কবরখানা চষে বেড়িয়ে যখন ঘরে ফিরতাম, তখন মা কোনোদিন জামা কাপড় ছাড়িয়ে তুলসীজল ছিটিয়ে আমাদের শুদ্ধ করতে দেখিনি। আমরা সেই জামা-প্যান্ট পরেই পড়তে বসতাম, খাওয়া-দাওয়া করতাম।

এই প্রসঙ্গে আমার বড় বোন রেখা চক্রবর্তীর কাছ থেকে শোনা প্রাতঃকৃত্য সম্পর্কে একটি চলমান ভূতের কাহিনি মনে পড়ছে। আমার দাদার (শঙ্কর) বন্ধুরা ধনাদা, অমরদা, বশিরদা, বলাইদারা রাতের পাহারা শেষে কবরখানার কাছে যে পুকুরটা ছিল, সেই পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটে বসে গল্পাড্ডা মারছিল। সে সময় প্রথম শীতের ভোরের আবছা মানুষ-দেখা কুয়াশা ধনাদা দেখতে পায় আগাগোড়া সাদা থানে মোড়া লম্বা মানবাকৃতি এবং ছায়ামূর্তি কবরখানায় ঢুকে মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রায়দিনই একই সময়ে ওরা সেই ছায়ামূর্তিটি দেখতে পায়। তবে দাদাদের কোনো ক্ষতি করে না, নাকিসুরে কোনো কথা বাতাসে ভেসে আসে না ওদের কানে। ঠিক হল একদিন বাঁশ নিয়ে সবাই মিলে ওই ছায়ামূর্তিটি অনুসরণ করবে। সেই দিনটি আসতেই ভোরের কুয়াশার ভেতর দিয়ে দাদারা চারজন লাঠি-বাঁশ নিয়ে ছায়ামূর্তিটি অনুসরণ করতে রওনা দিয়েছে। বলাইদা ছিল অনুপস্থিত। বলাইদার মধ্যে ভূতের ভয় ছিল। বলাইদার সামনে ভূতের গল্প বলতেই, বলাইদা বিড়বিড় করে আওড়াত, 'ভূত আমার পুত/করবি আমায় কি/রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে/ভয়টা আমার কি। (পাঠ্যান্তরে : ভূত আমাব পুত/শাঁখ-চুন্নি আমার ঝি)। ওরা ছায়ামূর্তিটির কাছে যেতেই, ছায়ামূর্তিটি ছুটতে থাকে। কাছে যেতেই ওরা শুনতে পায় সিমেন্ট বাঁধানো সমাধির গায়ে লেগে ঝনাৎ একটি শব্দ। ওরা দেখে ছায়ামূর্তিটির সাদা থানের ভেতর থেকে একটি জলভরা পেতলের বদনা (ঘটি জাতীয়) পড়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ ধনাদা এবং আমার দাদা থান কাপড়টি ধরে ফেলে টান মারতেই সাদা থানের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ময়লা গামছা-পরা একটি লম্বা রোগা মানুষ। কাঁদো কাঁদো গলায় হাত জোড় করে সে বলে, 'আমি এখানে হাগতে আসি।' শুনে সাহসী ধনাদা এই মারি কি সেই মারি ভাবভঙ্গি করে বলে 'লজ্জা করে না তোর এই কবরখানায় হাগতে, শুয়ার।' লোকটি সবার পায়ের কাছে পড়ে কান মুলে প্রতিজ্ঞা করে, 'আর কোনোদিন আসুম না। আর কাউকে আইতে দিমু না। এই কথাডা কইয়া রাখলাম।' বলেই সে দ্রুত পালাতে চেষ্টা করতেই আমার দাদা ওর হাতে বদনাটা ধরিয়ে দেয় পোঁদে একট লাথি মেরে। মনে পড়ে কবরখানার এই গাবগাছ ঘিরে আমরা 'গাউচ্ছা গাউচ্ছা' খেলা খেলতাম। বালক আমি গাব গাছে উঠতাম। নীচে আমার বালকবন্ধুরা য় থাকত। একজন বালক প্রশ্ন করত : গাউচ্ছা রে গাউচ্ছা?

উত্তর : কী রে ভাই গাউচ্ছা।

প্রশ্ন : গাছে উঠলি কেন?

উত্তর : বাঘের ডরে।

প্রশ্ন : বাঘ কই?

উত্তর : মাটির তলে।

প্রশ্ন : মাটি কই?

একটি কবর দেখিয়ে বলতাম : ওইত্তো।

এখানে কবরতলে মৃতদেহকে বাঘের ভয়ের প্রতীক ভূতের ভয় হয়তো সেসময় ভাবতাম। তারপর আবার প্রশ্নের ধারাবাহিকতা : তোরা কয় ভাই?

উত্তর : সাত ভাই।

প্রশ্ন : একটা ভাই দিবি?

উত্তর : ছুঁতে পারলে নিবি।

এখানে সাতভাই চম্পার-অনুভাবনা এসে যায়। তারপর আমার বালকবন্ধুরা আমাকে ছোঁবার জন্য গাছে উঠত। আমি এই ডাল সেই ডাল বেয়ে উপরে উঠতাম। আবার অন্য ডাল ধরে নীচের ডালে চলে যেতাম। একসময় যে প্রথম ছুঁতে পারত, সে আবার গাছে উঠত। আমি ছাড়া অন্যেরা ওকে ধরত। গ্রাম থেকে আসা খেলাটা আমরা এইভাবে খেলতাম। একসময় যারা গ্রাম থেকে অভাবে, আর্থিক কারণে, ব্যবসার কারণে (এটাই শহরগড়ার ইতিহাস) শহরে বসবাসের জন্য আসত, তারা গ্রাম থেকে নিয়ে আসত গ্রামের খেলাধূলা, গ্রামীণ সংস্কৃতি, গ্রামের নানারকম খাবারদাবার তৈরির উপকরণ। এখন বিদেশের শহর থেকে আসছে খেলাধূলা, সংস্কৃতি এবং খাবার-দাবারের উপকরণ, আমাদের সংস্কৃতিকে কবরে পাঠাবার ব্যবস্থা করছে এই দাস-সংস্কৃতি।

আমরা শীতের শুরুতে সন্ধ্যার পর মাঠে জড়ো হয়ে গল্পাড্ডা মারতাম। আরও একটু শীত পড়তেই শুকনো ডাল জড়ো করে রাতে আগুন জ্বালিয়ে আগুন পোহাতাম। পাশে শীতের জাড্যতায় কবরখানা শুয়ে থাকত। আগুনকে জীবন ভাবা, কবরখানাকে মরণ ভাবা—এরকম দর্শন সুলভ মনোভাব তখনও আমার মধ্যে গড়ে ওঠেনি। তবে কবরখানার নানারকম গল্প করত কামালদা। একবার ওর এক গরিব আত্মীয়কে এই কবরে গোর দিতে নিয়ে এসেছিল। তিন হাত মাটি তুলেই যখন গোর দিতে যাচ্ছে, তখন কামালদার বাবা ছড়া কাটে :

ছয় হাত গোরে
তাকে বেহেস্ত ধরে
তিন হাত গোরে
তাকে শিয়ালে ধরে।

ব্যস আর যায় কোথায়, তখন ছয় হাত মাটি তুলেই গোর দেওয়া হয়েছিল শরিয়তির ভয়ে। বাবার মতো কামালদা নিজেও মুখে মুখে গ্রাম্যছড়া বানাতে পারত। আমরা অবাক হয়ে সেসব

ছড়া শুনতাম, গল্প শুনতাম। হিন্দু-মুসলমানের গল্প নয়। ধর্মের ছাল ছাড়াতে পারলেই সব যেন মানুষের গল্প হয়ে ওঠে। সব যেন মানুষের সুখ-দুঃখের আর মৃত্যুর গল্প। একবার এক খারাপ মেয়ের গল্প করতে করতে গল্পের শেষে জুড়ে দিয়েছে এক গ্রাম্য ছড়া :

তোকে দেবো গোরে
ভাতার কাইন্দা মরে।

মন্দ মেয়ের গল্প শুনে বিশাদা হাসে। আমরা বিশাদার হাসি দেখে হাসি। গল্পের মজাটা সেই বয়সে বুঝতে পারতাম না। কবরখানা নিয়ে আরও ছড়া আছে কামালদার মনের আর্কাইভে।

সে সময়ের একটি উজ্জ্বল স্মৃতি এখনও আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে হিরের প্রভার মতো জ্বল জ্বল করছে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। বিশাল সাদা ডালিয়ার মতো জ্যোৎস্না কবরখানায় ফুটে আছে। আমরা চারজন রাতের ভাত খেয়ে রাত সাড়ে নটায় মাঠে জড়ো হয়েছি। আমি, অরুণ-অনন্ত-কামালদা-বিশাদা। বিশাদাই তুলল কথাটা, ৮৩ আজ আমরা কবরখানায় আমি মির্জার সমাধির মার্বেল বাঁধানো চাতালে বসে দেশপ্রেমের গল্প করব।' বলামাত্রই বিশাদা 'আজ রাতে সবাই গেছে বনে' দরাজ গলায় গাইতে গাইতে গোরস্থানের ভিতরের রাস্তা দিয়ে হাঁটা শুরু করেছে। আমরা বিশাদাকে অনুসরণ করছি। কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র **বিশাদার এমন** সুন্দর দরাজ গলা যা এখনও আমি কবরখানার জ্যোৎস্না রাত থেকে উঠে আসা সেই গান শুনতে পাই। আমার মনে অলৌকিক এক ভাবনা তৈরি হয়, মাটির তলায় চোখ বুজে শুয়ে থাকা দেশপ্রেমিক আলি মির্জা একবার অন্তত চোখ খুলে শুনেছিল সেই গান। ত্রিশের দশকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আলি মির্জার দেশপ্রেমের গল্প আমরা বিশাদার কাছ থেকেই শুনেঠিলাম সেই দিন রাতে।

সেই গান ঘন মাটির তলায় শুয়ে আরও একজন শুনেছিল, ওর নাম রহিম। বিশাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের পাড়ার ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। সেও ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত। সেই রহিম এক বয়স্ক মহিলার প্রেম সাগরে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল। মহিলার নাম ছিল শ্বেতা চক্রবর্তী। রশিদকে এবং বিশাদাকে গান শেখাত। কব্জির শিরা কেটে সেই রক্ত দিয়ে লিখে গিয়েছিল ' শ্বেতাদি আমি তোমাকে চিরকালের জন্য ভালোবেসে বাঁচতে চেয়েছিলাম।' কব্জির শিরার রক্ত আর বন্ধ হয়নি। বালকবেলায় এসব আমি শুনেছি, আমার দাদা-দিদিদের কাছ থেকে। রহিমদাকে আমাদের পাড়ার কবরখানাতেই গোর দেওয়া হয়েছিল। আমরা ফুল নিয়ে তোড়া বানিয়ে, মালা বানিয়ে বিশাদার সাথে প্রতি বছর রহিমদার মৃত্যুদিনে রহিমদার সমাধিতে দিয়ে আসতাম। আমাদের সাথে শ্বেতাদিও যেতেন এবং সমাধির সামনে বসে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন : 'রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে, দিনের শেষে/ দেয় সে দেখা নিশীথরাতে স্বপন বেশে।' আমি কিন্তু পাখির ঘরে ফেরা ম্লান বিকেলে শ্বেতাদির গালে লম্বা জলের ধারা দেখেছি। তারপর গান গাইত বিশাদা : 'দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই, কেন গো একেলা ফেলে রাখ।' আমরা সে সময় চোখ বোজা অবস্থায় স্তব্ধ হতাম। অনুভব করতাম রহিমদা কবর থেকে উঠে এসে আমাদের পাশে

বসে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনত। তারপর আমরা উঠে আসতাম পাতা চাদরটা ভাজ করে তুলে নিয়ে। এলোমেলো স্মৃতির জটাজালের অস্পষ্টতায় উল্লেখিত গানের সঠিকতা নির্ণয় করা কঠিন। তবু মনে হয়...।

আমার বালকবেলার এই কবরখানা আমাকে দিয়েছে মৃত্যুর উদাসীনতা, মৃত্যুর বাস্তবতা, মৃত্যু-চেতনার স্বাভাবিকতা এবং মৃত্যু-নির্ভীকতা। দিয়েছে সম্প্রীতির স্পষ্টতা, শিখিয়েছে সমীহ এবং মর্যাদা। ফলত কোনোদিন মৃত্যুর চেতনা-**তত্ত্ব**, মৃত্যুর দার্শনিকতা, মৃত্যুর বিষণ্ণতা বা হতাশা আমার মধ্যে জন্ম নেয়নি বা মৃত্যু-বীজ থেকে দার্শনিকতার বোধিদ্রুম গড়ে ওঠেনি। মৃত্যু নিয়ে আমি ভাবি না, কারণ বালকবেলা থেকেই বুঝতে শিখেছি, মৃত্যু হচ্ছে জীবনের শেষ অধ্যায়, লাস্ট চ্যাপ্টার।



গোরস্থান : শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। প্রবাসী

❑ **লেখক পরিচিতি : গল্পকার, সম্পাদক—আন্তর্জাতিক ছোটগল্প পত্রিকা।**

কালী সাধক মির্জা হুসেন আলি ও তাঁর সমাধি

অনুরাধা সরকার

তন্ত্র আমাদের দেশের জল, বাতাস, মৃত্তিকায় গড়ে উঠেছে। কামরূপ, ময়মনসিংহের উত্তর সীমান্ত, ত্রিপুরার অংশ বিশেষ, আর রাঢ় বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল তার শেকড়-বাকড়। বল্লাল সেনের ***দানসাগর*** গ্রন্থে একটি তন্ত্রবিহীন কালিকা পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টি বা তন্ত্রপ্রভাবিত কালিকাপুরাণ গড়ে উঠেছে, দশম-একাদশ শতকে, প্রচার ও প্রসার চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক। তন্ত্রের ঝড়ো হাওয়ায় সব কেমন টালমাটাল হয়ে যায়, তাই বুঝি মুসলমান, ধর্মপ্রাণ মানুষটিও মসজিদে বসে কালী সাধনা করেছেন। হ্যাঁ সেই সাধক একজন জমিদার। ত্রিপুররার বরদাখাতের জমিদার মির্জা হুসেন আলি। কেউ বলেন মসজিদের কাছেই ছিল বটগাছ, তার তলে বসেই আরাধ্য দেবীর সাধনা করতেন। ৩০ বছর ধরে তাঁর সাধনা চলেছিল। ১২২৯ সালে তাঁর জমিদারীর ১৫ আনা অংশ ঢাকার বাসিন্দা খাজা সলিমুল্লার কাছে বিক্রয় করেন। এই পূজায় ছিল ১০৮টি বলি। তার মধ্যে দুটি নরবলি। তন্ত্রশাস্ত্র বলে যদি— বিধি মতে একটি নরবলি দেওয়া যায় তবে দেবী একহাজার বছর তৃপ্তি লাভ করেন। আর তিনটি বলি দেওয়া হলে লক্ষ বছর। মির্জা মনে করতেন এজগত মহামায়ার সৃষ্টি। মৃত্যু ভয়ে ভীত মানুষ একমাত্র তাঁর দয়াতেই শমন ভয় মুক্ত হয়। কথিত, যম তাকে নিতে এলে তিনি কালীসঙ্গীত দ্বারা দু'বার যমকে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। এরপর তৃতীয়বার স্বেচ্ছায় যম বা শমনের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। সাধক সঙ্গীত গ্রন্থে—'যবন-ভক্তের গান' ভাগে দুটি মাত্র সঙ্গীত পাওয়া গেছে। গান দুটি হল—

১. যারে শমন এবার ফিরি।
এসো না মোর আঙিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি।
যদি কর জোর জবরি সামনে আছে জজ কাছারি,
আইনের মত রসিদ দিব, জামিন ত্রিপুরারি।।
আমি তোমার কি ধার ধারি,
শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বাস করি,
বলে মৃজা হুসেন আলি, যা করে মা জয়কালী,
পূণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।

২. সকলই করিতে পার মা কালী (গো মা)
কালী কং করালী মুণ্ডমালিনী।।
কখন রত্ন সিংহাসন, কখন পাঠাও বন

কখন বনে বনে বনমালী।।
শমন সঙ্কট ভয় (নিবারিতে)
তোমা বই আর কেহ নয়।।
তার সাক্ষী মৃজা হুসেন আলী।

১২৩০ সালের চৈত্রমাসে ৮০ বছর বয়সে এই সাধক কবি পরলোকগমন করেন নিজ নির্মিত কালীমন্দিরেই। তাঁর স্ত্রী ঢাকায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে সমাহিত করেন। এরপর তিনি অল্প কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন। তিনিও ১২৩৪ সালে মারা যান। ঢাকাতে তাকে স্বামীর পাশেই কবর দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ টাঙ্গাইল

রামপ্রাণগুপ্তের সমাধিলিপি

টাঙ্গাইলে আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে কিছুটা দক্ষিণে গেলে আবার রাস্তা গেছে পশ্চিমমুখী—বাজারের দিকে। এইখানে মোড়ের ওপর একটা পুরনো একতলায় ছোট দালান ছিল। বারান্দায় টিনের চালা। বাড়িটি ছিল বিখ্যাত ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্তের। রামপ্রাণ গুপ্ত হজরত মহম্মদের জীবনীকার। তাঁর প্রাচীন ভারত গ্রন্থ এখনও সুপাঠ্য এবং নির্ভরযোগ্য। রামপ্রাণ গুপ্তের বাড়ির সামনে একটা সমাধিফলক ছিল। তাতে শ্বেত প্রস্তরে লেখা ছিল :

ঁ রামপ্রাণ গুপ্ত
জন্ম—১৮৬০ খৃষ্টাব্দ
মৃত্যু—১৯২৭ খৃষ্টাব্দ
যে যায় যাক,
যে থাকে থাক
শুনে চলি
তোমারই ডাক।

পাকিস্তান হওয়ার পঁচিশ বছর পরেও বাংলাদেশের যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই সমাধিফলকটি দেখেছি। বাংলাদেশ হওয়ার পরেও যখনই টাঙ্গাইল গেছি সমাধি ফলকটি চোখে পড়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে শেষবার যখন দেশে যাই, ফলক বা প্রস্তর বেদিটি কিছুই দেখিনি। বোধ হয় যাঁরা এখন এই বাড়ির বসবাসকারী তারা এই প্রস্তর ফলকের গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। এরকমই হয়। এটাই সভ্যতার ইতিহাস। এরকম না হলে দেশে দেশে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কিংবা শহরে শহরে যাদুঘরের দরকার পড়ত না।

কোথায় যাচ্ছেন তারাপর বাবু/তারাপদ রায়
আজকাল। ৩০ নভেম্বর ২০০৩

মারমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে লোকাচার

স্মরণ বড়ুয়া

মনুষ্য সমাজে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিশেষ রীতি-নীতি রয়েছে। এ রীতিনীতি অর্থাৎ আচার-আচরণ সভ্য সমাজে অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন, তেমনি বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী মারমা উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানকে ঘিরে নানা লোকাচার ও অকৃত্রিম অনুষ্ঠানিকতা দৃষ্ট হয়।

রোগ যন্ত্রণায় দীর্ঘদিন কেউ কষ্ট পেলে তখন মারমারা ধরে নেয় যে তার শরীরে জিন, পরী অর্থাৎ অপদেবতা আশ্রয় নিয়েছে। এ সময় বাড়ির দরজার সামনে একটি 'হাঁড়ির' মধ্যে তুষ ও 'নুইঅ' (তুলসি পাতা) মিশিয়ে তাতে আগুন দিয়ে ধোঁয়া দেওয়া হয়। এর অর্থ বাড়ির ভিতর অপদেবতা যাতে প্রবেশ করতে না পারে; আগুন দেখে তারা পালাবে। এ সময় তারা 'বৈদ্ব' (বৈদ্য) এর শরণাপন্ন হয়। বৈদ্য এসে বিভিন্ন মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে "জল পড়া"[১] দিয়ে চলে যায়। যদি লোকটিকে বাঁচানোর সব চেষ্টা করার পরও মারা যায় তবে ঐ হাঁড়িতে, উল্লেখিত জিনিস দ্বিগুণ পরিমাণে মিশিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কিছু লাল সুতা দিয়ে মৃত বা মৃতার ঠোঁটের ফাঁক ঢেকে দেওয়া হয়। শবদেহ 'কাম্ব' বা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। বাড়ির মাটির হাঁড়ি পাতিল ও কলসিতে রাখা জল ফেলে দেওয়া হয়। মৃত্যুর সাথে সাথে ঢোল পিটিয়ে এ সংবাদ পাড়া প্রতিবেশীদের জানিয়ে দেওয়া হয় যদি মৃতের বাড়ির ঢোল না থাকে সাথে সাথে অন্য বাড়ি থেকে ঢোল আনানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ঢোল পিটিয়ে তারা অপদেবতাদেরও বিতাড়িত করে। শবদেহ শ্মশানে তোলার পূর্ব পর্যন্ত পালাক্রমে এই ঢোল পেটানো চলে। মৃতের শিয়রে বসে একজন লোক মৃতের আত্মার সদ্‌গতি-কামনায় 'না-বাইলা' (ত্রিপিটক) কিংবা জাতকের কাহিনি পাঠ করতে থাকে। তবে নিয়ম রয়েছে প্রথম একজন বয়স্ক

১. 'জল পড়া'—একটি পাত্রে কিছু জল নিয়ে 'বৈদ্ব' (বৈদ্য) তাতে মন্ত্র পড়ে দেন। এ জল অসুস্থ ব্যক্তিকে খাওয়ানো এবং বাড়ির চতুর্দিকে ছিটানো হয়।

ব্যক্তি দ্বারা এ-গ্রন্থ পাঠ শুরু করতে হবে। পরে যে কোনো বয়সের লেখাপড়া জানা লোক এ-কাজ করতে পারে। এ গ্রন্থ পাঠ পাঠকের ইচ্ছে অনুসারে দীর্ঘক্ষণও চলতে পারে। এর জন্যে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। মৃতের আত্মীয়স্বজনদের খবর দেওয়া হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে 'ফাং' (নিয়ন্ত্রণ) করা হয়।

শবদেহ ধৌত করা হয় শবকে দাঁড় করিয়ে। পাঁচ-ছয়জন লোক শবকে দাঁড় করিয়ে পার্শ্ববর্তী 'ছড়া'[২] কিংবা নলকূপ থেকে (সাধারণত নলকূপ খুব কমই দেখা যায়) একটি নতুন কলসিতে করে জল এনে চুলোর আগুনে ঈষৎ গরম করে মৃতের দেহের উপর আস্তে আস্তে ঢেলে দেওয়া হয়। পুরুষ শবকে পুরুষেরা এবং মহিলাকে মহিলারা স্নান করায়।

পূর্বে তৈরি করা 'ছুং ভাই' (বাঁশের তৈরি খাটিয়া বিশেষ)-এর উপর শবকে স্নান করিয়ে শোয়ানো হয়। সাথে একটি 'অলং' বা শবাধার দরকার হয়। এটিও তাঁপ, বেত, 'তলই'[৩] এসব জিনিস দিয়ে বানানো হয়। শবাধারের সমস্ত শরীর নানারকম কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো হয়।

'ছুং ভাইর' উপর নতুন 'চাংফুং' (পাটি) ও বালিশ দিয়ে বিছানা পাতা হয়। এবং তা ঘরের ভিতর একটি জায়গায় রাখা হয় 'ছুং ভাই'-র চার কোণের জন্য চারটি বাঁশ মাটি থেকে চার হাত বা সাড়ে চার হাত লম্বা করে কাটা হয়। তাতে চাঁদোয়ার মতো করে মৃতের ব্যবহৃত একটি কম্বল কিংবা চাঁদর দিয়ে ছাউনি দেওয়া হয়। এরপর 'ছুং ভাই'-র চার কোনায় ঝুলিয়ে দেয়। মৃতদেহের গলায়, হাতে ও দেহের চারপাশে খই-এর মালা রাখা হয়। পায়ের দিকে একটি খইয়ের পাত্র রাখা হয়। যারা শবদেহ দর্শন করতে আসে তারা শবদেহের উপর কিছু খই ছিটিয়ে দেয়; মৃত ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ হলে হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন। যাদের সামর্থ আছে, তারা এ সময় টাকা-কড়িও দেন।

মৃতের উদ্দেশ্য দু'বার 'পিণ্ডদান' করা হয়। প্রথমে একবার সকালে, পরে স্নান করানোর পর দুপুরে। ৫ 'পোয়া' কিংবা ১ 'পোয়া' চাল রান্না করে পাঁচটি পাত্রে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে দুটি পাত্র হাতের দিকে, ২টি পায়ের দিকে এবং একটি পাত্র মাথার দিকে রাখা হয়। ভাতের সাথে চিনি কিংবা মিষ্টি জাতীয় কিছু দেওয়া হয়।

স্ত্রীলোক হলে স্নানের পর তার ব্যবহৃত সমস্ত সোনা-রূপার অলংকার দিয়ে তাকে সাজিয়ে পুরুষের মতো অন্য সব কাজ করা হয়।

---

২. 'ছড়া'—পাহাড়ের জল গড়িয়ে পড়ে এটি সৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে এ "ছড়ায়" জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। মারমারা এখানে স্নান এবং গৃহস্থালির জিনিসপত্র ধোয়া-মোছা করে।

৩. 'তলই' বাঁশকে পাতলা করে কেটে ৬/৭ হাত লম্বা ও ৫/৬ হাত প্রস্থ করে এটি পাটির মতো তৈরি করা জিনিস।

দূরের আত্মীয়-স্বজন এলে তাদের জন্য সেদিন ভাত এবং কাছের আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশীদের চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করা হয়। তবে, এ আপ্যায়ণ অবস্থাপন্ন পরিবারেই করা হয়ে থাকে।

প্রিয়-বিচ্ছেদের শোক তারা চেপে রাখতে পারে না। তাই তারা কান্নাকাটিতে ভেঙ্গে পড়ে। প্রিয়জনদের কান্নায় সেদিন শব-দর্শনার্থীদের দুচোখও অশ্রু শিক্ত হয়ে উঠে। সান্ত্বনা জানানোর ভাষা তখন বোবা হয়ে যায়। তখন মনে হয় এমন ভালোবাসা, হৃদয়ের এমন মধুময় মিলন মৃত্যুতেই বুঝি সব ছিন্ন হয়ে গেল। অরণ্যের এ মানুষগুলো পরস্পর পরস্পরের সুখে-দুঃখে, রোগে শোকে, বিপদে-আপদে, হাসি-আনন্দে, জন্ম মৃত্যুতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার পূর্বে মৃতের আত্মার মঙ্গলকামনায় একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর (ভিক্ষু) নেতৃত্বে শবদাহে যোগদানকারী নরনারীকে পঞ্চশীল প্রদান করা হয়। ভিক্ষুগণ পালি ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ এবং অনিত্য গাথা[৪] আবৃত্তি করেন। জল ঢেলে পুণ্য অনুমোদন করা হয়।

শবদেহ 'অলং'-এ ঢুকানোর সময় বিবাহিত হলে উপুড় করে এবং অবিবাহিত হলে কাত করে শুইয়ে দেওয়া হয়। 'ছং ভাই'-এ ঝুলিয়া রাখা সমস্ত জিনিসপত্রও ঢুকিয়ে দেখা হয় অলং-এ। শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় সবার আগে আগে একজন লোক একটি পাত্রে বেশ কিছু খই নিয়ে তা অল্প অল্প পথে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাড়ি থেকে শ্মশান পর্যন্ত যান। একজন লোক মাটির নতুন কলসি ও 'বদনা' শ্মশানে নিয়ে যান। একজন লোক শ্মশানে আগুন ধরানোর জন্য একটি শুকনো বাঁশের আঁটি নেন। বয়স্ক কেউ মারা গেলে সাধারণত 'অলং' নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে ঠেলাঠেলির প্রতিযোগিতা চলে। দু'পক্ষের মধ্যে একপক্ষ যমরাজের ভূমিকায় অপর পক্ষ দেবতাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শেষ পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতায় দেবতাদের পক্ষই বিজয়ী হন। শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় ঢোল বাজানো এবং শব মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানে উপস্থিত হয়। শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় দুই তিনজন লোক বড় একটি পাত্র নিয়ে সমস্ত পাড়া কিংবা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। এ সময় প্রতিটি বাড়ীর লোক এক পোয়া চাল কিংবা গৃহস্থের ইচ্ছা ও সামর্থ অনুসারে কিছু টাকা দান করেন। এসব চাল ও টাকা ঐ পাত্র সহ শ্মশানের এক পার্শ্বে ফেলে দেওয়া হয়। এ দানের উদ্দেশ্য মৃতের সাথে তাদের পরিবারের সমস্ত আপদ-বিপদও যেন দূর হয়ে যায়; গ্রামটা যেন নানা ভয় ও উপদ্রব

---

৪. 'অনিত্য গাথা' অর্থাৎ সংসারের অনিত্যতা—একদিন সবাইকে এই শবের মতো পরপারে চলে যেতে হবে। যাবার কালে পিতা-মাতা-ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন কেউ সাথে যাবে না। জগতের এই আসা-যাওয়ার চিরন্তন রীতিনীতিতে আমি এবং আমার বলতে কেউ নেই। নিজের কর্মই নিজের পাথেয়।

থেকে মুক্ত থাকে। মৃতের ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন থালা, গ্লাস, দা, বাঁইনদু (হুকা), ছিঁ (তামাক) ইত্যাদি শ্মশানের পার্শ্বে রাখা হয়।

ব্যবহারকারী ব্যক্তি মারা যাওয়ার সাথে এগুলো অব্যবহারোপযোগী হয়ে যায়। তবে মহিলাদের বেলায়, চিতায় অগ্নি সংযোগ করার পূর্বে হাতে গলায় ও পায়ে সাজানো অলংকারগুলো বের করে নেওয়া হয়। পরে সেগুলো বাড়িতে এনে রাখা হয়। প্রয়োজনে বাড়ির লোকেরা তা ব্যবহার করেন।

শবদেহ চিতায় তোলার পূর্বে আবার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছ হতে পঞ্চশীল[৫] নেওয়ার বিধি। এখানে ভিক্ষুগণের বসার জন্য বাড়ির লোকেরা এক হাত উঁচু বাঁশের একটি ছোট্ট মঞ্চ তৈরি করেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সূত্র এবং মন্ত্রপাঠ শেষে মৃতের পুত্র কিংবা রক্ত-সম্পর্কীয় কেউ শবদেহের পায়ের দিকে একটি পাত্রে জল ঢেলে পুণ্য অনুমোদন করে। সে মন্ত্রপূতঃ পবিত্র জল মৃতের শরীরের উপর ছিটিয়ে দেয়। সাধারণতঃ স্বামী মারা গেলে স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে মারা গেলে পিতা-মাতা কেউ শ্মশানে আসেন না; এটা প্রিয়-বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না বলেই করা হয়ে থাকে। শ্মশানের পাশেই একটি 'ভাতের মোচা'[৬] তোলা হয়। সকালে ও দুপুরে মৃতের উদ্দেশ্যে দেওয়া পিণ্ডগুলো মোচার নিচে ফেলে দেয়। শবদেহ শ্মশানে আনার পূর্বেই কাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। শবটি পুরুষের হলে চিতায় তিনস্তর কাঠ এবং স্ত্রীলোক হলে চারস্তর কাঠ সাজানো হয়।

মৃতের পুত্র কিংবা রক্ত-সম্পর্কীয় কেউ প্রথম চিতায় অগ্নি সংযোগ করে। পরে দাহ-ক্রিয়ায় যোগদানকারীরা কেউ শ্মশান থেকে সরাসরি নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারে না। যদি নিকটে কোনো 'ক্যাঙ' (মন্দির) থাকে তবে ক্যাঙে বুদ্ধ-বন্দনা করে মৃতের বাড়ীতে পুনঃ 'পদধুলা' দিয়ে প্রত্যেক নিজ নিজ বাড়িতে চলে যায়। দাহ-ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ স্নান সমাপন করে তবেই বাড়িতে প্রবেশে করে। চিতা নিভে গেলে সেখানে উপস্থিত কর্মীরা ছাইগুলো মাটি চাপা দিয়ে দেন। পরদিন সেখানে একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে তার মাথায় 'টাংটোন' (এক জাতীয় লম্বা সাদা কাপড়) টাঙ্গিয়ে দেয়। হাড়গুলো সংগ্রহ করে নতুন কলসিতে ভরে শ্মশানের এক পাশে রাখা হয়।

সাপের কামড়ে, বিষপানে, গাছের থেকে কিংবা অন্য কোনো অস্বাভাবিক কারণে কারো মৃত্যু হলে তাদের স্বাভাবিকভাবে মৃতের মতো আনুষঙ্গিক সব কাজ সম্পন্ন করে শবদেহ দাহ না করে কবর দেওয়া হয়। গর্ভ-অবস্থায় কেউ মারা গেলে শবদেহ ব্যবচ্ছেদ

---

৫. পঞ্চশীল—(১) প্রাণী হত্যা থেকে বিরত (২) অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত (৩) ব্যভিচার হতে বিরত (৪) মিথ্যা বাক্য হতে বিরত (৫) সুরা, মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমোদ-বস্তু হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ।

৬. 'ভাতের মোচা'—এটি একটি থালা রাখার উপযোগী দুই হাত উঁচু বাঁশের তৈরি একটি পাটাতন। এখানে মৃতের উদ্দেশ্যে ভাত রাখা হয়। সাথে মিষ্টি জাতীয় কিছু জিনিস দেওয়া হয়।

করে সন্তানটি বের করে নেওয়া হয়। সন্তানটি কবরস্থ করে মাকে দাহ করা হয়। শিশু সন্তানকে দাহ না করে কবর দেওয়া হয়।

মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যে মৃতের সদ্গতি কামনায়, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয়। এ অনুষ্ঠান করার জন্য কমপক্ষে পাঁচজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রয়োজন। মৃত্যু থেকে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা পর্যন্ত পাড়ার যুবতীদের কাজ-কর্ম বেশ বেড়ে যায়। মেয়েরা কলাপাতা সংগ্রহ করা, কাঠ কাটা, চাল তৈরি করা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করে। যুবকেরা ভিক্ষুগণকে 'ফাং' (নিমন্ত্রণ) করা, জিনিসপত্র ক্রয় প্রভৃতি কাজ করে।

শ্রাদ্ধের দিন নিমন্ত্রিত ভিক্ষুগণ সকাল ১০টার মধ্যে 'ক্যাঙে' (মন্দির) উপস্থিত হন। যদি কাছাকাছি ক্যাঙ না থাকে সেদিনের সে অনুষ্ঠানের জন্য সাময়িক ভাবে একটি ঘর তৈরি করা হয়। ভোর থেকেই শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের জন্য রান্নার কাজ চলে। ভাত রান্না করার দায়িত্ব যুবকেরাই নেয়। অন্যান্য তরিতরকারি রান্নার ভার মেয়েরা গ্রহণ করে।

সকালে ভিক্ষুদের 'ছোয়াইং' (ভাত) খাওয়ানোর পূর্বে মৃতের সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনেরা প্রচুর পরিমানে 'বিনিভাত' ও 'দেশী ভাত' একটি পাত্রে নিয়ে ক্যাঙে উপস্থিত হয়। ক্যাঙ থেকে নেওয়া হয় দুটো 'ছাবাইক' (ভিক্ষাপাত্র)। ক্যাঙে উপস্থিত সবাই ভিক্ষুর নির্দেশে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে উপবেশন করে। সাথে নেওয়া 'বিনি ভাত' ও 'দেশীভাত' সবাই অল্প অল্প হাতে নিয়ে 'ছাবাইকে' রাখে। প্রত্যেকে 'ভাত' রাখার পর 'ছাবাইক' দু'টো ভর্তি হয়ে যায়। এরপর ভিক্ষু মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান মৃতের বাড়িতেই সম্পন্ন হয়। 'ভিক্ষু সংঘ' (পাঁচ জন ভিক্ষু হলে এক সংঘ হয়) বাড়িতে প্রবেশ করার পূর্বে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে তাঁদের প্রত্যেকের পা বাড়ির লোকেরা ধুয়ে দেন। ভিক্ষুদের সাথে কোন ভারি জিনিসপত্র থাকলে তা আগু বাড়িয়ে নিয়ে নেওয়া হয়। ভিক্ষু সংঘ আসন গ্রহণ করার পর বাড়ির একটি কক্ষ সুতা দিয়ে সাত পাক ঘুরিয়ে এনে সুতার সাতটি মাথা একজন বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুর হাতে দেন। বাড়ীর একজন লোক ক্ষমা প্রার্থনা ও 'পরিত্রাণ' (সূত্র পাঠ করার পূর্বে সূত্রপাঠ করার জন্য আহ্বান) প্রার্থনা করেন। তারপর পঞ্চশীল প্রার্থনা ও গ্রহণ করা হয়। অকালে কোনো ছেলে কিংবা মেয়ে মারা গেলে পালি ভাষায় কমপক্ষে ৭টি সূত্র, (যেমন মঙ্গল সূত্র, রতন সূত্র, জয়মঙ্গল অটঠ-গাথা, করণীয় সূত্র...ইত্যাদি) বয়স্ক কেউ মারা গেলে ১টি সূত্র (করণীয় সূত্র বা রতন সূত্র) পাঠ করা হয়।

এদিন বেলা ১১টার মধ্যে মৃতের বাড়ির উঠানে মৃতের উদ্দেশ্যে 'ভাতের মাচা',[৭] তোলা হয়। 'মোচার' খুটি পেঁচিয়ে একটি সুতার মাথা বাড়ির সাথে সংযুক্ত করা হয়। এ 'মোচা' কোনো প্রাণী স্পর্শ না করা পর্যন্ত 'মোচা' তুলতে-যাওয়া লোকজন সেখানে

৭. "ভাতের মোচা" এটি পূর্বের "মোচা" থেকে একটু আলাদা। এতে সে দিনের রান্না করা "ভাত" মাছ, মাংস, দই, ডাল, অন্যান্য তরিতরকারি দেওয়া হয়। তবে উচ্চতা একই রকম।

দাঁড়িয়ে থাকে। কোনো প্রাণী এসে স্পর্শ করলেই সেখান থেকে লোকজন চলে আসে। ওদের ধারণা মৃত্যুর পর মানুষ কোনো না কোনো প্রাণীর আকৃতি গ্রহণ করে। তাই যে প্রাণী এ 'মোচা' স্পর্শ করে, মৃত্যুর পর লোকটি সেই প্রাণী হয়ে জন্ম নিয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

বেলা ১২টার পূর্বেই ভিক্ষু সংঘকে "ছোয়াইং" খাওয়ানোর কাজ শেষ করতে হয়। মৃতের বাড়ি থেকে ভিক্ষুগণ "ছোয়াইং" খেয়ে ক্যাঙে চলে যাবার সময় ভাতের মোচাটি ভেঙ্গে দিয়ে যান। "মোচার" জিনিসগুলো কুকুর-বিড়াল কিংবা অন্য পশু-পক্ষী এসে ভক্ষণ করে। নির্মন্ত্রিত অতিথিদেরও ভাত খাওয়ানো হয়।

বিকাল ২টার সময় ভিক্ষুসংঘ আবার মৃতের বাড়িতে উপস্থিত হন। আগে থেকেই ঘরের ভিতর কাগজ ও কাপড় দিয়ে সুন্দর করে 'কল্পতরু' (টাকার গাছ) সাজিয়ে রাখা হয়। আত্মীয়-স্বজন ও অতিথিদের মধ্যে যাদের টাকাকড়ি দান করার ইচ্ছে হয় তারা তা 'কল্পতরু' গাছে ঝুলিয়ে দেন। ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান-সামগ্রী ভিক্ষুর সংখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট পাত্রে ৫ পোয়া চাল, ১ কাঁদি কলা, ১টি নারিকেল, ৫টি সুপারি, ২০টি পান, ১/২ সের চিনি, ১ প্যাকেট বিস্কুট, ১/২ পোয়া চা, ১টি দুধের টিন, ১ বাণ্ডিল মোমবাতি, ১ প্যাকেট ধূপকাঠি, ১ প্যাকেট সিগারেট বা চুট্টা, ৪টি ছোট ছোট পতাকা, কমপক্ষে ১০টি টাকা, এবং এক হাত লম্বা বাঁশের টুকরোকে ফালি করে একটি 'ঝুলন'।

ভিক্ষুসংঘের সূত্র পাঠের পর ২ ঘণ্টা 'ধর্ম দেশনা' চলে। এ সময় ২/৩ জনের বেশি ভিক্ষু ধর্মদেশনা করেন না। সাধারণত বয়স্ক ভিক্ষুই এ অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন। 'দেশনা' শেষে জল ঢেলে পূণ্যানুমোদন করা হয়।

সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধের পর মৃতের জন্য আর কোনো ধর্মানুষ্ঠান করা নিয়ম নেই। তবে মৃত ব্যক্তিকে আত্মীয় স্বজন কিংবা মৃতের বাড়ির কেউ স্বপ্নে দেখে থাকলে ভিক্ষুকে ফাং করে মৃতের শুভ কামনার্থে ভিক্ষুদের বিভিন্ন জিনিস দান করা হয়ে থাকে।

মারমা রাজা ও খ্যাতনামা ভিক্ষুদের মরদেহ মৃত্যুর সাথে সাথে দাহ করা হয় না। তাঁদের মৃতদেহ রাসায়নিক ক্রিয়ায় বা আদাপাতা দিয়ে আচ্ছাদিত করে কিছুদিনের জন্য, অনেক ক্ষেত্রে কয়েক মাস, 'অলং' (শবাধার)-এ রাখা হয়। একটি বিশিষ্ট পূর্ণিমাতে ভিক্ষুটিকে দাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। এ দাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এতে মারমা সম্প্রদায়ের বাইরের লোকও এ কমিটি-ভুক্ত করা যেতে পারে। এ জন্য কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই। চাঁদা তোলার জন্য রসিদ বই ছাপানোর পর দূরের ভিক্ষুদের লোক মারফৎ কিংবা চিঠির মাধ্যমে "ফাং" করা হয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ৬-৭ হাজার টাকা এবং কয়েক মন চাল পর্য্যন্ত দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। সে গ্রামের বিভিন্ন ব্যক্তিদের টাকা ও চাল সংগৃহীত হবার

পর দেখা যায় এ অনুষ্ঠানের জন্য ৪/৫ লক্ষ টাকারও বেশি পাওয়া গেছে।

দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে কাঙের মধ্যেই শবদেহটি রাখা হয় শবদেহের মুখটি দেখা যাওয়ার মতো একটি ছোট কাঁচ দিয়ে ''অলং'' এর মাথার দিকের কিছুটা অংশ খোলা রাখা হয়। ভিক্ষুটি মারা যাওয়ার পরদিন থেকে দাহ-ক্রিয়ার দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে ও দুপুরে মৃতের উদ্দেশে দু'বার পিণ্ডদান করা এবং রাত্রে তার সম্মুখে বাতি জ্বালানো হয়।

ভিক্ষু-দেহ দাহ করার একমাত্র পূর্বে নতুন একটি ঘর তৈরি করতে হয়। ঘরটির নাম 'ছাইখেয়ং'। একটি বাঁশ ও বাঁশের নির্মিত বেড়া দিয়ে মজবুত করে নির্মাণ করা হয়। পুরানো ''অলং'' থেকে শবদেহ পুনঃ নতুন ''অলং'' এ স্থানান্তরিত করা হয়। নতুন অলংটি বিভিন্ন কাগজ ও কাপড় দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। এই এক মাস ধরেই ভক্ত-সমাগম চলতে থাকে। ভিক্ষু দর্শন করতে যারা আসেন, তাঁরা ছাতা, স্যাণ্ডেল, গামছা, চীবর, 'ছাবাইক' ভিক্ষুদের ভিক্ষাপাত্র, চন্দন কাঠ সহ দূর-দূরান্তের দর্শনার্থীরা বিভিন্ন দান-সামগ্রী সাথে নিয়ে আসেন। দাহ করার সময় দেখা যায়, প্রচুর পরিমান দান-সামগ্রী ক্যাঙে জমা হয় গেছে। পরে তা দাহ-অনুষ্ঠানে আগত ভিক্ষু সংঘের ভিক্ষুরা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেন।

শবদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সুদৃশ্য গাড়ি প্রস্তুত করা হয়। সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে তৈরি এ গাড়ির বিভিন্ন অংশ দাহ ক্রিয়ার দিন সংযুক্ত করা হয়। গাড়িটি খোলা ও জোড়া দেওয়ার মতো করে তৈরি করা হয়।

দাহ-ক্রিয়ার আগের রাতে ''জাইক কাড়ে'' কিংবা ''পাংখু গান''-এর অনুষ্ঠান করা হয়। এ ধরনের সংগীতানুষ্ঠান মঞ্চস্থ করতে হলে গানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ ধরনের পোষাক প্রয়োজন হয়। এগুলো ভাড়া করে আনা হয়। বিদ্যুৎ না থাকায় ডাইনামো কিংবা ম্যানথল লাইট দিয়ে এ অনুষ্ঠান উপভোগ করে। এর কয়েকদিন আগে থেকেই অরণ্যের শান্ত সরল মানুষগুলো গভীর ভাবাবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। উৎসব আর আনন্দ, দান এবং ধর্ম একই স্রোত-ধারায় মিশে যায়। নানারকম বাজা-বাদ্য, বাজি ফাটা, নৃত্য গান চলতে থাকে।

প্রাণ-প্রিয় ধর্মীয় গুরুকে শেষ বিদায় জানাতে দুর-দূরান্তের ভিক্ষু এবং লোকজন পায়ে হেঁটে গুরুর চরণতলে সমবেত হয়। সারারাত ধর্মীয় কাহিনির উপর ভিত্তি করে রচিত ''পাংখু'' এবং 'হাইক কাড়ে' গান শোনে। এ গান এবং নাটক দেখতে দেখতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দু'চোখ হয়ে উঠে অশ্রুসিক্ত। মনটা হারিয়ে যায় অজানা অচেনা কোনো এক জগতে।

যারা আগের রাতে গান শুনতে কিংবা গুরু-দর্শন করতে আসে, শবদাহ কমিটির সদস্যরা তাদের পরদিন খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করেন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েক হাজার

লোককে খাওয়ানোর পরও প্রচুর ভাত ও রান্নাকরা তরিতরকারি ফেলে দিতে হয়। ভোরে ও বেলা ১১টার আগে ভিক্ষুদের ছোয়াই (পিণ্ডদান) দেবার জন্য যুবক যুবতীরা দান-ধর্মের চেতনায় এক-মন, একপ্রাণ হয়ে যায়।

এদিন বেলা ২টায় ধর্মসভার অনুষ্ঠান। এতে ধর্মের আলোচনা, প্রয়াত ভিক্ষুক কর্মময় জীবনের স্মৃতি-চারণ, পঞ্চশীল গ্রহণ, সূত্রপাঠ প্রভৃতি করা হয়। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হয়। ধর্মসভায় কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক থালা নিয়ে পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করেন। সবার কাছ থেকে পুণ্যদান নেবার পর কয়েকজন লোক থালায় জল ঢেলে ভিক্ষুর মুখে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য পরলোকগতদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের করেন।

সভাশেষে শবদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার গাড়িটি মাথায় তুলে বিশেষ ভঙ্গিমা সহকারে একদল নৃত্য ও সংগীত পারদর্শী লোক বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে নৃত্য ও গীত পরিবেশন করে।

"অলং"-সহ শবদেহ গাড়িতে তোলার পর গাড়ির একদিকে যমরাজা অপরদিকে দেবদূতদের পক্ষাবলম্বন-কারীদের মধ্যে গাড়ি টানাটানির প্রতিযোগিতা চলে। শেষ পর্যন্ত দেব-দূতদেরই বিজয় সূচিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম-ভিত্তিক বিভিন্ন ধ্বনি দেওয়া হয়। কয়েক হাজার দর্শন ধর্মীয় গুরুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসে শবদাহ অনুষ্ঠানটিকে মহা মিলনের কেন্দ্রে পরিণত করে।

শবদেহ বহনকারী গাড়ি থেকে অলংটি শ্মশানে রাখা হয়।

গাড়ি টানার জন্য গাড়ির দু' দিকে দু'টো লম্বা রজ্জু বেঁধে দেওয়া হয়। এ সময় রজ্জুর উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করা সম্পূর্ণ নিষেধ। এ নিষেধ অতিক্রম করে কেউ তার উপর দিয়ে চলাচল করতে চাইলে তিনি নাকি সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মারমাদের ধারণা এ সময় রজ্জুতে কোন মন্ত্র-শক্তির প্রভাব পড়ে।

শ্মশান থেকে ২০/২৫ হাত দূরে কয়েকটি খুঁটি স্থাপন করা হয়। এ খুঁটির সঙ্গে চিতা পর্যন্ত লম্বা দড়ি সংযুক্ত করা হয়। দড়ির সাথে বেঁধে দেওয়া হয় সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন ধরনের বাজি। বাজিতে আগুন দেবার সাথে বাজিগুলো ছুটে গিয়ে "অলং" এর সাথে শব্দ করে ধাক্কা খায় এবং আগুন জ্বলে উঠে। এভাবে বাজির আগুনে এক সময় শ্মশানের চিতায় আগুন ধরে যায়। উপস্থিত শবদাহ সৎকার-কর্মীরা শবদেহ সম্পূর্ণ দাহ না হওয়া পর্যন্ত শ্মশানের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেন। এইভাবে এই দাহ-ক্রিয়ার জন্য শুধু ৭৯/৮০ হাজার টাকারও অধিক টাকা বাজি ক্রয়ের জন্য খরচ করা হয়। এ কয়েকদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এ অনুষ্ঠানের জন্য অরণ্যের মানুষগুলো হয়ে উঠে উদ্বেলিত।

গুরুকে শেষ বিদায় জানাতে এসে অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে সেদিন কাঁদতে দেখা যায়।

বসিরহাটের কবরস্থান ও শ্মশান

চয়ন দেব

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের ভাবনাচিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত যুগের মানুষ অনেকেই ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, অনুশাসন ইত্যাদি অনুপুঙ্খভাবে মানেন না। বাস্তব কারণেই যুগের সাথে তাল মিলিয়েই মানুষ তাঁর মানসিকতা, ধারণা, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির পরিবর্তন সাধন করে, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এমন অনেক কিছু মানুষের ধর্মের সাথে সাথে মানুষের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে, যা বোধহয় কোনোমতেই আগামী দিনেও পরিবর্তিত হবে না। এইরকমই একটা বিষয় মৃতদেহ সৎকার।

বস্তুত, আদিমযুগের কথা তেমনভাবে জানা না গেলেও, তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার কাল থেকেই মানুষের সভ্যতায় মৃতদেহ সৎকারের রীতি অনুসৃত হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমের নগর রাষ্ট্রগুলির সৎকার প্রথা, মোটামুটিভাবে সর্বত্র একই ধর্ম প্রচলিত থাকলেও, একই রকম ছিল বলা চলে না। তবে বেশিরভাগ নগররাষ্ট্রেই মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতিই প্রচলিত ছিল। ভারতে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতায় মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হত। আর্যযুগে এসেই মৃতদেহ আগুনে দাহ করার রীতি চালু হয়। এবং সেই থেকে আজ অবধি হিন্দু ধর্মের মানুষ শবদাহ করার প্রথাকে অনুসরণ করে আসছে। অপরদিকে, হজরত মহম্মদ প্রচারিত ইসলাম ধর্ম তার সূচনাকাল থেকেই মৃতদেহ কবর বা সমাধিস্থ করার রীতি অনুসরণ করে আসছে।

আমাদের শহর বসিরহাট তার জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। তাই এই অঞ্চলে মৃতদেহ সৎকারের জন্য অনেক কবরখানা ও একাধিক শ্মশানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেহেতু সূচনাকাল থেকে শহর বসিরহাট ও তার আশপাশ এলাকায় মুসলিম জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি, তাই এই অঞ্চলে কবরখানার সংখ্যাও অনেক বেশি। তবে এর মধ্যে শহরের বুকে তিনটি বড় কবরখোলা সমধিক প্রসিদ্ধ। শহরের বুকে এবং আশেপাশে অনেক গোরস্থান আজও বিদ্যমান—এদের অনেকগুলিই আজ আর দাফনের কাজে ব্যবহৃত হয় না, আবার যেগুলো ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে অধিকাংশই পারিবারিক বা গোষ্ঠী ভিত্তিক—যেগুলো আজকের আলোচনার বিষয় নয়। কেবলমাত্র টাকি রোডের সন্নিকটে সাঁইপালায় অবস্থিত পৌপর বেরিয়াল গ্রাউন্ড, ভ্যাবলা স্টেশনের কাছে স্যর আর.এন. মুখার্জি রোডের উপর পাটকেল মাজার খোলা এবং বসিরহাট কলেজের কাছেই মৃজাপুরে পশ্চিমপাড়া কবরখোলা—এই তিনটি-ই বর্তমানে চালু সর্বজনীন কবরখোলা।

এই তিনটির মধ্যেই কেবলমাত্র নয়, এমনকী বলা যায়, বসিরহাটের সর্বপ্রাচীন কবর খোলা হল—স্যর আর.এন. মুখার্জি রোডের সর্বজনীন পাটকেল মাজার খোলা।

বসিরহাটের জিরাকপুর মৌজার জিরাকপুর গ্রামের বনেদীবংশ খানবংশ, বংশানুক্রমিকভাবে

এই স্থানে তারা প্রায় চারশো বছরের বাসিন্দা। একদা উচ্চবিত্তশালী এই পরিবারের ৩২ বিঘা ভিটাবাড়ি, প্রচুর কৃষিজমি ছাড়াও এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক ডাঙা জমি ছিল। এই বংশের বর্তমানে জীবিত সর্বজ্যেষ্ঠ সত্তরোর্দ্ধ আকবর আলি খান ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নবীন প্রজন্ম বছর চল্লিশের মত্‌লুবর রহমান খানের ভাষায় নিজেদের ভিটাবাড়িতে পারিবারিক কবরস্থান থাকা সত্ত্বেও আনুমানিক প্রায় দুশো বছর আগে তাঁদেরই এক পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই স্যর আর.এন. মুখার্জি রোডের পাশে একখণ্ড জমিতে তাঁরা দরিদ্র, নিঃস্ব ভূমিহীন মানুষদের দাফনের বন্দোবস্ত করেন। এরপর আরও দীর্ঘকাল পরে আকবর আলি খান-এর পিতামহ আখতার হোসেন খান এর পিতামহের সময়ে ওই কবরখোলার এক কোণে একজন গুণী ফকির মানুষকে সমাহিত করে সমাধিস্থান ইট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। যাতে ওই স্থানে আর কোনো কবর না দেওয়া হয়। কালক্রমে দীর্ঘ পরিচর্যার অভাবে ওই ইটের ঘেরা স্থানে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়ে পাটকেল পরিণত হয়, এবং ক্রমশ লোকমুখে ওই স্থান পাটকেল মাজার খোলা নামে পরিচিত হয়ে পড়ে।

এরপর যুগের অগ্রগতি ও সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে খানেদের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় ওই গোরস্থানের সংরক্ষণ ও পরিচর্যায় নানাদিক দিয়েই সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। এতমাবস্থায় ১৯৪০-এর দশকের সূচনায় (২য় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন) আকবর আলি খানের পিতা খান ফজলে রহমানের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে পাটকেল মাজার খোলা সংরক্ষণ কমিটি। স্থানীয় যুবক ওই কমিটির সদস্য শেখ ওবায়েদুর হক (প্রাক্তন শিক্ষক, বসিরহাট টাউন হাইস্কুল), প্রয়াত আব্দুর রঈস, প্রয়াত আব্দুল মান্নান প্রমুখেরা উদ্যোগী হয়ে প্রায় দেড় বিঘা ওই গোরস্থানটি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এরপর ঐ দশকে শেষে এবং ১৯৫০-এর দশকের সূচনায় পাটকেল মাজার কমিটির সদস্যরা স্থানীয় ইটভাটা থেকে ইট দান হিসাবে সংগ্রহ করে সমগ্র এলাকাটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরার বন্দোবস্ত করেন। সেই সময়ের বসিরহাটের সবচেয়ে নামকরা রাজমিস্ত্রী আনোয়ার আলি মোল্যা সম্পূর্ণ বিনা মজুরিতে ওই পাঁচিলের কাজ করেন। আর স্থানীয় ব্যবসায়ী আইজুদ্দিন মল্লিক এই কাজে প্রয়োজনীয় সমস্ত সিমেন্ট বিনামূল্যে দান করেন। এরপর ১৯৮০-এর দশকে স্থানীয় নির্বাচিত পৌরসভার প্রতিনিধি শেখ সহীদুল্লাহ্ (আহ্লাদ মিঞা)-এর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় পৌরসভা ওই গোরস্থানে সামান্য আলোর ব্যবস্থা, নিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য অল্প অনুদান মঞ্জুর করেন।

এদিকে প্রায় দুশো বৎসর ব্যবহারের ফলে গোরস্থানে মাটি ক্রমশ নেমে যাওয়ার সাথে সাথে শহর বসিরহাটের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে গোরস্থানের স্থান অপ্রতুল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বর্তমান কমিটির সভাপতি মত্‌লুবর রহমান খান, কার্যকরী সভাপতি সদাহাস্যময় ভদ্রলোক লিয়াকত আলি (প্রাক্তন শিক্ষক, ভ্যাবলা হাইস্কুল) ও উদ্যমী সম্পাদক তরুণ শামসেল আলির প্রচেষ্টায় বসিরহাটের সর্বজনপ্রিয় সাংসদ অজয় চক্রবর্তী ওই গোরস্থানের উন্নতির জন্য তাঁর সাংসদ তহবিলের থেকে ২৫ লক্ষ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা অনুদান দিয়েছেন।

এবং বর্তমান কমিটি ইতিমধ্যেই ওই অর্থের সুব্যবহারের জন্য জোরকদমে সর্বাত্মকভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে।

সর্বজনীন পাটকেল মাজার খোলা :

মৌজা-জিরাকপুর, থানা-বসিরহাট, খ. নং-২৩৮, দাগ নং-১৮ ও ২০ সর্বমোট এরিয়া—৪০.২০৮ শতক + ৮ কাঠা।

বসিরহাট পশ্চিমপাড়া কবরস্থান : স্থাপিত —১৯৩৫

থানা-বসিরহাট, মৌজা-মৃজাপুর, আর.এস খতিয়ান-৬৫৩, ৬৭৩, দাগ নং-৭২৬,৭২৫, মোট এরিয়া-৬১ শতক, জে.এল-৪১।

বসিরহাট ফাল্গুনী সিনেমা হলের ঠিক পিছনে পশ্চিমপাড়া কবরস্থানটির অবস্থান মৃজাপুর মৌজায়। হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক নজির এই কবরস্থানটি। হিন্দু মালিকের জমির ওপরে গড়ে ওঠা ওই কবরস্থানটি একটা সময়ে রক্ষার জন্য স্থানীয় হিন্দুদের অবদান আজও প্রবীণ মুসলমানেরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

বসিরহাট বড়কালিবাড়ি পাড়ার বাসিন্দা জ্ঞানেন্দ্রনাথের একখণ্ড জমি মৃজাপুর মৌজায় দীর্ঘদিন ধরে অযত্নে পড়েছিল। প্রায় জনশূন্য ওই অঞ্চলের ওই জমিটি দীর্ঘদিন আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে পতিত হয়ে পড়েছিল। এরপর স্থানীয় কিছু মুসলিম বাসিন্দা মাঝে মাঝেই ওই জমিতেই তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের মৃতদেহ কবরস্থ করতেন। এমতাবস্থায়, মুসলমান সাধারণের কবরস্থান হিসাবে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় মুসলমানদের অনুরোধে কালীবাড়ি পাড়ার জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী নিশারানী দেবী ১৯৩৯ সালের ৮ ডিসেম্বর মাত্র ৫০০ (পাঁচশো) টাকার বিনিময়ে ৬১ (একষট্টি) শতক জমি স্থানীয় বাসিন্দা মোঃ অখিলদ্দিন গাজী (পিং মৃত কছিমুদ্দিন গাজী) ও মোঃ ইমামতি গাজীর (পিং মৃত মনিরুদ্দিন গাজী) নিকটে রেজিস্ট্রি করিয়া দেন। দলিল নং-৪২২২, তাং-৮.১২.৩৯। এর ২ মাস পরে অখিলউদ্দিন ও ইমামতি ওই জমি পশ্চিমপাড়া মাজার কমিটির পক্ষে কেরামত আলি মণ্ডল ও চেরাক আলি মণ্ডলকে ওই একই দামে জমিটি হস্তান্তর করেন। দলিল নং-৪৩৬ তাং ৬.২.১৯৪০। এইভাবে মাজার কমিটির সম্পাদক হিসাবে হাজী শামসের আলি মাজার কমিটরি পক্ষে ওই জমিটির মালিক হন।

এরপর ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক নেতাদের বদান্যতায় ভারতবর্ষ দুভাগ হয়ে পড়ে। শহর বসিরহাটের একেবারে পাশ দিয়েই তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তান। এই দেশ বিভাগকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে শুরু হয় গোলমাল, দাঙ্গা। একদল মতলববাজ এই সুযোগে মেতে ওঠে সম্পদ সম্পত্তি লুঠতরাজের নেশায়। ইতিপূর্বেই জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে আশপাশের স্বরূপনগর, মালঙ্গপাড়া, শিবহাটী, ভেবিয়া, রাজেন্দ্রপুর, রামনারায়ণপুর, পুঁড়া, খোরগাছি ইত্যাদি অঞ্চলের বহুমানুষ প্রশাসনিক কেন্দ্র শহর বসিরহাটে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এর সাথে সদ্য দেশভাগের কারণে বসিরহাটে আগত ছিন্নমূল মানুষদের একটা অংশ যুক্ত হয়। এইসব মতলববাজ

মানুষ ছিন্নমূলদের ক্ষোভকে সুকৌশলে ব্যবহাব করে। তারই ফলশ্রুতিতে মৃজাপুর মৌজার একদল মানুষ ওই কবরস্থান বন্ধ করার অছিলায় ওই স্থান ছেলেদের খেলার মাঠ হিসাবে দাবি করেন। এমতাবস্থায়, ওই কবরখোলাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বসিরহাট আদালতে এই নিয়ে একটা মামলা রুজু হয়। বাদীপক্ষ অর্থাৎ একদল মানুয (সর্বমোট চল্লিশ জন) একটা আবেদন ভিত্তিতে আদালতে মামলা করেন। বিবাদী পক্ষে ছিলেন মাজার কমিটির পক্ষে জোবেদ আলি মণ্ডল। ইনি প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ কাসেদ আলি সাহেবের চাচা। মামলার নম্বর (এম/২৯০, ১৯৫২)। যাই হোক, এই সময়ে এগিয়ে আসেন হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্য কিছু মানুষ। তাঁরা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জমিদাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি ও এলাকার অত্যন্ত জনপ্রিয় শ্রীঅজিত দে মহাশয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এইসব সচেতন মানুষের ভূমিকায় মতলববাজদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। আদালতে ওই জমি কবরখোলা বলে নিষ্পত্তি হয়। এরপর ১৯৫৫ সাল থেকে আবার ওই জমিতে মুসলমানদের শবদেহ কবরস্থ হতে থাকে।

পশ্চিমপাড়া কবরস্থান মূলত বসিরহাট পশ্চিমপাড়ায় বসবাসকারী মুসলমানদের জন্যই এখনও ব্যবহৃত হয়। এখানে সাধারণত অন্য অঞ্চলের মুসলমানদের কবরস্থ করা বা না করা মাজার কমিটির বিবেচনাধীন। এই রীতি সূচনাকাল থেকেই চলে আসছে। তবে এর যে কোনো অন্যথা হয়নি। তা নয়। যেমন ১৯৩০ এর শেষভাগে এবং ১৯৪০-এর সূচনা মুসলিম সমাজের হজরত পির রুহুল আমিন (রঃ) সাহেব গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাঁর তদ্‌বির ও পরিচর্যার জন্য পশ্চিমদেশ থেকে দু-জন বিদগ্ধ পুরুষ বসিরহাটে আসেন। কিন্তু হযরত পির রুহুল আমিন (রঃ) তখনকার মতো সুস্থ হয়ে উঠলেও, বঙ্গদেশের জলহাওয়ায় ওই দু-জন পুরুষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বসিরহাটেই প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে, বসিরহাট পশ্চিমপাড়া কবরস্থানে ওই দুইজনকে সমাধিস্থ করা হয়।

পশ্চিমপাড়া কবরস্থান পৌরসভার নিজস্ব কবরস্থান নয়। তাই অদ্যাবধি ওই কবরস্থান পৌরসভার কোনোরকম অনুদান পায়নি। এর রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, সৌন্দর্যকরণ ইত্যাদির সকল ব্যয়ভার স্থানীয় মুসলমানেরাই করে থাকেন। এই কাজে স্থানীয় মুসলিম ব্যবসায়ী ও বিত্তবানেরা নানা সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৬০-এর দশকে পশ্চিমপাড়া গাড়ির হাট সমিতির ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) এবং ১৯৮০-এর দশকের গোড়ায় পশ্চিমপাড়া মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ২০০০০০্ (দু-লক্ষ টাকা)।

অতীব রমণীয় ও সুসজ্জিত এই কবরখানাটির মাজার কমিটির বর্তমান সম্পাদক হাজী আশরফ আলি ও মাজার কমিটির প্রাণপুরুষ মামুদ ভাই-এর বিবৃতি থেকে একথা স্পষ্ট যে ওই

কবরখোলাটি পরিচালনার ব্যাপারে তাঁরা অত্যন্ত আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পথ অবলম্বন করে আসছেন।

বসিরহাট পৌপর বেরিয়াল গ্রাউন্ড :

স্থাপিত - ১৯৩৪

থানা - বসিরহাট, মৌজা - বসিরহাট।

দাগ নং- ৪৫৪৭ - ৩৯ শতক সর্বমোট জমি।

৪৫৪৮ - ৩৫ শতক - ৯৯ শতক সর্বমোট।

৪৫৪৯ - ১৮ শতক।

৪৫৫০/৯১২৯ - ৭ শতক।

বসিরহাট পৌরসভার নিজস্ব কবরখোলা হল বসিরহাট পৌপর বেরিয়াল গ্রাউন্ড। বারাসত-টাকী রোডের গায়ে বসিরহাট রেল স্টেশনের একদম পাশে অবস্থিত ওই গোরস্থানটিই বসিরহাটে সর্বাধিক পরিচিত কবরখোলা। তবে ওই কবরস্থানটির উৎপত্তি ও সৃষ্টি সম্বন্ধে জানাতে গেলে আগে অন্য একটি গোরস্থানের কথা উল্লেখ করতে হবে।

বসিরহাট শহরের ইটিন্ডা রোড-এর কথা বাদ দিয়ে অন্য অংশ (যাকে স্থানীয়ভাবে অনেকে নীচের বসিরহাট বলে থাকেন) অর্থাৎ বিশাল সাঁইপালা অংশে বোধহয় এমন একটিও হিন্দু পরিবার খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা একাধিক্রমে দুশো বছর বা তার বেশিদিন ধরে বাস করছেন। যদিও পৌরসভার সৃষ্টি ১৮৬৯ সালে, কিন্তু তার বহুপূর্ব থেকেই এই সাঁইপালায় বহু মুসলমান পরিবার বংশানুক্রমিকভাবে বাস করে আসছিলেন। এই রকম একটি পরিবারের একজন ব্যক্তি ছিলেন হাজী শেখ আবদুল্লা। এনার মৃত্যু আনুমানিক একশো দশ বছর আগে, পাঠক লক্ষ করুন, ওই সময়েই তিনি হজ করে এসেছিলেন। এই হাজী শেখ আব্দুল্যার পূর্বপুরুষেরা বসিরহাটের (তখন এর নাম কি বসিরহাট হয়েছিল?) মুসলমান জনসাধারণের গোরস্থান হিসাবে ব্যবহারের জন্য নিজেদের একখণ্ড জমি ব্যবহারের অনুমতি দেন। বসিরহাট মৌজায় অবস্থিত ওই জমিটির মোট পরিমাণ ৫৩ শতক। জমিটির বর্তমান দাগ নং-৪৯৮৬ এবং খ. নং-২৫৭৭।

দীর্ঘকাল ধরে স্থানীয় মুসলমানেরা ওই জমিটি গোরস্থান হিসাবে ব্যবহার করে আসছে, এরপর ১৮৯৯ সালের ৫ ডিসেম্বর ভারত সরকার কমিশন নং-৩০৬ আর.এল.এ বলে ওই কবরখোলা খাসজমি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে। বসিরহাট এস.এন মজুমদার রোডের উপরে (পূর্বতন নাম সারদা দালাল রোড?) বসিরহাট পুলিশ ফাঁড়ির ঠিক পাশেই অবস্থিত এ গোরস্থানটি দীর্ঘকাল রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে প্রায় জনবিরল ওই গোরস্থানটির আশেপাশে অনেক হিন্দু পরিবার এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। এমতাবস্থায় মুসলমান জনসাধারণের জন্য একটা নতুন নতুন গোরস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আর

তা থেকেই টাকি রোডের ওপর পৌরসভার ওই কবরখোলাটি সৃষ্টি।

বসিরহাটের বিখ্যাত মুসলমান পরিবার খানবাহাদুর পরিবার, খানবাহাদুর গোলামকাশেম ছিলেন উদার দানশীল ব্যক্তি। টাকি রোডের পাশে তাঁদের অনেক জমি পতিত হিসাবে পড়েছিল। ওই অঞ্চলের মুসলমানেরা ওই পতিত জমি মৃতদেহ কবরস্থ করার কাজে ব্যবহার করত। বর্তমান পুশি ফাঁড়ির পাশের কবরস্থানের বিকল্প অনুসন্ধান শুরু হলে খানবাহাদুরেরা তাঁদের ওই জমি মুসলমান জনসাধারণের কবরস্থান হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি দেন। এরপর খানবাহাদুর এফ.এম আব্দুর রহমান ওই কবরস্থান উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ওই জমি বসিরহাট পৌরসভাকে দান করেন।

ওই জমি ইং ২০/৪/১৯২৯ সালে ভারত সরকারের ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন আইনের ৬৫২০ নং নোটিশ অনুযায়ী সরকারের খাস দখলে আসে। এরপর বাংলা ১৩৪১ সালে ইং ১৯৩৪ সালের মে মাসে খানবাহাদুর এফ.এম. আব্দুর রহমান সাহেব (এম.এল.সি)-এর উপস্থিতিতে তদানীন্তন পৌরপিতা শ্রী শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস ওই কবরস্থানটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৌরসভার নিজস্ব কবরস্থান বলে অধিগ্রহণ করেন এবং এর নামকরণ করা হয় বসিরহাট পৌপর বেরিয়াস গ্রাউন্ড (পৌপর কথার অর্থ যাদের কবরের জন্য নিজস্ব জমি বা মাটি নেই)

মজার কথা হল, পৌরসভা কর্তৃক অধিগ্রহণের পূর্বে স্থানীয় ধর্মপ্রাণ ও বিত্তবান মুসলমানদের অর্থানুকূল্যে তবু মাঝে মাঝে ওই গোরস্থানের সংস্কার ও পরিচর্যা হত। কিন্তু পৌরসভার হাতে আসার পর দীর্ঘকাল ধরে অযত্নে থেকে থেকে ওই গোরস্থানটি বাস্তবিকপক্ষেই ভৌতিকগল্প বা রহস্যগল্পের কবরস্থানের চেহারা নিল। এমনকী সন্ধ্যার পরে নিতান্ত নিরুপায় না হলে সাধারণ মানুষ ওই পথে হাঁটাচলা করত না। এমতাবস্থায়, স্থানীয় সচেতন ও উদ্যমী একদল তরুণ মুসলমান এর বিহিত করার জন্য এগিয়ে আসলেন।

এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালে তৈরি হল একাত্মবাদ সঙ্ঘ। আরশাদ আলি মোল্যার সভাপতিত্বে ও সম্পাদক মনসুর আলি গাজীর প্রচেষ্টায় একাত্মবাদ সঙ্ঘ তাঁদের সীমিত সামর্থ নিয়ে কবরখোলার পবিত্রতা রক্ষা এবং উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে উদ্যোগী হল।

নরীম মোল্যার নাতি বিত্তশালী হাজী রব্বানী মোল্যার বাড়ির চত্বরে প্রত্যেক শবেবরাতের রাতে একাত্মবাদ সঙ্ঘ একটা ইসলামীয় জলসার আয়োজন করত। ওই জলসা থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে একদিকে যেমন তাঁরা কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য চালানোর প্রচেষ্টা করত, তেমনি পাশাপাশি স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করে পৌরসভার কাছে নিয়মিত কবরখোলার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের প্রশ্নে নানা দাবিপত্র পেশ করে আসছিল। বোধহয়, এক নাগাড়ে তাদের ডেপুটেশনের ফলে পৌরসভার কানে জল ঢোকে। তাই দেখা যায়, অবশেষে ১৯৮০-এর দশকের গোড়ায়, চেয়ারম্যান হরিনারায়ণ ঘোষের উদ্যোগে পৌরসভা একটা মোটা টাকা ব্যয় করে এখানে অনেক কিছু করে দেয়। এই প্রকল্পে সমগ্র কবরখোলা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরার বন্দোবস্ত করা হয়। গোরস্থানের ঠিক মাঝখানে শবযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একটি মাথা ঢাকা

চাতাল বানানো হয় এবং একটা ইলেকট্রিক বাতি জ্বালানোর বন্দোবস্ত করা হয়।

কিন্তু তারপর আবার যে কে সেই। পৌরসভা এর উন্নয়নের প্রশ্নে সম্পূর্ণ উদাসীন। পৌরসভার নিজস্ব কবরস্থান—অথচ কোন কর্মচারী নেই, নেই মৃতব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করার কোন রেজিস্টার, এমনকী পৌরসভা ঘরে কোথাও এর রেকর্ডও খুঁজে পাওয়া গেল না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী এই প্রতিবেদককে বলেই দিলেন—কবরখোলা আমাদের না, ওটা মুসলিমদের, ওরাই দেখাশুনা করে। হ্যাঁ, উনি ঠিকই বলেছেন, কারণ পৌরসভা যখন কিছুই করে না, তখন দায়িত্ব তো নিতেই হবে। সমাধিস্থ ব্যক্তির হিসাব তো রাখতেই হবে। কবরস্থানের পবিত্রতা রক্ষা কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে তো উদাসীন থাকলে চলবে না। আর তাই ১৯৯৪ সালে একাত্মবাদ সঙ্ঘ রূপান্তরিত হল আল আমিন সেবা সমিতিতে। এই সমিতিই এখন তাঁদের সীমিত ক্ষমতা ও সামর্থ নিয়ে পৌপর গোরস্থানকে এখনও পৌপর হতে দেয় নি।

এছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট কবরখোলার পাশাপাশি শহর বসিরহাটে বেশ কয়েকজন পির ও আউলিয়ার কবরস্থান আছে যেগুলো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে নেওরাদিঘির পশ্চিমধারে পির রমজান আলি (রঃ)-র মাজার, টাকি রোডের ধারে হুজুর হজরত আল্লামা রুহুল আমিন (রঃ)-এর মাজার, শোন পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে হাফেজ আব্দুর রহমান এবং শোনপুকুরের পূর্বপাড়ে অবস্থিত হজরত শাহ্ মিয়া (রঃ)-এর কবরশরিফ। (প্রসঙ্গত *লোক* পত্রিকার জলাশয়/দিঘি খণ্ডে শাঽ মিঞা সম্বন্ধে বিস্তৃত লেখা হয়েছে)। তবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শহর বসিরহাটে যে পবিত্র কবরশরিফ সবচেয়ে বেশি পবিত্র ও আকর্ষণ করে তা হল আস্তানা রোডের ধারে অবস্থিত পির শাহ্ আলি (রঃ)-এর পবিত্র আস্তানা শরিফ।

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে দিল্লীতে বিন তুঘলকের রাজত্বকালে হজরত খান জাহান আলি (রঃ) -এর নেতৃত্বে যে বাইশ জন আউলিয়া বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন হজরত শাহ আলি রহমতুল্লাহ, আলাইহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর কোনো নির্ভরযোগ্য জীবনী বা ইতিহাস পাওয়া যায় না। যেটুকু জানা যায় সবটাই কথিত। বাগদাদ থেকে আগত এই সাধক তৎকালীন বঙ্গদেশীয় শাসক সুলতান হুসেন শাহ্-এর আনুকূল্য ও বদান্যতায় এই অঞ্চলে ইসলামধর্ম প্রচারের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। ইছামতীর দক্ষিণতীরে যে স্থানে তিনি আশ্রয়স্থল গড়ে তুলেছিলেন, তাই পরবর্তীকালে আস্তানা রোড নামে অভিহিত হয়। কথিত, তিনি নাকি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। অতঃপর এই সাধক তাঁর আস্তানায় যথাকালে পরলোক গমন করলে ওই স্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। আর তারপর থেকেই স্থানীয় মুসলিম জনসাধারণের কাছে ওই মাজারখোলা অত্যন্ত পবিত্রস্থান বলে গণ্য হয়ে আসছে। আজও বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ ও পুণ্যার্থী মুসলমান ওই আস্তানায় তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও রোগমুক্তির জন্য নিয়মিত প্রার্থনা করেন।

বসিরহাট শ্মশান :

বসিরহাটে একাধিক কবরখোলা থাকলেও শহর বসিরহাটে শ্মশান মাত্র একটি। যেহেতু মুসলিম অধ্যুষিত শহর ছিল একদা, তাই এর কারণটা না বোঝার কোন অসুবিধা নেই। যদিও আশেপাশে আরও কতকগুলো শ্মশানের অস্তিত্ব আছে। যেমন—*ইটিন্ডার শ্মশান*। যদিও নামে এটি ইটিন্ডার শ্মশান, কিন্তু বাস্তবে এটা ধলতিথা মৌজায় অবস্থিত। এতদ্অঞ্চলের শ্মশানগুলির মধ্যে এটিই সুপ্রাচীন, যদিও ধলতিথা গ্রামের মুসলিম তরদী মণ্ডলের জমিতে গড়ে ওঠা আদি শ্মশানটি বহুকাল আগেই খেয়ালি ইছামতীর গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এরপর দে পরিবারে প্রায় ১ বিঘা জমিতে এই শ্মশান এখনও তার প্রাচীনত্ব নিয়ে বিরাজ করছে। সবদিক দিয়েই সমাজবিরোধী মুক্ত এই শ্মশান এখন সরকারি কিংবা বেসরকারি সহায়তার দিকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

এরপর উল্লেখ্য শহর বসিরহাটের উপকণ্ঠে অবস্থিত *ধান্যকুড়িয়া শ্মশান*। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গ্রন্থাগারিক ছিলেন পুরন্দর মণ্ডল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পুরন্দরের কর্ম দক্ষতায় খুশি হয়ে তাঁকে ধান্যকুড়িয়ার পত্তনী দান করেন। প্রায় সম্পূর্ণ নাবালক জমিকে চাষবাস ও মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তোলেন পুরন্দর। মূলত মণ্ডল, গাইন ও বাইন পরিবার অধ্যুষিত ধান্যকুড়িয়ার নেহালপুর মৌজার বিদ্যাধরী শাখা নদীর ধারে ১৮৭০ এর দশকের ১ম ভাগে গাইনদের জমিতে এবং বাইনদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা হয় ধান্যকুড়িয়া শ্মশানের। এতদ্অঞ্চলের শ্মশানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুযোগ এই শ্মশান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। জনশ্রুতি, এখানে এখনও বেওয়ারিশ লাশ গোপনে পোড়ানো হয়। আরও অভিযোগ, এই মহাশ্মশানে আত্মীয় পরিজনের নশ্বর দেহ পরম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার আগে পবিত্র পূজোপাঠ ও নিয়মকানুনের কাছাকাছি আসতে পারে না।

ইটিন্ডার মহাশ্মশান, ধান্যকুড়িয়ার মহাশ্মশান, ভেবিয়ার শ্মশান যখন প্রতিষ্ঠিত ও চালু তখনও কিন্তু সেই অর্থে শহর বসিরহাটে কোনো স্থায়ী শ্মশান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তখনও পর্যন্ত ইচ্ছামতী নদীর তীরেই হিন্দুরা শবদাহ করে আসছিল। অঞ্চল ও পাড়াভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই শবদাহ স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল বসিরহাটের জামরুলতলা অঞ্চলের ইছামতী নদীসংলগ্ন স্থান। পরবর্তীতে অন্য দাহস্থানগুলো ক্রমশ উঠে গেল—থেকে গেল জামরুলতলা দাহ স্থানটি। এটাই পরিবর্তিত হয়ে গড়ে, উঠল *বসিরহাট শ্মশান*।

তবে বর্তমানে যে স্থানে ও যে জমিতে বসিরহাট শ্মশান অবস্থিত, প্রথম অবস্থায় শ্মশান ছিল আরও অনেক উত্তরে। বর্তমান শ্মশান থেকে প্রায় ১০০ মিটার উত্তরে। এর নামছিল *টুনিবামনির ঘাট*।

ট্যাটরা গ্রামের চ্যাটার্জি পরিবার মহকুমার এক বিশিষ্ট নামকরা বনেদী পরিবার। দিগম্বর তর্কবাগীশ, পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় ও নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় এই তিন ভাইয়ের পিতা ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারের বিধানদাতা পণ্ডিত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেমন তাঁর গ্রন্থগারিক পুরন্দরমণ্ডলকে ধান্যকুড়িয়া অঞ্চলের পত্তনী দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিই দিগম্বর, পীতাম্বরদের

পিতাকে রঘুনাথপুর সংলগ্ন রামনারায়ণপুরে ভূমিদান করেন। পরবর্তীতে বড়ভাই দিগম্বর তর্কবাগীশ দুই অনুজ পীতাম্বর ও নীলাম্বরকে তন্তুবায় অধ্যুষিত তন্তুরা গ্রামে বা ট্যাটরা গ্রামে জমি দিয়ে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এই নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়ের বংশধারার সপ্তম পুরুষ ছিলেন আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। আশুতোষের একপুত্র দুর্গাদাস ও দুই কন্যার জ্যেষ্ঠা ছিলেন টুনি। অসামান্যা সুন্দরী টুনি অঞ্চলে টুনি বামনী বলে সমধিক প্রসিদ্ধা ছিলেন। সম্ভবত ১৯২০-এর দশকের প্রথমভাগে এই টুনি অকালে অল্পবয়সে আত্মঘাতী হন। এদিকে এই সময়ে বসিরহাট কোর্টের যশস্বী মোক্তার হিসাবে খ্যাত ছিলেন চ্যাটার্জি পরিবারের বিখ্যাত পুরুষ যোগেশ চ্যাটার্জি। ইনি ছিলেন নীলম্বরের অগ্রজ পীতাম্বরের বংশধারার ৬ষ্ঠ পুরুধ। সম্পর্কে টুনি বামনী ছিলেন যোগেশের নাতনী। জামরুলতলার নদীর ধারে টুনিবামনীকে দাহ করা হয়। এরপরে যোগেশ ওই স্থানে নদী সংলগ্ন একটি ঘাট নির্মাণ করেন এবং দাহস্থানে একটি সিমেন্ট বাঁধানো চত্বর তৈরি করে দেন। বস্তুত ওই সময় থেকেই মানুযের মুখে মুখে প্রচলিত টুনি বামনীর ঘাট একটা সার্বজনীন শ্মশানের রূপ নিতে শুরু করে।

রাক্ষসী ইছামতী অচিরেই টুনি বামনীর চত্বর সমেত ঘাটকে একরাত্রে গ্রাস করে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ওই স্থান বসিরহাটের শ্মশানরূপে পরিচিতি লাভ করায়, হিন্দুধর্মের মানুষেরা একটু দক্ষিণে সরে আসা ইছামতীর তীরে শবদাহের কাজ চালাতে থাকে। খানবাহাদুর এফ.এম. আব্দুর রহমান সাহেব তখন পৌরসভার চেয়ারম্যান। এরপর ১৯৪২ সালে প্রয়াত হন বসিরহাটের প্রখ্যাত আইনজীবী দ্বিজেন রায় মহাশয়। আদালতে যোগেশ চ্যাটার্জীর এবং দ্বিজেন রায়ের লড়াই নাকি একটা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। পুরনো মানুষদের স্মৃতিচারণে প্রকাশ যে দিন যোগেশবাবু ও দ্বিজেনবাবুর লড়াই থাকতো, সেদিন নাকি আদালতের অন্যকক্ষের কাজকর্ম শিকেয় উঠত। বারের সমস্ত উকিল মোক্তারবাবুদের ভিড় জমতো ওই এজলাসে।

সেই দ্বিজেনবাবুর শবযাত্রা ও দাহ উপলক্ষে নির্মিত হল নতুন স্থানে নতুন শ্মশানঘাট। বারের প্রখ্যাত অন্য আইনজীবী শ্রীরাধিকা চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও অনুরোধে তদানীন্তন চেয়ারম্যান পশুপতি রায়চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল বসিরহাট শ্মশান। ক্রমশ নতুন প্রজন্মের মন থেকে হারিয়ে গেল টুনি বামনীর ঘাট। ওই স্থানে একটা মন্দিরও নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু টুনি বামনীর ঘাট থেকে দক্ষিণে সরে আসা এই নতুন শ্মশানও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ক্রমশ এটাও হারিয়ে যেতে লাগল ইছামতীর ভাঙনে। ফলে শ্মশান আরও দক্ষিণে সরে এল সৈয়দ সাদেক আলীদের জমিতে।

জামরুলতলার এক বর্ধিষ্ণু ও বিত্তশালী পরিবার এই আলী পরিবার। বসিরহাটের তপামৃজাপুর মৌজায় ২২৫৪ দাগে একত্রে ৩.৯০ শতক একখণ্ড জমি ছিল। ওই জমিরই উত্তর অংশে গড়ে উঠল নতুন শ্মশান। ১৯৪০-এর দশকের ১ম ভাগে বসিরহাটের হিন্দু সম্প্রদায় ইছামতীর ভাঙ্গনের কারণে বাধ্য হয়ে শ্মশান সরিয়ে নিয়ে এল আরও দক্ষিণে আলীদের জমিতে। সৈয়দ সাদেক আলির পুত্র বশরাত আলি ও ভ্রাতুষ্পুত্র মেহের আলির মালিকানাভুক্ত এই জমিতে

দীর্ঘকাল শবদাহ চলতে লাগল। এরপর ১৯৪৯ সালের শেষভাগে বশরাত আলির সুযোগ্যপুত্র সৈয়দ এহসান আলি পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান নির্বাচিত হন। এবং তখন সৈয়দ এহসান আলিই ২২৫৪ দাগের ৩.৯০ শতক জমি থেকে বাটা করে ২৪২৫ দাগে সর্বমোট ৮১ শতক জমি পৌরসভার হাতে শ্মশান হিসাবে অনুমতি দখল প্রদান করেন। (নোটিফিকেশন নং-৩৭৭৫ এল-এ, কেস নং-১৪, ১৯৫৫-১৯৫৬)। এইভাবেই বসিরহাট শ্মশান পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

টুনিবামনীর ঘাট-এর সূচনা পর্বের শুরু থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্মশানে কোনো আলোর বন্দোবস্ত ছিল না। বসিরহাট শ্মশানে প্রথম এল গ্যাসের বাতি। সে এক মজার ঘটনা। পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভূক্ত ৯৬নং হোল্ডিং-এ অবস্থিত শ্মশানে দীর্ঘকাল ধরেই একটা আলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। শ্রীশরচ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় তখন পৌরসভার চেয়ারম্যান। আকৃতির দিক দিয়ে ছোটোখাটো হলেও মানুষটি ছিলেন দাপুটে ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও কুশলী সিদ্ধান্তে সমসময়ে তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না। ধলতিথা জেলেপাড়া নিবাসী বিষয়ভোগী ভূপতি মণ্ডলের অবহেলা ও অজ্ঞানতার কারণে পৌরসভার দেয় বার্ষিক ট্যাক্স অনেক বাকি পড়েছিল। পৌরসভা তার আয় বৃদ্ধির জন্য অনেক মানুষের সাথে ভূপতি মণ্ডলের উপরেও নোটিশ জারি করে। অশিক্ষিত ভূপতিমণ্ডল নোটিশ পেয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে শরৎবাবুর শরণাপন্ন হন। বুদ্ধিমান শরৎবাবু বসিরহাটের মানুষের স্বার্থে আর ভয় দেখান। ভীত ভূপতি মণ্ডল তখন জেল জরিমানার হাত থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে শরৎবাবুর প্রস্তাবমতো জামরুলতলা শ্মশানে সর্বপ্রথম গ্যাসের বাতি দান করতে স্বীকৃত হন। এইভাবে সর্বপ্রথম বসিরহাট শ্মশানে গ্যাসের বাতি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত তখনও বসিরহাটে বৈদ্যুতিক আলো আসেনি।

বসিরহাট শ্মশানের সাথে তন্ত্রসাধনার একটা স্পর্শ আছে। যদিও সেই অর্থে তান্ত্রিক সাধনার শবসাধনা, নরবলি ইত্যাদির কথা কখনও শোনা যায়নি। আর সতীদাহ পর্বের বহু পরে এই শ্মশানের উৎপত্তি—তাই সতীদাহের কোনো প্রশ্নই জড়িত নেই। বস্তুত, একমাত্র তারাগুণিয়া ভিন্ন টাকি, ভেবিয়া, ধান্যকুড়িয়া, আঁধানি, ইটিন্ডা, জামরুলতলা, হরিশপুর কোন শ্মশানেই কখনও সতীদাহ হয়েছে শ্রুত হয়নি। একমাত্র তারাগুণিয়ার পুরনো শ্মশানে নাকি ১৮৬০-এর দশকে একটা সতীদাহ ঘটনা ঘটেছিল—একথা শোনা যায়। যদিও এর সপক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণ এখনও সংগৃহীত হয়নি। তবে অনেক শ্মশানেই তন্ত্রসাধনা হত এটা নিশ্চিত। বসিরহাটের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক বামাক্ষ্যাপার ভাবশিষ্য মনিমোহন গোস্বামী (মণি গোঁসাই), যিনি তারাক্ষ্যাপা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, যাঁর আশ্রমে শুধু বসিরহাট নয় বাংলার বহুস্থানের খ্যাতনামা ব্যক্তিদেরও যাওয়া আসা ছিল, বসিরহাট শ্মশানে প্রায়ই সাধনায় উপবিষ্ট থাকতেন—এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন এমন মানুষ আছেন।

একটা ব্যাপার কাকতালীয় হলেও সত্যি, ইছামতী নদীর গতিপথে বসিরহাট মহকুমার জানা শ্মশানগুলোর যতগুলোর অবস্থান সবকটিই ইছামতীর দক্ষিণতীরে। কেমন এমন, এ প্রশ্ন কিন্তু

এখনও উদ্‌ঘাটিত নয়। টাকির শ্মশান, ইটিন্ডার শ্মশান, বসিরহাট জামরুলতলার শ্মশান, হরিশপুরের শ্মশান, তারাগুণিয়ার শ্মশান—সবই ইছামতীর দক্ষিণ তীরে। অথচ এর মধ্যে বেশ কয়েকটি শ্মশানের অপর পার অর্থাৎ ওই স্থানে ইছামতীর বামতীরের জনপদ শুধু জনসংখ্যাতেই নয়, প্রাচীনতার দিক দিয়েও অনেক এগিয়ে। দু'একজন প্রবীণ মানুষের পক্ষে একটা ক্ষীণ যুক্তি অবশ্য শোনা যায় যে, ইছামতীর গতিপথে নাকি দুটি জলের ধারা প্রবাহিত হয়, দক্ষিণদিকে গঙ্গার ধারা আর বামদিক দিয়ে যমুনার ধারা, আর সেই কারণেই গঙ্গার ধারায় গড়ে শ্মশান ও মহাশ্মশানগুলি—যাতে করে পরম পূজনীয় পিতামাতা থেকে পরম আত্মীয় পরিজনের নশ্বর দেহরে ভস্ম গঙ্গার বারিতে বসির্জন দিয়ে পরমপিতায় বিলীন হয়ে যেতে পারে।

তবে একথা ঠিক, এই বিশ্বাস ও আবেগের পিছনে কতটা যুক্তি আছে সেই প্রশ্নেরও কিন্তু কোন উত্তর আজও মেলেনি।



❑ লেখক পরিচিতি : সহ: শিক্ষক, বসিরহাট হাইস্কুল।

বাদুড়িয়ার শ্মশান-কবরস্থান-সমাধিক্ষেত্র

শৈলেন্দ্রনাথ কাবাসী

যারা মরা গেছে, তারা সত্যিই মরে যায়নি
তারা বেঁচে আছে অরণ্যের ঘন ছায়ায়।
মৃতেরা মাটির নিচে নেই
তারা বেঁচে আছে দোলায়মান বৃক্ষে
মর্মরিত অরণ্য শাখায়।
তারা রয়েছে বেগবতী স্রোতস্বিনীর গতির মধ্যে,
রয়েছে স্থির সায়রে
রয়েছে কুটিরে, জনা'রণ্যে।
মৃত, মৃত নয়।
যারা মৃত তারা চিরকালের জন্য আমাদের ছেড়ে যায়নি।
তারা বেঁচে রয়েছে মায়েদের বুকে,
বেঁচে রয়েছে ক্রন্দনাতুর শিশুর মধ্যে,
বেঁচে আছে জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডে।
মৃতেরা মাটির নিচে নেই
তারা রয়েছে নিভন্ত অগ্নির মধ্যে
তারা রয়েছে ভেজা ঘাসে
রয়েছে পাহাড়ের গোঙানো প্রতিবাদের মধ্যে
মৃতেরা মৃত নয়।

(From chants d'ombre suivis de Hosties Noires, ed. Leopoed Senghor. মৃত্যু ও পরলোক/নিগূঢ়ানন্দ)।

যদুরহাটী : যদুরহাটী দঃ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন খাসপুর-ষাঁড়াতলা পাকা রাস্তার ধারে দেড় বিঘার বেশি জমিতে কবর স্থান। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে চারদিকে পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন দেড় বিঘা জমিতে গাজিবাবার নজরগা। গাজিবাবার কয়েক শতক পরিমাণ নজরগা বাদ দিয়ে বাদ বাকী অংশ কবরস্থান। তার মধ্যে বাচ্চা ও শিশুদের বয়সের হিসাবে আলাদা আলাদা কবরস্থান হিসাবে সংরক্ষিত আছে। গাজিবাবার উরস উৎসব হয় প্রতি বছর ২২ ফাল্গুন। একসময় সপ্তাহকালব্যাপী জমজমাট মেলা বসত। প্রায় সাত বছর হল মেলা বন্ধ হয়ে গেছে। একই গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন বুনোরআটি গ্রামের সরদারদের তিন

বিঘা জমি এবং এর অদূরে বিবিপুর-বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন আরো তিন বিঘা কবরস্থান আছে। বুনোরআটি সরদার পরিবার কিন্তু যদুরহাটী দ. গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। হাটি, হাটী-সংস্কৃত হট্ট। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে 'মানুষ ও দেবতার নামে হাট'—হাট নাম থেকে গ্রামনাম। আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণেতাগণের কারো অভিমত এমনকী স্থানীয় প্রবীণ মানুষেরা মনে করেন স্থানীয় কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি অনুসারে গ্রামনাম। তেমনি যদুনাথ কাবাসীর নাম থেকেই যদুরহাটি গ্রামের নাম। যদুরহাটী উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন গাজিতলায় এক বিঘা, বড়বাগানে এক বিঘা, কাজিরবাগান এক বিঘা, মোল্লের বাগান ৩৩ শতক। অপভ্রংশ হয়ে মোল্লা হয়েছে। তাই কবরস্থানের জমি ওই মোড়ল এলাকার (পঞ্জী) বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবার ঘোষদের নামে কাগজপত্র, ঘোষবাবুরা কবরস্থানের জমির বর্তমান মালিক। ঘোষবাবুরা কবরস্থানের ওই জমি বিক্রি করে দেবার দাবি আজও তোলেনি। এখানে পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের বসবাসের সঙ্গে সম্পর্কের ফাটল ধরেনি। সম্পর্ক মধুর।) হামিদউদ্দিন/হাসাইল যৌথ নামের প্রায় এক বিঘা, দিদার সাহাজীর এক বিঘা, লাল খাঁ'র বাড়ি প্রায় দশ বিঘা, ঘনির বাগান প্রায় এক বিঘা, মোল্লেদের প্রায় এক বিঘা কবরস্থান আছে।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন-শাহ গৌড়ের সুলতান।।
হেনকাল রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পীরিত।।

মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর সপ্ত ডিঙ্গির মাধ্যমে এই পদ্মা নদী পথেই ভাটি অঞ্চলে বাণিজ্য করতেন বলে উল্লেখ আছে। পদ্মা নদীর পাড়ে এক বিঘা সাত কাঠা জমি সংলগ্ন শ্মশান আছে। স্থানীয় প্রবীণ মানুষের অভিমত এই শ্মশান প্রায় পাঁচ শ' বছরের প্রাচীন এই শ্মশানে পঞ্জি, জঙ্গলপুর, মধ্যমপুর, পিঙ্গলেশ্বর, কলসুর, বেলিয়াখালি, পারপাটনাসহ দশ পনেরোটা গ্রামের মানুষ এই শ্মশানে শবদাহ করতে আসে। এই শ্মশানের পাশাপাশি আছে পবিত্র কবরস্থান। সেও বেশ কয়েক বিঘা। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এই শ্মশান ও কবরস্থানের জমি জঙ্গলপুরের বর্ধিষ্ণু কিছু মানুষ নিজেদের নামে রেকর্ড করে নেয় এবং পরবর্তীকালে শ্মশান ও কবরস্থানের জমি বিক্রি করে দেয়। এরই পাশাপাশি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিরাট বিরাট আমবাগানে তাঁতাল খাঁ ওরফে আবদুল রহমান-এর (পির গোরাচাঁদের সমসাময়িক) রওজা আছে। এখানে ফাল্গুনের শেষ ও চৈত্রের ১, ২ এই তিন দিন ধরে হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়। কথিত, এখানে এক সময় রওজার চর্তুদিকে বাঘ ঘুরে বেড়াত। বাঘের পায়ের ছাপও দেখেছেন অনেকেই। একসময় সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার রওজার চর্তুসীমানায় নানা প্রজাতির বিষধর সাপ ঘুরে বেড়াত। বাঘ কিংবা সাপ কারো কোন ক্ষতি করেনি। একসময় বহু ভক্তের আগমন ঘটত। রওজার পিরোত্তর পরিত্যক্ত জমিতে বাচ্চাদের কবর দেওয়া হত। পিরোত্তর এই সম্পত্তি-ও কোন এক অদৃশ্য হাতের ব্যাকরণে ব্যক্তি মালিকানা হয়ে গেছে এবং ভোগ দখল

করছে। আমবাগানসহ পিরোত্তর সম্পত্তির আয়ের অর্থ পিরের কোন কাজে লাগানো হয় না বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ জানালেন। বর্তমান পিরোত্তর সম্পত্তির লোক দেখানো একটা কমিটি আছে। কমিটিতে গ্রামবাসী দাউদ ভাই, নূর ইসলাম আছেন।

পদ্মার তীরবর্তী এলাকায় চার বিঘা জমি জুড়ে নীলকর সাহেবদের নীল কুঠি এবং নদীর দুই তীরের পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার কয়েকশ বিঘা জুড়ে নীল চাষ হতো। সমগ্র জেলার নীলকুঠির হেড কোয়ার্টা ছিল রুদ্রপুর। পদ্মার তীরবর্তী এই এলাকায় ইংরেজ দুই সাহেবের কবরস্থান এখনও আছে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে। একজনের নাম বানু সাহেব বলে জানা গেছে। অন্যজনের নাম জানা যায়নি। নীলকুঠিয়াল সাহেবদের মধ্যে প্যানটিং সাহেবের নাম স্মৃতির অতল থেকে কেউ কেউ মনে করে বলেন। নীল চাষকে কেন্দ্র করে পদ্মানদীর জলপথে যাতায়াতের জন্য যেমন বন্দর গড়ে উঠেছিল তেমনি নদীর এপার ওপার যাতায়াত করার জন্য নদীর উপর সেতুও তৈরি হয়েছিল। তার প্রমাণ আজও রয়েছে। কবরস্থান ও তাঁতাল খাঁর এলাকা বেশ উঁচু জমি। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট ইটের টুকরো। টুকরো ইট, উঁচু জমি দেখে মনে হয় এক সময় এখানে নদী-বন্দর ছিল। স্থানীয় মানুষও একই কথা বলেন। এছাড়া নদীর উপর সেতুর একটা বিরাট থাম—নদী মজে যাওয়া পদ্মার মাটির উপর থেকে জলের তলার ইট সংগ্রহ করে বেশ বড়সড় একটা ঘর বানিয়েছে এলাকার মানুষ। সেতু ও নদীর দুই পারে যাতায়াতের জন্য এক বিঘা এক কাঠা খাস জমি ছিল।

কাঁকড়া-গৌরীভোজ : কচুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন কাঁকড়া গ্রাম নিম্ন জলাভূমি ও সুন্দরবনাঞ্চল ছিল। এলাকার জমি ছিল বেশ নিচু। বিস্তীর্ণ এলাকা একসময় জলে জলাকার মনুষ্য বসতির অযোগ্য ছিল। এখানকার অধিবাসীরা বহিরাগত। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে এখানে জনপদ গড়ে তোলে। জলাভূমি ছাড়াও বিদ্যাধরীর শাখা নদীও উত্তাল গতিতে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ-এ ভরা যৌবনে একসময় প্রবাহিত ছিল কাঁকড়া গ্রামের গা ঘেঁসে। এছাড়াও কাঁকড়াগ্রাম একসময় টাকির জমিদার সূর্যকান্ত রায়চৌধুরীদের জমিদারির অন্তর্গত ছিল। জমিদারদের এখানকার গাতিদার ছিলেন কাঁকড়া গ্রামের যদুনাথ রায় মণ্ডলরা। 'রায় মণ্ডলরা' 'বাবু' উপাধিতে ভূষিত হতেন গ্রামের প্রজাদের কাছ থেকে। কাঁকড়া গ্রাম যেমন টাকির জমিদারদের তেমনি পাশেই ছিল ধান্যকুড়িয়ার জমিদারদের বহুল সম্পত্তি।

যদুনাথ রায় মণ্ডলের পিসেমশাই কৃষ্ণপদ মণ্ডলের স্ত্রীর শবদেহ প্রথম দাহ করা থেকেই কাঁকড়া গ্রামে শ্মশানঘাট চালু হয়। ১৩৪২ সালের সরকারি রেকর্ডে শ্মশানঘাটের উল্লেখ আছে। আজ থেকে ত্রিশ/বত্রিশ বছর আগে কলকাতা থেকে বাবলু দে নামে এক স্কুল ছাত্র ছোট বয়স থেকেই কাঁকড়া গ্রামের এই শ্মশানঘাটে আসতেন। এই বাবলু দে পরবর্তীকালে গ্রামের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে কষ্টি পাথরের কালী প্রতিমা ও মোজাইক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দুবেলা নিত্য পুজো ছাড়াও প্রতি অমাবস্যায় ধুমধাম করে পুজো হয়ে থাকে। প্রতিবছর ১৪ চৈত্র বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। দূর-দূরান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষের সমাগমে মুখরিত হয়

শ্মশান কালীতলা। তিন দিন সারারাত ধরে যাত্রা, নাটক, গানবাজনা, কথকতা, লোকসংগীত, ফকিরী গানসহ নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শ্মশানকালী পুজো উপলক্ষে মেলা বসে যায়। এছাড়া বাবলু দে'র পরিবারসহ কলকাতা থেকে একাধিক ভক্তপ্রাণ মানুষেরা বৈশাখ মাসের ২ তারিখে এসে পুজোপাঠ করেন সারাদিন ধরে। শ্মশানের অদূরে 'পুঁটে গড়'নামে জমিতে মৃত শিশুদের মাটি দেওয়ার নির্দিষ্ট জায়গা সংরক্ষিত আছে। শ্মশান সীমানা ঘিরে চারদিকে পাঁচিল দেওয়ার কাজ চলছে বর্তমানে। এই শ্মশানঘাটে শবদাহ শুরু করার আগে চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন গৌরীভোজ গ্রামে হাজরাতলায় শতবর্ষ প্রাচীন শ্মশানঘাট ছিল। একসময় দশ/বারোটা গ্রামের শব দাহ করার একমাত্র শ্মশানঘাট ছিল। পরবর্তী কোনো এক সময়ে নিরালা-নির্জন হাজরাতলা ও শ্মশানঘাট এলাকা জুড়ে মানুষের বসবাস শুরু হয়। বসবাস করা মানুষদের বেশিরভাগ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। ক্রমে জনপদ বাড়তে থাকে। তেমনি শব দাহকারীদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে মতানৈক্য হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে শব দাহ কমতে থাকে। এখন আর এই শ্মশানঘাটে শব দাহ হয় না। গৌরীভোজের হাজরাতলার শ্মশান এখন অবলুপ্তির পথে।

কলসুর : বাগজোলা গ্রাম পঞ্চায়েত কলসুর গ্রামে পদ্মা নদীর ধারে একশ বছরের প্রাচীন দশ শতক জমির উপর শ্মশানঘাট। কলসুরের জমিদার রাসবিহারী মণ্ডলদের জমির উপর শ্মশান। শ্মশানের পাশে জমিদারবাবুদের আরও ছাব্বিশ বিঘা জমি এখন বিক্রি হয়ে গেছে। ছেলেরা আগে খেলা করত। এখন চাষআবাদ হচ্ছে। বাগজোলার শুকুর আলি মুসলিম থেকে হিন্দু হয়ে সুকুমার কাহার হয়। সুকুমার এখন শ্মশান সংস্কার ও দেখাশুনা করে থাকে। বর্তমানে কালী মন্দির তৈরির কাজও সুকুমারের তত্বাবধানে হচ্ছে। এই শ্মশানে বাগজোলা, কলসুর ও চণ্ডালআটি গ্রামের গরীব মানুষেরা শবদেহ দাহ করতে নিয়ে আসে। এই শ্মশানতলায় বার্ষিক মেলা হয়ে থাকে। কলসুরে গাছতলায় বৈশাখ মাসে ওলাইচণ্ডী মেলার পরের মঙ্গলবার শ্মশানকালী পুজো হয়ে থাকে। একসময় সুকুমারের পিসিমা কালীপুজো করতেন। এরপর কয়েক বছর ভক্তপ্রাণ সুকুমার ভাবক পুজো করতেন। বর্তমানে সুকুমার ভাবকের বৌদি প্রতিমা মণ্ডল পুজো করে থাকে। চৈত্র মাসে চড়ক পুজোর হাজরা ভূতের ভাত রান্না করে ওখানে রেখে আসা হয়। শ্মশানঘাটে বিকালের দিকে বেশ কিছু মানুষজনকে দেখা মেলে। কেউ কেউ নিয়মিত আসেন পবিত্র শ্মশানঘাটে।

বাজিতপুর : বাজিতপুর উত্তর পাড়ার শ্মশানঘাট প্রায় এক বিঘা জমির উপর। বিনয়কৃষ্ণ বাছাড় শ্মশানঘাট সংস্কার করেছেন। বিনয়বাবুর ভাই আনন্দ বাছাড় তাঁর স্ত্রী স্মৃতির স্মরণে কালীমন্দির নির্মাণ ও যাত্রীনিবাস পাকাপাকিভাবে তৈরি করে দিয়েছেন। মোজাইক করা মেঝে। ঝকঝক, তকতক করছে। বর্তমানে টাকির পূজারী শিবশম্ভু ঠাকুর পুজো-অর্চনা করে থাকেন। 'শ্মশান সেবা সংঘ' নামে একটা কমিটি আছে। কমিটির সদস্যরা শ্মশানের কাজ কর্ম দেখাশুনা করে থাকেন। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সাতদিন ব্যাপী জমজমাট মেলা বসে। যাত্রা, কথকথা, কীর্তন, লোক-সংগীত, নাটকসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে মনোরঞ্জনের জন্য। দুর-

দূরান্ত থেকে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মেলায় হাজার হাজার মানুষের কোলাহলে মুখরিত হয়। অমাবস্যায় ধুমধাম করে শ্মশানকালী পুজো হয়ে থাকে। শ্মশানে জল আলোর সুবন্দোবস্ত ব্যবস্থা আছে।

বাজিতপুর দক্ষিণ পাড়া (খেয়াঘাটের ধারে) পাকা শ্মশান ঘাট : সন্তোষ বৈদ্যের উদ্যোগে বছরে একবার কালীপুজো হয়ে থাকে। দশ কাঠা জমির উপর বর্তমান শ্মশানঘাট। ফতুল্ল্যাপুর রাজবংশী পাড়ায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে গোবিন্দ মণ্ডল, তার বাবা প্রফুল্লকুমার মণ্ডলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্মশানঘাট নির্মাণ করেন পাঁচ কাঠা জমির উপর। দ্বীপ মেঁদিয়া শ্মশানে সাধু থাকেন। টালির চালের ঘর আছে। দক্ষিণ মেদিয়া ইছামতী নদীর ধারে শ্মশান আছে। ভোজপাড়ায় সুন্দর মনোরম পরিবেশে শ্মশানঘাট আছে।

লক্ষ্মীনাথপুর ইছামতী নদীর ধারে শ্মশানঘাট ও পাকা ঘর আছে। জগন্নাথপুর গ্রামপঞ্চায়েত অধীন শ্রীরামপুরে শ্মশানঘাট আছে। শ্মশানকালী পুজো উপলক্ষে সাতদিন ব্যাপী মেলা বসে। মেলায় মনোরঞ্জনের জন্য বিনোদনমূলক নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে। মেলায় অনেক দুর-দূরান্তের মানুষ আসে। কেউ কেউ সারারাত মেলা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখে রাত কাটিয়ে সকালে ঘরে ফেরে।

পান্তাপাড়া : বাদুড়িয়া পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত পান্তাপাড়ায় মোল্লেদের উলের বাগান আট শতক, লিচুর বাগান আট শতক এবং বানির পুবগায় আর একটি দশ শতক জমির উপর কবরস্থান আছে। একান্নবর্তী পরিবার গোলামদের তিন বিঘা জমির উপর কবরস্থান আছে।

বাদুড়িয়া : বাদুড়িয়া পৌরসভার অন্তর্গত শ্মশানঘাট ১১নং ওয়ার্ডে পুঁড়া, ৫নং ওয়ার্ডে বাদুড়িয়া এবং ১৭ নং ওয়ার্ডে মাগুরখালি। কবরস্থান : ১৪নং ওয়ার্ডে খোড়গাছি, ৫নং ওয়ার্ডে বাদুড়িয়া, ৪নং ওয়ার্ডে বাদুড়িয়া, ১৭ নং ওয়ার্ডে মাগুরখালি এবং ১৬ নং ওয়ার্ডে তারাগুনিয়া।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতে আসা ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা ডা. উইলিয়াম কেরীর সঙ্গেই এতদ্ অঞ্চলে আসেন। কেরী সাহেব যান হাসনাবাদে। আর একদল সাহেব বাদুড়িয়ায় এসে মিশন প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার পাশাপাশি সেবামূলক চিকিৎসা পরিষেবা ও কুটির শিল্পের কাজ ছিল মিশনের কাজের অঙ্গীভূত। এখানে নীলকুঠির সন্ধান পাওয়া গেলেও - কোন চার্চের যেমন সন্ধান পাওয়া যায়নি—তেমনি কোনো সাহেবদের মৃত্যুর পর শবদেহ সমাধির জন্য সংরক্ষিত কোন সমাধিক্ষেত্র নেই। খুব সত্যি কথা এ ব্যাপারে এ যাবৎকাল কোন অনুসন্ধানে কেউ তেমনভাবে এগিয়ে আসেনি। বর্তমানে কোনো গবেষকের অভিমত বাদুড়িয়া লন্ডন মিশনারী সোসাইটি হাইস্কুলের (এল.এম.এস) টিনের ছাউনির পুরনো বিল্ডিংই চার্চ ছিল। পুরনো সেই বিল্ডিং যখন ভাঙার কাজ চলছে তখন কোনো কোনো গবেষক চার্চের অনুসন্ধানে এসে পরিদর্শনে স্থির সিদ্ধান্ত ওটাই একসময় চার্চ ছিল। চার্চের কিছু নমুনাও তারা দেখতে পান। কালের গভীরে অতীত ইতিহাস বাঁচিয়ে রাখতে কেউ এগিয়ে

আসেনি। বিলুপ্তির পথে ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি। স্কুলের খেলার মাঠের শেষ প্রান্তে চারটি সমাধি এখানে দেখতে পাওয়া যায়। যার কোনোটার কোনো নাম লেখা নেই। ইট দিয়ে বেদি করা আছে। চারটির মধ্যে একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধীর মিত্র, অন্য আর একটি প্রধান শিক্ষকের শাশুড়ি আর অন্য দুটি ইংরেজ সাহেবের দুটো পাগলা ঘোড়ার সমাধিক্ষেত্র বলে প্রবীণ মানুষের অভিমত।

বাদুড়িয়া সীতানাথ শ্মশান ঘাট : ধান্যকুড়িয়া নিবাসী সীতানাথ মণ্ডল ব্যবসা সূত্রে বাদুড়িয়া আসেন। বার্মা সেগুন, পাট, ধান, গুড় ছিল মূল ব্যবসা। ইছামতী নদী পথে নৌকায় পূর্ববাংলায় যেত। সীতানাথ ব্যবসা সূত্রে প্রচুর ধনশালী হন এবং সম্পত্তির অধিকারী হন। বৃটিশ আমলে পূর্ববাংলা এবং বসিরহাট মহকুমা অঞ্চলে সুখ্যাতি লাভ করেন। বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দান-ধান করতেন। সেসময় যত্রতত্র হিন্দু শবদেহ দাহ করা হত। সীতানাথ মণ্ডলের নাতি প্রাক্তন সরকারি কর্মী নির্মলকুমার মণ্ডল জানালেন আনুমানিক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ইছামতীর তীরে শ্মশানঘাট নির্মাণ করেন। শ্মশানঘাটের মৌজা আরশুলা, জে.এল.নং- ৬৮। বর্তমান জরিপে দাগ নং - ৮০৬। শ্মশানঘাটের জমির পরিমান ২৫ শতক। বর্তমানে ঐ জমি ১নং খতিয়ানভুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে নথিভুক্ত হয়েছে। সরকারি কাগজে মন্তব্য লেখা : শ্মশানঘাট হিন্দু ব্যবহারযোগ্য। বর্তমানে ইছামতী চরটি ভরাট হয়ে চার শতক জমি মদনমোহন সাহার নামে ৪৮৯ খতিয়ানে রেকর্ড হয়েছে। কিন্তু ঐ জমি শ্মশান সংলগ্ন - সেহেতু শ্মশানের হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অজানা কোন হাতের ব্যাকরণে ঐ জমি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড হয়েছে। শ্মশান সংলগ্ন জমিতে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু কয়েকটি পরিবার ভোগ দখল করছে। জনশ্রুতি, সীতানাথ মণ্ডল সফল ব্যবসায়ী ও জনহিতকর কাজের সুনাম বহুদূর দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সীতানাথ মণ্ডল বর্তমান বাংলাদেশের মুকুন্দকাটি নদীতীরবর্তী অঞ্চলে হিন্দুদের শবদেহ দাহ করার জন্য শ্মশানঘাট নির্মাণ করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য শবদেহ কবর দেওয়ার জন্য জমি দেন বলে জানা যায়। বর্তমানে শ্মশানঘাট সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন বাদুড়িয়া পৌরসভা। বাদুড়িয়া পৌরসভার পৌরপিতা সুশান্ত ঘোষ কবরস্থান ও শ্মশানঘাট সংস্কার করেন। শ্যামাপুজো রাতে কালীপুজো হয়। সারা চৈত্র মাসে বাবার গান হয়। গ্যাস চুল্লির জন্য সাংসদ অজয় চক্রবর্তীকে জানানো হয়েছে।

বাদুড়িয়া পৌরসভার রেজিস্ট্রি অফিস সংলগ্ন শ্মশানকালীতলায় বার্ষিক কালীপুজো হয়ে থাকে। পুজো উপলক্ষে সারা রাত ব্যাপী মনোরঞ্জনের বিনোদনমূলক নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শ্মশান কালীতলায় শ্মশানের কোন সন্ধান না পেলেও প্রবীণ মানুষের কাছ থেকে জানা যায় ব্রিটিশ আমলে এক শ্রেণির মানুষের রুজি রোজগার ছিল ডাকাতি। ডাকাতির পর মানুষ খুন করে মাটিতে পুতে ফেলত। সেই ঘটনানুসারে শ্মশানের নাম হয়ে থাকতে পারে।

মাটিয়ার শ্মশান : বসিরহাট মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের অধীন ধান্যকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে পূর্ব নেহালপুর বিদ্যাধরী নদী পাড়ে, জমিদার গাইনবাবুদের প্রজা ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা রাধানাথ

কাবাসী শ্মশানঘাটের জমি দান করেন বলে জানা যায়। মাটিয়া ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি প্রাক্তন শিক্ষক আয়ুব আলি জানালেন রাধানাথ কাবাসী জমি দান করলেও—আসলে ঐ জমি ছিল ধান্যকুড়িয়ার জমিদার গাইনবাবুদের। গাইনবাবুরা বেশ কয়েকবিঘা জমি সর্ত সাপেক্ষে দিয়েছিলেন। ব্যবসায়ী সমিতি ও মানব কল্যাণ ট্রাস্ট শ্মশান উন্নয়ন, সংস্কার ও অন্যান্য কাজ দেখাশুনা করে থাকে। ত্রিনাথ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে শ্মশান সংলগ্ন জমিতে—মাটিয়া শ্মশান মিলন শিবকালী মন্দির সেবাশ্রম নির্মিত হয়েছে বাংলা ১৩৭৬ সালে। সরকারি রেজিস্ট্রেশন নং- (এস./আই.এল./১৪৪৫৩)। সেবাশ্রমের সেবাইত পাগলবাবা সন্তোষ মহারাজ। ট্রাস্ট ও ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে শান্তি আশ্রম নির্মাণ কাজ চলছে। পায়খানা ও বাথরুমের কাজ শুরু হবে। প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে শ্মশানের দেড়শ বছর। শ্মশানঘাটের জমির পরিমাপ ৪৩ শতক। শ্যামাপুজোর রাতে সদ্য প্রতিমা নির্মাণ করে পুজো করার রীতি চালু আছে এখানে। পুজো শেষে রাত থাকতেই প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। ক'দিন ধরে হরি সংকীর্তনের ব্যবস্থা থাকে। শ্মশানঘাট সংস্কার করেন অপূর্বকুমার সাহা ও ব্যবসায়ী সমিতি। ধান্যকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, শ্রীনগর মাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত একটি করে দুটি টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়েছে। ঁবাণীকান্ত মল্লিক, মায়ারানী মল্লিক, ঁচাঁদু দাসের স্মরণে শ্রীমতী কমলা দাস বিদ্যাধরী নদীর তীরে পাকা ঘাট নির্মাণ করে দেন। বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালের প্রাক্তন গার্ডেনার গাছপাগল দাউদগাজী মাটিয়া শ্মশান, ইটিন্ডা শ্মশান, বসিরহাট শ্মশান, নেহালপুর-মহেশতলা দর্গাতলা, বিভিন্ন কবরস্থান, টাকি রোড বরাবর, বিদ্যাধরী নদীর পাড় বরাবর সহ মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে গাছ বসিয়েছেন। গাছপাগল দাউদগাজীর হাতে পোঁতা বহু গাছ মহীরূহে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে শ্মশানঘাট, কবরস্থান, নজর গাঁ'র জমিতে পোঁতা গাছ। গাছপাগল দাউদ গাজীর জীবনের শিকে ছিড়লেও ভাগ্যে পুরস্কার জোটেনি। ইন্দিরা বৃক্ষ মিত্র পুরস্কারের তালিকায় নাম উঠলেও—প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী প্রয়াত হওয়ায় পুরস্কারের তালিকা বাতিল হয়ে যায়। মাটিয়া শ্মশান সংলগ্ন বিদ্যাধরী নদীর তীরবর্তী সাতখালি সংরক্ষিত জায়গায় গরু, ছাগল, ঘোড়া, কুকুরসহ পশুদের কবর দেওয়া হয়। শেষ করা যাক একটি গানের লাইন দিয়ে—

'কবর দাও বা চিতায় পোড়াও
মরলে সবাই মাটি।'

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক।

টাকীর শ্মশান ও কবরস্থান

মৃন্ময় সমীরণ নন্দী

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত টাকী পৌরসভা বাংলাদেশের প্রায় সীমানায় অবস্থিত। ঐতিহ্যের আলোকে উদ্ভাসিত এই পৌরসভা ১৮৬৯ সালের আবির্ভাব কাল থেকে আজও সমান গতিতে চলেছে। মাঝে সামান্য দোলাচল—প্রশাসনের পরিবর্তন: এসব ঘটনা অঞ্চলের মানুষকে আরো রাজনীতি সচেতন করে তুলেছে। এখানকার মাটি উর্বর। নদীর বুক থেকে উঠে আসা স্নিগ্ধ হাওয়া গায়ে মেখে বেড়ে উঠেছে কতো ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষ। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-প্রশাসন—জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিল। তার অটুট ঐতিহ্য ধরে ১৬টি ওয়ার্ডে বিভক্ত এই ছোট্ট পৌরসভাটি সমবেতভাবে আজও অগ্রগতির পথেই পা রেখে এগিয়ে চলেছে। পৌরসভার চেয়ারম্যান কিংবা পশ্চিমবঙ্গের আবাসন মন্ত্রী মাননীয় গৌতম দেব, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলের মানুষ এখন সব রকম পরিসেবার সুযোগ পায়। টাকী পৌরসভা থেকে প্রকাশিত ২০০১ সালের 'ব্রিফ রিপোর্ট' থেকে যতদূর জানা যায়—মোট জনসংখ্যা ৩৭২৬৫। স্ত্রী ১৭৬২২, পুরুষ ১৯৬৪৩। এই জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৫১১২। জালালপুর, বেঁওকাটি, সোদপুর, টাকি, থুবা, রোজিপুর এবং হাসনাবাদ এই পৌরসভার অন্তর্গত। উল্লিখিত রিপোর্টে যদিও ৯৩ শতাংশ শিক্ষিতের সংখ্যা, তবে সকলে এখনও সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তার নমুনা বেশি বলে—এলাকার মানুষ মনে করেন। পৌরসভা তার অন্তর্গত বসবাসকারী মানুষের স্বার্থে সব রকম পরিষেবার সুযোগ দিয়েছে বলে বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন। আলোচনার সূত্র ধরেই বললেন—এখানকার জনসংখ্যার ভিত্তিতে মোট ২টি শ্মশানঘাট এবং একটি কবরস্থান পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত হয়। পাঁচ নং ওয়ার্ডে ইছামতী নদীর লাগোয়া ঘোষবাবুর পাড়ার শেষে স্বর্ণময়ী শ্মশানঘাট অবস্থিত। একসময় টাকীর জমিদার পরিবার নিজেদের প্রয়োজনে শ্মশানঘাটটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা এই শ্মশানঘাট টাকী পৌরসভার হাতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তুলে দেন। পৌরসভার নথিভুক্ত তথ্য থেকে জানা যায় এই শ্মশানঘাটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ —

ডি.এস খতিয়ান নং-১৬২৬ পৃঃ নং-২

অত্রস্বত্বের নিজ দখলীর জমি। জমির পরিমান-৩১ শতক। দাগ নং - ২৩৩৬ (আর. এস খতিয়ান অনুযায়ী দাগ নং - ৩৭৫৯) জমির রকম -শ্মশান, হোল্ডিং নং -৪৩। মন্তব্য - দালান-১ প্রঃ স্বর্ণময়ী শ্মশানঘাট। ২৪/৭/২০ ইং তারিখের ল্যান্ড একুইজেশন ৬১৮-২ নং নোটিফিকেশন সাধারণের ব্যবহার্য, ঘোষবাবুর পাড়ার শেষে।

অন্য শ্মশানঘাটটি টাকী পৌরসভার অন্তর্গত বেঁওকাটি গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। এলাকার মানুষের

কাছে বেঁওকাটি শ্মশানঘাট নামেই পরিচিত। বহু পুরানো আমলের এই শ্মশানঘাট সংস্কারের অভাবে কিছুটা অচল হয়ে পড়েছিল। তবে পৌরসভা তৎপরতার সাথে এই শ্মশানঘাটকে ব্যবহার্য্য করে তুলেছে। বিগত ৭/৮ বছর আগে কর্তৃপক্ষ সংস্কার করেছে। টাকী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত এই শ্মশানঘাট। নথিভুক্ত তথ্য থেকে জানা যায় এই শ্মশানঘাটের অবস্থান। মৌজা-বেঁওকাটি। জে.এল নং-৪৮। দাগ নং-২০৫, ৩৪০ (আর.এস. খতিয়ান অনুযায়ী)।

মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা ভেবে টাকী পৌরসভা ৫নং ওয়ার্ডে যে কবরস্থান তৈরি করেছে, সেটি স্বর্ণময়ী শ্মশানঘাটের লাগোয়া মানসিংহ রোডের ধারে অবস্থিত। টাকী মিউনিসিপ্যাল কবরস্থান নামেই পরিচিত। আর. এস. খতিয়ান অনুযায়ী দাগ নং-৩৯২৭। মৌজা-টাকী। জে.এল নং-৫১। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের এই শ্মশানঘাট ব্যবহার করতে খুব বেশি আগ্রহী নয়। এর পিছনে অবশ্য ধর্মীয় কারণ বর্তমান। সম্প্রদায়ের মানুষের অনেকের বিশ্বাস—মৃত্যুর পরেও দেহ পবিত্র থাকে। কবরের পাশে যদি মসজিদ থাকে। সেখান থেকে আগত নামাজ কিংবা আজানের শব্দে দেহ পবিত্র থাকে এবং আল্লার কৃপা পায়। তাঁরা মনে করেন অপঘাতে মৃত্যু আল্লার এই কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। সেই জন্যে অপঘাতে মৃত্যু কিংবা দাবিহীন মৃতদেহ ছাড়া—টাকী মিউনিসিপ্যাল করবস্থানে সচরাচর কবরের কাজ হয় না।

অথচ পৌরসভা দ্বারা পরিচালিত নয় ১৩ নং ওয়ার্ডে ২০ শতক জমির উপর গড়ে ওঠা রোজিপুরের কবরস্থান অনেক বেশি জনপ্রিয়। কেননা মসজিদের পাশে চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত রোজিপুরের কবরস্থান অনেক বেশি পবিত্র এবং ধর্মভিত্তিক। সেজন্যে এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এই কবরস্থান মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে আসেন। সমষ্টিগত মানুষ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্যে-এই কবরস্থান সারা বছরই পরিস্কার এবং পরিচ্ছন্ন থাকে। রোজিপুরের কবরস্থানের অবস্থানগত পরিচিতি এইরকম আর.এস. খতিয়ান অনুযায়ী দাগ নং ২৭৫৯, ২৭৬১, ২৭৬২, ২৭৬৩, ২৭৬৪, মৌজা-থুবা, জে.এল নং - ৪৭।

কবরের উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ পছন্দ করেন। সেজন্যে বাড়িতে অনেকক্ষেত্রে প্রিয়জনের সমাধি তারা দিয়ে থাকেন। প্রিয়জনকে স্মরণযোগ্য করে রাখার একটা চেষ্টা এর মধ্যে নিহিত থাকে। কিন্তু জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির জন্যে বাসযোগ্য জমির পরিমান কমে আসছে। সেজন্যে বাড়ির কবরের ব্যবস্থা করলেও, স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে জমির অপচয় করতে তারা চান না।

❑ লেখক পরিচিতি : শিক্ষক, গবেষক, প্রাবন্ধিক।

কলকাতার শ্মশান, গোরস্থান, সমাধিক্ষেত্র

'গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল।' একথা সুবিদিত। পশ্চিমতীরে দাহ করলে স্বর্গে যাওয়ার সুবিধা। হিন্দুদিগের এমত সংস্কার সত্ত্বেও কলকাতার বেশীরভাগ শ্মশান কিন্তু পূর্বতীরে। উল্লেখযোগ্য শ্মশান ৫টি। যথা—নিমতলা, কেওড়াতলা, কাশীমিত্র ঘাট, কাশীপুর ও বেহালার সিরিটি মহাশ্মশান। তথ্য মোতাবেক সবচেয়ে পুরনো শ্মশান হচ্ছে কাশী মিত্র শ্মশান ঘাট (১৭৭৪), নিমতলা (১৮২৮), কেওড়াতলা (১৮৬০), কাশীপুর (১৮৭৪-৭৫)। বেহালার সিরিটি শ্মশান সাবর্ণ চৌধুরীদের ব্যক্তিগত শ্মশান হিসেবেই পরিচিত। এগুলি সবই পূর্বতন ২৪ পরগণার শ্মশান। বর্তমানকালেব কলকাতার ভেতরেই গড়িয়া শ্মশান। আদিগঙ্গার তীরে। 'অন্তর্জলি যাত্রা'র ঘাট হিসেবে গোটা দেশেই এর খ্যাতি ছিল। কলকাতার শ্মশান হিসেবে তেমন সুপবিচিত না হলেও গার্ডেনরীচের বিরজুনালা-র নাম উল্লেখ করা দরকার। আর ক্রিমেটোরিয়ামে একটি গ্যাস চুল্লি স্থাপন করা হয়েছিল ১৯০৩ সালে। তৎকালীন কলকাতার কেওড়াতলা আর চিৎপুরের ঘাটে সতীদাহ করা হত। নরবলিও বোধহয় ঘটেছিল ১৭৮৮ সালের ৬ এপ্রিল চিৎপুর কালীমন্দিরে। কলকাতার শ্মশানে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাহিত্যিকের শেষকৃত্য নিয়ে গোলমালের ঘটনাও কম ঘটেনি। আমরা এমনতর নানান বিষয় নিয়ে লেখা সংগ্রহ করেছি। স্থান সংকুলানের অভাবে দ্বিতীয় সংখ্যায় তা মুদ্রণের চেষ্টা করব।

কলকাতার মুসলিম কবরখানা নিয়েও একাধিক লেখা আমাদের হাতে এসেছে। লেখাগুলি দীর্ঘ অথচ চমৎকার। ইচ্ছে রইল পরের সংখ্যাটিতে রাখবার। তবুও দু-চারটি কথা না বললেই নয়। স্থানাভাবে কলকাতার চারটি গোরস্থানে কবর দেওয়া বন্ধ হয়েছে। এগুলি হলো—নিউ কাশিয়া বাগান, তালবাগান, খয়রাতী ও গোবরা পুরনো কবরস্থান। কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ব্যক্তিগত কবরস্থান, সম্প্রদায়গত কবরস্থান ও পিরের দরগা। মানিকতলায় বাগমারী কবরখানা, এশিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ। জমির পরিমাণ ১৫০ বিঘা। গোবরা গোরস্থান ১৩৯ বিঘা। একবালপুর রোডে ষোলোআনা মুসলিম কবরখানা, ভূমির পরিমাণ ২০ বিঘা। ছোটোখাটো. পারিবারিক ও সম্প্রদায়গত কবরস্থানগুলি হল ১. দাউদি বেহরা সম্প্রদায়ের কবরস্থান (শিয়া) বাগী মহম্মদী কবরস্থান (দাউদ-বেহরা), রাজেন্দ্র মিত্র রোড, ২. মানিকতলার নাখোদা কবরস্থান (শিয়া), ৩. প্রিন্স গোলাম মহম্মদ কবরখানা, আনোয়ার শা রোড, ৪. চেতলা মুন্সিপাড়া কবরস্থান (সুন্নি সম্প্রদায়, পারিবারিক), ৫. মারবল হক কবরখানা (সুন্নি), আলিপুর, ৬. দিল্লিওয়ালা কবরস্থান (সুন্নি) মুন্সি পাড়া, ৭. তাজমহম্মদ কবরখানা (শিয়া) মুন্সিপাড়া লেন, ৮. সুরতি জামাত কবরস্থান, ৯. দি ওয়াকফ এস্টেট অফ লেট নবাব নাজির সিদ্দি আলি খান বাহাদুর (শিয়া) নর্থ শিয়ালদা রোড, ১০. কুরেশী কবর স্থান (কসাইদের জন্য) নর্থ শিয়ালদা রোড, ১১. গার্ডেনরিচ কবরখানা, এখানে আলাদা আলাদা কবরখানা আছে। ৩টি সুন্নি সম্প্রদায় ও ১টি

শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য, ১২. মেটিয়াবুরুজ ইমামবাড়া (নবাবদের কবরখানা) গার্ডেনরিচ, ১৩. শাহেব বাগান মুসলিম কবরস্থান (টিপু সুলতানের বংশধরদের পারিবারিক কবরস্থান) সতীশ মুখার্জী রোড, ১৪. মণ্ডলগাঁতি মুসলিম কবরখানা, কৈখালী রোড। কেমন আছে এসব কবর খানা, তাদের দেখ-ভালের মানুষেরা, কফিন তৈরির শিল্পীদেরই বা অবস্থা কেমন জানতে ইচ্ছে করে। সেসব কথা থাকবেও বোধ হয়।

এবার খ্রিস্টানদের সমাধিক্ষেত্র সম্পর্কে দু-চারটে কথা। কলকাতায় সবচেয়ে পুরনো সমাধিটি ঘটেছিল ১৬৩০, ১১ জুলাই। এক আর্মেনিয়ান মহিলার নাম আর সুকিয়াস। আর্মেনিয়ান গির্জায় তার সমাধি-ফলক আছে। আর পুরনো সমাধিক্ষেত্রটি হলো সেন্ট জন গির্জার প্রাঙ্গন। এখানেই জোব চার্নক আর তার দুই কন্যার সমাধি আছে। ছিল চার্নকের হিন্দু স্ত্রীর সমাধি। পার্কস্ট্রীটে ছিল বিরাট পার্ক, হরিণ এখানে ঘাস খেতে আসতো। তাই নাম হল পার্ক স্ট্রীট। পুরনো নাম—বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড। এখানেই আছে অসংখ্য কবরখানা বা সমাধিক্ষেত্র। সাউথ পার্ক স্ট্রীট সেমিট্রির সূচনা ১৭৬৭ খ্রি. ২৫ আগস্ট। এদিন সমাহিত করা হয় স্যার জন উড নামে কাস্টমস্ অফিসের এক কেরাণীকে। আর বর্তমান এ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ হসপিটালের কাছে নর্থ পার্ক স্ট্রীট সেমিট্রি। এই দুখানি সমাধিভূমিতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন—বাংলার নবজাগরণের পুরোহিত, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, স্যার উইলিয়াম জোন্স, হিন্দু স্টুয়ার্ট, আলেকজাণ্ডার কলভিন, বিখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিক উইলিয়াম মেকশিপ থ্যাকার প্রমুখ। পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে শিল্পের ছড়াছড়ি। এখানে স্তম্ভ বিশিষ্ট গম্বুজসহ সমাধি দেখা যায়। কোনো কোনো সমাধিতে শ্বেতপাথরের পরিও দেখা যায়। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও দেখা যায়।

একালের পার্ক স্ট্রীটের ও মেকলয়েড স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে ছিল দি ফ্রেঞ্চ বা টিরেটাজ বেরিয়াল গ্রাউন্ড। এর অদূরে ছিল মিশন সেমিট্রি। এখন ও দুটি নেই। লোয়ার সার্কুলার সমাধিভূমিতে বেথুন মাইকেলের সমাধি আছে। ভবানীপুরে আছে ওল্ডমিলিটারি সেমিট্রি। এখানে চার্লস ডিকেন্সের পুত্র লেফটেন্যান্ট—ওয়াটার ল্যাণ্ড-এর সমাধি। মানিকতলায় ছায়া সিনেমার কাছে আছে তরুদত্তর পারিবারিক সমাধি। তেমনি এদেশকে ভালবেসে ইংরেজদের কাছে ব্রাত্য হয়েছিলেন যে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার। কলেরায় মারা গেলে ইংরেজ সমাধিক্ষেত্রে তাঁর স্থান হয়নি। তাঁর শব যাত্রায় যোগদানকারী হাজার পাঁচেক বাঙালি চাঁদা তুলে হেয়ার স্কুলের প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করেন।

কলকাতায় চিনাদের কথাও বলা দরকার। ইহুদি, পার্শি কিংবা ব্রাহ্মদের কথা। আমরা চেষ্টা করছি এখানে কিছু তুলে ধরবার। অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনাও জড়িয়ে—আছে সৎকার নিয়ে। আগ্রহী পাঠক, লেখক, আলোচক, গবেষক সকলের সহযোগিতা চাই। প্রয়োজনীয় লেখা তথ্য ও ছবি পেলে ২য় খণ্ডের কলকাতা পরিক্রমা হয়তো মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে।

সম্পাদক

কলকাতার চিনাদের কবরস্থান ও শেষকৃত্য

কলকাতার চিনাদের ৫টা কবর স্থান আছে। কলকাতার চিনাদের খবর কী? তাদের শেষকৃত্য, তাদের সমাধিক্ষেত্রের কিছু পরিচয় না দিলে চলবে কেন? তাদের কবরস্থান সম্পর্কে মহুয়া ভট্টাচার্য লিখছেন—"চীনাদের মধ্যে যাঁরা ক্রীশ্চান তাঁরা মৃত্যুর পরে কবর দেন আর যাঁরা বৌদ্ধ তাঁদেরও কবর দেওয়া হয়। যদিও বৌদ্ধ সাধুদের দেহ দাহ করা হয়ে থাকে। চীনাদের বড় বসতি হচ্ছে চায়না চাউনে। এখানে এঁদের সমাধিক্ষেত্র আছে এবং তা জনবহুল এলাকায়। অল্প কিছুদিন আগে ১৯৫৮ সালে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের কাছাকাছি নোনাডাঙা মৌজায় বিশাল এলাকা জুড়ে ওদের কবরস্থান তৈরি হয়েছে। নাম—ওয়ি থং সেমিট্রি। এর অফিসের ঠিকানা—৬, নিউ ট্যাংরা রোড, কলকাতা-৪৬। তৈরি হবার পর থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ছটি কবর এখানে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের নাম 'সান-চন ৎসি'। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী একজন মঙ্ক (নাম লেনমিন) মন্দিরও কবরস্থান দুই-এর দারোয়ান হিসাবে কাজ করে বিন্দেশ্বরী সিং ওরফে রামু সিং। লে মিন জানালেন যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চীনাদের কারও মৃত্যু হলে প্রথমে মন্দিরে খবর দেওয়া হয়। মৃতের কবর হবে জন্মবারে। কাজেই কোনও ব্যক্তির যেদিন মৃত্যু হল সেদিন তাঁর জন্মবার না হলে, মৃত্যুর দিন থেকে তাঁর জন্মবার পর্যন্ত মৃতদেহ বরফ ইত্যাদি দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়, এবং লাগাতার পূজার্চনা (বা প্রার্থনা ইত্যাদি) চলে। মৃত্যুর পর মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে কবরে যায়না। একটি ঘরে রাখা হয়। চিনা পঞ্জিকা অনুসারে কবরের দিন স্থির করা হয়। কিংবদন্তি, "আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে হোয়াং হো-র জলে আপন ছায়া দেখে যতক্ষণ না বুঝতে পারবে ততক্ষণ কবর দেওয়া যাবে না। তরুণতর যারা তারা নাকি আগে বুঝতে পারে। কবর না দেওয়া পর্যন্ত আত্মীয়রা খালি পায়ে ম্লান রঙের পোষাক উল্টে পরেন। কব্জিতে সাদা সুতো বাঁধেন। (সূত্র : দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়) এই পূজায় আহ্বান করা হয় মন্দিরের এই পুরোহিতদের। এঁদের উপাস্য বুদ্ধদেব স্বয়ং। এই পূজার্চনায় দেবতার ভোগে দেওয়া হয় ফলমূল, কেক, বিস্কুট লজেন্স ইত্যাদি। এরপর জন্মবারে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয় কফিনে কবর দেবার জন্য।" কবরের দিন সাদা সুতো পুড়িয়ে ফেলে, ছেলেরা হাতে কাল ফিতে বাঁধেন। মেয়েরা চুলে ঝোলান নীল উল। মৃত্যুর উনপঞ্চাশতম দিনে ফিতের আর উল পোড়ান হয়।

শোকযাত্রার ছবিটা মেলে অন্য রচনায়—"শোকযাত্রায় আত্মীয়েরা চটের পোষাকে মৃতের শকটের পেছন পেছন যান। অপদেবতা রুখতে পটকা ফাটানো হয়। প্রত্যেক শবাযাত্রীকে একটি করে লালখাম দেওয়া হয়। এতে সাধ্যানুযায়ী কুড়ি পয়সা থেকে কুড়ি টাকা থাকে। একে বলে গুডলাক মানি। শোকযাত্রার সামনে থাকে মৃতের ছবি এবং কফিন। জল, খাবার ছেলেমেয়েদের পোষাক ইত্যাদি কফিনের মধ্যে রাখা থাকে। যেন ওঁরাও মৃতের সঙ্গে আছেন। শবযাত্রীরা নানারকম প্রশংসাপত্র ফেস্টুনের মত করে নিয়ে চলেন। বিয়ের সময়ে বাজনা না বাজলেও শোক মিছিলে করুণ বাজনা বাজানো হয়। গরমের সময়ে আবার আজকাল শবযাত্রীদের কোল

ড্রিংকসও দেওয়া হচ্ছে। এদিন পুরনো মুদ্রার ছাপ দেওয়া নকল গোলকরা নোট পুড়িয়ে আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। শবযাত্রীরা কিছুদূর চলার পর একটি রিজার্ভ করা বাসে ওঠেন। চলে যান ধাপায় নয় এন্টালীর কবরক্ষেত্রে। কবর আগে থেকেই খোঁড়া থাকে। কবরে প্রথম মাটি দেন বড় ছেলে। তারপর আর সবাই। ওই গর্তের মধ্যেই চটের পোষাক ফেলা হয়।'' (কলকাতার চীনারা/দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়), আবার মহুয়া দেবী লিখছেন—'' ... শবযাত্রীরা কফিন কবর দেবার আগে ও পরে পূজা জাতীয় কিছু অনুষ্ঠান করে। এসময়ে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর সাথে মুরগি এবং অন্যান্য মাংসও দিয়ে থাকেন। তবে সেগুলি দারোয়ানের প্রাপ্য, এছাড়া রামুকে টাকাও দেন। বর্তমানে এই কবরখানায় রামু সিং একমাত্র কর্মচারী। তিনি মন্দিরের দারোয়ান হিসাবে চারশ টাকা পান, আর শবদেহ এলে সে সময় কিছু পাওনা হয়।'' দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়—''কবরক্ষেত্র থেকে সবাই মৃতের বাড়ীতে আসেন। সেখানে এতদিন ধরে একটি আধারে আগুন জ্বালান ছিল। এই আগুনেই আত্মা তার অনন্তের মধ্যে চলার সময় হল। শবযাত্রীরা তারপর চিনি দেওয়া একবকম মদ পান করেন। বাড়ি গিয়ে স্নান করে সেই রাতেই মৃতের বাড়িতে রাতের খাওয়া সাঙ্গ করেন।''

মহুয়া ভট্টাচার্য লেখেন—''কবর হয়ে যাবার তিনদিন পর আবার আত্মীয়রা আসেন এবং সেদিনও মুরগি নানাবিধ অন্যান্য মাংস (শূয়োর, গরু ইত্যাদি) মদ, ইলিশমাছ উৎসর্গ করে পূজা করেন।''

''ঠিক তিন কী পাঁচ বছর বাদে কবর খুঁড়ে ফেলে হাড়গুলি বার করা হয়। সেগুলিকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনুযায়ী সাজিয়ে একটি মাটির গামলায় রাখা হয়। তারপর গামলাটি গোষ্ঠির কবর ক্ষেত্রে শেষবারের মত সমাহিত করা হয়। বছএর দু'বার শরতে-বসন্তে চীনারা তর্পণ করে।'' (দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়)

কবরস্থানের পরিবেশ কী রকম—মহুয়া ভট্টাচার্য লিখছেন—''এই কবরস্থানের আশেপাশের অঞ্চল প্রায় জনশূন্য। ফলে অসাধু লোকেরা কঙ্কাল চুরির চেষ্টাও করে। সেজন্যে মাঝে মাঝে কবর খুঁড়ে দেখা হয়, শহদেহ পচে গেল কিনা। হাড়গুলি আলাদাভাবে যেখানে পোঁতা হয়েছে তার উপর বেদি ও সমাধিফলক বেশ শক্ত করে ঢালাই করা।''



সংকলন প্রস্তুত হয়েছে · ''কলকাতার শ্মশান ও কবরস্থান/মহুয়া ভট্টাচার্য ও ২. কলকাতার চীনারা/দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়, রচনা দুটির সাহায্যে। (বিষয় কলকাতা/জাতীয় গ্রন্থগার কর্মীসমিতি।)

হিন্দুর শবদাহ

বর্ত্তমান সময়ে যন্ত্র সাহায্যে শবদাহের যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। ইহার দ্বারা মৃতের কোনোরূপ কল্যাণ সাধিত হয় না। উহাতে বিজাতীয় লোকের স্পর্শ সম্ভাবনা, মন্ত্রপাঠাদির অভাব, গঙ্গায় অস্থি প্রক্ষেপরাহিত্য নিয়মিতভাবে শবস্থাপনের অভাব প্রভৃতি থাকায় বৈধ দান সিদ্ধ হয় না। অতএব দাহ সিদ্ধ না হইলে, তৎপরবর্ত্তী মৃতের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াগুলিও অসিদ্ধ হয়। এই কারণ যান্ত্রিক-দাহে কাষ্ঠ ব্যয় ও শ্রমের লাঘব হইলেও এই সুবিধার নামে অশাস্ত্রীয় কার্যদ্বারা মৃতের পারত্রিক কার্যে বিঘ্ন সম্পাদন কখনও সনাতন ধর্মাবলম্বিগণের সমর্থনীয় হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত হিন্দুমাত্রেরই যান্ত্রিক-দাহে অনাস্থা ও তীব্র প্রতিবাদ করা কর্তব্য। কিছুকাল পূর্বে যন্ত্র সাহায্যে শবদাহের ব্যবস্থা হয় এবং উহার প্রতিকূলে তুমুল আন্দোলন হয়, এইরূপ জনশ্রুতি আছে তৎকালে প্রাতঃস্মরণীয় মহামানব ॰ রামগোপাল ঘো মহাশয় তাঁহার স্বর্গাদপি-গরিয়সী জননীর আদেশে উক্ত অবৈধ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন ও নিমতলা ঘাটে শবদাহের জন্য প্রচুর মুদ্রা দান করিয়া অতুলনীয় শক্তি অর্জন করিয়াছেন।

'ভারতসাধনা'—শ্রীবিভূভূষণ দত্ত সম্পাদিত দ্বিতীয় বর্ষ ১৩৩৭, কার্ত্তিক, প্রথম সংখ্যা।

ইলেকট্রিক চুল্লি

পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচতে, কাঠের অপচয় রোধে—শবদাহের ভাল ব্যবস্থা ইলেকট্রিক চুল্লি। এ ব্যবস্থা প্রথম চালু হয়—কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ১৯৫৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। প্রথম দুটি চুল্লির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়। ১১ ও ১২ তারিখে হিন্দু সৎকার সমিতি আনীত বেওয়ারিশ লাশ দাহ করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর, ১০নং রাজা বসন্ত রায় রোড নিবাসী জনৈকা উষাপ্রভা ব্যানার্জীকে প্রথম ইলেকট্রিক চুল্লিতে দাহ করা হয়। নিমতলা ঘাটে প্রথম ইলেকট্রিক চুল্লিতে দাহ করা হয়—কানাইলাল গোস্বামীকে। ঠিকানা ২৬/৭, দমদম রোড, কলকাতা-২। তারিখ : ১৪ জানুয়ারী ১৯৭৫। কাশীপুর শ্মশানঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রথম দিন সরকারী খরচে সমস্ত শবদাহ করা হয়। তারিখ : ১৯৮৯, ২২ ফেব্রুয়ারি। কাশীমিত্র শ্মশানঘাটে ১৯৯০, ৯ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ইলেকট্রিক চুল্লির উদ্বোধন করা হয়। বেহালার সিরিটি শ্মশানে ২০ জুন ১৯৯০ বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু হয়। গড়িয়া শ্মশানেও বৈদ্যুতিক চুল্লি আছে।

সূত্র : কলকাতার শ্মশান ও কবরস্থান/মহুয়া ভট্টাচার্য, বিষয়ত্ব কলকাতা॥

সংকলন

জব চার্নকের সমাধি

এই কলকাতায় তখন পাকাবাড়ি একটি কি দুটি। একটি সাবর্ণ চৌধুরীদের পাকা কাছারী বাড়ি—যেখানে তাদের নায়েব আন্টুনি ফিরিঙ্গি কবিয়ালকে খাতা খুলে বসে থাকতে দেখা যেত। আর একটি ছিল পর্তুগীজদের প্রার্থনাগৃহ—সেন্ট জন গীর্জা। তার পাশেই ছিল গোরস্থান। জলপথে হুগলীর কুঠি থেকে বালেশ্বর ও মাদ্রাজের কুঠিতে ইংরেজ কুঠিয়ালদের যাতায়াত ছিল এই পথে। কোনো ইংরেজ মারা গেলে তাকে এখানেই কবর দিয়ে যাওয়া হত। এখানেই কলকাতার স্রষ্টা জব চার্নকের কবর দেওয়া হয়েছিল। এখানকার হেস্টিংস স্ট্রিটে সেই সেন্ট জন গির্জার চার্চ ইয়ার্ডে সে কবর আজও সুরক্ষিত রয়েছে। সেই কবরের ওপর জব চার্নকের জামাই চার্লস আয়ার সাহেব পরে একটি সুন্দর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তখনকার খড়ের চাল আর মাটির দেওয়ালের দিনে এ ধরণের গাঁথনির কাজ কল্পনাতীত। উচ্চতায় প্রায় বারো ফুট। দ্বিতল এই স্মৃতিসৌধের নীচের মহল অষ্ট ভুজবিশিষ্ট। এর প্রত্যেকটি কোণ এক একটি স্তম্ভের দ্বারা সমর্থিত। নীচের মহলে নয়টি খিলান তার মধ্যে দিয়ে কবরের ওপর আলো এসে পড়েছে। কথিত আছে চার্নক ও চার্নকের হিন্দু স্ত্রীকে একই কবরে সমাধিস্থ করা হয়। উপরের মহলও নীচের মহলের অনুরূপ। সর্বোপরি শোভন গম্বুজ। বহির্ভাগের দেয়ালের গায়ে খাঁজ কাটা কারুকার্য বহির্ভাগে কার্নিশের মাথায় দ্বিতল ও একতলের মধ্যেবর্তী স্থানে ইংরেজী V-এর আকারের সূক্ষ্ম কারুকাজ। মাথার ওপরে গোলাকার উঁচু সিলিং, জায়গায় জায়গায় নোনাধরা। কথা বললে প্রতিধ্বনি ওঠে। এই স্থাপত্য সম্পূর্ণ মুঘল স্থাপত্য রীতির দ্বারা প্রভাবিত। কবরের শিখরে ল্যাটিন ভাষায় জন চার্নকের পরিচয় পত্র আঁটা।

. . . .

পাটনার রাস্তায় এক সন্ধ্যায় বেড়াতে বেড়াতে তাঁর চোখে পড়লো চতুর্দোলায় চড়িয়ে ঢাক পিটিয়ে বহু লোকজন এক পরমা সুন্দরী মেয়ে ও একটি মৃতদেহকে নিয়ে আসছে। খবর নিয়ে জানলেন, ঐ পরমা সুন্দরী অল্প বয়স্কা মেয়েটি ঐ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী। মেয়েটি মৃত স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় জীবন বিসর্জন দেবে। তাঁর চোখে পড়লো, এ ব্যাপারে মেয়েটির চাইতে আত্মীয় স্বজনের উৎসাহই অত্যন্ত বেশী। কুঠির সেপাইদের সঙ্গে শব বাহকদের খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। চার্নক মেয়েটিকে এনে কুঠিতে আশ্রয় দিলেন। পরে মেয়েটির সম্মতি পেয়ে খ্রীস্টান মতে তাঁকে বিয়ে করে ফেললেন। এতদিনে পেলেন একটি জীবন সঙ্গিনী। ছত্রিশ বছর বিদেশের অস্বাস্থ্যকর জল হাওয়ার সঙ্গে যুঝতে

যুঝতে চার্নকের শরীর ভেঙে পড়েছিল। শেষের দিকে কোম্পানির কাছে কিছুই বিশেষ তিনি দেখতে পারেন নি।

শেষ জীবনে নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জব চার্নককে দিন কাটাতে হয়েছে। ১৬৯২ সালে জব চার্নক মারা যান। সন্তানাদির মধ্যে জব চার্নকের তিন মেয়ে। সকলেরই বিয়ে হয়েছিল প্রভাবশালী স্থানীয় ইংরেজদের সঙ্গে। মারা যাবার সময়ে জব চার্নক তিন মেয়ে ছাড়াও নিজের সরকার ও দুজন প্রিয় ভৃত্যকে সম্পত্তি দিয়ে যান। তাঁর উইল ছিল এমনি অদ্ভুত। তাঁর অন্যতম জামাই কোম্পানীর পরবর্তী এজেন্ট চার্লস আয়ার সাহেব জব চার্নকের সমাধির ওপর ওই সুন্দর স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করান। জন্মবার্ষিকী কিংবা মৃত্যবার্ষিকী ছাড়াও প্রতিবছর নভেম্বর মাসের ২রা তারিখে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয় কবর, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় দুটো মোমবাতি। আর খ্রীস্টান পাদ্রী ঘুরে ঘুরে কয়েক মিনিট এই সমাধির ওপর স্বস্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করেন। এই অশান্ত হৃদয় মৃত্যুর পরে যেন শান্তি পায়, —এই প্রার্থনা নিয়ে সারারাত টিম্‌টিম্ করে জ্বলে সাদা মোমবাতির দুটো কাঁপা কাঁপা শিখা। ভিতরের দেয়ালে জায়গায় জায়গায় অল্প নোনা ধরলেও আজ অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইংরেজ আমলের সর্ব প্রথম স্থাপত্যের এই নিদর্শন।

*চার্নক যে হিন্দু মেয়েটিকে উদ্ধার করে বিয়ে করেছিলেন তিনি নাকি আরিয়াদহের ঘোষালদের বউ লীলা ঘোষাল। ১৯৬০ সালে আরিয়াদহ শ্মশানের প্রবেশ দ্বারে কামারহাটি পৌরসভার চেয়ারম্যানের নামাঙ্কিত একটি শ্বেত পাথরের ফলকে উক্ত কথাগুলো লেখা ছিল। পরে তা খুলে নেওয়া হয়। চার্নক সমকালিন ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ একথা লিখলেও বেশীরভাগ মত দেন বিপক্ষে। গভর্নর হেজেসের ডাইরীতে পাটনার কথা আছে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ও পাটনার কথা বলেন। তিনি আরো লেখেন—"চার্নক এই হিন্দু পত্নীর সহিত বহুদিন সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন। চার্নক অতিশয় পত্নী বৎসল ছিলেন এবং চার্নকের শত্রু পক্ষীয়েরা বলেন, স্ত্রীকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা দূরে থাকুক, তাঁহার শক্তির অধীনে তিনিই অন্ধ পৌত্তলিক হইয়া পড়েন। এই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে চার্নক তাঁহার দেহ সুতানুটিতে সমাধিস্থ করেন। প্রতি বৎসর তাঁহার পত্নীর মৃতুদিনে সমাধির উপর চার্নক একটি করিয়া মোরগ বলি দিতেন।

সম্পাদব

প্রমোদ মুখোপাধ্যায় রচিত উক্ত শিরোনামের রচনার অংশ বিশেষ। সৌজন্যে - "এই অচেনা শহর কলকাতা" সম্পাদনা - রমাপদ চৌধুরী, প্রকাশক - সংবাদ

সংকলন

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ

শহর থেকে যদিও আটাশ-উনতিরিশ মাইলের ভেতর থাকতুম। বয়েস যৎসামান্য ছিলো বলেই খবরের কাগজ পড়তুম না। পড়লে বড়ো জোর খেলার পৃষ্ঠায় একবার চোখ বুলিয়ে নিতুম নামমাত্র। মোহনবাগান—এই অক্ষর কটিই রূপকথার স্পর্শকাঠি ছিলো।

সেদিন দাদামশাই হন্তদন্ত হয়ে ইস্টিশান থেকে ফিরলেন বিকেলবেলা। আমাদের কারুর সঙ্গে কোনো কথা বললেন না—সঙ্গে এলেন ইস্টিশান মাস্টার। দুজনেই বৈঠকখানায় মর্মাহত হয়ে বসে রইলেন গভীর রাত পর্যন্ত। সেদিন ঘরে গ্যাসবাতিও জ্বাললেন না।

. . . .

মাসিমণি চা দিয়ে গেলেন কয়েকবার নিঃশব্দে। আজকের সন্ধ্যা দেখে আমার কেমন অচেনা ঠেকতে লাগলো—আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না ভিতরের নিঃশব্দের কারণ। সন্ধ্যা পড়তে না পড়তেই এক পশলা বৃষ্টি হলো। বাদলা পোকা ঝাঁক বেঁধে উঠোনের আকশটুকুতে উড়ে বেড়াচ্ছিলো। তাদের সবারই পাখা বৃষ্টিমাখা ঘাসের উপর ঝরে পড়লো। আমার পড়াশুনোতে বসা হলো না সেদিন। দাদামশাই আর মাসিমণি সেদিকে কোনোমতেই দৃকপাত করলেন না। দাদামশাই শুধু বললেন একবার, এখানে এসে চুপ করে বসো। আমি বৈঠকখানায় তাঁদের কাছে এসে মুখবন্ধ করে বসে রইলাম। তাঁরা খুব অল্পই কথাবার্তা বলছিলেন। এক সময় শুধোলেন, 'তুমি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছো? কবিতা পড়েছো তাঁর? খবর এসেছে—তিনি মারা গেছেন।''

পরদিন সকালবেলা কলকাতার বাড়িতে ভাইবোনদের কাছে চিঠি লিখলুম—রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। তোমরা তাঁর এটি ছবি পাঠিয়ে দাও।

কিছুদিন বাদে জয়নগর-মজিলপুরে বাণী-সিনেমা হলে ছবি দেখতে গেছি। কি বই স্পষ্ট মনে নেই। ঝাঁক ঝাঁক বিমানবহর, আর যুদ্ধের সমাচার দেখার পর—অরোরা থেকে তোলা শোকযাত্রার ছবি দেখতে পেলুম! মনে পড়ে মাসিমণির কোলে বসেও শ্রাবণের ধারায় সেদিন ভিজেছিলুম। আসল ছবিটা সেদিন অল্প কয়েকজনই দেখেছিলেন! মহাপ্রায়ণের ছবি দেখার পর সাশ্রুনেত্রে সেদিন অনেকেই আনন্দে ভঙ্গ দিয়েছিলো। মাসিমণিও আমার হাত ধরে এসে সাইকেল-রিক্‌শায় উঠে বসলেন। আমাদের তখন মন খারাপ করার বয়স নয়। তবুও মনের ভিতর কোন্‌ নিরানন্দের আসন পাতা হলো।

'২২শে শ্রাবণ' গ্রন্থে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখছেন : জনতার উন্মত্ত কোলাহল সমুদ্র গর্জনের মতো কানে আসছে। ঘরের মধ্যে অপরিসীম শান্তি বিরাজমান।

কবি চিরনিদ্রায় মগ্ন। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সেই শান্ত সমাহিত মুখশ্রীতে দেহের কোনো কষ্টের চিহ্ন মাত্র নেই। পরনে সাদা বেনারসীর জোড়, কপালে চন্দন। আজানুলম্বিত চাদরখানা পাঠ করে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোড়ের মালার ফুলের গন্ধে ঘর আমোদিত। শুভ্রকেশ, শুভ্রকেশ। নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন কবি। কোথায় গিয়েছে আমাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। অতৃপ্ত নয়নে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি।

১৯৪১ সনের ৮ই আগস্ট আনন্দবাজার লিখেছে : কলেজ স্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের লোকের ভিড় সমাধিক হয়। গোলদীঘি হইতে হেদুয়া পর্যন্ত সমস্ত রাজপথটি লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল ... শোকাযাত্রাটি শবদাহ ঘাটে পৌঁছানো পর্যন্ত পথিমধ্যে কবির দেহের উপর যে সব পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়, তাহা একত্র করা হইলে উহার উচ্চতা তিনফুট হয়। ... শ্মশানের দৃশ্য দেখিবার জন্য অনেক নৌকার আরোহীরা নদীর মধ্যে নোঙর করিয়া রহিল। রেলওয়ে ভ্যানের ছাদ, বৃক্ষ, মোটর গাড়ির হুড কোথাও তিলমাত্র জায়গা অবশিষ্ট রহিল না। ... শোকযাত্রা কবির গৃহ হইতে বাহির হওয়ার পর দেখা যায় যে প্রায় ১ হাজার জোড়া জুতা ও বহু ছেঁড়া শার্ট ও পাঞ্জাবি কবির গৃহের নানাস্থানে পড়িয়া আছে।

না জানলে বিশ্বাস করা শক্ত যে—রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি নিমতলাঘাট শ্মশানের সঙ্গে জড়িত আছে।

আমি কলকাতায় এসেছিলুম ১৯৪৭ সনে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর বছর ছয়েক বাদে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বহুবারই গঙ্গাতীরে এই শ্মশান ঘাটে গিয়েছি।

গতবছর এক বিদেশী কবি এসেছিলেন কলকাতায়। নানা কারণেই তিনি নিমতলা ঘাট পছন্দ করতেন। সেখানে সাধুসন্ত পাগল ক্ষ্যাপা ভিখারীদের সঙ্গে তিনি বহু রাত কাটিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে শ্মশানে ঠিক দিনরাতই ঐ স্মৃতিস্তম্ভ পাহারা দেয়, আর লোকজনকে বলে বেড়ায় প্রথম বাইশে শ্রাবণের দিনও সে অমন জায়গায় ছিলো। খুব কাছ থেকে কবির মৃতমুখ সে দেখেছে। এত বড় কবিকে কি অবস্থায় থাকতে হচ্ছে মশায়—এ কি সহ্য হয়। এই বলে সে সেই বিদেশীর কানে কানে আরো অনেক কথা বললো। সেকথা অবশ্য আমরা আজো জানতে পারিনি। তবে এখনো নিমতলা ঘাটে গেলে সেই ক্ষ্যাপাকে একভাবে বসে থাকতে দেখা যাবে। ক্ষণে ক্ষণে তার অভিযোগ,—আপনারা একটা কিছু করুন মশাই। অতো বড়ো কবির স্মৃতি—বললেও—লোকে বিশ্বাস করে না আজকাল। ভাঙ্গা, ফাটা, কুকুর-লাঞ্ছিত—এই কি স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা!

---

* রূপচাঁদ পক্ষী রচিত 'রূপকথার কলকাতা' গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত। শিরোনামটি সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত।

সংকলন

টাওয়ার অব সাইলেন্স

. . . .

মস্ত ফটকটা একটুখানি ফাঁক করা। ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়েই কল্পনার তৃতীয় নেত্রে দেখি ওপারে সীমাহীন রহস্যের গোপন ভাণ্ডার। টাওয়ারের চূড়াটা চোখে পড়ে। দূরের বটগাছটার ওপর এক ঝাঁক শকুন নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এর মৌনতাকে আরও নিঃশব্দ করে তুলছে ওরা। কখন একটি মৃতদেহ আসবে, নীরবে সেটিকে তুলে দেওয়ার হবে টাওয়ারের চুড়ায়। তারপর সেই মৃতদেহের সৎকার ঘটাবে শকুনকুল।

'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এর মৌনতা ভেঙে খান খান হয়ে যাবে শকুনের ডানার ঝাপট আর অবিশ্রান্ত চিৎকারে। পরিতৃপ্ত হয়ে ওরা ফিরে যাবে নিজেদের আস্তানায় আর কয়েকটি জীবিত প্রাণীর দেহ ধারণের জন্য আপন দেহটিকে উৎসৃষ্ট হতে দেখে একটি মৃত আত্মা হয়তো পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে পঞ্চভূতে।

কল্পনাটিকে আরও অতীতের দিকে প্রসারিত করে দেওয়া যেতে পারে। স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায় কোম্পানী বাহাদুরের কলকাতা থেকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতা গড়ে উঠছে ঐশ্বর্যে-বাণিজ্যে-বিদ্যায়। দুনিয়ার তাবৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় এসে বাসা বেঁধেছে কলকাতায়। কলকাতা এখন 'কসমোপলিটন'। ভারতবর্ষের বিত্তবান উদীয়মান বণিক-শ্রেণীর বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে কলকাতা আদর্শস্থল। এঁদের মধ্যে অগ্নি-উপাসক পার্শী সম্প্রদায় যেমন বিত্তে তেমনি বিদ্যায়ও অগ্রসর। কলকাতার পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতের হার ইংরেজদের পরেই শতকরা প্রায় ষাট জন। সোরাবজী পরিবার দীর্ঘকাল বাংলাদেশের বাসিন্দে। বাংলাদেশের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগটা এত ঘনিষ্ঠ যে তাঁদের পদবীর শেষে 'বেঙ্গলী' শব্দটা যোগ হয়ে গিয়েছিল। সোরাবজী শাপুরজী বেঙ্গলী ছিলেন গত শতকের অষ্টম দশকে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার বিশিষ্ট সদস্য। তাঁর পিতামহ নওরোজী সোরাবজী বেঙ্গলী ছিলেন কলকাতার পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যবসায়ী এবং প্রচুর অর্থের মালিক তাঁরই প্রচেষ্টায় এই 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'টি গড়ে ওঠে, কলকাতার পার্শী-সম্প্রদায়ের বিত্তশালী বহু ব্যক্তিরই অবদান রয়েছে এর পিছনে, তবে মূলতঃ নওরোজীরই ভূমিকা ছিল প্রধান। ১৮২৯ সালের ২৮শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিক ভাবে 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এর উদ্বোধন হল বেলেঘাটায়। পূর্ব এশিয়ার এই প্রথম এবং সম্ভবতঃ পার্শীদের একমাত্র শেষকৃত্য ভূমি। আজও সুদূর রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, মালয় থেকে পার্শীদের শবদেহ বহন করে আনা হয় এই কলকাতায়, কলকাতার এই নিস্তব্ধ গম্বুজটির শীর্ষে।

এই দীর্ঘ একশো একত্রিশ বছর ধরে 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এর স্তব্ধ প্রাচীরে কলকাতার বিবর্তনের অনেক চিহ্ন আঁকা হয়ে আছে। আজকের বেলেঘাটা হয়ে উঠেছে জনবহুল টাওয়ারের চারপাশ বেষ্টন করে তৈরি হয়েছে অ্যাসফল্টের দীর্ঘ পথের সারি আধুনিক ছাঁদের অগুন্তি বাড়ি গঠে উঠেছে টাওয়ারের উল্টো দিকে তৈরি হয়েছে বৃহদায়তন হাসপাতাল। এই নিতান্ত আধুনিকেরা কি করে জানবে একশো তিরিশ বছর আগেকার বেলেঘাটার বিরল-বসতি, জলা-জঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলের শেয়ালের ডাক আর দিনমানের রাহাজানির সংবাদ? 'টাওয়ার অব সাইলেন্স' তা দেখেছে। শেয়ালদা পেরোলেই বেলেঘাটার ভূতুড়ে রাজত্ব। নতুন খালটিও তখন পর্যন্ত কাটা হয়নি। ৩০শে মে ১৮২৯-এর সংবাদ, "সম্প্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের রাজপথের শোভাবর্ধন করিবার জন্য মোকাম পূর্ব অঞ্চলে হইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া পুরাতন বেলেঘাটা পর্যন্ত যাইয়া মিলিবে। শুনিতে পাই যে ঐ খাল নূতন বেলেঘাটা দিয়া অনায়াসে যাইতে পারিবেক—।" 'বৃহৎ খাল' অর্থাৎ বেলেঘাটার এপার-ওপারের মাঝখানের খালটি কাটা হয়েছিল, বলাই বাহুল্য, জলপথে যাতায়াতের সুবিধের জন্যে। খালের ওপারে তখন পুরাতন 'বেল্যাঘাটা'র অনড় স্তব্ধতা। এপারে নূতন বেল্যাঘাটা মুখরিত হয়ে উঠেছে, 'টাওয়ার অব সাইলেন্স' পুরাতন বেল্যাঘাটার পুরাতন অধিবাসী। অনেক দেখা-অদেখা, অনেক জানা-অজানা ইতিহাসের সাক্ষী। . . .

কলকাতার ভাগাড়

শ্মশান, কবরস্থান, সমাধিক্ষেত্র — কলকাতার মানুষের সৎকার বা শেষকৃত্য ভূমির অনেক কিছুই-তো আলোচনা হয়। কিন্তু কলকাতার জীবজন্তু, পশুপাখির শেষকৃত্য ভূমির খবর কী? যতদূর জানা যায় — সার্কুলার রোডে একটা শেষকৃত্য ভূমি বা ভাগাড় ছিল। সেখানে গরু, মহিষ, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া মারা গেলে তাদের মৃতদেহ ফেলা হত। ফলে চারপাশের বাসিন্দারা গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। পরিবেশ দূষিত হত। এই অবস্থা দূর করতে এগিয়ে এলেন একজন সমাজসেবী খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি ছিলেন সত্যকার সুচি, কর্মকার ও ডোম সম্প্রদায়ের বান্ধব। মৃত পশুগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহার করা তিনিই শিখিয়েছিলেন। মৃত পশুর ছাল-চামড়া তুলে তাকে ঠিকঠাক কাজে লাগনোর জন্য কুটির চর্মশালা তৈরি করেন এবং ৩০০০ টাকা দিয়ে হাবড়া শ্মশান লীজ নেন। ধাপার কাছে ট্যাংরায় তিনি স্থাপন করেন 'কুটির চর্ম কারুশালা'। হাড়, চামড়াকে কারখানায় এনে তিনি সুষ্ঠভাবে ব্যবহার শেখান।

* অশোক ভট্টাচার্য লিখিত — 'টাওয়ার অব সাইলেন্স' নামক রচনার অংশ।

* সৌজন্যে . এই অচেনা শহর কলকাতা, সম্পাদনা - রমাপদ চৌধুরী।

সংকলন

মরা ফেরা

. . . .

হায়! অল্পবয়সে এক একবার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগলামো করেছি, এখন সেইগুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাসি পায়; আবার এখন যে পাগলামী প্রকাশ কচ্চি, এর জন্য বৃদ্ধবয়সে অনুতাপ তোলা রইলো! মৃত্যু-শয্যার পাশে যবে এইগুলির ভয়ানক ছবি দেখা যাবে, ভয়ে ও লজ্জায় শরীর দাহ কত্তে থাকবে, তখন সেই অনন্য-আশ্রয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর জুড়াবার স্থান পাওয়া যাবে না! বাপ-মার কাছে মার খেয়ে ছেলেরা যেমন তাঁদেরই নাম করে, 'বাবা গো—মা গো', বলে কাঁদে, আমরা তেমনি সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘননিবন্ধন বিপদে পড়ে তাঁর নাম ধরেই,—পাঠক! তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দেখাতে দেখাতে তরে যাব।

প্রলয় গম্মিতে আমরা একদিন মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে নদে অঞ্চলের একজন মুহুরি বল্লে যে, "আমাদের দেশে হুজুক উঠেছে, ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মরা মানুষরা যমালয় থেকে ফিরে আসবে'—জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমূর চৈত্র মাসে রাসের মত সহরের বেণেবাবুরা সিংহবাহিনী ঠাকরুণের পালায় যেমন ছোট আদালতের দু-চার কয়েদী খালাস করেন, সেই রকম স্বর্গের কোন দেবতা আপনার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে যমালয়ের কতগুলি কয়েদী খালাস করবেন; নদের রামশর্ম্মা আচায্যি স্বয়ং গুনে বলেছেন। আমরা এই অপরূপ হুজুক শুনে তাক হয়ে রইলেম! এদিকে সহরেও ক্রমে বোল উঠলো '১৫ই কার্ত্তিক মরা ফিরবে।' বাঙ্গালা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পুরাবার জিনিস পেলেন—একটি গেরো দিলে পূর্ব্বের গেরোটি যেমন আল্গা হয়ে যায়, বিধবা বিবাহ প্রচার করাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যাসাগরের প্রতি যে ভক্তিটুকু জন্মেছিল, সেটুকু সেই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থারমোমিটারের পারার মত একেবারে অনেক ডিগ্রী নেবে গিয়ে, বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়লো।

সহরে যেখানে যাই সেইখানেই মরা ফেরবার মিছে হুজুক! আশা নির্ব্বোধ স্ত্রী ও পুরুষদলের প্রিয়সহচরী হলেন। জোচ্চোর ও বদমাইসেরা সময় পেয়ে গোছাল গোছাল জায়গায় মরা ফেরা সেজে যেতে লাগলো; অনেক গেরেস্তোর ধর্ম্ম নষ্ট হলো—অনেকের টাকা ও গয়না গেল। ক্রমে আষাঢ়ান্ত বেলার সন্ধ্যার মত—শোকাতুরের সময়ের মত, ১৫ই কার্ত্তিক নবাবিচালে এসে পড়লেন। দুর্গোৎসবের সময়ে সন্ধিপূজার ঠিক শুভক্ষণের জন্য পৌত্তলিকেরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন, ডাক্তারের জন্য মুমূর্ষ রোগীর আত্মীয়েরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটীর দিন প্রতীক্ষা

করেন—বিধবা ও পুত্রসহোদরাবিহীন নির্ব্বোধ পরিবারেরা সেই রকম ১৫ই কার্ত্তিকের অপেক্ষা করেছিলেন। ১৫ই কার্ত্তিকই দিল্লীর লাডডু হয়ে পড়লেন—যাঁরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করেন নি, ১৫ই কার্ত্তিকের আড়ম্বর ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিশলেন। ছেলেবেলা আমাদের একটি চিনের খরগোশ ছিল, আজ বছর আস্টেক হলো, সেটি মরেচে—ভাঙ্গা পিঁজরের মাটী ঝেড়ে ঝুড়ে, তুলো পেড়ে বিছানা টিছানা করে তার অপেক্ষায় রইলেম।

১৫ই কার্ত্তিক মরা ফিরবে কথা ছিল, আজ ১৫ই কার্ত্তিক। অনেকে মরার অপেক্ষায় নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাত্রি দশটা বাজে, মরা ফিরল না! অনেকে মরার অপেক্ষায় থেকে মড়ার মত হয়ে রাত্তিরে ফিরে এলেন; মরা ফেরার হুজুক থেমে গেল!

হুতোম প্যাঁচার নক্সা/কালীপ্রসন্ন সিংহ

শহীদায়ন কবর

কলকাতার গোবরা সমাধিক্ষেত্রে দুই ধর্মপ্রাণ যুবকের শহীদ-কবর আছে। নরহত্যার অপরাধে এদের ফাঁসী হয়েছিল তিরিশের দশকে। অতঃপর এদের শব দুটিকে এনে এখানে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু নরহত্যা ও ফাঁসীর কাহিনিটা কী?

তিরিশের দশকে কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের এক প্রকাশক ভোলানাথ সেন হজরত মহম্মদের একটি সুলিখিত জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়াবার জন্যে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে হজরত মহম্মদের ছবির একটি কপি এনে ওই গ্রন্থে মুদ্রিত করেন। এতে তৎকালীন মুসলমান সমাজে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। ইসলাম ধর্মের নিয়মানুসারে হজরত মহম্মদের ছবি চাপা নিসিদ্ধ ছিল। ক্ষেপে গিয়ে দুই ধর্মপ্রাণ যুবক কলেজস্ট্রীটে ভোলানাথ বাবুর দোকানে ঢুকে তাকে গুলি করে হত্যা করেন। এই অপরাধে বিচারে তাদের ফাঁসী হয়। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে এরা শহীদ হিসেবে বরনীয় হন। তাই তাদের কবর শ্রদ্ধার সঙ্গে মুসলমান সমাজে উচ্চারিত।

তথ্য - মহুয়া ভট্টাচার্য, কলকাতার শ্মশান ও কবরস্থান

গঙ্গায় শব নিক্ষেপ

সমাচারচন্দ্রিকা-য় প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় মহোদয়েষু

... ইহা বিখ্যাত আছে যে এতন্নগরীয় নিমতলার ঘাটে স্কেবেঞ্জরের ঘাটে গরু গাদা ইত্যাদি নানা জন্তুর মৃত দেহ ও মনুষ্যের গলিত শব নিক্ষেপ করে তাহাতে গবর্নমেন্টের আইনও আছে ইদানীং তাহার বিপর্য্যয়ে চিকিৎসালয়ে যে সকল মনুষ্য প্রাণ ত্যাগ করে তাহারদিগের গলিত শব কাশী মিত্রের ঘাটে লইয়া গিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতেছে ইহার কারণ বুঝিতে পারি না কি স্বতন্ত্র আদেশে প্রকাশ হইয়াছে অথবা অনিয়ম রূপে মজুরেরা ঐ কর্ম্ম করে ইহাতে যদি শেষোক্ত বিষয় যথার্থ হয় তবে তাহার দণ্ড করা উচিত কেননা ঐ সকল শব তৎপল্লীর ক্ষুদ্র গলী হইয়া লইয়া যাইবাতে তত্রস্থ ব্যক্তিদিগের মহাক্লেশ হইতেছে রাশি ২ ঐ শবনীত হয় তাহার গলিত মাংসে সেই ক্ষুদ্র রাস্তায় লোকের গমনাগমন করা ভার হইয়াছে ইহাতে যদি কোন কর্ম্মকর্ত্তা সন্দিগ্ধ হন বরঞ্চ প্রার্থনা করি পোলীসের অধ্যক্ষ সাহেবেরা আমারদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া উক্ত ক্লেশ নিবারণ করুন। .....

তারিখ ২১.৩.১৮৪২ কেষাঞ্চিৎ কাশী মিত্রের ঘাটবাসিনং

নিমতলা শ্মশান ঘাটের কাষ্ঠাদির দোকানদার

আমাদিগের প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব নগরীর শান্তিকার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত অনেক কঠিনতর নিয়ম নির্দ্ধারিণ করিতেছেন ... কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নিমতলা শ্মশানের কাষ্ঠাদির দোকানদারদিগের দৌরাত্ম্য আমারদিগের মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিছুই নিবারণ করিতে পারিলেন না! তাহারা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, অর্দ্ধটাকার দ্রব্যাদি দিয়া এক টাকা গ্রহণ করে। অথচ তাহারদিগের লোভের সমতা হয় না ... ঐ ব্যবসায়িদিগের অত্যাচারের জন্য অনেক লোকেই মহাক্লেশ ভোগ করিতেছেন।

সংবাদ প্রভাকর, ১০.৮.১২৬০

সহগমন

কত্রক দিবস হইল মোং খিদিরপুর গ্রামে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের দৌহিত্রেয় দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় রোগ বিশেষে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে তাঁহার স্ত্রী পতির বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলাতনা হইয়া শবসহ জলজ্ঞানে জ্বলদগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন।

সমাচার দর্পণ, ৩১ শ্রাবণ, ১২৩১

পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরখানা

গৌরীশংকর দে

১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট পার্ক স্ট্রিটের কবরখানার পত্তন। এখানে প্রথম যাঁকে সমাহিত করা হয় তিনি ছিলেন শুল্ক ভবনের (Custom House) একজন কেরানি, জন উড। এর পর এই 'মৃতের নগরীর' (Necropolis) বাসিন্দা হন অসংখ্য ইংরেজ নর-নারী। কবি, সেনাপতি, বিচারক, ভাষাবিদ, পণ্ডিত, কেরানি, তরুণী বধূ, নানা পেশার, নানা চরিত্রের নামী অনামী নারী-পুরুষ। বহু ব্যয় করে নির্মিত হয় অনেকের সুদৃশ্য সমাধিসৌধ; স্থাপিত হয় মর্মর ফলক। আবার অনেকের শয়ান নিতান্তই সাদাসিধা সমাধিতে। বহু দিন হল এই সমাধিক্ষেত্র পরিত্যক্ত। বেশিরভাগ সমাধির গায়ে শ্যাওলা আর আগাছা। অস্পষ্ট হয়ে এসেছে অসংখ্য সমাধিলিপি। কলকাতার ইতিহাসবেত্তা কটন-এর ভাষায় এই সমাধিভূমি এক শোকভূমি (Land of Regrets)।

অষ্টাদশ শতকের কলকাতা নানা দিক থেকেই ছিল অস্বাস্থ্যকর। এখানকার জলবায়ু সহ্য হত না ইংল্যান্ড থেকে আগত ইংরেজ নর-নারীদের। অনেকের অকালেই জীবনাবসান ঘটেছিল। অনেকে আবার ভারতে আসার পথে জাহাজেই প্রাণ হারাতেন। স্বদেশ থেকে দূরে ভিন্ন দেশের মাটিতে ভিন্ন পরিবেশে তাঁরা চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন পার্ক স্ট্রিটের এই পুরনো কবরখানায়। অবশ্য কলকাতা তখন ইংরাজের শহর। অষ্টাদশ শতকের পরিত্যক্ত এই সমাধিক্ষেত্র।

ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যান্ডর (১৭৭৫-১৮৬৪) একজন প্রখ্যাত ইংরেজ কবি। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস খুললেই তাঁর জীবন ও কাব্য সম্পর্কে অন্তত চার-পাঁচ পাতা পাওয়া যাবে। প্রজাতান্ত্রিক ভাবধারার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্পেনের বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করেন ফ্লোরেন্সের মাটিতে।

রোমান্টিক কবি ল্যান্ডর প্রথমে যৌবনে যাঁর প্রেমে পড়েছিলেন সেই তরুণীর নাম রোজ (Rose Aylmer)। তাঁর উদ্দেশ্যে কবি লিখেছিলেন :

Ah, what avails the sceptred race?
Ah, what the form divine?
What every virtue, every grace?
Rose Aylmer, all were thine.
Rose Aylmer, whom these wakeful eyes
May weeps, but never see?
A night of memories and sighs
I consecrate to thee."

কবি ল্যান্ডরের প্রেমিকা রোজের জীবনাবসান ঘটে অকালে ১৮০০ সালে। তাঁর কাকিমা লেডি রাসেলের বাড়িতে বাস করার সময়। কবি ল্যান্ডর ঘুমিয়ে আছেন ইতালির মাটিতে। আর

নিঃসঙ্গ কবির প্রেমিকা মহানিদ্রায় শায়িতা কলকাতার মাটিতে। পার্ক স্ট্রিটের পুরাতন কবরখানায়। প্রেমিকার উদ্দেশ্যে রচিত ল্যান্ডরের কবিতাটি রোজ-এর সমাধিফলকে লেখা হলে ভালো হত। কিন্তু তা হয়নি। লেখা আছে কয়েকটি মামুলি কথা। সমতল বাংলায় তখন ম্যালেরিয়ার দাপট। তখনও এদেশে ইংরেজদের শৈলাবাস (hill-stations) তৈরি হয়নি। সুয়েজ ক্যানাল তখন কাটা হয়নি। সমুদ্রযাত্রা ছিল দীর্ঘ। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পরেই হয়তো প্রাণ হারিয়েছিলেন রোজ।

পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরখানায় সমাহিত আছেন তরুণ নাবিক ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ম্যাকে। তিনি লিখেছিলেন 'জুনার জাহাজডুবি' (The shipwreck of the Juina) নামে একটি বর্ণনামূলক কবিতা। কলকাতার ইতিহাস রচয়িতা ড. বাস্তিড (Dr. Busteed) আমাদের জানাচ্ছেন, কবি বায়রন যখন স্কুলে পড়তেন তখন ম্যাকে রচিত এই কবিতাটি তাঁর হাতে পড়ে। এই কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বায়রণ রচনা করেন ডন জুয়ানের জাহাজ ডুবির দৃশ্য।

'মৃতের শহর' পার্ক স্ট্রিটের সমাধিক্ষেত্রের একজন বিখ্যাত অধিবাসী স্যার উইলিয়াম জোনস (১৭৪৬-৯৪)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এই বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ছিলেন বহু ভাষাবিদ। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা ছাড়াও তিনি আয়ত্ব করেছিলেন আরবী, পার্সি, হিব্রু, চীনা ইত্যাদি নানা ভাষা। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পার্সি থেকে ফরাসি ভাষায় 'নাদির শাহ' গ্রন্থখানির তর্জমা করেন। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং 'নাইট' (knight) উপাধিতে ভূষিত হন। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এর সভাপতি ছিলেন।

জোনস সংস্কৃত ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। মনুসংহিতা, হিতোপদেশ এবং গীতগোবিন্দও তিনি ইংরেজিতে তর্জমা করেছিলেন। তাঁর ইংরেজি শকুন্তলা পাঠ করে জার্মান কবি ও নাট্যকার গ্যয়টে লিখেছিলেন : ''কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণতি বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।''

স্যার উইলিয়াম জোনসের সমাধিলিপিটি তাঁর নিজেরি রচনা। সেখানে তিনি লিখেছেন : *"Here was deposited the mortal part of a man who feared God, but not Death, who thought none below him but the base and unjust, none above him but the wise and virtuous."*

জোনসের সমাধির কাছে অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন ইংরেজ রাজপুরুষের (civilians) সমাধি। এঁদের মধ্যে আছেন অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড (Augustus Cleveland, 1784), পেশায় তিনি ছিলেন ক্যালেক্টর (collector)। কিছু দিন তিনি রাজমহলে ছিলেন।

নিকটেই অন্য একজনের উন্নত সুদৃশ্য সমাধিসৌধ। সৌধে শায়িতা বিচারক রবার্ট পাল্ক-এর (Robert Palk) তরুণী স্ত্রী লুসিয়ার (১৭৭২) সমাধি। এই সমাধি দর্শন করে রুডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling) তাঁর 'ভয়াবহ রাত্রির নগরী ('City of Dreadful Night')কাব্যে

লুসিয়ার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতাটি হল :

'The tender pity she would off betray,
Shall be with interest at her shrine returned,
Connubial love connubial tears repay,
And Lucia lov'd shall still be Lucia mourned.'

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কবি, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, নব্যবঙ্গ আন্দোলনের জনক, ঊনবিংশ শতকের নবজাগৃতির অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) পার্ক স্ট্রিটের সমাধিক্ষেত্রে চিরনিদ্রামগ্ন।

বর্তমান লেখক যখন কলেজের ছাত্র, তখন কবি অরুণাচল বসু (কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অভিন্ন বন্ধু) এসে তাঁকে বলেন, পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরখানায় একদিন গিয়ে আগাছায় ঢাকা, ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় একটি সমাধি আবিষ্কার করেছেন। সমাধিলিপি মুছে যেতে বসেছে। আক্ষেপ করে বললেন, কিছুদিন পরে আর এই সমাধির পরিচয় থাকবে না, খুঁজে পাওয়া যাবে না। অরুণাচল বসুর কথায় বর্তমান লেখক সমাধিটির অবস্থা সরেজমিনে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন ও 'স্বাধীনতা' দৈনিক পত্রিকায় 'স্টাফ রিপোর্টার' নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ডিরোজিওর সমাধি ও স্মৃতি রক্ষার জন্য সম্ভবত এই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। অরুণাচল বসু তখন 'সোভিয়েত দেশ', 'স্বাধীনতা', 'পরিচয়' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। বর্তমানে অবশ্য ডিরোজিও-র সমাধি সুরক্ষিত। তাঁর নামে প্রেসিডেন্সি কলেজের (পুরাতন হিন্দু কলেজ, যেখানে ডিরোজিও শিক্ষকতা করতেন) একটি ভবন বর্তমানে চিহ্নিত।

হিন্দু স্টুয়ার্টের সমাধি

মেজর জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু ধর্মের ওপর তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতনে ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতো সাত্ত্বিক জীবনযাপন করতেন। তাঁর সমাধির ওপর হিন্দু মন্দিররীতিতে স্মৃতি-সৌধ নির্মিত হয়। তাঁর অভিনব সমাধিসৌধ পার্ক স্ট্রিটের সমাধি ক্ষেত্রের অন্যতম আকর্ষণ।

পার্ক স্ট্রিটের পুরনো কবরখানা যেন ইতিহাসের কয়েকটি ছেঁড়া পাতা। ইংল্যান্ড আর ভারতের এক হারানো যোগসূত্র। কর্মচঞ্চল, যানবাহনের অবিরাম স্রোতবাহী আধুনিক মহানগরীর কোলাহলে ভরা কয়েকটি রাজপথ বেষ্টিত এই গাছপালায় ঘেরা নির্জন 'মৃতের দ্বীপে' থমকে আছে অষ্টাদশ শতক।

কবি রুপার্ট ব্রুক (১৮৮৭-১৯১৫) লিখেছিলেন :

"If I should die, think only this of me
That there's some corners of a foreign land
That is for ever England."

পার্ক স্ট্রিটে যাঁরা সমাহিত আছেন তাঁরা অনেকেই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেননি; অনেকে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যুর বুকে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তথাপি কবি ব্রুকের ভাষায় বোধহয় ব্যক্ত হয়েছে তাঁদের সকলের মনের আর্তি।

❑ লেখক পরিচিতি : ইতিহাসের অধ্যাপক, হাবড়া ইতিহাস পরিষদ, নানান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। 'চন্দ্রকেতু গড়' নিয়ে দীর্ঘ গবেষণারত।

মধুসূদনের সমাধি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

শ্রী নিশীথ কুমার দত্ত

জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ত জানি "শেষের সে দিন ভয়ংকর" তাই শ্মশান ও গোরস্থানের চিন্তা ভাবনা কেই বা করি। শ্মশান ও গোরস্থানের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। শ্মশানে দেহ মহাব্যোমে বিলীন হয়, আর গোরস্থানে দেহ হয় 'ধূলায় ধূলি'। গোরস্থান বললেই Cemetery, Burial Ground বা Grave-Yard এই ইংরাজি শব্দই মনে আসে। এই কলকাতা শহরেই North Park Street সংলগ্ন রাস্তার নাম Cemetery Street আবার জগদীশ বসু রোড ও পার্কস্ট্রিট এর সংযোগস্থলে যে South Park Street Cemetry রয়েছে সেই Park Street এর আগে নাম ছিল Burial Ground Street. এই সমাধিক্ষেত্র ইং ১৭৬৮ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন অপ্রশস্ত বন-জঙ্গলে ঢাকা পথ ধরেই শব নিয়ে আসতে হত। ইলিজা ইম্পের এক বিশাল বাগান ছিল এই Burial Ground Street এর পাশে। তাতে অনেক হরিণ থাকতো। তাই এই রাস্তার পরে নাম হয় Park Street। এখানে জমি কিনে অনেক সাহেব-সুবোরা বাড়ি করেন। South Park Street এর কবরের জমি সংকুলান না হওয়ায় রাস্তার অপর পারে North Park Stree Cemetry হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্স, স্যার এলিজা ইম্পে, হেনরী ডিরোজিওর সমাধি এই দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীট কবরখানায়। কবরের ওপরে যে আকর্ষণীয় সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে তাতে গ্রীক, রোমান বা ইটালিয় প্রভাব দেখা যায়। কলকাতার ইতিহাস জানতে হলে এই সমাধিক্ষেত্রে প্রতিটা কবরলিপিই পড়া উচিত। খোঁজখবর নিয়ে যা জানলাম তাতে মনে হয় রাত্রে অসামাজিক ক্রিয়কলাপও চলতে পারে। ঠিক অপর পারের North Park street Cemetery-তে রয়েছে ডিরোজিও-শিষ্য মাইকেল মধুসূদন দত্তর সমাধি। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে ইংরেজদের কবরস্থান ছিল সেন্ট জন চার্চ সংলগ্ন প্রাঙ্গণেই। এই প্রাঙ্গণে রয়েছে চার্ণকের সমাধি। এখানে আরও বেশ খ্যাতনামা কয়েকজনের সমাধি আছে। এই South Park Street Cemetery অপূর্ব স্থাপত্য শৈলীর স্মৃতিসৌধ আছে। কালো গ্রানাইট পাথরে যে স্মৃতিলিপি (Epitaph) লেখা আছে তার খোদাই কাজে আছে বিশেষ মুন্সীয়ানা। এক বিশেষ ধরনের ব্যবসায়ী সংস্থা এই সব স্মৃতিলিপি খোদাইয়ের কাজ করতো। জগদীশ বসু রোডের অপর পারেই আছে North Park Street Cemetery। South Park Street Cemetry-তে স্থান সংকুলান না হওয়ার পরে এই কবরখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ১৮৭৩ সালে ২৯ জুন রবিবার মধুসূদন দত্ত মারা যান অতি দীন অবস্থায়। সেদিন তাঁর পাশে কোনো আত্মীয় ছিলেন না। অতি দীন ভাবে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। মাটিতে ঢাকা কবর এইভাবেই প্রায় পনেরো বছর পড়ে থাকে। এই কবরকে শনাক্ত

করাই কঠিন হয়ে ওঠে। ১৮৮৮ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গৌরদাশ বসাক, মধুসূদনের সতীর্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিশির ঘোষ, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে 'মধুসূদন স্মৃতিরক্ষা কমিটি' হয়। এই কমিটি পার্কস্ট্রীটের তাঁর মাটির কবরের ওপর এক মার্বেলের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রয়াস করে ও অর্থ সাহায্য চায়। পূর্ববঙ্গের ভাওয়ালের সাহিত্যানুরাগী রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ প্রভৃত অর্থ সাহায্য করেন। কলকাতার বহু মানুষ অর্থ সাহায্য করেছিলেন তাদের প্রিয় কবির স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্যে। ১৮৮৮ সালের ১ ডিসেম্বর ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ বহু গণ্যমান্য মানুষের সমক্ষে এই নবনির্মিত প্রস্তর ফলকের উদ্বোধন করেন। সেদিন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান মীররের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখেরা। এইভাবে নির্মিত সেই স্মৃতি ফলকেই মাইকেলের নিজের রচিত বিখ্যাত সেই ছত্র উৎকীর্ণ করা আছে।

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণ এ সমাধিস্থলে।

আজকের এই স্মৃতিফলক দেখে ক'জন স্মরণ করবে বাঙলার এই মহাকবিকে কী দীনহীন ভাবে কবরস্থ করা হয়েছিল।

কলকাতায় পর্যটকেরা ক'জন এই সব ইতিহাস প্রসিদ্ধ গোরস্থানগুলো দেখে? অর্থের অভাবে আজ সব শ্রীহীন। এগুলিকে শ্রীমণ্ডিত করে পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয় করে তুললে রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধে হবে না। দুশো বৎসরের প্রাচীন এই ব্রিটিশ কবরস্থান এখন শ্রীহীন। বেশিরভাগ ফলক ও মার্বেললিপি উধাও। পাহারাদারের ঘরও এখন বেদখল। কবরের কয়েকটি লিপিই এখন এর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্যবাহী। প্রতি বছরের ২ নভেম্বর এখানে পৃথিবীর অন্যান্য প্রোটেস্টান্ট চার্চের প্রথানুসারে 'All Souls Day' পালিত হয়। এই দিনে কবরে শায়িত প্রতিজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। বহু আদিবাসীমানুষ যারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন তারাও ওই দিন সমবেত হন।

ব্রিটিশরা খ্রিশ্চান কবরের প্রসঙ্গ এলেই 'Grane Digger' ও 'Grane Cloth' এর কথা স্মরণে আসে। এই কবর খননকারীদের তখন ছিল খুব চাহিদা। মৃতদেহকে আচ্ছাদিত করার জন্য ছিল বিশেষ কাপড়। যাদের আত্মীয় বিয়োগ হত তারা পরতেন কালো কাপড় কবর দেওয়ার পর অনেকক্ষেত্রে বড় সৌধ, যাকে 'Cenotaph' বলা হয়। আর কবরের উপরে পাথরে খোদিত লিপিকে Epitaph বলা হয়। এই Epitaphএ কেবল মৃতের পরিচয়ই থাকে না, উৎকীর্ণ থাকে নানা কাব্যিক লেখা। সিমলা শহরের অদূরে, কশৌলিতে একটি কবরের Epitaph-এ লেখা

"Halt Stranger, do not go by
As you are now, so once was I.
Prepane therefore to follow me,
As I am, so will you be.

❑ লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক, গবেষক, হেরিটেজ কমিটির সঙ্গে যুক্ত।

রাজবংশী লোকচারণা ও শ্মশান

দীপককুমার রায়

রাজবংশী জনগোষ্ঠী বৃহত্তর মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। উত্তরপূর্ব ভারতে কোচ, মেচ (Boro), হাজং, রাভা, মদাহী, জলদা, ধীমল ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক নৈকট্য বিদ্যমান। ষোড়শ শতকে কোচ রাজা বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে কোচরা হিন্দুকৃত হয়ে রাজবংশী নামে চিহ্নিত হয় অর্থাৎ রাজবংশী পরিচয় দিয়ে থাকে। ড. চারুচন্দ্র সান্যাল বলেছেন—'... The kochs are non-Aryan in origin. Some of them adopted Hinduism and became Rajbansis'.[১]। পরবর্তীকালে রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে ক্ষত্রিয় আন্দোলন রাজবংশী সমাজে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রায় দুশো বছর ধরে রাজবংশী সমাজে একদিকে মহাপুরুষ শংকর দেব প্রবর্তিত মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতি এবং শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। এরূপ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পদচিহ্ন আছে রাজবংশী লোকচারণা ও শ্মশান ভাবনায়।

শ্মশান বলতে রাজবংশী সমাজে একালের নির্দিষ্ট কোনো স্থান নয়। বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে সাধারণত যে কোনো স্থানই 'শ্মশান বাড়ি' বা 'পাথার বাড়ি' নামে চিহ্নিত। তাই মৃতদেহ সৎকার করা হয় 'পাথার বাড়ি'র যে কোনো স্থানে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো নদী-নালা, জলাশয় বা পুকুরের পাড় চিহ্নিত করে মৃতদেহ সৎকার করার রীতি। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পথে এক ধরণের গীত পরিবেশন করেন রাজবংশী সমাজের কীর্তনিয়া সমাজ, যা 'মড়া-খোয়া' গান নামে পরিচিত। মৃতের প্রতি প্রথম পিন্ডদান করা হয় শ্মশানেই।

মৃতদেহকে দাহ না করে সমাধি দেওয়া রাজবংশী সমাজের দেশজরীতি। সমাধিতে দেওয়া হত সওয়া সের লবণ। এই রীতিকে বলা হয় 'নুন মাটি'। মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির পিছন দিকের 'পদ্দলা' বা বেড়া ভেঙে নিয়ে যাওয়া হত এবং তিনদিন পরে সেই পদ্দলা বা ভাঙা বেড়া জুড়ে দেওয়ার রীতি; লোকবিশ্বাস মৃত-আত্মা যাতে পুনরায় বাড়িতে ফিরে আসতে না পারে সেজন্য বেড়া ভাঙার রীতি প্রচলিত ছিল।[২] বলাবাহুল্য তখন অশৌচ পালন করা হত তিনদিন। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের পরবর্তীকালে শুরু হয় এগারো-বারো বা বারো-তেরো দিন অশৌচ পালন। ডি.এইচ.ই. সান্ডার ত্রিশ দিন অশৌচ পালনের কথা উল্লেখ করেছেন।

গর্ভবতী সধবার মৃত্যু হলে সমাধিস্থ করা হয় এবং সমাধিক্ষেত্রের পাশে একটি কলার গাছ রোপন করা হয়। কোথাও কোথাও সমাধিক্ষেত্রে সর্ষে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তবে আধুনিককালে মৃতদেহকে গর্ভবতী সধবা এবং শিশু ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাহ করা হয়।

মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় কীর্তিনীয়া (কীর্তনীয়া) সমাজে পরিবেশন করনে বিরিবার গান বা সৈন্যাস গান, যেমন—

নগর হৈতে বাহির হৈলো রে
ওরে শচীর দুলাল গোরা
ওরে চলিলো গোরা নিজ পন্থে।

শ্মশানেই পালিত হয় বালুপিন্ড লোকাচার; প্রথম পিণ্ডদান। গানে উল্লেখ করা হয় রাজা দশরথের কথা—

কুন বনে গেল রাম কুন বনে গেল
মরণ কালেতে রামের দ্যখা না হৈল।

চিতান : রাম গেল বন বাসে সঙ্গে লইয়া সীতা।
রামের শোকে কেঁন্দে মইল দশরথ পিতা।।

চিতান · শূন্য হইল খাট পালঙ্ক-রত্ন সিংহাসন।
রাম বিনে শূন্য-হইল অযোধ্যা ভুবন।।

(পয়ার)

কুঠরিতে রাখিয়া সীতাকে রাম গেল বন্।
হেন কালে দশরথ মাগে পিন্ডদান্।।
পিন্ড দেহ পিন্ড দেহ সীতা মা জানকী।
তোমার হস্তে পিন্ড পাঁইলে হব স্বর্গবাসী।।
সীতা বলে মহারাজ কিছু নাই ঘরে।
রাজা বলে বালির পিন্ড দেও তো আমারে।।
ফাগুতে নামিয়া সীতা ওজ মন হইয়া।
রামজাম করে সীতা বালির লইয়া।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব তিন জন।
প্রভু জিজ্ঞাসিলে সাক্ষী দিবেন ততক্ষণ।।[৮]

মৃতদেহ সৎকার করে বাড়ি ফিরে আসার সময় গানের মধ্যে বৈরাগ্য এবং আত্মসমর্পণের ভাবটি ফুটে ওঠে। এই পর্বেও 'সৈন্যাস গান' পরিবেশিত হয়—

ও মাধাই হে
তুই এইঠে আয় রে আয় ...

এইভাবে রাজবংশী লোকজীবনে 'মড়া খোয়া' গানে অধিবাস, মিলন, ধুমালী ফিরা গোষ্ঠ, ইত্যাদি বিভিন্ন পর্বের গান প্রচলিত আছে। তবে গানগুলিতে বৈষ্ণব প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্ভবত অতীতে এরূপ গানের প্রচলন ছিল না, চৈতন্য সংস্কৃতি এবং ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রভাবেই এই সংগীত ধারা পুষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণ দাস (কৃষ্ণদাস কবিরাজ), কানুদাস প্রমুখ পদকর্তার ভণিতা লক্ষ করা যায়।

শ্মশানের দেবদেবী :

রাজবংশী লোকসমাজ মৃতের প্রতি শ্মশানে পিণ্ডদান করার সময় ১২ জন দেবদেবীর পূজা করেন—শিব, গৌরী, সাঞ্জি, ডাকিনী, যগিনী, মাশান, ভূত, তিস্তাবুড়ি, বিষহরী, কুচুনী, অপদেবতা এবং কালী।[৪]

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মাশান ভয়ংকর দেবতা। তাঁর রূপ ১৮টি অর্থাৎ মাশান ১৮ প্রকার। শ্মশানে মূলত জলুয়া মাশানের পূজা করা হয়। কীর্তিনীয়ার দল শ্মশানে প্রবেশ করার পূর্বেই মাশান দেবতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'মাশান বন'-এর মন্ত্রোচারণ করেন।

তিস্তাবুড়ি রাজবংশী সমাজের অন্যতম লৌকিক দেবী। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী তিস্তা নদীর দেবী তিস্তাবুড়ি; ঝড় ঝঞ্ঝার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই দেবীর পূজা করা হয়। শ্মশানেও এই দেবীর পূজা আবশ্যিক। শ্মশানে বারোজন দেবদেবীর পূজা করাকে স্থান বিশেষে বলা হয় 'হাজরা পূজা'।

শ্মশানের লোকাচার ও বৈষ্ণব প্রভাব :

অনুমান করা যায় প্রায় দুশো বছর ধরে রাজবংশী সমাজে বৈষ্ণব সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি প্রভা বিস্তার করে। অতি প্রাচীনকালের কৌম ভাবনা থেকে সরে এসে রাজবংশী সমাজ চৈতন্য সংস্কৃতি এবং শংকরীয় সংস্কৃতি (অসমের)কে আপন করে নেয়। ক্ষত্রিয় আন্দোলন এক্ষেত্রে অনেকখানি সহায়ক হয়ে ওঠে। 'মড়া খোয়া' গানের প্রতিটি কলি আসলে বৈষ্ণব পদাবলীর পদ। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস প্রমুখ পদকর্তার নিমাই সন্যাস পর্বের পদ, বাল্যলীলার পদ, গোষ্ঠ লীলার পদ, মিলন-বিরহের পদ মড়া খোয়া গানের প্রধান অঙ্গ।

রাজবংশী লোকাচারে অশৌচ কর্মকে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়। যেমন—চৌধা (চৌঠা), দশা, খাউর, শ্রাদ্ধ। প্রতিটি পর্ব শ্মশানের সঙ্গে যুক্ত। চারদিনে পালিত হয় চৌধা; এই পর্বে শ্মশানে পূজা করা হয় ৪৬ মাহান্তো বা মহান্ত; অর্থাৎ ৪৬ জন মহন্তকে স্মরণ করা হয়। রাত্রে অধিবাসের গান পরিবেশিত হয় (বাড়িতে) যা কৃষ্ণলীলাল অন্তর্গত। দশ দিনে দশা এবং এগারোতে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বারো দিনে পালিত হয় 'শীতুলী' পর্ব বা সমাপ্তি পর্ব। দশা ও শ্রাদ্ধ পর্বে শ্মশানের বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করা হয়। মড়া খোয়া গানের সুর বৈচিত্র্য এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে মহাপুরুষীয় বৈষ্ণবগুরু শংকর দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট।

শ্মশানের গান : কীর্তিনীয়া সম্প্রদায় :

রাজবংশী সমাজে শ্মশানের গান বা মড়া খোয়া গান পরিবেশন করেন। কীর্তিনীয়া বা কীর্তনীয়া সমাজ। তাঁদের পদবী সাধারণত 'রায়' এবং 'অধিকারী'। পুরুষানুক্রমে এই গান পরিবেশন করেন। 'মৃতদেহ সৎকারের যাবতীয় দায়িত্ব, যেমন জীবচালনা, গৃহশুদ্ধি ইত্যাদি কর্ম কীর্তিনীয়াগণ সম্পন্ন করিয়া থাকেন।'[৫] নিম্নে জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকজন কীর্তিনীয়ার তালিকা দেওয়া হল—

১. খর্গনারায়ণ অধিকারী, চাপগড়, আমগুড়ি, জল

২. শ্রীরমণীমোহন রায় (৫৬), চাপগড়, আমগুড়ি, জল
৩. ঁনবীনচন্দ্র অধিকারী, চাপগড়, আমগুড়ি, জল
৪. শ্রীসাকালু রায় (সুঙোর ঢেলা) (৫০), বক্সীরডাঙ্গা, আমগুড়ি, জলপাইগুড়ি
৫. শ্রীঘুঙুরু রায় (৫০), সাতকুড়া, দঃ খারিজা, বেরুবাড়ি
৬. শ্রীঅভয় রায় (৪০), খোলার বাড়ি, পদমতি ২-নং গ্রাম পঞ্চায়েত, ময়নাগুড়ি
৭. ধৌলু রায় (৬০), নয়াবানি, পদমতি ১-নং গ্রাম পঞ্চায়েত, ময়নাগুড়ি
৮. ঁনুনচন অধিকারী, চাপগড়, আমগুড়ি, জল
৯. শ্রীঅরণ্য অধিকারী (৭০), মরুচবাড়ি, ময়নাগুড়ি
১০. শ্রীহরিহর অধিকারী (৬০), সিঙিমারী, ময়নাগুড়ি
১১. ঁভুসুং রায়, সোনার বাড়ি, আমগুড়ি, জল
১২. ঁকেন্দেলু কীর্তিনীয়া (রায়), বাংলার ঝাড়, ময়নাগুড়ি
১৩. ঁঠসা রায়, খ্যামনপাড়া, পূর্ববড়গিলা, আমগুড়ি, জল
১৪. ঁউপেন অধিকারী, পশ্চিম নারার থলি, কামাখ্যাগুড়ি
১৫. ঁভান্ডা অধিকারী, প. নারারথলি, কামাখ্যাগুড়ি
১৬. শ্রীভবেন অধিকারী, প. নারার থলি, কামাখ্যাগুড়ি
১৭. শ্রীডেরু রায় (৭০), প্রমোদনগর, ফালাকাটা, জল

শ্মশান স্থান :

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে রাজবংশী সমাজের কৌম চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটে; তাই আধুনিক কালে নির্দিষ্ট স্থানে শবদেহ দাহ বা সমাধি দেওয়া হয়। শবদেহ-কে দাহ করার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্মশান স্থান চিহ্নিত আছে। যেমন—

১. জলপাইগুড়ি শহরের মাসকলাই বাড়ির শ্মশান—করলা নদীর পাশে অবস্থিত। শ্মশান কালীর মন্দির আছে। জানা যায়, একদা মন্দিরের সামনে মানুষ বলি দেওয়া হত।

২. খইলসামারীর শ্মশান—চেপানী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত (আলিপবদুয়ার) শ্মশানকালী দেবীকে পূজা দেওয়া হয়।

৩. পুলকুড়ার পাড়—ভোটপট্টি গ্রামের পশ্চিমে, পদমাত ২-নং (ময়নাগুড়ি) গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই শ্মশান।

৪. ধন্যা পাড়ের শ্মশান—গ্রাম ভোটপট্টি থানা ময়নাগুড়ি; শ্মশান কালীর মন্দির আছে।

৫. ডেরকামারীর শ্মশান—বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাণিজ্যের হাটের পাশে ডেরকামারী নদীর পাড়ে অবস্থিত।

৬. কাইতাকুড়ার শ্মশান—ময়নাগুড়ি (শহীদগড়), শ্মশান কালী মন্দির আছে।

৭. ধুপগুড়ির শ্মশান—ধুপগুনি শহরের কুমলাই নদীর পাশে অবস্থিত। শ্মশান কালী মন্দির আছে।

৮. মরাঘাট শ্মশান : বিন্নাগুড়ি ও বানার হাটের মাঝখানে হাতিনালা (পরে মিশেছে আংরাভাসা নদীর সঙ্গে) নদীর পাড়ে মরাঘাট। শ্মশানকালীর মন্দির আছে। একদা ধুপগুড়ি বানারহাটের বৃহত্তর এলাকা মরাঘাট পরগনা নামে চিহ্নিত ছিল।

৯. ডুডুয়া পাড়ের শ্মশান—ফালাকাটা, ভূটনীঘাট এলাকার ডুডুয়া নদীর পাড়ে অবস্থিত। শ্মশানকালী মন্দির আছে।

১০. বিরকিটি শ্মশান—জটেশ্বর বিরকিটি নদীর তীরে অবস্থিত (ফালাকাটা)

১১. কাজলী হল্ট-এর শ্মশান—জটেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের (২নং) অধীন, শ্মশান কালী মন্দির আছে।

১২. পুরান শালবাড়ির শ্মশান—অনেক পুরাতন শ্মশান স্থান, শ্মশান কালী মন্দির আছে। শালবাড়ি (পুরান), ধুপগুড়ি, জল।

তথ্যসূত্র :

১. Dr. Charee Chandra Sanyal : The Rajbansis of North Bengal. The Asiatic Society, 1965, P-13

২. ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক : প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোক সংগীত, ক.বি. ১৯৭৭, পৃ. - ২৫৩

৩. সংগ্রহ : রমণীমোহন রায় (৫৬) চাপগড়, আমগুড়ি, জল

৪. ড. গিরিজাশংকর রায় : উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজাপার্বণ, ডিব্রুগড়, আসাম, ১৯৯৯, পৃ.-৩৯

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-৫



❑ লেখক পরিচিতি : প্রাবন্ধিক, গবেষক, অধ্যাপক— কোকরাঝাড় কলেজ, আসাম।

দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মহাশ্মশান

বিমলেন্দু হালদার

আদিযুগের বাংলা সাহিত্য 'চর্যাপদে'র ৫০ সংখ্যক চর্যায় আছে—

"চারি বাসে গড়িলা রেঁ দি আঁ চইতালী।
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কাঙ্গই সগুণশিআলী।।" (শবরপাদ)

(চারি বাঁশে চাঁচারি দিয়ে খাট গড়া হল। তাতে তুলে শবরকে দাহ করা হল, শকুন শিয়াল কাঁদতে লাগল।)

এটি একটি শ্মশানের চিত্র। প্রাচীন বাঙালি হিন্দু সমাজে মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করে সৎকার করার রীতি প্রচলিত ছিল। শবরপদের এই পদে তার প্রমাণ মেলে।

শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করে সৎকার করার প্রথা আজও প্রচলিত আছে। তবে কবে থেকে এই রীতি বা প্রথার উদ্ভব হয়েছে তা সঠিক জানা যায় না। আদিম মানুষ মৃতব্যক্তির দেহ সাধারণত উন্মুক্তস্থানে ফেলে রাখতো—পশুপাখির খাদ্য হিসাবে। পরবর্তীকালে তারা মৃতদেহকে কবর দেওয়া শুরু করে। সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস থেকে জানা যায়—সিন্ধুর নগরগুলিতে মৃতদেহ কবর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্যে বিভিন্ন রকম অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। কোথাও কোথাও মৃতদেহকে আগে দাহ করে পরে ভস্মকে কবর দেওয়া হত। তবে এই মৃতদেহ দাহকার্য শ্মশানে সম্পন্ন হত কিনা সে বিষয়ে কোন হদিশ পাওয়া যায় না। তবে এটুকু অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয়না যে সাধারণত কোন পরিত্যক্ত স্থানে বিশেষ করে নদীতীরের পরিত্যক্ত স্থানে এই দাহকার্য সম্পন্ন করা হত। আর এইভাবে মৃতদেহ দাহ করার স্থান হিসাবে শ্মশানের উৎপত্তি ঘটেছিল।

প্রাচীন গ্রিসে সাধারণত মৃতদেহকে কবর দেওয়া হত। তবে এই প্রথা কিছুদিনের জন্য তিরোহিত হয়েছিল যখন আইওনীয়ানরা মৃতদেহ দাহ করার প্রথার প্রবর্তন করেছিল। হোমারের 'ইলিয়াড' কাব্যে পাত্রোক্লুসের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বর্ণনায় দেখা যায় সমাধি কাঠে চিতা সাজিয়ে বীর পাত্রোক্লুসের মৃতদেহ দাহ করা হচ্ছে। এই বর্ণনার ভিতর দিয়ে মৃতদেহ দাহ করার স্থান হিসাবে শ্মশানভূমির ছবি ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশে হিন্দু বাঙালিদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য মৃতদেহ দাহ করার পদ্ধতি এবং দাহকার্যের স্থান হিসাবে শ্মশানভূমির কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারা যায়। চর্যাপদের মতো মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে এবং অনুবাদ সাহিত্যে শ্মশানভূমির কথা আছে। সাধারণত নদীতীরে চিতা প্রস্তুত করে এই দাহকার্য সম্পন্ন হত। কৃত্তিবাসের রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বালিরাজের অন্ত্যেষ্টি বর্ণনায় আছে—

"চন্দন কাষ্ঠের চিতা করিল সে তীরে।
বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে।।"

বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসা বিজয়' কাব্যে আছে—

"করিল বিচিত্র চিতা ক্ষীরোদের কূলে।
দিলেন চন্দন কাষ্ঠ ঘৃত বহু তরে।।"

দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গলে আছে—

"কংসনদীর তটে আছে বড় রম্যস্থল।
নানা কাষ্ঠ কুড়াইয়া জ্বালিল কূলে।।"

রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়নে নর্মদার তটে চিতা সাজিয়ে অগ্নিকার্য করার প্রসঙ্গ থাকে। এইভাবে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু বাঙালির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় মৃতদেহ দাহকার্যের স্থান হিসাবে শ্মশানের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

বাংলাদেশে বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শ্মশানভূমিগুলির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল গঙ্গার তীরে কিংবা গঙ্গা সংলগ্ন বা গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত কোন নদীর তীরে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যতগুলি শ্মশান আছে তাদের প্রতিষ্ঠাভূমির কথা আলোচনা করলে একথার সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে। গঙ্গা বাংলার প্রাণের নদী। জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অতুলনীয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের কর্মে, জীবনে, ধর্মে, বিশ্বাসে, সংস্কারে গঙ্গা এক আশীর্বাদ। প্রাচীনকাল থেকেই গঙ্গার তীরে এখানকার মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতির নানা আচার প্রথা পালিত হয়ে আসছে। সেই হিসাবে মৃতদেহ সৎকারের স্থান হিসাবে এখানকার মানুষ গঙ্গারতীরকেই বেছে নিয়েছিল। আজও সেই রীতি প্রচলিত হয়ে চলেছে।

দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মহাশ্মশানটির একদা প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল আদিগঙ্গার তীরে প্রায় চারশ বছর পূর্বে। আজ এই শ্মশানভূমিটি এখানকার মানুষের কাছে একটি তীর্থক্ষেত্রের মতো। এই শ্মশান সংলগ্ন গঙ্গাতে স্পর্শ করলে পুণ্য লাভ হয় এবং এই শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করলে মানুষের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়—এই ধারণা আজও প্রচলিত। তাই বহু দূর দূরান্ত থেকে মৃতদেহ নিয়ে আসে মানুষ এখানে দাহ করার জন্যে। এমনকি ধারে কাছে অন্য শ্মশান থাকলেও মানুষ সংস্কারবশত এখানে নিয়ে আসে। সেইজন্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশানে কোন দিন মড়া পোড়ানো বন্ধ থাকে না। যেদিন বন্ধ হবে সেদিন সৃষ্টি রসাতলে যাবে।

এই শ্মশানভূমিটির প্রতিষ্ঠা কবে ঘটেছিল তার সঠিক দিনক্ষণ নির্ধারণ করা যায় না বা এই জাতীয় কোন সঠিক তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে শ্মশানটির একটি সময়কাল নিরূপণ করা সম্ভব হতে পারে। এরজন্য আমাদের বাংলার ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরাতে হবে।

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে দাউদ খানের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে পাঠান রাজত্বের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু বাংলার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে বিশেষ করে উড়িষ্যায় সামগ্রিকভাবে না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে

পাঠান শাসন তখনও বজায় ছিল। ১৫৮৪ খ্রি. পাঠান নায়ক কুৎলু খান লোহানী বিদ্রোহ করে বাংলার বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হলে মুঘলদের কাছে বাধা পান। মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি পুনরায় উড়িষ্যায় ফিরে গিয়ে রাজত্ব করতে থাকেন।

উড়িষ্যার যাজপুরে তখন বহু দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। এতদিন ধরে তাঁরা নিরুপদ্রবে বসবাস করে আসছিলেন। উৎকলের ইতিহাস থেকে জানা যায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাড়তে থাকে। উড়িষ্যায় বসবাসকারী বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে যাতায়াত করতে থাকেন। এমন সময় পাঠান-মোগলের এই দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্ব বিপর্যয়ে ভীত হয়ে যাজপুরে বসবাসকারী এবং বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী কিছু দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ উড়িষ্যা ত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সহ বাংলায় বসবাসের উদ্দেশ্যে আগমন করেন এবং বাংলার বিভিন্নস্থানে বিশেষ করে গঙ্গার তীর ধরে তাঁরা বসতি গড়ে তোলেন। চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় তাঁদের বসতি গড়ে ওঠে। তবে চব্বিশ পরগনায় এবং বর্ধমানে এঁদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল এমন তথ্য পাওয়া যায়।

উড়িষ্যার যাজপুর ত্যাগকারী দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে মধুসূদন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ বাংলায় এসে চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে খনিয়া শাহজাদাপুর গ্রামে (জয়নগর থানা) পরিবারবর্গসহ বসবাস শুরু করেন। তাঁর দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ হরিদেব এবং কনিষ্ঠ নৃসিংহদেব। পিতামাতার মৃত্যুর পর হরিদেব কনিষ্ঠ নৃসিংহদেবকে রেখে সস্ত্রীক তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন। এই ব্রাহ্মণবংশ নিজেদেরকে নিষ্ঠাবান এবং অশূদ্রজাতি বলে গর্ববোধ করতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তীর্থপর্যটন থেকে ফিরে এসে হরিদেব দেখেন তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা নৃসিংহদেব ও ভ্রাতুষ্পুত্র শূদ্রযাজী হয়ে শূদ্রজাতির মানুষের কাছ থেকে জমিজমা অর্থ ইত্যাদি দানগ্রহণ করে দক্ষিণ বারাসাত নামক স্থানে সুখে বসবাস করছেন। তখন ক্ষুব্ধ হরিদেব স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আরও দক্ষিণ দিকে সরে এসে গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে জঙ্গলাকীর্ণ প্রায় লোকবসতিশূন্য বিষ্ণুপুর নামক স্থানে কিছু জঙ্গল হাসিল করে বসবাস করতে শুরু করেন।

হরিদেব মিশ্রের দেখাদেখি আরও কিছু মানুষ দক্ষিণের এই বিষ্ণুপুরে এসে বসতিস্থাপন স্কুলে থাকেন। ক্রমে ক্রমে গঙ্গার তীরে ছোটখাট একটি লোকালয় গড়ে ওঠে। বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী এবং দূরবর্তী গ্রাম থেকে দু-চারজন মানুষও এসে এখানে বসতিস্থাপন করতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। তখন তাঁরা লোকালয়ের উল্টো দিকে গঙ্গার পূর্ব তীরে একটি নিম এবং বটগাছের মধ্যবর্তী স্থানে জঙ্গল হাসিল করে শবদাহের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করেন। ধীরে ধীরে সেই স্থানটি শ্মশানে পরিণত হয়। সেটি আজ দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মহাশ্মশান. দাউদ খানের পতন, কুৎলুখাঁর সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ, বৈদিক ব্রাহ্মণদের যাজপুর ত্যাগ প্রভৃতি ঘটনার কালক্রম পর্যালোচনা করে বলা যায় ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষে কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশানের প্রতিষ্ঠা

ঘটে।

সে সময় দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশানের প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন চব্বিশ পরগনার দক্ষিণাংশ প্রায় মনুষ্য বসতিশূন্য জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল ছিল একথা তৎকালিন ইতিহাস থেকে অবগত হওয়া যায়। তবে এই সমস্ত স্থান কোন না কোন জমিদারের জমিদারির অধীনে থাকত। দক্ষিণ বিষ্ণুপুর স্থানটিও সেই সময় হুগলি জেলার বংশবটী গ্রাম নিবাসী রাজা নৃসিংহদেবের জমিদারি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে গোকুলনগর গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার (মধ্যসত্ত্বভোগী) রামপ্রসাদ মণ্ডলের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। তখনকারদিনে জমিদাররা প্রজাবিলি সম্পর্কে অনেক উদারনীতি গ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণের এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে মানুষ বসবাস করতে ভয় পেত। হিংস্র জন্তু এবং সরীসৃপের ভয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল ডাকাতের উপদ্রব। তাই সে ব্যক্তি জঙ্গল পরিষ্কার করে যতখানি জমি বসতি এবং আবাদী ভূমি হিসাবে গড়ে তুলতে পারবে, জমিদারগণ সেই ব্যক্তিকে নামমাত্র মূল্যে, অনেক সময় বিনামূল্যে কিংবা নিষ্কর হিসাবে প্রদান করতেন। রামপ্রসাদ মণ্ডল এইভাবে জঙ্গল হাসিল করে বহু জমিজমার মালিক হন এবং গোকুলনগর গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ বিষ্ণুপুর সহ আশেপাশের অনেক গ্রাম তাঁর জমিদারীর অধীনে ছিল।

রামপ্রসাদ মণ্ডলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুর্গারাম মণ্ডল এবং দুর্গারামের পুত্র-পৌত্রগণ এই সমস্ত জমিজমা ভোগ দখল করতে থাকেন। এদিকে গঙ্গার প্রবাহ (ভাগিরথী) ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যেতে শুরু করে। একসময় গঙ্গা মজে যায় এবং স্থানীয় অধিবাসীরা সীমানার মধ্যে বেঁধে ফেলে পুকুরে পরিণত করে। দক্ষিণ বিষ্ণুপুর সংলগ্ন গঙ্গানদী এইভাবে ছোট বড় পুষ্করণীতে ভাগ হয়ে যায়। রামপ্রসাদ মণ্ডলের বংশধরগণ এই সময় শ্মশানভূমি, গঙ্গা এবং গঙ্গাতীরে স্থান (সব মিলিয়ে প্রায় ৯ বিঘা) সমূহ স্থানীয় হালদার পদবীধারী ব্রাহ্মণদের দান করেন। কিন্তু কিছুদিন ভোগদখল করার পর হালদার ব্রাহ্মণরা সমস্ত জমি, পুকুর (গঙ্গা) মন্দিরবাজার থানার কাদিপুর গ্রামের গুণসিন্ধু নস্করকে বিক্রি করেন। গুণ সিন্ধু নস্করের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণের সম্পত্তি ভোগদখল করলে অকল্যাণ হতে পারে এই ভয়ে তাঁর পুত্র পৌত্রগণ ঐ সমস্ত জমি (শ্মশান এবং গঙ্গা সহ) পুনরায় হালদার ব্রাহ্মণদের দান করেন। এর পরে আর ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়নি। হালদার ব্রাহ্মণরা এগুলি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভোগদখল করতে থাকেন। শ্মশান সংলগ্ন গঙ্গাটি পরিচিত হয় 'হালদার গঙ্গা' নামে। পরবর্তীকালে গঙ্গা এবং শ্মশান সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যতগুলি শ্মশান আছে তাদের মধ্যে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশানটি ঐতিহ্যে এবং মাহাত্ম্যে গরিষ্ঠ। প্রাচীনতার দিক দিয়েও এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পূর্বে উল্লিখিত এই শ্মশানভূমিটির আনুমানিক প্রতিষ্ঠাকাল বিচার করে বলা যায় এটি স্রোতস্বিনী ভাগিরথীর তীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। ভাগিরথীর প্রাচীনধারা কালিঘাটের উপর দিয়ে বয়ে এসে সূর্যপুরের নিম্নভূমি থেকে দক্ষিণ বারাশত, ময়দা, খনিয়া, শাহাজাদাপুর, বহড়ু, জয়নগর-মজিলপুর প্রভৃতি গ্রমের পাশ দিয়ে দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে এসে বাঁক নিয়ে পূর্ব-দক্ষিণে হেলে নালুয়ার

গাঙে মিশেছিল। দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে এই ভাগিরথীর কয়েকটি ধারা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি পূর্বোল্লিখিত গোকুলনগর এবং পার্শ্ববর্তী মহেশপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়ে বেনাই নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই বেনাই নদীর তীরে প্রাচীন বানচাবড়ার মন্দির এবং হাউড়িহাটের মন্দির। এদিক থেকে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর অনেকগুলি নদীমুখের সঙ্গমস্থল। এই সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশান।

১৬৮৬ সালে রচিত নিমতা নিবাসী কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে বণিক দেবদত্তপুত্র পুষ্প দত্তের আদিগঙ্গা দিয়ে নৌকাযোগে দেশে প্রত্যাগমনের বিবরণে ভাগিরথী তীরের যে গ্রামগুলির নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর অন্যতম।

"অম্বুলিঙ্গ মহাশ্মশান নাহি যার উপমান
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।
বাদ্যবাজে সুমধুর বাহিয়া হাজা বিষ্ণুপুর
জয়নগর করিল পশ্চাৎ।।"

কেবল অনেকগুলি নদীমুখের সঙ্গমস্থল নয়, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর সেই প্রাচীনকালের সুন্দরবন প্রবেশের অন্যতম দ্বার বিশেষ। এই পথ দিয়ে প্রাচীনকালে সুন্দরবনে পণ্য চলাচল ঘটত, বণিকরা সমুদ্রযাত্রায় যেতেন।

দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মহাশ্মশানের চৌহদ্দি মোটামুটি এইরকম—উত্তরে শিবগঙ্গা, দক্ষিণে নালুয়া রোড (বর্তমানে ডায়মণ্ডহারবার-রায়দীঘি বাস রাস্তা), পূর্বে রেললাইন (কাকদ্বীপ-লক্ষ্মীকান্তপুর-শিয়ালদহ রেলপথ), পশ্চিমে কুলপি রোড ও মথুরাপুর-গড়িয়া বাস রাস্তা। প্রাচীনকালে যেমন সুন্দরবনের প্রবেশমুখ এবং বিভিন্ন নদীর মিলন মুখ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বর্তমানে তেমনি বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থল হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর—এবং এই স্থানে অবস্থিত বলে শ্মশানটিও ঐতিহ্যপূর্ণ। নদী-সাগরের সঙ্গমস্থল হিসাবে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে যেমন পৌষ সংক্রান্তিতে বিশাল মেলা বসে, তেমনি প্রাচীন ভাগিরথী ও বিভিন্ন নদীর সঙ্গমস্থল হিসাবে দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে পৌষ সংক্রান্তিতে দুই দিন ব্যাপী বিরাট মেলা বসে। ভক্ত ও পুণ্যার্থীজন শ্মশান সংলগ্ন গঙ্গায় স্নান করে পুণ্য অর্জন করে এবং শ্মশানে পূজা দেয়।

আয়তনের দিক দিয়ে বিচার করলে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশানটি খুব বড় নয়। গঙ্গার তীরে লম্বাধরণের এক ফালি জমির (প্রায় দুই বিঘার মত) উপর মূল শ্মশানভূমিটি। একটি প্রাচীন বট ও একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ একপার্শ্বে ডালপালা ঝুরি বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিষ্ঠাকালের বটগাছ এবং নিমগাছটি কেটে ফেলা হয়েছে। শ্মশান সংলগ্ন হালদার গঙ্গার ঘাটের উপর অবশ্য আরও একটি প্রাচীন বটগাছ আছে। হালদার গঙ্গার ৪ (চার)টি ঘাট। দুটি ঘাট শ্মশানের গায়ে। এখানে শ্মশানযাত্রীরা স্নান দান করে। বাকি দুটি উল্টো দিকে গঙ্গার পাড়ে। এখানেও বহু মানুষ নিত্য স্নান করে। শ্মশানভূমিতে দুটি কালী মন্দির ও অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ। এছাড়া আছে পাঁচটি

চাঁদনী, কাঠে পোড়ানোর জন্য লোহার রড দিয়ে ঘেরা চুল্লী-স্থান এবং একটি বৈদ্যুতিক চুল্লী। প্রাচীনকাল থেকে মৃতদেহ কাঠে পোড়ানা হত এখানে, ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ বৈদ্যুতিক চুল্লীটি তৈরি করে। এসকল ছাড়া আছে চারশ বছরের কয়লার স্তূপ। মৃতদেহ পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছোটখাট পাহাড়ের মত কয়লা জমে গিয়েছিল। কিছুদিন পূর্বে কয়েক লক্ষ টাকার কয়লা বিক্রি করা হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এই শ্মশানের একটি মাহাত্ম্য আছে। এখানে মৃতদেহ পোড়ালে মৃত ব্যক্তির অক্ষয় স্বর্গলাভ ঘটে। সেই পুণ্যের আশায় বহু দুর-দুরান্ত থেকে মানুষজন মৃতদেহ দাহ করার জন্য এখানে নিয়ে আসে। ডায়মণ্ডহারবার থেকে রায়দীঘি—এই বিস্তীর্ণ এলাকার ধারে কাছে বহু শ্মশান থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ এখানে মৃতদেহ দাহ করার জন্য নিয়ে আসে। প্রতিদিন গড়ে ১০/১৫টি মৃতদেহ এখানে দাহ করা হয়। পূর্বে যখন কাঠে মৃতদেহ পোড়ানো হত, তখন একই সঙ্গে ১৫টি চিতা জ্বলতে দেখা গিয়েছে। পূর্বে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে এখানে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশানে কোনদিন প্রাকৃতিক কারণে মৃতদেহ দাহকার্য বন্ধ যাবে না। যেদিন বন্ধ যাবে—সেদিন নানা অমঙ্গল দেখা দেবে। কেবল একবারের জন্য এক সপ্তাহ মৃতদেহ দাহকার্য এই শ্মশানে বন্ধ ছিল। সে একটা মামলা-মোকদ্দমার কাহিনি। পরে সে কাহিনি বলব। তবে সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত (কোন এক সপ্তাহ বাদে) স্বাভাবিক কারণে কিংবা কোন প্রাকৃতিক কারণে এই শ্মশানে মৃতদেহের দাহকার্য বন্ধ থাকেনি। অনেকে গয়ায় বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদানের সঙ্গে এই শ্মশানের দাহকার্যের তুলনা করেন। গয়ায় কোনদিন যেমন পিণ্ডদান বন্ধ থাকে না, এখানেও তেমনি কোনদিন মড়া পোড়ানো বন্ধ হয় না। এছাড়া শ্মশান সংলগ্ন গঙ্গায় স্নান করলেও অশেষ পুণ্য হয়। এজন্য পূর্ণিমা তিথিতে বিভিন্ন যোগে মানুষজন গঙ্গার স্নান করে, শ্মশানে পূজা দেয়। জানা যায় ডায়মন্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মুড়াগাছা পরগনার সরিষা গ্রামের কাছাকাছি পাটদহ গ্রামের জমিদার কেশবচন্দ্র রায়চৌধুরী (যিনি নিজের নামানুসারে রামনাথপুর (বানচাবড়া) গ্রামে কেশবেশ্বর শিব মন্দির নির্মাণ করান ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে) পালকি চেপে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে প্রতিযোগে দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে গঙ্গাস্নানে যেতেন এবং শ্মশান দর্শন করতেন। কেশবেশ্বরের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক স্থানীয় একটি পুস্তিকায় পাওয়া গিয়েছে—

"অশ্বারোহী মহারাজ বিষ্ণুপুরে আসি।
প্রতিযোগে গঙ্গাস্নান প্রতি পৌর্ণমাসী।।"

শোনা যায় মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ এই শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল।

সমস্ত শ্মশান গোরস্থান ঘিরে নানা কাহিনি, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী যেমন প্রচলিত থাকে, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশান ঘিরে তেমনি নানা কাহিনি আছে। আগেকার দিনে এই শ্মশানের পাশ দিয়ে রাত্রে মানুষ চলাফেরা করতে ভয় পেত। এককালে এখানে ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে ইত্যাদির উৎপাত ছিল। শ্মশানযাত্রীরা সংখ্যায় কম হলে তাদের মারধোর করে টাকা পয়সা কেড়ে নিত

ডাকাতরা। পূর্বে বিষ্ণুপুর থেকে ডায়মন্ডহারবার কিংবা কুলপি পর্যন্ত কোনো পাকা রাস্তা ছিল না। কাঁচা রাস্তায় মানুষ হেঁটে চলাফেরা করত। মৃতদেহ আসত হাঁটা পথে, মানুষের কাঁধে চেপে। তখন যাত্রীদের প্রায়ই ডাকাতের হাতে পড়তে হত। তবুও এই শ্মশানে আসা বন্ধ করেনি মানুষ।

এই শ্মশানে কয়েকবার তান্ত্রিক যোগী-সাধুদের আবির্ভাব ঘটেছিল। শ্মশানের উত্তর দিকে বিশাল বেনা ঝোপ এবং নানা গাছগাছালির জঙ্গল ছিল। এখানে বসে কয়েকজন তান্ত্রিক শবসাধনা করতেন। শ্মশানের বটগাছে এবং নিমগাছে কয়েকটি ভূত এবং ব্রহ্মদৈত্যর স্থায়ী আস্তানা ছিল। অনেকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্রে গঙ্গার ঘাটে বসে পৈতা মাজতে দেখেছে ব্রহ্মদৈত্যকে—এইরকম অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তবে প্রেতজনিত কিংবা অলৌকিক কাহিনির প্রচলন তুলনামূলকভাবে অন্যান্য শ্মশান অপেক্ষা কম।

১৯২৮ খ্রি. কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী (বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক গ্রন্থের প্রণেতা ও তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান) নামে এক ব্যক্তি শ্মশান উঠিয়ে দেবার জন্য দলবল জুটিয়ে আন্দোলন করেন এবং মামলা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই শ্মশানে প্রচুর মড়া পোড়ানোর জন্য পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মড়া পোড়ানোর ধোঁয়া গন্ধ সহ্য করতে হয়। তাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। তাঁর মামলার জন্য শ্মশানে মড়া পোড়ানো এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে। একজন দারোগা এবং দুজন কনস্টেবল শ্মশান পাহারা দিতে থাকে। এই সময় গোকুল নগর গ্রামে অক্ষয় হালদার নামে একজন মানুষ মারা যান। তাঁর আট ছেলে খুব বলশালী। সেই ছেলেরা ও গোকুলনগর গ্রামের ধৈর্য হালদার, নগেন মণ্ডল প্রমুখ দাঙ্গাড়েরা শ্মশান দখল করে মৃতদেহ দাহ করে। পুলিশদের মারধোর করে তাড়িয়ে দেয়। তারপর থেকে শ্মশানে মৃতদেহ দাহকার্য আবার চালু হয় এবং আর কোনদিন বন্ধ হয়নি।

দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মহাশ্মশান ঘিরে এইরকম নানা কাহিনির ভিড়। তবে প্রায় চারশো বছর ধরে এই দীর্ঘকাল যে শ্মশানটি জীবন্ত হয়ে আছে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিমণ্ডল বদলের মধ্য দিয়ে যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটেছে—সেই শ্মশানটিই নিজেই একটি কাহিনি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বয়ে চলা ভাগীরথীর প্রাচীন ধারার তীরে জঙ্গলের মধ্যে যার জন্ম হয়েছিল—আজ সে উন্নত গঞ্জের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী হয়ে। শ্মশানের মৃত্যু হয় কিংবা কেমন করে মৃত্যু হয় তা জানা নেই, তবে দীর্ঘকাল ধরে মৃতদেহগুলি আপন বক্ষে ঠাঁই দিয়ে এই মহাশ্মশানটি আজ মৃত্যুঞ্জয়—অমর। কেবল তাই নয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উত্থান পতনের ইতিহাসের এক প্রাচীন সাক্ষী। কত বণিকের বাণিজ্যতরী তার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে কে জানে? কত নদী তার পাশ দিয়ে কত দূরে কোথায় গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে—তাও অনেকে জানে না। আজও এর বুক খুঁড়লে বেরিয়ে আসবে কত প্রাচীন ইতিহাস, সমাজ চিত্র, যত মানুষের সুখদুঃখের কাহিনি। ভাগীরথীর প্রাচীন ধারার ইতিহাস কিংবা সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস জানতে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মহাশ্মশানের প্রকৃত ইতিহাসের উদ্‌ঘাটন তাই আজ জরুরি।

তথ্যসূত্র :

১. বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক : কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

২. দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত : কালিদাস দত্ত।

৩. দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা (১ম খণ্ড) : বিমলেন্দু হালদার।

৪. বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য : দক্ষিণ বিষ্ণুপুর।

৫. অবনী মোহন মণ্ডল : গোকুলনগর।

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, গ্রন্থকার, সম্পাদক—'নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র'

ডায়মণ্ডহারবার সেন্টপিটার ক্যাথলিক চার্চ

নীলরতন মণ্ডল

ডায়মণ্ডহারবার শহরের নুনগোলা পাড়ায় ডায়মণ্ড ক্লাবের অনতিদূরে হুগলি নদী যেখানে ধনুকের মত বাঁক নিয়েছে ঠিক সেই বাঁকের মুখে বা টেলিগ্রাম স্টেশনের অল্প দক্ষিণে ইউরোপীয়দের কবরস্থান। এই সমাধিস্থলটি কতবেশি বছরের পুরানো বা পূর্বে এর কি নাম ছিল সেটা অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে একটি এপিটাফে মৃত্যুর বছর খোদিত ছিল ১৭৯০ সাল। এই কবরটি মিস এগনিরুস উইটলালের কন্যার। বর্তমানে এই এপিটাফটির কোনো হদিশ নেই। অপর একটি এপিটাফ টমাস থমসনের তিনি ৬.১০.১৭৯৫ সালে মারা যান মাত্র ৫৬ বছর বয়সে। বর্তমানে তাঁর সমাধির উপর ফাতিমা মাতার গ্রোটো নির্মিত হয়েছে। মিস এগনিরুসের কন্যা বা টমাস থমসনের এপিটাফ প্রমাণ করে এই সমাধিস্থলের জন্মকথা।

উইলিয়াম হোরাট তিনি ডায়মণ্ডহারবারের পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। তিনি এখানে কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়ায় পর তাঁকে এখানকার সমাধিস্থলে ১৮১৪ সালে ৫ই ডিসেম্বর সমাধি দেওয়া হয়। মিস এলিজা বানস্লের মৃত্যু হয় ৫ আগস্ট ১৮২৫ সালে। ক্যাপ্টেন ইস্ট গেট এবং লিজার শিশু সন্তান ১৮২৬ সালের ২২ মে ৩ মাস ৬দিনে মারা যায়। এই শিশুকেও এখানে কবর দেওয়া হয়। ১৮৩২ সালের একটি এপিটাফ জানাচ্ছে মেদিনীপুরজেলার হিজলির বাসিন্দা দুই বোনের মৃত্যু হয় –'Hidgeli contai of two young Girls Miss Marifer Donnithorne and Fenalo Dommithorme, whose ages wear 26 years and 28 years respectively within two of one another' মেয়ে দুটির মায়ের মৃত্যু ও তার সমাধির কথা জানা যায় ১৯১৪ সনের গেজেটিয়ারের ২৩০ পৃষ্ঠায় লেখা থেকে। জে.এইচ হোলম্যান, কুইনস্ট্রুপের স্টাফ সার্জেন ছিলেন। তিনি ছুটি কাটাতে কলকাতা থেকে ইংলন্ডে যাচ্ছিলেন ১৮৫৯ সালের ৪ঠা মে। তাঁর যাত্রা পথে মৃত্যু হলে, তাঁকে এখানকার সমাধিস্থলে সমাধি দেওয়া হয়। টাগ এন্টারপ্রাইজ ইঞ্জিনে কর্মরত থাকাকালীন ২৬ বছরের রিচাড কার্ড ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ সালে দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যান। তাঁকেও এখানে সমাধি দেওয়া হয়। এছাড়া পি. এন্ড ও কোম্পানির চাকুরে হেনরী পিটার সন ১৮৭৭ সালের ২৫ জুলাই মারা গেলে এখানে আনা হয়। Herold James Huntly, who was drowned on the 14th August 1899 off Diamand Harbour Creek by the sinking of the Port Commissioner's despatch vessal "Resolute" after having been in collision with the B.I.S.N. Co.'s ship 'schindia'. Erescted by the past and present officers of Rivers Servey to the memory of th captain Gorge Dalrymple Haller, River

Surveyor Author James Hudson Chief Engineer Gerold kirby stone and Herold James, asstt. surveyor, alongwith 13 natives all whom perished the same disaster in the execcition of their duty."

আমাদের দেশের বিভিন্ন গোরস্থান বা শ্মশানঘাটগুলি নানারকমের অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। এখানকার কবরস্থানটিও নানা অলৌকিক ঘটনার সম্মুখিন হয়েছে—বর্তমানে কবরস্থানের রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বে থাকা ফ্রান্সিস দিবাকরবাবু এবং তার স্ত্রী জানালেন তাদের বাবা মায়ের অভিজ্ঞতার কথা—আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা গান্ধী নামে এক জেলে রোজ ভোরবেলায় মাছ নিয়ে আড়তে যেত এখানকার কবরস্থানের নিকট দিয়ে যে রাস্তা দক্ষিণ-উত্তর দিকে চলে গেছে। একদিন এই কবরস্থানের কাছ থেকে মাছ নিয়ে যাওয়ার সময় গান্ধী লক্ষ করে এক মহিলা সাদা কাপড় পরে তার বেশ কিছু আগে আগে চলেছেন। গান্ধী ওই মহিলাকে একা যেতে দেখে তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে যায়। গান্ধী তার কাছাকাছি আসার আগে শ্বেতবস্ত্রাবৃত মহিলা কবরের মধ্যে প্রবেশ করেন। গান্ধী দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসেও তাঁকে দেখতে না পেয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে করতে চলে যায় তার গন্তব্যস্থলে। ওইদিন তার বেচাকেনা ভালো হয়। আড়ৎ থেকে ফেরার পথে গান্ধী কবরস্থানে এসে স্থানীয় মানুষদের জানায় তার চোখে দেখা মেয়েটির কথা। স্থানীয় মানুষেরা বলেন ওই মেয়েটি মাতা ফতিমা। গান্ধী তোমার ভাগ্য ভালো তুমি মায়ের দর্শন পেয়েছ তুমি ধন্য, তোমার মতো ভাগ্যবান কজনের হয়। আমরা এখানে বসবাস করছি আমাদের মা দর্শন দেন না। তুমি ধন্য। এই ঘটনার পর বহুবার মায়ের দর্শন পেয়েছিল গান্ধী। তারপর থেকে গান্ধী প্রায় দিনই সন্ধ্যায় ফাতিমার গ্রেটোর সামনে এসে ধূপ আর প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে যেতেন। তার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত তিনি মায়ের কাছে তার ভক্তি নিবেদন করে গেছেন। আজও অনেক মাঝি বা স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা এখানে এসে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে যায়। প্রার্থনা পূরণ হওয়ার পর তারা মায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ধূপ আর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যায়।

একদিন বিকালে দিবাকরবাবুর মা মারিয়া চারুলতা আর বাবা ভূতনাথ দুপুরবেলায় তাদের বিশেষ প্রয়োজনে কবরস্থানের মূল গেটটি বন্ধ করে তারা নিজেদের কাজে চলে যায়। মারিয়া চারুলতা ফিরে এসে কবরস্থানে ঢোকার আগে লক্ষ করেন এক দাড়িওয়ালা ফাদার নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে মালা জপে চলেছেন। তখন চারুলতা তাঁর স্বামীকে খুঁজতে গিয়ে স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে দেখতে পেয়ে বলেন ওদিকে এক দাড়িওয়ালা ফাদার এসেছেন। তুমি তাড়াতাড়ি চল। মারিয়ার কথা মত ভূতনাথ তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখেন তিনি যেমন ভাবে গেট বন্ধ করে গিয়েছিলেন, গেট ঠিক তেমন বন্ধ হয়ে আছে। ভিতরে কোন ফাদার বা অন্য কেউ নেই। তাহা-হলে দাড়িওয়ালা ফাদার কোথায়? অবাক হয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন মারিয়া চারুলতা। এই ঘটনা ঘটেছিল বিকাল চারটের সময়। তিনি আরো জানান তার মা ও বাবা রাত্রে ঘুমের মধ্যে প্রায়ই দিন সাহেবদের ইংরেজিতে কথাবার্তা শুনতে পেতেন। তাঁরা আবার অনেক সময় বাবা

মাকে নানা ধরনের সান্ত্বনাবাণী শুনিয়ে যেতেন। বাবা শুধুমাত্র সাহেবদের কথাবার্তা শুনেছেন। মা চারুলতা নিজের চোখে ফাদার দেখার ভাগ্য হয়েছিল আর তাদের কথাবার্তাও শুনেছিলেন। বাবা শুধু তাদের কথাবার্তা শুনেছেন দেখার ভাগ্য হয়নি।

এই ইউরোপীয়ান কবরস্থান ছাড়া এই শহরে আরো দুটি কবরস্থান ছিল। হুগলি নদীর কিনারে যে স্থানে এখন পি.ডব্লুই.ডি বাংলো সেই স্থানে কিছুকাল আগেও কয়েকটি সমাধি ছিল তবে তার উপর কোন এপিটাফ ছিল না। এখন যে স্থানে সেচ বিভাগের বাংলো তার সামনের লনে দুটি সমাধি ছিল কয়েক বছর আগে এগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এই দুটি সমাধির মধ্যে একটি এপিটাফে লেখা ছিল—'To the memory of John Aitken, Inspector of police, who, with his wife and child was killed in the cyclone of 1864.'

এখানকার কবরস্থানের নাম অজ্ঞাত থাকলেও বর্তমানে হাঙ্গেরির ফাদার স্টিফেন পলগার এবং আরচ বিশপরা স্থানীয় ভুতনাথ হালদারের সহযোগিতায় ১৯৭২ সেন্টপিটার ক্যাথলিক চার্চটি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এ.এল ডায়াস প্রতিষ্ঠা করেন কবরস্থানের মধ্যে।

ঋণ :

- পরায়ত্ত পরাগনা কথা ২য় খণ্ড—মনোরঞ্জন রায়।
- ডায়মণ্ডহারবারের আঞ্চলিক ইতিহাস—নীলরতন মণ্ডল।
- লেখকের ক্ষেত্রানুসন্ধান।

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার।

মগরাহাট থানার গোরস্থান ও শ্মশান

নবকুমার মণ্ডল

"তোমার বুকের থেকে একদিন চলে যাবে তোমার সন্তান
... যে ইঙ্গিতে নক্ষত্রও ঝরে, আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে ডুবে যায়,-কুয়াশায় ঝরে পড়ে দিকে দিকে রূপশালী ধান।
একদিন...আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে ..."

জীব দেহ মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। বিশ্বমানের সমাজে ধর্মের ভিন্নতার কারণে শ্মশানে, গোরস্থানে, কবরস্থানে চলে ক্ষিতি, অপ্ তেজ মরুৎ, ব্যোম-এ মিশে যাবার প্রক্রিয়া। মগরাহাট থনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গোরস্থান ও শ্মশানের ওপর আলোকপাত করা যাক।

গোরস্থান :

ষোড়শ শতকে বাংলায় শাসন ব্যবস্থা যখন শিথিল হয়ে পড়ে। ঠিক এরকম একটা সময়ে দক্ষিণবঙ্গের ভিন্ন অঞ্চলে মগ দস্যুদের অত্যাচার শুরু হয়। এমনই একটি অঞ্চল হল অধুনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার মহকুমার বারিদহাটি পরগনার মগরাহাট থানা। প্রাচীন মগদস্যুরা এখানে এসে আস্তানা গড়ে তোলে। আর তারাই এখানে হাট বসায়। সেই কারণে বাঁকিপুরের একটা অংশের নাম মগেরহাট। এই নাম পুরনো নথিপত্রে পাওয়া যায়। দিন বদলের ফলে সেদিনের মগেরহাট আজ মগরাহাট নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ১৮ শতকের শেষের দিকে ইংরেজরা এখানে অফিস-কাছারি তৈরি করেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত রেলপথ পাতার জন্য এই প্রাচীন জনবসতির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। মগরাহাট থানার আয়তন প্রায় ২৫৫.১ বর্গ কিমি. ২০০০-২০০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুসারে মগরাহাট থানার লোকসংখ্যা ২,৬২,০২২ জন। মগরাহাট অঞ্চলে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান এই তিনটি প্রধান জনজাতির মানুষের বসবাস লক্ষ করা যায়।

মগরাহাট থানার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস থেকে জানা যায় ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৬০টি গোরস্থান আছে। যা সর্বসাধারণ (মুসলিম জনগণ) ব্যবহার করে। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গোরস্থান। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য গোরস্থানগুলির মধ্যে প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—বেড়ামারা গোরস্থান, চক্পরান-কান্টাখালি গোরস্থান, মাধবপুর, রায়পুর-কামদেবপুর গোরস্থান, মাইতির হাট গোরস্থান, রামনগর গোরস্থান, মুগদিয়া গোরস্থান, মির্জাপুর গোরস্থান, বাঁকিপুর গোরস্থান, বিশ্বেশ্বরপুর গোরস্থান, মোল্লারচক্ গোরস্থান ও মামুদপুর গোরস্থান।

হাজি রমজান মিয়ার গোরস্থান : মগরাহাট অঞ্চলে বিদেশি রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামধর্মের

প্রচার যে হয়েছিল তা উপরে উল্লেখিত গোরস্থানের সংখ্যা থেকে বোঝা যায়। মগরাহাটে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছিল মুঘল আমল থেকে। তাই এই অঞ্চলে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন দুই তিনটি মসজিদ-এর অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। আর এই মসজিদগুলির আশেপাশেই রয়েছে ইসলামধর্মীয় মানুষের সমাধিক্ষেত্র। মগরাহাট রেলস্টেশনের পূর্বদিকে বেলাড়িয়া গ্রামের একটি প্রাচীন মসজিদ হল হাজি রমজান মিয়ার মসজিদ। এই মসজিদটি মিয়াদের মসজিদ নামে পরিচিত। এটি ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে জানা যায়, এটি পূর্বে ছিল পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। এটি ছিল গঙ্গার পাড়ে। তবে এখন আর সেইরূপ নেই। পুরনো ও ভগ্নমুখী মসজিদকে স্থানীয় মানুষরা সংস্কারের মাধ্যমে বর্তমানরূপ প্রদান করেন। এই মসজিদের সঙ্গে রয়েছে মাদ্রাসা তবলীগুল উলুম।

মসজিদের অদূরে প্রায় দেড় বিঘা এলাকা জুড়ে রয়েছে মগরাহাটের প্রাচীন গোরস্থান। গোরস্থানটি মহাত্মা হাজি রমজান মিয়ার গোরস্থান নামে পরিচিত। গোরস্থানের চারিদিকে পূর্বে প্রাচীর ছিল। এখন আর সেই প্রাচীর নেই। সমাধিক্ষেত্রটি সরকারিভাবে স্বীকৃত। এখানে সমাধি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো টাকা পয়সা খরচের প্রয়োজন হয় না। মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সময় মজুরদের খরচ দেওয়ার বিষয়টি একান্তভাবে ব্যক্তিগত। তবে গরিব-দুঃখী মানুষদের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষ ও মসজিদ কমিটি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এই গোরস্থানে কোনো পাকা কবর নেই। হাজি রমজান মিয়ার মসজিদের বর্তমান ইমাম মনে করেন এই ধরনের পাকা সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ করা ঠিক নয়। পাকা সমাধি নির্মাণের ফলে গোরস্থানে সমাধি দেবার স্থানাভাব ঘটতে পারে।

মামুদপুরের প্রধান গোরস্থান : মগরাহাট অঞ্চলের আর এক প্রাচীন মুসলিম জনবসতি অঞ্চল হল মামুদপুর। মামুদপুরের গোরস্থানটি প্রায় ২০০ বছরের পুরনো। এই গোরস্থান প্রায় তিনবিধা জমির উপর অবস্থিত। চারিদিকে প্রাচীর দেওয়া। এই জমির দাতা হলেন স্থানীয় নস্কর পরিবারের ব্যক্তিরা। এই গোরস্থানটির মধ্যে বেশ কয়েকটি বড় গাছও রয়েছে।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সমাধিক্ষেত্র সমূহ : মুঘল শাসনের অবসান ভারতবর্ষে যখন আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব ঘটায়, সেই সময় বাংলায় শাসনপটে আসেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। তারপর গঙ্গার স্রোত বয়ে চলেছে ইতিহাসের উত্থান-পতনের পালা বদলে। আমরা হয়েছি পরাধীন। বাংলার এই ইতিহাসের শাসক পট-পরিবর্তনের পালা যখন চলেছে তখনই গঙ্গার বিপরীত স্রোতে এসেছে মগ, পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ। তারা কেউ করেছে বাণিজ্য; কেউ করেছে দস্যুতা, কেউ করেছে অত্যাচার; কেউ করেছে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার। জলা-জঙ্গল অধ্যুষিত গ্রামীণ মগরাহাট থানা অঞ্চলে তার ব্যতিক্রম হয়নি। দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের চিকিৎসার সুযোগ, আর্থিক সহায়তা, গ্রাম্য শিল্পদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি সাথে সাথে ইউরোপীয় যাজকবৃন্দ মগরাহাটের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের কাজ করেন।

ধর্মের কাজের জন্য বারুইপুর ও মগরাহাটে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে একটা নতুন চ্যানেল তৈরি

হয়। তখন মগরাহাট আর বারুইপুর মিলিয়ে ৫৪টি গ্রামের প্রায় ১৪৪৩ জন ব্যক্তি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তারা প্রত্যেকে গ্রামের মানুষের স্থানীয় গির্জা ঘরে যিশুর বাণী পরে শোনাবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মগরাহাট ও বারুইপুরের দুটি প্রধান গির্জা থেকে নিয়ন্ত্রিত হত-লক্ষ্মীকান্তপুর, ধান্যঘাটা, খাঁড়ি, বামনাবাদ, মল্লপুর, সালকিয়া, মাকালতলা, বানমগরা, কালিপুর, আঁধারমানিক, ক্যানিং, বাসন্তী, রামকৃষ্ণপুর, কোলহাজরা, ট্যাংরাখালি, ফুলবাড়ি ও বকুলতলার গির্জা ও গোরস্থানগুলি।

বর্তমানে মগরাহাট থানার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে মানুষের গির্জা ও গোরস্থানগুলি মরাপাই প্যারিস ও কল্যাণপুর প্যারিস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মগরাহাট থানার বেশিরভাগ গোরস্থানসমূহ ১৮ শতকের শেষের দিকে থেকে ১৯ শতকের প্রথম ভাগে গড়ে উঠেছে। বারুইপুর ডায়সিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মগরাহাট থানার ও মরাপাই প্যারিস-এর অন্তর্গত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত গোরস্থানের একটি তালিকা প্রদান করা হল—

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম ও গোরস্থানের নাম	জমির পরিমাণ	স্থাপনের বছর	অন্যান্য তথ্য
১.	মরাপাই	৪১ শতক	১৮৮৫ সাল	এই গোরস্থানটি যিশু হৃদয় চার্চ মরাপাই দ্বারা পরিচালিত।
২.	বাঁশপাল্লা	২০ শতক	১৮৭৬ সাল	মরাপাই গোরস্থান তৈরির পূর্বে যিশু হৃদয় চার্চ সংলগ্ন গ্রামের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মৃতদেহ-গুলি এখানে সমাধিত করা হত।
৩.	ঈশ্বরীপুর এইখানে গির্জা ও গোরস্থানে একই জমিতে	৩৩ শতক	১৯৯৩ সালে	পুরনো কবরস্থানটি ছিল মুকুন্দপুরে। যা ১৮৭৫ সালে স্থাপিত হয়। এইখান ১৯৩৮ সালে পর্যন্ত চালু ছিল।
৪.	মিঠানি	১৪ শতক (প্রায়)	১৮৭৫ সাল	
৫.	রাধানগর গির্জা ও	৪২ শতক (প্রায়)	১৯ শতকের প্রথম দিকে।	এই গোরস্থান ও গির্জার জমি ক্রয়ের রেকর্ড আছে ১৯৪৪ সালে।
৬.	জালাশি	১৩ শতক	১৮৭৮ সালে	মাঠের মাঝে একটি পোঁতার মতো দেখায়।
৭.	ধান্যঘাটা	১৭ শতক	আনুমানিক ১৯ শতকের প্রথম দিকে	
৮.	লক্ষ্মীকান্তপুর	২০ শতক	অনুমানিক ১৯ শতকের প্রথম দিকে	

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রাম ও গোরস্থানের নাম	জমির পরিমাণ	স্থাপনের বছর	অন্যান্য তথ্য
৯.	সদানন্দপুর	১০ শতক	১৯১৭	
১০.	সদাশিবপুর	১৭.৫ শতক		
১১.	মগরাহাট	১৭ শতক	১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।	এই অঞ্চলে ইউরোপীয়দের বসবাস যখন থেকে শুরু হয় তার অল্পদিনের মধ্যে মগরাহাটে গোরস্থান গড়ে ওঠে।
১২.	সালকিয়া	১০ শতক	১৯৪৪ সাল	এই গোরস্থানটি মগরাহাট থানার শ্যামপুর মৌজার অন্তর্ভুক্ত। যদিও কল্যাণপুর প্যারিসের অন্তর্গত।
১৩.	হেটির ও মাকালতলা	১৮ শতক	১৮৯৮	এই গোরস্থান মগরাহাট থানার অন্তর্গত হলেও এটি কল্যাণপুর প্যারিসের অন্তর্ভুক্ত।

হংসগেড়িয়া মহাশ্মশান

ধামুয়া রেলস্টেশন থেকে পূর্বদিকে তিন কিমি. দূরে ক্ষীণ ধারায় বয়ে চলেছে পুণ্যসলিলা আদি গঙ্গা। এই আদি গঙ্গা আজ সংস্কারের অভাবে প্রায় খালে পরিণত। আদি গঙ্গার পূর্ব-পশ্চিম তীরে রয়েছে এলাকার হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের মৃতদেহ সৎকারের বেশ কয়েকটি বিখ্যাত-অখ্যাত ছোট-বড় শ্মশান। এই অঞ্চলের বিখ্যাতও প্রাচীন শ্মশানটি হল হংসগেড়িয়া মহাশ্মশান।

মুল্টি বড় রাস্তা থেকে বাঁদিকে মেঠো রাস্তা দিয়ে কিছুটা যাবার পর একটা 'কেটো পোল' (কাঠের ব্রিজ) দিয়ে আদি গঙ্গা পাড় হলে আগে হাটখোলা, যা ছিল আদিকালে 'নৌ-বন্দর'। হাটখোলায় দেখা হল হংসগেড়িয়া শ্মশান উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক হারানন্দ নস্কর মহাশয়ের সাথে। তাঁর কাছে থেকে পাওয়া গেল এই মহাশ্মশানের নানান তথ্য।

হংসগেড়িয়া মহাশ্মশান স্থানীয় গ্রাম্য মানুষজনের কাছে 'হাঁসগেড়ে' নামে সর্বাধিক পরিচিত। মগরাহাট থানার মুল্টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে হংসগেড়িয়া গ্রামের পশ্চিমদিকে আদি গঙ্গার পূর্বতীর প্রায় সাড়ে তিন বিঘা এলাকা জুড়ে রয়েছে মহাশ্মশানটি। শ্মশানটির পূর্ব ও উত্তরদিকে রয়েছে চাযের জমি। দক্ষিণদিকে রয়েছে জ্ঞানগুরু স্বরূপানন্দ তীর্থ ব্রহ্মচারীর মঠ। বর্তমান শ্মশান উন্নয়ন কমিটির প্রচেষ্টায় শ্মশানের প্রবেশদ্বারটি খুব বৃহৎ ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, আর শ্মশানের মধ্যে বড় ধরনের সংস্কারমূলক কিছু কাজ করা হয়।

বর্তমানে হংসগেড়িয়া মহাশ্মশান ভূমির দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তরদিকের সীমানা পাকা প্রাচীর বেষ্টিত শ্মশানভূমির মাঝে আছে বহু স্মৃতি-বিজড়িত এক বৃহৎ ধ্যান-গম্ভীর বটবৃক্ষ। তার নীচে

রয়েছে চারটি চিতা (দাহ করার বিশেষ মঞ্চ)। তার পাশে রয়েছে বর্ষার দিন দাহ করার জন্য টিনের শেড দেওয়া চিতা। চিতাগুলির উত্তর ও পূর্বদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক চালা/দোচালা দালানে শ্মশানযাত্রীদের বসার বিশেষ ব্যবস্থা করা আছে। যাত্রীদের বসার দালানে উত্তরদিকে রয়েছে পুকুর, সানবাঁধানো ঘাট, যা 'সূর্যঘাট' নামে পরিচিত। সূর্যঘাটের পাশে রয়েছে দোতালা দু-কামরার গৃহ। এই বাসগৃহের নীচের তলে শ্মশান-এর অফিস। আরও দোতলায় শ্মশানের কর্মীদের থাকার ঘর। এই বাসগৃহ নির্মাণ সূর্যমণ্ডল নামে স্থানীয় ব্যক্তি। সূর্যবাবু যখন জীবিত ছিলেন তখন মাঝে মধ্যে বাসগৃহের দোতলায় থাকতেন। তিনি প্রথমে স্থানীয় মানুষের সাহায্য নিয়ে ১৩৬৬ সাল নাগাদ শ্মশানভূমি কিছুটা সংস্কার করেছিলেন।

'সূর্যঘাট'-এর পূর্বদিকে রয়েছে কালিমন্দির, বর্তমান শ্মশান উন্নয়ন সমিতির প্রচেষ্টায় কালিমন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। কালিমন্দিরের সামনে রয়েছে 'পঞ্চমুণ্ডির' আসন। এই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসতেন কৈলাস পণ্ডিত। আজ আর এই শাক্ত সাধক নেই, তবে রয়েছে পঞ্চমুণ্ডির আসন ও তার চার পাশে পঞ্চবৃক্ষ। স্থানীয় মানুষদের কারও মতে এই পঞ্চমুন্ডির আসন পাঁচটি মানুষের মাথা দিয়ে তৈরি আবার কারও মতে, এই আসনটি মানুষ, সাপ, বানর, বিড়াল ও কুকুরের মাথা দিয়ে তৈরি হয়েছে। যদিও এর কোনো সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। পঞ্চমুণ্ডির আসনের চারপাশে বেল, আম, অশ্বথ, যজ্ঞিডুমুর ও বটবৃক্ষ। লোকমুখে শোনা যায়, সূর্যমণ্ডল যখন শ্মশানের 'পঞ্চমুণ্ডির' আসন কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দেয়, সেই রাতে সূর্যবাবুর স্বপ্নাদেশ হয়, বেটা তুই আমার আসনে হাত দিবি না, দিলে তোর অনিষ্ট হবে। এমনকী সেই মজুরের ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পর দিন সূর্যবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পঞ্চমুণ্ডির আসন ঠিক করে দিয়ে অন্য কাজ শুরু করেন। তবে এই ঘটনার বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা খোঁজা অসম্ভব।

শ্মশানভূমির দক্ষিণ অংশে প্রায় একবিঘা অংশ জুড়ে রয়েছে সমাধিক্ষেত্র। এই সমাধিক্ষেত্রে বহু প্রাচীনকাল থেকে শিশু মৃতদেহ ও গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ মৃতদেহ পুঁতে দিত। পুঁতে দেওয়া কথার একটি গ্রামীণ প্রতিশব্দ হল গেড়ে দেওয়া। এই 'গেড়ে দেওয়া' থেকে হয়তো এই গ্রামের নাম 'হংসগেড়িয়া' এসেছে। যাই হোক, বর্তমান শ্মশান উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মহাশয় শোনালেন, পূর্বে পুঁতে দেওয়া মৃতদেহগুলি অনেক সময় শেয়াল বা কুকুর সমাধি থেকে তুলে গ্রামের চলার রাস্তায় নিয়ে যেত। তাই সমাধিক্ষেত্রটিকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। আর এখনও যে সকল গরিব মানুষ মৃতদেহ সৎকারের খরচ বহন করতে পারেন না তাঁদের মৃতদেহ সমাধি দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আবার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কোনো কোনো আর্থিক সম্পন্ন ব্যক্তি মৃতদেহ সমাধি দিয়ে, সমাধির স্থানটি স্থানটি পাকা করে গেঁথে দিতে চান। তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে তারা শ্মশানের উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য করে থাকেন।

হংসগেড়িয়া মহাশ্মশানে একটা বিশেষ বিষয় নজর কারে। শ্মশানের দাহক্ষেত্রের কাছে একটি ফলকে দাহ করার পদ্ধতি বা কৌশল লেখা রয়েছে। আসলে পুরোহিত বা নাপিত না

থাকার ফলে এই বিশেষ ব্যবস্থা। এখানে স্থায়ী কোনো ডোম নেই। তবে শ্মশান কমিটির অফিসে থেকে কাঠ পাওয়া যায়। লম্বা চিতার জন্য ৪৫০ টাকা এবং সাধারণ চিতার জন্য ২২৫ টাকা। আর মশদান, পূজার দান বাবদ ৩০ টাকা, ও শ্মশান উন্নয়ন-এর জন্য ২৫ টাকা। অর্থাৎ কাঠের দাম ছাড়া ৫৫ টাকা মৃতদেহ দাহ করার জন্য দিতে হয়। আরও উল্লেখ্য যে এখানে কোনো প্রকার উপকরণ (আতপচাল, কলা, তিল ইত্যাদি) পাওয়া যায় না। এখানে দাহ করার ক্ষেত্রে 'ডেথ সার্টিফিকেটটির' কড়াকড়ি আছে তবে স্বাভাবিক মৃত্যুর মৃতদেহগুলির ক্ষেত্রে 'ছাড়' আছে। এই মহাশ্মশানের পুরনো খাতার হিসাবে এখানে পূর্বে বহু মৃতদেহ আসত তবে বর্তমানে মৃতদেহ দাহের হার কমে গিয়েছে। বর্তমানে বছরে প্রায় ৪০০টি শবদাহ হয়। অর্থাৎ দিনে প্রায় একটি করে শবদাহ হয়ে থাকে। পূর্বে বারাসাতও কেওড়াতলা শ্মশানের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ না থাকায় মগরাহাটে থানার প্রায় প্রতি গ্রাম থেকে মৃতদেহ দাহ করতে এখানে আসত। যা বর্তমানে দেখা যায় না।

হংসগেড়িয়া মহাশ্মশানের দক্ষিণদিকে হাটখোলার গায়ে রয়েছে জ্ঞানগুরু স্বরূপানন্দ তীর্থ ব্রহ্মচারীর মঠ। স্থানীয় মানুষের কাছে ৩টি 'ক্ষ্যাপাবাবার মঠ'। স্বরূপানন্দ তীর্থ ব্রহ্মচারী ছিলেন সাধক মানুষ। তিনি ছিলেন কালিসাধক। গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার খুব মেলামেশা ছিল। তিনি গ্রামের ছেলেদের যোগব্যায়াম ও লাঠিখেলা শেখাতেন। তিনি সাধনা-পূজা নিয়েই থাকতেন। ক্ষ্যাপাবাবার প্রধান শিষ্য ছিলেন ওপার বাংলা থেকে আসা নগেন চক্রবর্তী। কালিপূজার দিন এখানে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। আর প্রতি বছর ১ এপ্রিল ক্ষ্যাপাবাবার জন্মদিনে ও প্রধানশিষ্য নগেন চক্রবর্তীর জন্মদিন ফাল্গুন মাসে বাৎসরিক উৎসব হয়ে থাকে।

ক্ষ্যাপাবাবাকে নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নানা রহস্যমূলক কিংবদন্তী রয়েছে। শোনা যায় ক্ষ্যাপাবাবার মধ্যে বাল্যকাল থেকে একটা সাধক রূপ প্রকাশ পেত। গ্রামের ছেলেদের সাথে ক্ষ্যাপাবাবা ঠাকুর-ঠাকুর খেলা করছেন। শিব, কালি, শেয়ালঘাতক, পাঁঠা ও ব্রাহ্মণের আলাদা-আলাদা ভূমিকায় অভিনয় করছেন। এই খেলার সময় শিশুদের মধ্যে যে ঘাতক সেজে ছিল সে 'তাল করাত' দিয়ে পাঁঠা সাজা শিশুটির ঘাড়ে আঘাত করে, তখনই ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে যায়। তারপর ক্ষ্যাপাবাবার চেষ্টায় সেই ধড় ছিন্ন মুণ্ডু আবার এক হয়ে যায়।

মগরাহাট থানার হিন্দুজন গোষ্ঠীর শবদাহ করার পবিত্র ক্ষেত্ররূপে শত শত বছরের প্রাচীন হংসগেড়িয়া মহাশ্মশান আজ এক নতুন রূপ গ্রহণ করলেও ১৫-২০ বছর পূর্বে এক ভিন্ন রহস্যময় ভয়মিশ্রিত রূপ প্রকাশ করত। আজও শ্মশানভূমিতে ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা নেই ফলে সন্ধের পরে ঘন অন্ধকার নেমে আসে। আর তখন ঘন অন্ধকারে রহস্যময় ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে চিতা ও সমাধির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের শোক ও দুঃখের স্মৃতির সাক্ষী হয়ে শতাব্দী প্রাচীন ধ্যানগম্ভীর শান্ত সমাহিত মহা বটবৃক্ষটি।

তথ্যসূত্র :

'রূপসী বাংলা'—(কবিতা) জীবনানন্দ দাস।

ডায়মন্ডহারবারের আঞ্চলিক ইতিহাস।
সাক্ষাৎকার —হাজি রমজান মিয়া মসজিদের প্রধান ইমাম।
„ —মৌলান গোলাম বারি ঢালী, মোল্লার চক।
„ —তরনি সেন মণ্ডল, মগরাহাট ব্লক-২।
„ —হারানন্দ নস্কর, সম্পাদক 'হংসগেড়িয়া মহাশ্মশান উন্নয়ন সমিতি'।
„ —নারায়ণ মণ্ডল, ধামুয়া।
„ —মানিক সরকার, বারুইপুর।
„ —ড. কালিচরণ কর্মকার, বারুইপুর।
„ —বিশপ হাউস, সোনারপুর।

❑ লেখক পরিচিতি : গল্পকার, প্রাবন্ধিক।

দার্জিলিং জেলার পাহাড় ও পাহাড়তলির শ্মশান

হরেন ঘোষ

শ্মশান অতি পবিত্র স্থান। শ্মশানে গেলে মানুষের মনে সাময়িক বৈরাগ্য জন্মায়। শ্মশান সম্পর্কে কত না মতামত জানিয়েছেন বিদগ্ধ মনীষীরা।

কিন্তু একটি কথা স্বীকার করতেই হবে, শ্মশান অতি কঠিন বাস্তব সত্য, জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যু, জীবনের এই তিন সত্য অস্বীকার করা যায় কী?

এমন অনেক শ্মশানের কথা আমরা জানি, যা কিংবদন্তী হয়ে আছে। যেমন উদ্ধারণপুরের ঘাট, তারাপীঠ মহাশ্মশান। অন্যদিকে বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাট।

শ্মশানের রকমফের আছে। মৃত্যুর পর শব সৎকারের জন্যে প্রয়োজন শ্মশানের। হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেমন শবদাহ, তেমনি বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে সমাধি। সমাধির সাধারণ নাম কবর বা গোর দেওয়া। তাই এই শ্মশান কবরস্থান বা গোরস্থান নামেই পরিচিত।

বাংলার ছোটবড় প্রায় সব গ্রাম বা শহরেই শ্মশান রয়েছে। শ্মশানের সঙ্গে সবসময় যুক্ত থাকে ঘাট শব্দটি। বলা হয় শ্মশানঘাট। ছোট বড় নদী-তীরেই শ্মশান হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে দার্জিলিং জেলার তিনটি মহকুমাই পার্বত্য অঞ্চলে। দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিমপঙ। শিলিগুড়ি সমতল অঞ্চলে।

প্রথমেই ধরা যাক কার্শিয়াঙ-এর অধীনে তিনধারিয়ার কথা। এটি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের অর্থাৎ টয়ট্রেনের প্রাণকেন্দ্র। বিখ্যাত রেলকলোনি। রেল থেকেই তৈরি করে দেওয়া হয়, হিলকার্ট রোডের পাশেই টিনের ছাউনি দেওয়া শ্মশানঘর। শবযাত্রীদের বিশ্রামের জন্যে। পাশেই শবদাহের ব্যবস্থা। জলের ব্যবস্থা একটু দূরে। তিরতির করে বয়ে চলেছে পাহাড়ি ঝরনা তিরানব্বই খোলা।

স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই লেপচা-নেপালি-তিব্বতি-ভুটিয়া। নেপালি সমাজের উচ্চবর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছেত্রিদের শবদাহ করা হয়, অন্যদের সমাধিস্থ করা হয়।

সতেরো মাইলের শ্মশান ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে চুনাভাটির কাছে লালমাটিতে রয়েছে গোরস্থান। অন্য ধর্মাবলম্বীদের শব এখানে সমাধিস্থ করা হয়।

তিনধারিয়া নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এখানকার রেল কারখানাকেই সাগিনা মাহাতো শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। সেই কাহিনি লিখেছেন গৌরকিশোর ঘোষ। চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন তপন সিনহা। এই তিনধারিয়াতেই আশুতোষ চৌধুরীর বাসভবনে বসে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির একাধিক কবিতা লিখেছেন। একসময় তিনধারিয়ার রেলের ফুটবল টিম সমগ্র অখণ্ড বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। উয়ারি, রমনাকে বিধ্বস্ত করে শীল্ড এনেছিল। ব্যাচা সরকার, নিখিল মিত্র, জগদীশ সিনহা, সদু গাঙ্গুলী তখন বিখ্যাত নাম। এদের অনেকের দেহই

তিনধারিয়া শ্মশানে ভস্মীভূত হয়েছে।

এবার কার্শিয়াঙ। এখানেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করেন। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা যথেষ্ট। কাছাকাছি চা বাগানেও প্রচুর এ্যাংলো ইন্ডিয়ান কর্মী বসবাস করেন। পানখাবাড়ি রোডের পাশে শান্ত সমাহিত চার্চের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে রয়েছে প্রাচীনতম গ্রেভ ইয়ার্ড বা গোরস্থান। চারিদিকে ফুলের বাগান। বহু প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রের পাশে নতুন সমাধিতে এখনও পুষ্পস্তবক মোমের আলো, ধূপের সৌরভ ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

হিন্দুদের শ্মশানক্ষেত্র শহর থেকে অনেক দূরে পাহাড়চূড়ায়। সেই ডাওহিল পাহাড়ে এস.বি.দে টি. বি স্যানাটোরিয়ামের পাশ দিয়ে ঘন অরণ্যে ধোবিঝোরা ঝর্ণার ধারে।

এত উঁচু পাহাড়ি পথে হেঁটে যাওয়াই কষ্টসাধ্য। শববাহকদের প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। মাঝে মাঝেই বিশ্রাম নিতে হয়। শববাহী শকটের কোনো ব্যবস্থা নেই। মানুষ নিরুপায়। বাধ্য হয়ে পর্বতারোহণ করতে হয়।

এই শ্মশানের পাশেই সমাধিক্ষেত্র। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরা প্রত্যেক সমাধির ওপর স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে এবং মন্ত্রলেখা পতাকা বাঁশের খুটিতে লাগিয়ে পুঁতে রাখে।

দার্জিলিঙের শ্মশানও পর্বতশীর্ষে। কাকঝোরা ঝরনার ধারে। শহরের অন্যান্য প্রান্তে একাধিক সমাধিক্ষেত্র আছে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে।

দার্জিলিঙের শ্মশান বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। এই শ্মশানেই ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার উৎপত্তি। এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় ভাওয়ালের রাজকুমারকে এখানে দাহ করতে নিয়ে আসা হয়। বৃষ্টির জন্যে শবদেহ ফেলে রেখেই দাহ না করে ফিরে যান শবযাত্রীরা।

এই সময়ে এক সন্ন্যাসী এসে দেখেন যাকে দাহ করতে আনা হয়েছে তার দেহে প্রাণ আছে। তিনি সকলের অগোচরে তাকে নিয়ে যান।

ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন আমারই এক আত্মীয় কিরণচন্দ্র দত্ত মুস্তাফী—যিনি জরবঙ-ব্লুমফিলড্ চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে দার্জিলিঙে হিন্দু বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিও ছিলেন শবযাত্রীদের দলে। তিনি জানিয়েছিলেন শবদাহ করা হয়নি।

পাহাড় থেকে এবার পাহাড়তলি। শিলিগুড়িকে বলা হয় উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী। ক্রমশ এই শহর মহানগরের রূপ লাভ করেছে। এই শহরের প্রধান শ্মশানঘাট মহানন্দা নদীর পাড়ে। একসময় এই অঞ্চলে জবর দখলকারীরা প্রচুর ঘরবাড়ি বানায়। শ্মশানের স্থান সংকুচিত হয়ে পড়ে। তৈরি হল বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান শ্মশান সংরক্ষণ কমিটি। অনেক চেষ্টার পর প্রায় তিরিশটি বাড়ি ভাঙা হয় এবং প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়। সংলগ্ন অঞ্চলের স্থানীয় নাম কুলিবস্তি।

শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও চা-কর প্রয়াত কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামানুসারে এই শ্মশানের নামকরণ হয় কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাট। একটি ছোট কালীমন্দিরও রয়েছে এখানে।

শিলিগুড়ি পুরসভা, পরবর্তীকালে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে শ্মশানক্ষেত্র। বর্তমানে বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা হয়েছে।

যারা প্রাচীন প্রথায় বিশ্বাসী তারা মহানন্দার তীরে দাহ করেন। এই শহরে রেড ক্রশ, করপোরেশন, সেন্ট জনস্ এ্যামবুলেন্স, মাড়োয়ারি যুবা মঞ্চ ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের শববাহী শকট আছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহরের অন্যপ্রান্তে মহানন্দা-তীরে গঙ্গানগরে গড়ে উঠেছে আর এক শ্মশান।

পুর-করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে বর্ধমান রোডের ধারে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সমাধিক্ষেত্র সংস্কার করে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ির বিভিন্ন থানা ও জনবসতিতে মানুষের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট শ্মশানক্ষেত্র। যেমন ফাঁসিদেওয়ায় রয়েছে মহানন্দার পাড়, তেমনি মাটিগড়া শিবমন্দির, আঠারোখাইয়ের রয়েছে বালাসন নদীর তীর, বাগাতাগরায় বুড়ি বালাসন, আর নকশালবাড়ির কাছে মেকি নদীর পাড়।



❑ লেখক পরিচিতি : প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, গবেষক।

দিনাজপুরের শ্মশান ও গোরস্থান

ধনঞ্জয় রায়

চিরন্ত্ন স্মৃতি ঘেরা দিনাজপুর ইতিহাসের আলোকজ্জ্বল কীর্তিবহুল জেলা। মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, পাল, সেন যুগ থেকে শুরু করে মুসলিম যুগের আধিপত্য এ জেলা থেকেই সূচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সুলতানি আমল, মোঘল ও নবাবি আমলের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রস্থল রূপে এ জেলা বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় শীর্ষস্থান রূপে পরিগণিত হয়েছিল। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, চন্দননগর, কলকাতা বিভিন্ন সেরা অঞ্চলগুলি ছেড়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা দিনাজপুরকেই সুজলা-সুফলা ভূমিরূপে বেছে নিয়েছিল। এই সূত্রে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জাতি-উপজাতির এখানে অভিবাসন ঘটেছিল। করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, নাগর, কুলকী, যমুনা বিভিন্ন নদী লালিত ধারায় এখানকার রসসিক্ত মাটিতে বিভিন্নধর্ম-অবলম্বী মানুষের জীবনাবসান হয়েছে আর তার জন্য কত যে শ্মশানভূমি, সমাধিস্থল জেলার যত্রতত্র রয়ে গেছে তার সীমা সংখ্যা বলে বোঝানোর নয়। মহাবীরের শিষ্য জম্বুস্বামী ৪৪৩ খ্রিস্টাব্দে কোটিকপুরেই (কোটিকপুর : বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অধীনে বানগড়) দেহ রেখেছিলেন। পাল ও কম্বোজ বংশীয় অনেক রাজারই শ্মশানকৃত্য হয়েছে এখানে। অনেক লেখক, কবি, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক এই রসসিক্ত মাটির শান্ত মনোরম শ্মশানভূমিতে—সমাধিভূমিতে দেহ রেখেছেন। এককালের শক্তিমান তুর্কি সেনানায়ক ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজি (দেবকোট : বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ধলদিঘির পূর্বপাড়ে) মাটিতেই সমাধিস্থ হয়ে আছেন। অসংখ্য পির-গাজি-দরবেশের সমাধিভূমি এ জেলার মাটিকে তীর্থপীঠে পারিণত করেছে। খ্রিস্টান গোরস্থানগুলিও এ জেলার স্মৃতির কুসুম। মিশনারী জন টমাস (১৭৯৬ খ্রি.), ফ্রান্সিস ফার্নান্ডেজ (১৭৯২ খ্রিঃ); জন ফাউনটেন (১৭৯৬ খ্রি.) এঁরাও এ মাটির গ্রেভইয়ার্ডে শায়িত আছেন।

বহু বিশ্রুত তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বামাক্ষেপা ছিলেন উনিশ শতকে বাংলায় শক্তি-সাধনার এক অগ্নিশিখা। তারাপীঠের মহাশ্মশানে খরস্রোতা দ্বারকা নদীতীরে ছিল এই মহাসাধকের বিচরণ ও তপোক্ষেত্র। তেমনি দিনাজপুরের করতোয়া, আত্রাই, কুলীক এসব নদীর জল-মাটিতেও ছিল বহু সর্বত্যাগী যোগীর সাধনপীঠ। পঞ্চদশ শতকে দিনাজপুরের শ্মশানভূমিগুলিকে কেন্দ্র করে তন্ত্রসাধনার প্রবল বেগে বয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ তপস্যার মধ্য দিয়ে শ্মশানভূমি থেকেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছিল জীবন সাধনার রহস্য। বছর ত্রিশেক আগে বালুরঘাটের ডাকরাচণ্ডীর পুজো উৎসবের খোঁজ-খবর নিতে জেনেছিলাম সিপাই বিদ্রোহের আগে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডি আসনের কথা। আত্রাই নদীর তীরে মনোরম বনানীতে সে পঞ্চমুণ্ডি আসনের টানে বহু তন্ত্রসাধক, সাধু-সন্ত-

সুফি-দরবেশ ও পরিব্রাজক এই ভূমিকে পবিত্র করে গেছেন। প্রাচীনদের মুখে শুনেছি এ শ্মশানে মৃতের দেহাস্থি রাখলে মুক্তি অবধারিত, চিতাগ্নি এখানে কখনও নেভার অবসর পায়নি। সে শ্মশান আজ কংক্রিটের আবাসভূমিতে পরিণত হলেও বহু সাধক তপস্যাধৃত জীবনে এখানেই খুঁজে পেয়েছিলেন শক্তি সাধনার আলোকিত জ্যোতি। দিনাজপুর জেলার এরকম আরও একটি প্রাচীন তন্ত্রপীঠ দিনাজপুর জেলার এরকম আরও একটি প্রাচীন তন্ত্রপীঠ ১৭৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে কুলীক নদীর তীরে তন্ত্রসিদ্ধ রঘুনাথ গিরি গোঁসাই প্রতিষ্ঠিত রাইগঞ্জ বন্দর শ্মশানের পঞ্চমুণ্ডির আসন। এই তন্ত্রসিদ্ধ শ্মশানভূমিগুলি যে যুগে যুগে সর্বত্যাগী যোগী মহাপুরুষদের শক্তি যুগিয়ে আসছে আর এ শক্তির জোরে কেউ হন বৈষ্ণব, কেউ তান্ত্রিক, কেউ বৈদান্তিক, কেউ বাউল, কেউ সর্বত্যাগী যোগী, জীবনসাধনার এ রহস্য অন্বেষণ চলছেই। দিনাজপুরে ভেজা মাটির জীবনরসে সুফি-দরবেশ-পির-ফকিরদের মাজার ও দরগাগুলি আজও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলনতীর্থ। সুফি-সাধক আতাশাহ, মখদুমী গয়াদুল হোসেন, ধোকরপোষ, বাজেরুদ্দিন, করম আলি টাটশাহী এ মাটিতেই সমাধিস্থ হয়ে আছেন।

শবদাহ ও শব গোর-সমাধি নিয়ে শ্মশানভূমি ও গোরস্থানে লোকাচার ও লোক সংস্কারের শেষ নেই। এ জেলায় নানা জাতি-উপজাতি জনগোষ্ঠী মৃতদেহ অগ্নিকার্য অথবা দফন করার পূর্বে শ্মশানভূমি অথবা সমাধিক্ষেত্রে এক অদ্ভুত প্রাণধর্মী উন্মুক্ত লৌকিক মাত্রা যোগ করে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা মৃতদেহ দাহ করে। শ্মশানে শবদেহের হাত-পা-মুখ ধোয়ায়, তেল হলুদ মাখায়। সধবার ক্ষেত্রে সিঁদুর দেবার ব্যবস্থা আছে। এরপর নতুন কাপড় দিয়ে মৃতদেহ ঢেকে দেয়। চুল্লিতে মৃতদেহ দক্ষিণদিকে মাথা রেখে শোয়ায়। মুখে আগুন দেওয়ার আগে একটি মুরগির বাচ্চা বলি দেওয়া হয়। বিশ্বাস যে, ওই মুরগির বাচ্চাই শবদেহকে স্বর্গে নিয়ে যায়। অগ্নিক্রিয়া শেষ হলে একটি মাটির ভাঁড়ে দগ্ধাস্থি সযত্নে সংগ্রহ করে জলাশয়ে স্নান সেরে বাড়ি ফেরার আগে ওই দগ্ধাস্থি ভাঁড় কোনো গাছের নিচে পুঁতে দেয়। কোচ-রাভারা সংগীত-নৃত্যের মাধ্যমে শবদেহকে চিতায় তুলে দেয়। মৃতের সঙ্গীরূপে চিতার উপর মুরগির একটি ছোট 'ছা' ঝুলিয়ে দেয়। মুণ্ডারা শবদেহ দাহ করে। ওই চিতাভস্ম অস্থি সংগ্রহ করে শ্মশানে তা গোর দেয়; সেই গোরে একটি জড়পাথর স্মৃতিস্বরূপ পুঁতে দেয়। ওঁরাওরা মৃতদেহ কবর দেয়, কবরে দেওয়া হয় মৃতের ব্যবহৃত প্রিয় সামগ্রী। কবরের উপরে ছাতা-কুলো দেওয়া হয় তার উপর একটি জলভরা কলস ভেঙ্গে দেয়। চিরবাহকরা আবার শবদেহ শ্মশানে যাবার আগেই পথে জল, ধান, কলাই ছিটিয়ে শ্মশানমুখী হয়। শ্মশানে ডোমদের কাজই হল মৃতদেহ সৎকার করা। বাংলার এই শ্মশান ডোমেরা বহুকাল আগেই উধাও হয়ে গেছে। অথচ এককালে এই ডোমেরাই ছিল শবদেহ কবর অথবা দাহ করার অধিকারী। বল্লালী যুগে এরা সবচেয়ে নিচু শ্রেণিভুক্ত হলেও আজ আর অস্পৃশ্য নয়। এ ব্রাত্য ডোমেরা আর্থ-সামাজিক কীর্তনে আজ ক্লান্তিহীন পথিক। শহর-বন্দরের শ্মশানভূমিতে এদের দেখা হয়ত পাওয়া যায়, গ্রামগঞ্জে দেখা পাওয়া ভার। দিনাজপুরের বিভিন্ন ব্লকে অজস্র শ্মশান অজস্র কবরস্থান। সরকারি হিসেবে

তাদের দেখা পাওয়া যায় না, আবার সরকারি রেকর্ডভুক্ত শ্মশান ও গোরস্থানের তালিকাও কম নয়। ১৯৯১ সালের সেন্সাসে কেবলমাত্র অখণ্ড পশ্চিমদিনাজপুর জেলাতেই সে সংখ্যা ছিল এক হাজার নয়শোটি। এখানকার পল্লি অঞ্চল ঘুরে বেড়ালে দেখা যায় কোথাও মন্দির, আর সে মন্দিরে অনন্ত শয়নে আছেন বাড়ির কর্তা অথবা দীক্ষামন্ত্রের গুরুমশায়। দিনাজপুরের বৈষ্ণব ভাবাপন্ন দেশি-পলি সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজে এ চিত্র চোখে পড়ে। অর্থাৎ বাড়িতেই শ্মশানভূমি বাড়িতেই সমাধিভূমি, যাকে বলে টাওয়ার অব সাইলেন্স। গ্রামগঞ্জের সর্বত্রই মুসলিম কবরস্থানের অধিকাংশই গড়ে উঠেছে মুসলমান জমিদার ও জোতদারদের ভূমিদানে। কোথাও কোথাও সরকারি খাসজমি অথবা শ্মশানভূমির পাশেও গোরস্থান ও সমাধিভূমি দেখা যায়। দিনাজপুরের শ্মশানভূমিগুলিতে চড়ক ও শিবপুজোর উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। কবরস্থানগুলিতে মহরম উপলক্ষে মাসিয়া ও জংগান অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ইদ্-উল-ফিতের, বকর ঈদ, সবেবরাতের দিনগুলিতে মেলা বসে এবং সে মেলায় বহু ভক্তের সমাগম হয়।

সাবেক দিনাজপুরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মহাশ্মশান ছিল কাঞ্চননদীর তীরে। একটি রাজাপোড়া শ্মশানঘাট অপরটি ফুলতলী-মহাশ্মশান। চল্লিশের দশকেও গা ছমছম করা শ্মশানঘাট দুটি ছিল অনেকেরই শৈশব ভয়। পুনর্ভবা নদীর ধারা কাঞ্চন তীরে গোবরাপাড়ার পশ্চিম ধারে অবস্থিত শ্মশানঘাটের নাম রাজাপোড়া শ্মশানঘাট। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা রাধানাথকে এই ঘাটে দাহ করা হয়েছিল। এ কারণেই ঘাটটির নাম হয় রাজাপোড়া। দিনাজপুর সদরের কুঠিবাড়ির পশ্চিমে কাঞ্চন অপগার তীরে ছিল ফুলতলি মহাশ্মশান। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে গরুর গাড়িতে তুলে এনে বহু বুভুক্ষু শবদেহ এখানে দাহ করা হয়েছিল। শ্মশান দুটি এখনও আছে, মানববসতি ভবে যাওয়ায় দাহস্থানের পরিধি অনেকটা কমে গেছে। দিনাজপুর সদরে পুরনো তিনটি গোরস্থান রয়েছে এবং পৌরসভার অনুমোদনই সেগুলি আজও সচল রয়েছে। এগুলি সোনাপির গোরস্থান, শেখ ফরিদ গোরস্থান ও শেখ জাহাঙ্গীর গোরস্থান। দিনাজপুরে আদি খ্রিস্টান গ্রেভ ইয়ার্ডটি রয়েছে ঘাসিপাড়ায়। এখানেই মিশনারি জন রিটমাস, ফ্রান্সিস ফার্নাণ্ডেজ ও জন ফাউনটেন সমাধিস্থ হয়ে আছেন। তাঁদের সমাধিভবনগুলি এখনও আছে।

বালুরঘাটের খিদিরপুর ও চকভবানী শ্মশানঘাট :

বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনে বালুরঘাট সদরে দুটি প্রাচীন শ্মশানের একটি হল খিদিরপুর। অপরটি চকভবানী মহাশ্মশান। দুটি শ্মশানই আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত। নদী গর্ভোত্থিত চরের ওপরকার শূন্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত চকভবানী শ্মশানভূমি। বালুরঘাট শহরের প্রধান মৌজায় স্থাপিত মহাশ্মশানের কাছেই রয়েছে বুড়ামা কালীমন্দির। দাহস্থান দুটিতে বিদ্যুতের আলো, পাকা চুল্লি, শবানুগমনকারীদের জন্য বিশ্রামাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা সবই রয়েছে। প্রাচীনদের মুখে শুনেছি, বেলতলা পার্কের খাড়ির পাশে বিস্তীর্ণ এলাকায় বৈষ্ণব ধর্মালম্বীরা শবদেহ সমাধিস্থ করত কিছুকাল আগেও। মানুষের বসবাস বেড়ে যাওয়ায় তা বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে। বালুরঘাট শহরের কুন্ডু কলোনীতে একদা পাকা দেওয়াল ঘেরা যে গোরস্থান চালু ছিল

কালের স্থূল হস্তাবলেপে তা গ্রাম হয়ে গেছে। বর্তমান বালুরঘাট শহরে বসবাসকারী অল্প কয়েক ঘর মুসলমান সম্প্রদায়ের গোরস্থান ভূষিলায় অবস্থিত। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিষ্ঠিত ভূষিলার প্রাচীন কবরখানাই শহরে বসবাসকারী মুসলমানদের এখন একমাত্র সমাধিস্থল। বালুরঘাট শহরে ফেন্ডস ইউনিয়ন ময়দানের উত্তর-পশ্চিম কোনে একসময় খ্রিস্টানদের সমাধিভূমি ছিল। কিছুকাল আগেও সেখানে খ্রিস্টানের সমাধিস্থ শবদেহের ওপর বাঁধানো স্মৃতিফলক অনেকেই দেখেছেন। কালের ছোঁয়ায় তাও আজ লুপ্ত প্রায়। এককালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য পদ্মপুকুর ও বাদবঙ্গীতে পৃথক শ্মশান ছিল। মানুষের ক্ষুধায় সে মাটিও আজ ঘর-বাড়িতে পরিপূর্ণ।

রাইগঞ্জের বন্দর মহাশ্মশান ও খরমুজা শ্মশানঘাট :

বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত রাইগঞ্জ ব্লকের অধীনে রয়েছে একটি প্রাচীন ক্রিমেটোরিয়াম বন্দর মহাশ্মশান। ১৭৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে তন্ত্রসিদ্ধ যোগী পুরুষ রঘুনন্দন গিরিগোঁসাই এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করেন এবং দক্ষিণা কালীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। একসময় এই শ্মশানভূমির বিস্তৃতি ছিল প্রায় ত্রিশ বিঘা জমি জুড়ে বর্তমান রামবিহারী মার্কেট থেকে শুরু করে দেবীনগর ব্রিজ পর্যন্ত। কালের কৃপায় এখন সে জমির পরিমাণ দাড়িয়েছে আট থেকে ন' বিঘায়। গা ছমছম করা ভয় যেখানে দিনেরবেলায় বাসা বাঁধত। সে সব কবেই ভ্যানিশ হয়ে গেছে। এখন কংক্রিটের দালানবাড়ি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শ্মশানেও আর আগের পরিবেশ নেই। দু'বেলাই পুলিশি টহল। সন্ন্যাসী ঠাকুর অথবা সিঁদেল চোরেরা শ্মশানের শান্ত অন্ধকারে একসময় যেখানে সুরা ও গঞ্জিকা প্রসাদে ভীম ভৈরবকান্তি হয়ে উঠতে পারত এখন তার আর উপায় নেই। বন্দর মহাশ্মশানে রাতের অন্ধকার দিনের আলোর মতো হয়ে ওঠে। হ্যালোজেন, টিউব, বাল্‌ব চারদিকে যেন প্রখর সূর্য। ফুলিক নদীর বাঁকে এ মহাশ্মশানে তান্ত্রিক যোগেশ চ্যাটার্জী দীর্ঘদিন তন্ত্রসাধনা করে গেছেন। কখনও-সখনও তারাপীঠ সিদ্ধ শ্মশানের ভক্তরা এখানে এসে ধ্যানাবস্থা ও সমাধিতে মগ্ন থাকেন। গত শতকের ষাটের দশকে নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর কালে এখানে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্মশানভূমিতে বর্তমানে গড়ে তোলা হয়েছে রক্ষাকালী ও ছিন্নমস্তা কালী মন্দির। তান্ত্রিক অটলবিহারীর চেষ্টায় এগুলি গড়ে ওঠে। অনিল গিরি নামে এক সেবক মন্দিরগুলি দেখভাল করেন। বিপ্লবী নিশীথনাথ কুণ্ডু, যতীন গিরি গোঁসাই, মানুগিরি গোঁসাই, শ্যামাকান্ত বর্মন, পৃথ্বীশ মিত্র প্রমুখদের শ্মশানকৃত্য এখানেই হয়েছে। চার-পাঁচটি করে নিত্যদিন এখানে শবদাহ হয়। রাইগঞ্জের খরমুজা শ্মশানঘাট মোহনবাটির পশ্চিমে কুলিক নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর চরে হয়ত কোনও একসময় প্রচুর তরমুজ ফলত, তারই অপভ্রংশ হয়ে অঞ্চলটি খরমুজা নামে পরিচিত। এখানেও রয়েছে পাকা চুল্লি, শ্মশানগৃহ, বৈদ্যুতিক বাতি ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা। রাইগঞ্জে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য গোরস্থানটি বন্দর শ্মশানের কিছুদুরে রয়েছে। গোরস্থানের পাশে কিছু জমি আছে সেখানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত শবদেহ সমাধিস্থ হয়। শ্মশান দুটি বর্তমানে রাইগঞ্জ পৌরসভার অধীনে পরিচালিত। চৈত্র মাসে এখানে গাজন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

কালিয়াগঞ্জে ছিরামতি শ্মশান :

শ্মশানটি কালিয়াগঞ্জ শহরের কেন্দ্রস্থলে ছিরামতি নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। স্রোতবহা ছিরামতি মনুষ্যসৃষ্ট ক্ষুধায় এখন জলহীন। নদী জুড়ে বিস্তীর্ণ ধানখেত। শ্মশানের পশ্চিমপাড়ে বয়রা কালীর মন্দির। শ্মশানের তিনিই রক্ষাকর্ত্রী। শহরের লোকসংখ্যা চাহিদার তুলনায় অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় এখন নিত্য দিনই দুটি-তিনটি করে শবদাহ চলছে। কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার যাদু ছোঁয়ায় ছিরামতি শ্মশান এখন রূপলাবণ্যে ভরপুর। দূর থেকে কোনও আগত ট্যুরিস্ট দেখলে ভাববেন হয়ত বাবুদের কোনও বাগানবাড়ি। পরিকল্পনা মাফিক বৃক্ষরোপণ, শবানুগমন যাত্রাপথ, নদীর ধার বেঁধে দেওয়া, পাকা দাহস্থান, স্নিগ্ধ বৈদ্যুতিক আলো, এসবই যেন শ্মশানভূমিকে মনোরম সময় যাপনের পার্কে পরিণত করেছে। কিন্তু সীমিত ঘোলা জল, ছিরামতী যেন বিপদ সঙ্কেত বয়ে আনে। রুদ্ধ জলে শবদাহ ছাড়াও নানাদিকের বজ্য-ক্লেদাক্ত-নোংরা জল সেখানে অবিরাম ছুটে আসছে। নদী দখল হয়ে যাওয়ায় সে জল বদ্ধ হয়ে আছে, সরতে পারছে না। আর চিতার ধোঁয়া ও মরণগন্ধ শহরবাসীর নাক ছোঁয়নি এমন মানুষ হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। শ্মশানের উত্তরপ্রান্তে রয়েছে গোরস্থান। খাস জমির উপর সমাধিস্থলটি কয়েক বছর আগেও বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল, কালের অভিশাপে বর্তমানে সংকুচিত ও সীমিত হয়ে গেছে। কালিয়াগঞ্জে আরও দুটি গোরস্থান রয়েছে দক্ষিণ আখানগরের বুড়ি পুকুরে এবং তরঙ্গ পুরের আনাউনে। একপাশে বুড়ি পুকুরে শবদাহস্থান অপরপাশে সমাধিভূমি। পঞ্চায়েতী জোয়ারে গ্রামগঞ্জের শ্মশানভূমিগুলিতে এখন বেশিরভাগই পাকা চুল্লি, শবানুগমনকারীদের জন্য ঘর, পানীয় জলের সুব্যবস্থা হয়েছে। শ্মশানকৃত্যে জলাভূমি সে তুলনায় সংস্কারনহীন অবস্থাতেই পড়ে আছে। ফলে পরিবেশ দূষণ বাড়ছেই।

হেমতাবাদের কবরস্থান :

উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাব্লকের অধীনে কালিয়াগঞ্জ, রাইগঞ্জ পাকা সড়কের বাম পাশে বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে প্রাচীন কবরস্থানটি অতীত ইতিহাসের নানান স্মৃতি নিয়ে এখনও সচল রয়েছে। সাবেক তাজপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ একটি জনপদ এবং তাজপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সেনানিবাস ছিল এখানে। মুসলমান আমলে বহু কীর্তির নিদর্শন এই অঞ্চলে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে, বিভিন্ন কাহিনি ও কিংবদন্তি এখানকার ধুলোয় মিশে আছে। মখদুমি গয়াদুল হোসেন, বাজেরুদ্দিন, ফকির বোরহানার মতো সুফি সাধকেরা এখানে বসবাস করতেন। ইতিহাসের শক্তিমান রাজা মহেশ, রাজা বালিয়া এই মাটিতেই লয় হয়েছেন। মোঘলবীর হুমায়ুনের সঙ্গে এখানেই যুদ্ধ হয়েছিল তুর্কিবীর তাহির ইমামের। রক্তাক্ত দেহে তিনি শায়িত আছেন ঘাস-মাটির ওই সমাধিতলে। হেমতাবাদ অঞ্চলে মুঘল শাসন থেকে পলাতক আফগান বিদ্রোহীদের অভিবাসন ঘটেছিল। নানান স্মৃতিচিহ্ন ঘেরা হেমতাবাদের গোরস্থানটি তাই অতি প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ সমাধিভূমি। এ রকম বিস্তীর্ণ এলাকা ও পুরনো গোরস্থান জেলায় আর দ্বিতীয়টি নেই। বছর বিশেক আগেও কবরস্থানটিতে লম্বা লম্বা পাকা সমাধি দেখা যেত, সমাধির উপর আরবি-

ফারসি লিপিতে স্মৃতিকথাও দেখেছি। বর্তমানে সে সব লুপ্ত হয়ে গেছে। মহরম উপলক্ষে এখানে জংগান ও মার্সিয়া গান অনুষ্ঠিত হয় এবং মেলা বসে। সবেবরাত উপলক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা রাত্রিতে এখানে প্রদীপ জ্বেলে নানান লোকাচার পালন করে। সরকারি রেকর্ডভুক্ত এই গোরস্থানটি রক্ষণা-বেক্ষণার অভাবে এবং অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে। মাজারগুলির এমন অবস্থা যে কিছুদিন যেতে না যেতে তারই উপর আবার খাল খুঁড়ে কবর হচ্ছে। অতি প্রাচীন এ সমাধিক্ষেত্রের উন্নয়নে সমাজবদ্ধ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে—তাকে প্রাণ দিয়ে আগলাতে হবে। সর্বদাই মনে রাখা দরকার এ আমাদের অনন্ত শয়নের টাওয়ার অব সাইলেন্স।

দিনাজপুরে কত যে ঐতিহাসিক গোরস্থান রয়েছে গ্রামগঞ্জ ঘুরলেই তার প্রমাণ মেলে। এমনই একটি গ্রাম বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত নারই। গ্রামটি গঙ্গারামপুর থেকে চার মাইল পুবে মালদা-বালুরঘাট পাকা সড়কের দুপাশে ছাড়িয়ে আছে। খরপা, দক্ষিণপাড়া, কলসিডাঙা, বাগানবাড়ি, পুবপাড়া, এ পাঁচটি অঞ্চল নিয়ে নারই গ্রামটি যতখানি ছিল ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল ততখানিই আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন। অবহেলা জড়ানো এ গ্রামেই মুঘল সেনানায়কদের অজস্র মরণ কবর আজও ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে। আসলে মোগলযুগে নারই অঞ্চলটি ছিল মোঘল শাসকদের গেভিইয়ার্ড। এ গ্রামে আজও আটজন মুঘল সেনাপতির সমাধি রয়েছে। এরা সকলেই হয়ত মীরজুমলার অধীনে অসম দখল করতে যাচ্ছিলেন। এদেশের আবহাওয়া সহ্য করতে পারেনি তাই পথেই সম্ভবত ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এঁদের সমাধি রয়েছে নারই দু-সতীনের দিঘির উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে। ওই দিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে তিনটি সমাধিসৌধ জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। দুটি জোড়া কবরে সমাধিসৌধ দুটি জোড়া এবং অপরটি একক। জোড়া সমাধিসৌধটি উত্তর-দক্ষিণে চার দশমিক পঁচাত্তর মিটার লম্বা এবং পুব-পশ্চিমে দু'মিটার। নারই গ্রামের পুবপাড়ায় রয়েছে আরো পাঁচটি জোড়া সমাধিসৌধ। এই জোড়া পাঁচটি সমাধির মধ্যে দুটি সমাধি এখনও কোনোক্রমে টিকে আছে। অপর দুটি ধ্বংসপ্রায়। বট-অশ্বত্থের গাছ এমনভাবে সমাধিগুলিকে জড়িয়ে ধরেছে যে কিছুদিনের মধ্যে সেগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যাবে। এই সমাধিসৌধের পুবদিকে মসুলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা এখন নামাজ পড়েন। ভালো করে লক্ষ করলে নারই গ্রামে কবরের যে ছড়াছড়ি এ কথা হলফ করেই বলা যায়। ইতিহাস বলে, এ পথে পাঠান-মোগলের অনেকবার যুদ্ধ হয়েছে। পাঠান-মোগল যুগে ধলদিঘির উত্তরপাড়ে দেবকোট ছিল গুরুত্বপূর্ণ সেনানিবাস। দেবকোট সেনা নিবাসের মুসলমান বীরেরা এ স্থানটিকে গোরস্থান হিসেবে ব্যবহার করেছেন এ প্রমাণ নারই গ্রামের প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন করলেই বোঝা যায়। নারই গ্রামটি ইতিহাস স্মৃতি বিজড়িত। গবেষকরা অনুসন্ধান করলে এখানে অনেক অজানা তথ্যের হদিশ পাবেন স্থির বিশ্বাস।

বখতিয়ার খিলজির সমাধি :

রক্তে ছিল নুনের স্বাদ বাহুতে তরবারি কিন্তু তারপরেই দিন ফুরলো রাত এগোল মুষল পর্বের। সবই চলে গেছে বিস্মৃতির অতলান্তে। মানুষ যারা তারা রয়েই গেছে সূর্য আর আলোর

কাছে। তাই এ এলাকার মানুষ তোমায় ভোলে নি। ভোলেনি বলেই এত লোকগাথা ও কাহিনি তোমাকে জড়িয়ে চলে আসছে যুগ থেকে যুগান্তে। বর্তমান গঙ্গারামপুর থানার নারায়ণপুর মৌজায় পিরপাল গ্রাম। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ঝড়-জল-বৃষ্টি-রোদে সেখানে একটি প্রাচীন কবর ধ্বংসপ্রায়। অতি জীর্ণ এই সমাধিসৌধ অনেকদিন আগেই ভেঙে ভেঙে পড়েছে। প্রাচীন ইঁট দাঁত মেলে তাকিয়ে আছে। কিছু অংশ বছর বিশেক আগে সিমেন্ট দিয়ে সারানো হয়েছিল, তাও ক্ষয়ে গিয়ে চারদিক আগাছা আর জঙ্গলে ছেয়ে আছে। এই গেভ ইয়ার্ডের ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যায় ছোট ছোট মাটির ঘোড়া আশপাশে ছড়ানো-ছিটানো। এখানেই অতীতের সেই দুর্দান্ত সেনানায়ক বাংলায় প্রাচীনযুগ শেষ করে মুসলমান যুগের সূচনা করেছিলেন, তার কথা কেউ মনে রাখল না। কোনও নবাব বা আমির শ্রেণির মানুষের এখানে পায়ের ধুলো এখনও পড়েনি, হাল আমলের ট্যুরিস্টরা এদিকে বড় একটা ঘেঁষে না। বড় অবহেলিত হয়ে রইল এই সমাধিস্থল।

ঐতিহাসিকরা অবশ্য এ সমাধি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। তাঁদের মতে এ মাজার হল পির বাহাউদ্দিনের। কিন্তু দীর্ঘকাল জুড়ে যে প্রবল জনশ্রুতি ছড়িয়ে আছে সে শ্রুতি কোনো ঐতিহাসিকই কানে তোলেননি। কিন্তু, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে প্রবল জনশ্রুতি হল এটি বুড়া পির মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির সমাধিস্তম্ভ। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে যে জনকল্লোল নগরীকে তিনি ছারখার করেছিলেন, যে চিরত্ন সভ্যতাকে তিনি গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন অতর্কিতে ছুরিকাঘাতে এ মাটিতেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন। দেবকোটের মাটি কিন্তু তাঁকে নিরাশ করল না। পরম আদরে শীতল হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল বক্তিয়ারের রোগজীর্ণ ছুরিকাহত ছিন্ন ক্ষতদেহকে। তাঁকে সমাধিস্থ করা হল পুনর্ভবা নদীর অপর পারে নারায়ণপুর মৌজায়। এরপর গৌড়বাংলার শাসন অধিকার নিয়ে বহু সংগ্রাম হয়ে গেছে। দেবীকোট বা বানগড়ের গৌরব স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজরা যখন বানগড় দুর্গ আবিষ্কার করেন তখনই ঘন জঙ্গলে ঘেরা এ স্মৃতি সৌধের সন্ধানও তাঁরা প্রথম পেয়েছিলেন।

সাবেক কাল থেকে বুড়া পির বা বক্তিয়ার খিলজিকে নিয়ে দিনাজপুরের লোককৃত সমাজে নানা লোকাচার পালিত হয়ে আসছে। যেহেতু বুড়াপির এখানে শুয়ে আছেন সে কারণে এখানকার লোকজনের খাটে শোওয়া নিষেধ ছিল। কালের কৃপায় এ নিয়ম পাল্টে গেলেও এখনও সাবেকি নর-নারী এ প্রথা মেনে চলেন। পৌষের প্রতি মঙ্গলবার এখানে বুড়া পিরের সমাধিসৌধ কে স্মরণ করে একটি ছোট্ট মেলা বসে। এ মেলা প্রতিবছর পৌষের মঙ্গলবার বসে কেন? তবে কি পৌষের কোনও মঙ্গলবার মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি এ নগর অধিকার করেছিলেন? তারই বিজয়স্মৃতি পৌষের মেলায় ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে? স্থানীয় মানুষেরা মাটির ঘোড়া রেখে মানত করেন পিরসাহেবকে। মাটির ঘোড়া রেখে মানত করার অর্থ হয়ত একদিন এ রণবিজয়ী ও শত্রুহন্তা পির ঘোড়ায় চড়ে এখানে এসেছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম ও সভ্যতার সূচনা বঙ্গদেশে করেছিলেন। তাই ঘোড়া দিয়ে বুড়া পীরকে তুষ্ট করার চেষ্টা যাতে

সাধারণ মানুষ সংসারের দুঃখকষ্ট অতিক্রম করে যেতে পারে। এ অঞ্চলের একটি শতাব্দী প্রাচীন ছড়ায় আছে—

বখতিয়ার আইলো রে
সোনার জমি দখল হইলো রে।।
হিন্দু আজা লক্ষণ পলাইলো রে
হিন্দু ধ্বংস হইয়া যবন ভরিয়া গেলোরে।।

কেউ মনে রাখেনি বুড়া পিরকে। অশোক, শেরশাহ্, আকবর, ভারতবর্ষ এ সব সন্তানদের মনে রেখেছে আজও। ভুলতে বসেছে গৌড়বঙ্গ বিজেতা বক্তিয়ার খিলজিকে। নারায়ণপুর মৌজায় পিরপাল গ্রামে নিস্তব্ধ মকবরায় দুর্মদ, শক্তিমান, তুর্কি সেনানায়ককে নিশ্চুপভাবে শায়িত দেখে তাই আশ্চর্য হতে হয়। একদিনের ভয়ঙ্কর করাল কঠোর বিভীষিকা আজ বাংলায় এ ভেজা মাটিতে কত অসহায়।

দেবকোটে আতাশাহের দরগা :

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অধীনে ধলদিঘির উত্তরপাড়ে রয়েছে সুফি সাধক মৌলানা আতাশাহের দরগা। অতীতের দেওকোট মহাবিহার যে বর্তমান আতাশাহের দরগা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই বৌদ্ধ মহাবিহারটি দখল করে বখ্তিয়ার মসজিদ, মাদ্রাসা, উপসনালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রুক্ন-উদ্দীন-কাইকাউসের সময় (৬৯০ হতে ৬৯৮ হিজরীবর্ষ) সাধক মৌলানা আতাশাহ্ ইসলাম ধর্ম প্রচার ও আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দেওকোটে এসেছিলেন। লখনৌতির সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউস কর্তৃক ওই সময় মসজিদটি নির্মাণ কাজ চলছিল। এ মসজিদটিকে কেন্দ্র করে সাধক আতাশাহের তত্ত্বাবধানে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সুপরিকল্পিতভাবে ধলদিঘির উত্তরপাড়ে গড়ে উঠেছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মসজিদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাবত্তা, জ্ঞানগরিমা ও চারিত্রিক গুণাবলীর দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। ক্ষমতাবান এ সাধকের নির্দেশে মসজিদ চত্বরেরই এককোণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় এবং এ দরগার খাদেম নিযুক্ত হয়েছিলেন গিয়াস নামে একজন সাধক। খাদেম গিয়াসের উদ্যোগে বর্তমান আতাশাহ'এর দরগায় যে গম্বুজ দেখা যায় ওই গম্বুজ শোভিত সমাধিকক্ষের নির্মাণ কাজ সাধিত হয়। সাধারণত মসজিদের ভেতরে কাউকে দাফন করা আপত্তিজনক কিন্তু এখানে তাই করা হয়েছে। সাধক মৌলানা আতার মৃত্যুর পর তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে সম্ভবত বান্দা গিয়াস অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়ে মসজিদ কক্ষেরই এককোণে তাঁকে দাফন করেছিলেন। প্রতি বছর মহরম মাসে মৌলানা আতাশাহের উরস উৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা এখানে সমবেত হোন এবং মুরগি জবাই করে রান্না করে আতাশাহের সমাধিতে তাঁরা ভোগ দেন। উরস উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। এখানকার মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা আতাশাহের দরগার চত্বরকে গোরস্থান রূপেও ব্যবহার করেন।

সৈয়দ করম আলি টাট শাহীর মাজার :

ঐতিহাসিক গঙ্গারামপুর সংলগ্ন ধলদিঘির দক্ষিণপাড়ে রয়েছে সৈয়দ করম আলি টাটশাহী পিরের মাজার। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ধলদিঘির মেলা তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পির করম আলি টাটশাহীর বাড়ি ছিল গঙ্গারামপুর থানার অধীনে প্রাণ সাগরের নিকটে রঘুনাথপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিল কেয়ামদ্দিন এবং গুরু ছিলেন কটকিহার গ্রামের খোদাবক্স। করম আলি ঈশ্বরভক্ত ছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনি সিদ্ধপুরুষ বা কামেল রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর অলৌকিক কাণ্ডের সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। এ সময় একদিন তিনি স্বপ্নে খোদাতাল্লার আদেশ পেলেন যে দেবীকোট পরগনার ধলদিঘির দক্ষিণপাড়ে এ মেলা বসাতে হবে। সে মেলা হবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনমেলা। আদেশ পেয়ে পিরসাহেব ছুটলেন দিনাজপুর শহরের ইংরেজ কালেকটরের কাছে সেরেস্তদার কানা ইমাম বক্স এতে বাধা দিলেন। তিনি বললেন, আপনি যদি যথার্থই কামেল হন তবে আমার এই কানা চোখটি সারিয়ে আপনার অলৌকিক সাধনার পরিচয় দেখান। পির সাহেব ইমামবক্সের চোখে হাত বুলোতেই দৃষ্টি ফুটে উঠলো। বিস্মিত সেরেস্তাদার আনন্দে মেলার লাইসেন্স মঞ্জুর করার ব্যবস্থা করলেন। সৈয়দ করম আলি টাটশাহী মারা গিয়েছিলেন এক হিন্দু শিষ্যের বাড়িতে। তিনি হলেন জয়পুর গ্রামের কান্ত গোঁসাই। হিন্দুশিষ্য খোল-করতাল বাজিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে আসে এবং ধলদিঘির দক্ষিণতীরে সমাধিস্থ করা হয়। প্রতিবছর ২৫ মাঘে পির করম আলি টাটশাহীর উরস উৎসব পালিত হয়। এই দিন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তরা খোল-করতাল বাজিয়ে চিনি-বাতাসা ধূপ দীপ-সহ হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে পিরসাহেবকে শ্রদ্ধা জানান। মুসলমানেরা মুরগি জবাই করে অথবা খাসির মাংসের পোলাও দিয়ে পিরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পিরের এ প্রসাদ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তরা হরির লুটের মতো লুট করে খেয়ে থাকেন। অনেকে পিরের মাজারের মানত করেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ হলে পিরকে মাটির হাতি-ঘোড়া জ্যান্ত মুরগি সন্দেশ বাতাসা কদমা দেন। সৈয়দ করম আলি টাটা শাহীর মাজার দিনাজপুর জেলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক মিলন সেতু।

পির মখদুমী গয়াদুল হোসেনের কবর :

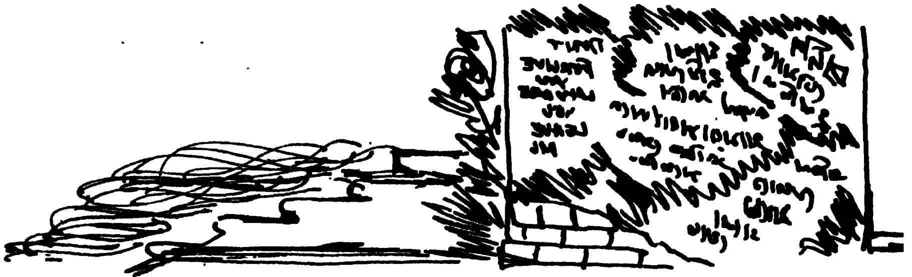
উত্তর দিনাজপুরের রাইগঞ্জের কাছে কসবা মহশোগ্রাম। কথিত যে, হিন্দুরাজা গণেশের রাজধানী ছিল এখানে। গণেশের পিতার নাম ছিল মহেশ নারায়ণ, তাঁর নামেই স্থানটির নামকরণ হয় মহেশপুর। পরবর্তীতে স্থানটি কসবা-মহশো নামে পরিচিত হয়। এ গ্রামেই রয়েছে পীর মখদুমী গয়াদুল হোসেনের কবর। পীর শাহ মখদুম ছিলেন একজন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ। তিনি বাহাত্তর জন সঙ্গী নিয়ে এখানে এসে রাজা গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ করেন বলে কথিত। রাজা গণেশকে তিনি পরাজিত করে এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইসলামধর্ম প্রচার করেছিলেন। এখানে একটি 'শ্বেতকূপ' রয়েছে। এই কুয়োটি পিরসাহেব অলৌকিক ক্ষমতা বলে খনন করেন বলে লোকবিশ্বাস। বহু লোক এ কুয়োর জল পবিত্র বলে মনে করেন এবং এ জল পান করলে

দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যায় বলে মানুষের ধারণা। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে মখদুমী পিরের উরস উপলক্ষে মেলা বসে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভক্তরা উরস উপলক্ষে পির মখদুমী গয়াদুর হোসেনের কবরে সিন্নি ও মিষ্টান্ন দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

বুরহানা দরবেশের গোর :

রাইগঞ্জ থানার অধীনে বিন্দোলের অদূরে বালিয়া গ্রামে রয়েছে বুরহানা দরবেশের গোর। বাংলার সুবাদার শাহসুজার সময় সুলতান হাসান সরিয়া বুরহানা নামে এক দরবেশ বিরাট ভক্ত বাহিনী নিয়ে বালিয়া রাজার গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইনি ছোট কাপড় পড়তেন। গৈরিক আলাখাল্লা গায়ে দিতেন আর ত্রিশূল হাতে নিয়ে আসনে বসে ধর্মকথা বলতেন। অলৌকিক ক্ষমতার গুণে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে তিনি শ্রদ্ধা পান। প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠমাসে বুরহানা দরবেশের উরস উপলক্ষে হিন্দুরা নতুন কাপড় ও মাটির ঘোড়া দিয়ে দরবেশকে শ্রদ্ধা জানান, মুসলমানরা সিন্নি প্রসাদ দেন। দরবেশের উরস্ উপলক্ষে মুর্শেদী-মারফতি গানের আসর বসে।

দিনাজপুর জেলায় এমন কোনও থানা নেই যেখানে পিরের মাজার নেই। হিন্দু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় বাড়িতে গুরু গোঁসাই অথবা গৃহস্বামীকে মন্দিরের ভেতরে সমাধিস্থ করতে। ভক্তরা গোঁসাইয়ের মৃত্যু দিবসটিকে পুজো-উৎসবের মধ্যে অতিবাহিত করেন। এরকম নিজ গৃহে স্মৃতি মন্দিরে সমাধিস্থ আছেন বালুরঘাট চকভৃগুতে কোকন গোঁসাই। বঙ্গদেশে তাঁর প্রচুর শিষ্য আছে। সাধুদের আলোচনায় তিনি সিদ্ধান্ত দিতেন। চকভৃগু নিজ আখড়ায় শায়িত আছেন সাধক দয়ালচাঁদ। রাইগঞ্জের রাসবিহারী মার্কেটের পশ্চিম ধারে অনন্ত শয়নে রয়েছেন বৈষ্ণবগুরু অনন্ত ক্ষ্যাপা। মৃত্যুর আগেই তিনি নিজের সমাধি করেন এবং তারপর সেখানে দেহ রাখেন। এরকম সমাধি জেলার সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যায়।



❑ লেখক পরিচিতি : গ্রন্থকার, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, সমাজতাত্ত্বিক।

ইসলামপুর মহকুমার শ্মশান সমীক্ষা এবং সতীপুকুর শ্মশান

বাণীপ্রসাদ নাগ

ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর জেলার এক ছোট মহকুমা শহর। এখানে ৫৫ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায় এবং ৪৫ শতাংশ হিন্দু। তবু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই মহকুমা দার্জিলিং জেলা-সংলগ্ন সোনাপুর হাট থেকে রায়গঞ্জ-সংলগ্ন করণদিঘি পর্যন্ত বিস্তৃত। একমাত্র ইসলামপুর ছাড়া এই মহকুমায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য শ্মশান নেই। সোনাপুর হাট, তিন মাইল হাট, কাঁচাকালি, চোপড়া, দলুয়া, শ্রীকৃষ্ণপুর, রামগঞ্জ, জগতাগাঁও, পাটানোর, মাটিকুণ্ডা, গোয়ালপুকুর, শ্রীপুর, মণিভিটা, চাকুলিয়া হাট, কানকি, ডালখোলা, করণদিঘি ইত্যাদি স্থানে মহানন্দা, তিস্তা ক্যানেল, ডক ও বলঞ্চা নদী, পুকুর, জলার ধারেই শবদাহ করা হয়। সোনাপুর হাটে মহানন্দা সেতু-সংলগ্ন একটি ছোট মন্দির আছে। চোপড়ায় মহানন্দার তীরে একটি ছোট শবযাত্রীদের অপেক্ষমান ঘর ও শবদাহ ক্ষেত্র আছে। তিনমাইল হাটে সাধারণ শ্মশানকে কেন্দ্র করে প্রতি বৎসর বাউল সংগীতের মেলা বসে। দলুয়া শ্মশান-সংলগ্ন ডক নদী প্রথমে দক্ষিণমুখী ও পরে উত্তরমুখী হওয়ায় এখানকার সকলে গঙ্গার সমতুল্য মনে করেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন শিবমন্দিরকে ঘিরে মেলা বসে। পুণ্যার্থীরা পুণ্যস্নান, পূজা সেরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মেলায় অংশ নেন। একমাস ধরে এই মেলা চলে। কানকি লালবাড়ি শ্মশান ঘাট মহানন্দার পাড়ে। এখানে একটি মন্দির ও ভগবতী গঙ্গার মূর্তি আছে। ১৯৭২ পর্যন্ত মহকুমা শহর ইসলামপুর ও কোনো নির্দিষ্ট শ্মশান ছিল না। তখনকার ঝলঝলিয়া পুকুরপাড়ে বর্তমান ক্ষুদিরামপল্লিতে শবদাহ করা হত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে শবদাহ বন্ধ হয়ে গেলে রেললাইন পেরিয়ে বিহারের একটি পুকুরের পাড়ে শবদাহ করা হত। কিছু সমাজসেবী ব্যক্তিবর্গের চিন্তাভাবনায় স্থান পায় ইসলামপুরে স্থায়ী শ্মশান। হয়তো আল্লার পয়গাম পেয়ে হিন্দু সমাজের সাহায্যে এগিয়ে এলেন তেলীভিটার রফিক ও কাসেম সাহেব। জয়গুপ্তেষা, সালমগীর এবং চোপড়াঝাড়ের শংকর দত্ত পিছিয়ে থাকলেন না। মুসলিম সম্প্রদায়ের জমি দানে সতীপুকুরের পশ্চিমপাড় জুড়ে ১৯৭৩ সালে শ্মশান স্থাপিত হয়। এই বৎসর ইসলামপুরের মণ্ডল পরিবার থেকে শবযাত্রীদের অপেক্ষমান গৃহ ও জনসাধারণের সহযোগিতায় তৈরি হয় জলকূপ। খড়ের ঘরে শুরু হয় বাৎসরিক মাতৃ আরাধনা রটন্ত কালীর পূজা। ১৯৮০ সালে শ্মশান মায়ের পাশেই বাৎসরিক জগদ্ধাত্রী মায়ের আরাধনা শুরু হয়। ১৯৮০ সালেই বাজারের ৺কানাইলাল দাস ছোট পাকা মাতৃমন্দির তৈরি করে দেন। ১৯৮৪ সালে তদানীন্তন মহকুমাশাসক মাননীয় দিলীপ চৌধুরী জেলাশাসকের সাহায্যে পাকা চুল্লি নির্মাণ করে দিতে সক্ষম হন। ১৯৯০ সালে ৺ব্রহ্মচারী তারা চৈতন্য-ভারতী শ্মশানে থেকে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের প্রচেষ্টায় আগ্রহী হন। ১৯৯৪ সালে ইসলামপুর পৌরসভাব সেবাইতের বিশ্রামগৃহ নির্মাণ করে দিলে তিনি আরও উৎসাহ

পান।

দুই কিমি দুরে হিন্দুদের 'সতীপুকুর শ্মশান' একটি ঐতিহ্যবাহী নাম। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীতে (১৮২০) ইসলামপুর বাজারের মণ্ডল পরিবারের নিঃসন্তান গৃহবধূ চম্পা, স্বামী সঙ্গতরাম মণ্ডলের সাথে একই চিতায় সহমরণে অংশগ্রহণ করেন। হিন্দু মৌলবাদীদের নিষ্ঠুরতম প্রথা সতীদাহের বলি হন। প্রাচীন লোক-পরম্পরায় সে-সময় থেকে পুকুরটি সতীপুকুর নামে খ্যাতিলাভ করেছে। আজকেও যাঁর বয়স ১০০ বৎসর তিনিও সতীপুকুর নামটি শুনে আসছেন। যদিও পুকুরটি আজও মুসলিম সম্প্রদায়ের অধীন। আজও সংস্কার বিমুখ, নোংরা, কচুরিপানায় ভরা। গ্রীষ্মের দাবদাহে সম্পূর্ণ অচল কিন্তু বর্ষায় পুষ্ট। নদীর ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রকৃতি ইসলামপুরে নির্মম। ব্রহ্মচারী তারা চৈতন্যভারতীর সান্নিধ্যে এসে আমার এখানে আসা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বদলে পরিকল্পিত সৃষ্টির আনন্দে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। মাধুকরী ব্রতে দীক্ষাগ্রহণ। ১৯৯৭ সাল থেকে সতীপুকুর শ্মশানের চিত্রটা ক্রমশ বদলে যেতে থাকে সতীপুকুর শ্মশান কালীমন্দির কমিটির প্রচেষ্টায়। ১৯৯৮ সালে জেলাশাসকের তহবিল থেকে গড়ে তোলা হয় চারিদিকের পাকা দেওয়াল। সাহায্য করেন মহকুমাশাসক অশোক ব্যানর্জী ও সেকেন্ড অফিসার পি.টি শর্মা মহোদয়। এরপরেই ইসলামপুরের আপামর জনসাধারণ পরিবর্তনের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দেন। ২০০০ সালে ইসলামপুর পৌরসভার বৈদ্যুতিক সংযোগে উদারতা ও বিজুয়ান আলম এবং তার ভায়েদের পুকুরের অর্ধেক অংশ দান কমিটিকে উৎসাহ দেয়।

সুধী পাঠকবৃন্দদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইসলামপুরের চোপড়াঝাড়মোড় বা জীবনমোড়। পূর্বদিকে একটু এগিয়ে গেলেই তিস্তা ক্যানেল ব্রিজ পেরিয়ে পাকা রাস্তার দুপাশে ধানখেত, পানখেত ও বাঁশবাগানের মাঝে উন্মুক্ত তোরণ 'অনন্তলোক দুয়ার' আপনাদের আবাহন জানাবে। ডানপাশে ফুল, দেবদারু ও পাতাবাহারের বাহার দেখতে পাবেন চিরবিশ্রাম বাগে। চারিদিক ঘেরা সেই বাগানে আপনি ঢুকতে পারবেন না। দেখতে পাবেন কংক্রিটের ছাতার নীচে হিসাবের খাতা-সহ চিত্রগুপ্তের সাথে ধর্মরাজ। আর তিনটি ছাতার নীচে মাতৃসাধক ত্রৈলঙ্গস্বামী, মায়ের সন্তান বামাক্ষ্যাপা, দানবীর রাজা হরিশচন্দ্র ও পুত্রকোলে শৈব্যার স্থির মূর্তি। চির বিশ্রামবাগের ওপাশে 'অন্তিম সমাধিস্থল'। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও ছোট শিশুদের স্বল্প পরিসরে সমাধি দেওয়ার স্থান। বামদিকে দেবদারু সারির মাঝে বিভিন্ন বাণী সংবলিত দেওয়াল। ২০০ ফুট, ১০ ফুট প্রশস্ত পিচ রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই এক এক টন ওজনের দেবাদিদেব ভোলানাথের বাহন নন্দী ভৃঙ্গী সদা সতর্ক প্রহরায় আসীন। শুভ্র পোশাক পরিহিত মশাল হাতে দুই দেবদূত আপনাকে 'অমৃতলোক দ্বার' দেখিয়ে দেবেন। আপনারা মার্বেল খচিত দু'টি বিশ্রামালয়ে বিশ্রাম নিন। পাশে বেলবৃক্ষ। তার পাশে প্রিয়জনদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুষ্পতর্পণ বেদী। দেওয়ালে নারীর যন্ত্রণামুক্তিদাতা রামমোহনের মূর্তি। বিশ্রাম শেষে এসে পৌঁছাবেন পাশাপাশি দুটি কাষ্ঠচুল্লিতে। একটি ১৯৮৪, অপরটি 'সচ্চিদানন্দ স্থল' ২০০৩। সামনেই মার্বেল দিয়ে তৈরি পাশাপাশি দু'টি

'অন্তিম স্নানাগার'। নতুন ছাতার নীচে প্রাচীন জলকূপ। চিতা ধোয়ার জন্য পাম্পলাইনের সাহায্যে জলের সুব্যবস্থা। পূর্বদিকে 'অস্থি বিসর্জন দুয়ার' যেতে বামপাশে সতী চম্পার কাল্পনিক মূর্তি। এগুলি দেখে 'নির্বাণদ্বার'কে বামপাশে রেখে আপনি এগিয়ে আসুন 'অমরাবতী দুয়ার তোরণে'। তোরণ পেরিয়ে বামে সর্পছত্র তলে স্বামী বিবেকানন্দ ও রামপ্রসাদের মূর্তি। দক্ষিণমুখী পাশাপাশি চারটি ঘর। ভোগের জন্য রন্ধনশালা, অফিস, খড়ি ও দশকর্ম ভাণ্ডার এবং সেবাইতের বিশ্রামগৃহের বারান্দায় কৃষ্ণমন্দির।

আপনারা এসে পৌঁছেছেন মাতৃমন্দিরের সামনে। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এখানে ছিল ছোট মাতৃমন্দির, চুল্লি, জলকল, সাধারণ বিশ্রামগৃহ, ইতস্তত রোপিত গাছ, পরিকল্পনাবিহীন পরিবেশ। একবিংশ শতাব্দীর উন্মত্ততায় আমরা সবই হারিয়েছি। চারিদিক উন্মুক্ত। আজ আর পড়ে থাকে না ত্রিভঙ্গাকার বাঁশের মাচা, শবের ব্যবহৃত লেপ তোশক, ভগ্নমাটির পাত্র, মৃত অর্ধগলিত শব নিয়ে শিয়াল কুকুরের টানাটানি। কিন্তু অবিচলিত অবাক করা সেই বট পাকুড় ও কদমের অপূর্ব মিলনের মহাবৃক্ষটি আজও অচল অনড়। যেন শ্যাম ও শিবের আলিঙ্গন। পালন ও সংহার কর্তার মহামিলন। আজ আর শোনা যায় না রাখাল বালকের সুমধুর বংশধ্বনি। হারিয়ে যাওয়া মায়ের জন্য গো বৎসরের হাম্বা হাম্বা রব। বাধানো বেদীর তলে শান্তি ছায়ায় অপেক্ষা করে পূর্বদিকে এগিয়ে প্রশস্ত চওড়া বাধানো সিঁড়ি দিয়ে সতীপুকুরের জলে পা ধুয়ে নিন। বামপাশে অল্পবয়স্কদের বসবার স্থান। মায়ের উঠান চত্বরেই পূর্বদিকে দেখতে পাবেন রামভক্ত হনুমানের মূর্তি। সিঁড়ির বামদিকে দক্ষিণমুখী ৩৬/, ১৬/ মার্বেল খচিত বারান্দার সিঁড়ির দুইপাশে দুই শান্ত সিংহমূর্তি। কোলাপসিবল গেট পেরোলেই জবাফুলে আসীন মা শ্মশানকালী। ১৮/, ৮/ দেওয়াল জুড়ে কৃষ্ণকালীর ঢালাই মূর্তি। সঙ্গে রাধা, আয়ন ঘোষ, জটিলা ও কুটিলা। বামপাশের ঘরে শিবমূর্তি ও শিবলিঙ্গ। দেওয়ালে সতীর দেহত্যাগ মূর্তি। ডানপাশের ঘরে মা জগদ্ধাত্রী। দেওয়ালে দেবী, যোগমায়ার মূর্তি। দর্শনার্থীদের আনাগোনার ভিড়ে ব্যস্ত থাকেন শ্মশান মা। নিশার অমানিশায় মায়ের শান্তি, আরাম।

সতীপুকুর শ্মশান আজ ইসলামপুরের অহংকার। ইসলামপুরবাসীর অনন্ত সাধনার ফল। শ্মশানের অর্থভীতি, অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ। শ্মশানভীতির চির অবসানে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূরীকরণে, চির আনন্দস্থলের উদ্দেশ্যে সামাজের দৌড় মাধুকরীর পিছনে। আমাদের দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গে এক আদর্শ শ্মশান স্থাপনের। আমাদের দৌড় দর্শনীয় স্থান রূপান্তরণে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

ক) নব পর্যায়ে সতীপুকুর শ্মশানের

খ) মন্তব্য পুস্তিকা থেকে—'কল্পনা করে স্বর্গকেও এত সুন্দর দর্শন করা যায় না।' রেণুকা বালা, কালনা বর্ধমান।

'সতীপুকুর এক আদর্শ শ্মশানের দৃষ্টান্ত'। প্রমথনাথ দত্ত, ভাদুতলা প. মেদিনীপুর

'পশ্চিমবঙ্গের হার্ট অব থর্ব'। পাপিয়া দাস, ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা ৬.৬.০৩—'এ বার্নিং ইস্যু'

'প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক—'উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ'

'আরও স্থানের প্রয়োজন'—কারামন্ত্রী মাননীয় বিশ্বনাথ চৌধুরী প. ব. সরকার।

জনসাধারণের পাশে পৌরপিতাকে এগিয়ে আসার অনুরোধ—পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয় অশোক ভট্টাচার্য মহাশয়, প. ব. সরকার।

গ) মূর্তিশিল্পী—রামপ্রসাদ পাল, দমদম কলকাতা

সহযোগিতায়—জগদীশ হালদার, ইসলামপুর।

ঘ) সতীপুকুর নামকরণের সাহায্যে :

জয়ন্তী মণ্ডল (মণ্ডল পরিবারের উত্তরপুরুষ ডা. বিজয় মণ্ডলের সহধর্মিণী)

মানু মণ্ডল (মণ্ডল পরিবারের উত্তরপুরুষ, অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক)

দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (অধ্যাপক ইসলামপুর কলেজ)

সুবল ভৌমিক (প্রধান শিক্ষক, ক্ষুদিরামপল্লী সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, ইসলামপুর)

প্রদীপ কুণ্ডু (সহ-শিক্ষক ইসলামপুর হাইস্কুল)

প্রফুল্ল মণ্ডল (পি.পি. ইসলামপুর কোর্ট, মণ্ডল পরিবারের উত্তরপুরুষ)

হরেকৃষ্ণ মণ্ডল (ব্যবসায়ী, মণ্ডল পরিবারের উত্তরপুরুষ)

রামকৃষ্ণ মণ্ডল (ব্যবসায়ী, মণ্ডল পরিবারের উত্তরপুরুষ)

ঙ) পথনির্দেশ—দার্জিলিং মেল বা অন্য ট্রেনে আলুয়াবাড়ি রোড/এক কিলোমিটার দূরত্বে বাস টারমিনাস/জীবন মোড় বা চোপড়াঝাড় মোড়/পূর্বদিকে তিস্তা ক্যানেল ব্রিজ/সতীপুকুর শ্মশানের অনন্তলোক দুয়ার তোরণ। (মোট ২ কিমি)

বাসযাত্রায়—ইসলামপুর/তারপর নির্দেশমতো।



❑ লেখক পরিচিতি : শিক্ষক, গবেষক।

নদিয়ায় নানা সম্প্রদায়ের শেষকৃত্যস্থান

মোহিত রায়

নদিয়া জেলায় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-বৈষ্ণব-পির প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শেষ কৃত্যস্থান শবদাহের শ্মশানঘাট এবং গোর-কবর-মাজার-সমাধিস্থান আছে, কয়েকটি প্রাচীনত্বে-ঐতিহ্যে খ্যাত।

১৬৯৪ সাল। গঙ্গাতীরবর্তী প্রাচীন জনপদ নবদ্বীপ। শ্মশানঘাট, সংলগ্ন অন্তর্জলিস্থান। নদিয়ার মহারাজা রুদ্র রায় (নদিয়ারাজকাল ১৬৮৩-৯৪ সাল)-কে মুমূর্ষু অবস্থায় এখানে আনা হয়েছে, তাঁর পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাঁর নিম্নাঙ্গ গঙ্গার ধারে জলমগ্ন করে রাখা হয়েছে। অজস্র মানুষ তাঁর অন্তর্জলি দেখছে। তৃতীয় দিনে রাজার মৃত্যু হল। পাশের শ্মশানঘাটে বিপুল পরিমাণ রক্ত ও শ্বেত চন্দনকাঠে রাজার শবদাহ করা হল। মোগল অনুগ্রহে নদিয়া রাজদের সূচনা হয় ১৬০৬ সালে। তাঁরা শুধু নদিয়ারাজ নন, তাঁরা ছিলেন নবদ্বীপাধিপতি। তাই রুদ্র রায়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত নদিয়ারাজদের শবদাহ হয় বাংলার অন্যতম প্রাচীন নবদ্বীপ শ্মশানঘাটে। নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (জন্ম ১৭১০, মৃত্যু ১৭৮২, নদিয়ারাজকাল ১৭২৮-৮২) -এর শবদাহও হয় নবদ্বীপ শ্মশানঘাটে জাঁকজমক সহকারে, তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসনের কর্মকর্তারাও এই শবদাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। শুধু নদিয়ারাজদের নয়, নদিয়ার শতসহস্র জমিদার বিত্তশালীসহ নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞদেরও শবদাহ হয়েছে এই শ্মশানঘাটে। এই শ্মশানঘাটেই একদা ছিল সতীদাহ স্থান। মৃত পতির জ্বলন্ত চিতায় অজস্র সতীনারীরও স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জীবন্ত দাহ করা হয়েছে। সে সব এখন অতীত— আমাদের জনসামাজিক ইতিহাসের নীরব সাক্ষ্য এই শ্মশানঘাট। নবদ্বীপে নানা বৈষ্ণব মঠ-আখড়াতে আছে অজস্র বৈষ্ণবসমাধি।

সেকালের সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত নবদ্বীপের শবদাহ ও সতীদাহের বিবরণ :

৫ জানুয়ারি ১৮১৯ □ 'রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ... গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন ...'

১৯ মে ১৮২২ □ '... অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার ... গঙ্গাতীরে লোকান্তরগত হইয়াছেন। ... পরে তাঁহার স্ত্রী ঐ সমাচার শুনিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বিধিপূর্বক সহমরণ করিয়াছেন।'

২০ আগস্ট ১৮২৫ □ '... নবদ্বীপের ... রামকুমার তর্কালঙ্কার ... পরলোকগত হইয়াছেন এবং তৎপর দিবস তাহার অনুমান চল্লিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।'

১৫ নভেম্বর ১৮২৮ □ 'নবদ্বীপনিবাসী ... কুলীনাচার্য রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি ... পরলোক গমন করিয়াছেন।'

নবদ্বীপ শ্মশানঘাটে সতীদাহের তথ্য :

১৭৯১ সালে নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার অন্যতম সভাপণ্ডিত গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের মৃত্যুতে নবদ্বীপে তাঁর স্ত্রী শ্মশানঘাটে আসেন এবং স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন।

উলা (বীরনগর)-এর মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় ছিলেন নদিয়ারাজ আত্মীয় ও বিত্তশালী জমিদার। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর ১৩জন স্ত্রীকে নানা স্থান থেকে এনে নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাটে সুবিশাল চিতায় একের পর এক পৈশাচিক বীভৎসভাবে পুড়িয়ে হত্যা করে তথাকথিত সতীদাহের মাহাত্ম্য প্রচার করে কাপুরুষ ধর্মান্ধেরা।

জানুয়ারি ১৮৮৩ পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মার মৃত্যুতে তাঁর শবদেহ নবদ্বীপে শ্মশানঘাটে আনা হয় এবং তাঁর জ্বলন্ত চিতায় তাঁর পাগলিনী স্ত্রীকে বলপূর্বক দাহ করা হয়।

নবদ্বীপের পণ্ডিত আশুতোষ তর্কালঙ্কার ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী সংখ্যা ছিল ১৯ জন। তাঁর শবদেহ নবদ্বীপে শ্মশানঘাটে এনে রাখা হয়। নানা জায়গা থেকে তাঁর ১৯জন স্ত্রীদের নিয়ে আসা হয়। একটি বিরাট চিতায় রক্ষণশীল সমাজপতিরা পণ্ডিত আশুতোষসহ তাঁর ১৯জন নানা বয়সের স্ত্রীদের সতীদাহ করা হয়, তাঁরা ছিলেন ২২ থেকে ৫০ বৎসর বয়স্কা। নির্মম হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। নবদ্বীপের শ্মশানঘাটের এমন সামাজিক কুপ্রথার অজস্র নজির আছে।

১ এপ্রিল ১৮৬৯ সালে স্থাপিত হয় নবদ্বীপ পুরসভা। তারপর থেকেই নবদ্বীপের শ্মশান পুরসভার অধিকারভুক্ত। নবদ্বীপ শ্মশানঘাট এলাকাটি ১৮ ও ১৯ সংখ্যক ওয়ার্ডে, জমির পরিমাণ ১০ + ৫ মোট বিঘা। এখানেই আছে পুরসভার মৎস্য প্রকল্প ৭০ বিঘা পরিমিত এলাকায়। চার বিঘা জমিতে আছে দুটি পুকুর। এলাকার নাম মণিপুর—মণিপুরচরা। পথের নাম মণিপুর রোড। নবদ্বীপ শ্মশানঘাটে আছে বৈদ্যুতিক চুল্লী, এটিই নদীয়ার প্রথম বৈদ্যুতিক চুল্লী। চুল্লীর কাজ শেষ হয় অক্টোবর ১৯৯৩, পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম শবদাহ হয় ২০.১০.১৯৯৩। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ৩০ মার্চ ১৯৯৪। ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। প্রতিদিন এখন গড়ে ১৫টি শবদাহ হয়। দাহ ব্যয় ৫০০ টাকা। এছাড়া পাশাপাশি কাঠের চুল্লীও আছে। দাহ ব্যয় ২৫০ টাকা। বৈদ্যুতিক চুল্লীর জমির পরিমাণ ১০ বিঘা, প্রাচীরবেষ্টিত। সুদূর অতীত থেকে অদ্যাবধি নানা দূরস্থান থেকে দাহের জন্য এই শ্মশানঘাটে শব আনা হয় ও দাহ করা হয়।

শিয়ালদহ-লালগোলা রেলপথের মুড়াগাছা স্টেশন থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে গঙ্গাতীরে প্রাচীন গ্রাম রুকুনপুর। এখানে আছে 'অন্তিম আশ্রম' নামে দালানবাড়ি, পাশেই সুরম্য তুলসীমঞ্চ। আগে এখানে অন্তর্জলি ও সতীদাহের জন্য অনেককে আনা হত। এখানে একদা অন্তর্জলি অবস্থায় অনেকের মৃত্যু হয়েছে, পরে এই শ্মশানঘাটে হয়েছে শবদাহ। এখানে অনেক সতীদাহও হয়েছে। 'অন্তিম আশ্রম' দালানে মুমূর্ষুদের আত্মীয়স্বজনেরা সাময়িক অবস্থান করতেন। এই স্থান শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্মৃতিবিজড়িত, তাঁর দুই স্ত্রী বসুধা ও লক্ষ্মী (জাহ্নবা)-র নামাঙ্কিত গঙ্গাসংলগ্ন বসুলক্ষ্মীর বিল আজও বর্তমান, সে কারণে এই জনপদ বৈষ্ণবতীর্থও। গ্রামে

বসুলক্ষ্মীর মন্দিরও আছে। এই গ্রামে বৈষ্ণবদের অজস্র সমাধিও আছে।

নদিয়ার ফুলিয়া ছিল একদা গঙ্গাতীরবর্তী 'গ্রামরত্ন ফুলিয়া'। প্রথম বাংলা রামায়ণকার কৃত্তিবাসের জন্মস্থান। এখানে কৃত্তিবাসের সমাধি আজও বর্তমান। অদূরেই শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ যবন হরিদাসের সাধনপীঠ।

নদিয়ার চাকদহও প্রাচীন জনপদ। একদা গঙ্গাতীরবর্তী এই জনপদের নাম ছিল চক্রদহ বা চক্রদ্বীপ। এখানে গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাট। শবদাহের স্থান। একসময় এখানে গঙ্গাস্নানের জন্য বহু দূরদেশ থেকে লোক সমাগম হত। গঙ্গাসাগরের মতো চাকদহের গঙ্গায় শিশুসন্তান বিসর্জনের প্রথাও একসময় প্রচলিত ছিল। কেউ কেউ আবার নাকি মোক্ষলাভের জন্য চাকদহের গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন। শ্মশানঘাটে আজও শোনা যায় নানা কিংবদন্তী লোকশ্রুতি। তবে গঙ্গা পশ্চিমে সরে যাওয়ায় এই স্থান ক্রমেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।

চার্লস কোলম্যান তাঁর 'মাইথোলজি অফ হিন্দুস' আকর গ্রন্থে চাকদহে গঙ্গাতীরে ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে পতি জ্বলন্ত চিতায় তাঁর কিশোরী স্ত্রী সতী হন স্বেচ্ছায়, নিবৃত্ত করার চেষ্টা বিফল হয়।

নদিয়ার কালিগঞ্জ থানার ভাগীরথী ও দ্বারকা নদীর সঙ্গমস্থলে প্রাচীন গ্রাম মাণিকডিহি। প্রায় তিনদিকেই ভাগরথী (গঙ্গা) নদী। বৈষ্ণবতীর্থ। এখানকার শ্মশানঘাটে শবদাহ হয়। একসময় এখানে সতীদাহ হত। স্থানীয় গোস্বামীবংশের প্রপৌত্রী লক্ষ্মীদেবী ১৮২৭ সালে এই শ্মশানঘাটে গঙ্গাতীরে মৃত পতির সঙ্গে সহমৃতা হন, তাঁর পরিত্যক্ত শাড়ি-শাঁখা ইত্যাদি গ্রামে গোস্বামীদের গৃহে সমাদরে রক্ষিত।

নদিয়ার গঙ্গাতীরবর্তী বিল্বপুষ্করিণী, প্রচলিত নাম বেলপুকুর। এখানে গঙ্গাতীরে মহাশ্মশান। এই গ্রামে কার্তিকী অমাবস্যায় ও মাঘী-কৃষ্ণ-চতুর্দশীতে রটন্তী তিথিতে পঞ্চ-ম-কারে গভীর তন্ত্রাচারে কালীপূজা হয়ে থাকে প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে। ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত গ্রাম। এখানে শ্মশানঘাটে আছে পঞ্চমুণ্ডীর আসন, এখানে শ্মশানে আগে নাকি শবসাধনা হত, এখনও আছে শবসাধনপীঠ। এই শ্মশানঘাটেও শবদাহ হয়।

নদিয়ার কালিগঞ্জ থানার গঙ্গাতীরবর্তী জুড়নপুর গ্রামে আছে মহাশ্মশান, সতীর মস্তিষ্কের অংশ বা মতান্তরে মুণ্ড পতিত হয়েছিল বলে কালীতীর্থ। এখানে রাজারাম ভট্টাচার্য কালীসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, জনশ্রুতি রাজারামের স্ত্রী রূপে স্বয়ং মা কালী এসেছিলেন। এখানে শ্মশানে তন্ত্রসাধনার জন্য মাটির নীচে গুপ্ত সাধকনকক্ষ আছে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিপুর গঙ্গাতীরবর্তী। হিন্দু ও বৈষ্ণবতীর্থভূমি। এখানকার শ্মশানঘাটও প্রাচীন। শ্মশানঘাট সংলগ্নই একদা ছিল সতীদাহস্থান। অজস্র সতীদাহ হয়েছে। ১৭৯৯ সালে শান্তিপুরের অনন্তরাম শর্মার মৃত্যুতে এই নৈকষ্য কুলীনের ৩৭জন স্ত্রীকেই শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে সহমৃতা হতে হয়েছিল, কারও কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ১৮০৯ সালে শান্তিপুরের রামচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে তাঁর চার স্ত্রীকেও এখানে সহমরণে যেতে হয়েছিল। ১৮২৪

সালে শান্তিপুরের কুলীন বিশ্বনাথ ব্যানার্জীর ৫জন স্ত্রীকে এখানে তাঁদের অনিচ্ছায় স্বামীর চিতায় জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল। ইতিহাসের পাতা মেলে ধরলে দেখা যায় যে শান্তিপুরের শ্মশানঘাটে সতীদাহস্থানে ১৭ থেকে ১৯ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শতাধিক সতীদাহ হয়।

একদা অগ্রদ্বীপ ছিল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জমিদারিভুক্ত ও ভৌগোলিকভাবে নদিয়া জেলাভুক্ত। এখানে আছে মহাশ্মশান। পাশেই সতীদাহ স্থান। ১৭৮৮ সালে ইংরেজ চিত্রশিল্পী উইলিয়াম হেজেস এখানকার শ্মশানঘাট ও সতীমন্দির দেখে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন, বর্তমানে অবশ্য এই শ্মশানঘাট ও সতীমন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন।

কৃষ্ণনগর শহরে নগেন্দ্রনগরে জলঙ্গী ও অঞ্জনা নদীর সঙ্গমস্থলের অদূরে জলঙ্গী নদীতীরে আছে শ্মশানঘাট। কৃষ্ণনগর ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার গরিব মৃতদের শবদাহ হয় এই শ্মশানঘাটে। একারণেই কোনও পাকা ঘর নেই।

কৃষ্ণনগর শহরের উপকণ্ঠে গোদাডাঙার কাছে সন্ধ্যাপাড়া গ্রামে আছে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাচীন গোরস্থান। এখানে অজস্র কবর আছে। কয়েকটি ইটের গাঁথনির ক্ষুদ্রাকার স্থাপত্য নিদর্শন। দেশভাগের আগে কৃষ্ণনগরের অধিবাসী বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তিদের কবরও এখানে আছে। এই কবরখানা বাংলাদেশ সীমান্তগামী সড়ক পথে। এখন এই এলাকায় আছে স্টেট আর্মস ফোরসেসের সদর দপ্তর ও আবাসন এলাকা। ফলে এই কবরখানার জমি ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। বেশ কয়েকটি কবর স্থাপত্যের ইট ও মৃতের পরিচয় উৎকীর্ণ মার্বেল পাথর উধাও হয়ে গেছে। এছাড়াও, নদিয়ার অন্যান্য মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় কবরখানা আছে, তার মধ্যে নবদ্বীপ থানার বামনপুকুরের শ্রীচৈতন্য প্রাণিত চাঁদকাজীর সমাধি উল্লেখ্য। নদিয়ার ধুয়োজারি গানের অসামান্য শিল্পী লালন পুরস্কারপ্রাপ্ত চায়েনুদ্দিনের সমাধি তাঁর জন্ম-মৃত্যুস্থান ডোমপুকুর গ্রামে নির্দিষ্ট কবরস্থানে আছে।

নদিয়ার পিরেরা হিন্দু মুসলমান মিলনের সেতু রচয়িতা। পিরদের আখড়ায় তাঁদের সমাধিস্থান আছে। নদিয়ারাজ রুদ্র রায় ১৬৮৩ সালে ঢাকা থেকে সুদক্ষ স্থপতি আলাবক্স কৃষ্ণনগরে এসে রাজপ্রাসাদ নহবতখানা, চারমিনারাদি নির্মাণ করেন। আলাবক্স কৃষ্ণনগরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন, তিনি পরে হন পির। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির অদূরেই পিরতলায় ছিল তাঁর সাধনভজনের স্থান, তাঁর মৃত্যুর পর এখানেই তিনি সমাহিত হন। তাঁর সমাধিস্থানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানত করেন, উৎসর্গ করেন ছলনের মাটির ক্ষুদ্রাকৃতি ঘোড়া, জ্বেলে দেন প্রদীপ।

নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার কৃষ্ণপুর গ্রামে চূর্ণি নদীতীরে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সেতু রচয়িতা মরমী সাধক পির জমাদার সাহেব মামুদ জাফরের মাজার সমাধি আছে এবং প্রতি বছর এই মাজারকে ঘিরে বসে মেলা। মামুদ হলেন নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সেনাবাহিনীর সেনাপতি। ভরতচন্দ্র রায়গুণাকর লিখিত 'অন্নদামঙ্গল' (রচনাকাল ১৭৫২-৫৩) কাব্যে আছে :

সেপাহীর জমাদার মামুদ জাফর
জগন্নাথ শিরোপা করিলা যার পর।

পরবর্তীকালে মামুদ সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে অতিমর্ত্য ক্ষমতার অধিকারী হন। মামুদ সহ তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যদের সমাধি আছে কৃষ্ণপুরে।

চাকদহ পুরসভার অন্তর্গত কাজীপাড়া, এককালে নাম ছিল পাজনৌর (পাঁচনূর-এর বিবর্তিত রূপ)। কাজী হজরত শাহ্ আদম শহীদ এই কাজীপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মাজার (সমাধি) আছে এখানে, পাশেই ছোট মসজিদ। কাজী বংশের মুন্সী এতেমুদ্দিন মহম্মদের আমলে কাজীপাড়ায় সুরম্য কাজীবাড়ির নানা মহল, নাচঘর—বর্তমানে জরাজীর্ণ ও ভগ্ন। কাজী বংশের কীর্তিমানদের সমাধিও আছে এখানে। এই বংশের সপ্তম পুরুষ ফারসি পণ্ডিত মুনশি এতেমদ্দিন মহম্মাদ দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের প্রতিনিধিরূপে বিলেত গিয়েছিলেন, তিনি লর্ড ক্লাইভের মীর মুনশি পদে বৃত ছিলেন।

কল্যাণীর ঘোষপাড়া নববৈষ্ণবধর্মের উপশাখা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। এখানে আছে 'সতীমা'র সমাধিমন্দির। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের নানা বিখ্যাত-অখ্যাতদেরও সমাধি আছে।

উনিশ শতকের সূচনায় নদিয়া জেলায় খ্রিস্টীয় মিশনারীদের কার্যকলাপ শুরু হয়, ১৭৯৩ সাল থেকে কৃষ্ণনগরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ও পরে ইংরেজ সরকারের প্রশাসন চালু হয়। ফলে, কৃষ্ণনগরে বসবাস কালে যে সব ইংরেজ মিশনারি ও প্রশাসকের মৃত্যু হয—তাঁরা কৃষ্ণনগরেই সমাধিস্থ হন। এই খ্রিস্টীয় সমাধিস্থান এখন কৃষ্ণনগরে বাসস্ট্যান্ডের সংলগ্ন এবং প্রাচীন প্রাচীরবেষ্টিত এই সমাধিস্থানের এলাকা একদা ছিল ২৪ বিঘা, এখন ১৫ বিঘার বেশি জমি সংরক্ষিত নেই। এই সমাধিস্থানের নাম—'C.M.S. St. John's Burial Ground - Cemetery' ১৮৩৪ সালে স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সমাধি এখানে আছে। 'ভবানী জংশন'-খ্যাত লেখক জন মাসটারের পিতামহ কৃষ্ণনগর কলেজের শিক্ষক উইলিয়াম মাসটারের সমাধি ও সমাধিস্তম্ভ উল্লেখ্য। মিশনারি কার্যকলাপের সূচনা থেকেই এখানে ছিল নানা সেবাকেন্দ্র ও হাসপাতাল। এই সমাধিস্থানে চিকিৎসক ও সেবিকার অজস্র সমাধি আছে। তা থেকে প্রমাণ হয় যে উনিশ শতকের সূচনায় সেবিকারা হতেন এদেশীয় খ্রিস্টান মহিলারা। এখানে অজস্র সমাধিস্তম্ভ ও প্রস্তরফলক আছে। অধিকাংশই কালের করাল গ্রাসে জীর্ণ। একটি সমাধিফলকে উৎকীর্ণ আছে : 'Sulochone Biswas, 56 years, Bible Woman.' আর একটিতে আছে : 'Tanet Tarrant Sharpe, female, 64 years, Missionary.' কৃষ্ণনগরের ১৮৩৪ সালে স্থাপিত C.M.S. St. John's Primary School-এর প্রধান শিক্ষিকা Dorothy Ellen Bean (wife of Rev. R. W. Bean)-এর সমাধিও আছে এই সমাধিস্থানে। এই সমাধিস্থান প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য সংরক্ষিত।

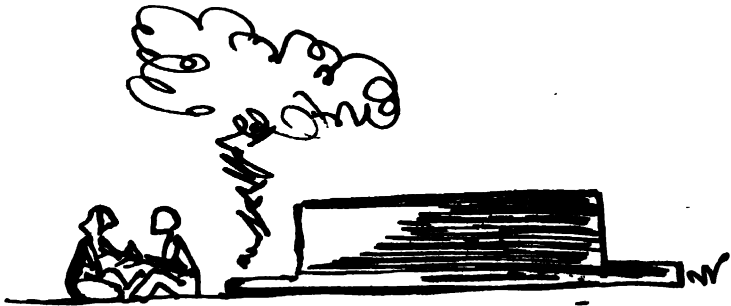
রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য কৃষ্ণনগর শহরের অন্যত্র সমাধিস্থান আছে। কৃষ্ণনগরের রোমান ক্যাথেড্রাল গির্জায় পাদপীঠে বিশপদের সমাধি আছে।

আঠারো শতকের শেষপর্বে নদিয়ায় ইউরোপীয় পুঁজির বিনিয়োগে বাণিজ্যিকভাবে নীল চাষ ও নিষ্কাশিত নীল উৎপাদন শুরু হয়। অজস্র নীলকুঠি ও নীলকারখানা স্থাপিত হয়। নীলকুঠিগুলি এখন পরিত্যক্ত। নীলকুঠি সংলগ্ন এলাকায় আছে ইউরোপীয় নীলকরদের সমাধি। নীলকরদের সঙ্গে বসবাস করতেন নীলকুঠিতে তাঁদের পরিবার। পরিবারের কারও মৃত্যু হলে তাঁদেরও সমাধিস্থ করা হয় নীলকুঠি সংলগ্ন স্থানে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আছে প্রস্তরফলকে তাঁদের নাম, বয়স ও পরিচয়। যেমন, শিকারপুর নীলকুঠি (এখন শিকারপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়) ও সলুয়া কুঠিপাড়ার নীলকুঠি (এখন কুঠিপাড়া রুরাল হাইস্কুল) সংলগ্ন সমাধি আছে : Thomas Laiday (1809 - 42), Helen Elizabeth Makenzie, Rev. C.H. Gill (1810-97), S. W. Donne (1814-1910). Mrs. Alecgendar Jane (1800-34) কালিগঞ্জ থানার পানিঘাটা গ্রামে পাগলাচণ্ডীদহের অদূরে ৩৪নং জাতীয় সড়কের পাশে আছে নীলকর C.H. Ogilvie-এর সুরম্য সমাধি। এখানকার নীলকর ও তাঁদের পরিবারের অন্য সকলের সমাধি এখন অবলুপ্ত।

বলাহাড়ি লোকধর্ম সম্প্রদায়ের কেন্দ্র তেহট্ট থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রাম। খুশি বিশ্বাসী লোকধর্ম সম্প্রদায়ের মূলকেন্দ্র কালিগঞ্জ থানার ভাগা গ্রাম। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কেন্দ্র চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রাম। এইসব লোকধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, অগণিত শিষ্য-প্রশিষ্য নরনারীর সমাধি আছে কেন্দ্রসংলগ্ন স্থানে। এইসব সমাধি উল্লিখিত লোকধর্মাশ্রিতেরা মান্য করেন এবং মৃত্যুতিথিতে সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নদিয়ার দশনামী সম্প্রদায়ের কেন্দ্র গঙ্গাতীরবর্তী স্বরূপগঞ্জে। এখানে দশনামী মন্দির সংলগ্ন স্থানে দশনামী সম্প্রদায়ভুক্তদের সমাধি আছে।

নদিয়ার মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে গুরু পরম্পরায় পাঁচজন গুরুর সমাধি মন্দির আছে. সেখানে নিত্য সেবাপূজাদি অনুষ্ঠান হয়। অদূরেই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ, সেখানে গুরুর সুরম্য পুষ্পসমাধি মন্দির আছে, এছাড়া আছে অন্যান্য প্রভুপাদ ও ভক্তদের সমাধি।



❑ লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট নদিয়া গবেষক, পণ্ডিত, বহুবিধ গ্রন্থ প্রণেতা।

নদিয়ার সমাজ মননে শ্মশান-গোরস্থান

সঞ্জিত দত্ত

মানুষের জীবনে জন্ম-মৃত্যু চিরন্তন সত্য। মানুষ সামাজিক জীব। কাজেই সামাজিক মানুষটির জীবনাবসানের পর সৎকারের সময় সমাজের একটি বড় ভূমিকা থাকে। সচরাচর সমাজের প্রতি মৃতের অবদান যেমন তাঁর অন্তিমযাত্রায় প্রভাব ফেলে তেমনি আবেগ ও ধর্মীয় সংস্কারও শেষকৃত্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। নদিয়া জেলায় সামাজিক পটভূমিকায় মানুষের অন্তিম সংস্কার-এর স্থান শ্মশানঘাট ও গোরস্থানের পরিবেশ পরিস্থিতিটা কেমন এক নজরে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

১. শ্মশানঘাট :

জেলায় সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। জেলার পশ্চিম সীমানা বরাবর উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে হিন্দুদের পবিত্র নদী গঙ্গা। কাজেই কালীগঞ্জ থেকে কল্যাণীগঙ্গা নদীর ধারে হিন্দুদের মৃতদেহ দাহ করার ঘটনা ঘটে বেশি পরিমানে। মড়া পোড়ানোর জন্য এখানে স্থায়ী ঘাট এবং পাকা বন্দোবস্ত যেমন আছে তেমনি অস্থায়ী ব্যবস্থাও হয়। নদীর গতি পরিবর্তন তথা নদী ভাঙনের জন্য ভৌগোলিক অবস্থায় রূপান্তর ঘটার ফলে শ্মশানঘাটের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে গেছে।

১.১. প্রাচীনকাল :

মুমূর্ষু হিন্দু বিশেষত হিন্দু ব্রাহ্মণদের তথাকথিত 'সশরীরে সজ্ঞানে স্বর্গারোহণে'র জন্য গঙ্গার ধারে অন্তর্জলি করার প্রথা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নদিয়ায় প্রচলিত ছিল। বিদেশি পর্যটক এবং এদেশে কর্মরত ইংরেজ শাসকদের অনেকের লেখায় নদিয়ায় এরকম গঙ্গাপ্রাপ্তির আশায় ক্রিয়াস্থল বা অন্তর্জলিঘাটের নাম পাওয়া যায়। কালীগঞ্জ থানার মানিকডিহি, পলাশী, কাটোয়াঘাট, অগ্রদ্বীপ, কাশিয়াডাঙ্গা, ভেবোডাঙা, বেলপুকুর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ফুলিয়া, চাকদহ, সুখসাগর প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ওইসব স্থানে অন্তর্জলিঘাটের অস্তিত্ব প্রমাণ করা না গেলেও ধুবুলিয়া থানার গঙ্গাতীরবর্তী রুকুনপুর গ্রামে (এখন অবশ্য গঙ্গা অনেকটা দূরে সরে গেছে) অন্তর্জলি যাত্রার শেষচিহ্ন রয়ে গেছে 'অন্তিম আশ্রম'-এ। পাশাপাশি একই সময়ে এই সমস্ত ঘাটে 'সতীদাহ'-এর মত ঘটনাও অনেক ঘটেছে। বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত 'চাকদহে সতীদাহের ছবি' বলে উল্লেখ থাকলেও সেটা কোন শ্মশানঘাটে হয়েছিল এখন বলা মুস্কিল। মরিচাগড়, আনন্দগঞ্জ, খয়রামারী সহ বিভিন্ন ঘাটে এবং গঙ্গার ধারে চাষের জমিতেও যে 'সতী' নামে মৃতের জীবন্ত স্ত্রীকে পোড়ানো হতো তার জনশ্রুতি রয়েছে। চাপড়া থানার শুঁটিয়া গ্রামের গোষ্ঠবিহারী ব্রহ্ম (১৮৭১-১৯১২ খ্রি.)-র ঠাকুরদাদা ব্রজনাথ ব্রহ্ম একশ বছর বয়সে নাকাশীপাড়া

থানার কাশিয়াডাঙার শ্মশানঘাটে অন্তর্জলি যাত্রায় যান। সেখানে ১২ দিন অবস্থানের পর সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অন্তর্জলি যাত্রায় গেলে আর ফিরে এসে বাড়িতে ঢোকা যায় না। ফলে বাড়ির বাইরে রথতলার মাঠে কাছারিবাড়ির সামনে বাস করতে থাকেন। এখানে আরো ১২ বছর পর ১১২ বছর বয়সে মারা গেলে দাহ করা হয়।

১.২ বর্তমান কাল :

এখনকার সময়ে নদিয়ার সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন এবং অত্যাধুনিক শ্মশানঘাট হচ্ছে নবদ্বীপ শ্মশান। নবদ্বীপ পুরসভা পরিচালিত এক দশক আগে স্থাপিত মন্দির দালানের মতো বৈদ্যুতিক চুল্লির এই শ্মশানে টেলিফোন সংযোগও রয়েছে। পাকা শ্মশানের পাশে পুরানো প্রথায় কাঠে পোড়ানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। একসময় কয়লাতেও শবদাহ করা হতো। পাকা শ্মশান রয়েছে জলাঙ্গী নদীর ধারে করিমপুর আনন্দপল্লীতে, চূর্ণী নদীতীরে রাণাঘাটে। প্রায় মৃত নদী অঞ্জনার ধারে বাদকুল্লায় যেমন শ্মশানঘাট আছে তেমনি নদী বা পুকুরবিহীন টিউবওয়েল ভরসা জেলার একমাত্র শ্মশান রয়েছে তাহেরপুরে। রেলস্টেশন, খেলার মাঠ, সিনেমাহল, বাজারের মাঝে খোলা প্রাঙ্গণে শবদাহ চলে বছরভর। ১৯৫১ সাল থেকে উদ্বাস্তু নগরী তাহেরপুরে এই শ্মশান চালু রয়েছে। এর আগে নবাব রোড বা বাদশাহী সড়কের পাশে এমনকি নিজেদের বাড়ির প্রাঙ্গণে দাহ করা হতো। নবাব রোডের ধারে বাদশাহি আমলের আমগাছের সারিও একদিন মৃতের চিতায় জ্বলে শেষ হয়ে গেছে।

নবদ্বীপ তীর্থস্থান বলে জেলা ও জেলার বাইরে দুরদূরান্ত থেকে হিন্দুদের মৃতদেহ সংকারের জন্য নবদ্বীপ শ্মশানঘাটে আনা হয়। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা অঞ্চল থেকে দু'টি সাইকেলের মাঝে বিশেষ কায়দায় চালি বেঁধে চারচাকার গাড়ির মত মৃতদেহ আনতে দেখেছি। হাজার টাকা লরি ভাড়া বাঁচাতেই এই কায়দা। একসময় যশোহর থেকে চাকদহ শ্মশানে মৃতদেহ আনা হতো। এখন চাকদহ থেকে শতকরা ৯০টি মৃতদেহ মোটরযানে উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরে নিয়ে যাওয়া হয়। নবদ্বীপ শহরে বিপরীতে শ্রীমায়াপুর হুলোরঘাটের জিউলি গাছের খুঁটির উপর কাঠের চিতায় মড়া পোড়ান আর্থিক ভাবে দুর্বল মানুষেরা। 'স্বর্গরথ', 'স্বর্গদূত' নামে সাজানো গোছানো কাঁচে ঢাকা গাড়ি (শববাহী শকট) বা মিনি লরিতে বেশিরভাগ শবযাত্রা হলেও এখনও পায়ে হেঁটে কাঁধে করে মড়া নিয়ে যাওয়ার প্রথা বর্তমান রয়েছে। প্রচলিত রয়েছে কথা—'জীবনের শেষে আর কি আছে? কাঁচা বাঁশ আর কাতা দড়ি!'

২. মাটির নীচে সংকার :

এ প্রথায় মৃতদেহের শেষকৃত্য করেন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান এমনকি আদিবাসীরাও। মাটির নিচে মৃতদেহ সংস্থাপনের বা আচার অনুষ্ঠানের কিছু তফাৎ শুধু লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু বৈষ্ণব ও যুগীরা মাটিতে 'সমাধি' দেওয়া বলেন আর মুসলমান-খ্রিস্টানরা তাকে বলেন—'কবর' বা 'গোর' দেওয়া। মুসলমান পির-ফকিরদের কবরকে বলা হয় 'মাজার'।

২.১. হিন্দুদের :

হিন্দুদের সমাধি হয় শ্মশানের পাশে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে। ধর্মীয় গুরু হলে সমাধি হয় আশ্রম বা মন্দির প্রাঙ্গণে। আবার কখনও বা সমাধির উপরে গড়ে ওঠে মন্দির। শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠে এর উদাহরণ মিলবে। আবার শ্রীমায়াপুরের সাহেবমঠ চন্দ্রোদয় মন্দির (ইস্‌কন) প্রাঙ্গণে, বারাণসীতে গুরুদেবের প্রকটলীলার পর তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ফুলকে সমাধি দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বিশাল শ্বেতপাথরের পুষ্পসমাধি মন্দির। কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীতে প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমের গম্ভীরা মন্দিরে প্রভু জগদ্বন্ধুর বিগ্রহ এবং বিগ্রহের মধ্যে প্রভুর অস্থিময় দেহ রাখা আছে। কৃষ্ণনগরে শ্রী অরবিন্দ ভবনে শ্রী অরবিন্দের পূতাস্থি রয়েছে।

২.২. মুসলমানদের :

মুসলমন ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষদের কবরস্থান বা গোরস্থান তাঁদের জনবসতির কাছাকাছি অবস্থিত। জেলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় গ্রামের জনপদের শেষপ্রান্তে ঢোল কলমী, ভেরেন্ডা, বাঁশের কঞ্চিঘেরা কবরস্থান। মুসলমানদে কবরস্থানে বাঁশঝাড় থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় এইসব বাঁশ কেটে কাজে লাগানো হয়। এছাড়া অন্যান্য গাছেও কবরস্থান ছায়াঘেরা থাকে। মুসলমানদের কবরস্থান দুই ধরনের—ক) পারিবারিক, খ) সমাজের। পারিবারিক গোরস্থানে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোন পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের মরদেহ সৎকার করা হয়। দ্বিতীয় ধরনের গোরস্থানে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী যে কোন ব্যক্তির মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়। কৃষ্ণনগর নাজিরাপাড়ার নদিয়ারাজের ওস্তাগরদের পারিবারিক কবরস্থান সময়ের কালচক্রে সমাজের গোরস্থান হয়ে গেছে। এছাড়া বাড়িতে বা নিজেদের মালিকানাধীন জমিতে ও অনেকে কবর দেন। সামাজিক বা আর্থিক দিক থেকে প্রভাবশালী অনেকে কবরের উপর পাকা সৌধ করে দেন। তাতে ধর্মীয় প্রতীক ছাড়া বংলায় মৃতের নাম ও মৃত্যুর বাংলা তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়। অনেকেরই এতে আপত্তি আছে। কারণ পাকা গাঁথনি করা হলে সেখানে ভবিষ্যতে সহসা নতুন করে কবর দেওয়া যায় না।

২.৩. খ্রিস্টানদের :

নদিয়া জেলার গ্রাম-শহরে খ্রিস্টীয় ধর্মানুসারীদের জনবসতিকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টানদের অনেক কবরস্থান আছে। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের আলাদা আলাদা সমাধিস্থান রয়েছে। যে জনপদ যত প্রাচীন তার কাছের সমাধিস্থানও তত প্রাচীন। কৃষ্ণনগর, চাপড়া, রাণাঘাট, বেগোপাড়া, মালিয়াপোতা, প্রভৃতি স্থানে পুরানো খ্রিষ্টীয় সমাধিস্থল রয়েছে। মুসলমানদের কবরের উপর বাঁশের বাতা দিয়ে যেমন মসজিদের গম্বুজের প্রতীকীরূপ করে দেওয়া হয় তেমনি খ্রিস্টানদের কবরে কাঠের ক্রুশচিহ্ন গেঁথে দেওয়া হয়। মানবদেহ মাটিতে মিশে যাওযার সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও বিলীন হয়ে যায়।

২.৪. আদিবাসী জনজাতিদের :

নদীয়া জেলায় ওঁরাও, সাঁওতাল, মালপাহাড়ী, রাজবংশী, ব্যাধ ইত্যাদি আদিবাসী জনজাতি মানুষ

বসবাস করেন। ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকা থেকে নীলকুঠিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে এসে বংশানুক্রমে এরা এখানে থেকে গেছেন। এঁদের মধ্যে ওঁরাও-সর্দাররা সংখ্যা গরিষ্ঠ। আদিবাসীরা মৃতদেহ মাটিতে সমাহিত করেন। ওঁরাওরা সমাধিস্থলকে বলেন—'মাশড়া' বা 'মশড়া'। কোতয়ালী থানার কুচাইডাঙা, হাজারীপোতা, নগরঘাটা, ভূতপাড়া ইত্যাদি গ্রামের মতো জেলার প্রায় সমস্ত আদিবাসী গ্রামেই ছোটবড় মাশড়া বা মশড়া আছে। চাকদহ থানার ১০নং মৌজার নাম 'মশড়া'। ড. অতুল সুর 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' দিতে গিয়ে বলেছেন— "আগে ওঁরাওরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করত। পরে বৎসরের এক নির্দিষ্ট দিনে সমাধিস্থল থেকে মৃতদেহ বের করে দাহ করত। একে 'হাড়বোরা' বলা হত।" কিন্তু এখানে ওঁরাওরা তা করেন না। এ প্রথা চালু আছে মালপাহাড়ীদের মধ্যে। তাঁরা শেষকৃত্যের স্থানকে বলে 'মাড়ি'। দোগাছি ও ক্ষীরপুলি গ্রামের মাঝে অঞ্জনা নদীর ধরে মালপাহাড়ী আদিবাসীদের 'মাড়ি' রয়েছে। গাঙ্গেয় সমতলভূমি এলাকায় পাথরের অভাব বলে সমাধির উপর পাথর চাপা দেওয়া যায় না। কুকুর শিয়াল থেকে মৃতদেহকে রক্ষা করতে কবরের অভ্যন্তরকে যেমন বাঁশের সাহায্যে মজবুত করা হয় তেমনি উপরে কাঁটা জাতীয় গাছ বিছিয়ে দেওয়া হয়। ইদানীংকালে অনেকে হিন্দুদের মত মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করছেন।

৩. কালের স্মৃতি : ইতিহাসের সাক্ষী

প্রাচীন কবর বা মাজার যেমন একটি স্থানের সময়ের পদচিহ্ন হিসাবে বেঁচে থাকে তেমনি ইতিহাসের জীবন্ত উপাদান হিসাবেও নিজেকে হাজির করে। নদিয়ার সামাজিক ইতিহাসে দেখা যায় এখানে চিরকাল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষ এক জোট হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বাণী যেমন তাঁদের আপ্লুত করেছে তেমনি সুফী মতবাদের পির ফকির আউল বাউলে প্রভাবিত হয়েছেন। নদিয়া জেলায় প্রায় ১০০টি পির ফকিরের মাজারের অস্তিত্ব নজরে পড়ে। সত্যপির, মানিকপির, জঙ্গলী পির, গাজীপির, ফরিদ পির, সাহেব পির, মাদার পির, বড় পির, ভাই পির, এ্যালা পির, গোরাশহীদ পির, গোরাচাঁদ পির, বদর পির, জাহির পির, ফতেমা বিবি পির, ধোকড় পির, সফীচাঁদ পির ইত্যাদি নানান নামের পিরের মাজার এবং তাকে ঘিরে মেলা-উৎসব সুফীমতের প্রভাব প্রসারকেই প্রতিষ্ঠিত করে। জেলার সবচেয়ে প্রাচীন মাজার বলে দাবি করা হয় চাকদহ পালপাড়ায় অবস্থিত হজরত শাহ আদম শহীদ এবং হজরত শাহ সুলতান জাহিরুদ্দিন বাকী ওরফে হজরত শাহ সাহেব ওরফে আজগুবি সাহেব। এঁদের আস্তানা বা মাজার দু'টি ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীর বলে বলা হয়। এছাড়া ইসলাম ধর্মানুসারী ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে প্রাচীন সমাধি রয়েছে নবদ্বীপ থানায় বামুনপুকুরে। এই সমাধিটি হলো গৌড় অধিপতি হুসেন শাহ'র (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) গৃহশিক্ষক মৌলানা সিরাজউদ্দীন ওরফে চাঁদ গাজীর।

গ্রাম-গঞ্জে পির ফকিরদের কর্মক্ষেত্রে তাঁদের আস্তানায় জীবনাবসানের পর সমাহিত করা হয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের বেলায় ব্যতিক্রম দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে থেকে কাজ করলেও সমাধি দেওয়ার সময় যাজনক্ষেত্রের সদরে বা বড়চার্চের অধীন বেরিয়াল গ্রাউন্ডে নিয়ে আসা

হয়েছে। ১৯৩৫ সালে মালিয়াপোতার কাছে ফুলবাড়ি গির্জার সঙ্গে যুক্ত ডন্ বস্কো ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক ব্রাদার চেসারিন (Br. Cesarin) সরস্বতী নদীর জলে ডুবে মারা গেলে সিস্টাররা মাঝিদের বুঝতে না দিয়ে তাঁর মৃতদেহ অসুস্থ রোগীর মতো করে নৌকায় কৃষ্ণনগর ক্যাথিড্রাল চার্চে নিয়ে আসেন এবং কৃষ্ণনগরেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। পাশাপাশি প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং নামকরা নীলকর সাহেবদের ক্ষেত্রেও অন্যত্র নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। চাকদহ পুরসভা প্রতিষ্ঠাতা তথা আলেকজান্ডার ক্যানিংহামের সহযোগী পুরাতাত্ত্বিক যোশেফ ডেভিড মেলিক বেগলার (১৮২৫-১৯০৭ খ্রি.) পরিবারটি আর্মেনিয়ান খ্রিস্টান পরিবার। চাকদহে বসবাস করলেও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমাহিত করা হয় কলকাতার আর্মেনিয়ান চার্চের সমাধিক্ষেত্রে। তাঁর নাতি জন বেগলার (১৯১০-১৯৮৬ খ্রি.) ১৯৬২ সালে মায়া কর্মকারকে বিয়ে করার জন্য কৃষ্ণনগর গির্জায় রোমান ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করায় তাঁকে মৃত্যুর পর রাণাঘাট বেগোপাড়ায় ক্যাথলিক বেরিয়াল গ্রাউন্ডে সমাধিস্থ করা হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের দুই দশক পর্যন্ত নদিয়ার নীলকুঠিগুলিতে অসংখ্য নীলকর সাহেব এবং তাদের অনেকেরই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বসবাস করে গেছেন। নীলকুঠির কাছাকাছি তাদের কবর দেওয়া হতো। এসব কবরে নাম, জন্মমৃত্যুর তারিখ, নীলকুঠির কনসার্নের নাম খোদাই করা দামি কালো, বাদামি বা সাদা পাথরের ফলক লাগানো থাকতো। ফলকে ফলক নির্মাতা কলকাতা বা হাওড়ায় অবস্থিত বিদেশী কোম্পানির নামও লেখা থাকত। বেশিরভাগ কবর ধূলিসাৎ হয়ে গেলেও কোথায় কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে এখনও কিছু কবর অটুট রয়েছে। শিকারপুর নীলকুঠি (যা এখন বি.এস.এফ ক্যাম্প) প্রাঙ্গণে আমগাছতলায় কচুবনে ঢাকা দু'টি কবর আজও বিদ্যমান পরিচয় লিপিসহ। মহেশগঞ্জ কুঠিবাড়ি প্রাঙ্গণে আমবাগানে একজন নীলকর সাহেবের সন্তান চিরনিদ্রায় শায়িত আছে। নীলচাষে নিমরাজী দুজন চাষিকে খুন করার বদলা হিসাবে কোতোয়ালী থানার দোগাছি এলাকার কৃষকরা ১৮০৭ সালে নীলকর মেটল্যান্ড আর্ণট এবং তার ঘোড়াকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ক্ষীরপুলি এবং হাটবোয়ালিয়া গ্রামের মাঝে আনন্দ বাগানের চাষের জমিতে তাদেরকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। এই দুটি কবর 'সাহেবপোতা' এবং 'ঘোড়াপোতা' নামে পরিচিত। বছর ১৫ আগেও আর্ণটের কবরে ফলক ছিল। সেটি অপহৃত হয়েছে। বছর চারেক আগে কবরটি নিশ্চিহ্ন করে চাষের জমিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু 'সাহেব পোতা' ও 'ঘোড়াপোতা' নাম দুটি র'য়ে গেছে।

কালীগঞ্জ থানার পাগলাচণ্ডীতে ৩৪নং জাতীয় সড়কের পাশে 'অলিগ্‌ভি' পদবীধারী এক ইংরেজ তরুণের সমাধি আছে। তাঁর সঠিক পরিচয় এখন জানা না গেলেও কেউ তাকে নীলকর বলেন কেউ বা বলেন তিনি কবি মানুষ। পলাশী রণক্ষেত্র থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে পাগলাচণ্ডী দহের (মরানদী) উত্তরপাড়ে তিনি ('The Plassey House) নামে দ্বিতল বাসভবন তৈরি করেন। প্রয়াত প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ও কংগ্রেস নেতা শংকর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলাত যাত্রার কারণে সমাজচ্যুত পিতা উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অলিভ্‌গি পরিবারের কাছ থেকে বাড়ি ও সংলগ্ন

জমি-বাগান কিনে নেন। ভবনের উত্তর-পশ্চিমে হাজার গজ দূরে সমাধিটি অটুট রয়েছে। মানবিক কারণে অথবা শর্তানুযায়ী কবরটি ধ্বংস করা হয়নি। শুধু তাই নয়, শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় নিযুক্ত একটি পরিবার যাঁরা কবরের পাশে বসবাস করেন তাঁরাই দেখভাল করেন এবং পরিবারের মহিলারা সন্ধ্যায় সমাধিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ ও ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেন।

৪. ভাঙাচোরা সময়ের হিসাব :

চাপড়া থানার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোরস্থানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় জলাঙ্গী নদীর ধারে নতুন গোরস্থান গড়তে হয়েছে। জেলার বহু গ্রামেই এই চিত্র দেখা যায়। আবার অন্যদিকে দেশ বিভাজনের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তথা. সামাজিক জটিলতার কঠিন সময়ে বহু মানুষ স্থানান্তরিত হওয়ায় গোরস্থানের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। ত্রিশের দশকের শেষ ভাগ থেকে ইসলাম ধর্মানুসারী নগরঘাটা গ্রামের জনবসতি ছেড়ে মানুষ ঝিটকেপোতা-দুর্গাপুর বা পাকিস্তানে চলে যান। গোরস্থান হারিয়ে যায় কলাবাগান, চাষের জমিতে। একইভাবে শহরাঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে প্রোথিত আত্মীয়স্বজনের কবর মুছে গেছে দেশ বিভাগ বা তারপরে বসতবাটি জমি হস্তান্তরের ফলে। সেখানে গড়ে উঠেছে নতুন ইমারত।

কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যাণ্ডের বাদুড়তলায় প্রোটেস্টান্টদের সমাধিস্থলে একসময় শ্বেতপাথরের দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য দেখা যেত কবরের উপর। তস্করদের উপদ্রবে পরী-জাতীয় মার্বেল পাথরের মূর্তি, শ্বেত পাথরের ফলক সমাধিস্থল থেকে উধাও হয়ে গেছে। একসময় গোরস্থান থেকে কঙ্কাল চুরির ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটতো। সেকারণে নিরাপত্তার কথা ভেবে কৃষ্ণনগর ক্যাথলিক চার্চের সমাধিক্ষেত্রে দিবারাত্রি পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে। এখানে 'দেওয়াল কবরে'র ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ স্থান সংকুলান না হলে প্রাচীন সমাধি থেকে দেহাবশেষ তুলে দেওয়ালে বিশেষ মর্যাদায় গেঁথে রাখা হয়। বেজেখালির কাছে একটি ইমারত গড়ার জন্য সমাধিস্থলের জমি প্রয়োজন হলে কবর স্থানান্তরিত করে 'দেওয়াল কবরে' স্থান দেওয়া হয়। এখানে সাল তারিখ ও পরিচয় লিপি সম্বলিত প্রাচীন স্মৃতিফলকও মর্যাদার সঙ্গে অটুট রাখা হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের হাওয়ায় আদিবাসী সমাজের বহু মানুষ এখন মৃতদেহ গোর না দিয়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে হিন্দুদের মত দাহ করেন। সেকারণে বহু হিন্দু বা অন্যধর্মের মানুষ ভুলেই গেছেন বা জানেন না যে আদিবাসীদের মৃতদেহ সৎকার করার ব্যবস্থাও আসলে খ্রিস্টান বা মুসলমানদের মাটিতে 'দাফন' করার মতোই মাটির নিচে সমাধি দেওয়া।

৫. সামাজিক সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যের প্রতীক :

নদিয়ার সমাজ মানসিকতায় সম্প্রীতির বাতাবরণ চিরকালই ফল্গুধারার মতো বহমান। গত দু'হাজার বছরের সময়কালের মধ্যে হিন্দু—বৌদ্ধ— মুসলমান—খ্রিস্টান—হিন্দু ধর্মান্তরের কালচক্রে আবর্তিত হলেও লোকায়ত জীবন, লৌকিক সংস্কার, সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্যের মেলবন্ধন সমাজ জীবনকে চিরসবুজ করে রেখেছে। চাঁদ কাজি ওরফে মৌলানা সিরাজউদ্দিন (১৪৩০-১৫০৬ খ্রি.)-এর সমাধি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতীক। শ্রী চৈতন্যদেবের ২১ বছর

বয়সে চাঁদকাজীর মৃত্যু হলে মহাপ্রভু নিজ হাতে বামুন পুকুরে চাঁদ কাজির সমাধিতে ফুলের গাছ পুঁতে দিয়েছিলেন। শতাব্দী প্রাচীন গোলঞ্চ বা কাঠগোলাপ ফুলগাছ আজও সমাধিকে ফুলে ফুলে ঢেকে দেয়। সমাধির সামনে বৈষ্ণবরা নাম সংকীর্তন করেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বি মানুষ নামাজ পড়েন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় কিছু মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে চাঁদ কাজি নবদ্বীপে হরিনাম সংকীর্তন বন্ধের আদেশ দিলে শ্রীচৈতন্যদেব এদেশে প্রথম অহিংস গণআন্দোলন গড়ে তুলে মিছিল সহযোগে চাঁদ কাজির কাছে দরবার করেন। নবদ্বীপের প্রশাসক চাঁদ কাজিকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলে কাজি সাহেব মহাপ্রভুকে জড়িয়ে ধরেন ও পুনরায় নগর সংকীর্তনের অনুমতি দান করেন। ফুলিয়া কৃত্তিবাসে যবন হরিদাসের গুম্ফা, পালপাড়ার লাল তেঁতুল গাছতলার আজগুবি সাহেব, রাণাবন্ধ-শ্যাওড়াতলার মরমি সাধক আহাদ শাহপিরের আস্তানা, চারাতলা-বৃত্তিহুদার দীনদয়ালভক্ত সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কুবীর গোঁসাই-এর থান, এরকম বহু মাজার, সমাধি, স্মৃতিসৌধ সম্প্রীতির প্রদীপ হয়ে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির চকের কাছে পিরতলায় রয়েছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক রাজমিস্ত্রী-পঙ্খ অলঙ্কৃত ঠাকুরদালান নির্মাতা আলাল দোস্তের সমাধি। রাজা তাঁর জন্য ১২ শতক জমি দান করেছিলেন। হিন্দুদের পুজো-উৎসবে যেমন প্রতিমা রাজারচকে আনা হয় তেমনি মহরমের তাজিয়া সমাধি পর্যন্ত আনা হয়। এখানে প্রচলিত রেওয়াজ-কাছেই আনন্দময়ীতলা কালীমন্দিরে তিন পয়সা প্রণামী দিলে পিরতলায় দুপয়সা দেবেনই। কদমখালি শ্মশানঘাটে (মৃত কলিঙ্গ/পলদা নদীর ধারে) লালন আশ্রমের মত জেলার সব প্রান্তেই পির-ফকিরদের মাজার এবং শ্মশানঘাটে কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বাউল-ফকির গান-শব্দগান, লালনের গান-এর মত লোকগানের আসর বসে। মেলাও বসে মাঠজুড়ে। শোনা যায় 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে', 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' কিংবা 'একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর, মন আমার কেন বাঁধো দালান ঘর'। হিন্দু যখন সমব্যথী হয়ে খ্রিস্টান বা মুসলমানের মৃতদেহ কাঁধে করে গোরস্থানে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে মাটি দেন অথবা মুসলমান বা খ্রিস্টান যখন 'কাঁদি' হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে শ্মশানযাত্রী হন কেউ কিছু মনে করেন না, আপত্তি করেন না, আশ্চর্যও হন না। একটা উদাহরণ দিয়ে আলোচনা শেষ করা যেতে পারে।

কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাপ্তাহিক 'গ্রাম গ্রামান্তর' পত্রিকায় বছর ১৩ আগে আগস্ট মাসে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে বা অন্য পত্রপত্রিকা এবং বুদ্ধিজীবীর লেখায় পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। চাপড়া থানার ২৬ নং লক্ষ্মীগাছা মৌজার চারাতলা গ্রাম। ৮০০ ঘর মানুষের বাস। একঘর মাত্র হিন্দু বাকি সব মুসলমান। পেশায় কর্মকার ঐ পরিবারটির কর্তা তথা একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি শিশির কর্মকার ওরফে ব্যাঁকা অসুখে ভুগে ২৮শে শ্রাবণ বুধবার কল্যাণী হাসপাতালে মারা গেলেন। বাড়িতে সদ্য বিধবা স্ত্রী, নাবালক পুত্র-কন্যা। জনপ্রিয় অথচ দরিদ্র পরিবারটির ধারে কাছে আত্মীয় পরিজন বলতে কেউ নেই। প্রতিবেশী মুসলমানরা এগিয়ে এলেন প্রাণের টানে। চাঁদা তুললেন। দুটি ট্রাক ভাড়া করে ৮৭ জন শ্মশানযাত্রী (যাঁদের সবাই

গ্রামের মুসলমান) রীতিমত 'হরিধ্বনি' দিয়ে নবদ্বীপ মহাশ্মশানঘাটে শিশিরবাবুর মরদেহের দাহ কাজ সেরে ফিরে এলেন। শিশিরবাবুর পুত্র শ্যামল কর্মকারকে দিয়ে মুখাগ্নি এবং পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থাও করে দিলেন প্রতিবেশীরা। তথাকথিত শিক্ষিত নগরবাসী, যখন জাতের নামে বজ্জাতি করেন। তখন দীনদয়ালভক্ত গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলোর পাল্টা প্রশ্ন—

"সৃষ্টিকর্তা এক নিরঞ্জন—হিন্দু-যবন জাতি নিরূপণ কিসের কারণ?"



নবদ্বীপ থানার বামুনপুকুরে পাঁচশত বছরের প্রাচীন মৌলানা সিরাজউদ্দিন ওরফে চাঁদকাজির সমাধি।
ছবি : অমিত কুমার বিশ্বাস।

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক।

তেজনগর শ্মশানঘাট

অরুণকুমার মণ্ডল

"এই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর" এই আপ্তবাক্যটিকে স্মরণ রেখে আমরা বলতে পারি যেখানে ভারতের রবি একদিন স্তিমিত হয়েছিল সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান পলাশির অনতিদূরে এক জনবিরল জনপদ তেজনগর শ্মশানঘাটের জন্ম। এই শ্মশানঘাটের জন্ম পঞ্জিকা অন্ধকারের কুয়াশায় আবৃত। তেজনগর শ্মশানঘাটের কবে যে উৎপত্তি হয়েছিল সে ইতিহাস সিরাজ-উদ্-দৌল্লা বনাম ক্লাইভের যুদ্ধে সমাধিস্থ হয়ে গেছে। এই ঘাট সংলগ্ন এক প্রবীণ অশীতিপর বৃদ্ধের কথায় 'আজ থেকে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে, কি তারও আগে এই শ্মশানঘাটের জন্ম হয়েছিল। তৎকালীন এই এলাকা ছিল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। দিনের বেলা মানুষের যাতায়াত রীতিমতো ভীতিজনক ছিল। তবুও এই শ্মশানঘাটকে ঘিরে বর্তমানে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। এই শ্মশান যেন এলাকার মানুষের কাছে পবিত্র মন্দির রূপে বিরাজ করছে। আর এই শ্মশানকে ঘিরেই ছড়িয়ে রয়েছে নানান অলৌকিক কাহিনির গল্প।

'শ্মশান' ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু এই ছোট্ট একটি শব্দের মধ্যে নিহিত আছে, কত মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, রাগ-অনুরাগ ও আশা নিরাশার কাহিনি। মোটামুটিভাবে মানুষের জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সকলেরই শ্মশানের সঙ্গে পরোক্ষভাবে পরিচয় ঘটে। আর এই আপাত কঠিন শব্দটি আমাদের অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু শ্মশানেরও একটা মৃত ইতিহাস থেকে যায় যেটা আমরা কেউ কোনোদিন জানার চেষ্টা করি না। শ্মশান শুধু দুঃখের সরোবর নয়, এ যেন মহামিলনের এক পূর্ণ তীর্থক্ষেত্র। এক অর্থে শ্মশান যেন মানুষের কাছে ত্রাস। কিন্তু শ্মশানেরও অনেক দুঃখ, অনুশোচনা আছে সেভাবে কত মানুষের নিথর দেহকে সে দৈত্য-দানবের মতো গিলে খেয়েছে, কত মানুষের অভিশাপ বুকে নিয়ে সে আজও নীরবে নির্জনে বিনিদ্র রজনী যাপন করে চলেছে। তার যেন ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই যেন অনন্ত সময়ের নির্বিকার প্রহরী। এই রকমই এক শ্মশানঘাটের কথা জানব আমরা যেটা হল নদিয়া জেলার একেবারে শেষ সীমানায় পলাশির কাছে অবস্থিত 'তেজনগর শ্মশান'ঘাট। এই ঘাট সংলগ্ন গঙ্গা পার হলেই মুর্শিদাবাদ পড়ে যায়। বর্তমানে এই শ্মশানঘাট পলাশি ২নং পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। শ্মশানের পাড়েই গড়ে উঠেছে অনেক দোকান-দানি। বাস যাত্রী প্রতীক্ষালয়। মন্দির, গোরস্থান ও কিছু ধীবরদের বাসভূমি। এই শ্মশানে মানুষ শবদাহ করতে আসে বহু দূর-দূরান্ত থেকে। আবার এখানেই আছে খেয়াঘাট। কবি জসীমউদ্দীন-এর ভাষায়—

"বিনি সুতী মালা গাঁথিছে নিতুই এপার ওপার দিয়া
বাঁকা ফাঁদা পেতে টানিয়া আনিছে দুইটি তটের হিয়া।"

যেন মুর্শিদাবাদের সঙ্গে নদিয়ার সেতুবন্ধন স্থাপিত করে দিয়েছে। এই ঘাটে শবদাহ করতে আসে নদিয়ার ১৭টি পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ও মুর্শিদাবাদের ৩টি পঞ্চায়েত থেকে। যে সমস্ত জায়গা থেকে মানুষ দাহ করতে আসে সেগুলি হল—পলাশি, পলাশিপাড়া, মীরাবাজার, তেজনগর, ছোট নলদা, বড় নলদা, করিমপুর, বেতাই, সেজুয়া, মুলান্দি, দেবগ্রাম পাগলাচণ্ডী, জামালপুর, নাজিরপুর, তেহট্ট, হরিপুর চাঁদের হাট, সাহেবনগর, ধরমপুর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর, ডাকাতিপোঁতা, কালীগঞ্জ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার রামনগর, সুজাপুর, কাদখালি, বাছড়া, সোমপাড়া, বিদুপাড়া, মহৎপুর, রেজিনগর, কাশীপুর, আন্দুলবেড়িয়া তেঘরি ও নাজিরপুর প্রভৃতি জায়গার মানুষজন।

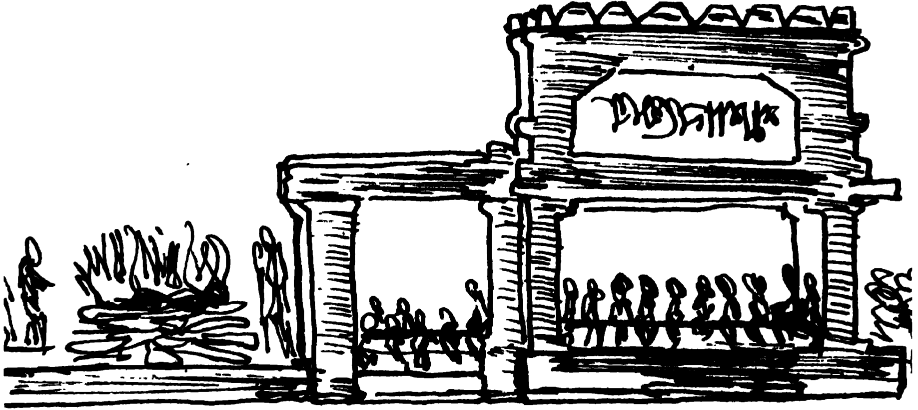
১৯৮৯ সালের আগে পর্যন্ত এই শ্মশানঘাটের কোনো উন্নতি ছিল না বললেই চলে। তখন যারা দাহ করতে আসত তাদের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। ১৯৮৯ সালে এই এলাকার মানুষ দলবদ্ধ হয়ে 'তেজনগর শ্মশান উন্নয়ন কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি বর্তমান সম্পাদক অনুপম মণ্ডলের কথায়—'এখানে প্রতিদিন গড়ে পাঁচটি করে শবদাহ হয়। এখানকার চিতা একরকম নেভে না বললেই চলে। এবং নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ মিলিয়ে ২০টি অঞ্চলের লোক এখানে আসে।' বর্তমানে এই শ্মশান কমিটি ঘাটের অনেক উন্নতি করেছে। যেমন—মহিলাদের কাপড় ছাড়ার নিবাস, শৌচাগার, রাত্রে থাকার আবাস, সর্বোপরি মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। এই শ্মশানঘাটকে কেন্দ্র করে শ্মশানের পাশেই নির্মিত হয়েছে শ্মশানকালী মন্দির। এই শ্মশানকালীকে ঘিরে রয়েছে নানান রূপকথা। এই শ্মশানভূমি আগে বনজঙ্গলে ভর্তি ছিল এবং সেখানে সতত সঞ্চবমান থাকত বাঘ, শিয়াল, বানর, ভোঁদড়, বন-বিড়াল প্রভৃতি জন্তুজানোয়ার। সেখানে ছিল ঝাউবন, বনকুল, বৈঁচিগাছ, শটিবন, ফণিমনসা ও শেওড়াগাছ। এই গহীন জঙ্গলে সূর্যের আলো প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য ছিল। বর্তমানে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে সবের চিহ্ন লেশমাত্র নেই। বহুদিন আগে মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে হ্যারিকেন ও হ্যাঁজাক নিয়ে সৎকার করতে আসত। এবং মাঝে মাঝে গঙ্গাযাত্রীদের সমস্ত কিছু মেরে ধরে কেড়ে নিত ডাকাতেরা। কিন্তু বর্তমানে মানুষ এখানে নিরাপদে আসতে পারে। এই তেজনগর শ্মশানঘাটে চারটি ঝিল আছে। এই কমিটি ঘাটে বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা করেছে। এবং একটি ছোট্ট বাজার বসেছে। তাছাড়াও শ্মশান উন্নয়ন কমিটির সৌজন্যে বাসস্ট্যান্ড নির্মিত হয়েছে। এই উন্নয়ন কমিটি তেজনগর খেয়াঘাট থেকে বর্ধমান জেলার কাটোয়া ঘাটে যাবার ব্যবস্থা নৌকায় করেছে। প্রতিদিন সকাল ৬.২০ মিনিট ও ৮.২০ মিনিটে যাত্রী নিয়ে কাটোয়ার দিকে নৌকা যায়। আবার ফিরে আসে সূর্যাস্তের আগে। এই শ্মশানঘাটে যারা দূর থেকে গঙ্গা দিতে আসে তারা সবাই ট্রাক কিংবা টেম্পো বা ট্রেকারে করে আসে। এবং উন্নয়ন কমিটিকে কিছু সাহায্য করতে হয় ওই ঘাটে মড়া পোড়াবার জন্য। ওই দানের টাকা থেকেই শ্মশানের পাশে একটি কালীমন্দির করা হয়েছে, মন্দিরের খরচও উন্নয়ন কমিটি বহন করে। এই শ্মশানকে কেন্দ্র করে জ্যৈষ্ঠ মাসে উৎসবের সূচনা হয়েছে। তাছাড়া প্রতি অমাবস্যায় কালীর পুজো হয়। পৌষ সংক্রান্তির মেলা হয় এবং এই শ্মশানের ঘাটে বহু স্নানযাত্রী আসে।

তেজনগর শ্মশান মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৯ তারিখে পুজো আরম্ভ

হয় এবং এই পুজো তিনদিন ধরে চলে। সেই সময় এখানে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। তখন এখানে কীর্তন হয় ও কবিগানের আসর জমে ওঠে। ওই তিনদিনই নরনারায়ণ সেবা করা হয়। প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ 'মচ্ছপ' খেয়ে যায়। তাছাড়া শ্মশান উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে প্রতি অমাবস্যায় প্রায় দুইশত বালকভোজন করানো হয়। এতদঞ্চলের মানুষের কাছে নাকি এই শ্মশানকালী খুবই জাগ্রত দেবতা। তাই দলে দলে ভক্তের ভিড় হয় খুব। এবং কিছু ধর্মভীরু মানুষ তাদের মনষ্কাম পূরণের জন্য আসে। এখানে পুজোতে প্রায় প্রতি বছর ৩০-৩৫টি বলি হয়। শোনা যায় যে বহুদিন আগে এই কালীকে নররক্ত পান করতে দিতে হবে। এই শ্মশানঘাটেই বংশ পরম্পরা কাজ করে চলেছে ভারতী ডোম বা ভারতী গঙ্গাপুত্র। তাঁর কথায়—'তাঁর বাবা ছিলেন পূর্ণ ডোম, আমার কোনো ভাই নেই তাই আমি এসব কাজ করি।' তাঁর পিতামহ-প্রপিতামহ এই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এলাকার মানুষেরা 'ভারতীকে ভারতী গঙ্গাপুত্র' বলে ডাকে। এই ঘাটের পাশেই গড়ে উঠেছে কবরস্থান বা গোরস্থান, যেন মিলনমেলা গড়ে উঠেছে। পলাশি ২নং অঞ্চলে অবস্থিত পলাশি সুগার মিল। কিন্তু দীর্ঘদিন সুগার মিল বন্ধ থাকার সুবাদে ১৮৮৯ সালে খৈতান কোম্পানি যখন এই কারখানাটি লিজ নেয় তখন এই তেজনগরে নাম পরিবর্তন করে খৈতান নগর করতে চেয়েছিল। কিন্তু এলাকার মানুষের প্রবল চাপে পলাশি খৈতান নগর-এর নাম পরিবর্তন হয়নি।

তেজনগরের শ্মশানঘাটের কালীমন্দিরের কিছু অলৌকিক কাহিনি শোনা যায়। আজ থেকে প্রায় বিরাশি তিরাশি বছর আগে এক সাধু শ্মশানের নিকটে বসবাস করতেন এবং তিনি প্রতিদিন রাত্রিবেলায় শ্মশানে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এবং মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি শ্মশানে কালীপুজোর প্রচলন করেন। একদিন রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকার ভেদ করে স্বপ্নের মতো করুণ কান্না ভেসে এল এবং তিনি গভীর জঙ্গল ভেদ করে কান্নার শব্দকে অনুসরণ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন। তারপর দিন সকালবেলায় সেই শ্মশানের পাশে একটি মৃতদেহ দেখতে পেলেন। আবার শোনা যায় দাহ করার পর কোনো পরিবারের মানুষ যদি বৈতরণী পারের কড়ি না দিয়ে আসে, মায়ের প্রণামী না দেয় তাহলে সেই পরিবারের অমঙ্গল হবে। একবার পলাশিপাড়ার এক পরিবার রাত্রে দাহ করে বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখেন তাদের বাড়ির একমাত্র মেয়ে কলেরায় মারা গেছে। সেই জন্য বর্তমানে সবাই মায়ের প্রণামী দিয়ে যায়। আবার আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে এক ভণ্ড সাধু এই শ্মশানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে নেপালের পরেশনাথ মন্দিরের সন্ন্যাসী বলে পরিচয় দিতেন। তাঁর নাম ছিল ভূতানন্দ স্বামী। এই এলাকায় তিনি ঝাড়-ফুঁক করতেন এবং কিছু গাছ-গাছালির ওষুধ দিতেন—যেমন বাত, হাঁপানি, রক্তস্রাব, বন্ধ্যাত্বকরণ, সংসারে শান্তি এবং শত্রু বিনাশ করার জন্য। একবার করিমপুর থেকে এক বিধবা রমণী তাঁর একমাত্র মূক ও বধির শিশুকে নিয়ে এসেছিলেন এই সাধুর কাছে। সাধু ছেলেটিকে দেখে বললেন, সেরে যাবে এবং মা তোমাকে এখানে এক রাত্রি এখানে থাকতে হবে। সেই দিন রাতের বেলায় ওই সন্ন্যাসী ছেলেটিকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে গরম রডের ছ্যাঁকা দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন এবং ওই বিধবা

রমণীর উপরে শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। তারপর দিন ঘটনাটি জানাজানি হবার পর গ্রামের লোক জড়ো হয়ে মারধোর করে সন্ন্যাসীকে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে অদ্যাবধি তেজনগরের শ্মশানঘাটে কোনো সাধু-সন্তদের ভিড় নেই। আবহমান কাল ধরে চলে আসা এই শ্মশান তুষের আগুনের মতো ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে। একে কঠিন শ্রাবণের ধারা যেমন সিক্ত করতে পারে না, তেমনি চৈত্র-বৈশাখের কঠিন দাহদাহ শুষ্ক করতে পারে না। এ যেন এলাকার মানুষের কাছে বিষাদ ঘন সুখ-দুঃখের নিরাসক্ত তপস্বিনী।



❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক।

শ্মশান : মহাশ্মশান উদ্ধারণপুর

পাঁচুগোপাল বক্সি

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

— সাংখ্যযোগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই রকম আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর পরিগ্রহ করে। নিষ্প্রাণ নশ্বর মানবদেহ সমাধি বা কবরে মাটির সঙ্গে মিশে যায় বা চিতার আগুনে ছাই হয়ে যায় বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের অঙ্গব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা (anatomy) শিক্ষার জন্যে সংরক্ষিত হয় অথবা পশুপাখিদের খাদ্য হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ঘটনা বা গুম হওয়ার কারণে অনেক শব উদ্ধার ও সৎকার হয় না; বেওয়ারিশ অনেক লাশ যায় হারিয়ে।

তৎসম 'শ্মশান' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, শ্ম বা মৃতদেহ শয়ান বা শায়িত করার স্থান। ব্যাপ্তার্থে, শবদাহস্থান। বহ্নিমান চিতা নেভানো বা শববাহক ও শবানুগমনকারীদের স্নানের জন্য জলের প্রয়োজন হয়। তাই সাধারণত নদী কাঁদর বা পুকুরের ধারে লোকালয় থেকে একটু দূরে শ্মশানের জন্য স্থান নির্বাচিত হয়। শ্মশানের নির্দিষ্ট স্থান ছাড়াও চিতা সাজানো হয় অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে যেমন, অসম্মান এড়াবার জন্য জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রাজপুত রমণীদের জহরব্রত পালন বা দুর্ঘটনাস্থলে গণসৎকারের সময়। বহিরঙ্গ বিচারে শ্মশান দুধরনের—১. শহরাঞ্চলে পৌরসভা পরিচালিত ও ছাদযুক্ত চাতালে বা মেঝেয় একাধিক চিতা সম্বলিত শ্মশান। অর্থের বিনিময়ে এখানে কয়লা বা কাঠ মেলে। অনেক শহরে শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপিত হয়েছে। সাঁই, ট্রাক, ট্রেকার, ভ্যান প্রভৃতি শববহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। দুর্ঘটনায় দলাপাকানো বা পচাগলা লাশ একটা বাঁশে বেঁধে আনা হয় শ্মশানে। ২. গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শ্মশান খোলা আকাশের নিচে, আচ্ছাদনবিহীন। চণ্ডালহীন। মৃতজনের পরিবারকেই চিতার কাঠ বা কয়লা নিয়ে যেতে হয়। নিজেদেরকে সৎকার করতে হয়। অবশ্য, অন্তরঙ্গে জগতের সব শ্মশান এক— একাধারে কঠোর কোমল, নির্মম ও উদার। চিতার লেলিহান শিখায় ছাই হয়ে যায় রূপের গুমর, ধনের অহংকার, গুণের অভিমান, মানের বড়াই। অন্যদিকে নানা দেশের নানা নদ-নদীর জল যেমন মেশে সাগেরর বুকে তেমনি শ্মশানের পবিত্র অঙ্গনে ব্রাহ্মণ-কায়েত-কুর্মী, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খে কোনো ভেদ নেই—'মৃত্যু-মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।' ভবলীলা সাঙ্গ হলে মায়াপ্রপঞ্চময় সংসার ছেড়ে সীমার বাঁধন ছিঁড়ে এখানে সবাই ঘরমুখো; লর্ড টেনিসনের ভাষায় :

When that which drew from out the boundless deep
Turns again home.

দার্শনিক দৃষ্টিতে শ্মশান হল সীমা ও অসীমের মিলনসেতু। শবসাধক তান্ত্রিক। গরমিলে মেলানো সহজ বাউল। সর্বভূক আগুনের আলোয় মন উদাস হয়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে জীবনের অনিত্যতা, মিথ্যা মনে হয় সাজানো ঘর, সব সঞ্চয়। যেসব শ্মশানে মন্দির বা গাছতলায় বেদি আছে সেখানে দেখা যায় আরাধ্য দেবী কালী—'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা'। পলকা দেহপটের লয়ের ভেতর দিয়ে মুক্তির বরাভয় দেন তিনি শরণাগতকে!

তবু জগতের সব বিচ্ছেদবেদনাময় বিষণ্ন, প্রিয়জনের শোকে বুকফাটা আর্তনাদে মুখর। 'যেতে নাহি দিব' বলে-ও যেতে দিতে হয়, 'নৈনং দহতি পাবকঃ' বা আত্মা আগুনে দগ্ধ হয় না জেনেও অবুঝের দল আছড়ে পড়ে প্রিয়জনের হিমশীতল দেহের ওপর; সাধ্য কার ওদের বোঝায় :

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।। (রবীন্দ্রনাথ)

কত শাঁখা-সিঁদুরের স্মৃতি, দেয়ালা-করা শিশুর গায়ের গন্ধ মাখা শ্মশান হয়তো সব শোক-তাপ বুকে ধরে পাষাণ নয়তো সব জ্বালা পুড়িয়ে জুড়িয়ে প্রশান্ত!

আজকাল শহরাঞ্চলে তো বটেই গ্রামাঞ্চলের শ্মশানে দু'চারটে কুকুরের দেখা মিললেও শিবাদের হুক্কাহুয়া শোনা যায় না। দুঃখ-ক্লান্তি ভোলার ছুতোয় শবানুগমনকারীদের কেউ কেউ বোতলবন্দী হয়। নিমতলা, কেওড়াতলা, মনিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ প্রভৃতি মহাশ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে চল কালস্রোতে কান পাতলে শোনা যায় হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার মিলন বা রোহিতাশ্বের পুনর্জীবনের পুরাকথা; ভাওয়ালের সন্ন্যাসী রাজার বা বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্রের নবজীবন লাভের রোমাঞ্চকর কাহিনি। শ্মশান সকলের সবকিছু হয়তো কাড়ে না, নিতে পারে না।

কলুষনাশিনী জাহ্নবীর দুই তীরে অজস্র শ্মশান, দিনরাত সারা বছর চিতা বহ্নিমান। সেগুলির অন্যতম উদ্ধারণপুরের ঘাট। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানায় উদ্ধারণপুর পল্লীতে একেবারে গঙ্গাতীরে অবস্থিত এই মহাশ্মশান। কাটোয়া শহরের প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এই স্থানে শ্রীচৈতন্য পার্ষদ, প্রভু নিত্যানন্দর প্রিয়পাত্র সপ্তগ্রামনিবাসী নৈহাটির নৈরাজার দেওয়ান তথা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম উদ্ধারণ দত্ত, যাঁর গৃহী নাম ছিল দিবাকর দত্ত, বাস করতেন। তাঁর নামানুসারেই এই গ্রামের নামকরণ হতে পারে। অবশ্য, সংস্কৃত উদ্‌ধারন শব্দটির অর্থ চুল্লী এবং এই শব্দটি থেকেও এই শ্মশানভূমির নামকরণ হতে পারে। অথবা এখানে চিতার আগুনে মানবাত্মা উদ্ধার বা মুক্তি লাভ করে বলে জায়গাটির নাম হয়েছে উদ্ধারণপুর। ষোড়শ শতকে নির্মিত কালাগ্নিরুদ্রদেবের মূর্তি রয়েছে এখানে। ভাগিরথীর বাঁধানো ঘাটের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধক উদ্ধারণ দত্তের বিগ্রহ। উত্তরাস্তিতে এখানে বিরাট মেলা বসে। এখানকার চৈত্র গাজনও বিখ্যাত। এখানে গৌরাঙ্গমন্দির এংব অদূরে এনায়েৎপুরে কালীবাড়ি দর্শনীয়। গ্রামের

ঘরবাড়ি দোকানপাট বামে রেখে ভাগিরথীর পশ্চিম তীর ধরে উত্তর মুখে কয়েক পা গেলেই চোখে পড়বে শ্মশানকালীর চালাঘর। সেটিকে বামে রেখে একটু নিচে নামতেই চোখে পড়বে উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশান। পূর্বদিকে নিত্য প্রবাহিনী কলুষনাশিনী গঙ্গা আর বাকি তিনদিকে গাছপালার আড়ালে কয়েকটা বাড়ি।

বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট থানা ছাড়াও বীরভূম জেলার প্রায় সব হিন্দু শবের সৎকার হয় উদ্ধারণপুর শ্মশানে। পুণ্যতোয়া গঙ্গায় অস্থিদান ও স্নান করে শববাহকরা. মৃতের আত্মীয় স্বজনরা পরিতৃপ্তি লাভ করেন। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে এ জায়গাটা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ নিরিবিলি। স্থায়ী লোকবসতি বা গৃহীর সংসার ছিল না শ্মশানের কাছাকাছি। দিনে কুকুর শকুনের চিৎকার, রাতে শিয়ালের হুক্কাহুয়া। আলো-ছায়ায় নির্জনতায় সে ছিল এক ভয়াল ভৌতিক গা-ছমছমে পরিবেশ! মর্মর ও গঙ্গার খেয়ালী কলতানে তা আরও রহস্যময় হয়ে উঠত। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের ও দেশভাগের পরে পশ্চিমবাংলার বহু শহর-গঞ্জের মতো এখানেও শয়ে শয়ে উদ্বাস্তু আগমন ও বসতি স্থাপনের ফলে উদ্ধারণপুরের আগেকার সেই রোমাঞ্চকর রহস্যময়তা আর নেই; নেই পঞ্চমুন্ডী আসনে বা মড়ার কাঁথার পাহাড়ে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন ভয়ঙ্কর দর্শন তান্ত্রিকসাধক। তবে এখনও দিনে ও রাতে দু'তিন ঘন্টা অন্তর 'বল হরি, হরি বোল' পিলে চমকানিয়া চিৎকার অব্যাহত। প্রিয়জন বিয়োগের শোকে কাতর স্বজনদের অশ্রুভেজা হাহাকারে আজও বাতাস ভারি হয়। অনেকেই বিরহবেদনায় পাথর হয়ে উদ্ধারণপুরের গঙ্গাঘাটের সিঁড়িতে ঠায় বসে অপলক দৃষ্টি মেলে ধরে বহতা জলস্রোতে; কান পেতে শোনে নদীর কথা : 'আমরা যথা হইতে আসিয়াছি তথায় ফিরিয়া যাই।' শোনে নদীর দুঃখ হরণের, মরণ জয়ের গান : আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ...

কারা এই সমুখ দিয়ে আসে যায় খবর নিয়ে
খুশি রই আপন মনে, বাতাস বহে সুমন্দ।।

উদ্ধারণপুরে সতত চিতা বহ্নিমান। গঙ্গাতীরে উত্তর থেকে দক্ষিণে এক রেখায় সমদূরত্বে পরপর তিনখানি চিতা। প্রায় চার ফুট উঁচু, পাঁচ ফুট লম্বা এবং দশ ইঞ্চি চওড়া সমান্তরাল দুই পাঁচিলের মাঝে ব্যবধান ফুট দেড়েক। জমি থেকে এক ফুট ওপরে চুল্লির ভেতর সমদূরত্বে আট দশটি লোহার শিক পাতা পূর্ব-পশ্চিমের দুই দেয়ালের মাঝখানে। তিনটি চুল্লি আকৃতি-প্রকৃতিতে এক— আয়তকার, উত্তর-দক্ষিণ দু'মুখ খোলা এবং কয়লাভুক। গ্রামে ফাল্গুন চৈত্র মাসে শালে আখের রস ফুটিয়ে গুড় করার জন্যে তৈরি জোলের মতো দেখতে এই চুলোগুলো। কাঠের দাম গরিব মধ্যবিত্তদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় শবদাহে কয়লাই ভরসা। তিনটে চিতাই খোলা আকাশের নিচে। ইতিমধ্যে তিনদিকে পাঁচিল তুলে এই মহাশ্মশানের ওপর আচ্ছাদনের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। পার্শ্ববর্তী ছোট্ট জীর্ণ একখানি ঘরে বৃষ্টির সময় শবদাহ করা হয়। ঘরটির

মেঝের এক কোণে ডাঁই করে রাখা মৃতদেহের সঙ্গে আনা লেপ-তোশক বালিশ প্রভৃতি। সাঙাতে ঝুলছে কাঁথা চাদর মাদুর ইত্যাদি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রের আমলের দশাশ্বমেধ ঘাটের শ্মশানের সঙ্গে উদ্ধারণপুরের ঘাটের শ্মশানের প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই :

শ্মশানং ঘোরসং নাদং শিবাশত সমাকুলম্।
শবমৌলি সমাকীর্ণং দুর্গন্ধং বহুধূমকম্।।

আগে দূরবর্তী গ্রাম থেকে গরিব লোকেরা শববাহকের সংখ্যা কমিয়ে খরচ বাঁচানোর জন্যে চাদর বা মাদুর বা তালাই জড়ানো মড়া একটা বাঁশের মাঝখানে বেঁধে নিয়ে আসত উদ্ধারণপুরে। পল্লীবাংলার অশিক্ষিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মহিলাদের মুখে প্রায়শই উচ্চারিত 'বাঁশবুকো ঘাটেপোড়া' গালির উৎস হল এই এক টুকরো বাঁশে ঝোলানো শববহনের রীতিটি। অবশ্য সাধারণতঃ আট দশ ফুট দুটো বাঁশ আড়াই তিন ফুট ব্যবধানে সমান্তরাল রেখে আট দশ ইঞ্চি অন্তর বাঁশ বা কাবারির টুকরো আড়াআড়ি নারকেল দড়ি বা বাবুই দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে খাটুলি বা সাঁই তৈর করে তার ওপর সতরঞ্চ, মাদুর তোশক প্রভৃতি পেতে মৃতদেহ চিৎ করে শুইয়ে সাদা কাপড়ে সেটি ঢেকে শ্মশানে আনা হয়। ধনীদের কোন কোনো শব আসে তাঁদের ব্যবহৃত খাটে বা বাজার থেকে কেনা তক্তায় শুয়ে। আজকাল ট্রাকে ট্যাকটরে মৃতদেহ চাপিয়ে আনা হচ্ছে বহু দূরবর্তী শহর, গ্রাম থেকে। আগে সিউড়ি সাঁইথিয়া তথা আশি-একশ কিলোমিটার দূরবর্তী স্থান থেকে আগত শববাহকদের সঙ্গে থাকত চার পাঁচ দিন চলার মতো ছাতু, চিঁড়ে, মুড়ি, গুড়, চাল-ডাল-লবণ, তেল, কাঠ-হাঁড়ি কড়াই—চলমান সংসার! সাধারণত শববাহকের সংখ্যা থাকে আট-দশজন; সঙ্গে জ্ঞাতি আত্মীয় কয়েকজন। অবস্থাপন্ন বা প্রভাবশালী ব্যক্তির পরিবারের শব শ্মশানে আনার সময় কয়েক শ' থেকে হাজার হাজার মানুষ শোকযাত্রায় সামিল হয়। ধূপ ও আতরের সুগন্ধে, ঘন ঘন হরিধ্বনিতে এবং খই পয়সা ছিটানো-কুড়োনোয় বাতাস চঞ্চল হয়ে ওঠে।

অনেক শিল্পী সাহিত্যিক সমাজসেবী তথা বড়ো মাপের মানুষের শেষ শয্যা রচিত হয়েছে উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশানে। শোনা যায়, 'বাংলা সাহিত্যে অভিনব' উপন্যাস 'কল্পতরু', উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গকাব্য 'ভারত উদ্ধার' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক অভ্যর্থিত 'পাঁচু ঠাকুর' বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯১১খ্রি:) মূল্যবান বেনারসী পরিহিতা সালংকারা সহধর্মিণীকে চন্দনকাঠের চিতায় সৎকারের দৃশ্য দেখতে কাঙালির মা অভাগীর মতো এই অঞ্চলের দশখানা গাঁয়ের হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছিল উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানে। বড় বিচিত্র স্থান এই শ্মশান! কঙ্কালসার নিঃস্ব প্রজার চিতার আগুন নিভতে না নিভতেই সেই একই চিতায় শায়িত হন তার হৃদয়হীন জমিদার, উৎপীড়ক মহাজন, প্রবঞ্চক সমাজপতি—চিতাভস্মে সবাই সমান! এখানে জাত-বর্ণ-লিঙ্গভেদ নেই। লাভ-ক্ষতির হিসেব নেই। কানাকড়ি নিয়ে টানাটানি নেই। হরি বোলে সাঙ্গ হয় কাঁদা-হাসা।

দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-সন্ত্রাস-সার্বিক অবক্ষয় বা মনুষ্যত্বের অবমাননায় বিষণ্ণ বিক্ষুব্ধ সংবেদনশীল ব্যক্তিরা জীবনানন্দের মতো বলেন :

আমার মনের চিতানলে জ্বলে লুটায়ে যেতেছে ছাই।
আমার চোখের অশ্রুপুঞ্জে লভিয়াছে তারা ঠাঁই!

তাঁরা দিশেহারা রক্তাক্ত বর্তমানের শ্বাসরোধী পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে ব্যগ্র— 'মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো,—প্রিয়ার মতন।' তাঁরা জানেন মৃত্যুর অনিবার্যতা :

"সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।"

অথবা, 'ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে...'

তবু, যেহেতু রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ; তার হৃদয় আছে, মমতা আছে তাই শোকে-ক্ষোভে মৃত্যুকে স্বাগত জানাতে গিয়েও পিছুটানে থমকে দাঁড়ায়; অসহায় কাতর দৃষ্টিতে তাকায় মমতামাখা সংসার-সন্তান-স্বজনদের পানে; শেষবারের মতো জন্মভূমির, ধরিত্রীর মুখখানি এঁকে নেয় অবসন্ন চেতনায় :

"বাঁধিলাম ঘর ওই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে,
ভাসানের গান শুনে কতবার ফাঁকা হ'ল খড় আর ঘর।"

সেদিন (১০।১০।২০০৩) এই কথাগুলোই ভাবছিলাম উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানে সকালের নরম রোদে দাঁড়িয়ে। শ্মশানের জ্বলন্ত চিতা, পাশেই প্রায় আধকিলোমিটার চওড়া উত্তাল ছুটন্ত গঙ্গা। এমন পরিবেশ মানুষকে উদাস দার্শনিক করে তোলে।

সেদিন দেখা গেল, একটি চিতায় তোলা হল বীরভূমের নানুর থানার জুবুটিয়া গ্রামের আশি বছর বয়স্ক বিমলাপতি মিত্রের মৃতদেহ। আর একটি চিতায় শায়িতা হলেন ঐ জেলারই লাভপুর থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামের বিমলা মণ্ডল।

জায়গাটাকে আরও ভালোভাবে জানা তথা ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজনে পরদিন সকালে যেতে হল উদ্ধারণপুর। একনাগাড়ে পাঁচ ছ দিন মুষলধারে বৃষ্টির কারণে মালদহ, মুর্শিদাবাদের অঞ্চল বিশেষ প্লাবিত হওয়ায় এবং ঘাটের সিঁড়িগুলো একে একে ঘোলাজলে ডুবতে থাকায় উদ্ধারণপুরের অধিবাসীদের চোখমুখে উদ্বেগের ছায়া ঘনিয়েছে। প্রায় গঙ্গাগর্ভে এদের বাস। কৃষি বা ছোটোখাটো ব্যবসা এদের জীবিকা। রাজনীতি বা প্রকৃতি বার বার এদের ঘর ভাঙে।

আগের দিনের মতো এদিনও (১১।১০।০৩) ঝকঝকে আকাশ। গঙ্গার পূর্বপাড়ে নদীয়ার বল্লভপাড়ায় দীর্ঘ কাশবনের মাথায় কাশরঙা হাল্কা মেঘের ভেলা ভাসছে শরতের নীলাকাশে। উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশানের খিদে মেটে না, পেট যেন ভরতেই চায় না; দিনরাত চেঁচায় : সব দে, শব দে। আজ তার জঠরানলে জ্বলছেন বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার কুমোরপুরের জয়াবতী

হাজরা। বিনোদ হাজরার সত্তর বছর বয়স্কা মা।

চুল্লিতে অগ্নিসংযোগ মাত্র গলগল করে ধোঁয়া বের হয়। হাওয়ায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধেয়ে যায় পাশের গাছপালা, বনের দিকে কখনো বা গঙ্গার ওপর দিয়ে ডানা মেলে বলাকার মতো। এই সেই গঙ্গা যার ওপর ভাসমান নৌকা থেকে বারণসীর শ্মশানে চিতায় শায়িত শবদাহের দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠে বিজ্ঞানী সাহিত্যিক অলডাস হাক্সলে (Aldous Huxley) বলেছিলেন "Gruesomely and grotesquely, their bare feet projected like the feet of those who sleep uneasily on a bed too short and under exiguous blankets." উদ্ধারণপুরের শ্মশানের গা ঘেঁষে গঙ্গায় পাল তোলা নৌকা, ভটভটি বা ডিঙির যাত্রীরা যাতায়াতের সময় হামেশাই মড়া পুড়তে দেখেন, ধোঁয়ার উৎকট গন্ধ তাঁদের নাকে লাগে। আশৈশব এসব অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁদের কাছে শবদাহের দৃশ্য বীভৎস ভীতিপ্রদ বা অতিপ্রাকৃত বলে মনে হয় না। বরং অনেকেই মৃত/মৃতার আত্মার প্রতি দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানে শব সৎকারে সাহায্যকারী 'চন্ডাল' বা স্থানীয় ভাষায় 'পাটুলি' (পাটনি - পাটুলি ?) তিন জন —দুখিয়া গঙ্গাপুত্র, রাজু ঘোষ (বিহার থেকে আগত) এবং সুকুমার থান্ডার। এদের প্রত্যেকের সাত দিন করে পালি পড়ে। বাবা তারাপদ দীর্ঘকাল পাটুলির কাজ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে করে মারা যাওয়ার পর তাঁর পুত্র দুখিয়া বাবার পেশাই বেছে নিয়েছে। দুখিয়ার যুবতী স্ত্রী লক্ষ্মী তিন সন্তানের মা। নিজের ঘরে উনুনে ব্যবহার করার জন্যে ডুরে শাড়ি-পরা লক্ষ্মী চিতার পাশে বসে আধপোড়া কয়লার টুকরোগুলো বেছে জড় করছিল। দুখিয়া-লক্ষ্মী দুজনেই বেশ সরল সুশ্রী। ম্লান হেসে তারা তাদের বারমাস্যার ঝাঁপি খুলে বসল আমার সম্মুখে। মড়া নিয়ে যারা আসে তাদের বদান্যতায় এদের সংসার চলে। ছোট্ট চালাঘরে দুঃসহ দারিদ্র্য, সংসারে সংবৎসর অভাব। অভাব নেই শুধু তৃপ্তির, শান্তির। যে দুখিয়ার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা তার আবার দুখ কীসের!

উদ্ধারণপুরের শ্মশানে যাওয়ার পথটি যেখানে গঙ্গার ঘাটের মাথায় বাঁক নিচ্ছে সেখান থেকে নির্মীয়মান শ্মশানঘর পর্যন্ত খুব সঙ্কীর্ণ। শ্মশানবন্ধু তথা শববাহক ও শবানুগমনকারীদের রোদবৃষ্টির কবল থেকে মাথা বাঁচানোর মতো কোন আশ্রয়ও চোখে পড়ল না। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সদাব্যস্ত শ্মশান চত্বরে বিদ্যুৎ নেই; নেই গঙ্গা তথা পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের স্বার্থে কোনো বৈদ্যুতিক চুল্লি। স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের আশু কর্তব্য এই সমস্যাগুলির সমাধানে তৎপর হওয়া। গঙ্গার পাড়-ভাঙা ভালভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না হলে শ্মশানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে গেল। সূর্য পাটে বসেছে। অশ্বত্থ কাঁঠাল গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য আবির ছড়াচ্ছে বানভাসি গঙ্গার জলে। একটা নিভু নিভু চিতা থেকে ধূপের ধোঁয়ার মতো সরু ধোঁয়ার সর্পিল রেখা এলোমেলো হাওয়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। এমন সময় ঘাটের মাথায় দোকানগুলোর সামনে দাঁড়াল একটা ট্রাক। অনুচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'বল হরি, হরি বোল'।

কয়েকজন গাড়ির ডালা খুলে ঝটপট লাফিয়ে নামলেন। নামানো হল শব। এ কি! সাদা ধপধপে চাদরের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক অষ্টাদশী সুন্দরীর শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো মুখখানি। Forget me not ফুলের পাপড়ি ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসিটি পড়ন্ত সূর্যের লালিমায় ব্যঞ্জনাময়, বাঙ্ময়। কলেরা না কালসাপ, ধনুষ্টঙ্কার না অত্যাচার—কী কারণে এ অকালমৃত্যুতা জানার ইচ্ছেটাও তখন অবসন্ন চেতনায় অস্তমিত। সাঁইথিয়ার শববাহকদের কাঁধে চেপে সীমন্তিনী যুবতী চলেছে বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি সব মিথ্যে করে আপন ঘরে! তার দাহদৃশ্য দেখার মতো মানসিক অবস্থা না থাকায় আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম চালাঘরে কালীমূর্তির সামনে—'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা'। তৃতীয় নয়নে মহাকালের ভ্রূকুটি, করাল দংষ্ট্রারেখায় রহস্যময় চাপা হাসি অথচ কি আশ্চর্য, লাল জিহ্বা, মুণ্ডুমালার পাশাপাশি স্বস্তিদায়ক বরাভয়মুদ্রা! মন্ত্রমুগ্ধের মতো করজোড়ে উচ্চারণ করলাম :

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে।।

চোখের জলে পিছল পথ ধরে বুকফাটা হাহাকারের স্তূপ ঠেলে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে উঠে বসলাম ভটভটিতে। অধিকাংশ আরোহীর গন্তব্যস্থল কাটোয়া; দু'একজন নামবে শাঁখাইয়ে। এ আর এক মনোরম স্থান। অজয়-গঙ্গার সঙ্গমস্থলে কর্মযোগী চিরযুবা ব্রহ্মানন্দ স্বামী (দুলালবাবা)-র আশ্রম। সম্প্রতি এই সাধনতীর্থটি ভারত সেবাশ্রম সংঘকে সম্প্রদান করা হয়েছে। ভটভটির ঐ এক দোষ! আলো নিভে আসা আকাশের নিচে ঘরে ফেরা পাখিদের মধুর আলাপন, দুপাড়ের গাছপালার ফাঁক দিয়ে গ্রামের আলো, জলের রংবদল বা সারাটা দিন কী দেখলাম কী শুনলাম সেগুলো আপন মনে একটু ঝালিয়ে নেওয়া—সব দুরমুশ করে দেয় যন্ত্রদানবের একঘেয়ে ভট-ভট গর্জন আর ডিজেল-কেরোসিনের কটু গন্ধ। শ্মশানের গা ঘেঁষে সশব্দে দিনরাত ধেয়ে চলা ভটভটি মানায় না। পূর্ব ধার দিয়ে ভেসে চলা পালতোলা একটা বড়সড় নৌকাপানে তাকিয়ে আছি এমন সময় কানে বাজল একতারার টিং টিং শব্দ। ঘুরে দেখি গলুইয়ের ওপর বসে এক প্রৌঢ় গান ধরেছে :

হরি নাম লিখে দিও অঙ্গে।
আনিও তুলসী দল যত্ন করে তুলে
তারি মালা গেঁথে পরাইও গলে
হরেকৃষ্ণ নাম দিও কর্ণমূলে
জাহ্নবীর কোলে নিয়ে যেও সঙ্গে।
হরিনাম লিখে দিও অঙ্গে।

গঙ্গার জল ঘোলা হলেও কাচ-কাচ ভাবটা রয়েছে। অজস্র কচুরিপানা পানকৌড়ির মতো ছুটে

চলেছে। ভটভটি জাহ্নবী ছেড়ে ঢুকল অজয়ের গৈরিক জলে। নদীর বাঁকে হারিয়ে গেছে সাঁঝের আঁধারে চিতার শিখা, ধোঁয়া।

'বশীকরণ', 'কালিতীর্থ কালীঘাট' প্রভৃতি একদা-জনপ্রিয় উপন্যাসের লেখক অবধূত 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসে বহুপ্রাচীন উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানের পটভূমিতে আবেগ লাবণ্যময় সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন জীবন-মৃত্যুর লীলা রহস্য, চিতার চারপাশে পাপ-পুণ্যের পাশা খেলা, মানব-মানবীর আদিম কাম-কামন-রিরংসা-ভণ্ডামি-ভ্রষ্টাচার-অনুতাপ-সন্তাপ ও মায়া-মমতার বিচিত্র ছবি। তান্ত্রিকের গাঢ় জীবনবোধ ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব সম্পর্কে লেখকের গভীর বোধির সুষম রসায়নে জারিত এই সাড়া-জাগানো উপাখ্যানের অংশবিশেষ উদ্ধার না করে পারি না :

"উদ্ধারণপুরের ঘাট। কান্না হাসির হাট। ছত্রিশ জাতের মহাসমন্বয় ক্ষেত্র। ... যত মড়া উদ্ধারণপুরের ঘাটে — এটা হচ্ছে ওদেশের একটা চলতি কথা। অবাঞ্ছিত কেউ এসে জ্বালাতে থাকলে বিরক্তি প্রকাশ করে এই কথাটা যখন তখন বলা হয়। ... কাঁথা মাদুর চট জড়ানো, বাঁশে ঝোলানো মড়া দশদিনের পথ পেরিয়ে আসে উদ্ধারণপুর ঘাটে পুড়তে। ...পতিতপাবনী মা গঙ্গ া কুল কুল করে বয়ে যায় কালো মাটি ধুয়ে নিয়ে। ঘাটের উত্তরদিকে আকন্দ গাছের জঙ্গলের পাশে উঁচু টিলার ওপর আমার দু'হাত পুরু গদি। সামনে চিতার পর চিতা সাজিয়ে তাঁর ওপর তুলে দিয়ে যায়—ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ি ছোকরা-ছুকরী যুবক-যুবতী। দমকা হাওয়া লেগে এক-একবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে চিতাগুলো। আবার ঝিমিয়ে পড়ে। শিয়ালেরা ছোঁক ছোঁক করে ঘুরতে থাকে। আগুনটা নিভে না এলে এগুতে সাহস পায় না ওরা। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটানে নামিয়ে আনে একটা মড়া। তারপর আর ওদেরকে পায়। ... বহুদিনের পুরানো শূন্যগর্ভ নরমুন্ড আর মোটা মোটা ফোঁপড়া হাড়ের শিঙায় ফুঁ দেয় বাতাস। নিশুতি রাতে শোনা যায় সেই শিঙাধ্বনি। শুনে শিহরণ জাগে চিতাভস্মের বুকে। জেগ ওঠে তারা, পাখনা মেলে উড়ে যায় বাতাসের সঙ্গে। শকুনরা পাখা ঝাপটে বিদায়-অভিনন্দন জানায়, আকাশের দিকে মুখ তুলে শিয়ালরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরে—"জয়যাত্রায় যাও গো"।... উদ্ধারণপুরের পূব সীমানা থেকে দিব্যলোকের দিব্যপথের শুরু। পশ্চিমের বড় সড়কের ওপর বসে গালে হাত দিয়ে জীবন কাঁদে। দিব্যপথে পা দেবার অধিকার নেই জীবনেব। তাই খন্তা ঘোষ সিধু কবরেজের দাওয়াইখানার সামনে জীবন-মচ্ছব দিচ্ছে। জীবনের মুখে হাসি ফোটাবে এই তার বাসনা। হারমোনিয়ম তবলার সঙ্গে নারীকণ্ঠে ভেসে আসছে ওখান থেকে— "শ্মশান ভালোবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।"

... এই উদ্ধারণপুরের ঘাট দিয়েই করেছে সবাই শেষ যাত্রা। সে যাত্রার এ-কূল ও-কূল দু-কূলই নেই। কিছুই সঙ্গে নিতে পারে নি। সব পড়ে আছে এ-কূলে। এমন কি প্রতি রাতের প্রতিটি প্রেম-অভিমান-বিরহ-মিলন সোহাগ-ভালোবাসা আর ছলা-কলা,—এই সমস্ত তিক্ত-মধুর লীলা খেলার জলজ্যান্ত সাক্ষী—লেপ কাঁথা তোষকগুলিকেও সঙ্গে নিতে পারে নি। রেখে গেছে আমার জন্যে

এই শয্যা, যে শয্যার সর্বাঙ্গে কিলবিল করছে কোটি কোটি জীবাণু, ক্ষুধার্ত আর বিষাক্ত কামের জীবাণুগোষ্ঠী! ... হি হিঁ করে হাসছে উদ্ধারণপুরের বাতাস। কাঁই কাঁই করে কাঁদছে উদ্ধারণপুর আকাশের দুই কালামুখী দেবী বাসনা আর বঞ্চনা। কড়-কড়-কড়াৎ করে দু'হাতের দশটা আঙ্গলের দশখানা ধারালো নখ দিয়ে চিরছে উদ্ধারণপুর রঙ্গমঞ্চের পর্দাখানা। উদ্ধারণপুরের উপসংহার। আর কোনও চালাকি চলবে না জাঁহাবাজ জাদুকরের।...''

ঝুমরি মেয়েদের সঙ্গে মাতাল কেঁধোদের ফষ্টিনষ্টি, আধপোড়া মড়া নিয়ে শিয়াল-কুকুরের টানটানি, শকুনের ডানা ঝাপটানি আজ আর নেই। বাড়ি-ঘর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে শ্মশানের ঘাড়ে। কেজো জগতের কোলাহলে হারিয়ে গেছে অতিপ্রাকৃত রহস্যময় আলো-আঁধারি পরিবেশ। তবে সেকালের মতো আজও রয়েছে বহ্নিমান চিতা, প্রহরে প্রহরে হরিধ্বনি; আছে অশ্রুধারা, ঘরভাঙার বেদনাবুকে ঘরগড়ার সাধ নিয়ে ঘরে ফেরা। গঙ্গার মতোই উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশানেও তন্দ্রাহারা :

বড় ভালোবাসি আমি ভ্রমিতে এস্থলে,—
তত্ত্বদীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি হাড়-মালা গলে;
গহন-কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি —
পত্রপুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীবরাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমনি। (শ্মশান, মধুসূদন দত্ত)

২৭০ পৃষ্ঠার শেষাংশ, *মারমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া* ...

শোক এবং আনন্দ, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার এ অপরূপ সম্মিলন—ক্রমে ক্রমে থেমে যায় এ উৎসব।

রাত্রে ক্যাঙে ধ্বনিত হয় বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি, ধম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণম্ গচ্ছামি।

পরদিন শ্মশান থেকে শবদাহ-কর্মিরা দেহভস্ম একটি 'ছাবাইকে' সংগ্রহ করেন এবং তা ছাবাইক সহ ক্যাঙে রাখা হয়। পরে শ্মশানের উপর গ্রামবাসীরা একটি ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরলোকগত সেই ভিক্ষুকে স্মরণ করে এ মন্দিরে ভক্তবৃন্দ পূজা-অর্চনা করেন।

* 'পূর্বাদ্রি' লোকধর্ম সংকলন—১৯৮৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত। সম্পাদনা : ইন্দুভূষণ অধিকারী

❑ লেখক পরিচিতি : ড. বক্সী, গবেষক, প্রাবন্ধিক।



উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাট ও গঙ্গা। ছবি : স্বপ্নেশ বক্সি।



গঙ্গাতীরে চিতার আধপোড়া কয়লা বাছছে লক্ষ্মী, পাশে দুখিয়া। ছবি : মঞ্জু বক্সি।

দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের শ্মশান ও তার রূপান্তর

ফণী পাল

স্বাধীনোত্তর কালে ভারতের স্বনির্ভরতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। তাই বয়সের নিরিখে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল নেহাতই অর্বাচীন। এখনও অর্ধ শতাব্দীর সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেনি। ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবান নগর-কুলে দুর্গাপুর শিল্প নগরী একান্তই নাবালক। তার উপর আধুনিক ও শিল্পনির্ভর হওয়ার কারণে ঐতিহ্যবান নগর-জীবন থেকে এ শহর সংস্কার ও সাংস্কৃতিক চরিত্রে কিছু ভিন্ন।

দেশের স্বাধীনতা লাভের পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির অন্যতম ফসল হল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। মাত্র এক/দুই দশকের মধ্যেই বর্ধমান জেলার জঙ্গলমহল রাঢ় ভূমিতে গড়ে তোলা হয়েছিল বহু ভারী-মাঝারি-ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা। গড়ে উঠেছিল ভারতের রূঢ় দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। নবগঠিত শিল্পে ভিড় করে এসেছে হাজার হাজার কর্মপ্রার্থী। শ্রমিক, দক্ষ-শ্রমিক-ইঞ্জিনিয়ার-প্রশাসক-ডাক্তার। এরা এসেছে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে। কর্মজীবনে এইসব বহিরাগত শ্রমজীবীরা একই অঞ্চলের কর্মী হয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও ব্যক্তিত্বে, মানসিকতায় ও সংস্কার-সংস্কৃতিতে এরা এক নয়। এরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে আনা নিজ নিজ সংস্কৃতির অনুপন্থী ও পৃষ্ঠপোষক। ফলে তাদের সম্মিলিত চাপে ও সংমিশ্রণে বর্তমান দুর্গাপুরে গড়ে উঠেছে এক মিশ্র সংস্কৃতি ও জীবনধারা। নবাগত অসংখ্য মানুষের চাপে চাপা পড়ে গেছে এখানকার ভূমিপুত্রদের কালাগত ও পুরুষানুক্রমিক সংস্কার, সংস্কৃতি আর আচরণীয় রীতিনীতি।

এই জঙ্গল মহল অঞ্চলের কয়েক ডজন গ্রাম জনপদকে হয় অধিগ্রহণ না হয় উচ্ছেদ-অপসারণ করে বর্তমান দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের প্রতিষ্ঠা হয়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেসব গ্রামের জলাশয়, পুকুর, দেবস্থান, শ্মশানভূমি। যে সব ভূমিজ জনপদকে ধ্বংস করে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হয় তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল প্রাচীন সংস্কার ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। ছিল মানবজীবনের অন্তিম সংস্কার ভূমি শ্মশান, গোরস্থান। প্রায় প্রতিটি গ্রাম-সংলগ্ন ছিল এক বা একাধিক শ্মশানক্ষেত্র। শিল্পায়নের চাপে আর বহিরাগত বিপুল সংখ্যক নাগরিক জনপদের চাপে তারা হয় বেশির ভাগ হারিয়ে গেছে, না হয় রূপান্তরতি হয়ে নতুন রূপ ধারণ করেছে। শিল্পায়নের আগে গ্রাম-সংলগ্ন নদী বা জলাশয়ের ধারে পরিত্যাক্ত ভূমিতে যে সব শ্মশানভূমি গড়ে উঠেছিল সে সব জনশূন্য, জঙ্গলাকীর্ণ বিজনভূমি মানুষের কাছে ছিল ভয়ংকর স্থান। সে সব শ্মশানভূমির অবস্থান, পরিবেশ, কিংবদন্তী ও ভৌতিক গল্পগাথা জনমানসে ভয়ংকর ও ভৌতিক বিশ্বাস সৃষ্টি করে রাখত। মৃতদেহের দাহ ও অন্তিম ক্রিয়াকর্ম করা ছাড়া পারতপক্ষে শ্মশানভূমিতে কেউ পা রাখত না। ফলে পুরাতন শ্মশানভূমিগুলি স্থানীয় মানুষের মনে আতঙ্ক,

ভয়-ভীতির সঙ্গে কৌতূহলও জাগিয়ে রাখত।

প্রাক-শিল্পায়ন দুর্গাপুর অঞ্চলে যে সব শ্মশানভূমি গড়ে উঠেছিল, আপাতদৃষ্টিতে, তা দেশের অন্যান্য শ্মশানভূমির মতো মনে হলেও বৈশিষ্ট্য ছিল। এ অঞ্চলের বেশিরভাগ শ্মশানভূমিতে বর্ণবৈষম্য সক্রিয় ছিল। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের শবদেহ দাহের জন্য নিজস্ব শ্মশানভূমি নির্দিষ্ট থাকত। সেখানে অব্রাহ্মণ সমাজের মৃতদেহ দাহ করা নিষিদ্ধ ছিল। আবার উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও নিম্নবর্গের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট থাকত ভিন্ন ভিন্ন শ্মশান। এ নিয়ম প্রচলিত ছিল শিল্পাঞ্চলের মিশ্র জনমানস, সংকর সংস্কৃতি গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত। বর্ণবৈষম্য ও জাতপাতের উচ্চনীচ ভেদ শ্মশানভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পাঁচ ও ছয়ের দশকে বৃহত্তর দুর্গাপুর জুড়ে শিল্পায়নের জোয়ার এলে যে সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তন এসেছিল তার ঢেউ লেগেছিল শ্মশানভূমিতেও। শিল্প স্থাপন ও নগরায়নের আবর্তন এ অঞ্চলের শ্মশানভূমিতে যে সব পরিবর্তন এনেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এগুলি। ১. জাতপাতের ভিত্তিতে শ্মশানভূমির ব্যবহারের প্রথা লুপ্ত হয়। ২. অনেক শ্মশানভূমির অবলুপ্তি ঘটে। এবং ৩. অনেক শ্মশানভূমি তাদের ভয়ংকর পরিবেশ পালটিয়ে কালীবাড়ি অথবা আশ্রমে রূপান্তরিত হয়। ৪. অনেক শ্মশানভূমিতে হয় কারখানা না হয় জনবসতি গড়ে উঠেছে।

জাতিভেদের ভিত্তিতে শ্মশানভূমি ব্যবহারের প্রথা যে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে তা শ্মশানভূমিগুলিতে ঘুরলেই দেখা যায়। মূলত বহিরাগত ও সংস্কারমুক্ত মানুষের সমাগমে শ্মশানভূমিতে জাতিভেদ প্রথা প্রায় লুপ্ত পেয়েছে। আবার নতুন নতুন কলকারখানা নির্মাণ, জনবসতির দ্রুত বৃদ্ধি ও নগরায়নের চাপে অবলুপ্ত হয়েছে অনেক শ্মশানভূমি। শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা, আবাসন নির্মাণ, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, জলাধার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মহাযজ্ঞের কারণে বিরল বসতি স্থলে জনবসতির ঘনত্ব বাড়তে থাকে। শ্মশানক্ষেত্রগুলি জনবসতির মধ্যে এসে পড়ায় সেগুলি তাদের গুরুত্ব হারিয়ে কলোনি, আশ্রম বা মন্দির বাড়ির চেহারা নিয়েছে। ভিড়িঙ্গী শ্মশান, আমরাই শ্মশান, মহেশকাপুর শ্মশান এর দৃষ্টান্ত।

বীরভানপুর শ্মশান : আধুনিক দুর্গাপুর তথা দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের সর্বাধিক বৃহৎ, গুরুত্বপূণ ও কার্যকরী শ্মশান হল বীরভানপুর শ্মশান। প্রতিদিনই এখানে কিছু না কিছু শবদাহ হয়। দিনে ২০/২৫টা শবদাহের ঘটনাও বিরল নয়। শবদাহের সংখ্যা বাড়ার কারণে এখন এই শ্মশানভূমিতে নয়টা চুল্লি কাজ করে। শ্মশান কর্তৃপক্ষ এ কারণেই বীরভানপুর শ্মশানকে মহাশ্মশান বলে উল্লেখ করে থাকেন।

দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে দামোদর নদের পাড়ে এই শ্মশানভূমি অবস্থিত। দুর্গাপুর রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২/৩ কি. মিটার। প্রায় ৪/৫ একর জমি জুড়ে গড়ে উঠেছে বীরভানপুর শ্মশানস্থল। চারিদিকে বড়ো বড়ো গাছ আর ঝোপঝাড় শ্মশানভূমির ভীতি সঞ্চারক পরিবেশকে ধরে রেখেছে। পাশাপাশি নয়টি চিতায় শবদেহ দাহ করার ব্যবস্থা আছে।

বীরভানপুর শ্মশানটি দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্যদ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত। এখানে শবদাহের পর শ্মশান সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অন্তিম সংস্কারের ও ক্রিয়াকর্মের জন্য পুরোহিত, চণ্ডাল প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। আছে শ্মশান বন্ধুদের জন্য বিশ্রামাগার, কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা। বর্তমানে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের ৭৫ শতাংশ শব এই শ্মশানেই দাহ করা হয়।

কিন্তু দুর্গাপুর আধুনিক শহর ও পরিকল্পিত জনপদ হলেও শ্মশানভূমিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি এতদিন। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হয়নি শ্মশানে। মৃতদেহ দাহর মতো নৃশংস ও ভয়প্রদ কাজ উন্মুক্ত ভূমিতে হওয়ার কারণে ও পরিবেশ দূষণের কথা মনে রেখে পুরাতন প্রথা রদের জন্য জন-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ফলশ্রুতি রূপে কর্তৃপক্ষ এখানে আধুনিক ব্যবস্থায় ও প্রযুক্তিতে শবদেহ দাহের ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। দুর্গাপুর নগর নিগমের মেয়র রথীন রায় সম্প্রতি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে আগামী বছরের গোড়াতেই বীরভানপুর শ্মশানকে আধুনিক শ্মশান রূপে গড়ে তোলা হবে। বসানো হবে বৈদ্যুতিক চুল্লি এবং ব্যবস্থা করা হবে আধুনিক সুযোগ সুবিধার। পৌর-নিগম এ কাজে কোটির অধিক টাকা ব্যয় করবেন বলে জানিয়েছেন। পুরাতন শ্মশানের গা-ঘেঁষে নির্মিত হচ্ছে বৈদ্যুতিক চুল্লি-গৃহ। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলের মানুষের অনেক দিনের দাবি পূরণ হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা দূষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে।

ভিড়িঙ্গী শ্মশান ও কালীবাড়ি : বেনাচিতি অঞ্চলের ভিড়িঙ্গী গ্রামের পাশে কুমোরবাঁধ জলাশয়ের পাড়ে অতীতকালে যে শ্মশান গড়ে উঠেছিল তা বহু সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে বর্তমান ভিড়িঙ্গী শ্মশান কালীবাড়ি নির্মিত হয়েছে। ভিড়িঙ্গী শ্মশান কালীবাড়ি 'অক্ষয়তন্ত্র সাধনক্ষেত্র' নামেও পরিচিত। আশ্রমের বর্তমান সাধক ও সেবায়েত শ্রীসাধনকুমার রায়ের মতে, প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে এই তন্ত্র সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে অক্ষয়কুমার রায় ও রবীন্দ্রনাথ রায়ের সাধনা ও চেষ্টায় এই শ্মশানভূমি লোকসমাজে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।

অক্ষয় রায় তাঁর বাল্যবয়সে নাগাসন্ন্যাসী তুলসীদাস গোঁসাইবাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কুমোরবাঁধ সংলগ্ন শ্মশানভূমিতে পঞ্চমুণ্ডি আসন গড়ে কালী সাধনায় নিযুক্ত হন। তাঁর গুরুদেব তুলসীদাস বাবাজী শ্মশানে একসঙ্গে অবস্থান করে শিষ্যের তন্ত্র সাধনাকে সহায়তা করেন ও তাঁর সাধনকর্মকে উদীপ্ত করেন। অক্ষয় রায় সিদ্ধকাম হলে তাঁর গুরুদেব দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুকালীন গুরুপ্রদ ও অর্থ আনুকূল্যে অক্ষয় রায় মায়ের মূর্তি ও মন্দির পুনঃনির্মাণ করে ভিড়িঙ্গী কুমোরবাঁধ শ্মশানভূমিকে অক্ষয় সাধন ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে ভিড়িঙ্গীর জনবসতি ক্রমশ বাড়তে থাকায়, বিশেষত স্বাধীনোত্তর কালে শিল্পায়নের হাওয়া লাগায় জনগণের চাপে এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত কারণে এই শ্মশানভূমিতে শবদাহ প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এখন আর এখানে মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা নেই। শ্মশানভূমি তার গাম্ভীর্য্য, নির্জনতা ও ভয়ঙ্করতা হারিয়ে জনস্রোতবাহী কালীবাড়ি ও আশ্রমের রূপ নিয়েছে। নিত্য পূজাপাঠ, মানসিক পূজা, বিশেষ পূজা ও আনুষ্ঠানিক ধূমধামের আড়ালে শ্মশান মাহাত্ম্য চাপা

পড়ে গেছে। দুর্গাপুরের অনেক লোক একথা জানে না যে আজ যেখানে আধুনিক কালীমন্দির গড়ে উঠেছে পূর্বে সেখানে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমি। জি.টি. রোডের ভিড়িঙ্গী মোড় থেকে প্রায় এক কি.মি. উত্তরে নাচন রোডের ধারে অবস্থিত ছিল ভিড়িঙ্গী শ্মশানভূমি। পুকুর ও পুকুরপাড়ের কয়েক বিঘা জমি জুড়ে ঘন বনের আড়ালে ছিল এই শ্মশানভূমি। নির্জন শ্মশানভূমিতে গা ছমছম করা পরিবেশ ছিল। শ্বাপদ প্রাণীর আধিপত্য ছিল বেশি। ভয়ে সচরাচর সে পথে কেউ পা বাড়াত না। অক্ষয় রায় তাঁর তান্ত্রিক গুরুর নির্দেশে এই শ্মশানকে সাধনক্ষেত্র রূপে নির্বাচিত করেন। পঞ্চমুণ্ডির আসন গড়ে সাধনায় নিযুক্ত হন। অক্ষয় রায় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে ক্রমশ ভক্ত সমাগম বাড়তে থাকে। ফলে শ্মশানভূমি তার নির্জনতা হারাতে থাকে। ক্রমে শ্মশান পরিবেশ ত্যাগ করে কালীমন্দির ও আশ্রমের রূপ লাভ করেছে। আর শিল্পায়নের ফলে তার চরিত্রে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমরাই মহাশ্মশান এবং শংকরনাথ আশ্রম : দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী থেকে এক কিমি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আমরাই গ্রামে প্রবেশের মুখে অবস্থিত 'আমরাই শ্মশান'। একটি বিশাল জলাশয়কে কেন্দ্র করে ১০/১২ একর জমির উপর তৈরি হয়েছে আমরাই মহাশ্মশান। শ্মশানের বর্তমান আধিকারিক শ্রীমৎ শংকরানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রায় আড়াই দশক আগে শংকরানন্দ ব্রহ্মচারী এই শ্মশানভূমির অধিকার নেন। যেহেতু শংকরানন্দ শ্মশানচারীর কাপালিক বা তান্ত্রিক নন তাই তিনি অধিকৃত শ্মশানভূমিকে ক্রমে সাধন-পন্থী আশ্রমে রূপান্তরিত করেছেন।

শংকরানন্দ ব্রহ্মচারী শঙ্করাচার্যপন্থী বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর মন্ত্র-শিষ্য। জাতিতে ব্রাহ্মণ। বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটির ডুমুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তেইশ বছর আগে এখানে এসে বসবাস করছেন। তাঁর সহযোগী রূপে আছেন শিবানন্দনাথ গোস্বামী।

আটের দশকে দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্প ও দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ আবাসন নগরী সংলগ্ন গ্রাম, পরিত্যক্ত ভূমি ও শ্মশানাদির উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়। তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় আমরাই শ্মশানভূমির চারপাশে প্রাচীন ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে। জলাশয়ের সংস্কার এবং নানাপ্রকার বৃক্ষাদি রোপণ করে চমৎকার আশ্রমের রূপ দেওয়া হয়েছে।

যে জলাশয়কে কেন্দ্র করে আমরাই শ্মশান গড়ে উঠেছিল তা ছিল একটা ডোবা। স্থানীয়ভাবে তার নাম ছিল "পঁচা গ্যাড়িয়া"। তাই এই শ্মশানের আদি নাম ছিল পঁচা গ্যাড়িয়া শ্মশান। এখানে সংলগ্ন গ্রামগুলির শবদেহ দাহ করা হত। এখনও আশপাশের গ্রাম থেকে দু'একটা শবদাহের জন্য আসে বটে কিন্তু শ্মশানের ভয়ংকরতা বা গা ছমছম করা পরিবেশ আর নেই। সারা আশ্রম ভূমি জুড়ে বনকুঞ্জ, আশ্রমের পরিবেশ। বনের ঘন ছায়ায় আশ্রম ব্রহ্মচারী ও ভক্তজনের চলা ফেরা, বিশেষ বিশেষ তিথিতে উৎসবের আয়োজন হয়। সবচেয়ে বড়ো উৎসব হয় মহালয়ায়। আশ্রম কর্তৃপক্ষ কিছু জমিকে কৃষিযোগ্য করে ফসল ফলায়, জলাশয়ে মাছ চাষ হয়। গোয়ালে গোরু আছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া আছে। আছে আশ্রমযোগ্য আরও কিছু পশুপাখি।

পীর পুকুর শ্মশান : পীর পুকুর শ্মশান ফরিদপুর সংলগ্ন পীর পুকুরের তীরে অবস্থিত।

'এই শ্মশানভূমি ফরিদপুর শ্মশান নামেও পরিচিত। অনেকটা বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে এই শ্মশানভূমি কোন অতীতে গড়ে উঠেছিল তার হদিশ কেউ দিতে পারে না। বহু প্রাচীন এ শ্মশানক্ষেত্র। শোনা যায় ভিড়িঙ্গী শ্মশান কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা সাধক অক্ষয়কুমার রায় জীবনের প্রথম পর্বে পীর পুকুর শ্মশানভূমিতে তাঁর সাধনার সূত্রপাত করেন। এখানে আরও একজন সাধক তন্ত্র সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। একই গুরুর দুই শিষ্য একই শ্মশানের সাধনায় রত হলে সাধনার গূহ্য বিষয়ে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। সেই কারণে সাধক অক্ষয় রায় গুরুর নির্দেশে পীর পুকুর শ্মশান ত্যাগ করে ভিড়িঙ্গীর কুমোরবাঁধ শ্মশানকে আশ্রয় করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর চেষ্টাকেই ভিড়িঙ্গী শ্মশানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে উপযুক্ত সাধক-সেবায়েত ও পরিচালকের অভাবে পীর পুকুর শ্মশান তার গুরুত্ব হারিয়ে সাধারণ শ্মশান রূপে বেঁচে থাকে। পীর পুকুর শ্মশানবাড়িতে কালীপূজা হয় পূর্ণিমায়। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়—একই গুরুর (তুলসীদাস বাবাজি) দুই শিষ্য পীর পুকুর ও ভিড়িঙ্গী শ্মশানে তান্ত্রিক সাধনা ও পূজা যজ্ঞ করায় একই গুরুর পক্ষে দু-জায়গায় উপস্থিত থাকা ও ব্যবস্থাদি সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাই গুরুর নির্দেশে ভিড়িঙ্গীতে অমাবস্যায় এবং পীর পুকুরে পূর্ণিমায় কালীপূজার অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন। গুরুর নির্দেশ মেনে সে প্রথা আজও চলে আসছে।

জামগড়া শ্মশান : জামগড়া গ্রামের বাইরে একটি জলাশয়কে আশ্রয় করে জামগড়া শ্মশান প্রতিষ্ঠিত। বহু প্রাচীন এ শ্মশান। শবদাহের ক্ষেত্রে জাতিভেদের প্রথা মেনে চলা হয়। তবে সম্প্রতি তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে জনবসতি বৃদ্ধি পেয়ে শ্মশানভূমির কাছে চলে আসায় শ্মশানভূমি তার ভীতি সঞ্চারক পূর্ব পরিবেশ হারাচ্ছে।

শ্রীরামপুর শ্মশান : দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের গা ঘেসে অবস্থিত শ্রীরামপুর শ্মশান অবস্থিত। বর্তমানে শবদাহের কাজ খুব বেশি হয় না। এখনকার শ্মশানভূমিতে আশ্রম বা মন্দির গড়ে ওঠেনি।

কমলপুর শ্মশান : কমলপুর গ্রামের পাশে জোড়া পুকুর ছাড়িয়ে আর কিছুটা এগোলে একটি ছোটো জলাশয়কে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে কমলপুর শ্মশানভূমি। বর্তমানে এর আশেপাশে জনবসতি গড়ে ওঠায় শ্মশানভূমিটির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে শবদাহ হয় খুবই কম।

পলাশডিহা শ্মশান : পলাশডিহা গ্রাম সংলগ্ন স্কুল পুকুরের পাড়ে পলাশডিহা শ্মশান অবস্থিত। পলাশডিহা ও পিয়ালা গ্রামের মৃতদেহ এখানে দাহ করার ব্যবস্থা ছিল। এখন আর শবদাহ হয় না। বর্তমানে শ্মশানভূমিতে একটি মন্দির ও আশ্রম গড়ে উঠেছে। এ আশ্রমের সেবিকা ও পরিচালিকা একজন বয়স্কা মহিলা।

সতীডাঙা শ্মশান : লাউদোহা যেতে কুনুর নদীর তীরে সতীডাঙা শ্মশানভূমি। জনশ্রুতি আছে, এই শ্মশানভূমিতে এক পতিব্রতা নারী তার মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সতী হন। সেই থেকে এই শ্মশানভূমির নাম হয়েছে সতীডাঙা শ্মশান। সতী হওয়ার ঘটনাকে সম্মান দিয়ে পরবর্তীকালে এ শ্মশানে সাধারণ শবদেহ পোড়ানো নিষিদ্ধ হয়েছে।

তামলা শ্মশান : এটি একটি নবগঠিত শ্মশান। কাণ্ডারন গ্রামের এক অংশের ব্রাহ্মণরা নিজেদের পারিবারিক শবদাহের জন্য তামলা পুকুরপাড়ে নিজস্ব শ্মশানক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। মনে হয় নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে শ্মশানভূমি থেকে জাতপাত ও বর্ণভেদ দূর হতে থাকলে জাত্যাভিমানী এই ব্রাহ্মণেরা নিজস্ব শ্মশানক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে জাতির আভিজাত্য বজায় রাখতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে চলছে ভাঙা ও গড়ার কাজ।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১. দুর্গাপুর ভিড়িঙ্গী শ্মশানকালী মায়ের কথা—(১৪০৭ বঙ্গাব্দ) শ্রীনীরদবরণ রায়।
২. দুর্গাপুরের ইতিহাস—(১৯৮৪ খ্রি.) প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।
৩. দুর্গাপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে—(১৯৯১ খ্রি.) মধু চট্টোপাধ্যায়।
৪. চৈতন্য আলোকে শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারীজি—(১৪০৯ খ্রি.) শ্রীনীরদবরণ রায়।
৫. মহাজীবনের পথে—(১৪০৯) শ্রীনন্দলাল চক্রবর্তী।
৬. সত্যের সন্ধানে—(১৪০৮) শ্রীনীরদবরণ রায়।
৭. মাতৃ সাধক শ্রীবরুণানন্দ (১৩৯৬), সম্পাদনা : শ্রীশিবদাস মুখোপাধ্যায়।
৮. অমৃতকুম্ভ—শ্রীবরুণানন্দ ব্রহ্মচারী।



আমরাই শ্মশান ও শঙ্করানন্দ আশ্রমের প্রবেশদ্বার ছবি · ফণী পাল

❑ লেখক পরিচিতি : গ্রন্থকার, গবেষক, প্রাবন্ধিক।

সাড়ে তিনহাত মাটি, শেষ ঘুমাবার তরে

বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিষ্যতে
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

প্রিয়জন বিয়োগের দুঃসহ বেদনার্তি শুধু মানুষ নয়—মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও এই ধারাটির বহমানতা আমরা মরমী হৃদয়ে, সংবেদনশীলতায় গভীরভাবে অনুভব করি। অনন্তকাল ধরে জীবের এই পরিণতি—গীতায় সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত
ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'।

এই সংস্কৃত শ্লোকের অমোঘ উচ্চারণে। তাই প্রাণহীন দেহকে বিষাদবিধর প্রাণের কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি অপসারিত করা যাবে দূ-উ-রে নির্জনে ততই দেহধারী প্রাণের পক্ষে আপাত মঙ্গল হবে—এই সত্যতা মানুষই সর্বপ্রথম উপলব্ধিই ধ্রুব—কারণ আত্মা তাঁর বিকারবিকৃতিতে কষ্ট পায়, যদিও আমার কোনো বিকারই নেই। কারণ

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্তাপে
ন শোষয়তি মারুতঃ'।

'I am the spirit, Me the sword cannot cut, fire cannot burn,' Weapon cannot pierce, I am the Omnipotent, I am the Omniscient'.

তবুও আমরা বলি আত্মাকে কষ্ট দিওনা—আত্মার শান্তির জন্য একমিনিট নীরব থাকুন—মরদেহের সৎকার শিঘ্র করুন। আত্মার শুচিতার জন্য অশৌচাদি পালন করুন—এবংবিধ সংস্কার রীতিগুলি মানুষ কর্তৃক অদ্যাবধি পালিত হয়ে আসছে চেতনাবৃদ্ধি ও অধ্যাত্ম উন্মেষের সাথে সাথে । পরম শুচিতায়—অনুরাগের গভীরতায়। আসলে আত্মার কোনো বিকার না থাকলেও—দেহের বিকারবিকৃতি স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতিগত কারণেই ঘটে থাকে। মৃত্যুর পর তা আরও ত্বরান্বিত হয় পচন গলন ও দূষণের মাধ্যমে। এই অসংখ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি (পেতে) পাবার জন্যই মানুষের মরদেহকে তখন থেকেই দাহ করার পদ্ধতি , মাটিতে প্রোথিত করার পদ্ধতি অনুসৃত হল সজীব মানুষ কর্তৃক। দেশভেদে এই সৎকার করার রীতি ধর্ম ও বর্ণভেদে লক্ষণীয়।

তবে মরদেহের দাহবায়(মানুষের) ও প্রোথিত করার পদ্ধতি দুটিই এখনও পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অকাট্য—বিশেষ করে দাহকার্যাদি । এই দাহকার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনেই সুনিদিষ্ট স্থানের মানুষ কর্তৃক দেয় নামরূপই—'মহাশ্মশান'—মহাযোগী মহেশ্বরের পরম শান্তির আলয়—যাকে ঘিরে আমাদের গভীর পরিক্রমা শুরু হবে। এখানে গোরস্থান সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা আমাদের প্রবল হলেও—প্রত্যক্ষ সংবীক্ষণের অনভিজ্ঞতাহেতু—ধর্মীয় লক্ষণরেখার উর্ধ্বে উঠে বিজাতীয় উন্ন্যাসিকতার পর্দা সরিয়ে মরমী হৃদয়ে দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞায় কজনাই বা পারেন সেই দুজ্ঞেয়তার যথার্থ অনুসন্ধানের অভিযাত্রী হতে? মরদেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত করার অব্যবহিত পর থেকেই হিন্দুশাস্ত্রমতে অশৌচাদি ক্রিয়া পালন করতে হয় নিষ্ঠা ও শুচিতার সঙ্গে কারণ 'তার আত্মা'। দেহনাশেও যাঁর বিনাশ হয় না অথচ জীবের এই শীতল প্রাণহীনতা ও প্রাকৃতিক নশ্বরতা মানুষকে যুগ যুগ ধরে অনুসন্ধিৎসু করেছে—বাড়িয়েছে তার অসমান্য অন্বেষা। ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা পেয়েছি জন্মান্তর—পরলোকত্ব—শবসাধনা। সবগুলিই মৃত্যু পরবর্তী। তাই অধ্যাত্ম সাধনায় তত্ত্বজানা লোকঋষিগণ তাঁদের সাধনালব্ধ প্রজ্ঞায় আত্মাকে জেনেছিলেন অজর-অমর-বিকারহীন এবং সকল আত্মার মূলে এক পরমাত্মার উপলব্ধি। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চভূতের সমন্বয়ে গঠিত জীবদেহের অস্তিত্ব অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। 'যা আছে দেহভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'—এই সত্যকে উপলব্ধি করে তন্ত্রসাধনায় দেহতত্ত্বের সৃষ্টি হল—আর তার অনুষঙ্গ হিসেবে কামসাধনা। এই উপলব্ধিসঞ্জাত বোধের জন্যই সে কখনও (মানুষ) জন্মান্তর রোধে সকরুণ আর্তি জানিয়েছে ভোলা মহেশ্বরকে—তার মন্ত্রোচ্চারণের পরিশুদ্ধতায়।

—'অনাথং সুদীনং প্রভো পুন)জন্মঃদুঃক্ষাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।' কখন আবার মরমী বাউলসাধকের মাধুরী মেশানো কণ্ঠে একই আর্তি বাঙ্ময় হয়েছে।

'আর চাহিনা জনম—আর চাহিনা মরণ,—
তোমার চরণতলে রেখে দাও।'
'সুন্দরী শরীর তোমার
গলে গলে পড়বে
একদিন শ্মশান চিতায় তুমি জ্বলবে।'
'মাটির দেহ মাটি হবে
পুড়ে হবে ছাই
এ দেহ পচা দেহ,
গরব কিসের ভাই।'
'শ্মশান হবে শেষ বিছানা
রব ঘুমায়ে
খাঁচা পড়ে রবে, পাখি

যাবে পালায়ে।'
'যে ঘুম আসেনি পাখার তলায়
নরম বালিশে শুয়ে
আসেনিতো ঘুম কতো না রাত্রি
ঘুমের ওষুধ খেয়ে
শান্তির ঘুম ঘুমাবি এবার
সে ঘুম তো ভাঙ্গবে না,
বদলে যাবে বাড়ির ঠিকানা'

পুরাণে বর্ণিত মহর্ষি কশ্যপের বংশের ধারা বেয়ে যাঁরা এলেন-গৃহস্থরূপে তাঁরা এক নূতন জাতকর্মের সৃষ্টি করলেন—সেগুলো হল (১) পঞ্চযজ্ঞ (২) গর্ভাধান (৩) অভিষেক (৪) বিবাহ (৫) পূজা (৬) বলি (৭) উপবাস (৮) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (৯) শ্রাদ্ধাদিকার্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় এখানে অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধকার্যাদির মধ্যে পরিক্রমারত।

সামাজিকক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের বিয়োগ ঘটলে বাড়ির স্বজনপরিজনেরা হিন্দুশাস্ত্রমতে সামর্থানুযায়ী অশৌচাদি পালন করেন (১০) দিন—(১) মাস পর্যন্ত। চুলদাড়ি নখ না কামানো, শাদা থান নতুন কাপড় পরিধানে, ওই কাপড়ের ফালি ছিঁড়ে লোহার তৈরি চাবিকাঠি শক্ত করে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখবেন অগ্নিকর্তা সমেত অন্যান্য পুত্রগণ। কম্বলাসন ব্যবহার করা তৈলাদি স্পর্শ না করা এইসব রীতিনয়মগুলির সাথে নিত্যস্নান-অবগাহনপূর্বক পরে মৃত স্বজনের আত্মার উদ্দেশ্যে ফল-জলদান এমনকি তামাক খাওয়ার সাজটুকুও নিষ্ঠার সঙ্গে—'তাঁর' উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়। দাহকার্যাদি (অন্ত্যেষ্টি) শেষে শ্মশানযাত্রীরা সকলেই 'শ্মশান ঠান্ডা' করবেন তাঁদের আনীত কলসভর্তি পূতবারি দ্বারা। যতক্ষণ পর্যন্ত না-শীতল হবে শ্মশানভূমি ততক্ষণই চলবে এই নিষ্ঠাসিক্ত পবিত্র কার্যটি। সম্পূর্ণ ঠান্ডা হলে (৮)টি পূত অস্থি ও (৮)টি কড়ি দিয়ে ভস্মীভূত মানুষটির প্রতিকৃতিতে প্রতিস্থাপন করতে হয়। শ্মশানের সদ্য পোড়া কাঠকয়লার সাহায্যে এই প্রতিকৃতি গড়া হয়। পরিশেষে একটি মাটির পূত জলপূর্ণ কুম্ভ প্রতিকৃতির (অনাহত) বুকের মাঝখানে বসিয়ে অগ্নিকর্তা কুড়ুলের বাঁট খুলে পিছন ফিরে সেই কাঠের বাঁটটিকে পূর্ণকুম্ভে ছুঁড়ে মারবেন ভাঙে ভালো না ভাঙলেও ক্ষতি নেই। অবগাহন শেষে শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে মমতাতে আর্দ্র হৃদয়ে (বয়স অনুযায়ী) একে একে শান্ত ধীর পদবিক্ষেপে পরস্পরের পিছনে লম্বাসারিতে বাড়ি ফিরবেন। দুঃসহ বেদনায় ভগ্ন হলেও কোনোভাবেই আর পিছন ফিরে সেই মহাশ্মশানকে দেখতে নেই। অতঃপর কাঁটাগাছ ডিঙিয়ে অশ্বত্থ গাছকে আলিঙ্গন করে গৃহপ্রবেশের আগে তুষের আগুনে শরীরকে সেঁকে বিষণ্ণ হৃদয়ে অভ্যন্তরে যাবেন। কলেবর বৃদ্ধির জন্য শ্মশানস্থলের পিণ্ডদান ও অগ্নিদান পদ্ধতির গভীরে যাওয়া গেল না—। অগ্নিকর্তা ও বাড়ির অন্যস্বজনেরা যে স্থানে দেহী দেহ রেখেছেন সেই স্থানটিতে জলছড়ি—ধুনাদীপ জ্বালানো অন্তত তিন দিবস পালন করবেন। দিনান্তে অবগাহনস্নানান্তে একবার হবিষ্যান্ন। সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্যাদিগ্রহণ

স্ত্রীসংসর্গ, মদ্যপান অসৎ চিন্তাভাবনা অশৌচকালীন গুরুতর পাপকার্য বলে বিবেচিত। নিষ্ঠা প্রেম ও শুদ্ধাচারের মাধ্যমে বিদেহী আত্মাকে সম্মান জানানোই এক্ষেত্রে উত্তরসূরীদের একমাত্র কাঙ্খিত হবে।

এখান থেকেই আত্মার অবিনশ্বরতা প্রবল হয়েছে মানুষের অন্তর্লীনে। কারণ হিসেবে দেখা গেছে তন্ত্রসাধক অমারাত্রির ত্রিযামায় মহাশ্মশানে এসে তাঁর তন্ত্রক্রিয়াদি শেষে সেই মহান মানুষটির আত্মাকে বশীভূত করে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। শুভ অথবা অশুভ কার্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে—।

বিয়োগবিধুর পরিজনদের অজ্ঞানতা অথবা উদাসীনতার দুর্বলতায়। এইজন্যই সৎগুণাধিকারী মহান মানুষের শ্মশানভূমিকে তিনদিন পাহারা দেওয়ার রীতি এখনও দেখা যায় এই ডামাডোলের যুগেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়াত মানুষটির ইচ্ছানুরোধের প্রেক্ষিতেই। এই প্রক্রিয়াটিকে লোকায়ত ভাষায় 'শ্মশান চিয়ানো' বলা হয়। কোনো অবস্থাতেই দেহীর শেষ ইচ্ছানুরোধ এখানে উপেক্ষিত হয় না তাঁর উত্তরসূরী দ্বারা। যদি হয় তবে তার প্রভাব পড়ে উত্তরসূরীদের গার্হস্থ্য জীবনে- - যার পরিণতি হয় অতি ভীষণ—। সম্ভবত এর জন্যই প্রয়াত মানুষটির প্রতি এত শুচিতা—এতো নিষ্ঠার সঙ্গে অশৌচ পালন—গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন—আদ্যশ্রাদ্ধাদিনুষ্ঠান পরিশেষে প্রেতগয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান—। এর জন্যই তর্পণ-মহালয়া-স্বর্গবাতি-দীপান্বিতা রাত—ভক্তিরস সাধকের অমর কাব্যগীতিকা—!

'শ্মশান ভালোবাসিস বলে শ্মশান করেছিস, হৃদি—মা'—
'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা'
'শ্মশানে মশানে ঘুরে ভোলা মহেশ্বর
তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে শিব দিগম্বর'

('ছোটিকা' শব্দব্রহ্মের দ্বারা শব সাধনায় তান্ত্রিক শবদেহে কম্পন সৃষ্টি করেন। এ-প্রসঙ্গে—

"উপচারৈঃ মন্ত্রণাং সংযোগে
ছোটিকা শব্দোব্রহ্ম
যঃ প্রবশতি কর্ণমণ্ডলে পরঃ
স শক্তি শাক্ত পুরুষা বজ্রহস্তেন
সংসৃজ্য প্রানান্‌-।")

মহাশ্মশান হতে সংগৃহীত দ্রব্যাদির অমোঘ গুনাগুণ সম্পর্কে দু-চার কথা

১. বাণবিদ্যার উপকরণ—চিতাবাঁশের ছিলা (নীল)

২. দেবসেনাপতি কার্তিকেয় তাঁর হস্তধৃত তির—যেটিকে মূর্তি ভাসানের সময় সাধারণ্যের অলক্ষ্যে-অজান্তে সংগ্রহ করতে হয়।

৩. আদ্যাশক্তির দুর্গার (মহামায়া) হস্তধৃত তির—(ওই একই নিয়মে)

৪. শ্মশানের পোড়াকাঠ (মড়াকাঠ) স্বাভাবিক অবস্থার জলে ডুবে থাকলে এবং সেটিতে যদি

শামুক ধরে থাকে তাহলে সেই কাঠটি জল থেকে উত্তোলিত হবার মুহূর্তে যে শামুকটি সর্বপ্রথম কাঠ ছেড়ে পড়বে তাকে শুকিয়ে গুঁড়া করে আখশালের জোলে (হো-হো আগুন জ্বলা বিরাট গহ্বর সদৃশ উনানে) জ্বলে বাড়ুইয়ের অজান্তে নিক্ষেপ করলে আখওড়ের পাগ্ আর মরবে না তাতরসিই থাকবে—গুড়ে রূপান্তরিত হবে না—। কুইন্ট্যাল-কুইন্ট্যাল জ্বালানিতে হো-হো শব্দে জেলে জ্বললেও।

৫. দ্বিতীয় শামুকটি পড়লে ওই একই নিয়মে নিক্ষেপ করলে ভোগের গুড় প্রচণ্ডভাবে ফুটতে থাকবে—জ্বালানি নিভে এলেও ফুটতেই থাকবে।

৬. তৃতীয় শামুকটি পড়লে—ওইভাবে নিক্ষিপ্ত হলে সমস্ত ডেগচির গুড়টাই ধুপ্‌সি উড়ে যাবে কিছু করার আগেই—।

(বাণবিদ্যা বিশেষজ্ঞের নিকট সংগৃহীত)

মানুষ শুধুমাত্র দেহ মন ও ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি নয়। সে চৈতন্যস্বরূপ। তাই দেহবিযুক্তিতেই যদি তার সমাপ্তি ঘটত তবে তার জন্য এতো কান্না-এতো দুঃসহ বেদনার্তির প্রকাশ অভিব্যক্তিগুলিরও সমাপ্তি ঘটত।

বিদেহী প্রিয়জনদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্মৃতিমন্দির—সমাধি—ফটোপূজা—সমাধিলিপি—গোরস্থান—মাজার প্রভৃতি স্মৃতিস্মরণের নির্দশনগুলি—উত্তরপুরুষদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-প্রেম-সোহাগে রাঙানো এক অকুণ্ঠ হৃদয় সংবেদেরই সমর্পণ বিশেষ। তাই আত্মার উদ্দেশ্যে পরমাত্মার গহিন থেকে নিরন্তর মানুষের কণ্ঠে উচ্চকিত হয়েছে—

'অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যো মাহমৃতংগময়'—।।
'ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা
প্রভাসে পুষ্করানি চ
তীর্থন্যেতানি পুণ্যানি
স্নানকালে ভবন্থিহ'—
ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি'।
('আসসালাতো খয়রুম মিনন্ নওম—
লা এলাহা ইল্লালাহ্
মহম্মদু রসুলুল্লা—
হাই আলে আসসালা
হাই আল্লেল ফলা'।। (ভুরাসানা মঞ্জেল বাদশাহ জাহাঙ্গীর))
ধ্বনিত হয়েছে—'কুল্লো নাফ্‌সুন জায়ে কাতুল মোউত'
'আপনি খোশী না আয়ে

না চলে
লা হায়াৎ আয়ে
কাজা লে-চলি-চলে'।

(Matter or energy cannot be created nor be destroyed, there is only transformation of one form of matter or energy into another form. – Low of Consensation of Mass and Energy into the another foren.)

'বাল বিখারকে টুঁটি কবরোপেঁ,
যবকোই মেহেযবীন রোতি হ্যায়—
মুঝকো অপসর খ্যায়াল আতা হ্যায়
মোউত কিতনি হাসিন হোতি হ্যায়।'

(–'Low of Conservation of Mass and Energy')

'মিনহা খালাক না কুম,
অহিফা নইদুকুম—
অহিফা নো প্রেজো কুম,
তারাতান নোখরা,
তারাতান নোখরা।'

('পাছতা রাহা হুঁ জিনেকে দুয়া লেকার
আব মঔত ভি আজায়ে, নাগাওয়ার নাহি'
—ঝিন্দানবাঈ (বেগম) (ইব্রাহিম লোদী))

'ইননাল্লিলাহে অ ইন্না ইলাহে রাজেউন' ('ওঁ তস্মাৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেযাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরনাথায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং।।')

'I hope to see my pilot face of face,
When I have crossed the bar'– (Tenmyson)
'May hear our mutual murmurs sweep
There, swan, – like let me sing, and die'– (Lord Byron)

গল্পের পটভূমি উপেন্দ্রবাবুর বাগান

জঙ্গল মহালের অধিকার খর্ব হয়েছে। আরণ্যক মানুষেরা ও ভূমিপুত্রেরা যখন ক্রমশই প্রাধান্য হারাতে বসেছে, তখন দামোদরের দক্ষিণতীরে বাগান ও উঁচুবর্ণের মানুষের বসতি শুরু হল। এই সময়েই ঘটে গেল সিপাই বিদ্রোহ। সালটা (১৮৫৭)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সাহায্য করে বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যা গ্রামের জমিদার পুরুষরা হয়ে গেলেন দোর্দন্ডপ্রতাপ। হুগলি জেলার নীলকুঠির দেওয়ানির সাথে স্বভূমি অযোধ্যা গ্রামেও নীলকুঠির অবাধ ব্যবসাতে (মল্লভূম)

বিষ্ণুপুর রাজার সম্মানীয় প্রজাবিশেষ। যাইহোক আমাদের আলোচনার মুখ্যত এই বন্দ্যোপাধ্যায় পদবিধারী অযোধ্যার জমিদার বংশীয়দের অভিশপ্ত আমবাগানকে নিয়ে। আমবাগানটির বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে দৃষ্টিগ্রাহ্যতা এখানে লক্ষণীয়। অযোধ্যার দক্ষিণদিকে দ্বারকেশ্বর গন্ধেশ্বরী দুজনে একই খাতে এখানে এসে প্রচণ্ড বাঁক নিয়ে ধরাপাটের উত্তরপূর্বে বয়ে গেছে। অযোধ্যা গ্রামের পাশাপাশি-পেঁচাবড়া-সাখরাল-জামরা গ্রাম। (১২২৯ বাংলা) এর বানে এই অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি হলেও এই আমবাগানটির কোনো ক্ষতিই হয়নি। বরং এর পূর্বদিকে গন্ধেশ্বরী দারকেশ্বর কানা পড়ে গেল। দারকেশ্বর গন্ধেশ্বরী ধরাপাটের দক্ষিণদিকে শীতল রায়ের ডাঙ্গ কে চিরে পূর্বদিকে গতি ফেরাল এই সময়টাতেই। ১২২৯-এর সময় বা তার পরবর্তী এতগুলো বছর পেরিয়ে এলেও এখানের মানুষদের মৃতদেহ সৎকার করার ব্যাপারে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতে হত—বিশেষ করে দাহকার্যের সময়। কারণ—আধবাঘা আর হুঁড়্যারের অত্যাচারে প্রায়শ আধপোড়া মৃতদেহ উধাও হয়ে গেছে শবসৎকারীদের চোখের সামনেই—কিছু করার আগেই। জ্বলন্ত শ্মশান থেকে আধপোড়াকে তুলে নিয়ে যাবার কৌশলে পৃথিবীর সেরা জীবরা এখানে বোকা-আহাম্মক অড়কঁক! নিকটবর্তী কোনো জলাশয়ে কাদাজলে সর্বাঙ্গ লেপ্টিলাগা করে—সমান্য অসচেতনার মুহূর্তেই এরা—(আধবাগা হুঁড়্যার) চোখের পলকে লাফ (টাফ) সেরে আধপোড়া মড়াকে তুলে নেয়। এখানেই এই আমবাগানের পূর্বদিকের বিঘা-তিনেক জায়গা জুড়ে ভয়-ভয়ংকর মহাশ্মশান—স্থানীয় আমরাল—বিড়রা—জামরা—নিশ্চিন্তপুর—ধরাপাট—পাইকপাড়া—অযোধ্যা—নদীপাড়ের দক্ষিণে যতগুলি গ্রামের মানুষেরা রক্তহিম করা একটি নাম উপেন্দ্রবাবুর আমবাগান। লোকমুখে (অপীন্দবাবুর বাগান)। ইংরেজ আমলে সদর বাঁকুড়া থেকে রামসাগর রেলস্টেশনে নেমে বরাবর উত্তরের মোরাম রাস্তা ধরে দারকেশ্বর পেরিয়ে ডাকযোগাযোগ হত রাধানগরে। এখনও ডাকঘর বনরাধানগর লেখা হয়। লেত্যাড়-আদিবাসী অধ্যুষিত বাঁশকোপা-জোড়বাঁধ-বনখগার দুর্ভেদ্য অরণ্য।

জীবন্ত কাহিনী (১)

শ্রাবণমাসের রাখীপূর্ণিমা।

আজকে ধরাপাটে মনসাপরব। সকাল থেকে আশমান গোলার সাথে পাল্লা দিয়ে ফাটানো হচ্ছে গ্যোঁঠা (ক্ষুদ্র কামানবিশেষ)। বেগুনঝাঁটির কয়লার সঙ্গে গন্ধকসোরার নির্দিষ্ট মিশ্রণে সূক্ষ্ম আঁজিতে—(চালুনিতে) চেলে রোদে শুকিয়ে বারুদ তৈরি হয় উৎকৃষ্ট। গ্যোঁঠার ডাকনিও হয় খুব। পাইকপাড়ার চক্রবর্তীমশাই স্থির করলেন রাত্রে ধরাপাটের মনসাপরব দেখতে যাবেন—আর ওই একই কাজে আমরলের নামোপাড়ায় শ্বশুরালয়েই রাতটা কাটাবেন—যেহেতু অর্ধাঙ্গিনী পিতৃালয়ে আছেন অথচ কোনো সুখদায়ক পত্রাদি বা কোনো সন্দেশবাহী খবর এযাবৎকাল পর্যন্তও দেননি। দিনেরবেলাটা রাধামাধবের পুজার্চনায় ও ভাইভায়াদের বাড়িতেই মধ্যাহ্নকালীন আহারপর্ব শেষ করে দীর্ঘ বিশ্রাম সেরে শাঁখ বাজাবার পরেই দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ যুবাপুরুযোত্তীর্ণ চক্রবর্তীমশাই ধুতি-তসরের পাঞ্জাবি-বিষ্ণুপুরী কেট্যার চমৎকারি পাট করা চাদরটি কাঁধে ফেলে

বাটা কোম্পানির চেটোভর্তি সৌখিন জুতো পায়ে রাজকীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারার মানুষটি রওনা দিলেন ধরাপাটের মনসা পরবের উদ্দেশ্যে। হ্যাঁ—রাজকীয়! কারণ বিষ্ণুপুরের রাজপুরুষ চৈতন্যসিংহদেব শ্রীচক্রবর্তীদের 'রাজচক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন ইতিপূর্বে। শ্রীচক্রবর্তীদের পদবি ছিল মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে নিলেন পাত্রপাড়ার প্রসিদ্ধ রসগোল্লা ও জিলাপি ইন্দ্র ময়রার দোকানে। ঢাকের বাজনার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ বারিনাচ দেখলেন—বাজি দেখলেন তিনদমা ভুঁইচম্প! চমৎকার বাজীকর!

রাত বাড়ছে—এবার শ্বশুরালয়। আমরাল নামোপাড়া—!

মনসাপরব দেখে ধরাপাটের পশ্চিমদিকের সদর রাস্তায় না গিয়ে কানানদীর ভিতর হয়ে সোজাসাপ্টা পায়ে চলা পথে প্রশান্ত চিত্তে নেমে এলেন অকুতোভয় বর্ষীয়ান চক্রবর্তী। কানানদীর স্থানে অস্থানে বোঁচ ঝোড়-সিয়াকুল আর শর কাশিনাছের জঙ্গল পেরিয়ে অসুবিধা হচ্ছেই-তবু ফট্‌ফটে চাঁদনি রাত। শ্রাবণ মাস হলেও বৃষ্টিবাদলের সম্ভাবনা নেই। কখন একসময় আমবাগানের কাছাকাছি চলে এসেছেন মনে হতেই মুখ তুলে দেখলেন চাপ চাপ অন্ধকার ঘুটঘুট করছে আমবাগানের ছায়ান্ধকারে। কেউ কক্ষনো আসেনি এই বাগানে আমের লোভেও। কী দিনে—কী রাত্রে! এখানে এলেই গা ছমছম ভয়ে মৃত্যুশীতলতা। মহাশ্মশানের বীভৎসা কালো কয়লার স্তূপকে ঠেলে-ঠেলে একটা ভূখণ্ড জুড়ে শুধু অন্ধকার থকথক করছে এতো চাঁদনি থাকতেও। ইতস্তত ছড়ানো কালো কালো আদ্যিকালের হাঁড়িভাঙা খাটপালঙ্কের আধপোড়া খুরাভাঙা বিশালাকৃতি কাঠের আধপোড়া কুঁদা কালো কালো মহিষের মনে ফিন্‌ফোটা জ্যোৎস্নায় সাঁতার কাটছে আদিম উল্লাসে। পাশেই ফণিমনসা আর কঙাগাছের সম্ভ্রান্ত সংসার। ওহঃ! নিজের অজান্তে উচ্চারিত হল শ্মশানভূমি অতি ভয়ানক। কাপড়ের কোছা দিয়ে ঘাম মুছলেন। চলা শুরু হল। হঠাৎ দিগবিশারী দুধেল জ্যোৎস্নায় দেখলেন আমরল গ্রামের সদর রাস্তা হয়ে দড়াম দড়াম শব্দে কোনো একটা কালো জানোয়ারকে আমবাগানের পাশ দিয়ে ছুটে যেতে। জানোয়ারটা আমরাল গাঁয়ে ঢুকে গেল বোধহয়। স্তম্ভিত শ্লথ পায়ে তিনি লক্ষ করলেন—শুনলেন অনেক দূর অব্দি তার চারপায়ের উদ্দাম শব্দ। পরক্ষণেই মনে পড়ল পাত্রবাগড়ার গোয়ালাদের দুটো বয়েল কাঁড়া আছে। একটা চারু গোয়ালার আর একটা গুঁড় গোয়ালার। হয়তো গরম হয়েছে তাই খুলে দিয়েছে। এর মধ্যেই চক্রবর্তী মূল রাস্তায় এসে পড়েছেন। চমৎকার মোরাম দেওয়া। ইংরেজ আমলের ডাক যাওয়া। ইংরেজদের তৈরি পাথরের মস্ত সাঁকোটা—ওই তো সামনেই। সাঁকোটা পেরিয়ে হাত পঞ্চাশেক গেলেই ডানদিকের তেমাথা ঘুরে মুখুজ্যেপাড়া—তারপরেই গোস্বামীপাড়ায় শ্বশুরালয়—। সমস্ত অবসন্নতা কাটিয়ে এবার নিরুদ্বেগে বাঁহাতে কোঁছা ধরে ডানহাতে শালপাতার মুখবন্ধ কট্‌ড়া ঝুলিয়ে সাঁকো পার হবেন এমন সময় শুনতে পেলেন সেই বয়েল কাঁড়াটা তার বীভৎস অন্ধকার শরীর নিয়ে দড়াম্ দড়াম্ শব্দে প্রচণ্ড জোরে তার দিকের রাস্তাতেই ছুটে আসছে। সুষুম্নাকাণ্ডে শীতল বিদ্যুৎ খেলে গেল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ-শীতল হয়ে এল—সেই মূর্তিমান আগন্তুকের অপ্রতিরোধ্য-দুর্বিনীত-আক্রমণের অনিবার্যতায়।

(কালভার্টে) সাঁকোর পাথরে বসে পড়লেন নিজেকে লুকিয়ে সম্ভাব্য আক্রমণকে এড়াতে। কালভার্টের উপর দিয়ে সাইক্লোনের মতো বেরিয়ে গেল বয়েল কাঁড়াটা। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে তখন চক্রবর্তীমশাই কপালের ঘাম মুছছেন যন্ত্রণাদায়ক অভিব্যক্তিতে। পাশে নামানো রসগোল্লার মুখটায় সিঁয়াপাতার (শালপাতা) ঢাকনা খুলে একটার পর একটা রসগোল্লাকে উদরসাৎ করলেন। কারণ এগুলো কাছে থাকলে তিনি আর বেঁচে শ্বশুরালয়ে ফিরবেন না। লাশ হয়ে যেতে হবে—মুর্দা—'বনে' যেতে হবে। সমস্ত সত্তা দিয়ে চক্রবর্তী উপলব্ধি করলেন জানোয়ারটা আর কেউ নয়—সেটা একটা প্রেতাত্মা-যেটা উপেন্দ্রবাবুর আমবাগানের 'শ্মশান' থেকেই পিছু নিয়েছিল।

জীবন্ত কাহিনী (২)

পাথরের কালভার্ট বসে সবকটা রসগোল্লাকে উদরসাৎ করার একটা বিশীর্ণ যন্ত্রণা মনে মনে হচ্ছিলই—খালি হাতে শ্বশুরালয়ে যাওয়ার অসৌজনতায়। শ্লা-বদ প্রেতাত্মাটার জন্যেই আজকের রাতটা সুখকর হলনা। একপেড়ে বাথান চালালেন। এতক্ষণে সুস্থবোধ করছেন তিনি। এখন কিছুটা বলশালীও মনে হচ্ছে। রহস্যময়স্মিতহাস্যে মনে মনে উচ্চারণ করলেন 'এরপর আয় দিকি শালা—প্রেতগয়াতে দিয়ে আসব—!'

পরবর্তী অধ্যায়ে শ্বশুরালয়ে কাছাকাছি প্রাকৃতিক বেগহেতু শৌচক্রিয়ার জন্য ডোবার ঘাটে ঘোমটা ঢাকা স্ত্রীলোক দর্শন। অপেক্ষান্তে বিরক্তি। শেষপর্যায়ে শৌচাদি সমাপন শেষে ঘোমটা ঢাকা স্ত্রীলোকটি ওই অবস্থাতেই চোখের সামনেই বড় খকরা আমগাছে তরতর করে উঠে যাওয়াতে ভয়তরাসে শ্বশুরালয়ে আগমন। স্ত্রীর পরিচর্যায় সুস্থতার অব্যবহিত অন্তজ্বর—পৃষ্ঠব্রণ—। দিন দশেকের মধ্যেই 'চিকিৎসাকে' আহাম্মক অড়কঁক বানিয়ে পঞ্চভূতে লীন শ্রীবিমল চক্রবর্তীমশাইয়ের দেহীজীবন।

এখনও বেঁচে থাকা শ্মশান ও গোরস্থানের পরিসংখ্যানসূচি :

১. বিষ্ণুপুর শ্মশানকালীর মহাশ্মশান

বিষ্ণুপুর শ্মশানকালীর অনতিদূরেই 'সতীস্থান' বলে পরিচিত। (সতীকুণ্ড) এখানেই দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহকে রানী চন্দ্রপ্রভা—চন্দ্রপ্রভার সহচরী সুরঞ্জাক্ষীকে দাহ করা হয়েছিল চন্দনকাষ্ঠ ও গব্যঘৃত সহযেগে। (সহমরণে) এখানেই অসামান্য রূপসি ও নৃত্যগীতপটিয়সী লালবাঈ এর জন্য প্রেমিক রাজা রঘুনাথ (২য়) 'নূতন মহল' তৈরি করেছিলেন। (বিষ্ণুপুর কুমারী টকি হাউসের পিছনেই) এখানেই 'ভোজনটিলা' বলে পরিচিত লালবাঈয়ের গর্ভজাত (২য়) রঘুনাথের ঔরসজাত পুত্রসন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে বিষ্ণুপুরের সমস্ত হিন্দুপ্রজাকে নিমন্ত্রণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু উপেক্ষিত হয়েছিল সে আমন্ত্রণ। রানী চন্দ্রপ্রভা কুলগুরু ও অগনন প্রজা ভক্তবৎসলদের অসহযোগিতায়। মর্মান্তিক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লালবাঈ ও শিশুসন্তানকে লালবাঁধের জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল ধর্মভ্রষ্টের অজুহাতে। বিষ্ণুপুরের হিন্দু প্রজাদের বিধর্মীকরণের

সূক্ষ্মতম ভালোবাসার ছদ্মবেশে—ষড়যন্ত্রের হৃদয়বিদারী আখ্যানেতিহাসে।।

২. কালিন্দী বাঁধপাড় মহাশ্মশান

৩. সিদ্ধেশ্বরী কালী মহাশ্মশান

৪. বিড়াই মহাশ্মশান

৫. দ্বারকেশ্বরের বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি মহাশ্মশান

৬. সতীর বাগান (লালচক) মহাশ্মশান

৭. উপেন্দ্রবাবুর বাগান

প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ অযোধ্যার জমিদার বংশীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতৃদেব গিরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮নং ধরাপাট মৌজায় এই বাগানের অবস্থান, দাগ নং-১৯৪১/১৯৫২, খতিয়ান নং—৩৭০/১, জেলা—বাঁকুড়া, ব্লক—বিষ্ণুপুর, পরিমাণ—২ একর, মোট—৬ বিঘা। তার মধ্যে 'মহাশ্মশান' ৩ বিঘৎ। বাংলা ১৩৭৮ সালের বন্যায় (দ্বারকেশ্বরের) এই বাগানের প্রভূত ক্ষতি হয়। এখনও শেষ নিদর্শন হিসেবে গোটা (৩০) খান তিরিশেক মস্ত আমগাছ টিকে আছে। বর্ত্তমান বংশধরদের মধ্যে এখানে শবদেহ—দাহকার্যাদির জন্য (বৃষ্টির জন্য) শবযাত্রীদের উদ্দেশ্যে (১) কুঠুরি পাকা ঘরের বন্দোবস্ত করেছেন।

৮. কাঁকিল্যার 'দ' শ্মশান

৯. বনরাধানগর কালীশ্মশান মহাশ্মশান

১০. দোলার বাগান মহাশ্মশান

১১. শুক্ল পুকুর শ্মশান

গোরস্থান :

(১) কবরডাঙা (২) ঘোড়ালি সাহেবের আস্তানা (৩) দ্বারিকা দক্ষিণপাড়া কবরস্থান (৪) বাকুস্থান (৫) ইদগাতলা (৬) বিহারির পাড় (৭) খুনডাঙা (৮) বন পারুল (৯) মানুষমারী (১০) চকাই (১১) চাঁকাই (১২) হরিপুষ্করিণী কবরস্থান (১৩) বিউর (১৪) কুমরুল (১৫) খিরি (১৬) নারকেলডাঙা (১৭) ধুলোর পুকুর (১৮) বুরুজ পোতা (১৯) কদুয়া (২০) ধানশিমলা (২১) সোনামুখী কবরডাঙা।

(লেখক কর্তৃক সংগৃহীত)।

সাহায্য সূত্র ঃ 'গীতা' 'হরিবংশ' 'মুরারী মোহন বেদান্ততীর্থ মহাশয়', 'অনেক প্রিয় মানুষ' 'বর্তমান' পত্রিকা।

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক।

বাঁকুড়া শহর-সংলগ্ন শ্মশান ও গোরস্থান

শান্তি সিংহ

পূর্বাভাষ :

শ্মশান-বিষয়ে লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে অতি শৈশবের স্মৃতি। 'বর্ণ পরিচয়'-এর গণ্ডি উতরাইনি তখনও। আইনজীবী-পিতার এক বন্ধু আচমকা জিগ্‌গেস করলেন, 'বলো তো খোকা, 'শাল্মলী'র কী বানান'? কোনওক্রমে তার সঠিক বানান বলার পরই তাঁর প্রশ্নের দ্বিতীয় বলো, 'শ্মশান'এর বানান। মামাতো দিদির হাতের সেলাই-নক্সার বাঁধানো ফ্রেমের পদ্য তখন মনে ভেসেছিল : 'সুখ স্বপনে, শান্তি শ্মশানে।' তাই বানান-বিদ্যের দৌড় স্বচ্ছন্দে শ্মশান-অবধি পৌঁছে ছিল।

বাস্তবে আবার শ্মশান-ভাবনা শুধু নয়, হৃদয়-শ্মশান নিয়ে শ্মশানে আগমন। ১৯৭৬-এর দোল পূর্ণিমার রাত। বাবার নশ্বর দেহ লকলকে অগ্নিশিখায় ক্রমে হয়েছিল ভস্মীভূত; বাঁকুড়া শহরের পূর্বপ্রান্তে, গন্ধেশ্বরী নদী-তীরবর্তী লখিয়াতড়া শ্মশানে। তার একযুগ পরে সেখানেই গর্ভধারিণীর নিথর দেহও জ্বলে উঠেছিল, এক শীত রাতে।

লখিয়াতড়া শ্মশান :

আদি-অস্ত্রালদের অস্ট্রিক ভাষা থেকে 'তড়া/ তোড়া' কথাটি এসেছে। কৃষিকাজে অনুপযোগী বা অব্যবহৃত পতিত-ভূখণ্ড হল—তড়া, বাইদ, ডাঙা, ডিহি। সেভাবেই এসেছে—শালতড়া/শালতোড়া, জামাবাইদ, ভুবনডাঙা, কুঁক্‌ড়াডিহি/ কুঁকড়াডিহি কুঁক্‌ড়াডি ইত্যাদি গ্রামনাম বা অঞ্চলক্ষেত্র। 'লক্ষ্মী' নামটি আদরার্থে বা তুচ্ছার্থে পুরুষবাচক হলে 'লখিয়া' বা 'লখ্যা' হয়। তা থেকে বোঝা যায়, কোনও লক্ষ্মীকান্ত নামযুক্ত বদান্য ব্যক্তির 'তড়া' বা পতিত জমিতে গড়ে-ওঠা শ্মশানটি বাঁকুড়ার উপভাষায় (বাঁক্‌ড়ি ভাষায়) হয়েছে লখিয়াতাড়া বা লখ্যাতড়া।

বাঁকুড়া শহর-মৌজায় এই শ্মশানের আয়তন প্রায় আড়াই একর। রানিগঞ্জের মোড়, কুচকুচিয়া রোড, পালিতবাগান দিয়ে এগিয়ে গেলেই স্তব্ধ গম্ভীর শ্মশান! নির্জন আরণ্যক পরিবেশে মা-কালীর মন্দির। পাশে শিব ও হনুমানের মন্দির। অনতিদূরে সাধক বামাখ্যাপার মূর্তিসহ মন্দির। স্থানীয় শ্মশান বিশেষজ্ঞদের অভিমত—এই শ্মশানেই আছে পঞ্চমুণ্ডির আসন। দেয়ালে আছে অর্ধশতাধিক (ছাপান্নটি) নরকরোটি শোভিত তান্ত্রিক মহিমা। মন্দির-সংলগ্ন টিনের শেড পেরিয়ে বিশাল বটগাছ। তার বাঁদিকে আছে দুটি চুল্লি। টিনের শেড। তার কাছে কংক্রিটে-বাঁধানো আরও নতুন তিনটি চুল্লি। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। বাঁকুড়া পৌরসভা সরবরাহ করেন পর্যাপ্ত জল। তাছাড়া আছে টিউবওয়েল। শ্মশানযাত্রীদের জন্য আছে সুন্দর বিশ্রামাগার। বাঁকুড়া লায়ন্স ক্লাবের প্রধান বিষ্ণু বাজোরিয়া—যিনি উচ্চশিক্ষিত সমাজসেবী, তাঁরই সৌজন্যে নির্মিত।

স্থানীয় অতি বৃদ্ধজনেরা বলেন—তাঁরা আগের প্রজন্মের মানুষের কাছে জেনেছেন—গন্ধেশ্বরী নদী তীরবর্তী এই অঞ্চল একদা ছিল কেয়াগাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গহিন পরিবেশে তখন ছিল বিস্তর সাপের উপদ্রব। অথচ বর্তমানের শান্ত সুরম্য পরিবেশ দেখে যে-কোনও ভাবুক আবেগ দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠতে পারেন—'শ্মশানের বুকে আমরা রোপন করেছি পঞ্চবটী....।'

লোকপুর শ্মশান :

বাঁকুড়া শহরের পশ্চিমপ্রান্তে গোবিন্দনগর, লোকপুর। গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড, সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ বিখ্যাত। অনতিদূরে দ্বারকেশ্বর নদ। এই দ্বারকেশ্বর নদতীরে, স্থানীয় দানা-পরিবারের বদান্যতায় একদা চার বিঘা পোড়ো জমিতে গড়ে উঠেছে লোকপুর শ্মশান। দানা-পরিবারের জমি ছাড়াও দ্বারকেশ্বরের জেগে-ওঠা চরে সুবিস্তৃত এই শ্মশান। যথারীতি বট, অশ্বত্থ বৃক্ষ শোভিত নির্জন পরিবেশে আছে একটি কালীমন্দির এবং বিশ্রামাগার। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা। লোকপুর রাজগ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মৃতদেহ সৎকারের সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালের বেওয়ারিশ মৃতদেহগুলিও দাহ করা হয় যথোচিত মর্যাদায়।

পাটপুর শ্মশান :

বাঁকুড়ায় পাটপুরের তেরাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে এই শ্মশান। মূলত পাটপুর ও মালপাড়ার অধিবাসীরা এই শ্মশানে দাহপর্ব সমাধা করেন। একে মীনাপুরের শ্মশানও কেউ কেউ বলেন। প্রায় এক একর জমিতে গড়ে উঠেছে এই শ্মশান। এখানেও আছে যথারীতি কালীমন্দির, শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রামাগার। পানীয় ও প্রয়োজনীয় জলের সুব্যবস্থা আছে।

কেঠারডাঙা শ্মশান :

বাঁকুড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছেই কেঠারডাঙা। কেঠারডাঙা মৌজায় দ্বারকেশ্বর নদের কাছে গড়ে উঠেছে শ্মশান। এখানেও যথারীতি আছে মন্দির, বাঁধানো অশ্বত্থ গাছ। উন্মুক্ত পরিবেশে সমাধা হয় দাহকার্য। বাঁকুড়া পৌরসভা ও স্থানীয় মানুষদের আর্থিক অনুদানে একটি বিশ্রামাগার তৈরি হচ্ছে।

রামপুর শ্মশান :

বাঁকুড়া শহরের উত্তরদিকে বনেদি বাসিন্দাদের বাস পাঠকপাড়া, রামপুরে। কাছেই গন্ধেশ্বরী নদী। পলাশ, আঁকড়, আম, অর্জুন গাছের ছায়াঘেরা পরিবেশ। সেখানেও দাহপর্ব অনেকে সমাধা করেন। আবার অনেকে দোলতলা পথে এগিয়ে যান লখিয়াতড়া শ্মশানে।

পলাশতলা শ্মশান :

রামপুর ও স্কুলডাঙার যেখানে মিশেছে, সেই রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলেই জুনবেদিয়া গ্রাম। জুনবেদিয়া মৌজার ৩৯নং দাগে গড়ে উঠেছে এই শ্মশানভূমি। অনতিদূরে গন্ধেশ্বরী নদী। বাঁকুড়া শহরপ্রান্তে বাইপাস রোড। পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর, দুর্গাপুর, বর্ধমানগামী নানা বাস ছুটছে। সেই বাইপাস থেকে লাল মোরাম রাস্তায় প্রায় এক কিলোমিটার দূরে এই শ্মশান। শ্মশান কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ রায়। বাঁকুড়া পৌরসভার ৯নং, ১০নং, ১১নং এবং ১২নং ওয়ার্ডের

বহু মানুষ তাঁদের প্রিয়জনের শবদাহের উদ্দেশ্যে এখানে শোকবিহ্বল চিত্তে সহজভাবে আসেন। খোলা পরিবেশে দাহকার্য চললেও আছে বিশ্রামাগার। সম্প্রতি দুটি চুল্লি তৈরি হচ্ছে। রামপদ লোহার নামে এক দানশীল বাঁকুড়াবাসী এই শ্মশানের উন্নতিকল্পে পনেরো হাজার টাকা দান করেছেন। এই শ্মশানেও যথারীতি আছে বাঁধানো বটগাছ, কালীমন্দির। সেই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন হারাধন কর্মকার, তাঁর পরলোকগতা জননীদেবীর স্মরণে। স্থানীয় শিল্পী সুজয় দাস এখানেই রোহিতাশ্ব শৈব্যার অপরূপ শিল্পসৃষ্টি করেছেন। ফুল ও ফল গাছ শোভিত শ্মশানভূমি। অথচ স্থানীয় মানুষদের ক্ষোভ এখানে আসার জন্য মোরাম রাস্তাব কালভার্ট আজও পাকা হয়নি।

নতুনচটি শ্মশান :

বাঁকুড়া পৌরসভাভুক্ত এই শ্মশানটি পুকুরের তীরবর্তী এলাকায়। এখানেও আছে কালীমন্দির ও বিশ্রামাগার। বাঁকুড়া শহর চারপাশে ক্রমশ বেড়ে ওঠার ফলে, এই শ্মশানটির কাছে গড়ে উঠেছে বসতি। অথচ শ্মশানভূমির সংরক্ষিত এলাকা বিঘা খানেক। তাই এই শ্মশানটি নিয়ে পৌরসভার বিশেষ দায়িত্ব আছে।

কানকাটা শ্মশান :

গোড়াবাড়ি অঞ্চলের অন্তর্গত কানকাটা মৌজায় গড়ে উঠেছে এই শ্মশান। দাহপর্ব সমাধা হয় উন্মুক্ত পরিবেশে। এখানেও আছে কালীমন্দির ও বিশ্রামাগার।

কেশরা শ্মশান :

আঁচুড়ি - শালবনি অঞ্চলে এই শ্মশান। কালীমন্দির আছে। খোলামেলা ভাবে শবদাহ কার্য সম্পন্ন করেন স্থানীয় মানুষ। বাঁকুড়া শহরপ্রান্তে কাটজুড়িডাঙা থেকেও মৃতদেহ আনা হয় সৎকারের জন্য।

রাজগ্রাম শ্মশান :

বাঁকুড়া শহর-সংলগ্ন বর্ধিষ্ণু অঞ্চল রাজগ্রাম। স্থানীয় উচ্চারণে রাজগাঁ। এটিও বাঁকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত। অথচ রাজগ্রামে নেই পৌরসভা নির্দিষ্ট শ্মশানভূমি। তাই গ্রামবাসীরা দ্বারকেশ্বর নদের বালিতে বা ব্রিজের নীচে চিরাচরিত প্রথায় দাহকার্য সমাধা করেন। বর্ষার দিনে স্বাভাবিকভাবেই নানা অসুবিধা হয়।

গোরস্থান :

বাঁকুড়া শহরে, খ্রিস্টানদের মৃতদেহ তাঁদের রীতিমান্য করেই একদা ভূগর্ভে কবর দেওয়া হত সিমেটারি রোডে। জেলায় জনবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সেই সুযোগ ওই অঞ্চলে এখন নেই। তাই বর্তমানে খ্রিস্টানদের সুরক্ষিত কবরভূমি (গ্রেভ ইয়ার্ড) গড়ে উঠেছে শহর সংলগ্ন গোবিন্দনগর মৌজায়, এক একর পরিমাণ ভূখণ্ডে। সেখানের সমাধিস্থলে (গ্রেভ ইয়ার্ড) প্রোথিত বহু ক্রসচিহ্ন ও লিপি অনেক প্রিয়জনের স্মৃতিকে মৌন মহিমায় জাগরূক রেখেছে।

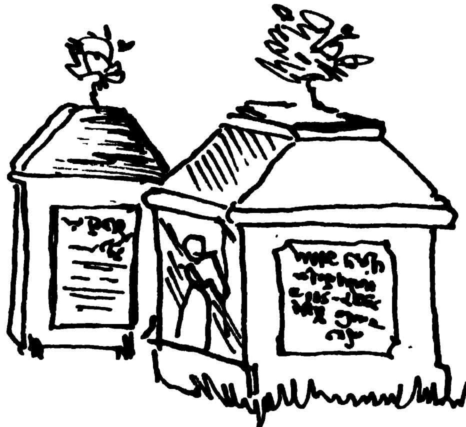
মুসলমানদের গোরস্থান :

বাঁকুড়া শহরের মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদের প্রিয়জনের কবর বা গোর-দেওয়া পর্ব অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে সুসম্পন্ন করেন। বাঁকুড়া রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন কেঠোরডাঙা অঞ্চলে আছে একটি কবরস্থান। তাছাড়া, শহরের বর্ধিষ্ণু অঞ্চল প্রতাপবাগান এবং তার কিছু দূরেই আছে খ্রিস্টানডাঙা। এখানে প্রায় আড়াই একর জুড়ে প্রাচীর ঘেরা সুরক্ষিত পরিবেশে মর্যাদাবান কবরস্থান গড়ে উঠেছে জেলার সিপিএম নেতাদের সক্রিয় উদ্যোগে। মাননীয় সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে দু'লক্ষ টাকার অনুদান দেওয়ায় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ মনোমতভাবে তাঁদের প্রিয় স্মৃতির পরিবেশ নির্মাণ ও সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছেন।

উপসংহার :

শ্মশান বা গোরস্থানের প্রতি অধিকাংশ নরনারীর প্রীতির পরিবর্তে আছে লোকসংস্কারজাত ভীতি ও ভক্তি। অথচ মানুষের অন্তিম পরিণতির স্থূল স্বাস্থ্য পরিষেবা-বহির্ভূত, জীবনবিমুখ কোনও ব্যাপার নয়—এই সত্য অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিতদের কাছে শুধুমাত্র নয়, তথাকথিত শিক্ষিত নরনারীদের কাছেও সহজে পরিজ্ঞাত না হওয়ায় পরিবেশ সংরক্ষণ ভাবনায় উন্নততর প্রযুক্তি ও মানবিকবোধের অপেক্ষা রাখে বই কী!

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন :
অতনু চট্টোপাধ্যায়।



❑ লেখক পরিচিতি : কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক।

সোনামুখী শ্মশান কথা

হরিসাধন চন্দ্র

'পুড়ছিলো ঐ শ্মশান ভরে কাঠের রাশি
পুড়তে আমি ভালোবাসি, ভালোই বাসি।
পুড়তে আমি চাচ্ছি কোনো নদীর ধারে।
কারণ, একটা সময় আসে, আসতে পারে
যখন আগুন অসহ্য হয নদীর ধারে।
এবং মড়া চাইতে পারে এক কুষি জল!
মৃত্যু তখন হয় না সফল, হয় না সফল!'

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মর্মোৎসারিত এই কথাগুলি বা এর অন্তর্লীন ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ অন্য কোনো বাক্য হয়তো অনুরণিত হবে আপনার মনের মধ্যে, যদি একবার গিয়ে দাঁড়ান সোনামুখী শ্মশানে, বিশেষ করে যদি আবার রাত্রির নির্জনতার মধ্যে কোনো শবদাহের দৃশ্য আপনার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রিয় মানুষের, চেনা মানুষের পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া অথবা নিজেরও পায়ে পায়ে ওই অন্তিম শয্যায় শোয়ার জন্য এগিয়ে যাওয়ার ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে যাবেন আপনি। আর হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেও কিছু দেখে যাওয়ার, চলে যাওয়ার পরেও অনুরাগে, অনুতাপে ফিরে ফিরে আসার একটা রহস্যঘন সুর আপনাকে আচ্ছন্ন করবে।

এ শ্মশান সূর্যের আলোয় একরকম, আবার জ্যোৎস্নারাত্রে আর একরকম, আবার অমাবস্যার অন্ধকারে এই শ্মশানই ধারণ করবে আর এক রূপ।

এক কাজ করা যাক, চলুন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নিয়ে বেলা থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ি। তাহলে দিনের আলোয় শ্মশানের রূপটা দেখা যাবে, দেখতে পাওয়া যাবে চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আবার দেখতে দেখতে সূর্য পাল্টে যাবে। সন্ধ্যা গড়িয়ে নামবে অন্ধকার। শ্মশানের রাত্রের রূপও দেখে নেওয়া যাবে।

দুপাশে ধানখেত, পুকুর, ঝোপঝাড়ের স্নিগ্ধ শ্যামলিমার বুক চিরে দুর্গাপুরের দিকে চলে যাওয়া উত্তরমুখী ধুলোয় কালোয় মেশা পিচ ঢালা রাস্তা থেকে হঠাৎ ডানদিকে অর্থাৎ পূর্বদিকে একটা সাদা হাতছানি আপনাকে ডাকবে। শান্তি, বিষণ্ণতা, মানসিক আশ্রয়—সবকিছুর মেলবন্ধনে কেমন যে একটা মিশ্ররাগের বিধুর-মধুর মূর্ছনা। চলুন না এগিয়ে যাই—ওই হাতছানির টানে।

দুপাশে, পিছনে সবজু আর সবুজ! এইরকম একটা পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুদৃশ্য তোরণ। এই দুধসাদা তোরণটি আপনাকে ডাকবে তার স্নিগ্ধ, শান্ত অথচ গম্ভীর হাতছানিতে।

আর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এগোলেই ...।

সবুজ আর নদীর আদরে ঘেরা ছোট্ট শহরটার নাম সোনামুখী। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত এই শহরটির উত্তরে ১৭ কি.মি. দূরত্বে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল, দক্ষিণে ৩০ কি.মি. দূরত্বে বিষ্ণুপুর, পূর্বে ৬০ কি.মি. দূরত্বে বর্ধমান শহর আর পশ্চিমে ৪৫ কি.মি. দূরত্বে নিজের জেলারই সদর শহর বাঁকুড়া। মোটের ওপর এই হল সোনামুখীর অবস্থান তথা চৌহদ্দি। সোনামুখীর একেবারে বুকের মাঝখান দিয়ে বাঁকুড়া-বর্ধমান রোড আর বিষ্ণুপুর-দুর্গাপুর রোড পরস্পরকে ছেদ করেছে। এই চৌরাস্তার মোড় (সোনামুখীর স্থানীয় ভাষায় 'চৌমাথার মোড়' বলেই সমধিক পরিচিত) থেকে একেবারে সোজা উত্তরমুখে চলুন এগিয়ে যাই। হেঁটে মিনিট কুড়ির বেশি নয়। হ্যাঁ রিক্সাও আছে। খুব একটা আপত্তি-অসুবিধে না থাকলে চলুন না হেঁটেই এগোই। দু-পাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো দুচোখ ভরে দেখে নেওয়া যাবে।

এই যে এবার দেখতে পেয়েছেন তো—ডানদিকে তাকান। সেই যে বলছিলাম—সাদা তোরণের সাদা ইশারা। তোরণের শীর্ষদেশে মাঝামাঝি অঞ্চলে একটি মন্দিরাকৃতি অংশের মধ্যে দেবী কালিকার মূর্তি। তোরণ শীর্ষের দু-প্রান্তে দুটি ছোট ছোট চূড়া—সেগুলিও মন্দিরের আদলে গড়া। ওই পার্শ্ব চূড়াগুলির ঠিক নীচেই শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রী মা সারদাদেবীর প্রতিমূর্তি। তোরণের দু-দিকের, স্তম্ভের একেবারে নিম্নভাগে দুটি মঙ্গলকলস। এই সবকিছুই সিমেন্টের তৈরি, আর একেবারে দুধসাদা রঙের। এই তোরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাই চলুন কংক্রিটের রাস্তা ধরে। এখানে ওখানে সাদা খই, ছড়ানো ফুল চোখে পড়ছে? হয়ত আজই, অথবা গতকাল এই পৃথিবীর অন্তিম যাত্রার কেউ...

এই দেখুন কথা বলতে বলতে আমরা এসে পড়েছি সোনামুখী শ্মশানে। এই দেখুন প্রথমেই বাঁ-হাতে কালীমন্দির, প্রশস্ত চত্বর, ফিকে হলুদ দেয়াল। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে বৈষ্ণবদের সমাধি। আসুন আর কয়েক পা এগিয়ে যাই। হ্যাঁ এবারে এসে পড়েছি আমরা দাহ করার জায়গায়। কাঠের চিতাই সাজানো হয় এখানে আপনার সামনেই। এই প্রাচীন বটবৃক্ষ, চারদিকে এত সবুজ, দেবী কালীর ভয়ঙ্করী অথচ সুষমামণ্ডিত প্রতিমা, দু-চারটে পাখির আওয়াজ—এই যে একটা নির্জন গম্ভীর শান্ত পরিবেশ, এতে আবহসঙ্গীতের ভূমিকায় রয়েছে—একটু কান পাতুন; হ্যাঁ শুনছেন?—কুলকুল ছল-ছল শব্দ? এই শ্মশানেরই গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে শালী নদী। এটা দামোদরের উপনদী। এই নদীই এই শ্মশান তথা সমগ্র সোনামুখী শহরের উত্তরসীমা নির্দেশ করছে। শালী নদীর ওপারে আছে দুটি গ্রাম গোলতোড় আর মহেশপুর। দুর্গাপুরগামী পিচরাস্তার পূর্বদিকে গোলতোড়, পশ্চিমে মহেশপুর। এই মন্দির, দাহস্থান, বটতলা—এসব নিয়ে এই যে মূল অংশ,—এটা হল বিঘে খানিক জায়গা জুড়ে। আর একেবারে সেই তোরণ থেকে শুরু করে শ্মশানের অধীনস্থ সমগ্র অঞ্চলের আয়তন প্রায় কুড়ি বিঘে। আসুন

একটু বসা যাক। এই তো—দেখুন, কালীমন্দিরের চত্বরে ও তার দুপাশে সিমেন্টের তৈরি লম্বা বসার জায়গা। ও, ধুলো রয়েছে একটু-আধটু? খবেরর কাগজের কিছুটা অংশ পেতে বসে পড়া যাক।

হ্যাঁ, এই সোনামুখীর জনবসতি তথা সোনামুখী শ্মশান অত্যন্ত প্রাচীন। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের কথা অনুযায়ী, সোনামুখী পৌরসভার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকারের লেখা 'বিষ্ণুপুরের অমরকাহিনী' শীর্ষক ঐতিহাসিক তথ্যের আকরগ্রন্থ অনুযায়ী এই সোনামুখী শ্মশান প্রায় দু-হাজার বছরের পুরানো। কারণ সোনামুখীর প্রবীণ ব্যক্তিরাই বলছেন যে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের রাজত্বের একেবারে উষালগ্নেও সোনামুখী শ্মশান ছিল। বিষ্ণুপুরের আদিমল্ল রঘুনাথ সিংহাসনে আরোহণ করেন ১০১ বঙ্গাব্দে তথা ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ তেরোশো বছরেরও বেশি। কিন্তু সোনামুখীর প্রবীণ ব্যক্তিদের মতে নাকি তারও প্রায় পাঁচ ছশো বছর আগে থেকে সোনামুখীতে জনবসতি গড়ে উঠেছে।

তবে একটা কথা, ওঁদের বিবৃতির মধ্যে ফুটে উঠছে। সেটা হল, বহুকাল পর্যন্ত চিতা সাজানোর একটা সুনির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। সুবিধা সুযোগ অনুযায়ী ও কিছুটা আবার নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ওই এলাকাতেই শালী নদীর ধারে এখানে ওখানে দাহ করা হত। তারপর বর্তমান দাহস্থলেই নিয়মিতভাবে চিতা সাজানো শুরু হয়। এই ব্যবস্থা চলে আসছে প্রায় চারশো বছর ধরে। লক্ষাধিক শবদাহ হয়েছে এখানে। তাই এটি আজ মহাশ্মশান বলা যায়। আর ১৩৮২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পৌরপ্রধান প্রয়াত শ্রীনারায়ণগোপাল চট্টোপাধ্যায়-সহ সোনমুখীর আরও কয়েকজনের বিশেষ উদ্যোগে কালীমন্দির ও শ্মশানযাত্রীদের পাকা বিশ্রামস্থল নির্মিত হয়; একটি নলকূপও নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমনোহর চট্টোপাধ্যায় পৌরপ্রধান থাকাকালীন সোনামুখী পৌরসভার উদ্যোগে ও ব্যয়ভার গ্রহণে প্রবেশপথের সারা তোরণটি, পাকা কংক্রিট রাস্তা, দুপাশের উদ্যান, বসার জায়গা, কালীমন্দিরের ভাঁড়ার ঘর প্রভৃতি নির্মিত হয়। বর্তমানে শ্মশানের তদারকির জন্য পৌরসভার বেতনভুক্ত একজন কর্মী আছেন। স্থানীয় কোনো কোনো মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী শ্মশানযাত্রীদের জন্য যে বর্তমান আশ্রয়স্থল সেটির আদিরূপটি নির্মিত হয়েছিল প্রায় ১২৫ বছর আগে। প্রতি অমাবস্যায় কালীমন্দিরে খিচুড়িপ্রসাদ হয়। স্থানীয় মানুষেরা মহানন্দে খিচুড়িপ্রসাদ পাওয়ার জন্য যান। অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করেন শ্মশানের পূজার জন্য। আর কালীপূজার সময় তো বেশ বড়রকম আয়োজনেই পূজা হয়। তবে বহু মানুষের খিচুড়ি ভোগ আর ভক্তিভরে পূজানুষ্ঠান—এ দুটোর ওপরই জোর দেওয়া হয় প্রধানত সাজসজ্জা বা অন্যান্য আড়ম্বর ততটা হয় না প্রায়।

ওই দেখুন কথা বলতে বলতে কখন পশ্চিম আকাশ লাল করে সূর্য দিগন্ত-ছুঁয়ে ফেলেছে। অস্পষ্ট চাঁদ দেখা দিয়েছে। আর একটু না হয় বসাই যাক। চাঁদনি রাতে আলো-ছায়ার রহস্যময়তার মধ্যে এই শ্মশানটিকে আর এক রূপে না হয় দেখে তারপর ওঠা যাবে। ওই দেখুন—চাঁদ এবার ঘন অন্ধকারের মধ্যে অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চারদিকের গাছগাছালিতে রাতের কালচে

অন্ধকারের ওপর একটা রূপালি রঙের পাতলা আস্তরণ কেউ যেন বিছিয়ে দিয়েছে। এই নির্জন আলোছায়ার মধ্যে ঝিঁঝির ডাক, রাতচরা পাখির ডানা ঝট্‌পট্‌, জন্তুজানোয়ারের চলাফেরার সরসর শব্দ আর তারই সঙ্গে শালী নদীর কুলকুল ও ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সঙ্গত—সব মিলিয়ে কেমন সুন্দর একটা মধুর, গম্ভীর, বিষণ্ণ সৌন্দর্য বিরাজ করছে এখানে। অমাবস্যা বা জ্যোৎস্নাবিহীন অন্যকোনো রাত্রেও এই শ্মশানের আর এক গম্ভীর নির্বাক সৌন্দর্য। তবু জ্যোৎস্নারাতের আলো আঁধারি মায়াময় সৌন্দর্য অনেক বেশি রহস্যময় আর নির্বাক হয়েও যেন অনেক বেশি বাঙ্ময়। অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে অথচ স্পষ্ট নয়—এরকম একটা পরিমণ্ডলে সবকিছুই যেন গম্ভীর তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। হারিয়ে যাওয়া প্রিয় বা পরিচিতজনেরা যেন কানের কাছে এসে কত কথা বলতে থাকেন। হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলির প্রতি কৃত ব্যবহার বা বাক্যালাপের নির্মমতা বা অসঙ্গতির কথা মনে পড়ে অনুতাপের আগুনে পুড়তে থাকে আমাদের মন। হঠাৎ খেয়াল হয়—আমরাও পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি ওই অন্তিমশয্যার দিকে। সোনামুখী শ্মশানের মতো এমন নির্জন, নীরব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতাঘেরা শ্মশানেই এরকম অনুভূতি জাগা সম্ভব। এখানে দাঁড়িয়ে এক একসময় অনেক বড় বড় ক্ষোভ, প্রতিশোধস্পৃহা, অতৃপ্তি, কামনা হারিয়ে যায় মন থেকে। হয়ত চোখের সামনে দাহবান শবদেহের দিকে অথবা দাহস্থানের দিকে তাকিয়েও মনে হবে যার সঙ্গে আজই ঝগড়া হয়েছে, বচসা হয়েছে—সেই মানুষটাকেই বুকে জড়িয়ে বলি "এসো দুজনেই মাঝখানের দেওয়াল ভাঙার কাজে হাত লাগাই"; যে প্রিয়জনকে অনেক কথা বলা বাকি রয়ে গেল, এইবেলা বলে দিই সেইসব না বলা ব্যথা, গোপন অনুতাপ; যতগুলো ক্ষতে পারি, লাগিয়ে দিই উপশমের প্রলেপ—শেষবারের মতো বিদায় নেওয়ার আগে বা বিদায় দেওয়ার আগে।

বাঙালি হিন্দু পরিবারের, বিশেষত গ্রামাঞ্চল বা মফস্‌সল অঞ্চলে শ্মশানযাত্রা ও দাহকার্যকালীন আচার-অনুষ্ঠান মোটামুটি একইরকম। অঞ্চলভেদে তেমন একটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না। নতুন কাপড়ে শবদেহকে আচ্ছাদিত করে ফুলমালা চন্দনে সাজিয়ে অন্তিমযাত্রায় নিয়ে যাওয়ার প্রথা সোনামুখীতেও আছে। "বল হরি হরিবোল" ধ্বনি আর খোল-করতাল সহযোগে কীর্তন সেই শ্মশানযাত্রায় থাকে। শবদেহ বেরিয়ে যাওয়ার পরই বাড়ির কোনো মহিলা গোবরজল ও ঝাঁটা দিয়ে বাড়ির সামনের অংশটি পরিষ্কার করে দেন। আর চিতায় শবদেহ ওঠানোর সময় সোনামুখীতে শবদেহকে বস্ত্রহীন অবস্থায় তোলা হয়। ঘি-মধু শবদেহকে মাখানোর যে আচার-অনুষ্ঠান আছে, তা তো বাংলার (দুই বাংলাতেই) বলতে গেলে সব জায়গাতেই আছে। এরকম নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে তারপরই প্রিয়জনের কাঁপা হাতে আগুনের ছ্যাঁকা লাগে প্রিয়মুখে। তারপরই শুরু হয় দাহ। দাহশেষে ভস্মাবশেষ ও কাঠকয়লার মধ্যেই একটি লাঠি দিয়ে একটি মানবাকৃতি এঁকে নিয়ে বিভিন্ন অঙ্গ-উপাঙ্গ থেকে অস্থির টুকরো তুলে নিয়ে ছোট একটি ঘটে রাখা হয় ত্রিবেণীতে বিসর্জন দেওয়ার জন্য। শালী নদী থেকেই একটি কলসিতে জল ভরে সেই জলে নেভানো হয় চিতার আগুন। শ্মশান থেকে বিদায় নেওয়ার বিষাদঘন লগ্নে

মুখাগ্নিকারীকেই লাঠি দিয়ে ভেঙে ফেলতে হয় ওই কলসি। তারপর বুকভাঙা কান্না নিয়ে, কেউ কেউ বা চাপা কান্নার মোচড় বুকে সহ্য করতে করতে বাড়ির পথ ধরে—।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রীপ্রকাশচন্দ্র নাগ (প্রবীণ সোনামুখীবাসী) ·
২. শ্রীমদনমোহন চন্দ্র (প্রবীণ সোনামুখীবাসী)
৩. 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী'—শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকার, দে'জ পাব্লিশিং
৪. সোনামুখী পৌরসভা



সোনামুখী শ্মশানের প্রবেশপথের তোরণ। আলোকচিত্র : শুভাশিস হালদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

❑ লেখক পরিচিতি : প্রাবন্ধিক, গবেষক, শিক্ষক।

দোলার বাগানের কালী এবং শ্মশান

সুভাষ চট্টোপাধ্যায়

অমাবস্যায় মঙ্গল বা শনিবার পড়লে স্থানটির মাহাত্ম্যই আলাদা। আমবাগানের অন্ধকার, কলকা, করবী আরও নাম না জানা ফুলের ম ম করা গন্ধ, আশেপাশে পাঁচটা গ্রামের শ্মশান, হাজারো ঔষধি শিকড়বাকড়ের ঝোপঝাড়— দক্ষিণে দারকেশ্বর নদ, কাশফুলের জঙ্গল—কেউটে, গোখুরে, শিয়াড়চাঁদা, চন্দ্রবোড়ার কারখানা, বানে ভেসে আসা পাহাড়ে চিতা, হুঁড়ার, কালা আধবাছার দুর্গম বাসস্থান। বাগানের মাঝে পাষাণকালী, পঞ্চমুণ্ডি সিদ্ধ আসন—কৌপিন সম্বল—প্রায় উলঙ্গ বিশাল জটাধারী সাধু, হাতে সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল—পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) মহকুমার অন্তর্গত বর্ধিষ্ণু গ্রাম অযোধ্যা। এককালের প্রবল প্রতাপান্বিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের জমিদারির চিহ্ন হিসাবে দেবত্তর এবং তার সঙ্গে বহু গল্পকে ডাইনে রেখে, দারকেশ্বরের তীর ধরে পশ্চিমে, আধ মাইলের মতো এগিয়ে কাদোকন্দা গ্রামের শেষে 'দোলার বাগান'—তার নিজস্ব মহিমায়, গম্ভীরতা, সিদ্ধস্থান এবং ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা, ভক্তি, শান্তির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে আজও বর্তমান।

অযোধ্যা গ্রামের দক্ষিণে নবজীবনপুর গ্রামের মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ সন্তান পৈতের সময় ব্রহ্মচারী হয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যান। শোনা কথা, হিমালয়ে সাধনায় সিদ্ধ হয়ে গুরুর আদেশে গর্ভধারিণী মাকে দর্শন দেবার নিমিত্ত দারকেশ্বর নদের তীরে তাঁদেরই নিজস্ব বিশাল জমি এবং বাগানে মহাকালী মহাশক্তির তথা পঞ্চমুণ্ডি আসনের প্রতিষ্ঠা করেন।

নিকটবর্তী সমস্ত গ্রামগুলির শব দোলার বাগানের সন্নিকটে দারকেশ্বরে দাহ করা হত। বাংলা ১৩৩০ সালের আগে পর্যন্ত দারকেশ্বর নদ দোলার বাগানের উত্তরে, বা দামোদরপুর, লোহারআড়া, কাদোকন্দা এবং অযোধ্যা গ্রামের দক্ষিণদিকে, অতি সন্নিকটে প্রবাহমান ছিল। ওই সমস্ত গ্রামের শব বা দাহ অভাবে পোঁতার জায়গা দোলার বাগানের আশেপাশে ছিল। বাংলা উক্ত সনে ভীষণ বন্যায় দারকেশ্বর রুদ্ররূপ ধারণ করে এবং ব্রহ্মচারীর কালীমাতা তথা নিকটবর্তী শ্মশানকে প্রায় অক্ষত রাখিয়া উত্তর দিক থেকে একেবারে বাগানের দক্ষিণে এবং উক্ত গ্রামগুলির নিকট থেকে প্রায় মাইলের ব্যবধানে বাগানকে মাঝে রেখে দিক পরিবর্তন করে। আশ্চর্যের বিষয়, এখনও দোলার বাগান এবং নবজীবনপুর গ্রামের মাঝখানে দারকেশ্বর গর্ভে এক বিশাল এঁটেল মাটির চাঙ বা টিপি রহিয়া গিয়াছে, যেখানে ওই ব্রহ্মচারী সাধক প্রথম মহাকালীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চারপাশে বালি এবং দারকেশ্বরের বন্যায় প্রচণ্ড চোট এবং প্রখরতা সত্ত্বেও বিশেষ ক্ষতি হয়নি। গল্প শোনা যায়, ওই স্থানের মাটি বিনা মহাকালীর বিনা অনুমতিতে নিলে তৎক্ষণাৎ বিপদ বা ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

অযোধ্যা এবং সংলগ্ন গ্রামগুলিতে বসন্ত রোগ মহামারীরূপে দেখা দেয় এবং পরিস্থিতি ইংরেজ চিকিৎসকদের আয়ত্তের বাইরে হওয়ায় প্রচুর লোক মারা যায়। শবদাহ করবার কেউ ছিল না, দাহ বা পোঁতার প্রশ্নই ছিল না। গ্রামের লোক কোনোমতে শব নদীতে বা দোলার বাগানে শ্মশানগত করে দিত। তাছাড়া ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ তথা মহামারীতেও উক্ত গ্রামগুলি প্রচুর লোক মারা যায়। ওই ব্রহ্মচারী সিদ্ধপুরুষ নিজহস্তে সমস্ত শব দোলার বাগান শ্মশানে দাহ করতেন। এমনও শোনা যায় যে সিদ্ধপুরুষ সাধু কেউ শব ফেলে গেছে শুনলে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে শবের অন্তিম সৎকার করিতেন। নিজ সিদ্ধ বলে যতদূর সম্ভব রোগে কাবুও করেছিলেন।

ওই সিদ্ধপুরুষ ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতেন এবং মাটির নীচে সুড়ঙ্গের মধ্যেও সাধনায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর সময়ে দামোদরপুর গ্রামের হারু রায় এবং রানী রায় দুধর্ষ ডাকাত ছিলেন। ওই হারু রায় বাগানের পাষাণকালীর পরিবর্তে অন্য কালী প্রতিষ্ঠা করে ডাকাত গুপ্তকালীর সাধনা ওই শ্মশান এবং বাগানের অন্যত্র করিতেন বলিয়া শোনা যায়। তার ডাকাত কালী বাগানের কোথাও না কোথাও আজও রয়েছে।

ব্রহ্মচারী সিদ্ধপুরুষের পর, তাঁহার উত্তরসূরি হিসাবে দীর্ঘ জটাধারী এক প্রায় উলঙ্গ কৃষ্ণকায় সাধু ওইখানে আসেন। তিনিও তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর সময়ে ভক্তজন সবাই জঙ্গলের শেয়ালদলকে মহাকালীর ভোগ খেতে প্রতিদিনই দেখত। তান্ত্রিক 'শিবা, শিবা' বলে আওয়াজ দেওয়ামাত্র পোষা কুকুরের মতো শেয়াল এসে ভোগ খেয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ত।

দারকেশ্বর নদ দূরে যাওয়ার কারণে এবং কানা নদীতে জল না থাকার অসুবিধার জন্য যেখান মর্জি দারকেশ্বরের যে-কোনো জায়গা বা বাগানের নিকটে শব দাহ করে।

বর্তমানে মহাকালীর বাড়িটি জীর্ণ ভগ্নপ্রায় হওয়ায় দোলার বাগান কমিটি মাটির পরিবর্তে দালানবাড়ি এবং কালীমূর্তি এবং মহাকালের মূর্তি নতুনরূপে তৈরি করিয়েছে। মাটিতে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডি আসন নষ্ট হয়ে গেছে বলে ধারণা, কারণ মন্ত্র এবং যোগবলে পঞ্চবল বন্দি এবং বিরাজমান থাকে বলে বিশ্বাস, সিমেন্টের দ্বারা মেঝে পাকা করবার সময় হাড় গোড় যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে, তা সমস্তই নতুন মহাকালীর পাদদেশে রাখা হয়েছে বলে বর্তমান পূজারি মহাশয়ের বক্তব্য।

মহাকালীর সম্মুখেই ওই সিদ্ধপুরুষ ব্রহ্মচারীর সমাধি যা নষ্ট হয়েছিল, সিমেন্ট ইট দ্বারা পাকা করে বাঁধানো হয়েছে।



❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক।

সিউড়ির কবরস্থান

এ মান্নাফ

কবরস্থান আর শ্মশান—জীবনের শেষ পরিণতির পীঠস্থান। একদিন প্রত্যেক মানুষকে এখানে আসতেই হবে। মানুষের জীবনের কঠোরতর দিন হল—মৃত্যুর দিন। মানুষকে লক্ষ করে কোরানে বলা হয়েছে—যখনি তুমি কবরস্থানের পাশ দিয়ে পার হবে, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে সকল মৃত মানুষের আত্মার শান্তির জন্যে অন্তত দু'মিনিট নীরব প্রার্থনা করবে।

এছাড়া আরও বলা হয়েছে, যে-কোনো কবরস্থানগামী লাশের সঙ্গী হবে। কবরস্থানে গিয়ে কবরস্থ মানুষের দেহের উপর পর পর তিনমুঠি মাটি ছড়িয়ে দেবে। এই নির্দেশের অন্তর্নিহিত অর্থ খুবই সোজা। প্রত্যেক মানুষকে তার জীবনের পরিণতিটুকু প্রদর্শন করাই হল মূল লক্ষ্য। তার চলার পথে লোভ, হিংসা, অসংযত জীবনে সংযমতা আনার জন্যেই—কোরানের এই নির্দেশ।

এই কথা স্মরণ করেই, সিউড়ি নানুমিএ্গা নামী এক ব্যক্তি কবরস্থানের জন্যে বিশাল জায়গা ওয়াকফ করে গেছেন। সিউড়ির পুলিশ লাইনের পাশেই কবরস্থান। পাশেই সিউড়ির বিদ্যাসাগর কলেজ। শহর থেকে স্টেশনগামী পিচ রাস্তাটি কবরস্থানটিকে দু-ভাগ করেছে। স্টেশনগামী রাস্তার ডাইনে-বাঁ'য়ে কবরস্থান। বাঁ'দিকের কবরস্থানটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণ দিকের কবরস্থান সংলগ্ন বিরাট মাঠ। এই মাঠটির নাম—সিউড়ি পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ড। এই মাঠে সিউড়ির ভ্রমণবিলাসী মানুষেরা সকাল সন্ধ্যা ভিড় জমায়। এই মাঠে ১৫ আগস্ট আর ২৬ জানুয়ারি পুলিশ প্যারেড হয়। দক্ষিণদিকের কবরস্থানটি সিউড়ি স্টেশন পর্যন্ত বিস্তারিত এই দক্ষিণদিকের কবরস্থানের মধ্যে আছে একটা বিরাট পুকুর। তালগাছমণ্ডিত পুকুরপাড় একটা আলাদা শোভা বর্ধন করছে।

কলেজ সংলগ্ন উত্তরদিকের প্রাচীরঘেরা কবরস্থানের মধ্যে 'গঞ্জে লস্কর পিরবাবার মাজার' আছে। এই পিরসাহেবের জন্যেই কবরস্থান এখন পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। সবশ্রেণির মানুষের গমনাগমন লেগেই আছে।

গঞ্জ শব্দের অর্থ হল শহর। আর লস্কর শব্দের অর্থ সৈন্য।

গঞ্জেলস্কর সাহেবের আসল নাম হল সৈয়দ ইসমাইল। ইসমাইল সাহেব ছিলেন সিউড়ি থেকে কাঁথি পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের প্রধান লস্কর। শান্তিরক্ষক। ইসমাইল সাহেব ছিলেন বর্ধমান জেলার দিশেরগড়ের প্রধান অধিপতির ভাগ্নে। দিশেরগড়ের অধিপতি ভাগনেকে গুরুদায়িত্ব পদে নিযুক্ত করেছিলেন। হঠাৎ ইসমাইল সাহেবের জীবনে পরিবর্তন আসে। তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করেন।

এর ফলে প্রশাসনিক কাজকর্মে ত্রুটি দেখা দেয়। এ নিয়ে ইসমাইল সাহেবের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ এসে জমা হয় দিশেরগড়ের মামার দরবারে।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে মামাভাগনেকে তলব করে পাঠালেন। জবাবে নিরুত্তর রইলেন ইসমাইল সাহেব। মামা ভুল বুঝে ভাগ্নেকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে একদল সৈন্য পাঠালেন। মামার সৈন্য পাঠানোর সংবাদে ইসমাইল সাহেব জ্বলে উঠলেন আগুনের মতো। ব্যক্তিগত সৈন্যদের নিয়ে ইসমাইল সাহেব রুখে দাঁড়ালেন। শুরু হল লড়াই। এই যুদ্ধ হয়েছিল কাঁদির কাছাকাছি। সিউড়ির কবরস্থান থেকে বর্ধমান পর্যন্ত গভীর জঙ্গলে আচ্ছাদিত ছিল তখন। এই জঙ্গলের সাক্ষী হিসেবে ইলামবাজারে জঙ্গল আজও বিদ্যমান।

এই যুদ্ধে ইসমাইল সাহেবের 'মাথা' শত্রুসেনার আঘাতে উড়ে যায়। ইসমাইল খাঁর মুণ্ডুহীন দেহ নিয়ে ইসমাইল খাঁর ঘোড়া দিশেরগড়ের দিকে ছুটতে থাকে। শত্রু সৈন্যরা তার পিছু ধাওয়া করেছিল।

সিউড়ি, ছিনবাই, ইলামবাজার পানাগড় জুড়ে বিস্তৃত জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ইসমাইল সাহেবের মুণ্ডুহীন দেহ নিয়ে ঘোড়া বিদ্যুৎগতিতে ছুটছিল। ঘোড়া ছুটতে ছুটতে দিশেরগড়ে পৌঁছানোর আগে তিনবার বিশ্রাম করেছিল। সিউড়ি কবরস্থানে গঞ্জেলস্কর পিরের মাজারটি কিন্তু ইসমাইল খাঁর কবর নয়। এখানে ঘোড়া শত্রুদের আড়াল করার জন্যে, ইসমাইল খাঁর মুণ্ডুহীন দেহ নিয়ে বিশ্রাম করেছিল।

ইসমাইল খাঁর কবর আছে দিশেরগড়ে। ইসমাইল খাঁর মুণ্ডুহীন দেহ নিয়ে ঘোড়া মামার সামনে হাজির হয়েছিল। মামা ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত। তিনি সাড়ম্বরে ভাগ্নেকে কবরস্থ করেছেন দিশেরগড়ে।

সিউড়ির কবরস্থানের অসংখ্য সাধারণ মানুষের কবরের মাঝে , অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রের মতোই ইসমাইল খাঁর মাজারটি বিদ্যমান। ঝকঝক করছে বাঁধানো মাজার। মাজারের বৈদ্যুতিক আলোয় কবরস্থানটি সারারাত্রি আলোকিত। গঞ্জেলস্কর পিরের জন্যেই সিউড়ি কবরস্থান—শান্তির বনবীথি হয়ে উঠেছে। গঞ্জেলস্কর পিরের মাজারটি হল সিউড়ির হিন্দু মুসলমানের মিলনভূমি, সদর রাস্তা থেকে পিরের মাজার পর্যন্ত যে রাস্তাটি আছে, সেটি তৎকালীন বিখ্যাত উকিল নির্মল মজুমদার তৈরি করে দিয়েছেন। নির্মলবাবুর একমাত্র শিশু সন্তানের জীবন সংকটপূর্ণ হয়ে উঠে, পির বাবার কাছে প্রার্থনা করে নির্মলবাবু সংকট মুক্ত হয়েছিলেন। নির্মলবাবুর সেই ছেলে এখন ডাক্তার।

সিউড়ির কবরস্থান অন্যান্য জায়গার কবরস্থান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কবরস্থান নিয়ে এখানে কোনো হানাহানি নেই। বরং এখানকার অধিকাংশ মানুষ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।

বক্রেশ্বর বিদ্যুৎকেন্দ্রের বড় ইনজিনিয়ার রমজান সাহেবের মা মারা গেলেন। হঠাৎ। দিনটি ছিল দুর্যোগপূর্ণ। রমজান সাহেব হলেন একমাত্র মুসলমান। তাঁর পার্শ্ববর্তী কোয়ার্টারগুলিতে কোনো মুসলমান নেই। সিউড়ির কবরস্থানে রমজান সাহেব তাঁর মাকে কবর দিয়েছেন।

রমজান সাহেব হলেন বিদেশি। আসল বাড়ি মেদিনীপুর। সিউড়ির কোনো মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নেই। সেদিন রমজান সাহেবের সঙ্গে তার ৫০/৬০জন হিন্দু অফিসারগণ এসে রমজান সাহেবের মাকে কবরস্থ করার কাজে পূর্ণ সাহায্য করলেন। কবর খননের তিনজন মুসলমান ছাড়া তাঁর পাশে সেদিন আর কেউ ছিলেন না। এই জন্যে সিউড়ির কবরস্থানকে আমরা বলি—'মহা মিলনভূমি'।

এই কবরস্থানে ১৯৬২ সালে একজন অনাথ বিধবাকে কবরস্থ করা হয়। এই মহিলার বয়স ছিল ছয়ের ঘরে। স্বাস্থ্য একহারা। আসল পরিচয় ছিল অন্ধকারে ঢাকা। সকলের কাছে 'আনখা' বিবি নামে পরিচিতা ছিলেন। দ্বারে দ্বারে ঘুরতেন। লোকে দয়া করে খেতে দিত, পরনের কাপড় দিত। লোকের ধারণা হয়েছিল আনখা বিবিকে দান করলে সংসারের মঙ্গল হবে। এই জন্যে আনখা বিবির ভাত কাপড়ের অভাব ছিল না। আনখা বিবি রাতে ঘুমাত না। কখনও কখনও তাকে ঝিম ধরে বসে থাকতে দেখা যেত। হঠাৎ আনখা বিবি সন্ধ্যায় মারা যায়। আনখা বিবি যে সাধারণ মহিলা ছিল না, সেটা বোঝা গেল তাকে কবরস্থ করার সময়। সন্ধ্যায় ইন্তেকাল করেছিল। রাতেই তাকে কবরস্থ করা হল। বিস্ময়কর ব্যাপার—আকাশে খণ্ড চন্দ্র ছিল। সেই চাঁদের আলো এত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, পূর্ণিমার চাঁদও এত আলো দিতে পারে না। খণ্ড চাঁদের উজ্জ্বল আলোতে তাকে কবরস্থ করা হল, লণ্ঠন ও হ্যাজাকের আলোর দরকার হয়নি। আনখা বিবির কবরকে ইট দিয়ে যে বাঁধাই করেছে— তার নাম আবার জানা নেই। তবে অনেক মানুষ আনখা বিবিকে সালাম করতে আসে।

সিউড়ির কবরস্থানে কখনও কখনও আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। লোকে বলে পাপীরা দোজখে জ্বলছে। এ ধারণা ভুল। কোনো কোনো কবরে তীব্র গ্যাস সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও গ্যাস জ্বলে ওঠে। সহজ সরল মানুষরা এ যুক্তি মানতে নারাজ। তাদের বক্তব্য—যে কবরে গ্যাস জ্বলছে সে কবরটা তো এক পাপীর।

যার যা বিশ্বাস। কাউকে আঘাত না করাই ভালো।

কবরস্থান ও শ্মশান—দুটি স্থানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এক। কবরস্থান ও শ্মশানে মৃতদেহ বিলুপ্ত করা হয়। প্রাচীনকালে জঙ্গলের মধ্যেই ছিল মানুষের বসবাস। তাই সেই সময় কাঠের কোনো অভাব ছিল না। মানুষ কাঠ পুড়িয়ে ভাত রান্না করত, ইট পুড়াত। এই জন্যে মৃতদেহকে পুড়িয়ে বিনাশ করা হয়েছে। সে ধারা আজও বিদ্যমান।

আরব দেশ হল মরুভূমির দেশ। চারিদিকে বালি আর বালি। ধূ ধূ বালি। কোনো গাছপালা নেই বললেই হয়। এই জন্যে ওইসব অঞ্চলের মানুষরা মৃতদেহকে বালির ভিতরে পুতে দিত। মরুভূমির তপ্ত বালির ভিতর মৃতদেহ পচন ধরে দুর্গন্ধ ছড়াবার কোনো সুযোগ নেই, ২৭ ঘন্টার মধ্যে মৃতের বিনাশ ঘটে।

আরবে ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি। এই জন্যে মুসলমানগণ মৃতদেহকে কবরস্থ করে।

কবরস্থান লোকালয় থেকে দূরে হওয়া ভালো। আগে সিউড়ির কবরস্থান দূরেই ছিল। কিন্তু

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু জীবিত আর মৃত মানুষের সহ-অবস্থান শুরু হয়েছে। কবরস্থানের সে ভীতি আর নেই।

সিউড়ির কবরস্থানের জন্ম বেশিদিনের নয়, পঞ্চদশ শতাব্দীতে এর আসল স্বীকৃতি এসেছে। সিউড়ি কবরস্থানের ফাঁকা মাঠে বিশাল ঈদ মসজিদ আছে। দুই ঈদে হাজার হাজার মানুষ নামাজ পড়তে আসে। এই সময় আপন আপন প্রিয়জনদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে।

১৯৭১/৭২ সালে নকশালী আন্দোলনে নকশালী ছেলেরা কবরস্থানে গা ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। আজকের দিনে সবাই জানে জন্মিলে মরিতে হবে। তাই কবরস্থানে এখন আর ভয় ভীতি নেই। বরং এখন সবাই বিশ্বাস করেন—আসল শান্তি তো কবরস্থান আর শ্মশানেই।



সিউড়ির কবরস্থান। ছবি : সরোজ কর্মকার।

❑ লেখক পরিচিতি : গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক।

কীর্ণাহার
একটি শ্মশানের মৃত্যু

শুভ্রাংশু রায়

সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার গ্রাম। জমিদারি ছোট হলেও বনেদিয়ানা যথেষ্ট। কয়েকশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ১০৮ নরমুণ্ডের উপর দুর্গামন্দির, পুকুরের জলের ভিতর শিব, মহাপ্রভুর মন্দির। গ্রামটির নাম পড়োটা, বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের উত্তরে অবস্থিত ছোট্ট গ্রাম। জমিদাররা রায় পদবিধারী।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে জমিদারদের শ্মশান। নাম হাড়পান্না। কাছেই পাঠানপাড়া। শুনলে অবাক হবেন পাঠানরা তখন হিন্দু। একটি বিরাট জলাশয়। চারপাশে অসংখ্য আমগাছ। দিনে সূর্যালোক প্রবেশ করত না। তার চারধারে আখ ও ধানের জমি। কেউ মারা গেলে তার শ্রাদ্ধের সময় শ্মশানের পুকুরে মাছ ধরা হত। তাছাড়া জলের মাছ জলেই থাকত। রায়েদের পরমায়ুও চরম। ৮০-৯০ এর আগে কেউ মারা যায় না। কেউ মারা যাওয়ার পর শ্রীখোল; করতাল সহযোগে রায় বংশের চারজনের কাঁধে চেপে তিনি হাড়পান্না যেতেন। করুণ সুরে শবযাত্রীরা গাইত--- ব্রজে চল হরি বলতে বলতে। রাস্তায় ছিদাম,পাই ও ফুটো তামার পয়সা ছড়ানো হত। মুখাগ্নির পর মৃতদেহ আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হত।

তারপর সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে আঠারো মাইল দূরে উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানে শব কাঁধে বাহকরা পদব্রজে যাত্রা করত। সঙ্গে থাকত মুড়ি, গুড়, বাতাসা, বোমা (আধুনিক চপকে বলত) , মদ ও হ্যাজাক লাইট। সে একশো বছর আগের কথা। এ. কে. রেলওয়ে স্থাপনের পর কীর্ণাহার স্টেশনে মালগাড়ি বুকিং করে মৃতদেহ অম্বলগ্রাম স্টেশনে নামিয়ে উদ্ধারণপুর নিয়ে যাওয়া হত। উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানে পুড়লে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। সেইজন্য হাড়পান্নায় কেউ পুড়তে চাইত না।

হাড়পান্না শব্দের মানে কী জানি না। তবে সকলে বলত যারা পাপী লোক তাদের মুক্তি হয় না। তাদের আত্মা হাড়পান্নার আমগাছে ও জলের তলায় থাকে। গ্রীষ্মকালে আমগাছে প্রচুর আম থাকত। ভয়ে কেউ গাছে চড়ত না। যে পাকা আমগুলি গাছ থেকে পড়ত সেইগুলি যে কুড়িয়ে পেত সেই খেত। প্রবাদ---একবার একটি ছেলে দুঃসাহস দেখিয়ে গাছে উঠে ভূত দেখে মুখে আঁ আঁ শব্দ করে গাছ থেকে পড়ে মারা যায়। আর কেউ হাড়পান্নার আমগাছে ওঠার সাহস দেখায়নি।

হাড়পান্না থেকে কিছুদূরে একটি বেলগাছের তলায় কয়েকশো মাথার খুলি জড় করা ছিল। বৃদ্ধলোকেরাও বলতে পারত না কে কত কাল আগে ওইগুলি বেলতলায় সংগ্রহ করে রেখেছিল।

এখনও সেই বেলগাছ আছে, মাথার খুলি একটিও নেই।

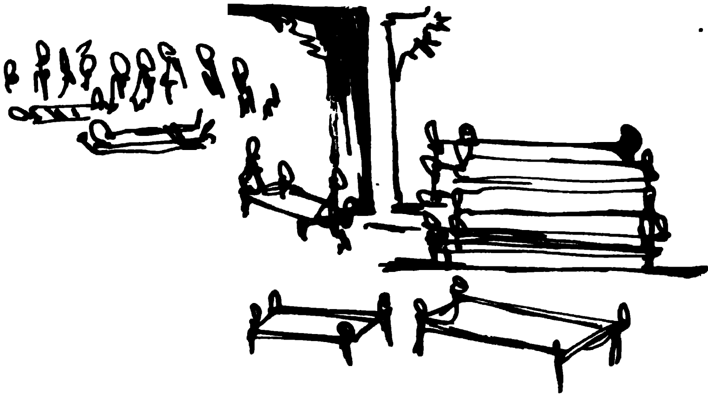
গ্রামের পশ্চিমদিকে একটি কাঁদরের ধারে আর একটি শ্মশান। সেটি সিডিউল কাস্ট শ্মশান। তাদের সেখানেই দাহ করা হত। প্রতি অমাবস্যার রাত্রে একটি বাতাস হাড়পান্নার দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে ঝাড়ার বিল যেত ও ভোররাতে বাতাসটি আবার হাড়পান্নায় ফিরে আসত। গ্রামের লোক জেগে থাকলে তখন রামনাম জপ করত। পশ্চিমদিকের শ্মশানটির নাম ঝাড়ার বিল।

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হল। যারা গ্রামে পড়ে থাকল তাদের রোজগার কমতে লাগল। ঠাট বজায় রাখার জন্য একটু একটু করে জমি বিক্রয় করতে লাগল। তারপর হাত পড়ল শত শত আমগাছে, তালগাছে, বয়স-না-জানা তেঁতুল গাছে। কয়েক বছরের মধ্যে সব লোপাট।

দু-চারটে ভুত, পেত্নি, শাঁকচুন্নি গ্রামের মাতব্বররা দেখতে পেত। গ্রামের কয়েকটি উৎসাহী যুবক কলাকাটা অমাবস্যার রাত্রে রাত ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত হাড়পান্নায় বসে ছিল। একটাও ভূতের দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে তারা বাড়ি ফিরে এল।

১৯৮০ সালের মধ্যে ভূতগুলির মৃত্যু হল। বিক্রি হল হাড়পান্নার অগুনতি আমগাছ। বিক্রি হল হাড়পান্নার দিঘি। ক্রমে ক্রমে সমগ্র শ্মশানটাই জায়গা সমেত বিক্রি হয়ে গেল। রায়বংশের কয়েকটি হতভাগায় সমগ্র শ্মশান বিক্রি করে দিল। তাদের বিবেকের দংশনের জন্য, মুখাগ্নি করার জন্য থাকল দৈর্ঘ্যে প্রস্থে হাত চারেক জায়গা।

এখন কি অমাবস্যার রাতে বাতাস ওঠে? না, ওঠে না। এখন কি ভূত দেখা যায়? না, যায় না। ভূতগুলি রায়দের দারিদ্র্য দেখে করুণায় তাদের ক্ষমা করে হাড়পান্না ছেড়ে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না।



❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক।

বীরভূমের শ্মশানচারণা

আবীর কর

মোরা এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক ফুল ও ফল
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশান ঠাঁই।

(হিন্দু মুসলমান/কাজী নজরুল ইসলাম)

আগেকার দিনের মা পিসীমার সূচিশিল্পে বা আজকের বাসট্রাকের পিছনে লেখা অসংখ্য আপ্তবাক্যের একটি পরিচিত লাইন 'সুখ স্বপনে/শান্তি শ্মশানে"। উদ্ধৃতিটি নিদারুণ সত্য, কালের কষ্টিপাথরে যাচাই করা সত্য। সেই কথা মনে রেখে আমরা বীরভূমের শ্মশান পরিক্রমা শুরু করতে পারি।

১. তারাপীঠ/বামাক্ষেপার শ্মশান :

দ্বারকা নদীর তীরে ৪ কি.মি. শব মুণ্ডাস্থি বহুল মহাশ্মশান—একদা ঘন জম্বু বৃক্ষপূর্ণ ও জম্বুকের নিঃশঙ্ক বিহারীস্থল। ১২২৫ সালে লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত মন্দির। রাজা রামকৃষ্ণ প্রদত্ত ও নাটোর রাজ সরকার প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির অর্থে ব্যয় নির্বাহ হয়। এখানকার দেবী তারিণী এবং ভৈরব-উন্মত্ত।

তারাপীঠকে কেন্দ্র করে শ্মশান, না শ্মশানকে কেন্দ্র করে তারাপীঠ। এ প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত শ্মশানচারীরা ছোট ছোট খাপরার বেড়া দেওয়া ঘরে যারা দীর্ঘ দীর্ঘ কাল শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কাটিয়ে এসেছেন, সেই সব অতিমানুষদের বক্তব্যের সরলীকরণে দাঁড়ায় বহুকাল আগে এক রানীমা স্বপ্নাদেশে ঠাকুর [১] প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তার আগে এই সাল নদীর (স্থানীয় নাম) ধারে জলাজঙ্গলের মধ্যে ছিল শ্মশান। রানীমা ছিলেন বামাক্ষেপার গুরু (বাবা)র সমসাময়িক। বালক বামাক্ষেপার দৌরাত্ম্য নিয়ে প্রচুর গল্প আজও শ্মশানমুগ্ধ মানুষের মুখে মুখে ফেরে। বালক বামাক্ষেপার দুরন্তপনায় অতিষ্ট হয়ে মন্দিরের পুরোহিতরা তাকে মারধোর করে প্রায়শই তাড়িয়ে দিত, এমনকি একসময় তাঁর মন্দির চত্বরে প্রবেশ নিষেধ হয়ে যায়। সেই সময় থেকে সে শ্মশানচারী বালক বামাক্ষেপা। শ্মশানের কাছেই একটি বেলগাছের তলে তাঁর বাস ছিল। বেলগাছটি আজও বর্তমান এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে বাঁধানো।

সেই সময় রানীমা বালক বামার মধ্যে বেশ কিছু অলৌকিক বিষয় লক্ষ্য করেন। যেমন তারাপুর গ্রাম (শোনা যায় এই গ্রামের নামই পরবর্তীকালে তারাপীঠ) থেকে রানীমা কোনো এক সময় ঘোড়ার গাড়ি করে বৃন্দাবন পৌঁছে দেখেন বালক বামা পায়ে হেঁটে তার অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে তার জন্য অপেক্ষায় আছে। রানীমা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতদের

বিরুদ্ধে বামা তাঁর অভিযোগ শুনিয়েছে এবং মারধোরের দৃষ্টান্তও প্রত্যক্ষ করিয়েছে। রানীমা তাকে আশ্বস্ত করে তারাপুরে ফেরার 'অনুরোধ' করেন। রানীমা ঘোড়ার গাড়ি করে এবং অন্যদিকে একগুঁয়ে বালক বামা পায়ে হেঁটে বৃন্দাবন থেকে রওনা হয়। বলাইবাহুল্য যে রানীমার অনেক আগেই বামা তারাপীঠে পৌঁছে যায়। রানীমা ফিরে মন্দিরে পুরোহিতদের নির্দেশ করে বলেন, যে বামার জন্য মন্দিরের দ্বার সর্বদা খোলা থাকবে। তারপর থেকে বামাক্ষেপার জীবনের নব-অধ্যায়। তবে, তারাপীঠের মা তারার মন্দিরের চেয়ে, বামাক্ষেপার বহুল মাহাত্ম্য ছড়িয়ে আছে তারাপীঠের শ্মশানে। এমনকি শ্মশানটি তারাপীঠের শ্মশান অপেক্ষা বেশি পরিচিত বামাক্ষেপার শ্মশান নামে।

নদীর চরে অনেকদূর বিস্তৃত শ্মশানজমি। এখানকার তান্ত্রিক, কাপালিকরা এই সাল নদীর তীরে শ্মশান ভূমিতেই দীর্ঘকাল বাস করছেন। দীর্ঘকালের চিতার আগুনে ঝলসানো তাদের জীবনদর্শন। সাধারণ মানুষের আওতার বাইরে তাদের অভিজ্ঞ জগত। অপরিমিত মাদক সেবনে তাদের শরীরী ভাষা ভিন্ন গোত্রের। শয়নে বসনে এবং খাদ্য নির্বাচনে তারা অন্যলোকের বাসিন্দা। চোখের সামনে সর্বদা চিতা জ্বলছেই। প্রাণহীন রক্ত মাংসের শরীর পুড়ে দুমড়ে-মুচড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার দৃশ্য তাদের অতীব পরিচিত। চিতার ছাই উড়ে বেড়ায় চারপাশে, দরমার বেড়া দেওয়া খলপার ঘরে বিক্ষিপ্ত ছড়ানো কঙ্কালের টুকরো। মড়া পোড়ানো কাঠই তাদের নিত্যব্যবহার্য জ্বালানি। চিতার আগুনের একপাশে চায়ের কেটলি চাপিয়ে তারা যখন উষ্ণ পানীয় এগিয়ে দেন, তখন যে কোনো দুর্বলচিত্ত মানুষের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কী।

বামাক্ষেপার মূল শ্মশান জমিটি বিঘা পাঁচেক নদীর চর জুড়ে ছড়িয়ে আছে। অদূরেই বামাক্ষেপার মন্দির, যা বামদেবের মন্দির নামেই পরিচিত। বামাক্ষেপার একটি পাষাণমূর্তি সেখানে নিত্যপূজা পায়। শ্মশানচারীরা 'সাধু সন্ন্যাসী' বিশ্লেষণের চেয়ে 'বামার চ্যালা' [২] নামে বেশি পরিচিত এবং এ নামে ডাকলে তারা খুশি হয়। বাস্তবিকই তারা বামার চ্যালা, মৃতদেহের পরিবারকে সাহায্য করতে তারা সর্বদা প্রস্তুত। মৃতদেহের শুদ্ধিকরণ, চিতা সাজানো, মড়া পোড়ানো, 'নাভিকুণ্ড উদ্ধার' সবকিছুতেই তারা সিদ্ধহস্ত। বিনিময়ে ইচ্ছাদান। কোনো দাবি নেই। নেই কোনো শ্মশানঘাট জমা। এমনকি দুঃস্থ মৃতদেহ সৎকারে বামার চ্যালাদেরই চিতার খরচ বহন করতে হয়। বামাক্ষেপার শ্মশানে চারটি স্থায়ী চুল্লি বর্তমান। বহু আগে এখানে দুটি মাত্র ঝিল [৪] ছিল। আলাদা করে কোন ডোমের ব্যবস্থা নেই। মৃতদেহ দাহভার তার পরিবার পরিজনকেই নিতে হয়, তবে বামা বাহিনীকে প্রায়শই নিতে হয় মুশকিল আসানের গুরুভার। এখানে বৈদ্যুতিক চুল্লির দাবি দীর্ঘদিনের (দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় (২১.১২.০৩) একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।) তবে বামার দলের বেশ কিছু চ্যালার বক্তব্য কাঠের চিতা সাজানো এবং মড়ার উপর কাঠের ভারি[৫] চাপানোর মধ্য দিয়ে সর্বোপরি সম্পূর্ণ

শ ঁ নির্মাণে আত্মীয় স্বজনের স্বহস্ত যেভাবে কথা বলে উঠে, বৈদ্যুতিক চুল্লির পক্ষে সেটা কী সম্ভব হবে। বাস্তবিক ভাববার আছে।

সমগ্র শ্মশানভূমি এক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যে মোড়া। চারিদিকে মড়া পোড়ানো আধপোড়া কাঠ, ছাইয়ের গাদা, ভাঙা হাঁড়ি, বাঁশের ছড়াছড়ি। এক চিতার আগুন নিভতে না নিভতে, আর এক চিতার আগুন ধরে। এক হরিধ্বনির রেশ কাটতে না কাটতে আর এক হরিধ্বনি আছড়ে পড়ে শ্মশান ভূমিতে, ছড়িয়ে পড়ে সাদা খই।

সম্পাদকেরসংযোজন : কালে কালে তারাপীঠের বিবর্তন হয়েছে। সে এক ভিন্ন ইতিহাস। আমাদের আলোচনার বিষয় তারাপীঠের শ্মশান। তারাপুর-চণ্ডীপুর এই অঞ্চলেই তারাপীঠ। বশিষ্ঠ মুনি বুদ্ধরূপী জনার্দনের দৈববাণী পেয়ে তারাপীঠে এসে সিদ্ধিলাভ করেন এরূপ কথা, মহাচীনাচার, তন্ত্রে লেখা আছে। তারাপীঠের তারা দেবী শিলাময়ী। শিবকে স্তন্যদানরতা তারা মাতৃমূর্তি এটি। সে সব অন্য প্রসঙ্গ। বশিষ্ঠ সিদ্ধিলাভের পর পদব্রজে হুগলী জেলার মহানাদ পবিত্র তীর্থে গিয়েছিলেন এমন কথা লিখিত আছে। জয়দত্ত বণিককে নিয়ে কিংবদন্তিও আছে। তারাপীঠের জীয়ৎ কুণ্ডতে স্নান করালে মৃত মানুষও জীবিত হয়ে ওঠে। দ্বারকা নদীর তীরে একসময় ছিল আড়াই-তিন মাইল ব্যাপী নানা বৃক্ষে আচ্ছাদিত ঘনান্ধকার মহাশ্মশান। দিনের বেলাতেও মানুষ যেতে ভয় করত। এই ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমিতে তান্ত্রিক— সাধকেরা বীরাচার তন্ত্রের সাধনা করেন। বশিষ্ঠের সাধনাস্থল—শিমূলতলা মহাশ্মশানে "বশিষ্ঠের আরাধিতা তারামার মন্দির যেখানে ছিল সেই পূণ্যস্থানে বর্তমানে একটি ছোট মন্দির ও দেবীপদ চিহ্ন খোদিত এক শিলা রয়েছে। মন্দিরের উপরে লেখা আছে—

"জয় মা তারা

ও

শিমূলতলা, ব্রহ্মার মানসপুত্র মহামুনি বশিষ্ঠের যোগাসন

(পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালী ক্ষেত্র : দীপ্তিময় রায়)

বোঝা যাচ্ছে বর্তমান তারাপীঠের মন্দিরটি আধুনিক কালের। জয়দত্ত কৃত তারামার মহাশ্মশান আজ আর নেই। বশিষ্ঠের প্রাপ্ত মূর্তিটি কালো কষ্টিপাথরের। তারামার সাজপরানো, বর্তমান দেবী বিগ্রহের পশ্চাতে রাখা আছে। ১২৬৪ বঙ্গাব্দে বর্তমান তারাপীঠ শ্মশানে এসেছিলেন সাধক কৈলাসপতি। সঙ্গে ছিল—ভৈরবী, চারপাশে নরকঙ্কাল ছড়ানো, শিয়াল, শকুন—সব মিলিয়ে ভয়ংকর পরিবেশ। তারাপীঠের যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন আনন্দনাথ, মোক্ষদানন্দ, বিশে ক্ষেপা জটামা, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, মণি গোস্বামী, থাকিয়া বাবা, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। তবে যে সিদ্ধ সাধকের জন্য তারাপীঠের এত খ্যাতি তিনি স্বয়ং বামা ক্ষেপা। তারাপীঠের শ্মশানের একটু বর্ণনা :

"দ্বারকানদীর কোলে শ্মশান। আজও অসংখ্য শব মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়, দাহ করা

হয় না। শৃগাল শকুনির লীলাক্ষেত্র এবং তান্ত্রিক সাধকের। পীঠের সীমানার মধ্যে চারিদিকে ছড়ানো পর্ণকুটির, আর কিছু আশ্রম। কোনো প্রকৃত তান্ত্রিক সাধক এখন আর তারাপীঠে নেই, পাণ্ডারা বলেন। .... আগাগোড়া নরমুণ্ড ও কঙ্কাল দিয়ে তৈরি কুটিরে সাধুরা বাস করেন। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য (বর্তমানে নরমুণ্ডকুটীর নেই)। মাটির দেয়ালে অজস্র নরমুণ্ড গাঁথা। দরজায় নরমুণ্ড, সামনের প্রাঙ্গণে বৃত্তাকারে আলপনার মতো মুণ্ড বসানো।''

(পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : প্রথম খণ্ড।)

২. কংকালীতলা/সিংহবাহিনী মহাশ্মশান ঘাট :

একান্নপীঠের একপীঠ কংকালীতলা। যেখানে একটি কুণ্ডে [১] মায়ের কঙ্কাল প্রোথিত আছে বলে বিশ্বাস। দেবী বেদগর্ভা, ভৈরব-রুরু। কুণ্ডের কাছে কালীমন্দির, মন্দির সংলগ্ন সুসজ্জিত নাটমন্দির। মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পটমূর্তি। যেখানে নিত্যসেবা পুজো হয়। এছাড়া মঙ্গলবার, শনিবার বিশেষ পূজা হয় অর্থাৎ মানত [৮] বা মানত পূরণের পূজা হয়। পীঠস্থানের দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল তা লোপ পায়। অতঃপর তালতোড় গ্রামের ঘোষবাবুরা 'ধরণীধর কঙ্কালী ট্রাস্ট স্টেট' গড়ে দেবী পূজার ব্যবস্থা করেন।

কংকালীতলা মন্দিরের অদূরেই মা কংকালীর মহাশ্মশান ঘাট যার প্রকৃত নাম সিংহবাহিনী মহাশ্মশানঘাট। এখানকার সিংহবাহিনী শ্মশানঘাট আশ্রমকে কেন্দ্র করে আদিত্যপুর গ্রামের দাস পরিবারের তিন পুরুষ কেটে গেছে। বর্তমানে মহাশ্মশানের দেখভালের ভার মদনদাসের উপর। তার বাবা শিবরাম দাস এবং তার বাবা সুরেন্দ্রনাথ দাস এই সিংহবাহিনী শ্মশানঘাট আশ্রমের দায়িত্ব ছিলেন। মূল শ্মশান কমিটি বিঘা খানেক (২২ কাঠা)। কোনোরকম যাত্রীচালা বা ছাউনি নেই। আশ্রম নামে যে কুটিরখানি আছে, ঝড়জলের সময় শবদাহীদের কাছে তাই আশ্রয়। 'দ্বিজেন্দ্রস্মৃতি পান্থনিবাস'—শ্রীযুক্তা অনুপমা রায় কর্তৃক স্থাপিত। ১৩১১, ২২ বৈশাখ ১৯০৪ ফলক যুক্ত একটি পুরানো ছাউনি বর্তমান। ১৪০৯ বঙ্গাব্দে স্থাপিত ঁনেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্মশানকালীর একটি পূজাঘর নির্মাণ করেন। দুটি পাকা চুল্লি এবং দুটি কাঁচা চুল্লি মিলে মোট চারটি চুল্লি। চুল্লিতে মৃতদেহ চাপানোর আগে মা কংকালীর থানে বা শ্মশানকালী ঘরের চালায় মুখাগ্নি করতে হয়। মৃতদেহের পরিবার পরিজনরা মৃতদাহ সৎকার করেন। এছাড়াও সিংহবাহিনী শ্মশানঘাটে পাটুনির [৮] কাজ করে মন্টু ডোম। যার মড়া পিছু কোন নির্দিষ্ট দাবি নেই। বিনিময়ের প্রশ্নে সে বলে—''পাকা মড়ায় শাল পাই, কাঁচা মড়ায় গাল খাই[১]'' গলায় এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততা।

সমগ্র সিংহবাহিনী শ্মশানভূমির উপর দু'শতাধিক সমাধি ফলক রয়েছে। বেশ কিছুস্থলে শুধুমাত্র খুঁটিপোতা। সমগ্র শ্মশানটিকে কনুইমোড়া করে রেখেছে কোপাই উত্তরবাহিনী নদী। যার কোলে ছিল আদি ঝিল অর্থাৎ প্রথম শ্মশান। পরে পরে তা সরে এসে শুকনো জায়গা অধিকার করে বসেছে। দু'একজন ভক্তের আনুকূল্যে শ্মশান সংস্কারের কাজ চললেও কোনরকম

পঞ্চায়েতী সাহায্য নেই। জাতপাতহীন এই সর্বজনের সিংহবাহিনী শ্মশানে কোনরকম শ্মশানঘাট জমা লাগে না। সর্বানন্দপুর, কলহরপুর, কাপাসটিকরি, বিপ্রটিকুরি, আদিত্যপুর ছাড়াও বহু দূর দূরান্তের মৃতদেহ নিয়ে আসেন তার আত্মীয় স্বজনেরা আত্মার শান্তি কামনায়। প্রতি মাসে ত্রিশ-চল্লিশটি শবদাহ হয়। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে বসে মা কংকালীর মেলা, যদিও তার সঙ্গে সিংহবাহিনী শ্মশান চত্বরের কোন ঘনিষ্ঠ যোগ নেই।

মা কংকালীর মন্দির এবং মন্দির সংলগ্ন অংশ অনেক ভক্তজনের সেবাহস্ত পেয়েছে কিন্তু উপেক্ষিত থেকেছে সিংহবাহিনী শ্মশানভূমি। যদিও এই উপেক্ষায় উদাসীন মন্টু ডোম বা বাবুয়ার মত মানুষজন। যাদের ঘর জিজ্ঞেস করলে উত্তর মেলে "কেন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানেই ঘর।" তারপরই চুল্লির মাথায় সিঁদুর দেয়, ফুলও দেয়[১০]। শ্মশানকালীর সঙ্গে সঙ্গে নিত্যদিন চুল্লিও পুজো পায়। মড়াপোড়ার ধোঁওয়ায় কালো স্তর জমা হতে থাকে পুরানো পান্থনিবাসটিতে। তবুও চুন-সুরকির দেওয়ালে চারকোল দিয়ে লেখা কত প্রিয়জনের প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, প্রতিহিংসার কথাগুলি [১১] স্পষ্ট পড়া যায়। যে স্পষ্ট কথার পিছনে লুকিয়ে আছে কোনো স্পষ্টতর সত্য ঘটনা। শুধুমাত্র উদ্‌ঘাটনের অপেক্ষায়।

৩. শান্তিনিকেতন/চাঁদের শ্মশান :

শান্তিনিকেতন চাঁদের শ্মশান নামে যেটি সুপরিচিত, সেই শ্মশানের আগে নাম ছিল দিগন্তপল্লি, আমানিডোবা শ্মশানভূমি। তালতোড়ের বাবুরা রবীন্দ্রনাথকে যে জমি দান করেন, সেই জমিরই এক টুকরো হল এই শ্মশানভূমি। বছর যাটেক আগে এই বিঘা দেড়েক জমি ছিল জলাজঙ্গলে পূর্ণ। বোলপুরের বীরেন সেনের দায়িত্বে ছিল এই জমি। ১৯৭৮-এর বন্যার পর চাঁদ দাঁ তার গুসকরার বসতবাড়ি ছেলে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। আপনভোলা, আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মানুষটির মন জাঁকিয়ে বসে ঐ দিগন্তপল্লি আমানিডোবা শ্মশানভূমিতে। তারপর থেকে ঐ শিকড়হীন মানুষটির নিরলস চেষ্টার ফসল আজকের চাঁদের শ্মশান। ১৯৯৮এর ২১ আগস্ট চাঁদ দাঁ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্তমানে চাঁদের শ্মশানের দায়িত্ব আছেন তার স্ত্রী টগর দাঁ, এবং তাকে সাহায্য করেন মেয়ে জামাই করবী ও সৌমেন, আর চাঁদ দাঁর বেশ কিছু চ্যালা। চ্যালাদের চোখে চাঁদ দাঁ 'গুরুদেব'। প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে চাঁদের হাতেই প্রতিষ্ঠিত শ্মশানকালীর পাশেই আজ চাঁদ দাঁর ছবিও পূজিত হয়।

দিগন্তপল্লি আমানিডোবা শ্মশানটিকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে তুলতে চাঁদ দাঁ তৎকালীন বিশ্ব ভারতীর আচার্য রাজীব গান্ধীর কাছেও আবেদনপত্রও পাঠিয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন উন্নয়ন পর্যদ (এস.এস.ডি.এ.)-এর কাছে বহুবার যাতায়াত। (এস.এস.ডি.এ.)-এর আনুকূল্যে একটি চুল্লি, একটি বিশ্রামাগার এবং শ্মশান কমিটিকে নির্দিষ্ট প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রয়াত চাঁদ দাঁ। যদিও এখনও বিদ্যুতের অভাব এবং জল সরবরাহের অব্যবস্থায় ক্ষোভ রয়েছে টগর দাঁ সহ অন্যান্যদের।

অন্যান্য শ্মশানের পাশাপাশি চাঁদের শ্মশান একটু ভিন্ন গোত্রের। নিখুঁত সাজ-সজ্জাই একে সাবেকি শ্মশান থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিয়েছে। শ্মশানকালীর মন্দির এবং মন্দির সংলগ্ন উঠোন এক আশ্চর্য মমতায় নিকানো, আবর্জনার বালাই নেই। একটিমাত্র চুল্লি এই বিশিষ্ট শ্মশানে, প্রয়োজনে একটি অস্থায়ী চুল্লি নির্মাণের ব্যবস্থা বর্তমান। ফুলডাঙ্গা, গোয়ালপাড়া, কমলাকান্তপুর, শান্তিনিকেতন, মকরম্পুর থেকে মড়া পোড়ানোর জন্য মানুষ এসে দাঁড়ায় এই চাঁদের শ্মশানে। 'গোয়ালপাড়া ধনিকতলা' নামে একটি শ্মশান থাকলেও সেখানকার মানুষও মৃতদেহ সৎকারে এই চাঁদের শ্মশানের উপর নির্ভরশীল। আর চাঁদের শ্মশানের উপর নির্ভর করে থাকা একটি পরিবার, দিনরাত অনেক প্রতিশ্রুতি শুনে, আজ ক্লান্ত। শুধুমাত্র ভরসা ঐ শ্মশানঘাট জমা শ'খানেক টাকা। তাও যখন সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, তখন মানবিক ঐশ্বর্যে এগিয়ে আসেন বীরেন মাহাতোর মত মানুষেরা। ডোমের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়ে সৎকার করেন, আর বিড়বিড় করে গুরুদেব চাঁদ দাঁর স্মরণ নেন। অজ্ঞাতবাস থেকে 'গুরুদেব' কী বলেন না 'সাধু' 'সাধু'?

৪. সুরুল/কালীসায়ের মহাশ্মশান :

সুরুল কালীসায়ের মহাশ্মশান সুরুল গ্রামের সমবয়সী। সুরুল সরকার বাড়ির বিশ্বনাথ সরকার এবং কৃষ্ণসাধন সরকার মহাশয়ের ভাষায় প্রায় তিনশো বৎসরাধিক বয়স মহাশ্মশানের। মহাশ্মশানের পরিমান ১ একর ২৭ শতক অর্থাৎ সাড়ে তিন বিঘার বেশি। কালিসায়ের মহাকালীর মন্দির, কালিসায়ের সহ মহাশ্মশানের সমগ্র কমিটিই সুরুল সরকার বাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কালীসায়েরর মহাকালী পাষাণরূপী। জনশ্রুতি আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কালে রেললাইন খননকার্যে এসে বর্তমান কালীসায়েরের কাছে এসে খননকারীরা বাধা পায় একটি রহস্যময় পাথরের" অবস্থানজনিত কারণে। এরপর রেললাইনের নির্ধারিত পথ যায় পাল্টে এবং উক্ত পাষাণটি মা কালীর মর্যাদায় পূজিত হয়। যদিও এর সঙ্গে পটের কালীমূর্তি বর্তমান। তবে মহাশ্মশান কোনরূপ শ্মশানকালীর মূর্তি নেই বা নেই কোন রূপ বিগ্রহ। এই মূর্তিহীনতাই মহাশ্মশানের বিশেষ ঐতিহ্য। বহুকাল আগে যখন মহাশ্মশানের জায়গাটি বরযার ডাঙ্গা নামে পরিচিত ছিল। তখন থেকেই এ নিয়মই বহাল আছে। যেমন নিয়ম আছে সুরুল গ্রামে ঢোকার মুখে আনি পুকুরের উত্তরপাড়ে প্রথমে মুখাগ্নি এবং শুদ্ধিকরণ জাতীয় পর্ব শেষে মরদেহের সৎকারের জন্য মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদেহ সৎকারের জন্য কোনোরূপ শ্মশানঘাট জমা লাগে না, এমনকি সর্বদা সরকার বাড়ির অনুমতিও লাগে না। তবে মহাশ্মশানের সংরক্ষণ বা উন্নতি প্রকল্পে কিছু পদক্ষেপ নিতে গেলে অবশ্যই সরকারবাড়ির অনুমতি প্রয়োজন। এ যাবৎ মহাশ্মশানে প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে একটি শবযাত্রী ছাউনি হয়েছে। আর রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দাক্ষিণ্যে একটি নলকূপ বসেছে।

আগেকার বরযার ডাঙ্গা এবং এখনকার বিনয় ভবনের মাঠ সংলগ্ন সুরুল কালীসায়ের

মহাশ্মশান উচ্চ-নীচ সবার জন্য সর্বদা খোলা। শান্তিনিকেতন সুরুল মূল রাস্তার পাশে শ্মশান অবস্থানের কারণে দূষণের অভিযোগ এসেছে দু'একবার। চিতার ধোঁয়া, ছাই এড়ানোর জন্য স্থায়ী চুল্লিটির শিরে একটি প্রাচীরের ঘেরা দেওয়া হয়েছে।

৫. ভুবনডাঙ্গা/শুকনাগোরে শ্মশানকালীতলা :

বর্তমানে ভুবনডাঙায় অবস্থিত শুকনাগোরে শ্মশানকালীতলা প্রথমে ছিল বাঁধগোড়ার কাছে। ১২৮০ বঙ্গাব্দে রত্নেশ্বর গোস্বামী এর প্রতিষ্ঠাতা। যিনি পঞ্চমুণ্ডী সিদ্ধিলাভ করেন। আনুমানিক ১৩১০-১৫ বঙ্গাব্দে রত্নেশ্বর গোস্বামী ভুবনডাঙায় সর্বপ্রথম মাটির ঘর দিয়ে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে কালীমূর্তি মৃন্ময়ী, বিরাটাকৃতি, নৃমুণ্ডমালিনী। পূর্ব ঐতিহ্য মেনে প্রতি বছর অঘ্রাণ মাসের অমাবস্যায় বৈদিক মতে দেবীর 'অঙ্গরাগ'[১৩] হয়। দেবীর নতুন মূর্তির অভিষেককে 'মোচ্ছব'[১৪] হয়। মোচ্ছবের সিংহভাগ ব্যয়ভার বহন করতে হয় গোস্বামী পরিবারকে। এই মোচ্ছবকে কেন্দ্র করে প্রায় হাজার চারেক ভক্তের সমাগম হয়। অবস্থাপন্ন ভক্তেরা স্বেচ্ছায় এই বিপুল খরচের ভার বহন করেন। বাস্তবিক শুকনাগোরে দক্ষিণাকালীর মন্দির, মন্দির সংলগ্ন বারান্দা, প্রাচীর এবং এক চুল্লি বিশিষ্ট শ্মশান, সর্বোপরি সমগ্র চত্বরটি ভক্তজনের দাক্ষিণ্যের চিহ্ন বহন করছে।

ভুবনডাঙ্গা শুকনাগোরে শ্মশানকালীতলার সঙ্গে গোস্বামী পরিবারের ওতপ্রোত যোগ। রত্নেশ্বর গোস্বামী ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা, শ্মশানের প্রাথমিক জন্ম বাঁধগোড়ার কাছে ছিল। বছর পঞ্চাশেক বা তারও আগে শ্মশান পরিবর্তন হয়। তারপর এর সম্পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন রত্নেশ্বর গোস্বামীর পুত্র মনোহর গোস্বামী। বর্তমানে এর ভার ন্যস্ত আছে তপন গোস্বামীর উপর। দক্ষিণ কালীর নিত্যসেবা করেন তপন গোস্বামী, এছাড়া মঙ্গলবার এবং শনিবার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষে ছোটোখাটো মেলা হয়, তবে সব কিছুকেই ছাড়িয়ে যায় অঘ্রাণের অমাবস্যা। সেই শীত নিশীথে স্বয়ং দক্ষিণাকালী ভর করেন মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তিতে। ছাগবলির রক্তে ভেসে যায় যূপকাষ্ঠ। মন্দির অভ্যন্তরে সাত আট ফুটের বিরাটাকায় কালীমূর্তি জীবন্ত মানুষের মতো থরথর করে কেঁপে উঠে।

৬. নীচুপটি/সতীঘাট মহাশ্মশান :

আনুমানিক সময় ১৯৪০-৪৫ সাল! পুরন্দরপুরের মদনগিরি নামে এক শ্রমজীবি সাধারণ মনুষ। দিন-মজুরিতেই যার দিন গুজরান। খেত-খামারের কাজের পাশে মেহনতি মানুষটিকে মাটি কাটা, পুকুর খোঁড়া কুয়ো কাটার কাজও করতে হত। সাধারণ দিনের মতই কাজ চলছিল নিচুপটি বারিপুকুরে। বারিপুকুরে পাঁক তোলার কাজে ব্যস্ত যখন মদনগিরির মত আরো অনেকে। সেই সময় পাঁকে পোঁতা এক অদ্ভুত দর্শন পাথরে মদনগিরির পা ঠেকে। সাধারণ গরীব-গুর্বো মানুষটির লোম কূপে কূপে এক অজানা শিহরণ। আর সেদিন রাত্রেই দেবীর স্বপ্নাদেশ। যদিও তাকে আদেশ না বলে আর্ত চিৎকার বলা ভালো। কে যেন মদনগিরিকে ঠেলা

মেরে জাগিয়ে দিল, মদন চোখ কচলে দেখে স্বয়ং দেবী তাকে বলছেন "আমাকে উদ্ধার কর, ঐ পচা দুর্গন্ধ পাঁক থেকে আমাকে তুলে আন, আমি তোর বিটি।[১৫]" দিন মজুরের মাথায় তখন অজস্র পোকার কিলবিলানি, কান ভোঁ ভোঁ; ঘুম গেছে ছুটে। ভোর রাতেই মদন গিরি পাঁক পুকুর থেকে পায়ে ঠেলা 'লক্ষ্মী'কে মাথায় নিয়ে এল। দেবীর স্বপ্নাদেশ মত তাকে স্থাপন করা হল নিচুপটির কান্দর[১৬] ঝিলের শ্মশানে। যার পাশে বয়ে যাচ্ছে সমগ্র বোলপুরের ব্যবহৃত ছিল।

পরবর্তীকালে সতীমায়ের শিলামূর্তিটিকে সম্মুখে রেখে মা কালীর মৃন্ময়ী মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেন মদন গিরি। মায়ের অসীম কৃপায় ততদিনে মদন গিরির নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। বর্তমানে মদন গিরি জীবিত নেই। সতীঘাট মহাশ্মশানের দায়িত্বে আছে তার তিন ছেলে শিবনাথ, ভোলানাথ, বিশ্বনাথ। আর মদনগিরি, বৈদ্যনাথ মণ্ডল, সঞ্জয় দাসের মত অনেক চ্যালার মধ্য দিয়ে আজও 'মদনগিরি মহারাজ' নামে বন্দিত। সতীমায়ের মন্দিরে মদনগিরির ছবি স্থান পেয়েছে, নিত্যপূজা তারও প্রাপ্য। ঠিকঠাক পুজো না পড়লে গাঁজার ধূমে আর ঘুমের ঘোরে মদনের চ্যালারা খিস্তি খান। মদনের চ্যালাদের মতে তার পুরো নাম ছিল 'মুখখিস্তানন্দ মদনগিরি মহারাজ।[১৭] সতীমায়ের তত্ত্বাবধানে মদনগিরি ছিলেন নিরলস ভক্ত সেবক। আর এই অনন্য নিষ্ঠা অন্যদেরও জাগিয়েছে। যার ফলস্বরূপ, আজ সতীমায়ের পাকা মন্দির, মন্দির সংলগ্ন নাট মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন বোলপুর হাটতলা পাল জুয়েলার্স-এর মালিক ছবি পাল। বোলপুর মিউনিসিপ্যালিটি ১৯৯৩-এ শ্যামলী ঘোষের তত্ত্বাবধানে নিচুপটির মূলরাস্তা থেকে শ্মশানভূমি ও মন্দিরচত্বর ইঁট সিমেন্ট বাঁধাই হয়েছে। এছাড়া প্রায়শই দূর দুরান্তের ভক্তদের দান-দক্ষিণা মেলে বর্তমানে মদনগিরির ছেলে ও চ্যালারা তার ঐতিহ্য মেনে আজও সতীমায়ের নিত্যসেবা করে। প্রতি অমাবস্যায় 'মোচ্ছব' হয়। শ' চারেক নিরন্ন মানুষের পাত পড়ে - 'আনন্দ মোচ্ছব'[১৮] আখ্যা এর। প্রতি পূর্ণিমায় পায়েস ভোগ হয়। আর প্রতিবছর কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে মৃন্ময়ীর মূর্তিবদল উপলক্ষে সতীমায়ের মেলা বসে। অসংখ্য ঢাকের বাজনা, অজস্র ছাগবলিতে সমগ্র শ্মশানভূমি মুখরিত হয়। হাজার ভক্তের সমাগমে বাউল ফকির সেবা চলে, চলে আখড়া। এই কাজটি শ্মশানচারী মানুষের ভাষায় 'মহাকাজ'। আর কোনো মহাকাজ একার পক্ষে সম্ভব নয়। দশজনের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

মূল শ্মশানভূমিটি বিঘা তিনে হলেও, সতীমায়ের মন্দির, মন্দিরের গা ঘেঁষে পুকুর, শ্মশানের একপাশে বহুদূর বিস্তৃত পতিতজমি মিলে প্রায় ১২ বিঘে জমি সতীমায়ের মালিকানা। একটি পাকা চুল্লি, প্রয়োজনে বানানো যায় একটি কাঁচা চুল্লি মিলিয়ে মোট দুটি শবদাহের ব্যবস্থা বর্তমান। চুল্লির পাশেই একটি বাঁধানো বেলগাছ, যার তলায় কুকুর শিয়ালের মূর্তি করা আছে। সতীমায়ের অনুচরদের সামনে মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নি করা হয়। এছাড়া দোষ পাওয়া মড়া, অপঘাতে মৃত্যু বা মারা যাওয়ার পর প্রেতের উপদ্রব থেকে বিশুদ্ধ হতে গেলে, এই বেলগাছের তলায়

অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা এসে 'গণনা' করে দোষ কাটান। আবার কোন সময়, যে কোন কারণে মৃতদেহ না পাওয়া গেল, তার উদ্দেশ্যে খড়ের পুত্তলি তৈরি করে, মায়ের অনুচরদের সাক্ষী রেখে সব বিধান মেনে দাহ করা হয়। কোনরকম বাধ্যতামূলক শ্মশানঘাট জমা নেই। মৃতের পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী মড়া পোড়ানোর অর্থ ভিক্ষা করা হয়।

শ্মশান সংলগ্ন পোড়ো জমির উপর বেশ কিছু সমাধি ফলক ছাড়াই সমাধি চিহ্ন বর্তমান। সেই সমাধিস্থ মানুষের 'বৈরাগ্য'কে স্মরণ করে, মদনের চ্যালা বৈদ্যনাথ গান বেঁধেছেন—

সতীঘাটে ডাঙার পরে
চার বৈরাগ বাস করে।
প্রথম বৈরাগ সত্যদাস
মা'র দক্ষিণে তার মাঠে বাস
বৈরাগ মধ্যে ঐ তো খাস।
দ্বিতীয় জন ঝোরার মাঠে
গোঁসাই নিরঞ্জন ছড়া কাটে,
ছড়ায় বাঁধা প্রেমদাসী
তাঁর বড়ই আপন—'সর্বনাশী'
বৈরাগ ছাড়া থাকতে না'রে—
তাই মরার পরে মড়ার ঘাড়ে
বৈরাগ সঙ্গে বসত করে।
ঐ সতীঘাট ডাঙ্গার পরে
চার বৈরাগ বাস করে।
চতুর্থজন দেবেন দাস
ধরায় থাকা ছিল আশ
থাকল না সে পুঁজির জোরে
অবশেষে সতীঘাটে ডাঙ্গার পরে
চার বৈরাগ বসত করে।

মদন গিরি মহারাজও ছিলেন গাইয়ে। গানের মধ্যে দিয়ে তিনি তার পরিচয় বেঁধেছেন—

জেলা মালদহ, আমার বাড়ি
আমি এক ভূতের ব্যাপারী।
বোলপুরে ঠিকানাপটির শেষ
ভূতধরা মন্ত্র নিয়ে ঘুরি নানান দেশ—
ভূতের খাই, ভূতের পরি

ভূতের সঙ্গে বসত করি
আমি এক ভূতের ব্যাপারী।

নিচুপটি সতীঘাট মহাশ্মশান তার পুরানো ঐতিহ্য মেনে সমস্ত শ্মশানাচার পালন করে আজও প্রতিটি মানুষের জন্য ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। বোলপুর, বাহিরি, বেংছাতরা, সিয়ান, কীর্ণাহার, কাটোয়া থেকেও মৃতদেহ নিয়ে আসেন তার প্রিয়জনেরা। সতীমায়ের মন্দির অভ্যন্তরে মা কালীর বিশালাকায় মূর্তি, সম্মুখে শিলা বিগ্রহ। আর সতীমায়ের ঘাট বলতে সমগ্র বোলপুর শহরের ব্যবহৃত পচা দুর্গন্ধ যুক্ত কালো জলের ধারার মাঝে শান বাঁধানো সিঁড়ি। মদনগিরির চ্যালাদের ভাষায় এ 'মৃতগঙ্গা', যা নাকি গঙ্গার মত পবিত্র। কেননা গঙ্গার মত মৃত গঙ্গায়ও সমস্ত নোংরা বহন করে চলে। আর কার্তিকের অমাবস্যায় মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তির পরিবর্তনের ঘোর রাতে 'এক পাত ভোগ'[১৯] বাড়তে হয় সতীঘাটের সোপানতলে। মায়ের অনুচর শিয়াল এসে কখন চেটেপুটে নিয়ে, সাধারণ চোখে তা দেখা যায় না।

৭. বোলপুর/ভুবনডাঙ্গা কবরস্থান :

পাঁচ একর পঁচিশ শতক অর্থাৎ প্রায় ১৬ বিঘা জমির উপর অবস্থিত বোলপুর ভুবনডাঙা কবরস্থান। বাংলা ১২৪০ বঙ্গাব্দে। ইংরেজি ১৮৩৩ খ্রিঃ এর প্রতিষ্ঠা। ১৭০ বছরের পুরানো কবরস্থানটি দীর্ঘদিন উন্মুক্ত প্রান্তরেই ছিল। পৌষমেলার মাঠ পরিবর্তনের[২০] কালে, ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদনে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পরবর্তীকালে সমগ্র কবরস্থানটি ছোট পাঁচিলে ঘিরে দেয়। আবদুল সালাম জানান, সমগ্র গোরস্থানটির সংরক্ষণের পরিচালনায় তৈরি আছে 'বোলপুর ভুবনডাঙ্গা মুসলিম কমিটি'। দশ বারোটি সমাধি ফলক বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভুবনডাঙা কবরস্থান। ভুবনডাঙা, বাঁধগোড়া, দর্জিপাড়া, হাটতলা, টিকাপাড়া, শ্যামবাটি, শান্তিনিকেতনের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মৃতদেহ গোর দেওয়া হয় এই কবরস্থানে। ১৭০ বছরের পুরানো কবরস্থানটি ঐতিহ্যে ও গাম্ভীর্যে অনন্য ভূমিকা পালন করে এসেছে দীর্ঘকাল। সমগ্র কবরস্থানটি পাঁচিলে ঘেরা এবং অভ্যন্তরে ছোট একটি স্থান পাঁচিলের আবেষ্টনীতে বাঁধানো। স্থানটি ঈদগাঁও মসজিদ। যেখানে পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে জানাজা নামাজ পড়া হয়। তাছাড়া ইদুজ্জোহার সময় ইত্বকরিত নামাজ পড়া হয়। সমগ্র কবরভূমিটির উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থাৎ পর্যাপ্ত জল সরবরাহ, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, এবং একটি ছাউনি নির্মাণের জন্য 'ভুবনডাঙা মুসলিম কমিটি' বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা ভেবেছে।

৮. গোরা শ্মশান/ আত্মার শান্তি নিকেতন :

জীবিত মানুষই জাতের বড়াই করে আর জতের নামে 'বজ্জাতি'ও করে। মড়ার কোন জাত নেই। না হিন্দু না মুসলমান। না রাজা, না ভিখিরি। রক্তমাংস বাদে প্রায় সব কঙ্কাল এক গঠনগ্রন্থিতে বাঁধা। হিন্দুর ক্ষেত্রে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া এবং মুসলমানের ক্ষেত্রে মাটিতে বিলীন হয়ে যাওয়ার দুটি স্থান 'শ্মশান' এবং 'গোর' উদারভূমির এক আশ্চর্যলোক। সে লোকে

জাতপাতের[১১] নিয়ম নেই। নেই অর্থের জারিজুরি। এক বিশৃঙ্খল পবিত্রতা বিরাজ করে। শ্মশানচারী বা গোরভূমি আঁকড়ে পড়ে থাকা জীবিত মানুষগুলিও মৃতের ভাষা মুখস্থ করে ফেলেছেন, আত্মস্থ করেছেন 'মত্যু' নামক অনিবার্য শব্দটি, শুধুমাত্র যে কোন সময় ছোঁয়ার অপেক্ষায়। বড় দীর্ঘকাল শীত, গ্রীষ্মকে দমন করে শরীরী ভাষা গেছে পাল্টে, মনের অন্তকরণে গড়ে উঠেছে এক আশ্চর্য দর্শন। যে জীবনদর্শনের মুখোমুখি হতে সাধারণ মানুষ ভয় পাবে। আর যে মানুষ এই অসাধারণ লোকের সন্ধানে যাবে, সে অতলে যাবে তলিয়ে। গোর শ্মশান জগৎ, যার অদূরেই অমরাবতী মাঝে 'মৃত্যু' নামক এক অমোঘ আবরণ।

পাদটীকা :

১. ঠাকুর — কথিত আছে জনৈকা রানীমা নাকি সুদূর চীনদেশ থেকে তারা মার এক পাষাণ মূর্তি সর্বপ্রথম তারাপুরে প্রতিষ্ঠা করেন।

২. বামার চ্যালা—এখানে 'চ্যালা' শব্দের অর্থ সাঙ্গোপাঙ্গ, সঙ্গীসাথী, বলা যায় খণ্ডশিষ্য, সতীর্থ।

৩. নাভিকুণ্ড উদ্ধার– মানুষের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পরও নাভিকুণ্ডলী পোড়ে না, পরে গঙ্গায় আত্মার শান্তিতে অনেকেই এই নাভিকুণ্ড ভাসিয়ে দেন।

৪. ঝিল-- প্রায় অধিকাংশ শ্মশান জল কেন্দ্রিক - জলাশয়ের কাছাকাছি মাটির লম্বা গর্ত কেটে চুল্লি বানানোর সমগ্র জায়গাটি ঝিল নামে পরিচিত।

৫. ভারি— আগুনের তাপে, মৃতদেহের চামড়ায় টান লাগে, দেহ কুঁকড়ে যায়, মনে হয় মড়া খাড়া হয়ে উঠবে, সে কারণে মড়ার ঘাড়ে, তলপেটে এবং গোড়ালিতে মোটা কাঠ দেওয়া হয়, এর নামে ভারি বা গড়ই।

৬. শ'—মৃতদেহ নিচে এবং উপরে সমগ্র কাঠ সজ্জাটিকে শ' নামে ডাকা হয়।

৭. কুণ্ড — ছোট পুকুর।

৮. মানত—কোন বিশেষ ইচ্ছাপূরণের জন্য দেবতার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। স্থানীয় ভাষায় 'মাগ্গিক' বলে।

৮. পাটুলি—মৃতদেহ সৎকারে অগ্রণী যে, ডোমের কাজ।

৯. এখানে 'পাকা মড়া' পূর্ণবয়স্ক মানুষের মৃত্যু এবং কাঁচামড়া অকাল মৃত্যুকে ইঙ্গিত করেছে। এবং তার ফলস্বরূপ দুটি ভিন্ন পাওনা।

১০. প্রতিটি শ্মশানেই চুল্লিও পূজ্য। মা কালীর সঙ্গে চুল্লিতেও পুজো দেওয়া হয়।

১১. চুল্লির সামনে, শবদাহী ছাউনির দেওয়াল লেখা—'আপনাকে আমার শেষ প্রণাম।' 'সুশান্ত অমর রহে'। 'তোর মৃত্যুর আমরা বদলা নেব'। 'আপনাকে শেষ কথা বলা হল না', 'ওগো অপেক্ষা কর, তোমার আশা পূর্ণ হবে।'—এহেন বিবিধ বাক্য চারকোলে লিখেছে মৃতের পরিজনেরা।

১২. শোনা যায় রেললাইন খননকালে কালীসায়ের স্থলে, একটি পাথর কিছুতেই তোলা যায়, পাথরকাটা যন্ত্রও ব্যর্থ হয়। সেই পাথরই আজকের কালীসায়ের মহাকালীর পাষাণী রূপ।

১৩. অঙ্গরাগ, যদিও মূর্তিতে নতুন রঙ বা পালিশ বোঝায়, আবার একেবারে নতুন মূর্তির ক্ষেত্রে অঙ্গরাগ বলা হয়।

১৪. 'মোচ্ছব'—বহু দুঃস্থ, দরিদ্র মানুষের একসঙ্গে ভোজ, কাঙাল ভোজন।

১৫. বিটি—মেয়ে। মদন গিরি নিজেকে সতীমায়ের 'বাপ' বলে দাবি করত।

১৬. কান্দর—কন্দর, গর্ত।

১৭. অতিরিক্ত গাঁজা এবং মাদক সেবনে, সম্ভবত কোন স্নায়ুগত পরিবর্তনে, শ্মশানচারী কাপালিক গোত্রের মানুষরা প্রায়শই গালিগালাজ দিয়ে থাকেন।

১৮. আনন্দমোচ্ছব—বৃহৎ ভোজ, জাতপাতহীন এক পংক্তির অন্নগ্রহণ।

১৯. সতীঘাটের সোপানে এক পাত নৈবেদ্য বাড়তে হয়, রাতের শেয়াল এসে তা খেয়ে যায়। (প্রসঙ্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুষ্করা' গল্পের কথা মনে পড়ে)।

২০. প্রথম পৌষমেলার মাঠ ছিল কাচমন্দিরের বিপরীতে।

২১. গুসকরার কাছে দিকনগর শ্মশানে দু'ভাগ, জাতের বিচারে, এই একবিংশ শতাব্দীতেও।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—বাবলু প্রামাণিক, শান্তদা, গোরা, ভবানীদি, শান্তশ্রী এবং বুবাই।

তারাপীঠ শ্মশানের সাধুবাবা ছবি : অভিজিৎ রায়।

❑ লেখক পরিচিতি : তরুণ প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

অন্য শ্মশান

তৃপ্তি সান্ত্রা

রাগ হলে বা মনের দুঃখে কেউ কেউ বলে বটে—একেবারে শোদলাপুর যাব—কিন্তু সত্যি সত্যিই সেখানে কে যেতে চায়! নামটা মুখেও আনতে চায় না। যেন চিতাকাঠের ডাক থেকে দূরে থাকলেই ম্লান হবে নশ্বরতা। দেহ চিতায় মন পোড়ে সারাটা জীবন—তবু পুড়ে যাবার ভয়!

শ্মশানে এক নারীরই দাপট—কালো রূপে মহাকালী, তবু শ্মশানে নারী বিবর্জিতা। শবদাহর কাজে নারীরা যান না। নারী যেমন পুরোহিত হন না তেমন চণ্ডাল বৃত্তি-ও নেই তার। হরিশ্চন্দ্রর স্ত্রী শৈব্যাকে পুত্রের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শ্মশানে যেতে দেখেছি। রাজার সাক্ষাতের জন্যই এই যাওয়া নইলে সর্পাদষ্ট রোহিতাশ্বকে জলে ভাসিয়ে দেওয়াই রীতি। শ্মশানে বিয়েও দেখেছি, অন্তর্জলী যাত্রায় নিয়ে আসা সীতারাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পূর্ণযুবতী যশোবতীর। আরও কত কী যে থেকে যায়। মধ্যবিত্ত চর্চিত শোভন সাহিত্য কতটাই বা জানে অন্ত্যজ জীবন প্রবাহ। চার-পাঁচ বছর আগে ডায়মন্ডহারবারে দুই তরুণীর একশো বা দেড়শো টাকার বিনিময়ে মর্গ থেকে লাশ নিয়ে থানায় পৌঁছে দেবার খবর পড়ে চমকে উঠেছি। অন্ধকার রাত। লাশ নিয়ে ভ্যান রিক্সায় ছুটছে দুই বোন। মহিলাদের ভ্যান চালানো এখন নতুন কিছু নয়। কিন্তু লাশ বহন করা নারী সত্যিই চেতনায় মেলে না। খবরে লেখা ছিল, কেউ তাদের বিরক্ত করে না। শববহনকারী নারী পিশাচ-সদৃশ—সম্ভবত সেই কারণেই তারা নিরাপদ। সামাজিক অভিজ্ঞতাতেও দেখি মা বাবা-র মৃত্যুতে কন্যা সন্তানের বাড়িতেই মুখাগ্নি ক্রিয়া। ডাকাবুকো কেউ কেউ নিয়ম ভাঙেন। ইদানীং লোকালয় সংলগ্ন শ্মশানভূমি সহজ গম্যতায় এই রীতি খানিকটা পাল্টালেও শ্মশানে নারী নেই।

শ্মশান এবং গঙ্গা যেখানে সমার্থক—সেখানে পৌষ সংক্রান্তির মেলায় বা অন্য উপলক্ষে স্নান সারতে শ্মশানে যাবার রেওয়াজ আছে। যেমন ছিল আমাদের ছেলেবেলায়। মহানন্দা রোজকার আটপৌরে নদী। যানবাহন, রাহাখরচ সব কিছু নিয়ে ফরাক্কা গঙ্গা অনেক দূর। অতএব শোদলাপুর। স্থানীয় উচ্চারণ এমনই। কেতাবি নাম সাদুল্লাপুর। পুরোনো শ্মশান। সাদুল্লা-র নামে সাদুল্লাপুর। সাদুল্লার সঠিক পরিচয় জানা যায় না। শাহ আবদুল্লা নামে এক ফকিরের নামেই শাদুল্লাপুর, প্রচলিত বিশ্বাস এমনই। গৌড়ের সুবর্ণযুগে শাদুল্লাপুর ঘনবসতি গ্রাম। বর্গিদের হাঙ্গামার সময় কিছু কংসবণিক সম্প্রদায়ের লোক বর্ধমান জেলা ত্যাগ করে মালদার চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাদুল্লাপুর এবং ইংরেজ বাজারে এসে বসবাস স্থাপন করেন। সাদুল্লাপুরের

পিতলের ঘটি অতি বিখ্যাত ছিল। গৌড় ধ্বংসের সময় এ অঞ্চলও মহামারীতে বিধ্বস্ত হয়। ঘন জঙ্গলপূর্ণ এই স্থানে ডাকাত ও বন্যজাতির উপদ্রব ছিল—এরকম ইঙ্গিত বিভিন্ন বইয়ে পাওয়া যায়।

ছয়ের দশকে নেহাত বালিকা বয়সে তিনচাকা রিক্সয় সিটে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাবা, চওড়া ধনেখালি শাড়িতে মায়ের সঙ্গে সাদুল্লাপুরে গঙ্গাস্নানে যাওয়া বিদেশ ভ্রমণের মতো টানটান। শুধু আজকের জীবনের মতো অযথা তাড়াহুড়ো ছিল না। স্ট্যান্ডে রাম সিং রিক্স নিয়ে খাড়া—থলিতে তেল গামছা শুকনো কাপড়। কলোনির ইটপাতা পথ ধরে তিন চাকা পুষ্প রথ বড় পথে উঠে গেলে শুধু কিছু ট্রাক বাস ভয়। জাতীয় সড়কের পাশাপাশি রেললাইনের সরু দুটো পাত কত দূরে চলে যায়—কলকাতায় থাকা আমার মেজদার শহরের দিকে। মালদা শহর থেকে জাতীয় সড়ক ধরে মাইল চারেক যাবার পর যদুপুর থেকে ডানদিকে যে রাস্তা চলে গেছে সাগরদিঘি পেরিয়ে সাদুল্লাপুরের দিকে, রাম সিং-এর রিক্স সেই পথ ধরে। পাকা হয়ে যাওয়ার এখন পথ ভালো। তখন ছিল কাঁচ এবড়ো-খেবড়ো পথ। স্মৃতি অস্পষ্ট। শুধু মনে পড়ে গঙ্গার পাড়ে উঁচু মাটির বাঁধের ওপর মেলা। খুরমা মেঠাই নকুলদানার ডাঁই করা দোকানের পাশে মাটির জাঁতা আর কুটনো বটির খেলনাপাতি। বেগুনি মলাটের পঞ্জিকার পাশে পেটমোটা গোপালভাঁড় ফিক্ করে হেসে ডাকলে একটু দাঁড়িয়েছি। শুধু দাঁড়াইনি, টেনেওছি মায়ের আঁচল। কিছু বলিনি। আমাকে সর্বস্ব দেবার জন্য তৈরি মা মুখ দেখেই বুঝতে পারতেন মেয়ের চাহিদা। বাবা হনহনিয়ে আগে হাঁটছেন। আঁচলের গিঁট খুলে পয়সা বের করতে যেটুকু দেরি। হাসিমুখের গোপালভাঁড়কে বগলদাবা করে বাবার পেছনে পেছন ছোটে ঘোমটা-মা আর আমি। তেল মেখে তহবন পরে বাবা স্নানে নামার আগে মায়ের সঙ্গে আবার হুম্-হাম্ ডুব। জলে আমাকে একা ছাড়তে চায় না মা—বালির গঙ্গায় ডুবতে বসেছিলাম যে! স্নান সেরে রান্না বসায় মা। তিন ইটপাতা উঠোনে আতপ আর ভাজা মুগডাল দিয়ে খিচুড়ি—অমৃত ফোটে। একটু দূরে শ্মশানে পোড়াকাঠ স্মৃতি আর ছাই। না কোনও মৃতদেহ সৎকার দেখিনি। হু হু শীত আর শীর্ণ হয়ে আসা এক নদী। মেলা, আউল বাউল মানুষ আর তাদের শ্রীখোলের হৃদ্‌ধ্বনি—আমার কলোনি বাতাসের মফস্‌সলী শহুরে ছবির থেকে কত অন্যরকম।

পথটা ভালোই হয়ে গেছে। চাকাও মসৃণ। চালক অভিমুন্য ততোধিক স্মার্ট এবং দক্ষ। লোকের জন্য শ্মশান সফরে প্রথম ধাক্কা খেলাম এই শাদুল্লাপুরেই। গাছে ঢাকা সাগরদিঘির নীল সবুজের ইশারা পেরিয়ে মসৃণ পথ পেরিয়ে এগিয়ে চলা। ডানদিকে সৎকার কাঠ বিক্রির ডোমদের বাড়ি পেরিয়ে একদম শ্মশান ঘাট। একশো মিটার জায়গা জুড়ে মন্দির অধ্যুষিত সে অঞ্চলে যে-কোনও ব্যবসায়িক তীর্থক্ষেত্রের আদল। শুধু লোহার ফ্রেমের তিনখানা চিতা, কিছু পোড়া কাঠে শ্মশানের ইশারা। আর নীচে সবুজ কচুরিপানায় মজা এঁদো ভাগীরথী শাখায় শুধু

যৌবন ফুরিয়ে যাওয়া বেগবতী এক নদীর নাভিশ্বাস নয়, লক্ষ লক্ষ মৃত আত্মার কান্না। আমাদের খুউব প্রিয়জন দেহকে স্নান করানো হয়েছিল এই জলে—ভেবে মন খারাপ হবেই। জল কোথায় এখানে—চিতা ধুয়ে দিলে গড়িয়ে যায় ছাই। কচুরিপানার সবুজ শরীরের নীচে শুধু সেই পোড়া কাঠ, অঙ্গার, ছাই। একটু দূরে ভাটির দিকে এই জনস্রোতের খানিকটা আদুল শরীর—দাহ কাজ সেরে সেখানেই শ্মশানযাত্রীদের স্নান। পুরো চত্বর জুড়ে মন্দির। বাঁশবন আর জঙ্গলের নির্জন শরীর ভেঙে ঝকঝকে নতুন দোতালা বিল্ডিং—বৈদ্যুতিক চিতা—যার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ—কিন্তু উদ্বোধন হয়নি। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী বরকত গণিখান চৌধুরীর সাংসদ কোটার অর্থে নির্মিত এই আধুনিক চুল্লি এক পরিচ্ছন্ন আধুনিক সৎকার ক্রিয়া উপহার দেবে। ঝকঝকে মার্বেল শোভিত প্রাসাদের একতলায় মৃতদেহ বয়ে আনা শ্মশান বন্ধুদের বিশ্রাম স্থান—দোতলায় চিতা। একটির কাজ শেষ, অন্যটি শুরু হয়নি। কলকাতার Trvvol Engineering Company র হয়ে ২০০৩-এর ১৫ জুন কাজ শুরু করেছিলেন প্রণব চ্যাটার্জী, কানাইলাল বেরা। তাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে। ডানদিকে এই সদ্যনির্মিত বৈদ্যুতিক চুল্লির বিল্ডিংকে ছাড়িয়ে এগোলে বিখ্যাত লালবাবার মন্দির। তারা মা-র মূর্তির সামনে সারাক্ষণই জ্বলছে যজ্ঞকাঠ। শিব, গঙ্গামাতা, সূর্য, হনুমান, শ্মশানকালী সবার আলাদা আলাদা মন্দির। এর মাঝেই আছে লালবাবার সমাধির ওপর লালবাবার যজ্ঞাসন, মূর্তি। এই চত্বরেই কালো বোর্ডে বোর্ডে ছয়লাপ দুটি গাছ। কালো বোর্ডের ওপর সাদা হরফে মৃতের নাম, বাড়ির ঠিকানা। প্রিয় মতজনদের অমর করে রাখার অসহায় প্রয়াস। বোর্ড লেখেন বিরামপুরের ভৌমিক দাস ১৫, ২১, ২৫ রেটে। দাহর জন্য খড়ি লাগে চার থেকে পাঁচ মন—খড়ি আশি টাকা মন। ডোম নেয় একশো কুড়ি টাকা। দাহ দক্ষিণা পঁচিশ টাকা। খড়ি কেনা বাধ্যতামূলক। কেউ যদি বাড়ি থেকে খড়ি নিয়ে আসেন তবুও তাকে ডোমদের তিনজন শরিকের কাছ থেকে কিনতে হয়, প্রত্যেকের কাছ থেকে তিরিশ কেজি করে। নইলে দেহ চিতায় উঠবে না। দাহ বাবদ খরচা হয় ৫০০-৫৫০ টাকা, শহর থেকে ট্রাক ভাড়া প্রায় ছশো টাকা। শ্মশান বন্ধুদের খাওয়াবার জন্য এখানকার হাতিপারা লুচি বিখ্যাত। পাতলা নরম হাতির পায়ের বেড়ের মাপে লুচিই পাতিপারা লুচি। সঙ্গে বোঁদে, চোকা সুদ্ধু আলুর কালো তরকারি আর চাটনি।

রজনীকান্ত চক্রবর্তীর বইয়ে সাদুল্লাপুরের গঙ্গায় তুলসীগঙ্গা নামক স্রোত যা বড়গঙ্গা থেকে এসে মিলেছিল তার উল্লেখ পাচ্ছি। তুলসীগঙ্গা সম্ভবত ভাগীরথী—গঙ্গার পুরোন গতিপথ। অযত্নে অবহেলায় এই নদীপথ রুদ্ধ। অনেক টাকায় প্রকল্প গ্রহণ করেও সঠিক সংস্কার হয়নি। নয়ছয় হয়েছে টাকা। নদী নদী। জীবন নদী। স্মৃতির নদী। স্মৃতির বেলাভূমি ফেলে নদী পেরিয়ে জীবনের অন্য পারে যাওয়া—নদী, মাঝি জীবন মৃত্যুর এমন অনুষঙ্গ। স্মৃতির শরীর পুড়িয়ে ফেলার আগে নদী জলে শেষ স্নান— সৎকার শেষ হলে শেষ চিতাভস্ম মিশে যাক বিশাল

প্রবাহিনীর তরল মাতৃমূর্তিতে। ঐতিহ্য স্মৃতি কল্পনা মিথ্ সব কিছুতেই শ্মশান আর নদী অঙ্গ াঙ্গী। শাদুল্লাপুরে তাই ভীষণ মন খারাপ হয়ে যাওয়া। অথচ সম্মানে সে কুলীন শ্মশান। স্বর্গে পৌঁছবার ডাইরেক্ট এক্সপ্রেস। আসাম, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে পুত্র গঙ্গায় ফেলার জন্য নিয়ে আসে বাবা মায়ের অদাহ্য নাভিকুণ্ড। গঙ্গার পুরোনো খাত। মজা ডোবা—তবু তো গঙ্গা, তবু তো শাদুল্লাপুর।

তাই পুরাতন মালদহের স্রোতস্বিনী মহানন্দা সংলগ্ন ছিমছাম শ্মশান বা মালদা শহরের বালুচরের কাছে বোঁচারটাঁক তেমন গুরুত্ব পায় না। নিখুঁত জ্যামিতিক চন্দনকাঠের চিতা, প্রচুর ঘি, চারিদিকে সুশৃঙ্খলিত জনতা এবং হাজার ক্যামেরার সামনে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব পুড়ছেন— এ দৃশ্যের রোমান্টিকতা অভাগীর স্বর্গের মুখুজ্জে গিন্নীর স্বর্গারোহন বর্ণনার পরিবর্তিত রূপ। এরকম হয় না সবার ক্ষেত্রে। কাঙালির মা অভাগীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। চাঁদা তুলে সৎকার হয়। কম বাজেটের সৎকারে অর্ধপোড়া দেহ মাটিতে যায় অথবা জলে। বোঁচারটাঁক এমনই এক অন্ত্যজ শ্মশান। গ্ল্যামার বিহীন দুঃখীদের শ্মশান। মহানন্দা বাঁধ ধরে লছমী সিনেমা হলের দিকে যেতে দূরে নদীচরের দিকে হাত তুলে ছয়-সাতের দশকে বড়রা দেখিয়েছিলেন বোঁচারটাঁককে। একটু নাক সিঁটকানো ভাব ছিল। রিক্সাওয়ালা বা পাটমজুরদের পোড়ানো হয় ওখানে। ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াইয়ের মৃত জিতু সাঁওতালকে ঝামেলা এড়ানোর ভয়ে দাহ করা হয়েছিল বোঁচারটাঁকে এরকম একটা তথ্য পেয়েছি—এ তথ্য সঠিক হলে বোঁচারটাঁক ঐতিহাসিক এক গুরুত্ব পাবে। লোক-এর জন্য শ্মশান তথ্য সংগ্রহ এক কার্তিকের বিকেলে গিয়ে দেখেছি প্রায় চার পাঁচ কাঠা জায়গা ঘিরে সবুজের এক চমৎকার সমারোহ। বেড়া খুলে ভেতরে ঢুকতেই ডানদিকে দত্তাত্রেয়-র মন্দির অন্যদিকে কালীমাতা। নানারকম পাতাবাহার, ফুল আর নবীন চারাগাছ লাগানো বাগান। গোবর সার মেশানো কালো মাটি তৈরি করছেন দুই একজন। বাঁ হাতে পুরসভার তৈরি লোহার খাঁচার চিতা—অব্যবহৃত। বাগানের শেষপ্রান্তে বাঁধানো গোল সিমেন্টের বেদীর ওপর খোড়ো চালের খোলা দাওয়ার পুরোন আশ্রমের আদলে মন্দির। তারা মা আছেন আর আছে বামাক্ষ্যাপার বেশ বড়সড় মূর্তি। জনাপাঁচেক ভক্ত বেদীর ওপরে বসে। রামকৃষ্ণর বড় এক তৈলচিত্র মেরামত করছিলেন স্থানীয় এক কারিগর। মন্দিরের পালে বাগানের সীমারেখা বেড়া দিয়ে—নদীমাত্র দশফুট দূরে। সেই জায়গাটুকুই চর এবং দাহ করার স্থান। না, দৈনিক এখানে শবদাহ হয় না। সপ্তাহে মাত্র দুই একজনই আসেন। আর মাঝে মাঝে হাসপাতাল থেকে একসঙ্গে সাতআটটা বেওয়ারিশ লাশ আসে। মন্দিরের বাগান সংলগ্ন এলাকাটি বাদে সবটাই ঘনবসতি। পচাগলা মৃতদেহ দাহের গন্ধ নিয়ে স্থানীয় লোকেরা আপত্তি জানায়, সেই কারণে রাত্রিকালে সেগুলোর দাহকার্য করার কথা জানানো হয়েছে—জানালেন আশ্রমের অন্তরায়। তিন বছর আগের তৈরি শ্মশান সংলগ্ন এই ত্রিনাথ সেবাশ্রম সংঘ আশ্রমটির প্রেসিডেন্ট

অরবিন্দ সাহা। সেবাইত তিনজন রাজু হালদার, শ্যামসুন্দর সেবাপুরী, মিঠুন দাস। আগে মোদো মাতালের আড্ডা ছিল বোঁচার টাঁক। দত্তাত্রেয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এ আশ্রম হবার পর থেকে সেসব অত্যাচার কমেছে। শ্মশানে মৃতদেহ দাহর জন্য কোনও বৈধ কাগজ লাগে না। রেজিস্ট্রেশনের বালাই নেই। দত্তাত্রেয় পশ্চিমবঙ্গের খুউব একটা প্রচলিত নন—বেনারসের লাহরীটোলা, গুজরাটে এর মন্দির আছে। মালদহের কুতুবপুর সংলগ্ন নাকা ফাঁড়ির পেছনে দত্তাত্রেয়-র কিছু শিষ্যর আখড়া আছে। অত্রি পত্নী অনুসূয়া-র সতীত্ব পরীক্ষার জন্য মুনির অবর্তমানে আশ্রমে এসেছিলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। বিবসনা হয়ে স্তন্য পান করাতে হবে এই ছিল তাঁদের আবেদন। কমুণ্ডুলের জল ছিটালে শিশু হয়ে যান তিন দেবতা—স্তন্য দিতে তখন অসুবিধা নেই। ধর্মের তিন বাঘা বাঘা দেবতা শিশু হয়ে আটকে আছে মর্তে অনুসূয়ার কাছে—দেবতাদের বৌয়েরা কেঁদে পড়লেন অনুসূয়ার কাছে। দুগ্ধপান করিয়েছেন শিশুদের— অনুসূয়া মাতৃত্বের দাবি ছাড়তে পারেন না, তিনি পেলেন একই শরীরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে দত্তাত্রেয় রূপে। যোগাসনে বসা ভোলানাথের দুদিকে দুটো মুখ একটা ব্রহ্মার অন্যটি বিষ্ণুর। প্রতি সোমবার বাবার ভোগ। এছাড়া আছে নিত্যসেবা এবং বাবার গঞ্জিকা সেবন। চারিদিকে কংক্রিট জঙ্গলের মধ্যে একটু সবুজ নিঃশ্বাস নিতে পাগল শহুরে মানুষের ভালো লাগবে এই আশ্রম—যতদিন না পাকাপোক্ত কংক্রিট প্রতিষ্ঠান হয়ে যায়।

লোলাবাগ, স্টেশন রোড পেরিয়ে খানিকটা এগোলে বাঁদিকে মহানন্দার ধার ঘেঁষে পুরাতন মালদহ শ্মশানে বাঁধানো পাকা মন্দিরের পাশে স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী মহানন্দা। উঁচু দোচালা টিনের শেডের নিচে একই রকম লোহার চুল্লি এখানেও। পুরসভার তত্ত্বাবধানে তৈরি। লোহার চিতার টেকনিক্যাল কিছু অসুবিধা আছে যার জন্য সব জায়গাতেই ব্যবহৃত হয় কাঁচা চিতা। শ্মশানের মাঠে অজস্র চোরকাঁটা আর এখানে কবরের মতো শ্মশানফলক দু একটি। দূরে শাদুল্লাপুরে না গিয়ে এখানেই চমৎকার দাহকার্য হতে পারে কিন্তু এখানেও এক্সপ্রেস আর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সমস্যা—গঙ্গায় নাভি গেলে যে অনন্ত স্বর্গ। সুতরাং শাদুল্লাপুর সর্বদাই এক নম্বরে। আসলে খানিকটা শহুরে দাদাগিরি। শহরের নিকটবর্তী শ্মশান সুতরাং হাঁক ডাক বেশি। অথচ জেলার প্রতিটি প্রান্তেই শ্মশান আছে। মালদা কোর্ট স্টেশনে বেহুলার ধারে সর্বমঙ্গলা কালীমন্দির সংলগ্ন শ্মশান, পাকুয়ার গোরবাকুরী পঞ্চতন্ত্র মহাশ্মশান, ফরাক্কার গঙ্গা এবং মানিকচক ঘাটে শ্মশান। গ্রামাঞ্চলে ছোটখাটো জোতদার বা সম্পন্ন গৃহস্থর নিজস্ব বাগান সংলগ্ন জলাশয়ের ধারে পারিবারিক দাহকার্য করার ব্যবস্থা থাকে। বৈষ্ণবদের মধ্যে নিজেদের গৃহের উঠোনে দাহ নয় সমাধি দেবার রীতিও দেখেছি। মানিকচকে অনন্ত গঙ্গা। ওপারে রাজমহল বিহার-বাংলা সীমান্ত ছুঁয়ে বিশাল প্রবাহিনী। বর্ষার অনর্গল উচ্ছ্বাসে সে প্রবার ঘোর মৃত্তিকাবর্ণ ঘোলাটে। মানিকচক থেকে ফরাক্কা আদিগঙ্গা বিভিন্ন কারণে ভাঙ্গণপ্রবণ। জল নামা ওঠার

মর্জি নিয়ে অস্থায়ী এখানকার শ্মশানভূমি। এখানে জীবন আর মৃত্যু নির্মাণ ধ্বংস পাশাপাশি এবং পেছনে বিশাল চালচিত্রের মতো গঙ্গা।

'ধায় রাত্রি ধায় রাত্রি মাতৃধারা যায় রে গঙ্গায়'—মৃত্যু এমন এক মহান বিষাদ। ক্ষুদ্র মনুষ্য জীবনের চারদিকে নশ্বরতার মহান উৎসব ,অথচ আমাদের অমরত্বলোভ। যিনি যান, তিনিই যান—জীবন পড়ে থাকে সব রঙরূপ কামনা বাসনা নিয়ে। দিনের আলোয় এই চলে যাওয়া এ্যাতো স্বাভাবিক—ভয় পাই আমরা। ভয় লাগে—আমাদের, আমার চলে যাওয়া তবে কিছুই নয়? এক তিল শোক নয় পৃথিবীর? মৃত্যু তবে রাত্রে আসুক—যখন চরাচর ঘুমিয়ে। যখন জীবন মানে স্তব্ধতা। জীবন মানে আলো জেনেছি, মৃত্যু তাই রাত্রি-অন্ধকার। কালো শোকবস্ত্র পরে স্বজন হারানোর পাশাপাশি রাত্রি দাঁড়াও। কাঁদো। বিলাপ করো। শোকে পাথর হও। উন্মাদ হও। এসো অন্ধকার। অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানো অতৃপ্ত আত্মাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সৎকার গাথা গাও। রাত্রিশেষে জবাকুসুম ভোর-সারা পৃথিবী বেয়ে জীবনের ছুটে যাওয়া। তখন মৃত কোথায়—কোথায় চিতাকাঠ স্মৃতি—সফেন জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ো যাও। কিছু থেমে থাকবে না কারও জন্য। শ্মশান বৈরাগ্য ধোও নদী জলে—এই জীবনের সঞ্জীবনী গ্রহণ করো দু হাতের পাতায়। ঢক্ ঢক্ পান করো মহাজীবন।

'যত শোক—যত দুঃখ/তত খণ্ড—তত ছিন্ন/যত অণু তত রেণু ...'

আজকের যন্ত্র সভ্যতায় জীবন ছোটো হয়ে আসে। মৃত্যু ছোটো হয়ে আসে। মৃত্যু নদী রাত্রি নির্জনতা শ্মশানভূমি প্রত্যেকে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যে জমজমাট লোকালয়ে কংক্রিটের বাঁধনে শ্মশানভূমি আমাদের আহত করে। খটখটে দুপুর রোদে স্মৃতি শোক বিষাদ বিজড়িত শাদুল্লাপুরের কংক্রিট নিঃশ্বাস আর নদীর নিস্তরঙ্গ গতিতে শ্মশান খুঁজে পাইনি। রাত্রি-ও তো নয় তখন। রাতের রহস্যময়তা না থাকলে শোক, স্মৃতি, মায়া—সবই বেপথুমান। শ্মশান দেখেছি সে দিনই—অন্য কোথাও। সেই কাহিনি দিয়েই শেষ করব এ নিবন্ধ।

৫/৯/০৩—শাদুল্লাপুর থেকে মেহেরাপুর হয়ে গীতামোড় ঘুরে বাঙ্গীটোলা পেরিয়ে যাচ্ছি পঞ্চানন্দপুরের দিকে। গঙ্গার ভাঙনে প্রায় বছর তিরিশ ধরে কাটছে পঞ্চানন্দপুর। মানিকচক, কালিয়াচক, রতুয়া, ইংলিশবাজারের মানুষ গত তিরিশ বছরে বারবার পিছিয়ে এসে ভিটে গড়েছেন। গত পঁচিশবছরে ঘরবাড়ি জমি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়েছেন প্রায় ছয় লক্ষ মানুষ। বাঙ্গ াটোলায় চেকিংপোস্টে প্রয়োজনীয় কাগজ দেখিয়ে পার পেলাম। অপ্রয়োজনীয় গাড়ি, বাস, বাইক ঢোকা নিষিদ্ধ এখানে। পরের দিন আগে যখন এখানে এসেছি জনপদ থেকে সভ্যতার সবচিহ্ন খুলে নেবার ক্লান্ত প্রয়াস দেখেছি। জানালা দরজা ইট—আসবাব তৈজস—সব নিয়ে পালাচ্ছে মানুষ। আজও তেমন। মানুষ, গবাদি, দিয়ারার উর্বর চর, খেয়ালি আকাশ এমনকী মালবহনকারী শক্তিমান, টাটা-র ট্রেকার ট্রাক সবকিছু এক মিহি বিষাদে ঢাকা। বেলী ব্রিজ

পেরিয়ে, বাজার ছাড়িয়ে গঙ্গাভবন টোলার কাছে গিয়ে দেখি সামনে আদি অনন্ত জল—কোথাও বাতাস নেই, ঢেউ-এর অনর্গল উচ্ছ্বাস নেই, সব স্তব্ধ শান্ত। শুধু নেই নয় যেন কখনও ছিল না। গ্রাম তার মাটির ঘর খোড়ো চাল মকাই আর দানা শস্যর মতো চরের মানুষ তারা যেন ডুববে, ডুববেই—অন্ত্যজ জীবনের এই তো লিখন। কিন্তু তাদের গরিব গেরস্থালির মধ্যে অহংকারের যে অট্টালিকা বানিয়েছিল শহর—গঙ্গাভবন সেন দপ্তরের আবাসন— গাছগাছালি বাগান সহ দ্বিতল প্রাসাদ—তার কোনও চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। আগের দিন রাত্রি একটা, দেড়টার সময় জলে একদম খাড়া হয়ে নেবে গেছে ভবন বিল্ডিং। ভবন গেল কী থাকল তাতে কিছু এসে যায় না গরিব মানুষের। ভবনে বড় বড় মন্ত্রী আসত, শহর আসত, তাদের আলোয় এ অঞ্চল ফোকাসে থাকত—সুতরাং তাদের মন খারাপ ছিল। কিন্তু ভিটেমাটি আশ্রয় হারিয়ে দুটো হাত-পা ছাড়া যাদের আক্ষরিক অর্থেই কিছু নেই তাদের শরীরে মনে যে অসহায় বিলাপ—তা যেন ছন্নছাড়া সর্বগ্রাসী শ্মশান ভূমির চিহ্ন। পাগলা গঙ্গা দুই নদী মিশে গেছে। ভিটেমাটি স্বপ্ন সব খেয়ে আলস্যে গড়াচ্ছে জল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে জীবন নয় মৃত্যু—পোড়া কাঠ, ছাই, ভাঙা ঘট, ধূপ। বুকে ধিকিধিকি চিতা নিয়ে বিশালদেহী আয়েসউদ্দীন আর নূরবানু বসে আছে। তারা স্থাণু। আয়েস উদ্যানের আদিম প্রস্তরবৎ বিশাল শরীর। রং সবুজ কালো। দুর্বাদল। যে বিশেষণ রামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়— ছায়া হিম বিষাদ মাখা পড়ন্ত বিকেলে যেন ঠিক সেই রকম গায়ের রং তার। বহু শতাব্দীর শস্য, সবুজ গাঙ্গেয় বাতাস আর জলজ অভিজ্ঞতা সে রঙে। আপাতত সব শেকড় হারিয়ে মাটির ওপর বসে আছে অসহায় স্বামী স্ত্রী। বন্যায় চর ডুবে গেলে আবার জেগে ওঠে নতুন চর। নতুন স্বপ্ন। কিন্তু এ যে ভাঙন। গঙ্গা আর তরল মাতৃমূর্তি নন। আক্ষরিক অর্থে সলিল সমাধি ঘটেছে জনপদের, আর জেগে থাকা মাটিতে থেকে গেছে ছত্রাকার ভাঙা জীবনের চিহ্ন। শস্য রাখার মাটির পাত্র উল্টিয়ে পড়ে আছে, ভাঙা উনুন, চট পেতে মাটিতে শিশুকে শুইয়ে যেটুকু পারা যায় সরাতে ব্যস্ত কেউ। এরই মাঝে বিশালদেহী আয়েসউদ্দীনের জ্বলন্ত শরীর। নূরবানু, দিলসাদ, লক্ষীপাল, কার্তিক মণ্ডল। সব ব্যর্থ শরীর এক হয়ে পুড়ে যাচ্ছে আয়েসউদ্দীনের জলজ কৃষিজ শরীর। এখানে শিবাধ্বনি নেই, পেচকের খরস্বর নেই, নেই মড়া পোড়ানোর কটুগন্ধ। জীবনের প্রচুর আয়োজন মুছে যাচ্ছে প্রকৃতির খেয়ালে, মানুষের অবেহলায়। শিকড় ডুবে যাচ্ছে। তীরে দাঁড়িয়ে আছে যে চারাগুলি তারা আর কোনও চরে প্রোথিত হবে না—চুবড়ি থেকে ছড়িয়ে পড়ছে ভুট্টাদানা—পপকর্ণ হয়ে শহরে বিক্রি হবে কেউ—কেউ প্লাস্টিকের প্যাকেটে ঘুরবে বোম্বে, দিল্লি, কলকাতার ফুটপাথে। অনন্ত সম্ভাবনাময় জীবনে যখন হাহাকার, হুতাশন তখন সে জীবন শ্মশানবৎ। উচ্ছেদে, ভাঙনে, প্রকৃতির তাণ্ডবে, রাষ্ট্রের সন্ত্রাসে যেভাবে জনপদ হয়ে যায় মহাশ্মশান—এক বিষাদ বিকেলে তারই সাক্ষী হয়ে হারিয়ে গেলাম জীবনের অনন্ত নশ্বরতায়।



মহানন্দার তীরে শ্মশান : পুরাতন মালদহ। ছবি : তৃপ্তি সান্ত্রা।



মালদহের ভিক্টোরিয়া ট্যাঙ্কের পার্শ্বস্থ সমাধিক্ষেত্রের একটি সমাধি।
ছবি : কমল বসাক।

❑ লেখক পরিচিতি : কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, পেশা-শিক্ষকতা।

মালদহে ইউরোপীয়দের সমাধিক্ষেত্র

কমল বসাক

মালদহে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয় ইংরেজি ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। তখন মালদহ নামে কোনো জেলার অস্তিত্ব ছিল না। এর অনেককাল পরে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ আমলে প্রশাসনিকভাবে মালদহ জেলার সৃষ্টি হয়। তবে আজকের ওল্ড মালদা নামে জায়গাটিকেই তখন বলা হত মালদহ। তা ১৬৮০ সালের ২২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ওঁরা আজকের ওল্ড-মালদায় পদার্পণ করে একটা ভাড়াবাড়িতে তাঁদের কাজ শুরু করলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু অসুবিধার জন্য ওই ১৬৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে মহানন্দা নদীর পশ্চিমপাড়ে স্থানীয় জমিদার রাজা রায়চৌধুরীর কাছ থেকে মাত্র ৩০০ টাকার বিনিময়ে একখণ্ড জমি কিনলেন। ওই জমিটির মধ্যে মকদমপুর, সিংহাতলা, কুতুবপুর ও হায়দারপুর নামে চারটি গ্রাম অবস্থিত ছিল।

এ ঘটনা কলকাতা পত্তনের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। ১৬৯০ সালের ১০ নভেম্বর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৩০০ টাকা ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তৎকালীন বড়িশার জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীর কাছ থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলকাতার জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন। কলকাতা পত্তনের সেই হল শুভ সূচনা।

সে সময় আজকের শহর মালদায় প্রথম ইংরেজ কুটি তৈরি হল তৎকালীন সিংহাতলায় অবস্থিত জমিদার রাজা রায়চৌধুরীর তৈরি পুকুরপাড়ে, যে পুকুরটিকে কেউ কেউ বলেন বাঘ-পুকুর। বর্তমানে সেই স্থানটিই হল সিংহাতলায় অবস্থিত পূর্ত বিভাগের আবাসন স্থল। পরবর্তীকালে ওই পুকুরপাড়ের জরাজীর্ণ কুটির ভেঙে ওইখানেই তৈরি হয়েছে পূর্ত বিভাগের দপ্তরখানা। ওই কুঠির কুঠিয়ালদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পূর্ত বিভাগের দপ্তরখানার উত্তরদিকে রাস্তার ওপারে সদর হাসপাতাল এলাকার মধ্যে কয়েকটি কবরের চিহ্ন আজও বর্তমান।

এভাবে অনেককাল এগিয়ে এসে মালদহের এই কুঠির স্থান পরিবর্তন ঘটে। দেওয়ানি লাভের পর ১৭৭১ সালে মালদহের সিংহাতলায় অবস্থিত পুরাতন কুঠি থেকে কিছু উত্তরে সরে এসে টমাস হেঞ্চম্যান নামে একজন সাহেব গড়লেন একটি বিশাল সুদৃঢ় কুঠি যার রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন তিনি নিজেই। 'বড়কুঠি' এই নামে পরিচিত হয়ে উঠল এই নবনির্মিত কুঠি। এই কুঠিতে শুরু হয় রেশমবস্ত্র উৎপাদনের, মজুত রাখার এবং বিদেশে চালানের এক বিরাট কারবার। ক্রমে এই বড়কুঠিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল শহর ইংরেজ বাজার। আর অদূরের ওই পুরানো সিংহাতলার কুঠির প্রাধান্য ক্রমে অস্তমিত হল। শুরু হয়েছিল এই বড়কুঠিকে কেন্দ্র করে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠিয়ালদের এক দীর্ঘ রোমাঞ্চকর জয়যাত্রা। ... এভাবে

দীর্ঘকাল এখানে বসবাস করার পর বহুদিন আগেই ওরা দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। মালদহ আজ পুরোপুরি স্বদেশি শহর। কিন্তু এই শহরের বুকে আজও বিরাজমান ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত ওইসব দিনের বহু ঔপনিবেশিক স্মারক। পুরাকীর্তি বা পুরাসম্পদের পর্যায়ে পড়ে এ হেন স্মারকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল প্রাচীন গোরস্থানগুলি। বিশেষ করে সমাধিফলকে সমাধিস্থ ব্যক্তির নাম ও পরিচয় উৎকীর্ণসহ বহু বছরের প্রাচীন ওই কবরগুলি। এ পর্যায় মালদহ শহরে বিদেশি বণিকদের তিনটি সমাধিক্ষেত্রের কথা আমাদের জানা আছে।

প্রথমেই যে গোবরস্থানটির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে সেই গোরস্থানটির কোনো চিহ্নই আজ আর বর্তমান নেই। শহরের নব-নগরায়নের প্রয়োজনে সমাধিগুলো বিনষ্ট করে সেখানে তার উপর ঘরবাড়ি নির্মিত হবার ফলে গোরস্থানটি আজ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর অবস্থান ছিল বর্তমান শিব্রাম ভবনের ঠিক পেছনের দিকে। প্রকৃতপক্ষে যে গোরস্থানটি এখানে ছিল তা ডাচেদের কবর। বলা হয় যে পাশেই ছিল এঁদের ফ্যাক্টারি। বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকেও সেখানে মৃতব্যক্তিদের নামধাম-সহ তিনটি সমাধি দেখা গিয়েছিল। একটিতে লেখা ছিল 'Antonoio Custidio, d. 1793, aged 30', দ্বিতীয়টিতে লেখাছিল 'Ambrozio Jose' d. 1799, aged 12 এবং তৃতীয়টিতে লেখা ছিল 'Maria, d. 1813, aged 43'. বয়সের উদ্ধৃতি দেখে জানা যায় যে এঁদের সকলেই অপরিণত বয়সে মৃত্যু হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে কবর তিনটিতে শায়িত এঁরা তিনজনই। 'Mascarenhas' নামে পরিচিত একই পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

দ্বিতীয় গোরস্থানটির অবস্থান শহরের গাজল ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের পেছনে অবস্থিত নোংরা জলাশয়টির পুবপাড়ে। পুরনো সিমেন্ত্রি রোডের পশ্চিম প্রান্তটি যেখানে গিয়ে কৃষ্ণজীবন সান্যাল রোডের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই সংযোগস্থলের বামদিকে নোংরা অপরিচ্ছন্ন জল এবং ময়লা ও আবর্জনাপূর্ণ একটি জলাশয় আছে। আদতে এই জলাশয়টি ইংরেজ আমলে তৈরি বহু প্রাচীন একটি পুকুর। এই কয়েক বছর আগেও পুকুরটির পুবপাড়ে জলে নামার জন্য বিশাল বিশাল কয়েক ধাপ পাকা সিঁড়ি দেখা যেত। সে সময় রানী ভিক্টোরিয়ার অর্থানুকুল্যে এই পুকুরটি তৈরি হয়েছিল 'ভিক্টোরিয়া ট্যাঙ্ক'। কিন্তু মালদহের তৎকালীন অধিবাসীরা এই পুকুরটিকে বলত 'বিবির পুকুর'। আর এই পুকুরটির চলতি নামে পার্শ্ববর্তী জনপদটির নামে হয় বিবিগ্রাম। তা এই পুকুরটির পুবপাড়ে ফল ও ফুলের গাছপালায় ভর্তি বিশাল জায়গা জুড়ে ছিল সাহেবদের বহু সমাধি। তাই এই গোরস্থানে যাবার রাস্তাটির নাম হয় সিমেন্ত্রি রোড। তা কতজন সেখানে সমাধিস্থ ছিলেন তা আজ নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই। কারণ এই সমাধিস্থলটির বহু সমাধি নষ্ট করে সেই জমির উপরেই তৈরি হয়েছে বহু সরকারি কার্যালয় এবং কিছু জনসাধারণের ঘরবাড়ি। সৌভাগ্যক্রমে গোটা পাঁচেক সমাধি রক্ষা পেয়েছে। সেগুলি ইংরেজ বাজার ব্লক অফিসের চত্বরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভীষণ অনাদৃত অবস্থায় পড়ে থেকে একেবারে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার দিন গুনছে। গোরস্থান দিয়ে এতদিন যে রাস্তার পরিচয় ছিল—

আসুন সেই রক্ষা পাওয়া পাঁচটি সমাধি ফলক পাঠ করে দেখি সেই গোরস্থানে কারা কারা চিরনিদ্রায় সমাহিত আছেন। দেখি — আরও কী কী কথা লেখা রয়েছে ওই সমাধি ফলক-গুলিতে :

১ম সমাধিফলক : Mrs. J. Kelly (Wife of Mr. J. Kelly–Civil Surgen Of Malda Hospital) Inscription : "thy will be done" – 1891.

২য় সমাধিফলক : "rest & peace Forever more" to the memory of T. Campbell - 1871.

৩য় সমাধিফলক : Eligabeth Ann – "I shall go to her but she shall not to me" (সাল-তারিখ কিছু লেখা নেই)

৪র্থ সমাধিফলক : Donnington castte : 'Dust we are and dust shall we return.' (সাল-তারিখ কিছু লেখা নেই)

৫ম সমাধিফলক : "In Fond remembrance of a much loved brother" : 1838-1874. "And now Lord what is my hope. Truly my hope is even in thee."

এখানকার প্রত্যেকটি সমাধিফলকে উৎকীর্ণ বিশেষ অর্থবহ চমৎকার উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ করার মতো।

তৃতীয় সমাধিক্ষেত্রটি মালদহ জেলা সদর হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে নার্সদের কোয়ার্টারের প্রায় সামনের দিকেই অবস্থিত। ইংরেজদের ছয়টি সমাধি নিয়ে তৈরি এই সমাধিক্ষেত্রটির বর্তমান দুরবস্থা দেখে আমাদের ভীষণ দুঃখ হয়। সমতল থেকে একটু উঁচু জায়গায় এই সমাধিক্ষেত্রটি পুরোপুরি বিভিন্ন জাতের গাছপালায় ঢেকে গেছে। প্রত্যেকটি সমাধির গায়ে আগাছা গজিয়ে উঠেছে। তাছাড়া কয়েকটি সমাধির চূড়ায় বিশাল বিশাল গাছ জন্মে তার শিকড় ওই সমাধিগুলোর ইটের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেছে। ঝোপঝাড় ভেঙে কাছে গিয়ে সমাধিলিপিগুলি পাঠ করার আজ আর কারও সাহস হবে না। বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে তখন দেখে লিখে রাখা থেকে সমাধিফলকগুলির পাঠ উদ্ধৃত করছি :

১ম সমাধিলিপি : In Memory of Wm BROWNE ESORE Who Died 10th March, 1800. Aged 38 years. After residing 17 years at Malda. 'The righteous shall be in Ever Lasting Rememberance.

২য় সমাধিলিপি : SCARED : To the Memory of DAVID BROWN ESQRE Who Died at Malda On the 5th Day of March, 1819. Aged 38 years.

৩য় সমাধিলিপি : SCARED : To the Memory of WILLAM ALEXANDER ESQRE Who died at Malda the 12th Day of October, 1832. Aged 36 years.

৪র্থ সমাধিলিপি : SACRED : To the Memory of DONALD A TAYLOR Who Departed this life on the 11th November, 1834. Aged 19 years. This Monument is Erected By his very affectionate Brother JOHN TAYLOR.

৫ম সমাধিলিপি : SACRED : To the Memory of JOHN ALEXANDER ESORE WHO Died at MALDA On the 18th Day of February, 1835. Aged 51 years.

৬ষ্ঠ সমাধিলিপি : SACRED : TO THE MEMORY OF MR. JOHN DUNNET WHO DEPARTED THIS LIFE ON THE 4TH OCTOBER, 1843 IN THE 21ST YEARS OF HIS AGE : HOLMES AND CO. CALCUTTA.

আমরা জানি যে সংজ্ঞা অনুসারে একশো বছরের বেশি পুরনো ঐতিহাসিক ইমারত বা স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শনকে পুরাকীর্তি বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া প্রাচীন স্তূপ, ঢিপি, জলাশয়, ভাস্কর্য, পুথি-পুস্তক, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র, এগুলিও পুরাকীর্তি বা পুরসম্পদের পর্যায়ে পড়ে। এগুলি ছাড়া পুরাকীর্তির আর একটি উল্লেখযোগ্য নির্দশন হল প্রাচীন গোরস্থান। বিশেষ করে সমাধিফলকে সমাধিস্থ ব্যক্তির নাম ও পরিচয় উৎকীর্ণসহ অন্তত শতাধিক বছরের প্রাচীন কবরগুলি—যে কথা আগেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি বহনকারী বিবিধ নিদর্শনগুলিকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছেন এ হেন দুটি সরকারি সংস্থা হ'ল 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ'' (Archaeological Survey of India) এবং 'রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকার' (State Archaeological Department)। বর্তমানে ইতিহাস বোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের এত বিপুল সংখ্যক সংরক্ষণযোগ্য নিদর্শনাদি বেড়েছে যে এককভাবে তাঁদের কারও পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা। কিন্তু এ ব্যাপারে কেন জনগণ এগিয়ে আসবেন? এ বোধ তো তাঁদের মোটেই নেই যে পুরাকীর্তি বা পুরাবস্তু তাঁদের বা আমাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষদেরই অবদান। এ আমাদের সকলেরই জাতীয় সম্পদ এবং এহেন সম্পদ সুরক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁদেরই। তাই এ কাজের জন্য প্রথমে দরকার ব্যাপক গণচেতনা গড়ে তোলা। ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে জনগণের অবহিত হওয়া।

আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক অতীতকেও একটা জায়গা করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে ঔপনিবেশিক আমলের স্মারকগুলি রক্ষা করা মানেই শুধু বিদেশিদের স্মৃতি রক্ষা করা নয়—সেই জেলার ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। তাই ঔপনিবেশিক আমাদের অট্টালিকা এবং অন্যান্য স্মারকগুলির মধ্যে ওঁদের গোরস্থানেও পুরাতাত্ত্বিক মূল্য যে কম নয় সে কথা বুঝানোর উদ্দেশ্যেই আমার এই নিবন্ধের অবতারণা। তবে দুঃখ হয় এ কথা ভেবে যে এই মালদহ জেলার এ হেন কিছু কিছু স্মারক অনাদরে এবং অবহেলায় ইতিমধ্যে লুপ্ত হয়েছে। কিছু জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবার দিন গুনছে। অথচ এগুলোকে যথাসম্ভবভাবে সংরক্ষণ করার প্রশংসনীয় কোনো উদ্যোগেই নেই।

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক।

মালদা জেলার শ্মশান ও গোরস্থান

আবদুস সামাদ

আলোচ্য প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু যেহেতু মালদা জেলা সম্পর্কিত। সেইহেতু সেটির আলোচনার প্রাক্‌কালে অন্তত সেই জেলার পরিচয় প্রসঙ্গটিও একান্তই অপরিহার্য। স্বভাবতই এবারে সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টিটা প্রথমেই নিবদ্ধ করা যেতে পারে এই প্রকারে।

''বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জেলা হল মালদা জেলা। উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার স্বরূপে এ জেলা বিগত ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের আগে ভাগলপুর ও রাজশাহী বিভাগে এবং স্বাধীনতা লাভের পর প্রথমত প্রেসিডেন্সী বিভাগভুক্ত হবার কিছুকাল পর থেকে আজো অব্দি তা জলপাইগুড়ি বিভাগে অবস্থিত। শুধু তাই-ই নয়,''[১] ''সেই সুদূর অতীতের গৌড়, পাণ্ডুয়া, লক্ষ্মণাবতী, টাঁড়া, একডালা প্রভৃতি বহু নগর রাজধানীর ধারাস্নাত হেতু বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত হয়ে রয়েছে এই মালদা জেলা ও তার সংশ্লিষ্ট নানান ইতিহাস। মালদা জেলা গেজিটীয়ার মতে এ জেলা ২৪০৪০´২০´´ থেকে ২৫০৩২´০৮´´ উত্তর অক্ষাংশে, ৮৮০২৮´ ১০´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এবং ৮৭০৪৫´৫০´´ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ জেলার মাটির তারতম্যের ফলে ভূ-বিজ্ঞান অনুসারে এ জেলাকে টাল, দিয়ারা ও বরিন্দ এই তিন বিভাগ অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যদিও এক সময় তার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলভূমি ছিল রাঢ়ভুক্তও।''[২]

''প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এ দেশে ইংরেজ শাসনের শুরুতেই ঐ মালদা আদৌ কোনও জেলা ছিল না। এমনকি তার আগে 'জেলা' বলেও কিছু ছিল না। বরং তখন বা সেই পুরাকালে ঐ জেলার ন্যায় কখনও 'জনপদ', কখনও 'বিষয়' রূপে কিম্বা পরবর্তী শাহী যুগে তা কখনও 'সরকার' কখনও 'চাকলা' প্রভৃতি রূপেও বিদ্যমান ছিল। যদিও এই শেষোক্ত 'চাকলা' শব্দ-পদটির দ্বারা কখনও বিশেষ রাজস্ব বিভাগকেও বোঝাত। স্বভাবতঃই ঐ 'সরকার' বা 'বিষয়' ইত্যাদি স্বরূপ এ জেলার নানান সংশ্লিষ্ট স্থানাঞ্চলভূমিকে এক সময়কালে 'সরকার জান্নাতাবাদ' ইত্যাদিভুক্ত দেখা যায়। তেমনি আবার অপর সময়কালে বিশেষতঃ যেমন সেই পাল যুগে 'কুদ্দাল খাতক' প্রভৃতি বিষয়ভুক্তও দেখা যায়। আর এই বর্তমান লেখক-প্রতিবেদক মতে ঐ 'কুদ্দালখাতক' শব্দ-কথাটি হল 'কোদালকাটি' শব্দ-কথাটিবই সে যুগের সংস্কৃত পোষাকি নাম এবং এইরূপে—কুদ্দাল < কোদাল, খাতক < কাটি (নালাখাত)। ফলে এই 'কুদ্দালখাতক' বিষয়টি প্রকৃত সীমাভূমিটি হল তাঁরই (অর্থাৎ বর্তমান লেখক-প্রতিবেদকরই) নির্ণয়াবিষ্কৃত মতো এই (মালদা) জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত কোদালকাটি ও রতুয়া থানার অন্তর্গত কোদালকাটি থেকে হবিবপুর থানার অন্তর্গত জগজ্জীবনপুর সংলগ্ন কোদালকাটি (স্থানটি) অব্দি। যা তিনি (অর্থাৎ বর্তমান লেখক-প্রতিবেদক) ইতিপূর্বে তাঁরই সংশ্লিষ্ট নানান গ্রন্থ ও

প্রবন্ধ-নিবন্ধে খুব সুস্পষ্টতঃ তুলে ধরেছেন।'' [৩]

''যাই হোক, সেই পূর্বোক্ত ইংরেজ আমলেই তথা সেই বিগত ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ণিয়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলার বেশ কিছু অংশভূমি নিয়ে ঐ জেলা স্বরূপে মালদা জেলা নতুনভাবে গঠিত হয়।... তারপর সেই বিগত ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এই সরকারি নোটিফিকেশন মারফৎ ঘোষিত হয় ঐ নবগঠিত মালদা জেলার ভৌগোলিক সীমা-চৌহদ্দি। যা স্বাধীনোত্তকালে নানা হেরফের বা রকমফেরে হয়েছে কিছুটা ভিন্নরূপ। ফলে বর্তমানে এ জেলার উত্তরে রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমে বিহার, দক্ষিণে গঙ্গা নদী মধ্য সংশ্লিষ্ট সীমা সংলগ্ন জল সম্পদভূমি ও পূর্বে অধুনা বাংলাদেশ।'' [৪]

আর এই স্বাধীনোত্তর কালের ওই উক্ত ভৌগোলিক সীমা-চৌহদ্দির সীমা-পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এই বর্তমান আলোচ্য প্রবন্ধটির বিষয়ীভূত বা বিষয় সম্পর্কিত উক্ত শ্মশান ও গোরস্থান পর্বটিই।

সুতরাং প্রথমেই আসা যাক এ জেলার শ্মশান পর্বটির কথায়। 'শ্মশান' কথাটির অর্থ হল শবদেহ সৎকারের স্থান। [৫] স্বভাবতই সেই অর্থে এ জেলায় দেখা যায় অসংখ্য বা অজস্র অশেষ ওই শ্মশান বা শবদেহ সৎকারের স্থান। যেগুলির অবস্থান বা অবস্থিতি খুব সুস্পষ্টত লক্ষ করা যায় এ জেলার নানান শহর-গ্রাম সংশ্লিষ্ট নানান প্রান্ত-ধারে তথা নানান সংশ্লিষ্ট নদ-নদী, খাড়ি, ডোবা, বিল, বাঁওড়, দহ ইত্যাদির তীরে এমনকী নানান সংশ্লিষ্ট দিঘি-পুষ্করিণীর পাড়েও। যেমন—এ জলার খরবা (অধুনা চাঁচল) থানার মাধাইহাট মৌজার পুরুষদিঘি বা কালী পুষ্করিণীর সংশ্লিষ্ট পাড়গুলিতে ওই শ্মশান বা শবদেহ সৎকারের স্থান বিদ্যমান। সেইরূপ এ জেলার ঐ পূর্বোক্ত চাঁচল থানার মরা মহানন্দার সংশ্লিষ্ট তীরে মালতীপুর শ্মশান, বীরস্থলি শ্মশান প্রভৃতি সহ বর্তমান মহানন্দা নদীর পশ্চিম তীরে প্রায় ১৪/১৫ বিঘা ব্যাপী প্রলম্বিত বিখ্যাত গোয়ালপাড়া-তক্তিপাড়া শ্মশানটি অথবা গাজোল থানার অন্তর্গত আলালঘাটের দক্ষিণে আলাল শ্মশান অথবা ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত বালুচর শ্মশান প্রভৃতি। তাছাড়াও এ জেলার প্রায় প্রতিটি সুবৃহৎ বা সুবিশাল আয়তন বিশিষ্ট অমুসলমান বা হিন্দু বসতি যুক্ত গ্রামের প্রান্ত-ধারের অথবা অন্তত দু-পাঁচটি হিন্দু বসতিযুক্ত গ্রামান্তরের ওই পূর্বোক্ত মতো সেই নানান নদ-নদী বা নানা খানা-খন্দের তীর-ধারেও বিক্ষিপ্তভাবে লক্ষ করা যায় অসংখ্য বা অজস্র শ্মশান স্থান বা স্থানগুলি। যা একান্তই স্থানাভাব হেতু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরা আদৌ সম্ভব হল না এখানে। তবুও উপরোক্ত শ্মশান স্থানগুলি সহ এ জেলার একান্তই উল্লেখযোগ্য নিম্নোক্ত আরও কয়েকটি খ্যাত-অখ্যাত অথবা ছোট-বড় ও মাঝারি ধরন প্রকৃতির শ্মশানগুলির নামোল্লেখের লোভ সম্বরণ করা গেল না। ফলে থানাওয়ারি সেগুলি একই সঙ্গে পরিব্যক্ত করা গেল এখানে এইভাবে নিম্নোক্ত মতো। যথা—

হরিশ্চন্দ্রপুর থানা : হরিশ্চন্দ্রপুর, পিপলা, ভালুকা বাজার, বৈরাট, কুশিদা, তুলসীহাট্টা,

ভাটোল, বরোই, গোপালপুর প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, এই শেষোক্ত গোপালপুরে তথা গোপালপুর মৌজা স্থানটিতে দুটি শ্মশান বিদ্যমান।

চাঁচল থানা : শিহিপুর, শিমুলতলা, চাঁচল, কলিগ্রাম, বলরামপুর, কাগুারণ, পাহাড়পুর, মখদুমপুর, মহানন্দপুর, গৌড়হস্ত, সদরপুর, মালতীপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, রামপুর, রসুলপুর, গৌরীপুর, গোয়ালপাড়া-তক্তিপাড়া, ভেবা, গোবিন্দপাড়া, বীরস্থলি, বত্রিশকোলা, মহাশ্মশান, পুরুদিঘি, কালী পুষ্করিণী প্রভৃতি।

গাজোল থানা : আলাল, মশালদিঘি, ময়না, রানীগঞ্জ, রাজনগর, একলাখি, গণেশবাটি, গরুহাটি, কদুবাড়ি, বড়াহিল, হাতিমারি, বাবুপুর, চণ্ডীপুর-বলরামপুর প্রভৃতি।

রতুয়া থানা : দেবীপুর, রতুয়া, সামশী, কাশিমপুর, ভোগা, মাগুরাটিশাল, মহানন্দাটোলা, বাহারাল, মাদিয়াঘাট, আড়াইডাঙা, পরাণপুর, পুকুরিয়া, গোবরজনা, একবর্ণা প্রভৃতি।

মালদা থানা : সতীঘাট, রশিলাদহ, মাধাইপুর, ছাতিয়ান, আইহোরানী, আটমাইল, সুজাপুর, ওল্ডমালদা স্টেশন রোড, বালিয়া, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি।

হবিবপুর থানা : সিঙ্গাবাদ, আইহো, শিবডাঙ্গি, দাল্লা, হবিবপুর, কেন্দুয়া প্রভৃতি।

বামনগোলা থানা : বামনগোলা, পাকুয়া, মদনাবতী, নালাগোলা প্রভৃতি।

কালিয়াচক থানা : সিলামপুব, জালুয়াবাধাল, মোথাবাড়ি, কপিলমুনি-গঙ্গাসাগর স্থান সংলগ্ন প্রায় সংশ্লিষ্ট শ্মশানস্থান, গোপালগঞ্জ, জালালপুর, আকন্দকাড়ীয়া প্রভৃতি।

বৈষ্ণবনগর থানা : কুম্ভীরা, বীরনগর, খেজুরিয়া, বৈষ্ণবনগর প্রভৃতি।

মানিকচক থানা : নাজিরপুর, মথুরাপুর, মানিকচক, ডোমহাট, শঙ্করটোলা, বোচাহী প্রভৃতি।

ইংরেজবাজার থানা : শাদুল্লাপুর, শৈলপুর, অমৃতি, কোতুয়ালি, গোপালপুর, মিল্কি, বালুচর (বর্তমান শহর মালদার অন্তর্গত) শোভানগর, আমড়িতলা-চড়কতলা সন্নিকটবর্তী ফাঁকা স্থানটি প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত এখানে একান্তই উল্লেখ্য যে, এ জেলার সর্বাপেক্ষা সুবিশাল বা বৃহদায়তন জায়গা-ভূমি বিশিষ্ট শ্মশানটি হল খুব সম্ভবত ওই চাঁচল থানার অন্তর্গত উক্ত গোয়ালপাড়া-তক্তিপাডা শ্মশানস্থানটি। যেটি এ লেখক-প্রতিবেদকের আবাসভূমি হোসেনপুর (তেলগাছি) গ্রামটিরই সন্নিকটবর্তী। আবার এ জেলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শ্মশানটি তথা মহাশ্মশানটি হল ওই ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত উক্ত শাদুল্লাপুর শ্মশান বা মহাশ্মশানটি। যেটি এ জেলার ওই একই থানার অন্তর্গত ভাগীরথী তথা আদি ভাগীরথী নদী তীরবর্তীতে অবস্থিত এবং যেটি এ লেখক-প্রতিবেদকরেই নির্ণয়াবিষ্কৃত মালদার গঙ্গাসাগর স্থানটির তথা ওই কালিয়াচক থানার অন্তর্গত উক্ত কপিলমুনির আশ্রম যুক্ত সেই পূর্বোক্ত গঙ্গাসাগর স্থানটির [৬] ও পার্শ্ববর্তী জাহ্নমুনি স্থানটির তথা এ লেখকের নির্ণয়াবিষ্কৃত জাহ্নমুনির আশ্রম নাম-স্মারক যুক্ত স্থানটির বিশেষ গুরুত্ব-সহ একটি ঐতিহাসিক বা বহু ঐতিহ্যবাহী শ্মশান বা মহাশ্মশানভূমিও বটে। যদিও পূর্বে

বা সেই পুরাকালে এই শ্মশানভূমিটি অবস্থিত ছিল সংলগ্ন প্রায় ভিন্নস্থানে। যেখান থেকে সেই সংশ্লিষ্ট নদীখাত পরিবর্তন ইত্যাদি হেতু সেটি ওই বর্তমান শাদুল্লাপুর স্থানটিতে তথা শাহ আবদুল্লাপুর নামক জনৈক ফকিরের নামাঙ্কিত [৬ক] স্থানটিতে স্থানান্তরিত হয়েছে যথা সময়ে। উল্লেখ্য যে, এই শাদুল্লাপুর মহাশ্মশানটিতে বর্তমান সাংসদ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল বরকত আতাউল গণি খান সাহেবের বদান্যতায় কোটি-উর্ধ্ব টাকা তথা দুই কোটি টাকা ব্যয়ে অতি সম্প্রতি বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপন কার্য সম্পাদিত হয়েছে বা হতে চলেছে। এ জেলার প্রধান [৬খ] বা প্রধানত ও সুবিখ্যাত উক্ত শাদুল্লাপুর মহাশ্মশানভূমি এলাকাটিতে আজও মহা সমারোহে দশহরা স্নানের মেলা [৬গ] সহ আরও নানান মেলা [৭] প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এই মহাশ্মশানভূমি ক্ষেত্রাঞ্চলটিতে সেই সুদূর অতীতের নানান সংশ্লিষ্ট সময়কালগুলিতে সতীদাহও অনুষ্ঠিত হত।[৮] সেইরূপ এই জেলার রতুয়া থানার অন্তর্গত পীরগঞ্জ শ্মশানটি ও মালদা থানার সতীঘাট স্থানটিসহ ওই পূর্বোক্ত চাঁচল থানার অন্তর্গত পাহাড়পুর সতীঘাট শ্মশান এলাকাঞ্চলটিতেও সেই সতীদাহ হত।[৯] এমনকী ওই চাঁচল থানারই অন্তর্গত উক্ত মালতীপুর এলাকাঞ্চলে অবস্থিত উক্ত মহাশ্মশান নামক স্থানটিতে এককালে সেই সতীদাহ হত।[১০] এ লেখক প্রতিবেদকের নির্ণয়াবিষ্কৃত মতো সে যুগের সেই নানান সংশ্লিষ সময়কালের এ জেলার আদি মূল গঙ্গার সংশ্লিষ্ট তীর-ধারে যেটি অবস্থিত ছিল[১১] এবং সেটি ওই সংশ্লিষ্ট মহাশ্মশানটিরই নামাঙ্কিত বা নাম-স্মৃতিবাহী।[১২]

এরপর এবারে আসা যাক এ জেলার উক্ত গোরস্থানের কথায়। এই 'গোরস্থান' শব্দ-পদটির অন্তর্গত ওই 'গোর' আদ্য-পদটি হল একটি ফরাসি শব্দ-পদ।[১৩] যার অর্থ হল সমাধি বা কবর।[১৪] আর এই 'গোর' শব্দ-কথাটির উক্ত কবর বা সমাধি অর্থেই প্রসঙ্গত এ জেলার বর্তমান গৌড়াঞ্চলটির কথা একান্তভাবেই উল্লেখ না করে পারা যায় না। কেননা পাঠানবীর শের খাঁকে দমনোদ্দেশ্যে মোগল সম্রাট হুমায়ুন সেই বর্তমান গৌড়াঞ্চলটি আক্রমণকালে এসে[১৫] সেখানকার আমবাগানের সুশীতল বাতাস ও আমের 'ম, ম' গন্ধে বিমোহিত হয়ে[১৬] এবং সেই গৌড়াঞ্চলটির অদ্য 'গৌড়' পদটিকে বিশেষত 'গৌড়' শব্দ-কথাটিকে ফারসী ভাষা 'গোর' বোধে তথা কবর বা কবরস্থান বোধে তিনি সেখানকার ঐ সংশ্লিষ্ট এলাকাঞ্চলটির নাম পাল্টিয়ে সেটির নতুন নাম রাখেন 'জান্নাতাবাদ'।[১৭] অর্থাৎ স্বর্গস্থান বা স্বর্গপুরী।[১৮] ফলে সেই প্রেক্ষায় বা সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এখানে এ কথাটি নিদ্বির্ধায় বলা যায় যে, এই বর্তমান লেখক-প্রতিবেদক মতে ওই বর্তমান গৌড়াঞ্চলটির নাম ছিল মূলত বা প্রথমত: ওই গৌড়নগর নাম অপেক্ষা বরং 'গোর নগর' এবং এ লেখক-প্রতিবেদক মতে যা ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খিল্জী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণও মেলে বদায়ুনী প্রণীত 'মেন্তাখব-উৎ-তাওয়ারীখ' নাম শীর্ষক সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থখানিতেও। কারণ সেই গ্রন্থখানি মতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মুহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খিল্জি নদিয়া শহরটির ধ্বংসের অব্যবহিত পরেই সেখানে তাঁরই

স্বীয় বা নিজ জন্মভূমি 'গোর' উপত্যকার নাম অনুযায়ী 'গোর নগর' নামক একটি নতুন নগর স্থাপন করেন। যেটি এ লেখক-প্রতিবেদক মতে কালেভদ্রে সমগ্র বাংলাভূমির আদি মূল বা প্রথম গৌড় নগরটির নাম কৌলিন্যে গৌড় নগর তথা পরবর্তী হয় গৌড় নগর অথবা এ লেখকের নির্ণয়াবিষ্কৃত নদিয়া শহরটির প্রকৃত অবস্থানভূমির সমাধিস্থানে গড়ে ওঠা ওই গোরনগর তথা নদিয়া-গোর নগর।[১৯] আর এ লেখক-প্রতিবেদক মতে ওই আদি গৌড় নগরটির প্রকৃত অবস্থানভূমিটি হল মালদা জেলার চাঁচল থানার অন্তর্গত গৌড়শণ্ড, গৌড়হণ্ড, কাণ্ডারণ প্রভৃতি, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গৌড়মন্ড, গৌড়দহ, বারদুয়ারী প্রভৃতি ও রতুয়া থানার অন্তর্গত সামশী, গৌড়াল প্রভৃতি বেষ্টনীযুক্ত সুবিশাল প্রত্নক্ষেত্রাঞ্চলটি।[২০]

যাহোক, ওই 'গোরস্থান' শব্দ-কথাটির ওই সমাধি অর্থে শুধুমাত্র মুসলমানদের সমাধিক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সেই অর্থে যুগী, ওঁরাও প্রভৃতি বহু সংশ্লিষ্ট অন্ত্যজ হিন্দুদের এমন কী বৌদ্ধ, ওলন্দাজ, খ্রিস্টান প্রভৃতিদের সমাধিক্ষেত্রকেও বোঝায়।[২১] যেমন— এ জেলার গাজোল থানার বারোকোনায় তথা এ লেখকের নির্ণয়াবিষ্কৃত মতো হিউয়েন সাঙ বর্ণিত পুন্ড্রবর্ধন নগর সংক্রান্ত বারহকোনা বৌদ্ধবিহারটির প্রকৃত অবস্থান ক্ষেত্রভূমিটিতে সেই বৌদ্ধবিহার সংক্রান্ত বিশেষ সমাধিস্থান[২২]-সহ ওই গাজোল থানার বাগসরাই হাতিমারি, স্টেশনরোড সন্নিহিত সংশ্লিষ্ট খ্রিস্টানদের সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান। এছাড়াও বর্তমান শহর মালদার ডাকবাংলোর দক্ষিণে তথা শিব্রাম ভবন ও ইউ.বি. আই-এর মধ্যবর্তী স্থানাঞ্চলগুলিতে সমাহিত মাসকারেনহাস নামক পরিবারভুক্ত মারিয়া, এমব্রাজিও এবং এন্টোনিও কাস্টডিওর সমাধি-সহ বর্তমান শহর মালদার হাসপাতাল চত্বর ব্যতীত মালদা মডেল মাদ্রাসা ও রানী ভিক্টোরিয়া নামাঙ্কিত[২২ক] ভিক্টোরিয়া ট্যাঙ্কটির মধ্যবর্তীতে অবস্থিত নানান সংশ্লিষ্ট খ্রিস্টানদের সেমিটারি বা সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান।[২৩] যা থেকে উদ্ভূত বা নামাঙ্কিত ছিল উক্ত সেমিটারি রোডটিও।[২৪] যেটি বর্তমানে বি.টি. কলেজ রোড অথবা খুব সাম্প্রতিককালে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন নামে পরিচিত।

তবে এবারে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত মুসলমান সমাধিক্ষেত্র কথাগুলিকে বাদ দিয়ে ঐ 'গোরস্থান' কথাটির দ্বারা বস্তুত ও সচরাচর বা সাধারণত কেবলমাত্র মুসলমানদের সমাধিক্ষেত্রকেই বুঝিয়ে থাকে। যা কখনও কখনও বা 'শাহাবান খানা' নামেও বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে লোকমুখে। আর সেই গোরস্থান বা শাহাবান খানাগুলিও বস্তুত ও যথার্থতই মুসলমান জনসাধারণের সমাধিক্ষেত্ররূপেই চিহ্নিত ও পরিচিত দুই-ই হয়ে থাকে। যদিও বা সেগুলি আবার (১) একান্তই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গোরস্থান ও (২) দশওয়ালি তথা গ্রাম্য বা স্থানিক মুসলমান জনসমাধানের ব্যবহার্য গোরস্থান—এই দুই শ্রেণিরই হয়ে থাকে। স্বভাবতই অন্যান্য স্থানের ন্যায় এ জেলায়ও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। ফলে সেক্ষেত্রে এ জেলায় প্রথমোক্তটির গড় পরিধি বা পরিসর যৎসামান্য বা অনেক কম। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয়োক্তটির বা শেষোক্তটির সেই গড় পরিসর অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশি। সুতরাং সেগুলির প্রায় প্রতিটিই

গড়ে অন্তত এক-দুবিঘারও কম নয়। যদিও বা সেগুলির বেশ কিছু ৮/১০ বিঘারও বেশি জায়গা-ভূমি জুড়ে অবস্থিত। যেমন—কালিয়াচক থানার অন্তর্গত হাতিমারি ভাঁড়া ও মাঠ সংলগ্ন প্রায় গোরস্থানটি। যেটির পরিসর প্রায় ৪/৫একর এবং সেটির ব্যবস্থাপনায় রয়েছে স্থানীয় চাষপাড়া মুসলিম জনসমাজ। সেইরূপ রয়েছে ওই থানার অন্তর্গত প্রায় ৬ একর ব্যাপী ব্রহ্মাত্তের গোরস্থানটি কিংবা ওই ব্রহ্মাত্তের গ্রাম সন্নিকটবর্তী প্রায় ৩/৪ একর যুক্ত বামনগ্রাম গোরস্থানটি। সেইরূপ আবার রয়েছে ভবা-ভগবানপুরের ১৬ (যোল) একর ব্যাপী সুবিশাল গোরস্থানটি। যেটির ব্যবস্থাপনায় রয়েছে উক্ত ভেবা-জোতচণ্ডী গ্রাম মুসলমান জনসমাজ। প্রসঙ্গত এখানে এ কথাটি একান্তই উল্লেখ্য যে, এই উপরোক্ত বা নিম্নোক্ত সরণি ব্যক্তিগত বা জনসাধারণের ব্যবহার্য গোরস্থানগুলিতে কোনও বিশেষ মেলা বা মিলন সংস্কৃতি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয় না বা হয়ে থাকে না। তবে উদ্যোগ ও অনুসন্ধান বা গবেষণার ভিত্তিতে প্রদত্ত এ জেলার প্রায় দেড় শতাধিক নানান সংশ্লিষ্ট পির-ফকিরদের পবিত্র পুণ্যময় দরগা-মায়ারগুলিতে প্রায়ই বা খুব সচরাচর পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যার সুবিস্তৃত বা বিশদ বিবরণ-চিত্রও মেলে বর্তমান বা এ লেখকের 'জেলা মালদহের পির-ফকিরদের কথা', 'উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য উরস্ উৎসব ও প্রয়াত পীর-ফকিরদের মেলা', 'মালদা স্থাননাম' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে। তা সত্ত্বেও এ লেখক প্রণীত সেই গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত পির-ফকিরদের মধ্যে একান্তই উল্লেখযোগ্য নিম্নোক্ত কয়েকজন পির-ফকিরদের দরগা-মায়ারগুলির কথা পরিত্যক্ত না করে পারা গেল না। যেগুলিতে সেই সংশ্লিষ্ট পির-ফকিরদের ফাতিহা (মৃত্যু দিবস), উরস্-উৎসব (মৃত্যু বার্ষিকী) যথা সংশ্লিষ্ট সময়কালে অনুষ্ঠিত হয় বা হয়ে থাকে। যেমন—এ জেলার গাজোল থানার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার তথা হজরত পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত বড় দরগা বা বাইশ হাজারী দরগা ও ছোট দরগা বা ষষ্ হাজারী দরগাক্ষেত্র সহ বর্তমান শহর মালদার জাহানপিরের দরগা, শাদুল্লাপুরের পীরানাপিরের আখি সিরাজের দরগা বা মাজার, ওল্ড মালদার ফকির তাকিয়া, রতুয়া থানার বাহারালের বিখ্যাত দানশাহ ফকিরের দরগা, চাঁচল থানার কালিগ্রামের বিখ্যাত জিন্দাপীঠের দরগাক্ষেত্রগুলি।[২৫] সেগুলির প্রথমোক্তটিতে পির জালালুদ্দীন তাব্রিজীর (রঃ) ও তাঁর আধ্যাত্মিক ধর্মীয় গুরু পবিত্র ফাতিহা ও উরস্ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এখানে তাঁর শিষ্য বা প্রশিষ্য সহ আরও নানান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবর বিদ্যমান। সেইরূপ ওই পূর্বোক্ত ছোট দরগা বা ষষ্ হাজারী দরগাক্ষেত্রটিতেও পির আলাউল হক, পির নূর কুতুবুল আলম প্রভৃতি পিরগণের ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাজার বা কবর বিদ্যমান। তবে সেখানে কেবলমাত্র পিরগণেরই ফাতিহা, উরস্ উৎসব সহ বিখ্যাত শবেবরাতের মেলাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবেই উল্লিখিত অপরাপর পির-ফকিরদের দরগা-মাজারগুলিতে উক্ত ফাতিহা বা উরস্ উৎসগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

যা হোক এবারে এ জেলার অসংখ্য মুসলমান সাধারণ গোরস্থানগুলির মধ্যে ভীষণই বেশি

উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু গোরস্থানের পরিসংখ্যান বা সংক্ষিপ্ত খতিয়ান চিত্রটি, যেটি এ লেখক-প্রতিবেদকের একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নিরীক্ষায় আহরিত বা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরিস্ফুট সেটি, থানাওয়ারি এখানে প্রদর্শিত হল এইভাবে নিম্নোক্ত মতো। যথা—

কালিয়াচক থানা : মশিমপুর, ব্রহ্মাত্তর, বামনগ্রাম মৌজা ইংলিশ, বাখরপুর, গয়েশবাড়ি, ধারারা, নাজিরপুর, বালিহারপুর, ফতেখানি, বালুয়াচারা, সৈয়দপুর, কদমতলা, হাতিমারি, শেরশাহী, নারায়ণপুর, মোজমপুর, লক্ষ্মীপুর, হাড়োচক, আলিপুর, বালিয়াডাঙা, কালিয়াচক, যদুপুর, ভাগলপুর, সলেহপুর, দরিয়াপুর (উত্তর ও দক্ষিণ), জগদীশপুর, খালাতপুর, সিলামপুর, দাল্লুগ্রাম, আলিনগর, মোহবাড়ি, পটলডাঙা, ছোট মহদীপুর, কেশরপুর, চক প্রতাপপুর, আমলিতলা, গঙ্গাপ্রসাদ, বাবলা, উত্তর লক্ষ্মীপুর, কাহালা, রথবাড়ি, কুড়িয়াটাইর, বাগিচাপুর, বিষ্ণুপ্রসাদ, ধমরপুর (মাসুমচক), সাটাঙ্গাপাড়া প্রভৃতি।

বৈষ্ণবনগর থানা : কৃষ্ণপুর, বৈষ্ণবনগর, গোলাপগঞ্জ, শাহাবাজপুর, চড়ি অনন্তপুর, বারোবিঘিয়া, মহব্বতপুর, খেজুরিয়া, যোলো মাইল, কুম্ভীরা, ভগবানপুর প্রভৃতি।

ইংরেজবাজার : চৈতন্যঘাট শাহাবানখানা, মহদীপুর, গুলমহুরী, মহেশ মাটি, কাঞ্চনটাইর, নরেন্দ্রপুর, বাছুরবাছা, গাবগাছি, যদুপুর, কেচুয়াহি, সোনাতলা (কেচুয়াহি), নেয়ামতপুর, অমৃতি, সাট্টারি, মিল্কী, বিচিত্রা মার্কেট, বাঘমারা, বেনিয়াগ্রাম, চণ্ডীপুর, শাদুল্লাপুর-পীরানাপির, গয়েশপুর, কোতুয়ালি, জোত, আড়াপুর, নিমাসরাই, বড়তলী, সহকতপুর, নরহট্টা, রাজনগর, শৈলপুর, বুধিয়া প্রভৃতি।

গাজোল থানা : সালাইডাঙা, পাণ্ডুয়া, কুতুবশহর, বাবুপুর, গোবিন্দপাড়া, বাচাহার, ইচাহার, বেলডাঙ্গি, খলম্বা, একলাখি, দেওতলা, বাদনাগরা, রহিমপুর, সৈয়দপুর, পাঠান পাড়া প্রভৃতি।

মালদা থানা : ওল্ড মালদা, নেমুয়া, কাদিরপুর, রায়গ্রাম, চৌধুরীপাড়া, সুজাপুর, সাহাপুর, মঙ্গলবাড়ি, মিজপুর, বালা সাহাপুর, ছাতিয়ান, বলতুলি, ধানকুড়ি শাহাবানখানা, যাত্রাডাঙা, রশিলাদহ, শনিবর্ষা, কাজিদাড়া, গুড়িপাড়া, ফুলবাড়ি প্রভৃতি।

বামনগোলা থানা : নালাগোলা, মদনাবর্তী-মেঘডম্বুর, পাউল প্রভৃতি।

মানিকচক থানা : এনায়েতপুর, নূরপুর, মধুপুর, নাজিরপুর, সেখরা (এখানে পৃথক সমাধিস্থানও বিদ্যমান), মানিকচক, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, সাহেবনগর, রাজনগর (কালিন্দ্রী), পাঠানপাড়া, মীরাগ্রাম, ধনরাজগ্রাম, চৌকিমীরদাদপুর, পুরানীপুর, মথুরাপুর প্রভৃতি।

হবিবপুর থানা : আইহো, বুলবুলচণ্ডী প্রভৃতি।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানা : বৈরাট, বিরুয়া এস্টেট, দৌলতপুর, টালবাগুরুয়া, চণ্ডীপুর প্রভৃতি।

রতুয়া থানা : বাহারাল, সাহেবনগর, পলাশবনা, চান্দুয়া, জিয়াগাছি, শ্রীপুর, রতুয়া, কারবোনা, মহেশপুর, ভাদো, বিজলী, তারানগর প্রভৃতি।

চাঁচোল থানা : ভেবা, খেলেনপুর, বারোগাছিয়া, কালিগ্রাম, পাঠানপাড়া, দরিয়াপুর, মহকুমা,

থাহাঘাটি, জালালপুর বাঙালপাড়া, গঙ্গাদেবী, পরানিনগর, দামাইপুর, গোবিন্দপাড়া, আলাদিপুর, শিহিপুর, চন্দ্রপাড়া, বলরামপুর, ট্যাকটুলি(পুরাতন খানপুর), খানপুর, মাদ্রাসারাভিটা, খানদিঘি, বাহারাবাদ (বাঙ্গালপাড়া), গালিমপুর, বৃহস্থলি, উমরপুর প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ জেলার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য মুসলমান গোরস্থানটি হল উক্ত ভেবা গোরস্থানটি। আর এ জেলার অধিকাংশই গোরস্থানগুলি ৫০-১০০ বছরেরও বেশি পুরনো। যদিও সংশ্লিষ্ট শিলালিপি মূলে তাব্রিজাবাদ (দেওতলা) গোরস্থানটি সর্বাপেক্ষা পুরনো ঐতিহাসিক গোরস্থান।

তথ্যসূত্র ও প্রমাণপঞ্জী :

১) Malda Bar Association এর cretenay celebration, 2002 সালের স্মরণিকায় প্রকাশিত বর্তমান লেখক আবুদস সামাদ-এর 'শতবর্ষের আলোকে মালদা বার এ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্র.। ২) প্রাগুক্ত প্রবন্ধটি অথবা ঐ বর্তমান লেখক প্রণীত 'মালদা জেলার আইন আদালতের ইতিহাস' গ্রন্থখানি, পৃ. ৭, ৮ দ্র.। ৩) প্রাগুক্ত, দ্র.। ৪) প্রাগুক্ত দ্র.। ৫) 'ভারতী বাঙলা অভিধান', পৃ. ৮৩৮ দ্র.। ৬) ঐ বর্তমান লেখকের 'গঙ্গাসাগর : নামকরণ, ইতিহাস, নানা বিষয়-প্রাসঙ্গিকতা ও তার প্রকৃত অবস্থান কথা', ২য় সংস্করণ দ্র.। ৬ ক) ঐ লেখকের 'জেলা মালদহের পির-ফকিরদের কথা', ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৩৮ অথবা তাঁরই 'মালদা স্থাননাম', দ্র.। ৬খ) অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫ অথবা Francis Buchnan Haminltons' Report, অথবা District Handbooks, 1951 : Malda, by A. Mitra, O. xciv দ্র.। ৬গ) প্রাগুক্ত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা', ঐ খণ্ড, পৃ. ঐ ৫ দ্র.। ৭) M.O. Carter's Final Report on the Survey and Settlement opsations in the District of Malda', 1928-1935, Page 15 দ্র.। ৮) ঐ বর্তমান লেখক আবুদস সাদাম প্রণীত 'মালদা জেলার পুরাকীর্তি পরিচিতি', গ্রন্থখানি অথবা স্থানীয় 'গৌড়কথা ও গৌড় মালদা সংবাদ' পত্রিকার সংশ্লিষ্ট শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁরই 'সতীদাহ : মালদা' প্রভৃতি নাম-শীর্ষক প্রবন্ধগুলি দ্র.। ৯) প্রাগুক্ত প্রবন্ধগুলি অথবা প্রাগুক্ত 'মালদা জেলার পুরাকীর্তি পরিচিতি', পৃ. পঞ্চাশ দ্র.। ১০) প্রাগুক্ত অথবা, ঐ বর্তমান লেখকের 'জেলা মালদহের ইতিহাস ও মালদহ সমগ্র', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ দ্র.। ১১) প্রাগুক্ত দ্র.। ১২) প্রাগুক্ত অথবা ঐ বর্তমান লেখকের 'জেলা মালদার অনাবিষ্কৃত নানা জনপদভূমির প্রকৃত অবস্থান কথা' ও ' গৌড়-পাণ্ডুয়ার বিতর্কিত স্তূপ বিহার ও নগর-রাজধানীর প্রকৃত অবস্থান : 'সমাধান', ৩য় সংস্করণ দ্র.। ১৩) চলন্তিকা অভিধান অথবা কালিপদ লাহিড়ী প্রণীত 'গৌড় দর্পণ' দ্র.। ১৪) ঐ বর্তমান লেখকের 'শেরশাবাদিয়াদের কথালেখ্য', ২য় রাজসংস্করণ ও ৩য় সম্রাট সংস্করণ দ্র.। ১৫) প্রাগুক্ত অথবা ঐ বর্তমানে লেখকের 'আম : ইতিহাস, নানা তথ্য পরিচয় : মালদহ' ২য় সংস্করণ, পৃ. ১২, ৫৪ দ্র.। ১৬) প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ঐ, অথবা ঐ বর্তমান লেখকের 'আমার

আবিষ্কার মালদার নদিয়া শহর', ৩য় সংস্করণ, দ্র.। ১৭) প্রাগুক্ত, ঐ সংস্করণ, পৃ. ঐ দ্র.। ১৮) প্রাগুক্ত, ঐ সংস্করণ ও ঐ পৃ. অথবা প্রাগুক্ত 'গৌড়দর্পণ' গ্রন্থখানি অথবা রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত 'গৌড়ের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, অথবা আবিদ আলি খানের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ 'গৌড়-পাণ্ডুয়ার স্মৃতি', (চৌধুরী শামশুর রহমান অনুদিত) গ্রন্থখানি দ্র.। ১৯) প্রাগুক্ত 'আমার আবিষ্কার মালদায় নদিয়া শহর', ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩২ প্রভৃতি দ্র.। ২০) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫ অথবা ঐ বর্তমান লেখক প্রণীত ২১, ২২) প্রাগুক্ত 'মালদা জেলার পুরাকীর্তি পরিচিতি' গ্রন্থ দ্র.। ২৩) প্রাগুক্ত 'জেলা মালদহের ইতিহাস ও মালদহ সমগ্র' অথবা 'মালদা গ্রন্থদ্বয় দ্র.। ২৪) প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্বয় দ্র.।



মালদা জেলার চাঁচল থানার অন্তর্গত ভেবা গোরস্থান। আবদুস সামাদ সংগৃহীত।
ফটোগ্রাফার : পরিমল সুর। আবদুল মালেক ও ফরহাদ হোসেনের সৌজন্যে সংগৃহীত।

❑ লেখক পরিচিতি : মালদা কোর্টের উকিল ও মালদার (সদর) নোটারি পাব্লিক (প. ব. সরকার), কবি-গবেষক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা।)

প্রসঙ্গ : শ্মশানযাত্রা, শব সৎকার

ললিতমোহন মাহাতো

ভারতে বিভিন্ন জাতির মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া ও শবদাহ প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠান বিভিন্ন প্রকার নিয়মে পালিত হয়। আমি সাধারণভাবে সব জাতির কথা সংক্ষেপে না বলে মাত্র তিনটি জাতির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। আর সব জাতির আলোচনা আমার নিকট দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই ঝাড়গ্রাম মহকুমা তথা দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার *সাঁওতাল-লোধা* উপজাতি এবং *কুড়মি,* যারা বর্তমানে অনগ্রসর তালিকাভুক্ত তাদের সম্পর্কে আলোচনাটি সীমাবদ্ধ রাখছি। তবুও সামান্য পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বে একই জাতির আচার-অনুষ্ঠানে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম মহকুমা তথা দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলা, ইংরেজ আমলের জঙ্গল মহল কয়েকটি পরগণাতে বিভক্ত ছিল যেমন—ধলভূম, মল্লভূম, বাঁশবন, বাহদুরপুর, ভঞ্জভূম, কল্যাণপুর ইত্যাদি। এই পরগনার মধ্যে দূরত্ব হয়তো পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে কিন্তু তবুও মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে অনেকটা তফাৎ হয়ে যায়। অবশ্য এটা বলা যায় যে 'যস্মিন দেশে যদাচার'। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কিছু পার্থক্য সর্বত্রই বিদ্যমান।

এই প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামে কুড়মালী ভাষায় একটি ছড়া প্রচলিত আছে। এটা বোঝাবার জন্য ছোট্ট একটা গল্প শোনাতেই হচ্ছে। মল্লভূমের একটা মেয়ের বিয়ে হয়েছে বাহাদুরপুরের এক অজ পাড়াগাঁয়ে। দূরত্বের তফাৎ হয়তো পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার। তাতেই এক জাতির মানুষের দু'জায়গায় খাদ্যাভাস দু'রকমের। এক পার্বণ উপলক্ষে মেয়েটির দাদা এসেছে ওকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু মেয়েটির দাদা জানে না যে ওদের বাড়িতে কুটুম আসায় ব্যাঙের ভাজা ও ব্যাঙের ঝোল রান্না হয়েছে। মেয়েটি শ্বশুর বাড়ির লোকের সামনে দাদাকে সোজাসুজি বারণ করতেও পারছে না। ওর বাপের বাড়ির দেশে কেউ ব্যাঙ খায় না। তাই খাবার পরিবেশনের সময় দাদাকে সাংকেতিক ভাষায় সাবধান করতে গিয়ে ছড়াটি উচ্চারণ করছে।

দেশ গুনে ভেশ্ দাদা
হামার কিবা দোষ,
'টুইর টুইর‍্যার' ভাজা দাদা
'কাঁককুকের' ঝোস্।

'টুইর টুইর‍্যা' ব্যাঙ—যে ব্যাঙগুলিকে 'টুরি ব্যাঙ' বলে। অর্থাৎ খুব ছোট জাতের ব্যাঙ। 'কাঁক্কুঁক' অর্থাৎ যে ব্যাঙ বর্ষাকালে কাঁক্কুক করে চেঁচিয়ে ডাকে। বড় জাতের রাজ ব্যাঙ। মেয়েটির দাদা সব বুঝতে পারে তাই শরীর খারাপের অজুহাতে ভাত ছেড়ে উঠে যায়।

যাই হোক 'ধান ভানতে শিবের গীত' হয়ে যাচ্ছে না তো? কিন্তু প্রসঙ্গ পেয়ে এই ছড়াটি শোনাবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না কারণ ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অতি প্রাচীন ব্যক্তি ছাড়া এটা কেউ জানে না। কোনো বইয়ে এটার উল্লেখ নেই। লোকমুখে প্রচলিত ছড়াটি এই প্রথম মুদ্রিত হোল।

এখন আমরা সাঁওতালদের শবদেহ সৎকার এবং তাকে ঘিরে যে আচার অনুষ্ঠান সেগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করছি।

১. গর্ভবতী মেয়ে ও শিশুর মৃতদেহ দাহ করা হয় না।

২. দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে মৃতদেহকে চিতায় তোলা হয়।

৩. চিতায় একটা মুরগি বেঁধে রেখে শবদেহকে দাহ করার রীতি আছে।

৪. কয়েক মাসের শিশুর মৃত্যু হলে মহুয়া গাছের তলায় অথবা জঙ্গলের যে রাস্তা দিয়ে গাই-গরুর ডহর (রাস্তা) আছে তার মাঝে পুঁতে দেওয়া হয়।

৫. মৃতদেহ পুড়ে শেষ হবার পূর্বেই চিতা না নিভিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

৬. তারপর পুকুরে স্নান সেরে বাড়ি আসে। মাছ ও মুরগি মাংস তেল মশলা না মাখিয়া রান্নার পর তিনটি খালিপাতায় সেই খাবার দোপথায় (দুটি রাস্তার মিলনস্থল) গিয়ে মৃত আত্মার প্রতি নিবেদন করা হয়। পরে ঘরে ফিরে করম গাছের পাতায় পরিবারের যে কোন দু'চার জনকে পূর্ব দিকে মুখ করে খেতে হয়।

৭. মৃতের সংরক্ষিত অস্থি পরে যে কোনদিন, অবশ্যই শুভদিনে, আড়ম্বর সহকারে দামোদর নদীতে বিসর্জন দিতে যাওয়া হয়। গ্রামের প্রতিটি বাড়ির একজন লোককে সঙ্গে যেতে হয়।

উপরিউক্ত প্রথাগুলি থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, সাঁওতাল জাতির ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মে পার্থক্য অনেক। মৃতদেহকে চিতায় স্থাপন করা সময় মাথা উত্তর দিকে দেওয়ার নিয়ম আছে হিন্দুধর্মে। যে হেতু মৃতব্যক্তি মাথা উত্তর দিকে দেওয়া হয় সেই হেতু সাধারণের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে রাতে ঘুমানো অশুভ। মানুষ তো দূরের কথা, স্বয়ং গণেশ দেবতার মাথা যখন শনির কোপে ভস্মীভূত হয় তখন গণেশকে বাঁচানোর জন্য একটি মাথার প্রয়োজন ছিল। তাই দেবতাগণ দূতকে আদেশ করলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি রাত্রিতে উত্তর দিকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে থাকে তবে তার মাথাটি যেন কেটে নিয়ে আসা হয়। দূত কোথাও কোন মানুষকে না পেয়ে এক হাতিতে উত্তর দিকে মাথা রেখে শয়ান অবস্থায় পেয়ে তার মাথাটি কেটে নিয়ে আসে। দেবতারা বাধ্য হয়ে সেই হাতির মাথাটি গণেশের ছিন্ন স্কন্ধে স্থাপন করে। এই জন্য গণেশ, গজানন হয়ে যান। তাই উত্তর দিকে মাথা দিয়ে রাত্রিবেলা শোয়ার নিষিদ্ধ ব্যাপারটা সাঁওতালদের মধ্যে নেই। তারা মৃতদেহকে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে চিতায় স্থাপন করে। তফাৎটি লক্ষ্যণীয়।

দ্বিতীয়ত আরও একটা নিয়ম লক্ষ করা যাচ্ছে যে, সাঁওতালেরা চিতা নির্বাপিত না করেই বাড়ি ফিরে আসে। সাঁওতাল লেখক ও ভাষ্যকার মঙ্গলচন্দ্র সরেনের অভিমত এই যে—

সাঁওতালেরা রাবণ রাজার বংশধর। কারণ রাবণ রাজার চিতা চার যুগ অমর। দাউ দাউ করে জ্বলছে সেই চিতা। তাই ধর্মের দিক থেকে দশেরা উৎসবের সময় রাবণের কুশ পুত্তলিকা দাহ করার সময় দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ও আদি অস্ট্রেলয়েড গোষ্ঠীর মানুষ প্রবল আপত্তি তুলছে।

তৃতীয়ত ছোট শিশুর মৃত্যু হলে তাকে মহুয়া গাছের তলায় বা জঙ্গলের গাই-ডহরে পুঁতে দেওয়ার মধ্যে আর এক বিশ্বাস কাজ করছে। শিশুর প্রধান খাদ্য দুধ। মৃত্যুর পর তার খাদ্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কোথায় পাবে? গাই-ডহরে অনবরত দুধেলা গাই চলাচল করে তার থেকে সেই শিশু অদৃশ্য থেকে গাভীর দুগ্ধ পান করতে পারবে। আবার মহুয়া গাছের পাতা চিরলে বা বোঁটা ভাঙ্গলে সাদা গাঢ় দুধ বেরোয়। সেই দুধও মহুয়া গাছের তলায় শুয়ে থাকা শিশু পান করে।

চতুর্থত হিন্দুদের মৃতদেহ ভস্মীভূত হলে সঙ্গে সঙ্গে বা কয়েকদিনের ভেতর গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন দেবার নিয়ম আছে। কিন্তু সাঁওতালেরা বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সেই অস্থি শুভদিনে দামোদর নদীতে ঘটা করে বিসর্জন দিয়ে আছে। এইভাবে তার পারলৌকিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। দামোদর ওদের নিকট সবচেয়ে পবিত্র নদী। আবার দামোদর নদীতেই তা বিসর্জন দিতে যেতে হবে তার কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। নামেই দামোদর কিন্তু প্রয়োজনে সুবর্ণরেখা নদীকেও সাঁওতালেরা স্থানে স্থানে দামোদর জ্ঞানে পূজা করে পারলৌকিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে।

সাঁওতালদের তুলসীমঞ্চ নেই। ওরা শবদেহকে দাহ করার সময় তুলীসমঞ্চের কাছে রেখে 'হরিনাম' বা হরিবোলা ধ্বনি দেওয়া কোনো কিছুই করে না। এই প্রসঙ্গে প্রতিবেদকের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি। একজন সাঁওতাল পাশ্ববর্তী কুড়মী বাড়িতে তুলসীমঞ্চের কাছে শায়িত এক মৃতব্যক্তির আচার অনুষ্ঠান দেখ্‌ছিল। 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি শুনে সে ভাবল বুঝি 'হরিনাম' উচ্চারণের জন্য তার মৃত্যু হল। তখন সে আর একজন সাঁওতালকে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে সাঁওতালী ভাষায় বলে "এই আ হরিদ আলম্‌ লেই-আ-নাইত ঠক্‌ মেন্‌তেক গুজু-আ কানা।" বাংলা—"এই হরিনাম মুখে উচ্চারণ করবি না নাহলে হঠাৎ মরে যাবি।"

এখানেই সাঁওতালদের আলোচনা শেষ করলাম।

২. লোধা :

লোধা উপজাতির নাচ, গান, বিবাহ, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সব সংস্কৃতিই নিবু নিবু লণ্ঠনের আলোর মতই অনুজ্জ্বল। কারণ লোধাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এই খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে লোধা জাতিটি কোন আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারে না। এদের সম্বন্ধে সামান্য তথ্য পরিবেশন করলেই অবস্থাটা অনুধাবন করা সহজ হবে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পরিসংখ্যানটি লক্ষ্যণীয়। ১০ হাজর ৩৭৭টি লোধা পরিবার আছে। এর মধ্যে ৮ হাজার ৮২টি পরিবার ভূমিহীন। এই জেলার লোধা জনসংখ্যা মাত্র ৪৬,৬৬৯জন। এই জনজাতির ৭৮ শতাংশ পরিবারই ভূমিহীন। লোধা-শবর জনসংখ্যা সাঁওতাল-কুড়মি জাতির

তুলনায় অনেক কম। আমার উল্লেখিত এলাকায় সাঁওতালরা কমপক্ষে দু'লক্ষ হবে। কুড়মিরা প্রায় সমসংখ্যক হবে। এই দুই জাতির তুলনায় অরণ্যজীবী, খেতমজুর লোধারা তাদের আচরণীয় সংস্কৃতি প্রায় ভুলতে বসেছে। সুতরাং মৃতদেহের শ্মশানে নিয়ে কেউ বা দাহ করতে পারে কেউ বা কাঠই জোগাড় করে দাহ করতেও পারে না। তবে এদের মধ্যে দাহ করার রীতি আছে। এমনকী মুখাগ্নি করার রীতিও আছে। আর কিছু আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল আচার-অনুষ্ঠান আছে অন্যান্য জাতি দুটির মধ্যে যা নেই। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির কথা এখানে উল্লেখ করছি।

১) এদের দশদিনে ঘাট এবং তৎপরদিন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয়।

২) ক্ষৌরকর্মের জন্য এরা নাপিত ব্যবহার করে কিন্তু সাঁওতালদের নাপিত পাওয়া যায় না। গ্রামে যে নাপিত আছে তারা সাঁওতালদের কাজ করে না কিন্তু লোধাদের করে।

৩) শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন হয় না। এমনকী এই উপজাতিটি ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা-ভক্তি জানানো বা প্রণাম করা—কোনটাই করে না। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে বৈষ্ণবেরাই সর্বেসর্বা। লোধাদের নিজস্ব কিছু প্রথার কথা এখানে তুলে ধরছি। কোন পিতা মারা যাবার সময় তার পুত্রকে কাছে ডেকে তাকে তাদের পূর্বপুরুষের (তিনপুরুষের) নাম বলে দেয়। আবার বলে যে সে মারা গেলে যেন তাকে নিয়ে মোট চার পুরুষের নামে শ্রাদ্ধ করে। পিতার শ্রাদ্ধের দিন সন্ধ্যার সময় পুত্র একটি নূতন কাপড় গায়ে জড়িয়ে গ্রামের দোপথায় (দুটি রাস্তার মিলনস্থল) গিয়ে চারপুরুষের নাম ধরে ডাকে। দোপথায় যাবার সময় সঙ্গে এক ঘটি জল নিয়ে যায়। সেই জল চারপাশে ছিটিয়ে দেয়। জল ছিটিয়ে আত্মাদের সন্তুষ্ট করে বাড়ি গিয়ে ঈশান কোণে সেই অবশিষ্ট জল রাখে। শ্রাদ্ধের দিন একটি মুরগি মেরে নতুন কড়াইতে তরকারি ও নতুন হাঁড়িতে ভাত রান্না করা হয়। রান্না হয়ে গেলে আলাদা আলাদা মোট আটটি পাতার থালা তৈরি করে চারটিতে ভাত এবং চারটিতে তরকারি দিয়ে ঘরের ঈশান কোণায় রেখে দেওয়া হয়। ছেলে ভক্তি সহকারে পূজা করে ও ভক্তি ভরে পূর্বপুরুষের নাম ধরে ডাকে। তারপর দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসে। অবশিষ্ট ভাত ও তরকারি বাড়ির সবাই ভাগ করে খায়।

এই পূজার আর একটি পদ্ধতি আছে। নতুন হাঁড়িতে ভাত-তরকারি রান্না হয়। রান্নার পর থালা নিয়ে ঈশান কোণে রাখা হয়। ভাতের সামনে মাটিতে আঙ্গুলের সাহায্যে সিঁদুর দিয়ে তিনটি আঁক টানে। সিঁদুরের দাগের উপর তুলসীপাতা দিয়ে তার উপর ভাত দেওয়া হয়। পাতার উপরের ভাত মুরগিকে খাওয়ানো হয়। মুরগিতে খেলেই সেই মুরগিটাকে বলি দেওয়া হয়। যদি কোন কারণবশতঃ মুরগি সেই ভাত না খায় তবে তাকে বলি দেওয়াও হবে না। বলির পর মুরগির ধড়টি রান্না করে বাড়ির সবাই খায়।

লোধাদের উপরোক্ত আচার-অনুষ্ঠানগুলি আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। অন্য কোন জাতির এই রীতি নেই। ব্রাহ্মণ যেমন এখানে প্রয়োজন নেই তেমনি গঙ্গাজলেরও প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণ বা গঙ্গাজলকে এরা পবিত্র বলে মনে করে না।

এখানে লোধাদেরই একটা প্রবাদ বাক্য দিয়ে আমিও গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সাঙ্গ করি। লোধারা

বলে—"এঠেও পানি সেঠেও পানি, কোন্‌ঠে যে গঙ্গাটা রহিছে।"—অর্থাৎ এখানেও জল সেখানেও জল। সব জলের মূল্য বা পবিত্রতা সমান। আবার গঙ্গার জলের প্রয়োজনীয়তা আছে কী?

৩. কুড়মী :

আমি ভূমিকায় কুড়মীদের শিক্ষায় অনগ্রসর জাতিরূপে বর্ণনা করেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুড়মীরা সাঁওতাল ও লোধা মতই উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত। তবে শিক্ষায়, স্বভাবে, চেহারায়, আচরণে ও ভূসম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় অনেকেই নিজেদেরকে উচ্চবর্ণের বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা চালাতে থাকে। এই একাংশের দাবি মেনে তৎকালীন ইংরেজ সরকার ১৯৩১ সালের লোক গণনায় কুড়মীদের 'কুর্ম্মী-ক্ষত্রিয়' নামের স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু তাতে অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। একজন বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ড. এলুইন তখন বলেছিলেন—"এইসব আন্দোলনের দ্বারা কুড়মীরা ইচ্ছা করেই তাদের সংস্কৃতি নষ্ট করছে। এর ফলে বর্ণহিন্দুরা তাদের শ্রদ্ধা করবে এই তাদের আশা।" কিন্তু আজ পর্যন্ত লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে তাদের আদিবাসী সুলভ উৎসব অনুষ্ঠান। বাঁদনা, টুসু, করম, জাওয়া, গরাম পূজা, শালই পূজা সবই উপজাতিদের মত।

যাই হোক এই নৃতত্ত্বের কথায় না গিয়ে আমরা এখন কুড়মীদের শ্মশানযাত্রা, মৃতদেহের সৎকার, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনায় প্রবেশ করবো। এই জাতির মানুষেরা ধানবাদ, রাঁচীর পাঁচ পরগনা, সেরাইকেলা, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সংবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। আমার আলোচনায় এই বিস্তৃত এলাকা গ্রহণ করিনি কারণ বিভিন্ন জায়গায় বিরাট পার্থক্য হয়তো দেখা যাবে। তাই মেদিনীপুরের অংশ বিশেষত ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের মধ্যে এই বিশেষত্বগুলো দেখা যায়।

১. মৃতদেহকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে উঠানে তুলসীমঞ্চের কাছে পূর্বদিকে মাথা রেখে শোয়ান হয়।

২. তারপর নাপিত মৃত ব্যক্তির দাড়ি কেটে পরিষ্কার করে তাকে শুদ্ধ করে। যে বাটিতে জল নিয়ে নাপিত দাড়ি কাটে সেই বাটিটা নাপিতকে দান করা হয়। মহিলা হলে নাপিত তার নখ কেটে দেয়। মোট কথা নাপিতের স্পর্শ চাই-ই-চাই।

৩. পরে পুত্রবধূরা কান্নাকাটি করতে করতে শ্বশুরের গায়ে হলুদ তেল মাখাবে। শাশুড়ি হলে যদি সধবা হয় তাহলে তাকে আলতা সিঁদুর পরাবে। মাথায় তেল দিয়ে সযত্নে চুল আঁচড়ে দেবে। তারপর শাশুড়ির তলপায়ে আলতা মাখিয়ে তার দুই পায়ের ছাপ কাগজে তুলে বাড়িতে স্মৃতিস্বরূপ রক্ষা করবে। শ্বশুরেরও পায়ের ছাপ্ রাখা হয়। তারপর তাদের গায়ে টাকা ও ধান ঠেকিয়ে সেই টাকা আলমারিতে তুলে রাখবে।

৪. মৃতের স্ত্রী স্বামীর খাটের বাজুতে ঠুকে শাঁখা ভেঙে ফেলে।

৫. তারপর মৃতের ছেলেরা এবং তার ভাইপোরা খাটের চারপায়া চারজন ধরে কাঁধে

তুলবে। তুলসীমঞ্চের চারপাশে তিনবার প্রদক্ষিণ করবে 'হরিবোল' ধ্বনির মাধ্যমে। এই 'হরিবোল' ধ্বনি কিন্তু সাঁওতালদের মধ্যে নেই। এইভাবে শবের শ্মশানযাত্রা আরম্ভ হয়।

৬. খোল কীর্তন সহকারে বৈষ্ণবরা হরিনাম গাইতে গাইতে মৃতদেহের সঙ্গে চলতে থাকবে। গোটা রাস্তা জুড়ে খই ছড়াতে ছড়াতে যাওয়া হয় এবং সঙ্গে খুচরো পয়সাও ছড়ানো হয়। মৃতদেহের পেছনে একজন কোদাল, একজন জ্বলন্ত বুঁদি (খড় দিয়ে মোটা কাছির মত পাকানো হাতখানেক লম্বা বিনুনি) সঙ্গে নিয়ে চলবে।

৭. শনিবার ও রবিবারে মৃত্যু হলে জ্বলন্ত চিতায় একটি মুরগি পুড়তে দেওয়ার রীতি আছে। মৃতের ব্যবহার্য্য অনেক জিনিস চিতায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

৮. শ্মশানে আগের থেকে চিতা সাজিয়ে রাখা হয়। উত্তর দিকে মুখ রেখে মৃতদেহকে শোয়ানো হয়। নতুন থানকাপড় চিরে কৌপিনমাত্র বস্তি প্রদেশে ঢেকে দেওয়া হয়। তার পূর্বে পরিহিত সব কিছু অঙ্গ থেকে খুলে নেওয়া হয়। এমনকি কোমর দড়িও ছিঁড়ে ফেলে।

৯. তারপর বড় ছেলে নতুন থান কাপড় পরে মুখাগ্নি করে। কনিষ্ঠ ছেলেও করতে পারে তবে মেজো বা সেজো ছেলের এই কাজের অধিকার নেই। কার্পাস তুলো গাওয়া ঘিতে ভিজিয়ে কাঠির মাথায় জড়ানো হয়। তারপর একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছেলের চোখ বন্ধ করে ধরে ধরে চিতায় চারপাশ তিনবার প্রদক্ষিণ করায়। তারপর সেই মৃতের মুখে অগ্নিসংযোগ করে। পরে সেই আগুন দিয়ে চিতা প্রজ্জ্বলিত করে। মৃতদেহের কোন অংশ যাতে পুড়তে বাকি না থাকে তার জন্য বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

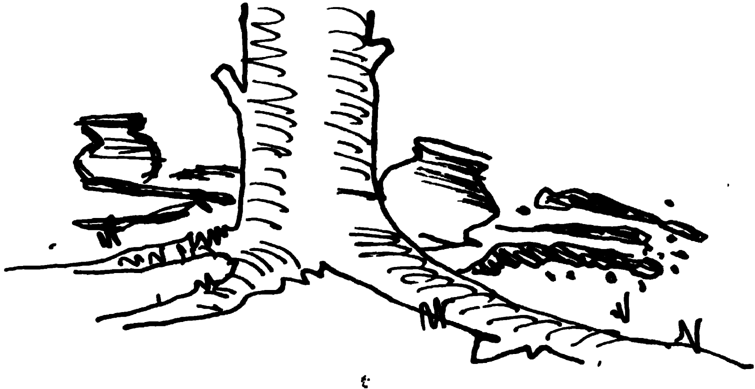
১০. তারপর সমস্ত লোকেরা এমনকী বাড়ি থেকে মেয়েরাও এসে চিতায় বেলগাছের ডাল বা চন্দনগাছের ডাল দেয়। এইভাবে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

১১. তারপর দাহকার্য্য শেষ হলে আগুন নেভানোর জন্য কলসি কলসি জল ঢালতে হয়। সম্পূর্ণ নিভে গেলে নিভন্ত কয়লার টুকরো দিয়ে একটি মানুষের মূর্তি তৈরি করা হয়। মাথার কাছে তুলসী গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়। একটি হাঁড়ি, ছোট ছিদ্র করে ওখানে রেখে দেওয়া হয়। অঙ্গারের ভেতর থেকে মৃতের অস্থি সংগ্রহ করে নতুন কাপড়ে বেঁধে রাখা হয়। পরের দিন তা গঙ্গা বা যে কোন নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

১২. জ্বলন্ত অঙ্গার যখন থাকে তখন কোদাল গরম করে তাকে খই ভাজে। তারপর নিভন্ত চিতার চারপাশে চারটি খুঁটি গেড়ে সেই খই গোড়াতে দেয় এবং নতুন থান কাপড়ের একটি আচ্ছাদন টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। কাজ শেষ। এবার বড়ছেলেকে সামনে নিয়ে সবাই পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান সেরে বাড়ি আসে।

১৩. তিনদিন পর সরে সন্ধ্যায় ভাত রান্নার সময় নিমপাতা দিয়ে ভাতকে তেতো করা হয়। সেই ভাত রাতে দোপথায় রেখে দিয়ে আসে অর্থাৎ মৃতের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। এমন বিশ্বাস আছে যে এরপর সে জন্ম পাবে তার রূপ ধরে সে ভাত খেয়ে যায়। তাই সকালে পায়ের ছাপ দেখে সেটা পাখির হোক কিংবা প্রাণীর হোক তা বোঝা যাবে।

তারপর ঘাট বা শ্রাদ্ধের ব্যাপারটা চলে আসে। যথারীতি অশৌচ পালন করা হয়। মাছ-মাংস-পেঁয়াজ রন্ধন নিষিদ্ধ। যদি মা হয় তবে মুখাগ্নি করেছে যে ছেলে সে দুধ খেতেও পারবে না। সে শ্রাদ্ধ করবে। ঘাট-শ্রাদ্ধ হবে দশ দিনে। এখানেই বিতর্ক চলে আসে। মল্লভূমে দশদিনে ঘাট হলেও ভঞ্জভূম বা বাহাদুরপুর বারো দিনে ঘাট হয়। তফাৎ আছে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিয়েও। দশদিন বা বারো দিনে ঘাট-শ্রাদ্ধ হলেও যাদের অবস্থা যেমন তারা সংক্ষিপ্ত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে। কেউ বা প্রচুর দান করে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে। এই ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বা বৈষ্ণব (ছড়িদার) শ্রাদ্ধের সব কার্য্য পরিচালনা করে। ঘাটশ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের সময় আর একটি বড় কাজ হয় সেটা হচ্ছে মৃতের স্ত্রী সেই দিন ঘাটে স্নান করে স্বামীকর্তৃক বিবাহে প্রদত্ত হাতের নোওয়া ভেঙ্গে দিয়ে থান কাপড় পরিধান করে সব এয়োতির চিহ্ন লোপ করে দেয়। তার হাতের নোওয়া ভেঙ্গে দেয় নাপিত। নাপিত ঘাটে ক্ষৌরকর্ম সমাধা করে। কুড়মীদের ভেতর মৃতের নিজের ছেলেদের ভাইএর ছেলেদের, সব জামাইদের নেড়া হতে হয়। অবশ্য নেড়া হবার নিয়মটি এখন নিজের ছেলেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। যদি কেউ শ্রদ্ধাবশত নেড়া হয় সেটা আলাদা কথা। দশদিনে ঘাট শ্রাদ্ধের পর যারা ঘাটে ওঠে তারা সবাই নতুন কাপড় পরে লাইন বেঁধে বাড়ি ফিরে আসে। রাতে সারারাত বৈষ্ণবের দল খোল কীর্তন ও হরিনাম পালাগান করে মঙ্গল রাত উদ্‌যাপন করে। সকালে একাদশ-দ্বাদশ শ্রাদ্ধকর্মাদি সবই হিন্দুদের মত অনুসারে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবরা নিষ্পন্ন করে।



❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক।

শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লক
শ্মশান, কবর ও আন্দোলন

ইন্দুভূষণ অধিকারী

জীবন একটাই। শ্মশান-কবরে তার শেষ নয়। তার শেষ আশ্রয় স্মৃতিতে। পরবর্তী প্রজন্মের স্মৃতিতেই তার শেষশয্যা। সে-শয্যা যত স্থায়ী ততই সফল মনুষ্য জীবন। এক অর্থে এটাই তার পরলোক। পুনর্জন্মের ধারণা অবৈজ্ঞানিক। এই জন্মের পর যদি মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, থাকতে হবে নিরবয়ব। মানুষের মনের মণিকোঠায়। তার জন্য থাকতে হবে জীবনভর সাধনা; বেঁচে থাকার দিনগুলিকে করে তুলতে হবে সর্বার্থে সার্থক।

প্রাণবায়ু বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-নাট্যের শেষ। শ্মশান-কবর মরদেহের শেষ আশ্রয় বলা যেতে পারে। তারপর পড়ে থাকে 'কর্মফল'। যার কর্মফল যত জোরালো, তার আসন তত স্থায়ী উত্তরপুরুষের কাছে। এক সময় হয়তো তাও হারিয়ে যায়।

শ্মশান বা কবরস্থান পবিত্র বলে মনে করেন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ— সকলেই। কিন্তু তবুও তা নিয়ে যে কুৎসিৎ দৃশ্যের অবতারণা হয় না তা নয়। আবার তা যখন ধর্মীয় সংঘাতের রূপ নেয় তখন তার চেয়ে দুঃখের ব্যাপার কিছু থাকে না। আমরা দেখেছি এবং শুনেছি সুন্দর সহাবস্থান— যেখানে হিন্দুর শ্মশান আর মুসলমানদের কবরস্থান পাশাপাশি। নিরুপদ্রবে চলছে বহুকাল। আবার কোথাও বা দেখেছি টানা-পোড়েন, পরস্পর বিরোধী দাবি-পাল্টা দাবি। এর থেকে তৈরি হয়েছে টেনশনের, জন্ম হয়েছে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা। বসেছে পুলিশ পিকেট, শুরু হয়েছে তাদের টহল। এসবই অবাঞ্ছনীয়। এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে দু-পক্ষেরই কম-বেশি জেদাজেদির জন্য। এটা এড়িয়ে যাওয়া সবার পক্ষে মঙ্গলজনক।

এই প্রসঙ্গে ৮ ডিমারীর পাশের গ্রাম খোসখানা মৌজার উল্লেখ করা যেতে পারে। এটির জে.এল.নং ৮৭। এই মৌজার ১ ও ২ দাগে অবস্থিত শ্মশান-কবরস্থান নিয়ে দুই তরফের মধ্যে মত-পার্থক্য থেকে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। সেটা ১৯৬৯ সালের ঘটনা। ওই গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের পাশেই কবর দেওয়ার জন্য একটি মৃতদেহ আনাকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক নেতারা মঞ্চে হাজির হন বিভিন্ন ভূমিকায়। কেউ প্রসঙ্গটির প্রশমন চান, মিটমাট চান; কেউ বা চান উস্কে দিতে। দেখা যায় অজয় মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন চক্রবর্তী, রব্বানি সাহেবকে বিভিন্ন ভূমিকায় নামতে। সুকুমার দাসের নামও শোনা যায় এই প্রসঙ্গে। মামলা-মোকর্দমা পর্যন্ত গড়িয়েছিল ব্যাপারটা। জায়গাটি শহীদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতির (ও ব্লকের) অধীন। অল্প কিছুদূরের মধ্যেই আলিনান গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। তমলুক-২ ব্লকটি তাঁর নামাঙ্কিত বর্তমানে। 'শহীদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতি' ব্লকটিও তাঁরই নামে।

তমলুকের মহাশ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে খুব ভিড় করেন না স্থানীয় মানুষজন। একদিন হয়ত তিন/চারটি মরদেহ এসে গেল, আবার হয়ত তিন/চারদিন একেবারে নেই। এরকম।

শ্মশানে মরদেহ পৌঁছানোর পর শবযাত্রীরা কী কী আচার অনুষ্ঠান পালন করে তার একটি ক্ষেত্র-সমীক্ষা তুলে ধরা হল :

তারাপদ চক্রবর্তী গত ৮ই নভেম্বর (২০০৩) শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ মারা যান। ঝাড়গ্রামে। তাঁর মৃতদেহ সন্ধ্যে প্রায় ছ'টায় তমলুকে এসে পৌঁছায়। বলা ভালো, আনানো হয়। কারণ? তাঁর জন্ম এই শহরে। বেড়ে উঠেছেন এই শহরে। তাই তাঁর বর্তমান বাসস্থান ঝাড়গ্রাম থেকে তমলুকে আনার সিদ্ধান্ত নেন তাঁর উত্তরপুরুষেরা। বাবার ইচ্ছা কি সন্তানে বর্তাল! এনে রাখা হয় উত্তরদিকে মাথা করে। গাড়িতে আনার সময় যতটা সম্ভব তা মানা হয়েছে। শেষ শয্যা উত্তর-মাথা হয়েই।

মৃতদেহ বহন করার জন্যে বাঁশ লাগে। তা কিন্তু কাঁচা হওয়া চাই। কেন? মৃতদেহ যখন চিতায় জ্বলতে থাকে তখন তাকে খোঁচাবার জন্য বাঁশ চাই। আর তা কাঁচা হওয়া আবশ্যিক কেননা শুকনো বাঁশ হলে পুড়ে যাবে। এই বাঁশ কাটতে গেলে 'অগ্নিকর্তা'কে প্রথম অন্তত তিনটে কোপ দিতে হয়। তারপর অন্যরা ঝাড় থেকে কেটে নিতে পারে। অর্থাৎ এই পর্বের উদ্বোধকই অগ্নিকর্তা।

এইভাবে খাটিয়া বেঁধে, মৃতদেহ নিয়ে শবযাত্রীরা সেই সেই জায়গায় যায় যেখানকার সঙ্গে প্রয়াত ব্যক্তির সংযোগ ছিল বেশি। সবচেয়ে আগে যাওয়া হয় শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সামনে। সব জায়গার শবাধার নিয়ে এক-পাক ঘুরতে দেখা যায়। যেন প্রয়াত ব্যক্তি শেষবারের মতো সবকিছু দেখে নিচ্ছেন।

মৃতদেহ বহন করা সময় শবের পিছু পিছু খই ছড়ানোর বিধি আছে। আর আছে শবানুগমনকারীদের একজন বলবেন 'বল হরি', অন্যেরা একসঙ্গে বলবেন 'হরিবোল'। একটি 'হরি বোল'-এর বর্তমান রূপ বলেই মনে হয়।

মৃতদেহ শ্মশানে পৌঁছাবার পর তাকে স্পর্শ করে একজন বসে থাকে। যেমন বসেছিল শ্মশানে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। সারাক্ষণ।

একজন পুরোহিত থাকে সঙ্গে। শ্মশানে দেহ পৌঁছাবার পর তাঁকে নানা rituals-এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যেমন তাঁকে মৃতের দেহকে স্নান করাতে হয়। গায়ে ঘি মাখিয়ে, নানা সুগন্ধি দিয়ে তাঁকে জল ঢেলে স্নান করাবার পরিবর্তে এখন সামান্য একটু জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। স্নানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আর কী! ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে পুরানো পৈতে খুলে একটি নতুন পৈতে দেওয়া হয়। বাঁ-কাঁধের পরিবর্তে ডান কাঁধে। তারপর প্রয়াত ব্যক্তিকে খাওয়াবার পালা। সে খাবার তৈরি করেন পুরোহিতই। নতুন মালসায় করে তিনি পিণ্ডের জন্য খাবার তৈরি করেন। সেই শেষ খাবার মৃতের মুখে ছোঁয়ান হয়।

খোল-করতাল বাজতে থাকে যেমন বাজছিল শবযাত্রার আগে আগে। এবার শব চিতায় তোলার পালা। তার আগে 'ভূমি-ক্রয়ে'র ব্যাপারটা সেরে নিতে হয়। শেষ শয্যার জন্য জমি চাই।

সাড়ে তিন হাত লম্বা। দেহের মাপে চওড়া। সেই জমির দাম কি ধরিত্রীর প্রাপ্য! যৎসামান্য মূল্যটি পুরোহিতই গ্রহণ করেন। ক্ষেত্রভেদে শ্মশান-পরিস্কারকারী।

চিতা তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। তার ওপর মৃতদেহকে উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর অগ্নিকর্তা তাঁর ডানদিকে রেখে মৃতদেহকে প্রদক্ষিণ করেন। তিনবার। এক-একবার প্রদক্ষিণের পরে তিনি মৃতের মুখাগ্নি করেন। তারপর সাহায্যকারীরা চিতায় আগুন ধরিয়ে দেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার আছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকার স্থানীয় সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ''অথচ পাশেই তমলুকে ইতিমধ্যেই বৈদ্যুতিক চুল্লি রয়েছে। রয়েছে মৃতদেহ সংকারের সরকারি বন্দোবস্ত।'' বলা হয়েছিল ৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে। এই খবরটির সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। না। তমুলকের কোনো শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি নেই। সংকারের 'যাবতীয় সরকারি বন্দোবস্ত' তো দূরের কথা। তার অভাবে তমলুকের মানুষের যে খুব ক্ষোভ আছে তা মনে হয় না। দাহের সুবিধের জন্য একটা ছোট আচ্ছাদন আছে এই শ্মশানে। আর আছে সাজানো চিতার কাঠকে ধরে রাখার জন্য লোহার বিম। সেগুলি মাটিতে পোঁতা আছে। তার ব্যবস্থা তমলুক পৌরসভাই করেছে।

যাহোক জ্বলমান চিতার আগুন কোন কারণে কমে এলে অথবা পোড়া মাংসের গন্ধ এড়াবার জন্য মাঝে মাঝে ধুনো, গুগ্‌গুল, চন্দনকাঠের টুকরো ইত্যাদি চিতায় দেওয়া হয়। মৃতের দেহ সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেলে চিতা নিভিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কলসিতে জল এনে সেই কাজট করা হয়। অবশিষ্ট দেহাস্থি বা নাভিকুণ্ডলী সংগ্রহ করে একটি ভাঁড়ে করে নিয়ে আসেন অগ্নিকর্তা নিয়ে আসেন চিতাভস্মও। সেই ভস্ম গঙ্গায় অথবা গঙ্গা-প্রতিম কোনো জলধারায় বিসর্জন দিতে হয় নদীর জলে ডুবে। ছুঁড়ে দিয়ে নয়। কেউ কেউ গয়ায় যান। সেখানে গিয়ে পিণ্ডদান না করলে আত্মার স্বর্গবাস হয় না; প্রেতলোকেই তাকে পড়ে থাকতে হয়। এরকম একটা লোক-বিশ্বাস একসময় প্রবল ছিল; এখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু গয়াযাত্রীদের সংখ্যা নগণ্য নয়।

যাহোক, এরপর সেলাই করা, পোশাক-পরা বন্ধ হয়ে যায় অগ্নিকর্তা সহ মৃতের উত্তরপুরুষদের গায়ে নতুন উত্তরীয় এবং পরনে নতুন কাপড়। কোমড়ে কম্বলের আসন গুঁজে তারা শোকপালন করেন। পথে-ঘাটে তাঁদের দেখলেই চেনা যায়। তেল না মাখা, চুল না আঁচড়ানো, হবিষ্য খাওয় তাদের অবশ্য-আচরণীয় ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে। সেই অবস্থাতেই তাদের বেরোতে হয় ''গঙ্গা শিরোধার্য করা চিঠি নিয়ে। করজোড়ে প্রার্থনা করতে হয় পিতৃদায়/মাতৃদায় থেকে উদ্ধারের জন সহযোগিতা। তারপর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ১০/১৫/৩০ দিন পর সমাজের স্তর অনুযায়ী। আজকাল সেই স্তরভেদ মানছেন না অনেকেই। সকলেরই লক্ষ্য অশৌচ-পর্বের দিন সংখ্যা কমাবার দিকে। যাক শ্রাদ্ধের প্রশ্ন ভিন্নতর এক পর্ব। সে আলোচনা থাক।

উপযুক্ত ব্যবস্থা তমলুকের শ্মশানগুলিতে মানা হচ্ছে। মোটামুটি। এক-আধটু তফাৎ হতেই পারে। বিশেষত 'জাত'-ভেদে।

তমলুক শহরে শ্মশান আছে ১২টি, হিন্দুদের জন্য। কবর আছে ৪টি। তার মধ্যে ৩টি মুসলমানদের জন্যে, ১টি খ্রিস্টানদের জন্য। তার একটা ছক করে দেওয়া যাক :

জে.এল. নং	মৌজা	দাগ নং	দাগ নং	জমির পরিমান	জমিটি কি হিসাবে ব্যবহৃত হয়
		১৯৬২ সেটেলম্যাণ্ট	২০০২ সেটলম্যাণ্ট		
১৩৯	সৈয়দপুর	৮৮৩	৯৪২	২৭ডে	শ্মশান
২৭৬	ডহরপুর	৪১৩		২ ডে	পীরস্থান
	ডহরপুর	৪৪৪	বাটা ৫০৩	৫ ডে.	শ্মশান
	ডহরপুর	৪.৪৫	বাটা ৫৫৪	৬ ডে.	শ্মশান
	ডহর পুর	৪৪৫	৫৭৬	১৬ ডে.	শ্মশান
১৪৫	বাড়পদুমবসান	৪৩৯	৫৩৭	১৬ ডে.	শ্মশান
	বাড়পদুমবসান	৭৫০	৮০৮	৪৩ডে.	শ্মশান
	বাড়পদুমবসান	২৪৪	১৮৬	৯ ডে.	শ্মশান
২৭৯	ধারিন্দা	১৫৯		১এ.১৩ ডে.	শ্মশান
২৭৮	শালগেছিয়া	১২৮		২৫ ডে.	শ্মশান
১৪৪	পদুমবসান	১১৮৫		৭ ডে.	কবরস্থান
	পদুমবসান	১৮১৫		৩ ডে.	শ্মশান
	পদুমবসান	১২৯৬		৪ ডে.	কবর (মু.)
	পদুমবসান	১৪৩৪		৪১ ডে.	কবর (মু.)
	পদুমবসান	৭৮৪		১২ ডে.	শ্মশান
	পদুমবসান	৫১		৬ ডে.	শ্মশান
২৭৯	ধারিন্দা	জানা নেই		জানা নেই	কবর (খ্রি.)

(এই জমিটি বর্ধমান বিভাগের কমিশনার লিজ হিসাবে বরাদ্দ করেছেন।)

এর বাইরেও কিছু কিছু পারিবারিক শ্মশান বা কবরস্থান থাকতে পারে। তার হিসাব এখানে ধরা হয়নি। পৌর এলাকায় সরকারি জমি (খাস) কিভাবে এবং কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তা জানতে গিয়ে উপযুক্ত তথ্য পাওয়া গেছে। পুরসভাও ঠিকমত তথ্য দিতে পারেননি। তাঁদের মতে পৌর এলাকায় ৫টি শ্মশান, ২টি কবরস্থান আছে।

যাহোক, সরেজমিন অনুসন্ধান অন্যরকম তথ্য জোগাতে পারে। এমন হতে পারে শ্মশান বা কবরের জমি বলে যা বলা হচ্ছে কার্যত তা নেই। জমির পরিমাণ কম হতে পারে এনক্রোচমেন্ট

(encrochment)-এর জন্য, পরিত্যক্ত শ্মশান বা কবরস্থানে স্কুল কলেজের বাড়ি হয়ে যেতে পারে। বা অন্যকিছু।

দেখা যাচ্ছে ধারিন্দা মৌজার শ্মশানটি আয়তনে সবচেয়ে বড়; আর ডহরপুর গ্রামেরটি সবচেয়ে ছোট। তবে মাহাত্ম্যে বড় পদুমবসানে শঙ্করআড়া খালের পার্শ্ববর্তী শ্মশানটি। শহরের মানুষ এটিকেই গুরুত্ব দেন প্রায় সকলেই।

পৌরপ্রধানের মতে শ্মশানটির বয়স দুশো বছর। কোনো কাগজপত্র নেই পৌরসভায়। সুতরাং এটা তাঁর অনুমান, কেবলই অনুমান। অশোকবাবু অর্থাৎ অশোক অধিকারী জানালেন পৌরসভার কোনো শ্মশানেই বা কবরখানায় কোনো রেজিস্টার নেই। তার প্রয়োজনও আছে বলে তিনি মনে করেন না। অর্থাভাব তো আছেই। কোনো শ্মশান বা কবরখানার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও ওঠে নি। সুতরাং ....। নরহত্যা যে হারে বাড়ছে তাতে আজ না হোক আগামীকাল ভাবতে হতে পারে।

এই শহরের লোকসংখ্যা ৪৮০০০, সংযুক্ত (added area) নিয়ে প্রায় ৫৯০০০। মৃত্যুর সংখ্যা এত নয় যে তা নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। পারিবারিক শ্মশান বা কবরও আছে। সেখানেও কিছু কিছু শব দাহ হয়।

পদুমবসান মৌজার দক্ষিণ শেষপ্রান্তে শঙ্করআড়া খালের প্রবহমান ধারার পাশের শ্মশানটিকে শহরের লোক সম্ভ্রমের চোখে দেখেন— তা আগেই বলা হয়েছে। এখানে শহীদ মাতঙ্গিনীর শেষকৃত্য হয়। এখানেই কেন হল, কীভাবে হল সে-কথায় আসতে গেলে একটু প্রাগৈতিহাস বলা দরকার।

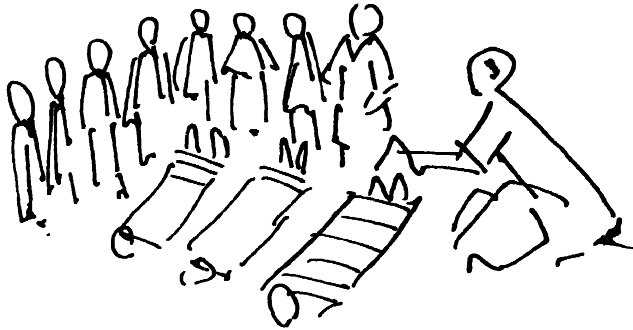
আগস্ট আন্দোলনের শেষদিকে ১৯৪২ সালের ২৯ তারিখে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনুপ্রেরণা আর নির্দেশে তমলুকে সংঘটিত হয় গণ-অভ্যুত্থান। ৭০/৮০ হাজার লোক পাঁচ রাস্তা ধরে শহরে ঢোকার চেষ্টা করে। আগের রাত্রে পাঁশকুড়া থেকে মহিষাদল পর্যন্ত রাস্তায় কয়েকটি খাদ কেটে গাড়ি চলাচলের রাস্তাকে অপ্রবেশ্য করে তুলেছিল আন্দোলনকারীরা, যাতে মেদিনীপুর শহর থেকে সশস্ত্র পুলিশ বা মিলিটারী তমলুকে ঢুকতে না পারে। টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার কেটে ধ্বংস করে তারা ভেবেছিল সেনাবাহিনীর প্রবেশের পথ যথেষ্ট দুর্গম করা গিয়েছে। কিন্তু তারা অর্থাৎ সৈন্যরা জনগণকে দিয়েই রাস্তা বুজিয়ে যথাসময়ে শহরে ঢুকে পড়ে এবং ৫টি প্রবেশ পথেই পজিশন নেয়।

উত্তর দিকের মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন মাতঙ্গিনী বড় মাপের একটি পতাকাসহ। সেনাদের সতর্কীকরণ উপেক্ষা করে এগোতে গেলে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। এবং অকুস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। শহরের অন্যান্য প্রান্তে নিহত হন আরো ১১জন।

শহীদদের শব-ব্যবচ্ছেদ করেন তমলুকের তৎকালীন প্রখ্যাত ডাক্তার কালিশঙ্কর নন্দ ১ অক্টোবর। তারপর মাতঙ্গিনী-সহ নিহতদের সবার দেহে কেরোসিন তেল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয়

পুলিশ রাত্রির অন্ধকারে, সবার অলক্ষে। এই ঘটনা ঘটে শঙ্করআড়া খালের ধারের পদুমবসান গ্রামের এই শ্মশানটিতে। তাই এটি তমলুকের অলিখিত 'মহাশ্মশান'। ১৯৭৩ সালের ২৩ জানুয়ারি মাতঙ্গিনীর গ্রাম আলিনানে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন ইন্দিরা গান্ধী। এই ঘটনায় মাতঙ্গিনী একটি সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই শ্মশানের সম্মান তাতে আরও বেড়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
আবদুল মামুদ, স্বাধীন চক্রবর্তী, পঞ্চানন চক্রবর্তী, অশোক অধিকারী (পৌরপ্রধান), সুবোধ মাইতি।



❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক—'পূর্বাদ্রি' পত্রিকা।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের পারলৌকিক লোকাচার

উপেন পাত্র

আশ্চর্য কী? এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য ছিল—

"অহন্যিহনি ভুতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম।
তস্মাৎ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম।"

প্রতিনিয়ত মানুষ মরছে। তবু দীর্ঘজীবি হওয়ার প্রত্যাশা আশ্চর্য বৈ কি। তবু ধর্মীয় গুরুদের দেহান্তের পর আবার নাকি তাঁদের পুনরুত্থান ঘটে। এই বঙ্গদেশে এক ধর্মগুরুর মৃত্যুর পরও তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শিষ্যদের কি আকুল প্রয়াস! কথায় বলে—"গুরুরা ওড়েন না, শিষ্যরাই ওড়ান।"

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু—এই সর্বজনীন সত্যকে অস্বীকার করে আমাদের পুরাণ—মহাকাব্যে যদি সাতজন অমর চিরজীবির উল্লেখ থাকে—

"অশ্বত্থমা বলির্ব্যাস হনুমান বিভীষণ।
কৃপ পরশুরামশ্চৈব এ সপ্ত চিরজীবিতঃ।।"

তাহলে সাধারণ লোকের আর দোষটা কী? এই জন্যই বলা হয়—'গপ্পের গরু গাছে চড়ে, ধম্মের গরু আকাশে ওড়ে।'

'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।' মানুষ মৃত্যুর পর 'কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই' পায়। মৃত্যু-পরবর্তী শবদেহ ঠাঁই পাওয়ার মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য। বাংলার নবজাগরণের কাণ্ডারী রামমোহনের স্বগ্রামে আজও নাকি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের জন্য আলাদা শ্মশানের ঠাঁই আছে। পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়তা—এটাই আমাদের দেশের ট্রাডিশান। হিন্দু সমাজের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদির নানান বৈচিত্র্য আছে। তথাকথিত হিন্দু নামধারী উপজাতিদের পারলৌকিক লোকাচারের মধ্যে নানা রকমফের আছে। (তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিভুক্ত লোকেরা বর্ণহিন্দু নন। তাহলে কি তাঁদের 'বিবর্ণ হিন্দু' বলা হবে?)

আমাদের দেশে মানুষ মৃত্যুর পরই বেশি কদর পায়। বেঁচে থাকতে যে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা শুধুই অবহেলা পেয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের কী ঘটা! মৃতের আত্মাকে স্বর্গে 'দুধে-ভাতে' রাখার জন্য উত্তরপুরুষদের কী ব্যাকুলতা! এই জন্য প্রবাদে বলে—'বেঁচে থাকতে দূর ছাই, মরলে দানসাগর দেই।' আসলে এ হলে পিতৃপুরুষদের পিণ্ডি চটকে পুরোহিতদের পেটপূজার ব্যবস্থা করা। তাই চার্বাকের সাদাসাপটা মন্তব্য—

"ন স্বর্গে নাপবর্গো নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদিনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকা।।
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণোবিহিত স্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্যানি ত্বন্যদ বিদ্যতে কচিৎ।।"

ব্রাহ্মণ্যমতে মৃতের পারলৌকিক শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন না হলে তার আত্মার মুক্তি নেই, মৃত ব্যক্তি যতই পুণ্যবান হোন না কেন, পারলৌকিক ক্রিয়াতে বিঘ্ন হলে মৃতকে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, ইহজগতের মায়া কাটাতে পারবে না।

কয়েক দশক আগেও পাড়াগ্রামে নানারকম ভূতের কথা শোনা যেত, যেমন ব্রহ্মদত্যি, শাঁকচুন্নি, গেছোভূত, মেছোভূত, স্কন্ধকাটা, গোভূত, কমলি ভূত, মামদো ইত্যাদি। এখন আর তাদের কথা তেমন শোনা যায় না। ভূত এক বিলুপ্ত-প্রায় প্রজাতি। কিন্তু কোনো পরিবেশ বিজ্ঞানী এদের নিয়ে মাথা ঘামান না। এটা বড় পরিতাপের বিষয়। মানুষের অজ্ঞতা কমার অনুপাতে ভূতেদের সংখ্যা হ্রাস ঘটেছে। নাস্তিকেরা মানুন বা না মানুন ভূত থাকার অনেক সুবিধাও ছিল। বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় লোম খাড়া হওয়া ভূতের গল্পে আড্ডা জমানো যেত। আষাঢ় সন্ধ্যায় এই গল্পগুলি ভাল জমত। তাই কি 'আষাঢ়ে গল্প' কথাটির উদ্ভব। সাহিত্যিকরা রোমহর্ষক ভূতের গল্প লিখতেন। এখনকার সাহিত্যিকরা তা পারেন না। এসব ভূতের গল্প শুনতে বাচ্চারাও যে হেসে ওঠে। পোড়ো বাড়িকে ভূতের বাড়ি বা হানাবাড়ি বলে রটিয়ে দিয়ে ডাকাতরা ওখানে আড্ডা বানাতে পারত। ডাকাতি-রাহাজানি করে হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেলে তা ধনকুঁদরা বা ঝাঁপড়ি ভূতের দয়াদাক্ষিণ্য বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র মশায় তাঁর 'জানগুরু' উপন্যাসে এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। ভূত-প্রেত নিয়ে সাহেবি আদিখ্যেতাও কম নেই। ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে কেউ প্লানচেট ব্যবহার করেছেন, কেউ বা অবাস্তব প্লাজমা তত্ত্ব নিয়ে এসেছেন।

হিন্দু ধর্মীয়দের পাপ পুণ্যের হিসাব যমরাজের পার্সোন্যাল অ্যাসিট্যান্ট চিত্রগুপ্ত তাঁর জাবদা খাতায় তুলে রাখেন। যমরাজ মৃতের পাপপুণ্যে বিচার করে তাকে স্বর্গে বা নরকে রাখার ব্যবস্থা করেন। এই বাজার অর্থনীতির যুগে পুণ্যও একপ্রকার পণ্য, টাকা খরচ করলেই কেনা যায়। স্বর্গ-নরক সবই তো মানুষের কল্পনা। এসবের ভয় দেখিয়ে দেশে দেশে কায়েমি স্বার্থের লোকেরা তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে আর অজ্ঞ জনগণ নিরন্তর ভাগ্য-ভগবান ইত্যাদি ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দি হয়ে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। সেমেটিক ধর্মে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত মৃতদের কবরে অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু হাজার বছর পূর্বে মৃত এবং শেষ বিচারের পূর্বদিনে মৃত ব্যক্তিদের কি একই সঙ্গে বিচার হবে? অগ্নি উপাসক পার্সিদের মৃত্যু পরবর্তী লোকাচার বেশ ভালো, সেবামূলক। মৃত্যুর পর শব দেহ 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'-এ মাংসভোগী পাখিদের আহারের জন্য রেখে দেওয়া হয়। এ যেন গোষ্ঠীগতভাবে মরণোত্তর

দেহদান। মৃত্যুর পর নিজ দেহদানের দ্বারা জীবসেবা। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর পরলোকে পাপপুণ্য বিচার করার জন্য ঈশ্বর জাতীয় কোন অবাস্তব কল্পনা নেই। ব্যক্তির নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী তার জন্মান্তর ঘটবে, যতদিন না কাঙ্ক্ষিত নির্বাণ লাভ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই হল ভাঁওতাবাজির আখড়া। এগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদই কেবল মানবসমাজের মঙ্গল আনতে পারে।

দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে মৃতদেহ সংকারের কতকগুলি সাধারণ প্রথা আছে। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত একজনকে শবের শয্যা ছুঁয়ে বসে থাকতে হয়। কোথাও বা শবশয্যায় একটি লোহার জিনিস রেখে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে শবদাহের জন্য কাঠ কাটা হয়। তারপর নববস্ত্র আচ্ছাদিত শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সাধারণত শিশু, সাপে কাটা শব ও কিছু সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত শব ছাড়া অন্যান্য মৃতদেহ দাহ করা হয়। শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় শববাহকদের সামনে হরিনাম সংকীর্তনকারী দল যায় এবং একজন খুচরা মুদ্রাসহ খই ছড়াতে ছড়াতে যায়। মাঝে মাঝে 'হরিবোল' ধ্বনি দেওয়া হয়। শবযাত্রাকালে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন রীতিটি চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তনের কাল থেকে প্রচলিত। গৌড় বঙ্গের এই রীতি পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বারা রাঢ় বঙ্গে এবং শ্যামানন্দ আচার্যের দ্বারা উৎকল সীমান্ত বঙ্গে প্রসারিত হয়। শববাহকদের পশ্চাতে কোদাল-কুড়ুল এবং তুলসী গাছ নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতের গৃহ থেকে গ্রাম ছাড়িয়ে কিছুদূর পর্যন্ত শবযাত্রীদের পশ্চাতে গোবরজলের ছড়া ও ঝাঁট দেওয়া হয়।

শ্মশানে চিতা প্রস্তুত করার পর শবদেহ চিতায় শোয়ানো হয়, তার ওপর কাট চাপানো হয়। সাধারণত মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র মুখাগ্নি করার পর অন্যান্যরা চিতায় আগুন দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মুখাগ্নি কথাটির প্রচলিত অর্থ 'মুখে আগুন দেওয়া' হলেও প্রকৃত অর্থ হলো অগ্নিমুখ্য বা প্রথম চিতায় অগ্নিসংযোগ করা। এই কারণে আর্যসমাজীরা এটিকে বিকৃত প্রথারূপে ঘৃণার চোখে দেখেন। শবদাহের পর চিতার আগুন নিভিয়ে চিতাস্থানে একটি বেনার চারা লাগানো হয়। তারপর স্নানান্তে বাড়ি ফেরার সময় গ্রামের তেমাথা বা চৌরাস্তায় লোহার জিনিস দিয়ে মাটিতে তিনবার দাগ কাটা হয়। লোক বিশ্বাস অনুযায়ী এর ফলে মৃতের প্রেতাত্মা পিছু ধাওয়া করবে না। ওই প্রথার সম্ভাব্য কারণ এই যে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে না। মৃতরাও জীবিতদের সাথে অদৃশ্য ভাবে থাকে। মিশরের পিরামিড ও মমি অনুরূপ ধারণার ফলশ্রুতি, লৌহযুগ আসার পর মানুষের এই ধারণা পরিবর্তিত হয়। তাই হয়তো লোহা নির্ভরতার প্রতীক হয়ে ওঠে।

আলোচ্য অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকায় নির্দিষ্ট শ্মশানভূমি প্রায়শ থাকে না। সাধারণত নদীর বালুচরে, খালের ধারে বা পুকুর পাড়ে দাহকার্য সম্পন্ন করা হয়। কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট শ্মশান থাকে। কিন্তু শবযাত্রীদের বিশ্রামঘর বা তৈরি করা চুল্লি থাকে না। শহর ও গঞ্জ এলাকায়

শ্মশানভূমি সুনির্দিষ্ট থাকে এবং কিছুক্ষেত্রে যাত্রী আবাস ও চুল্লি থাকে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত গোরস্থান প্রায়শ থাকে না। বর্দ্ধিষ্ণু মুসলিম গ্রামগঞ্জে গোরস্থান থাকে। খ্রিস্টানদের জন্য গ্রামীণ এলাকায়ও কবরখানা দেখা যায়। আলোচ্য অঞ্চলের কিছু প্রাচীন রাজবংশের পারিবারিক শ্মশান থাকে, বিখ্যাত মঠ-আশ্রমের জন্যও নিজস্ব সমাধিভূমি থাকে। বৈষ্ণবদের শবদাহের পরিবর্তে সমাধি দেওয়া হয়। অতীতে যুগী বা নাথ সম্প্রদায়েও সমাধি প্রথা ছিল, বর্তমানে শবদাহ করা হয়। এতদঞ্চলের শ্মশানে শ্মশানবন্ধু ডোমদের প্রয়োজন হয় না। এখানে উত্তর রাঢ়ের শ্মশানের মতো বামাচারী তান্ত্রিকদের দেখা যায় না। মুসলিমদের মৃত সৎকারে কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। শবদেহ কবর দেবার তৃতীয় দিনে 'তিজাঁ' বা চতুর্থ দিনে 'চাহরম' নামে প্রাথমিক সংস্কার হয়। অত:পর দশ দিনে 'দশবাঁ' এবং কুড়িদিনে 'বিশবাঁ' অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কবরদানের চল্লিশদিনের মধ্যে, তিনপক্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার আগে, অন্তিম সংস্কার করা হয়

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে ঝাড়গ্রাম মহকুমার গ্রামাঞ্চলে খ্রিস্টানদের জন্য ভীমপুর, বড়ামচটি ও চৈনিশোল গ্রামে কবরখানা আছে। মসুলিমদের জন্য নড়িহাটি, দহিজুড়ি, চিঁচড়া ও জাহানপুর গ্রামে গোরস্থান আছে। জাহানপুর গ্রামে গোরস্থানের অদূরে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে পিরথানটি বেশ জনপ্রিয়। এখানে সুফিবাদী দরবেশ সৈয়দ কাশিমের মাজারটি অবস্থিত। এলাকার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পিরের দরগায় মানত নিবেদন করে এবং এই স্থানকে পবিত্রজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। সীমান্ত বাংলার পৌর এলাকায় সুনির্দিষ্ট শ্মশান থাকে। কোনো কোনো শ্মশানে শবদাহের জন্য কাঠ পাওয়া যায়। শ্মশান সংলগ্ন কাঠ জোগানদারকে লোকেরা 'মড়াবাবু' বলে। কয়েকটি পৌরসভায় মুসলিম ও খ্রিস্টানদের জন্য গোরস্থান থাকে। ঝাড়গ্রাম পৌরসভায় মোট পাঁচটি শ্মশান আছে। তার মধ্যে চারটি পৌর এলাকার মধ্যে এবং একটি বাইরে আছে। শহর সীমানার উত্তরাংশে লাহড় খাড়ের ধারে যে শ্মশানভূমি তা প্রাচীর দ্বারা পৃথকীকৃত এবং এর মধ্যে একটি শবযাত্রী বিশ্রামাগার আছে। শহরের মাড়োয়ারি সম্প্রদায় এখানে শবদাহ করেন। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর এখানকার যাত্রী আবাসটি নির্মাণ করেছেন। পুরাতন ঝাড়গ্রামের তালতলা শ্মশানের অদূরে একটি গোরস্থান আছে। শহরের পশ্চিমে মেহরা বাঁধ পুকুরের পাড়ে যে শ্মশান আছে, সেখানে শবদাহের জন্য পৌরসভা নির্মিত একটি চুল্লি আছে। এছাড়া ঝাড়গ্রাম শহরে রাজ পরিবারের জন্য নিজস্ব শ্মশান আছে।

ঝাড়গ্রাম মহকুমার আর একটি উল্লেখযোগ্য পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র হল শ্রীপাট গৌপীবল্লভপুরের মোহান্ত গোঁসাইদের সমাধিভূমি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের শ্যামানন্দী শাখার প্রধান আশ্রম এই শ্রীপাট। সুবর্ণরেখা নদীতীরে কয়েক বিঘা জমির উপর সংরক্ষিত এই স্থানে দেবগোস্বামী বংশের লোকদের সমাধিস্থ করা হয়। মোহান্ত গোঁসাইদের যোগাবিষ্ট অবস্থায় সমাধিস্থ করার পর তৎস্থানে একটি সমাধি-মন্দির নির্মিত হয়। সমাধি মন্দিরগুলি সুদৃশ্য

আটচালা ঢঙের হয়। এই স্থানে একটি অতিথিশালা আছে। ভ্রাম্যমাণ বৈরাগীরা সমায়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে এখানে থাকেন। এখানে একটি গোকর্ণ বট আছে, যার পাতাগুলি গরুর কানের মতো হয়। রসিকানন্দ ছিলেন এই মোহান্তবংশের প্রথম পুরুষ। তাঁর সমাধিটি এখানে নেই। ওটি উড়িষ্যার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরে আছে। বর্তমান মোহান্ত গোঁসাই হলেন তাঁর ষোড়শতম বংশধর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মোহান্ত বংশীয়দের মৃতাশৌচ পালন করতে হয় না। দাস অধিকারী উপাধিকারী সদগোপ বংশীয়রা তাঁদের হয়ে মৃতাশৌচ পালন করেন। শ্রীপাটের প্রথম সেবাইত রসময় ঘোষকে দাস অধিকারী উপাধি দিয়ে আচার্য শ্যামানন্দ এই প্রথা প্রবর্তন করেন। রসময় ঘোষের পুত্র গোপীজনবল্লভ দাস অধিকারী রসিকানন্দের মহৎ চরিত্র চিত্রণের জন্য পয়ার ছন্দে 'রসিকমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এটি অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

যাই হোক মৃত সৎকার বা শবদাহ পরবর্তী দিন পর্যন্ত মৃতের পরিবারবর্গের লোকদের অগ্নিপক্ক খাদ্য গ্রহণ না করাই লোকাচার। তৃতীয় দিনে প্রথম অগ্নিপক্ক খাদ্য গ্রহণ করা হয়, একে তিক্তান্ন বলে। তৎপরে শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত পরিবারবর্গ আমিষবর্জিত খাদ্য খান। মৃতের সন্তানদের ওই সময় জুতো, তেল, পান বা অন্যান্য বিলাসদ্রব্য বর্জন করতে হয়। ওইকালে মুখাগ্নিকারী বা শ্রাদ্ধাধিকারীকে সাধারণত সেলাইহীন দ্বিবস্ত্র ও কম্বলাসন ব্যবহার করতে হয়। সাধারণত দশম দিনে ঘাটশ্রাদ্ধ হয়। বল্লালীয় নবশাখ গোষ্ঠীভুক্তদের স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী একমাসে ঘাটশ্রাদ্ধ হওয়ার কথা। আলোচ্য অঞ্চলে ওই বিধি সংক্ষেপিত হয়ে পঞ্চদশ বা দশম দিনে সম্পন্ন হয়। খলুর বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধকার্য হবে ব্রাহ্মণ্যদের দশ দিনে, ক্ষত্রিয়দের পনেরো দিনে, বৈশ্যদের বিশ দিনে এবং শূদ্রদের ত্রিশ দিনে। পিতৃমাতৃ বিয়োগ হলে অন্যান্যদের তুলনায় ব্রাহ্মণের শোকটা ক্ষণস্থায়ী হয় কিনা জানি না। আবার পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হলে গোত্রান্তরিত কন্যাকেও তৃতীয় বা চতুর্থদিনে স্বামীগৃহে সংক্ষিপ্ত শ্রাদ্ধ করে নিতে হয়। ঘাটশ্রাদ্ধের দিন ক্ষৌরকর্ম, মস্তক মুণ্ডনের পর ঘাটস্নান, তারপর নববস্ত্র পরে শ্রাদ্ধকারীকে মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ড নিবেদন করতে হয়। শ্রাদ্ধকারী ছাড়াও পরিবারের সবাইকে নববস্ত্র পরতে হয়, নববস্ত্র সাধারণত শ্বশুরবাড়ি ও মামাবাড়ি থেকে আসে। শ্রাদ্ধান্তে সবাই শোভাযাত্রা করে বাড়ি ফেরে।

একাদশ দিনে শ্রাদ্ধশান্তি ও ব্রাহ্মণভোজন হয়। ব্রাহ্মণভোজনের পূর্বে একটি অমানবিক প্রথা এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। মৃতের পরিবারবর্গকে আগত ব্রাহ্মণদের পদধূলি মাথায় নিতে হয়। শ্রাদ্ধ বাড়ির উঠোনে একটি নতুন গামছা পেতে দেওয়া হয়। তার উপর একে একে অতিথি ব্রাহ্মণরা এসে দাঁড়ান। পদধূলি লিপ্ত ওই গামছা মৃতের আত্মীয়বর্গকে মাথায় নিতে হয় এবং শ্রাদ্ধাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ওই গামছা মাথায় বেঁধে নিতে হয়। শ্রাদ্ধাধিকারী বৃদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ বালকের পদধূলি নিতে হয়। কেউ আপত্তি তুলতে প্রবীণেরা পাপের ভয় দেখিয়ে বলেন—"তুলসী পাতার কি ছোট বড় বিচার করতে আছে।" এইসব প্রথার যৌক্তিকতা কী? এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন কর মশায়ের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। ঝাড়গ্রাম সন্নিকটে বাঁধগোড়া

গ্রামবাসী আর্যসমাজী দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রবীণ করমশাই তাঁর 'মৃতক শ্রাদ্ধ কি আবশ্যক' পুস্তিকায় শ্রাদ্ধের অযৌক্তিকতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে আর্যসভ্যতায় নানা বিকৃতি আসার কালে মনুসংহিতা ও তৎপরে গরুড় পুরাণাদি লিখিত হয়েছে। গরুড় পুরাণে রক্তপুঁজ ভরা বৈতরণী নদী পার হয়ে মৃতের স্বর্গ গমনের জন্য পুরোহিতকে গোদানের কথা বলা হয়েছে। এর সমালোচনায় লেখক ব্যঙ্গ ভরে বলেছেন—গরু ওইরূপ নদী পার হতে পারবে না। বরঞ্চ কদর্যভোজী অস্থানবাসী শুয়োর তা পারতে পারে। তাই শ্রাদ্ধে পুরোহিতকে শূকর দান করলে মৃত আত্মা স্বর্গলাভ করতে পারে। তাঁর মতে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত। তর্কের খাতিরে তা মেনে নিলেও সূক্ষ্ম আত্মার স্থূল পিণ্ড ভক্ষণের যৌক্তিকতা কী? তিনি বলেন স্বার্থান্বেষীরা অতীতের অজ্ঞ মানুষদের যে অলীক দর্শন বুঝিয়েছিলেন, আজকের শিক্ষিত লোকেরা তা বিনা প্রশ্নে মেনে নিচ্ছে—এটা বড়ই লজ্জাজনক ব্যাপার। তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত গোবিন্দনাথ লিখিত 'হিন্দুইজম্' পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে বলেন—"বিহার ও বঙ্গদেশে যে শ্রাদ্ধের বাড়াবাড়ি দেখা যায় তা পুণ্যকর্ম নয়, বিকৃত রুচির পরিচায়ক।"

যাই হোক শ্রাদ্ধশান্তি ও ব্রাহ্মণ ভোজনের পর দ্বাদশ দিনে 'আলিত পিণ্ডি'র শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয়। ওইদিন সমস্ত প্রকার মৃতাশৌচ দূরীভূত হয়। ওই দিন শ্রাদ্ধের পর আমিষ ভক্ষণ ও বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করতে কোনো বাধা থাকে না। ওইদিন পিস্টক পিণ্ড নিবেদন করে পিঠা খাওয়া চলতে পারে। পিস্টক পিণ্ড নিবেদন না করলে সারা বছর পিঠা খাওয়া বন্ধ থাকে। তবুও তিলের পুর দিয়ে তৈরি পুলি পিঠে খাওয়া সারাবছর বারণ। মৃতাশৌচের কারণে বা অন্য কারণে স্থগিত হওয়া বাগদত্তা বা অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ ওইদিনে হতে পারে। এজন্য কোনো লগ্ন দেখার প্রয়োজন হয় না। দ্বাদশ দিবসের শ্রাদ্ধশান্তির পরও নাকি মৃতের আত্মার ঠিকঠাক মুক্তি হয় না। আবার গয়াধামে গিয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ড নিবেদন করতে হয়। গয়াধামে পিণ্ড না পাওয়া পর্যন্ত মায়াবদ্ধ আত্মারা সব 'হা-পিণ্ড' 'হা-পিণ্ড' করে ঘুরে বেড়ায়। শিবের নির্দেশমতো পিণ্ড না পাওয়া আত্মাদের ধরে নন্দী ভৃঙ্গী ভূত বাহিনীতে রিক্রুট করে নেয়।

আলোচ্য অঞ্চলের আদিবাসী সমাজে মৃত সংস্কার বিষয়ে নানারকম বৈচিত্র আছে। সাঁওতাল সমাজে মৃতকে তেল হলুদ মাখিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। শবের মাথা দক্ষিণদিকে রেখে দাহ করা হয়। শবদাহকালে একটি মুরগি বাচ্চা বলি দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস এই যে ওটি মৃতের আত্মাকে স্বর্গে বহন করে নিয়ে যাবে। শবদাহের পর মৃতাস্থি একটি মাটির ভাঁড়ের মধ্যে রেখে শালগাছের নীচে পুঁতে রাখা হয়। একে 'জাং তোপা' বলে। পাঁচদিন পর ছোট শ্রাদ্ধ হয়। তারপর মৃতাস্থি হলুদ ছোপানো কাপড়ে বেঁধে হলুদ বস্ত্র পরে দামোদর নদীতে বিসর্জন দিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর বড় শ্রাদ্ধ বা 'ভাণ্ডান' অনুষ্ঠান হয়। মুন্ডা ও ভূমিজদেরও শবদেহে হলুদ মাখিয়ে শ্মশানে নিয়ে দাহ করা হয় এবং দাহকালে মৃতের মাথা দক্ষিণ দিকে

রাখতে হয়। শবদাহের পর মৃতের অস্থি নিয়ে এসে পরিবারগত বা গোষ্ঠীগত 'সাসানডিরি'তে পুঁতে তার ওপর একটি পাথর খাড়াভাবে রেখে দেওয়া হয়।

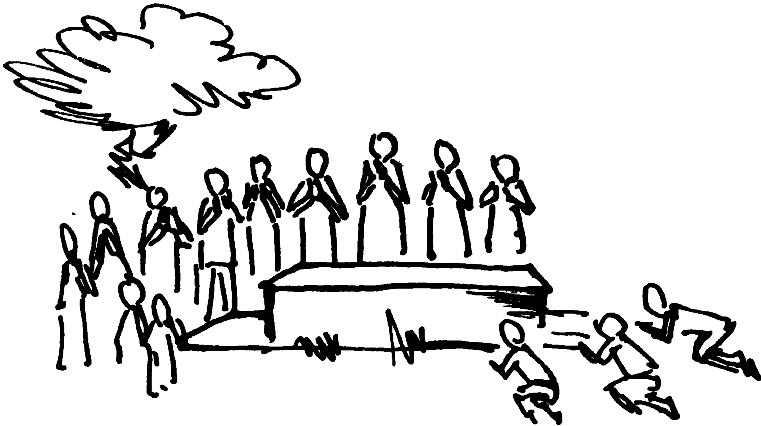
বাইগা ও আহির-হেয়রা মৃতের শ্রাদ্ধ শান্তির পর শ্মশান থেকে মৃতের আত্মাকে শোভাযাত্রা মাধ্যমে বাড়িতে নিয়ে এসে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বেদীতে স্থাপন করে। হো উপজাতীর পূর্বপুরুষ বেদী 'আদিং' রান্নাঘরে থাকে। সম্প্রদায় বহির্ভূত লোকদের এই বেদী স্পর্শ করার অধিকার নেই। লোধা উপজাতীয়রা বাড়ির ঈশান কোণে 'ঈশান' নামে বেদীতে উর্ধ্বতন চার পুরুষের আত্মাকে রাখে। যে-কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা হয়। মৃতের শবদাহের এগারোতম দিনে মৃতের বড় ছেলে গ্রামের চৌমাথায় একটি জলভর্তি ঘটি রেখে মৃত চার পুরুষকে আহ্বান করে। তারপর ঘটিটি নিয়ে এসে ঈশান বেদীতে রাখে। তারপর নতুন মাটির হাঁড়িতে ভাত ও মুরগির মাংস রান্না করে চারটি শালপাতার দোলায় ভাত ও চারটি দোলায় মাংস রেখে চার পুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়।

এতদঞ্চলের বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে স্মৃতি তর্পণ অনুষ্ঠান অতীতে প্রচলিত ছিল। পূর্বে মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না করা হত এবং বছরের বিশেষ দুটি দিনে হাঁড়ি পরিবর্তন করা হত। এই পরবকে 'নুয়া হাঁড়ি' বলা হত। কালীপূজার পরদিন এবং চৈত্রসংক্রান্তি এই দুই দিনে 'নুয়া হাঁড়ি' পরব পালন করা হত। নতুন হাঁড়িতে ভাত রান্না করে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করার পর পরিবারের অন্যান্যরা অন্নগ্রহণ করতো। কালীপূজার পরদিন অমাবস্যা তিথিতে সন্ধ্যেবেলা পাটকাঠি জ্বালিয়ে পূর্বপুরুষদের স্বর্গের পথ আলোকিত করা হত। অঞ্চলভেদে ওইদিন কোথাও কোথাও যম রাজার উদ্দেশ্যে 'যমঘাড়ি' ছুঁড়ে মারা হত। ছোট ছোট পাটকাঠির একদিকে কাদা মাখিয়ে গুটিমতো বানানো হত এবং রোদে শুকনো করে নেওয়া হত। ওইদিন সন্ধ্যায় নদী বা বড় পুকুরের পাড়ে পাটকাঠির খোলা দিকে আগুন জ্বালিয়ে উপরদিকে ছুঁড়ে দেওয়া হত। ওইদিন আবার বাঁশের খুঁটির আগায় চৌকো কাগজের বাক্সের মধ্যে প্রদীপ জ্বালানো হত। ওই আলো পিতৃপুরুষকে স্বর্গের পথ দেখাবে—এই বিশ্বাস ছিল। ধনীগৃহস্থরা পরবর্তী অমাবস্যা তিথি পর্যন্ত প্রতিদিন এই আলো জ্বালাত। একে 'স্বর্গদীপালি' বলা হত।

উপজাতীয়দের মৃত সৎকার বিষয়ে কতগুলি সাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায়। পণ্ডিতদের অনুমান যে আদিতে বিভিন্ন উপজাতি সম উৎস থেকে জাত হয়েছে। অস্ট্রিক-খেরওয়াল গোষ্ঠীর এই উপজাতীয়দের পূর্ব পুরুষরা এতদঞ্চলে তাম্রাশ্ম যুগের পতন ঘটায়। ঝাড়গ্রাম মহকুমার পশ্চিমাংশে এবং সংলগ্ন ঝাড়খন্ড রাজ্যের ধলভূম এলাকায় তারা তামা আকর থেকে তামা নিষ্কাশন করত। আজও এই অঞ্চলে ধাতু নিষ্কাশন চুল্লির ধ্বংসাবশেষ ও তামার ধাতুমল দেখা যায়। বেলপাহাড়ীর নিকটবর্তী তামাজুড়ি নামকস্থানে অতীতে তাম্রপিণ্ড ও তাম্রনির্মিত দ্রব্য বেচাকেনার জন্য গঞ্জ ছিল। তৎকালের বণিকরা তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে ওই সামগ্রী সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলে রপ্তানি করত। ড. অতুল সুরের মতে সিন্ধুসভ্যতার লোথাল বন্দরে তাম্রলিপ্তি

বণিকদের বাণিজ্যকুঠি ছিল।

এতদঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্য-সংস্কার যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনই গোঁড়ামি ও অজ্ঞতাও অভাবনীয়। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলে ভূত-প্রেত-ডাইনি বিষয়ে বিশ্বাস এবং অলীক পরলোক ধারণা ইত্যাদি অনুধাবন করে অবাক হতে হয়। আজও সাপে কাটা রোগীকে হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে ওঝা-গুনিনের ওপর ভরসা রাখা হয়। রোগীর মৃত্যুর পর মৃতকে কলার ভেলায় চাপিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এই বিশ্বাসে যে মৃত অলৌকিকভাবে জীবন ফিরে পাবে। আজও মানুষের রোগ-অসুখ ও মৃত্যুর জন্য ডাইনি-তুকতাক ইত্যাদিকে দায়ী করা হয়। ডাইনি সন্দেহে কত অভাগী নারীকে গ্রামছাড়া করার চেষ্টা করা হয়। জানগুরুদের কথাকে অভ্রান্ত বলে মনে করা হয়। তার কথায় ডাইনি সন্দেহে অভাগী নারীকে পিটিয়ে মারা হয়। আজও সাধারণ জনের মধ্যে, এমনকী শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও, প্রচলিত কুসংস্কারকে মান্য করা, তথাকথিত জাতপ্রথা মেনে চলা এবং কিছু ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রত্যক্ষ করে ডি. এল. রায়ের ওই বিখ্যাত সংলাপটি স্বতোচ্চারিত হয় — 'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!'



❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক।

মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট গোরস্থানের ইতিবৃত্ত

মাজরুল ইসলাম

মানুষের কাছে স্মরণাতীতকাল থেকে, মৃত্যু এক নির্মম হলেও—প্রবহমান সত্য। প্রত্যেকেহ পরলোকের পথ গ্রহণ করবে। আর, মৃতদেহ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ ও নারীর জন্য (প্রায়) একই ধরনের নিয়মাবলি। মৃতব্যক্তিকে মক্কার দিকে মুখ করে কবরে শোওয়ানো হয়। মৃতের কাছে যারা থাকে তাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ—কোরান থেকে আবৃত্তি করার বিধান আছে। পরিজনের মৃত্যু হলে—পুরুষাপেক্ষা মহিলারা বেশি বেশি শোক প্রকাশ করেন। মৃতদেহের ধোয়ানোর কিছু কিছু পালনীয়—আচার, যেমন, মৃতদেহের পেট মলে, তারপর পায়খানা প্রস্রাব হলে তা পরিষ্কার করে সর্বপ্রথমে উযু করিয়ে দিতে হয়। ভিজা কাপড় দিয়ে মুখের ভিতর ও কান পরিষ্কার করে তারপর, মৃতের দেহ বামদিকে কাত করে আগে ডানদিক ধুয়ে নিতে হয়। বিজোড় কুলের পাতা দিয়ে জল গরম করে, কর্পূর দেওয়া জলে শরীর মুছে আতর মাখিয়ে কাফন (সাদা নতুন কাপড়) দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকের চুলে তিনটি বেণি গাঁথিয়ে তার পিছনে রাখার নিয়ম দেখা যায়। (বুখারী ১ম ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯ পৃঃ)। স্বামীকে তার স্ত্রী বা স্ত্রীকে তার স্বামী কর্তৃক ধুয়ানো সর্বোত্তম। (আহ্‌মদ ইবনে মাজা বুলুগুল মারাম)। রুকু-সিজ্‌দা-বসার দরকার ছাড়া অন্য নামাজের মতোই জানায়ার (শাস্ত্রীয় প্রার্থনা) নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাজে ইমাম—মৃতব্যক্তি পুরুষ হলে তার মাথার সামনে, আর স্ত্রীলোক হলে তার মাঝে দাঁড়ানোর প্রথা আছে। কমপক্ষে তিন কাতার (পঙ্‌ক্তি) লোকের দরকার জানাযার নামাজে। ৪ তাকবীর বা ৫ তাকবীর জানাযার নামাজ পড়া যায় (বুখারী-১৬৬ পৃঃ)। মুসলিম মিশকাত ১৪৫ পৃষ্ঠায় জানাযার নামাজের দোয়া—আরবি থেকে বাংলায় ভাষান্তর করলে অর্থ দাঁড়ায়—হে আল্লাহ! তুমি এই মৃতকে ক্ষমা করো, দয়া করো, মুক্তি দাও, এর অপরাধ মার্জনা করো। একে সম্মানের সঙ্গে কবরে স্থান দাও, এর কবর প্রশস্ত করে দাও, আর তার পাপকে বরফ জল ও শিশির দিয়ে ধুয়ে মুছে দাও। যেমন, তুমি, সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করো। তার ঘর হতে উত্তম ঘর, পরিবার হতে উত্তম পরিবার ও উত্তম স্ত্রী হতে প্রবর স্ত্রী দান করো। একে জান্নাতে (স্বর্গে) প্রবেশ করাও এবং কবরের আযাব বা জাহান্নমের আযাব হতে মুক্তি দাও! আগে ডানে ও পরে বামে সালাম ফেরার আদেশ আছে। দোয়া পাঠ সহকারে দু-হাত একত্রিত করে তিনবার, তিন আঁজলা মাটি দেওয়া যায়। কথিত আছে—সব মৃত ব্যক্তির মরণাত্মাই শান্তি-পিপাসু। তাই ভেবে মৃতদেহের এত যত্নসহকারে কবরের সুবব্যস্থা করা হয়ে থাকে। কবর এক বুক পর্যন্ত খোঁড়া হয়।

তবে, একটা কথা—এখানে শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রানুযায়ী ক্রিয়াদির নিয়ম উল্লেখ করা হল। কিন্তু, অমুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো বিশেষ বিশেষ নিয়ম থাকলেও থাকতে পারে।

প্রবন্ধকারের তা অজানা।

মুর্শিদাবাদের প্রবর গোরস্থানের ইতিবৃত্ত—উত্থাপন করতে গিয়ে, এতক্ষণ মৃতব্যক্তিকে সমাধিস্থ করার আগে যেগুলো শাস্ত্রানুযায়ী করণীয়—তার কিছুটা আলোচনা করা হল মাত্র।

মুর্শিদাবাদ জেলা বর্তমানে ভাঙা হাটের মতো খাঁ খাঁ করছে। নবাবি আমলের জৌলুস, আর নেই কিছু দর্শনীয় স্থান—আর, কবরগুলো উপর দিকে মুখ ফাঁক করে শুয়ে আছে। মানুষ, নবাব রাজা প্রজা—দরিদ্র বিত্তবান যাই হোন না কেন একদিন না একদিন—মৃত্যু, কাফন পরলোকের কথা স্মরণ করতে ভুল করেন না। তাই, এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ানুযায়ী কবরের কান্নার সুরে সেইসব কবরের ব্যক্তিবর্গের স্থান-কাল-পাত্র প্রভৃতি নির্ণয় করার জন্য প্রবন্ধকারের ইচ্ছা।

পাঠকবর্গ, আসুন প্রথমেই দেখা যাক—মুর্শিদাবাদ সৃষ্টিকর্তা নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কবরের আলেখ্য-কাহিনি। কাট্‌রায় মুর্শিদকুলীর গোরস্থান : লা-ইলাহি য়ে-আল্লা-মহম্মদ রসুলাল্লা—অর্থাৎ ঈশ্বর এক এবং মহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ—কাট্‌রা মসজিদে একদিন মোয়াদ্দিনের নিনাদিত আজান, মুর্শিদকুলী কবরে শুয়ে কান পেতে শুনতেন।

১৭২৩/২৪ খ্রি. মসজিদ নির্মাণ শেষ হয়। মক্কার সুপ্রসিদ্ধ কাবা মসজিদের অবগুণ্ঠনে নির্মাণ করেছিলেন মোরাদ ফরাশ নামে একজন বিশ্বস্ত নবাব কর্মচারী। মসজিদ নির্মাণের একবছর পরেই মুর্শিদকুলী পরলোক গমন করেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে কাট্‌রার মসজিদের প্রবেশ পথে সুরম্য সিঁড়ির নীচে পূর্ব নির্দিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠে সমাহিত করা হয়। ১১৩৯ বঙ্গাব্দে। আগত দর্শনার্থীর পায়ের ধূলিকণা পরলোকে তাঁর পূণ্যলাভ হবে এই রকম দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল; সেই জন্য তিনি এই রকম ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন। মসজিদে কষ্টিপাথরের তৈরি একখণ্ড ফলকে লেখা আছে—আরবের মহাম্মদ (রাঃ) উভয় জগতের গৌরব, যে ব্যক্তি তাঁর দ্বাররে ধূলি লয়, তাঁর মাথায় ধূলি বৃষ্টি হোক।

রোশনীবাগের সুজাউদ্দৌলার গোরস্থান—(১৭২৫-৩৯)। মুর্শিদাবাদের বর্তমান হাজারদুয়ারী প্রাসাদের সোজাসুজি, ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে একটি মনোরম-ছায়াময়-শান্তিময় বাগান দৃশ্যমান। এই বাগানটির নাম—রোশনীবাগ বা রোশনীগঞ্জ বলে। বাগানটি আকারে বড় না হলেও গুণের দিক থেকে সমৃদ্ধিমান—মনোমুগ্ধকর সর্বজন বিদিত। আদিকালে এখানে আলোকোৎসব হত। এখন হয় না।

১২৫১ বঙ্গাব্দে সর্বজন প্রশংসনীয় মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দীনের গোর এই বাগানেই আজও দৃষ্টিগোচর। চৌকোণা প্রাচীর বেষ্টিত সমাধিক্ষেত্রটি। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি প্রবেশপথ দেখা যায়। তবে, উত্তরের প্রবেশপথটি সদর গলি বলে অনুমান করা হয়। সুজাউদ্দীন রোশ্‌নীবাগের ছায়াতলে চির বিশ্রাম-লাভ করছেন, আজো। গোরস্থানের সরদ গলি দিয়ে ঢুকতেই ডানহাতে একটি ছোট মসজিদ দৃষ্ট হয়। রিয়াজ গ্রন্থের লেখানুসারে, সম্ভবত আলীবর্দী তাঁর প্রভুতুল্য নবাব সুজাউদ্দীনের কল্যাণার্থে তাঁর সমাধিস্থলে উক্ত মসজিদটি নির্মাণ করান। কবর প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে ফোয়ারা চৌবাচ্চা ও নহর এবং ভূলুণ্ঠিত তামার পাইপ লাইন

আজও দর্শনার্থীর নজর এড়িয়ে যায় না। পূর্ব-উত্তর ও পূর্ব-দক্ষিণকোণে দু'টি ঘুমটি ঘর বিদ্যমান। রোশনীবাগের সমাধি-ভবনের পাশে দাতা করিম খাঁর এবং তদীয় স্ত্রী-কন্যার—মোট তিনটি সমাধি আছে। এখানে প্রতি চৈত্র মাসের ৩-১৩ তারিখ পর্যন্ত মেল—কবিগান, তরজা, কাওয়ালি, জলসা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমাধির পূর্বদিকে অধুনা রাইটনবাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

রোশনীবাগ সমাধিভবনটি দৈর্ঘ্যে ১৪ ও প্রস্থে ১৩ হাত। সম্মুখভাগে ৩টি দরজা আছে। মধ্য দরজার উপরে কালোপ্রস্তর ফলকে ফারসি ভাষায় লেখা আছে—"১১৫১ হিজরীর ১৩ই জেলহজ্জ মঙ্গলবার সোজবাসিপদ লাভ করেন।" ঘরের ভেতরে সুজাউদ্দীনের সুবিশাল সমাধি বিরাজ করছে। মুর্শিদাবাদের মধ্যে এত বড় কবর আর দেখা যায় না। কবরটি দৈর্ঘ্যে ৭ হাত প্রস্থে আড়াই থেকে তিন হাত। সমাধিভবনের দক্ষিণের বারান্দায় আরেকটি কবর আছে। কবরটি কার আজও অজানা।

জিন্নাতুন্নিসার জীবন্ত কবর— লালবাগ থেকে জিয়াগঞ্জ যাবার পথে মহিমাপুর পুলিশ ফাঁড়ির ঠিক উল্টোদিকে জিন্নাতুন্নেসার সমাধি অবস্থিত। ১৭৩০ খ্রি. তাঁর মৃত্যু হয়। আবার কেউ কেউ বলেন—যে, তাঁকে না কি জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। এ নিয়ে মতান্তর আছে। যাহোক, তাঁর মৃত্যু পর তাঁর পিতার মতোই স্থিরীকৃত সিঁড়ির নীচে কবর দেওয়া হয়।

সরফরাজ খাঁর কবর : মুর্শিদাবাদ রেলস্টেশনের উত্তরদিকে নবাব সরফরাজ খাঁর সমাধি আজও বিদ্যমান। ১৭৪১ সালে গিরিয়ার যুদ্ধে আলীবর্দী খাঁ তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তখন গোপনে ওঁকে এখানে নিয়ে এসে সমাহিত করা হয়েছিল। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে।

শোক মৌন খোসবাগের গোরস্থান—নবাব আলিবর্দী খাঁ, তাঁর বেগম শরফুন্নেসা, নবাব সিরাজউদ্দৌলার ও তাঁর বেগম লুৎফান্নেসার কবর আছে। এছাড়া, তদীয় পরিবারবর্গের মিলিয়ে—৩৪/৩৫টি সমাধি আজও বিরাজ করছে।

হতভাগ্য সিরাজ মীরণের আদেশক্রমে মোহম্মদী বেগের তরবারির আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে চিরদিনের জন্য এই খোসবাগের বৃক্ষচ্ছায়ায় সমাহিত হয়েছেন। নবাব আলীবর্দী ও সিরাজের সমাধি-ভবন খোশবাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন;—লুৎফুন্নেসা বেগম। ৩০৫ টাকা ছাড়াও ১০০ টাকা বৃত্তি পেতেন, তিনি। সোনা-রূপোর পুষ্পখচিত কালোবর্ণ বস্ত্র দিয়ে এই কবর ঢাকা থাকত। লুৎফুন্নেসা প্রতিদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতেন, এবং সুগন্ধি কুসুম ফুলে চুমো দিয়ে— সেই অশ্রুজল সিক্ত কুসুমরাশি প্রিয় পতির সমাধির উপর ছিটাতেন। সে সময় বুক চাপড়ে করাঘাত করতে করতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এইভাবে চলতে চলতে একদিন তিনিও পরলোকগমন করেন। খোশবাগে সিরাজের পদতলে তাঁর কবর, আজও দৃশ্যমান। খোশবাগের সমাধি-ভবনটি দুটি প্রাকারে বিভক্ত। প্রথম চত্বরটি মূলপ্রবেশ দ্বার থেকে শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির পশ্চিম দিকে সোজাসুজি। প্রথম চত্বরটির উত্তরদিকে একটি উঁচু জায়গায় ১৭টি

বিপরীতে ৩টি কবর দেখা যায়। তার দক্ষিণদিকে আরও কবর আছে। দ্বিতীয় চত্বরে ৭টি সমাধি আছে। মধ্যস্থলে সাদা ও কালোবর্ণ পাথর খণ্ড মণ্ডির সমাধিতলে বাংলার আদর্শ নবাব আলীবর্দী খাঁ চিরবিশ্রাম করছেন। এখানে মোট ৩৪-৩৫টি কবর আছে। সমাধিভবনের পূর্বদিকে ২টো গুমটিঘর আছে।

সিরাজের পূর্ব পাশে তাঁর ভাই—১৫ বছরের মীর্জা মেহ্দী সমাহিত হয়েছেন। লুৎফুন্নেসার পূর্বপাশে—মীর্জা মেহদীর দক্ষিণে আরেকটি কবর আছে—কেউ কেউ সিরাজের কোনো বেগমের—তথা সিরাজের প্রথমা বিগমে ওমদাতুন্নেসার সমাধি বলে অনুমান করেন। আলিবর্দীর দক্ষিণদিকে তাঁর মহীয়স বেগম শরফুন্নেসার সমাধি বলে কথিত আছে। তাঁর কবরের পশ্চিমে আরও দু'টি কবর আছে—তাঁর দু-মেয়ের সমাধি বলে সর্বজনবিদিত। আলীবর্দী খাঁ এই বাগানের প্রতিষ্ঠাতা।

১১৬৯ হিজরীর ৯ রজব তারিখে আলীবর্দী মারা যান। তাঁর সমাধির পূর্বভাগে তাঁর প্রিয়তম দোহিত্র বাংলার সুপরিচিত হতভাগ্য নবান সিরাজউদ্দৌলার কবর। তাঁর সমাধিটি মাটির সঙ্গে মিশে আছে। কবরের উপর কোনো প্রস্তরখণ্ড নেই—কেবল বিলাতি মাটি দিয়ে লেপা আছে।

লুৎফুন্নেসা বেঁচে থাকতেই তাঁর মেয়ে উম্মত জহুরার মৃত্যু হয়। সেই জন্য তাঁর মৃত্যুর পর উম্মত জহুরার চার মেয়ে—সরীফুন্নেসা, আসম্মতুন্নেসা, সাকিনা ও উম্মতুলা মেহেদী বেগম খোশবাগের দায়িত্বভারের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে নিবেদন করেন, এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁদের উক্ত ভার প্রদান করেন। তাঁদের মৃত্যু হলে উক্ত বংশীয়দের খোশবাগের দায়িত্ব পান। ১৮৪৫ খ্রি. সাকিনার বড় মেয়ে খয়েরুন্নেসার মেয়ে জীনা বেগম ও তাঁর ছোট মেয়ে ফতেমার পুত্র মহম্মদ আলি খাঁ এবং উম্মত জায়েনা ও উম্মত কুলসুম বেগম নামে উক্ত বংশীয় আরও দুজন মহিলা—এই চারজন খোশবাগের মাতোয়াবনী নিযুক্ত হয়েছিলেন। কালক্রমে তদীয় বংশীগণের হাত থেকে সরকার বাহাদুর নিজে ভার গ্রহণ করছেন।

জাফরগঞ্জে মীরজাফর বংশের কবরখানা—এই স্থানটি মুর্শিদাবাদের একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। এখান মীরণ ছাড়া প্রায় ১১০০টি কবর আছে। কবরখানাটি প্রায় ৯/১০ বিঘা জমি জায়গা জুড়ে। এই স্থানটি বাংলার শেষ নবাব-নাজিমদের সমাধি-ক্ষেত্র। মীরজাফর খাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী মনি বেগম ও বর বেগম এবং মীরজাফরের সমাধির পশ্চিমে তাঁর অন্যতম জামাই ইসমাইল খাঁ, তার পশ্চিমে মীরজাফরের বংশের দ্বিতীয় নবাব নজ্মুদ্দৌলা চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। এই কবরস্থানে মীরজাফর বংশের ছাড়া অন্য মৃতব্যক্তির কবর দেওয়া প্রথা রহিত। সংলগ্ন সবেবরাতের গৃহ পরিত্যক্ত অবস্থায় বিরাজ করছে। বর্তমানে ৬জন মোত্তালী প্রতিদিন কোরান পাঠ করেন।

জাফরগঞ্জ কবরখানাটি পশ্চিম মুখে রাজপথের উপরই অবস্থিত। এই সমাধি-ক্ষেত্র নবাব-নাজিমদের কবরে কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হয়েছে যে, সেখানে তিল রাখারও জায়গা নেই।

এখানে ভ্রমণ করতে করতে এইরকম ভয় উপস্থিত হয় যে, পাছে মৃতব্যক্তিগণের প্রতি কোনো রকম অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়ে পড়ে। সমাধিক্ষেত্রের মাঝ বরাবর একটি সারিতে সমস্ত নবাব-নাজিমগণ সমাহিত আছেন। এই সারির পূর্বসীমায় একটি আবৃত স্থান গতিয়ারা বেগম নামের নবাব বংশীয় কোনো মহিলার কবর। তার পশ্চিম হতে একটি সারি ক্রমান্বয়ে ১২টি সমাধি আছে। পূর্বদিক থেকে দেখতে আরম্ভ করলে, প্রথমে মীরজাফরের পিতা সৈয়দ আহম্মদ নজফীর সমাধি দৃষ্ট হয়। তারও পশ্চিমে মীরজাফরের ভাই ও রাজমহলের নবাব কাজেম আলি খাঁর কবর। আরো পশ্চিমে নবাব মীরজাফরের কবরটি। ১৭৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে বৃহস্পতিবার তিনি দুরারোগ্যে ৭৪ বছর বয়সে মারা যাবার পর এখানে সমাধিস্থ হন।

নাজমুউদ্দৌলার পরে উক্ত বংশীয় তৃতীয় নবাব সৈফউদ্দৌলা বা কানাইয়ার সমাধি। সৈফউদ্দৌলার পশ্চিমে মীরজাফরের অন্যতম পুত্র আশরফ আলি খাঁর সমাধি। তাঁর পরই চতুর্থ নবাব-নাজিম মোবারকউদ্দৌলার কবর আছে। মোবারকউদ্দৌলার পশ্চিমে পঞ্চম নবাব বাবর জঙ্গের কবরটি। তাঁর পাশে ষষ্ঠ নবাব আলিজা বা সৈয়দ জৈনুদ্দিন আলি খাঁ শায়িত আছেন, এবং আলিজার পাশে তাঁর ভাই সপ্তম নবাব ওয়ালাজার সমাধি। অষ্টম নবাব হুমায়ুনজার সমাধিটি আজও ওয়ালাজার পাশে বিরাজ করছে।

১৭৫৯ সালের ৩ জুলাই রাতে ভীষণ বৃষ্টির সময় ঘুমন্ত মীরণ তাঁবুর মধ্যে বজ্রাঘাতে মারা যান। তখন রাজমহলের কাছে শরিফা বাজারে মীরণের পচা-গলিত মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। জাফরগঞ্জ মীরজাফর বংশের সমাধিক্ষেত্র—তাই, মীরণের কবর নেই।

ডাচ্ সমাধি—কাশিমবাজার রেলস্টেশনের অদূরেই কালিকাপুরে ডাচ্ বেনিয়াদের বসবাস ছিল। এঁরা সোনা-হীরা-জহরতের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তাঁদের সমাধিক্ষেত্রটি ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অধিগ্রহণ করেছে।

ইংরেজগণের সমাধি : কাশিমবাজার রাজবাড়ি ও রেলস্টেশনের মাঝামাঝিভাগে ইংরেজদের একটি সমাধিক্ষেত্র আছে। হেস্টিংস-পত্নী ও তাঁর মেয়ে ছাড়া আরও অনেক ইংরেজগণের সমাধি এখানে বিদ্যমান। ইংরেজদের সমাধিক্ষেত্রটিও ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে রয়েছে।

এছাড়াও, বাবুলবোনা রোডে ইংরেজদের পুরানো কবরস্থান আছে। পুরানো কবরগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবহেলার ভেলায় ভাসমান। বাবুলবোনা কবরখানার মধ্যে যে সব সমাধিতে মনুমেন্ট আছে তার মধ্যে—ক্যাপ্টেন স্কিনার (মৃত্যু, ১৭৭৩), ক্যাপ্টেন জন ফ্রেন্ড (১৭৮৭ মৃত্যুকাল), ফ্রেডারিক গ্রিফিথস্ (মৃত্যু ১৭৯১) মুর্শিদাবাদ দেওয়ানি আদালতের রেজিস্ট্রার মি. ড্যানিয়েল লেকি (মৃত্যু ১৭৯২), মিসেস ক্যারোলিন ব্রাউন (মৃত্যু ১৭৯৮), জন উইলসন (মৃত্যু ১৮০৩), ক্যাপ্টেন ল্যায়বার্ট (মৃত্যু ১৮০৫), ক্যাপ্টেন পেমবারটন (মৃত্যু ১৮৪৩) প্রমুখ।

মি. সেক্সপীয়ার ছিলেন—সিভিল সার্ভেন্ট, তিনি ৬৪ বছর বয়সে বহরমপুরে মৃত্যুবরণ করেন। এখানকার সব চেয়ে পুরানো কবরটি হল ক্যাপ্টেন জেমস্ স্কিনারের। ১৭৭৩ সালে

তিনি বহরমপুরে মারা গেলে এখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। আইরিশ সেনাপতি জর্জ টমাসের কবরও এখানে আছে। শুধু তাই নয়, দুই কুঠিয়াল সাহেব ক্রিকটন এবং গ্রান্টের কবরটিও এখানেই আছে। আরো কবর আছে রবার্ট ক্রিকটন নামে তখনকার সিভিলিয়ানের। তাছাড়া খ্যাতনামা লেখিকা মিসেস শেরউডের দু-বছরের ছেলে হেনরী শেরউডের কবরও এখানে দৃশ্যমান।

মোতিঝিল কবর—মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে মোতিঝিলের বিবরণ পাওয়া যায়। নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁ অত্যন্ত বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। তিনি একটি সুরক্ষিত স্থানের খোঁজ করতে গিয়ে এই অশ্বক্ষুরাকৃতি মোতিঝিলের মনোরম অবস্থান দেখে, তিনি এখানে নিজের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁ খুব দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য তাঁর মসজিদ ও অতিথিশালার খরচ বাবদ মাসিক ৩৭.০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। জৈনুদ্দীনের কনিষ্ঠ পুত্র এক্রামুদ্দৌলাকে (সিরাজের ছোট ভাই) পালিত ছেলে হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে প্রাণের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন। বসন্ত রোগে এক্রামুদ্দৌলার মৃত্যু হলে নওয়াজেস শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং মারাও যান। তাঁর ইচ্ছানুসারে মোতিঝিলের মসজিদের সামনে তাঁর স্নেহের এক্রামুদ্দৌলার পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। ১১৬৯ সালে ভোর হতে না হতে মীর মহম্মদ আলি, আলীবর্দী খাঁ-সহ তাঁর পরিবারস্থ সব আত্মীয়-স্বজন এবং নগরের স্ত্রী পুরুষ মিলে মৃতদেহ সৎকারে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কদম শরীফ কবরখানা—মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশন থেকে বিডিও অফিসের কাছে এসে বামদিকে মোরামের রাস্তা ধরে পূর্বদিকে ১/২ কি.মি. গেলে বহরমপুর-জঙ্গীপুর পাকা রাস্তায় উঠেই কদম শরীফ। রাস্তার পূর্বদিকে একটি মসজিদ ও সুরম্য সিঁড়িযুক্ত পুকুরসহ একটি বড় কুয়ো বেষ্টিত কদম শরীফ কবরখানা অবস্থিত।

হুমায়ুনজার পিতা ওয়ালাজার রাজত্বকালে বসন্ত আলী খাঁ নামে একজন খোজা এখানে মসজিদ, মক্তব, লঙ্গরখানা এবং মুসলিম উৎসবাদি পালনের জন্য তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এখানে সমাধিস্থ করা হয়। এখানে একটি বড় কুয়ো বেষ্টিত প্রায় ২৫/৩০টি কবর আছে। কয়েকটি কবরে স্মৃতিফলক আছে। স্মৃতিফলকের ভাষা অজানা বলে পাঠোদ্ধার করতে প্রবন্ধকার অক্ষম। তবে, ইংরেজি ভাষায় লেখা আছে কতকগুলো স্মৃতিফলক— যেমন, সৈয়দ তোকি রেজা (২১-১২-১৯৭৬) এবং সৈয়দ আকবর রেজা, পিতা আসগর রেজা (১৭-১২-১৯৮৭)।

মসজিদটি ছাড়া কুয়ো, পুকুরের ও কবরগুলোর বর্ণনা করতে সত্যি সত্যিই, যে কেউ আমার মতো আপ্লুত হবেন। এলাকার জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে সরকার বাহাদুরের উচিত— কবরগুলোর যত্ন নেওয়া।

জিন দিঘির কবরখানা—বাংলা খ্যাত সম্মানপ্রাপ্ত কবিয়াল শেখ গুমানি দেওয়ান, মুর্শিদাবাদ-

বীরভূম জেলার সীমান্তবর্তী সাগরদিঘি থানার পশ্চিম প্রান্তে জিন্‌দিঘি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার গ্রামে গ্রামে কবি গান নিবেদন করে বেড়িয়েছেন। তিনি ছিলেন চারণ কবি সম্রাট।

২৫ বৈশাখ মাসের রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ২৬ বৈশাখ মাসে তাঁকে জিন্‌দিঘি গোরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। প্রতি বছর জিন্‌দিঘির গোরস্থানে নতুন নতুন কবিয়ালরা তাঁদের দলের সঙ্গ তদের নিয়ে তাঁদের নতুন সৃষ্টি পাঁচালি শুনিয়ে প্রয়াত চারণকবি সম্রাটের আত্মার শান্তি কামনা করেন। প্রাণের আবেশে তীর্থভূমি হয়ে যায়—জিনদিঘি।

চারণ কবি সম্রাট সেখ গুমানি দেওয়ানের আন্তরিকভাবে চলে আসছে এই স্মৃতিচারণা। অজ গ্রামের জিনদিঘি—যেন, নতুন নতুন চারণ কবিয়ালদের কাছে কবিতীর্থ হয়ে উঠেছে।

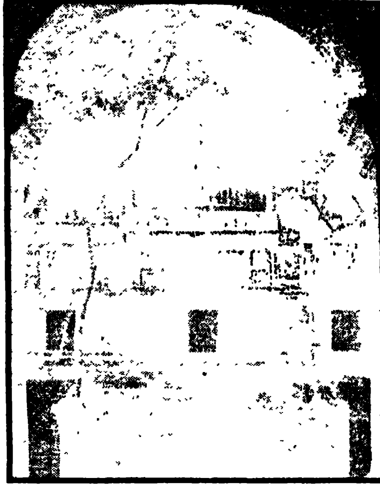
চারণ কবি সম্রাট শেখ গুমনি দেওয়ানকে সম্মান জানাতে আথুয়া বেলুই পাড়া ঘাটের গম্ভীরা নদীর উপর মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত সেতুটি উৎসর্গ করা হয়েছে। জিনদিঘিতে এখনও বসবাস করেন কবিকন্যা লতা, কবিপুত্র প্রয়াত বাদলের স্ত্রী পিয়ারুন্নিসা এবং কবির নাতির এক কন্যা (শিশুশিল্পী)

দাদাপিরের মাজার—এই মাজারটি প্রায় দেড়শো বছরের পুরাতন। ৫৬৪ সালে ভগবানগোলার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে সেখপাড়া গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন এক ফকির সাহেব। এই ফকিরবাবা তখনকার জমিদারের কাছে এক রুমাল মাপের জমি দান চাইলেন। জমিদার সামান্য জমি ভেবে জমি দান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জমি দিতে গিয়ে দেখা গেল—সেই রুমাল বাড়তে বাড়তে প্রায় ১২ বিঘা জমির দখল দিতে হল সেই পির ফকিরবাবাকে। সেই ১২ বিঘা জমির সবটুকুই দাদাপিরের মাজারের তত্ত্বাবধানে আজও আছে। এই মাজারের ফকিরবাবার শিয়রে একটি কাঁঠাল গাছ ছিল। এই কাঁঠাল গাছ নিয়ে অনেক জনশ্রুতি।

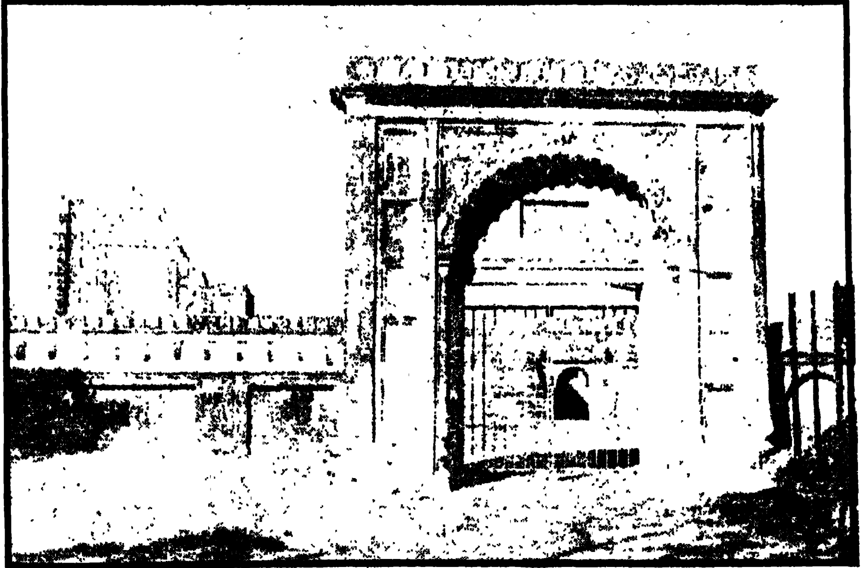
এই ফকিরবাবা সাহেবের নাম সৈয়দশাহ নাসের আলী। কালক্রমে দাদাপির বাবা নামে পরিচিত লাভ করেন। ৫৯৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মাজার ঘিরে সারা পৌষমাস ধরে মেলা চলে। মাজারে শ্রদ্ধাসহকারে ফুল, মালা, ধূপশালা, মোমবাতি দিয়ে মানত করেন অনেকে। মনস্কামনাও পূর্ণ হয় বলে জনশ্রুতি।

তথ্যসূত্র :

১. মুর্শিদাবাদ-কাহিনী—নিখিলনাথ রায়
২. মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি—কমল বন্দ্যোপাধ্যায় (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)
৩. মুর্শিদাবাদ কাহিনী—লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
৪. মৃত্যু ও পরলোক—নিগূঢ়ানন্দ
৫. লোকশ্রুতি-লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র
৬. গ্রামীণ পত্রিকা—ফেব্রুয়ারি, ২০০৩
৭. মুর্শিদাবাদ ও তার স্থাপত্য শৈলীগুলি—মাজরুল ইসলাম
৮. দীনিয়াত শিক্ষা—মেসবাহুদ্দিন



মুর্শিদাবাদের খোসবাগ : সিরাজদ্দৌল্লার সমাধি।



আজিমুন্নেশা বেগমের সমাধি, মুর্শিদাবাদ।

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক, জীবনবিমা কর্মী।

সাটুইঘাট শ্মশান-কথা

উত্তমকুমার পাল

একশো বছর আগেকার কথা। কৃষ্ণগঞ্জের বাজারের তখন আলাদা একটা সুখ্যাতি ছিল। আশেপাশে তেমন বড়ো মাপের বাজার ছিল না। ইংরেজদের কুঠি সংলগ্ন এই বাজারে ভাগিরথীর বুক চিরে নিয়মিত লঞ্চ স্টিমার আসা যাওয়া করত বর্ষার মরশুমে। স্থলপথ ও জলপথে মাল পরিবহনের বিশেষ সুবিধা ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিমপারে ছিল এই বাজারের অবস্থান। হাঁটাপথে মিনিট দশেক পশ্চিমে হাঁটলে চৌরীগাছা স্টেশন। পূর্বে ছয়সাত কিলোমিটারের মধ্যে গঙ্গার ওপারে বেলডাঙ্গা। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা শশাঙ্কের রাজধানী এখান থেকে দশ কিলোমিটার উত্তরে। এই কৃষ্ণগঞ্জের বাজার থেকে চারশো মিটার দক্ষিণে গঙ্গাতীর বরাবর পা বাড়ালে সামনে পড়ত একটি শ্মশানঘাট। পূর্ব দিক ঘেঁষে বয়ে যেত খেয়ালী গঙ্গা, পশ্চিম দিক জুড়ে ছিল ঘন ঘন। রাত্রে তো দূরের কথা, দিনেরবেলায় সেইপথে একলা মানুষ যেতে ভয় পেত। ঘাটটি পরিচর্য্যার দায়িত্ব কেউ মাথা পেতে নেয় নি তখন। আজ থেকে ৮০ বছর আগে।

আনুমানিক ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে) বীর বিক্রমে ১২ বছর দেশ ভ্রমণের পর ঐ ঘাটে আশ্রয় নিয়েছিলেন জেমোকান্দি থেকে আগত শৈব উপাসক কৃষ্ণধন বাবাজী। একজন শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষ, সেকালের হয়েও বি.এ. পাশ। জন্মের সাল তারিখের কোনও নিদর্শন শ্মশানঘাট থেকে পাওয়া যায় না। তখন মৃতদেহ দাহ করার রীতি ছিল নিতান্ত কম। বেশিরভাগ দেহকেই কিছুটা মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলা হত। তা নিয়ে মহাভোজ হত সূর্য ডুবলেই শিয়াল কুকুরের। সেই পরিবেশে অতন্ত্র প্রহরী হয়ে চল্লিশোত্তীর্ণ প্রবীণ সাধক দিনরাত উপাসনার কাজে লিপ্ত থাকতেন। সূচনাপর্বে তিনিই নাকি এঘাটের প্রথম সার্থক সাধুপুরুষ।

বর্ষাভিন্ন গঙ্গায় তখন হাঁটু খানেক জল। এপারের সঙ্গে ওপারের ছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। এপারের লোকজন তাকে ডিঙিয়ে ওপারে যেত অনায়াসে। কাজ শেষে গঙ্গার স্নিগ্ধ শান্ত কোমল জলে পা ভিজিয়ে জঙ্গল ডিঙিয়ে দলে দলে বাড়ি ফিরত দিনান্তে সূর্য ডুবলে। একটু রাত্রি হলেই শ্মশানের উপর দিয়ে সনসন করে বইত ভারি বাতাস। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ত শিয়াল কুকুরের দল। তারা মৃতদেহকে মাটি খুঁড়ে তুলে এনে টানাটানি করত, ধারালো দাঁত দিয়ে কামড়াতো, নখে করে আঁচড়াতো, নিজেদের মধ্যে ভাগবন্টন নিয়ে মারামারি করত। মাঝে মাঝে ভয়ানক বাঘ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে হুঙ্কারে শ্মশানের সমস্ত নির্জনতা ভেঙে চুরমার করে দিত। এখন শুনলে সে কথা গল্পের মতো মনে হয়, সত্যিই সে জঙ্গলে ছিল বেশ কয়েকটি বাঘের আস্তানা। বেলগাছতলায় যেরূপ বেল পড়ে থাকে এখানে ওখানে ছিটিয়ে, শ্মশানঘাট

জুড়ে ছড়িয়ে থাকত কুকুর শেয়ালের ভক্ষণ অবশিষ্ট মানুষের অস্থি কঙ্কাল সহ ছিন্ন মুণ্ডু। দিনেরবেলায় ঘাট আগলাতো সারি সারি তালগাছের উপর উপবিষ্ট শকুনের দল। কাক চিল আরও অনেক।

সুদুর রাঢ়বঙ্গের কিছু অংশ - কান্দি, ভরতপুর, আমলাই, মাসলা, ভালুইপাড়া, নারায়ণপুর থেকে মড়া ফেলতে আসত বাবলা ডিঙিয়ে। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণধন বাবাজী ওরফে কেষ্ট বাবা দু'তিন বছর কাটিয়েছিলেন গঙ্গাগর্ভে। কয়েকটা মাত্র বাড়ি ঘুরে অন্ন যোগাড় করতেন আর জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা ফুটিয়ে খেতেন।

ঘাটে লোকজনের সমাগম দিন দিন বাড়তে লাগল। প্রচলিত হল দাহপ্রথা। তবে সমাধিপ্রথা একেবারে নিশ্চিহ্ন করা গেল না। দুর্গন্ধ থেকে স্থানীয় লোকের মুক্তি ঘটল না। কৃষ্ণগঞ্জের একটা গোষ্ঠী ঘাট উচ্ছেদনের কাজে লিপ্ত হল। বিতাড়িত করল সাধু বাবাজীকে। সাধুবাবা ছিলেন যোগীপুরুষ। শোনা যায় মা গঙ্গার সরাসরি সাক্ষাৎ তিনি নাকি পেয়েছিলেন। যাবার সময় রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিয়ে গেলেন—"যে কৃষ্ণগঞ্জ থেকে আমায় নির্বাসন দিলি, সেই কৃষ্ণগঞ্জ তোদের থাকবে না, ধ্বংস হবে।" ঘটলও সেইরূপ। দু'বছরের মধ্যে কৃষ্ণগঞ্জের বাজার গঙ্গার ভাঙনে অর্ধলুপ্ত। ব্যাপার বুঝে নিঃশেষে অনেক কষ্টে সাধুবাবাকে ফিরিয়ে আনা হল। স্বাধীনতার আগেকার কথা। তিনি গিয়েছিলেন এখান থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তরে কাঁঠালিয়া ঘাটে। জানা যায়, ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন তিনজন ব্যক্তি। প্রয়াত বিভূতি দাস, দ্বিতীয়জন কালাচাঁদ এবং তৃতীয়জন ন্যাঙাবাবা, বর্তমান সাটুই ধর্মশালার প্রয়াত সাধক। কৃষ্ণধন ফিরে এলো, কিন্তু তাঁর অভিশাপ তিনি ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কৃষ্ণগঞ্জের বাজার। মা-গঙ্গার কোন অতল তলে তলিয়ে গেল যত আভিজাত্য, যত গৌরব।

সৃষ্টি হল একটি নতুন গ্রাম, নতুন লোকালয়, যা আজকের সাটুই নামে পরিচিত। বাংলা অভিধান মতে 'সা' এর মানে শান্তি অথবা শ্রী। টুঙ্গি আসলে উঁচু জায়গার সমার্থক। তাহলে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণগঞ্জের বাজারের তুলনায় নতুন গড়ে ওঠা এই লোকালয়টি অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং সুন্দর। সাটুই নামকরণের এর রকম একটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সংলগ্ন ঘাটটির নাম 'সাটুইঘাট'। ঘাটটি সাটুই চৌরীগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সোনাদিয়ার মৌজা এলাকায় হলেও, এর নির্দিষ্ট কোনও অবস্থান অতীতেও ছিল না, এখনও নেই। মা-গঙ্গার খেয়াল খুশি মতো ঘাটটিকে চলাফেরা করতে হয়। গঙ্গার পাড় যখন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, শ্মশান এলাকাসহ সাধুবাবার আশ্রমটি একটা জমি পিছিয়ে আসে। কৃষ্ণধন বাবাজী স্রষ্টা এবং এখনও পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ আসন তাঁর নামে এই সাটুই ঘাটে। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে) বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণের রাত্রে চূড়ামণি যোগে তিনি দেহ রাখেন অজস্র ভক্তবৃন্দের সামনে। দাহ করে দেওয়া হয় তাঁর অন্তিম অস্থিটুকু তাঁরই কথামতো। স্মৃতি হিসাবে রয়ে যায় এখানে ওখানে কয়েকটি অস্পষ্ট সাদাকালো ফটো, আর রামায়ণ মহাভারত সহ কয়েকটি দুর্মূল্য ধর্মগ্রন্থ। সাটুই

ধর্মশালায় এখনও তাঁর স্মৃতিকে ঘিরে সকাল সন্ধ্যায় আসর বসে নিয়মিত। সেখানে দেখা যায় মুক্তিদাতা দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তদের পরিত্রাণমূলক আচরণ বিধি, পাঠ করা হয় শোক শান্তির স্তব। নানা ধরণের বৈষ্ণবীয় কার্যকলাপ চলে সারা বছর ধরে।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই আদর্শবাদী এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পোড়াডাঙ্গা গ্রামের ধনু দে বছর পনেরো শূন্যস্থানে আসীন ছিলেন।

ইতিমধ্যে ক্ষীণকায়া গঙ্গা নদী উঠল ফুলে ফেঁপে। পোড়াডাঙ্গা গ্রাম থেকে বয়স্ক গোবিন্দ মোড়লের কাছে পাওয়া তথ্য অনুসারে ১৩৮২ বঙ্গাব্দের (১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে) ৯ বৈশাখ মাঝরাত্রে গ্রামবাসী দেখল গঙ্গার দুকুল ভরা জল। ছোটো ছোটো বালির চড়ার উপর দিয়ে বয়ে গেল গভীর জলস্রোত। যার ধারা আজও অব্যাহত। পায়ে দলিত নদীর বুকে চলল ছোটো বড়ো নানা মাপের পারাপারি নৌকা। শ্মশানের যত ঝুলকালি সব গেল ধুয়ে মুছে। শ্মশানঘাটকে নতুন রূপ দিলেন, ঘোষ বংশীয় দেবর ঘোষের পুত্র কাশীনাথ ঘোষ। ঘাট থেকে ওপারে নজরে পড়ে তার গ্রাম জালালপুর। ঘাটের সে প্রথা গেল পাল্টে। প্রতিটি মরাকে সযত্নে দাহ করার রীতি প্রচলিত হল। তালগাছে কয়েকটা শকুন আর বালির পাড়ে গর্ত খুঁড়ে বসবাস করা কয়েকটি শেয়াল ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের উপদ্রব কমে গেল। কারণ মড়াকে আর আগের মতো তাদের ভোগ সামগ্রী করে রাখা হয় না। জঙ্গল কেটে বানানো জমিতে শুরু হল লোকজনের নিয়মিত আসা যাওয়া। দিনেরবেলায় বাচ্চারাও সে এলাকায় অবাধে ঘুরতে শুরু করল। গড়ে উঠল স্নানের ঘাট, বাজার। বছরে অনেক কবার রীতিমতো স্নানের আড়ম্বর শুরু হয়ে গেল দূর দূরান্তের পুণ্যাকাঙ্ক্ষীর।

সাটুই মোটামুটি একটা চলনসই বাজার বর্তমানে। গঙ্গা ও বাবলা নদীজাত মাছের আমদানি এখান থেকে নেহাৎ কম হয় না। সকালের সবজি থেকে রাত্রের দেশী মদ পর্যন্ত প্রায় সব কিছুই এ বাজারে পাওয়া যায়। প্রকৃতি এখানে গাছপালায় জমজমাট।

এগারো বছর নিবিড় তপস্যার পর দৈববিপাকে একবার কাশীবাবাকে এ ঘাট থেকে চলে যেতে হয়েছিল। তারপর এসেছিলেন দুর্গাপুরের গদাবাবা, কাঁঠালিয়ার গেবাবাবা। সকলেই এইঘাটের সঙ্গে যুক্ত থেকে আমৃত্যু এ ঘাটের সেবা করে গেছেন। বর্তমানে কাশীবাবা আবার ফিরে এসেছেন। এখন তিনিই এ ঘাটে বহাল আছেন শিষ্যের দলবল নিয়ে। এই কাশীবাবা যখন আগের বার এসেছিলেন, তখন ছিলেন জাগ্রত শ্মশানের জাগ্রত প্রহরী। তিনি সাটুই পোড়াডাঙ্গার অনেককেই তাঁর শিষ্যত্বের আওতায় এনেছেন।

দু-একটা রহস্যজনক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর প্রথম পর্বে। প্রত্যক্ষদর্শীর বেশিরভাগই জীবিত। সাগরচন্দ্র দে-এর কাছ থেকে শোনা গেল এরকম দু'একটা রহস্যজনক কাহিনী। রাত্রে ঘড়ির কাঁটা তখন দু'টোর ঘর অতিক্রম করেছে। শ্মশানঘাট থেকে মাঠ পথে বাড়ি ফিরছিলেন পোড়াডাঙ্গার অকালপ্রয়াত নিবাসী বৈদ্যনাথ দে। প্রায় নিজের দেহের দৈর্ঘ্যের সমান হাতে তার একখানা শক্ত বাঁশের লাঠি। মাঠ পেরিয়ে তখন গ্রামে ঢুকবেন, এমন সময় রাস্তার এপার হতে

ওপার হয়ে সম্মুখ ছোট্ট ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা অস্পষ্ট জন্তু। বেড়াল বলে মনে হল তাঁর। জ্যোৎস্নার রাত। স্পষ্ট বোঝা গেল না। থেমে গেল তাঁর পা। নিজেকে সামলে নিয়ে লাঠি দিয়ে বিস্তর খোঁচাখুঁচি করেও ঝোপের মধ্যে প্রাণীটির সন্ধান পেলেন না। হতবাক হয়ে গেলেন। যদি এখানেই কাহিনি শেষ হয়ে যেত, তবে এটা কাহিনি হত না। কিন্তু কাহিনি সমাপ্তি এখানে নয়। লাঠির উপর থুতনিই ভর করে ভয়ার্ত বৈদ্যনাথ রাতের আঁধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। সাহস থেকেও না থাকা। কোনও সাড়া নেই। পার্থিব জগত থেকে সে একেবারে বিচ্ছিন্ন। সাধুবাবা বুঝতে পেরেছিলেন সমস্ত ব্যাপারটা। দেখতে পান নি। দূর থেকেই নিশুতি বাতাসে জোর গলায় হাঁক দিয়েছিলেন—"ভয় নেই রে বৈদনাথ, তোর ভয় নেই, তুই সামনের দিকে পা বাড়া, থেমে থাকিস না, বিপদ তোর কেটে গেছে।" বৈদ্যনাথ শুনতে পায়। সেই রাত্রির মতো নির্বিঘ্নে বাড়ি এসে পৌঁছায়।—রীতিমতো অবাক করা এবং অবিশ্বাস্য কাহিনি। তবে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

এর থেকেও বেশি অবাক হতে হয় কাশীবাবার পালিত কুকুরের আচরণে। নাম তার যোগী। সে এখন যদিও পরলোকে, তার ছায়া শ্মশানের চারপাশ জুড়ে এখনও সমান বিরাজিত। তার কাজ ছিল গভীর রাত্রি হলে শ্মশানঘাট থেকে ভক্তবৃন্দদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। আশ্চর্য এখানেই, হাজার বাধ্য করলেও বাড়িতে এসে সে একবিন্দু জল পর্যন্ত স্পর্শ করত না। বাড়ির চারপাশটা একবার ভালো করে ঘুরতো, তারপর বাড়িতে তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে সেইপথে ফিরে যেত সাধুবাবার পদতলে। অথচ সকাল হলে সেই জন ঘাটে গিয়ে যা খেতে দিত, তা-ই সে মহানন্দে খেত। খেতে তখন তার বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকত না।

বর্তমানে কাশীবাবার আশ্রমটি তালপাতার কুঁড়ে। মাথায় পরিত্যক্ত মাদুরের ছাউনি। শব জড়ানো মাদুরগুলি প্রয়োজন ফুরোলে সাধুবাবা তুলে রাখেন মাথার উপরে। ব্যবহার করেন ভক্তদের বসার আসন হিসেবে, আশ্রিতকে আশ্রয় দানের কাজে। অন্ন সংস্থান বলতে যে যা হাত তুলে দেয়। একবেলা হয়। একবেলা হয় না। অফুরন্ত ভাণ্ডার বলতে শিবের প্রসাদ-বাবার ভোগ-গাঁজা। চব্বিশ ঘন্টা গাঁজার গন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত। সূর্য এখানে অস্ত যায় না।

অনুষ্ঠানের মধ্যে চল আছে বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় কৃষ্ণধন বাবাজীর স্মৃতিকে ঘিরে সারাদিন ব্যাপী নাম সংকীর্তন, আর বেলা দুই প্রহর থেকে সার্বজনীন মহোৎসবের মহড়া। হাতে হাতে মালসা প্রসাদ এবং পাতায় পাতায় খিচুরি প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা। বিরাট তার আকার। সাম্প্রদায়িকতার যুগে ধর্মের প্রাচীর ডিঙিয়ে ছোটো বড়ো সকলের এই উৎসবে অবাধ অংশগ্রহণ। এছাড়া আছে বিভিন্ন আঞ্চলিক অনুষ্ঠান। জৈষ্ঠ্য মাসে শ্মশানঘাট লাগোয়া গঙ্গার ধারে গঙ্গাপূজো, মেলা, আরও কত কী! কার্ত্তিকী অমাবস্যায় মা শ্মশানকালী তথা শ্যামাকালীর পূজা আরাধনা শুরু হয়েছে কাশী বাবার আমলে দু'বছর ধরে। এই রাত্রে পূজা প্রচলনের আগে থেকেও নির্জন শ্মশানভূমিতে দু'চারজন তান্ত্রিক সকলের অগোচরে সাধনা করতে আসেন বছর বছর।

শোনা যায়, এ ঘাট নাকি কোনও দিন খালি যায় না। সারা বছরই ঘাড়ে করা শবের পিছু পিছু কাঠ মাথায় শবযাত্রীরা শবদেহের সৎকারে তাগিদে এ ঘাটে আসেন শবযাত্রার সাথী হয়ে। সঙ্গে থাকেন স্ত্রী-পুরুষ সহ আরও অনেক আত্মীয় স্বজন। এদের বলা হয় কাঠুরে। আগেই উল্লেখ করেছি, সুদূর রাঢ়বঙ্গের ঐসব এলাকা সহ স্থানীয় কামনগর, তিলিপাড়া, পোড়াডাঙ্গা, সাটুই, ঘোষপাড়া, শ্রীকৃষ্ণপুর, গোপালপুর প্রভৃতি অঞ্চলের সমস্ত নাগরিকের শেষ আশ্রয় হয় এই সাটুই শ্মশানে। সাধুবাবা গঙ্গা থেকে জলতুলে শবের উপর ছিটিয়ে শবকে মন্ত্রসহযোগে পবিত্র করেন, তারপর দাহ করার অনুমতি দেন। সাধুবাবা নিজেও দাহকর্মে অংশগ্রহণ করেন। কাঁচা বাঁশের ধপাধপ শব্দ আর মদ মাতালের নিদারুণ হৈ চৈ এ জীবিত মানুষের যাবতীয় দম্ভ ছাই হয়ে ধূলিকণার সঙ্গে মিশে যায় অবলীলায়। বংশধর কর্তৃক মুখাগ্নির পর থেকে সমস্ত দেহটা সামান্য অস্থিভস্মে পরিণত হওয়া পর্যন্ত গড়ে প্রায় চার-সাড়ে চার ঘন্টা সময় লাগে। দাহকার্য সম্পন্ন করে প্রত্যেকে গঙ্গাস্নান করে নেয়। ভিজে কাপড় ছাড়ে। সাটুই বাজারের রসগোল্লা আর নিজেদের হাতে বানানো লুচি সহযোগে মহাভোজে মেতে ওঠে।

পোড়ানোর কাজে নেই কোনও সাহান বাঁধানো মজবুত কয়লার চুল্লি অথবা আভিজাত্যেভরা জাকজঁমক পূর্ণ বৈদ্যুতিক চুল্লি। এখানে মাটি খুঁড়ে অর্থাৎ ঝিল কেটে তার উপর চিতা সাজানো হয়। একসঙ্গে দু'চারটে মরা এলে পাশাপাশি একাধিক ঝিল কাটতে হয়। একাজ করে থাকেন ডোমেরা। ঘাটের পাশে মোটামুটি একশো বছর থেকে একঘর ডোমেদের বাস। এরা সমাজে অস্পৃশ্য। এখন বেড়ে তিন ঘর হয়েছে। জগদীশ ডোম, মোহর ডোম, রাজেশ ডোম তাদেরই সাময়িক বংশানুক্রম। তাঁরা তাঁদের কাজের অনুপাতে সামান্য পয়সা পান। এবং সেই সঙ্গে পরিত্যক্ত জামাকাপড় সহ অন্যান্য দ্রব্য। গঙ্গার জলে কোনও মৃত প্রাণী ভেসে এলে তা থেকেও কিঞ্চিৎ উপার্জন হয়। তাদের দিন চলে গ্রাম থেকে মাসান্তে একবার ভিক্ষে করে। এখানে নেই মরা পোড়ানোর জন্য নির্ধারিত করপ্রথা। কান্দির সুবিখ্যাত লালাবাবুর মাহালের অংশ এটি। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক রাজা। এ এলাকায় তাঁর বড়ো নাম ডাক। সুদূর অতীতে তিনি এ ঘাটের কর থেকে অসহায় গ্রামবাসীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। কীর্তিমান অতীশ সিং এই বংশেরই সন্তান। সেই থেকে সরকারি কোনও কর বা খাজনা এই ঘাট থেকে তোলা হয় না। এটি নিষ্করের ঘাট। দাহকারীরা স্বেচ্ছায় হাতে তুলে যা দেন, তা-ই সাধুবাবা গ্রহণ করে দিন যাপনের কাজে ব্যায় করেন।

অসহায় এই ঘাটটির বর্তমানে করুণ অবস্থা। দূর থেকে আগত শব যাত্রীদের রাত কাটানোর জন্য মাথার উপর ছাদ নেই। বৃষ্টি অথবা শীতে গাছতলায় পড়ে থাকতে হয়। এমনকি আজ পর্যন্ত অবাধে সম্পন্ন হয় পরের জমিতে দাহ প্রক্রিয়া।

এঘাট বড়ো উপেক্ষিতা। প্রয়োজন ছাড়া কেউ খোঁজ রাখে না কোনও দিকের। নেই বলিষ্ঠ পরিচালক কমিটি। মোটামুটি ষাট হাজার মানুষের অন্তিম সংস্কারের আধার এই সাটুই ঘাট আজ অবলুপ্তির পথে। এখান থেকেই অগণিত মানুষকে দেওয়া হয় স্বর্গপথের টিকিট। অথচ স্থায়ী

কোনও মন্দির, স্তম্ভ অথবা আশ্রয়স্থল ঘাটের উপর নেই। পাঁচ সাতজনের থাকার মতো ইঁটের একখানি ঘর খাড়া করা হলেও তাতে বিশ্রামের ব্যবস্থা লেশমাত্র নজরে পড়ে না। দরজা-জানালা তো নেই-ই। এমনকি শ্মশানভূমির উপর দিয়ে কখনও কখনও চাষীদের ভোঁতা লাঙ্গলের ফাল চলে যায়।

অবিবাহিতরা সচরাচর ওখানে যায় না সময় কাটাতে। সাধারণত বিবাহিত পুরুষ ভক্তদের ওখানে আসা যাওয়া। তাদের মধ্যে আবার বয়স্কর সংখ্যাই বেশি। ওখানে গেলে সর্বপ্রথমে কপালে সিঁদুর টিকা ও হাতে একটু বাতাসা প্রসাদ দেওয়ার রীতি আছে। দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছুর নীরব সাক্ষী মা-চামুণ্ডা তলার বুড়ো বটগাছটা। এলাকার আদি গাছ বলতে এটাই। গুঁড়ি তার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কয়েকশো বছর থেকে সম্পূর্ণ ভর করে আছে শাখা প্রশাখা থেকে প্রসারিত অসংখ্য ঝুড়ির উপর। যেখানে বসে মহোৎসবের সেই মিলন মেলা। এখানকার ইতিহাস কমেডি নয়, ট্র্যাজেডি ভরা করুণ ইতিহাস—জীবন অধ্যায়ের চূড়ান্ত পূর্ণচ্ছেদ।



❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক।

গোরস্তানের ইতিবৃত্তে কান্দরা

শামসুদ্দিন আহাম্মদ

ঐ মহামৌনে ভূমি আঁধার বিবর
হোথা চির নিদ্রাবৃত কত নারীনর
দেনা-পাওনার হাট করি সমাপন
নীরবে বেঁধেছে বাসা কত প্রিয়জন
নাই-নাই-নাই কারো স্বপ্ন রঙীন
কালের বন্ধন ছেদি মহাকালে লীন
স্নেহের বাঁধন নাই ছিন্ন প্রেমডোর
ইতি টানি দিল ঐ মহামৌন গোর।

প্রসঙ্গ যখন কবর তখন জানা প্রয়োজন যে 'কবর' শব্দের অর্থ কী? কখন হতে এই কবর দেওয়ার বা দাফন করার প্রথা শুরু। পবিত্র মহাগ্রন্থ কোরান মজিদে'এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। কবর হল একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল প্রোথিত করা। আদি পিতা আদমের (সঃ) দুই পুত্র এবং এক কন্যার মধ্যে ত্রিকোণ প্রেম হতে দু-ভাইয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার শুরু হয়। ফলে উভয়ের অন্তরে জিঘাংসার উদ্রেক করে। সুযোগমতো একদিন জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাবিল কনিষ্ঠভ্রাতা কাবিলাকে হত্যা করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হাবিলের পক্ষে একা কাবিলের লাশ গোপন করার সমস্যা দেখা দেয়। তখন মহান আল্লার নির্দেশে কাকরূপে দুই ফেরেশতা সেখানে হাজির হয় এবং পরস্পরের মধ্যে মারামারি শুরু করে দেয়। ফলে একটি কাক মারা যায়। ঘাতক কাকটি তার চঞ্চু দিয়ে মাটি খুঁড়ে বেশ বড় একটি গর্ত তৈরি করে নিহত কাকটিকে ওই গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দিয়ে প্রমাণ লোপাট করে। হাবিল আগাগোড়া ঘটনাটি লক্ষ করে এবং নিহত ভায়ের মৃতদেহটি অনুরূপভাবে মাটি চাপা দিয়ে উদ্ভূত সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। সেকাল হতেই শুরু হয় গেল প্রিযজনের শেষ-শয্যাদানের প্রক্রিয়াটি।

যে গ্রামের কোনো এক গোরস্থানের সবুজ-কোমল তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর বসে কবর প্রসঙ্গে যখন কিছু লিখছি তখন সেই গ্রামের কবরস্থান সম্বন্ধে কিছু লেখা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। গ্রাম কান্দরা। কে কখন এই গ্রামটির পত্তন করেন তার সঠিক তথ্য আমার জানা নেই। তবে গ্রামটি যে সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সে বিষয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। গ্রাম-সদৃশ পাঁচটি বৃহৎ মহল্লা যোগে গ্রামটি গঠিত। প্রত্যেকটি মহল্লা সন্নিহিত কবরস্থানগুলি প্রত্যক্ষ করলে এর সত্যতা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

গ্রামটির অন্যতম মহল্লা মিস্ত্রীপাড়া এলাকাভুক্ত এক ঐতিহ্যবাহী মাজার আপন মহিমায়

বিদ্যমান। মাজারটির নাম মুলতানি সাহেবের মাজার। সুবিশাল এক তেঁতুলগাছের নীচে সৌধহীন বাঁধানো কবরের নিকটবর্তী হলে অনেকের অন্তরে এক ঐশ্বরিক এবং স্বর্গীয় চেতনার উদ্রেক করে। আনুমানিক সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে কাবুলের মুলতান হতে দুজন দরবেশ-ভ্রাতা ভারতে আসেন। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ শেষে তারা বঙ্গভূমির দুটি প্রত্যন্ত গ্রামকে সাধনক্ষেত্রের উপযোগী বলে গ্রহণ করেন। একটির নাম হল কান্দবা অন্যটি হল হামিদহাটি পিলখুণ্ডি। মুলতান হতে আগত এই সাধক দুইভায়ের অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড আজ লোকমুখে ফেরে। হামিদহাটিতে যে তাপস আস্তানা গ্রহণ করেন তাঁর তিরোভাবের পর বহু ভক্তজন মিলিতভাবে কবরটি বাঁধিয়ে দেন এবং চৌহদ্দিতে পাঁচিল তুলে মাজারটি সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। অদ্যাবধি প্রতিবৎসর ওই মাজার প্রাঙ্গণে উরস্ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বহু বাউল, ফকির এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে অসংখ্য ভক্তের সমাগমে ওই মাজার প্রাঙ্গণ এক বিশেষমাত্রা লাভ করে। উরস্ পর্বকে উপলক্ষ করে এক বিরাট মেলারও আয়োজন করা হয়।

এবা আসা যাক দ্বিতীয় তাপসের প্রসঙ্গে যাঁর মাজার অদ্যাবধি কান্দরা মিস্ত্রীপাড়ার দক্ষিণ প্রান্তে অটুট রয়েছে। তাপসের নাম সুফী শাহ সানাউল্লাহ। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য এলাকাস্থ মানুষজন তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করে চলতেন। তাঁর প্রয়াণের পর খাদেমগণ তাঁর মাজারটিকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। খাদেম গোষ্ঠীর বংশধরগণ এখনও ওই মাজারটির প্রতি বিশেষ যত্নবান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে মালিহাটি এবং কান্দরা দুটি অচ্ছেদ্য গ্রাম। ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে মালিহাটি গ্রামটি বৈষ্ণব সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয়। ওই সময় মালিহাটির কৃতি সন্তান শ্রীরাধামোহন ঠাকুর (জন্ম-১৬৯৮ খ্রি.) যিনি ছিলেন বৈষ্ণব পদকর্তা এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিতের অধিকারী তাঁর সাথে সমকালীন দক্ষিণখণ্ড নিবাসী শ্রীদ্বারিকানাথ দেবতপস্বী এবং সানাউল্লাহ মুলতানী সাহেবের মধ্যে আধ্যাত্মিক যোগসূত্র ছিল। সমকালীন এই ত্রয়ীর জীবনাদর্শের মধ্যেই তা প্রতিফলিত। এঁরা তিনজনই ছিলেন অতীন্দ্রিয় সত্তার অধিকারী। আজও এঁরা প্রাতঃস্মরণীয়। সুফি সাহেবের মাজারে এখনও বিশ্বাসীরা মনস্কামনা পূরণের জন্য বৃহস্পতিবার দিবাগতে সাদিয়ানাসহ সিন্নি দিতে আসেন।

এ গ্রামের কমবেশি অন্যান্য পঞ্চাশটি সমাধিক্ষেত্রে অনেক জ্ঞানীগুণি ও তাপস চিরশান্তিতে সমাহিত আছে। মিস্ত্রীপাড়া ছাড়াও পাঠানপাড়া, দুর্লভপুর, নওদাপাড়া ডাঙাপাড়ার গোরস্থানগুলি সুপ্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী। কিন্তু পরিতাপের কথা এই যে এই ভোগবাদের দুনিয়ায় চলমান জীবনধারায় সকলেই কর্মব্যস্ত। প্রিয়জনেরা যে কবরের মধ্যে শায়িত আছেন সেই কবরগুলিকে আমরা যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন বা সুরক্ষার ক্ষেত্রে উদাসীন। সাড়ে তিনহাত গভীর স্বল্প পরিসর কবরে কফিনসহ প্রিয়জনকে রেখে কবরের উপর বাঁশের টোটা বিছিয়ে বা তক্তা ঢেকে কর্দমাক্ত মৃত্তিকার একটি ছোট টিলা তৈরি করে আমরা কর্তব্য সম্পাদন করি। যে কবর সংবেদনশীল মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, যে কবর পারলৌকিক জীবনের ইঙ্গিতবহ সেই কবর কতভাবে উপেক্ষিত।

পরিসংখ্যানের দিক হতে কান্দরা গ্রামের কবরস্থানের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। পাড়ায় পাড়ায় স্থান

সঙ্কুলানের অভাবহেতু অনেক প্রাচীন কবরস্থান বর্তমানে পরিত্যক্ত। ব্যবহৃত কবরস্থানগুলি নিম্নরূপ—মিস্ত্রীপাড়া-১৫+১, পাঠানপাড়া, দুর্লভপুর ১৪ ডাঙাপাড়া ৮+২ নওদাপাড়া ৮+৪ কবরস্থানগুলির অবস্থিতি যথা দাগনম্বর ও খতিয়ান নম্বর নং সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে সব কটি গোরস্থান কান্দরা মৌজাস্থ।

যে কবর অমোঘ, প্রবাহমান কালস্রোতে বিশ্বাব্যাপী প্রতি নিয়ত চলছে যার সৃজনশীলা, কালের তরঙ্গাঘাতে অলক্ষে চলছে তার বিলুপ্ত সাধন। মানুষের দেহান্তরিত মৃত্তিকা মানুষের অবয়ব তৈরির অন্যতম উপাদান আর সেই অবয়বের মধ্যে উপাদানহীন আত্মার সাময়িক অধিবাস। পরে বিশ্ব নিয়ন্ত্রার নির্দেশে নিয়ে যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড। তবুও প্রিয়জনের মরদেহের উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধ অন্তত প্রেমের স্মারকরূপে আজও মহিমান্বিত।



একটি সাধারণ কবরখানা, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দরা গ্রামে। ছবি : আমিনুল হক।

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক।

সম্প্রীতির সুরে বাঁধা আজিমগঞ্জ শ্মশান

উমেশকান্ত মণ্ডল

"এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই"
(হিন্দু মুসলমান - কাজী নজরুল ইসলাম)

* * * * *

"এই তো জীবন
হিংসা বিবাদ লোভ
হোকনিঃশেষ
চিতাতেই সব শেষ" (চিত্রগীতি)

জন্ম ও মৃত্যু। জন্ম না হলে মৃত্যু সম্ভব নয়, কিন্তু জন্মের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু। মৃত্যু হল একটি জীবনের সমাপ্তি। মৃত্যুর পর কী! মৃত্যু কোথায় নিয়ে যায় আমাদের? মিশরীয় ফারাওরা মনে করতেন মৃত্যুর পর আর একটি জীবন শুরু হয়। তাঁদের বিশ্বাস ছিল মৃত ব্যক্তির দেহ যতদিন অবিকৃত থাকবে ততদিন তারা মৃত্যুর পর যে জীবন—সেই জীবন অতিবাহিত করবে। তাই তাদের জমি তৈরির পিছনে রাজকোষ শূন্য হয়ে যেত। শবদেহ অনেকদিন অবিকৃত রাখার এ একটি প্রতিযোগিতা।

মৃতদেহ সৎকারের জন্য তৈরি আজিমগঞ্জ পুরসভার অধীনস্ত আজিমগঞ্জ শ্মশান বহু প্রাচীন। শতাব্দী প্রাচীন এই পুরসভার বয়সও শতাব্দী অতিক্রম করেছে। আজিমগঞ্জ শ্মশানটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই শ্মশান এলাকায় রয়েছে একটি গোরস্থান। যদিও ভাগীরথীর নদীর ভাঙনে তার অবস্থা বর্তমানে বিপন্ন। অন্তিম যাত্রায় মানুষের শেষ আশ্রয় একই সঙ্গে 'শ্মশান ও গোরস্থান'।

নদীর তীর থেকে দু-বিঘা জমি জুড়ে রয়েছে আজিমগঞ্জ শ্মশান। ১৮৯৮ সালে শ্মশানটির সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কথিত আছে ১৮৯৭ সালে ম্যালেরিয়ায় আজিমগঞ্জ এবং সান্নিহিত অঞ্চলের বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। সেই সময় ভাগীরথী নদী খুব ক্ষীণ প্রবহমান ছিল। অস্তিত্ব বিপন্ন মানুষ ভাগীরথীর তীর বরাবর বহু মৃতদেহ ফেলে রেখে চলে যায়। পরিবেশ খুব অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। তখন জমিদার রায়বাহাদুরের চেষ্টায়, লোকালয় থেকে দূরে (বর্তমানে আজিমগঞ্জ রেল স্টেশনের কাছে) একটি জায়গাকে শ্মশান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। গোরস্থানটি ছিল বহু প্রাচীন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী যখন মুর্শিদাবাদ ছিল তখন এর সূচনা হয়েছিল

বলে কেউ কেউ অনুমান করেন।

বর্তমানে আজিমগঞ্জ শ্মশানটিকে কোনোভাবেই আধুনিক শ্মশানের তালিকায় রাখা যায় না। এখানে কোনো বৈদ্যুতিক চুল্লি নেই। রাতে যে সমস্ত শবদাহ হতে আসে তাদের বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। শ্মশানে বৈদ্যুতিক খুঁটি থাকলেও জোরালো কোনো আলোর ব্যবস্থা না থাকায় শ্মশানটি অসামাজিক লোকেদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। শ্মশানটি এখন পুরসভা 'ডাকে' দিয়ে দেয়। ফলে যে 'লিজ' নেয়, তার কাছ থেকেই মৃত ব্যক্তির পুড়ে যাওয়ার নথি পাওয়া যায়।

আজিমগঞ্জ শ্মশানে রয়েছে প্রাচীন কালীমন্দির। দেবী শ্মশানকালীর আরাধনা এখানে হয়ে থাকে। তান্ত্রিক কালিকা সিং ও বি.এন.দাস এই শ্মশানে শব সাধনার দৃষ্টান্ত রেখেছেন। দিনে গড়ে একটি শব এখানে দাহ হয়। সাফল্য-ব্যর্থতা কীর্তি-অপকীর্তি, হিংসা-বিবাদ-লোভ দিয়ে তৈরি যে জীবন তা শেষ পর্যন্ত চিতায় এসে শেষ হয়ে যায়। আর বাঙালির মতো ভাগ্যহীন মানুষ ভাগীরথীর তীরে আকাশের দিকে উড়ে যাওয়া ধোঁয়ায় দেখার চেষ্টা করে স্বর্গ থেকে কোনো রথ নেমে আসছে কিনা।



জগদীশপুর শতমুখী শ্মশান, উলুবেড়িয়া। ছবি : শ্যামল মান্না

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক।

শিমুলতলা শ্মশান ও লোকজীবন

প্রসাদ মান্না

শ্মশানের নাম : শিমুলতলা শ্মশান। অবস্থান হ'ল হাওড়া জেলার, উলুবেড়িয়া মহকুমার, উলুবেড়িয়া থানার, উলুবেড়িয়া-২নং ব্লকের, বাণীবন গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বৃন্দাবনপুর গ্রামে। বৃন্দাবনপুর একটি গ্রাম এবং মৌজাও বটে। থানাওয়ারী জুরিসডিকশন্ লিস্ট নম্বর, সংক্ষেপে জে.এল.নং-৯০। শিমুলতলা শ্মশানের জমির পরিমান আনুমানিক ছয় বিঘা বা দুইশত শতকের মত। শ্মশানের দাগ নং-৩০১০। ৩২২০। ৩২২১। ৪২৫৯। ৪২৬০। ৪২৬৩। ৪২৬৪। ৪২৬৬ প্রভৃতি। শ্মশানের ভূখণ্ডটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত ও উত্তর দিকে সংকীর্ণ। একদা শ্মশানে অবস্থিত বৃক্ষকুলের মধ্যে শিমুলগাছের আধিক্য থেকেই শ্মশানের নাম 'শিমুলতলা শ্মশান' হয়েছে বলে জানা যায়।

আদিপর্বে অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তীকালে শিমুলতলা শ্মশান ছিল খানা-খন্দে ভরা, জল-জঙ্গলে ভরা, ভূতের গল্পে ভরা ভয়ঙ্কর এক স্থান। তার জঙ্গল জুড়ে ছিল শিমুল বট, অশ্বত্থ, অর্জুন, তেঁতুল, খেজুর, শেয়াকুল, বুঁচ, নাটাকাঁটা প্রভৃতি বৃক্ষ, গাছপালা ও লতাপাতা। জল জুড়ে ছিল কচুরীপানা, কলমিদাম, শালুক। আর খালের ধারে জুড়ে ছিল গভীর হরগোজা বন। জঙ্গলে বসবাস করত শিয়াল, খেঁক্শিয়াল, বনবিড়াল, খরগোস, শজারু, ভাম, গোসাপ প্রভৃতি। গাছপালায় বসবাস করত পেঁচা ও রকমারি পাখি। আর, খালের জলে জন্মাত রকমারি মাছ। মানুষের বসবাস ছিল শ্মশান থেকে অনেক দূরে।

শিমুলতলা শ্মশানের আদিপর্বের কথা প্রসঙ্গে শ্মশানের পূর্বদিকে অবস্থিত 'শিমুলতলা খাল' নামক খালটির কথাও উল্লেখ করা যায়। খালটির দাগ নং হল-৪২৬৬। একদা শিমুলগাছের আধিক্য থেকে যেমন শ্মশানের নাম হয়েছে শিমুলতলা শ্মশান, তেমনি শ্মশানের নামানুসারে খালটির নাম হয়েছে শিমুলতলা খাল। খালটিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি ভূতের গল্প প্রচলিত আছে।

বর্তমানের শিমুলতলা খাল—অতীতের কানানদীর একটি শাখা। এখনও প্রাচীনেরা শিমুলতলা খালটিকে শাখা কানানদী বলে থাকে। আর সেকথার সমর্থনও পাওয়া যায়। ''হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি'' গ্রন্থের ভূমিকায় তারাপদ সাঁতরা লিখেছেন—''দামোদর তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাসহ প্রবাহ পরিবর্তন করেছে সবচেয়ে বেশি। কানা নদী, কানা-দামোদর বা কৌশিকী, মাদারিয়া খাল, রাজাপুর-সিজবেড়িয়া খাল, বাঁশপাতি খাল প্রভৃতি দামোদরের পরিত্যক্ত খাত-মাত্র।''

তাই আমরা একরকম নিশ্চিত হতে পারি যে, দামোদর পরিত্যক্ত খাত কানা নদী তার শাখা বিস্তার করে শাখা কানা নদী হয়েছে ও সেই কানা নদী বর্তমানে শিমুলতলা খাল হয়েছে। শিমুলতলা শ্মশান সংলগ্ন শিমুলতলা খালের উত্তর দিকের অংশটি যে অতীতের শাখা কানা নদীর একটি দহ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, শিমুলতলা খালটি রাজাপুর-সিজবেড়িয়া খালের সঙ্গে যুক্ত ও রাজাপুর-সিজবেড়িয়া খালটি হুগলি নদীর সঙ্গে যুক্ত।

শিমুলতলা শ্মশানে বিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে। ঐ সময় গ্রামের কিছু উৎসাহী যুবক শিমুলতলা শ্মশানের পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ ৪২৫৯ নং দাগের অংশটি খানা-খন্দ ভরাট করে বনজঙ্গল পরিস্কার করে ও বয়সের ভারে জরাজীর্ণ কয়েকটি বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ অপসারিত করে ৯০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৬০ ফুট প্রস্থ মাপের একটি ফুটবল মাঠ তৈরি করে ফুটবল খেলা শুরু করে। তাদের টিম বা দলের নামকরণ করা হয় "মাদার ইন্ডিয়া ফুটবল ক্লাব"। এটাই হল এতদ অঞ্চলের সর্বপ্রথম খেলাধূলার প্রতিষ্ঠান।

ঐসব যুবকদের উৎসাহ দেখে গ্রামের মানুষও উৎসাহী হয়ে তাদের সঙ্গে যোগদান করেন। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মাদার ইন্ডিয়া ফুটবল ক্লাবের পরিচালনায় এই মাঠে দু'টি প্রতিযোগিতামূলক 'কাপ'-এর খেলা হয়। পরের বৎসব অর্থাৎ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় "মাদার ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ শীল্ড" নামে একটি প্রতিযোগিতামূলক শীল্ডের খেলা। এই শীল্ডের খেলাকে কেন্দ্র করে মাদার ইন্ডিয়া ফুটবল মাঠে যে সব নামী ফুটবল খেলোয়াড়গণ ফুটবল খেলতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে গগলভাই জুট মিলের (বর্তমানের কানোরিয়া) ম্যানেজার কেকি সাহেব, রতন সেন, (মোহনবাগান), এস, গড়গড়ি, (উয়াড়ী) নির্মল ঘোষ, (উয়াড়ী) বিনয় পাঁজা (মোহনবাগান) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়া যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলার অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক, উলুবেড়িয়া অঞ্চল উন্নয়ন আধিকারিক, উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যক্ষ হরিপদ ঘোষাল, উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক অরুণ দাশগুপ্ত প্রমুখের নামও উল্লেখ করা যায়। এখন আর মাদার ইন্ডিয়া শীল্ডের খেলা হয় না। তবে পরম্পরায় মাদার ইন্ডিয়া ফুটবল ক্লাবটি এখনও আছে ও মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণে নব নির্মিত ক্লাব ঘরটি অবস্থিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত স্থানটিতে শবদাহ করা হত। এখনও চিতার নিদর্শন আছে। তবে গ্রামের যুবকেরা ঐ অংশটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফুটবল খেলা শুরু করার পর থেকে কেউ ঐ স্থানটিতে শবদাহ করত না ও এখনও করে না।

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের (১৯৪২ খ্রিঃ) ঘূর্ণিঝড়ে শিমুলতলা শ্মশানের অধিকাংশ বৃক্ষ ও গাছপালা আশিকড় উপড়ে পড়ে। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৩৫০ বঙ্গাব্দে (১৯৪৩ খ্রিঃ) বৃন্দাবনপুর গ্রামে 'প্রসন্ন আশ্রম' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। সেই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ

শিমুলতলা শ্মশানএর অবশিষ্ট বন-জঙ্গলও উচ্ছেদ করেছিলেন।

এইভাবে একদিন যে শিমুলতলা শ্মশান খানা-খন্দে ভরা, বন-জঙ্গলে ভরা ও নানারকমের পশু-পাখিতে ভরা ছিল—সেই শিমুলতলা শ্মশান একটি সমতল ও ধু-ধু শ্মশানে রূপান্তরিত হয়। সেই সুবাদে ও জনবিস্ফোরণে মানুষের বসবাস ক্রমশঃ করে এগিয়ে আসতে আসতে এখন শ্মশানের সীমান্ত ছুঁয়ে গেছে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন, এতদ অঞ্চলের একমাত্র ও বৃহৎ জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই শিমুলতলা শ্মশান মাঠে। সভা শেষে এক বিশাল শোভাযাত্রা শিমুলতলা শ্মশান থেকে হাতিমাড়ানের পথ দিয়ে উলুবেড়িয়া মহকুমা শহরের তৎকালীন 'পোড়ামাঠ' নামে পরিচিত মাঠটি পরিক্রমা করে বাণীবনের উত্তর-পীরপুর গ্রামের দুর্গা প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনপুর গ্রামের এক ধর্মপ্রাণ দম্পতি শিমুলতলা শ্মশান মাঠে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের একটি বৈশাখী রথ উৎসর্গ করে বৈশাখী রথযাত্রা ও উল্টো রথযাত্রা উৎসবের সূচনা করেন। প্রথম যে রথটি উৎসর্গ করা হয়েছিল, সেই রথটি ছিল লোহার চাকা ও টিনের আচ্ছাদন যুক্ত। আচ্ছাদনে চিত্রিত করা হয়েছিল দেবদেবীদের লীলাপ্রসঙ্গ। কালক্রমে সেই রথটি জীর্ণ হয়ে গেলে তার পরিবর্তে উক্ত দম্পতির উত্তরাধিকারী একটি দারু নির্মিত কারুকার্যময় রথ উৎসর্গ করেন। এখন এই রথটি টেনেই রথযাত্রা ও উল্টো রথযাত্রা উৎসব হয় ও উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা হয়। মেলায় লোক সমাগম হয়, দোকানপাট হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে শিমুলতলা শ্মশানের ৩২২০ দাগের এক পাশ দিয়ে রথ টানা হয় ও উক্ত দাগের উত্তর প্রান্তে রথঘরটি অবস্থিত।

শিমুলতলা শ্মশানের অনতিদূরে অর্থাৎ বৃন্দাবনপুর গ্রামর পূর্বপাড়ায় 'প্রসন্ন আশ্রম' গৃহে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'বৃন্দাবনপুর পূর্ব নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় চালু হয়। গ্রামের যে সমাজসেবক ঐ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি ঐ বিদ্যালয়ের স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য শিমুলতলা শ্মশান সংলগ্ন তাঁর নিজস্ব জমি হাওড়া জেলা স্কুল বোর্ডকে অর্পণ করেন ও তাঁরই প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত তৎকালীন সময়ে আনুমানিক ২৫০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঐ স্থানে একটি বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়। কিন্তু প্রসন্ন আশ্রম গৃহ থেকে বিদ্যালয়টিকে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে প্রবল বাধার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ শ্মশানের বিদ্যালয়ে গেলে তাঁদের ছেলেমেয়েদের গায়ে অপদেবতার বাতাস লাগবে বা নজর লাগবে এই সংস্কারবশতঃ কোন অভিভাবকই তাঁদের ছেলেমেয়েদের শ্মশানের বিদ্যালয়ে পাঠাতে রাজি নয়। তাই বিদ্যালয়টি যথাস্থানে অর্থাৎ প্রসন্ন আশ্রম গৃহেই থেকে যায়। তারপর শিমুলতলা শ্মশান সংলগ্ন নব নির্মিত বিদ্যালয় ভবনটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে জীর্ণ

৩০/৩৫ বৎসর পর ধ্বংস হয়ে যায়।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'বাণীবন চক্র' অর্থাৎ বাণীবন সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসর এই শিমুলতলা শ্মশান মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাণীবন চক্রের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মাঝে মাঝে অন্যান্য মাঠে হলেও বাণীবন গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্বভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শিমুলতলা শ্মশান মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়।

জন বিস্ফোরণে মানুষের বসবাস যে ক্রমশঃ করে শিমুলতলা শ্মশানের সীমান্ত ছুঁয়ে গেছে সে কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। সে কারণে শিমুলতলা শ্মশানভূমির উপর শুরু হয় আগ্রাসন ও নানা রকমের উপদ্রব। সেইসব আগ্রাসন ও উপদ্রবকে প্রতিরোধ করতে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে "বৃন্দাবনপুর শিমুলতলা শ্মশান সুরক্ষা ও উন্নয়ন সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। সেই থেকে শিমুলতলা শ্মশান সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের তদারকি এই সমিতি করে থাকে। বর্তমানে এই সমিতির উদ্যোগে প্রায় ৮০,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে শ্মশানযাত্রীদের জন্য ২৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২৫ ফুট প্রস্থ ও ২.৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট টিনের ছাউনিযুক্ত একটি চারচালা ও শবদেহ রাখার জন্য ৬ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩ ফুট প্রস্থ ও ২.৫ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বেদী নির্মাণ করা হয়েছে ও শ্মশান জুড়ে নানা রকমের বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সমিতি গঠন হওয়ার পরবর্তীকাল থেকে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১৫ বৎসরকাল কার্ত্তিকী অমাবস্যার রাত্রিতে অর্থাৎ কালীপূজার দিনে শিমুলতলা শ্মশানে একটি কালীপূজা হয়ে থাকে।

শ্মশান আছে। ভূত, প্রেত, শাঁখচুন্নী নেই এমন হতে পারে না। শিমুলতলা শ্মশানকে কেন্দ্র করেও অনেক ভূত, প্রেত, শাঁখচুন্নীর গল্প বা ভূতের গল্প প্রচলিত আছে। আবার অনেক সত্য ঘটনা আছে যা গল্পের মত বা ভূতের গল্পের মত শোনায়। এছাড়া বিলুপ্ত ও বর্তমান কিছু ধর্মাচার ও লোকাচারও আছে। সে সব কথা একটি একটি করে উল্লেখ করা হ'ল।

কলসিতে কলসিতে ঠোকাঠুকি :

শবদাহ শেষ হওয়ার পর যে মাটির কলসি করে জল ঢেলে চিতা নেভানো হয়, শ্মশান যাত্রীরা বাড়ি ফেরার সময় সেই কলসিটা, যে দিকে মাথা রেখে শবদাহ করা হয়েছিল চিতার সেই দিকে রেখে কোদালের বাট দিয়ে তার কানা ভেঙ্গে দিয়ে আসে। পরে নাকি শ্মশানে সেই সব কলসির চিহ্নমাত্র থাকে না। কিন্তু রাত্রিকালে বা শুনশান দুপুরবেলায় শিমুলতলা শ্মশানে কলসিতে কলসিতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে এমন শব্দ নাকি শোনা যায়। এটি প্রচলিত একটি ভূতের গল্প।

খালের জলে ছেলে ভূতেদের সাঁতার :

শিমুলতলা শ্মশানের কাছাকাছি বসবাসকারী পরিবারের প্রৌঢ়া মহিলারা শিমুলতলা শ্মশান

মাঠে সকালবেলায় গোরু-বাছুর বেঁধে দিয়ে আসত। দুপুরবেলায় সেই গোরু-বাছুর ঘরে নিয়ে আসার সময় দেখত এক দঙ্গল ছেলে শিমুলতলা শ্মশান সংলগ্ন শিমুলতলা খালের জলে সাঁতার কাটছে। কাদের ছেলেরা সব সাঁতার কাটছে দেখার জন্য খালের ধারে যেয়ে তারা আর কিছুই দেখতে পেত না। খালের জল যেমন থাকে তেমনি আছে। এমন দৃশ্য নাকি অনেক মহিলাই দেখেছেন। এটিও একটি ভূতের গল্প হিসাবে প্রচলিত।

মাছ কুড়ানি শাঁখচুন্নী :

শিমুলতলা শ্মশান সংলগ্ন শিমুলতলা খাল জমিদারের একটি 'জলকর' ছিল। সেই জলকর বিলি বন্দোবস্ত করে জমিদার প্রচুর পরিমান কর পেতেন। সে কারণে খালের জল ব্যবহার করতে পারলেও কেউ মাছ ধরতে পারত না। তা সত্ত্বেও অনেকে রাত্রিতে বা ভোরবেলায় লুকিয়ে চুরিয়ে মাছ ধরত। এমনি এক মাছধরা একদিন ভোরে খালে জাল ফেলতেই জালে প্রচুর মাছ পড়ল। মাছ সমেত জাল ডাঙ্গায় তুলে যখন ঝাড়তে গেল, তখন দেখল তার ১০/১২ বছরের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে সেই মাছধরা বলল, 'তুই আবাব কখন্ এলি?' মেয়েটি বলল, তুমি যখন মাছ ধরতে এলে তখনই আমি তোমার পিছনে পিছনে এসেছি। তখন সেই মাছধরা বলল, 'এসেছিস ভালই করেছিস। আজ খুব মাছ পড়ছে, আমি মাছ ধরি তুই মাছ কুড়িয়ে খালুই-এ রাখ।' সেদিন সেই মাছধরা যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে মাছ ধরছিল। কখন যে পূর্বদিক ফরসা হয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসার সময় মেয়েকে বলতে যায়, 'তুই খালুই নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আয়, কেউ দেখে ফেললে বিপদ।' কিন্তু কোথায় কে? মেয়ে নেই—শূন্য খালুই পড়ে আছে। তখন সে বুঝতে পারে এতক্ষণ তার মেয়ের রূপ ধরে যে মাছ কুড়চ্ছিল সে একটা শাঁখচুন্নি। শিমুলতলা শ্মশানকে কেন্দ্র করে প্রচলিত এটা হল আর একটি ভূতের গল্প।

জলসেচক ভূত :

এক ব্যক্তির শিমুলতলা শ্মশান সংলগ্ন নিজস্ব একটি সবজি খেত ছিল। শিমুলতলা শ্মশানের উপর দিয়ে নালা কেটে, সেই নালা দিয়ে শিমুলতলা খাল থেকে সিউনী করে জল সেচন করে ঐ ব্যক্তি তার সবজি খেতে সেচ দিত। তখন চাষীরা খেতে সেচ দিত ভোরবেলায়। সেই মত এক সেচ দেওয়ার দিন ঐ ব্যক্তি খুব ভোরে উঠে এক ছিলিম তামাক খেয়ে ও আবার তামাক খাওয়া জন্য হুঁকো-কলকে ও জল সেচনের সিউনী নিয়ে—সেচন সঙ্গী তার ভাইকে জল সেচন করতে যাওয়ার জন্য ডেকে শিমুলতলা খালের ধারে সেচ দেওয়ার জায়গায় এসে হাজির হয়। ঐদিন তার ভাই 'যাচ্ছি' বলে সাড়া দিয়েও আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর, তার ভাইয়ের রূপধারণ করে এসে এক ভূত নাকি তার সঙ্গে জল সেচন করেছিল।

শিমুলতলা শ্মশানকে কেন্দ্র করে এটিও একটি বহুল প্রচলিত ভূতের গল্প।

প্রেতের যজ্ঞ চরু ভক্ষন :

শিমুলতলা শ্মশানের কাছাকাছি বসবাসকারী এক পরিবারের এক বয়স্ক ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় পঞ্জিকার নির্ঘন্ট অনুসারে নানাবিধ দোষপ্রাপ্ত হয়। সেই দোষ কাটাতে ঐ পরিবারের কুলগুরু এক অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে অর্থাৎ রাত ১২টার পর মৃত ব্যক্তির চিতাস্থলে এক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী ঐ পরিবারের এক ব্যক্তির জবানীতে জানা যায়, এই যজ্ঞ ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। ঐ পরিবারের লোকজন ছাড়া অন্য মানুষ তো দূরের কথা একটি কাক-পক্ষীও যেন টের না পায়। এই যজ্ঞে ৬জন ব্রাহ্মণ ও ১জন আচার্য ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করেন। যজ্ঞের দিন অগ্নিকর্তাকে হবিষ্যি করতে হয়েছিল ও পরিবারের অন্যান্যদের নিরামিষ পালন করতে হয়েছিল। যজ্ঞস্থলে মহিলাদের উপস্থিতি বারণ ছিল। পুরুষদের মধ্যে যারা সাহসী তারাই শুধু উপস্থিত থাকতে পারে। যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণগণসহ যাবতীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত গোপনে কুলগুরু করেছিলেন। যজ্ঞের দিন কেউ কারোকে ডাকতে বা কিছু বলতে বা জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। রাত্রি ১২টার পর যার যা ভূমিকা পালন করতে যন্ত্রচালিতের মত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয় ও যজ্ঞ আরম্ভ হয়। যজ্ঞে অগ্নিকর্তাকে একটি মাগুর মাছ বলি দিতে হয়। তারপর যজ্ঞ সমাপন করে কুলগুরু যজ্ঞের চরু শত হাত দূরে একটা কলাব পাতায় রেখে আসেন। তার কিছুক্ষণ পরে আলো-আঁধারে দেখা গেল ভল্লুকের মত দেখতে কালোর রঙের একটা জন্তু এসে সেই চরু খেয়ে গেল। শিমুলতলা শ্মশানকে কেন্দ্র করে এটিও একটি ভূত-প্রেতের গল্পকথা হিসাবে প্রচলিত আছে।

জনৈক মহিলার নিরুদ্দেশ হওয়া :

শিমুলতলা শ্মশানের কাছাকাছি বসবাসকারী পরিবারগুলির প্রৌঢ়া মহিলাদের শিমুলতলা শ্মশান মাঠে গোরু বাঁধতে যাওয়ার কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এমন এক প্রৌঢ়া মহিলা একদিন সকালবেলায় শিমুলতলা শ্মশান মাঠে গোরু বাঁধতে গিয়ে এবং গোরু বেঁধে দিয়ে চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সাধারণ্যে শিমুলতলা শ্মশানকে কেন্দ্র করে এটিও একটি ভৌতিক ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বার বৎসর পর ঐ নিরুদ্দিষ্টা মহিলার শ্রাদ্ধশান্তি হয়।

মানুষ ভূতের কথা :

মানুষ ভূতের কথা একটি সত্য ঘটনা। আর, এই সত্য ঘটনাটি ঘটেছিল শিমুলতলা শ্মশানে। কোন এক শীতের পড়ন্ত বেলায় শ্মশানের কাছাকাছি বসবাসকারী একজন খোনা লোক (যে নাকিসুরে কথা বলে) শ্মশানে অবস্থিত একটি খেজুরগাছে উঠে রসের কলসি বাঁধার জন্য গাছকাটারি দিয়ে খেজুরগাছের মাথা চাঁচাছোলা করছিল। ঠিক সেই সময় তার পাশ দিয়ে অর্থাৎ

শ্মশানের মাঝ বরাবর রাস্তা দিয়ে উত্তরমুখে একজন লোক মিস্টির হাঁড়ি হাতে কুটুমবাড়ি যাচ্ছিল। ঠিক রাস্তায় যাচ্ছে কিনা তা জানার জন্য খেজুরগাছে উঠে গাছের মাথা চাঁচাছোলা করতে থাকা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল,- দাদা, ওমুক জায়গায় ওমুকের বাড়ি যাবো এই রাস্তাই তো? গাছ থেকে সেই খোনা লোকটি নাকিসুরে বলল, 'সোজা চলে যাও'। একে শ্মশান, তায় পড়ন্ত বেলা, আবার নাকিসুরে কথা। ও নিশ্চয় ভূত। এই ভেবে লোকটি শ্মশানে মিষ্টির হাঁড়ি রেখে জুতো হাতে নিয়ে পড়ি কি মরি করে দৌড়। খোনা লোকটি তখন বুঝতে পেরেছে ও ঠিক আমাকে ভূত ভেবেছে। তাই তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে মিষ্টির হাঁড়িটা নিয়ে তার পিছনে সেও ছুটতে ছুটতে নাকিসুরে বলছে—দাঁড়াও, আমি ভূত নয় মানুষ—আমি ভূত নয় মানুষ। ফল হল বিপরীত। লোকটি আরও ভয় পেয়ে প্রাণপন ছুটতে ছুটতে কাছে একটা বাড়ি দেখে সেখানে ভূত-ভূত বলে আছাড় খেয়ে পড়ল। বাড়ির লোক হতচকিত হয়ে তাকে ব্যজন করতে লাগল। এমন সময় মিষ্টির হাঁড়ি হাতে খোনা লোকটির প্রবেশ ও ঘটনাটির আনুপূর্বিক বর্ণনা। পরিশেষে মধুরেন সমাপয়েৎ। শিমুলতলা শ্মশানকে কেন্দ্র করে মানুষ ভূতের কথা একটি মজার ঘটনা হিসাবে বহুল প্রচারিত।

শ্মশানে বটবৃক্ষের তলায় দীপদান :

শিমুলতলা শ্মশানের কাছাকাছি বসবাসকারী জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী বিয়োগের পর প্রায় ২৫/৩০ বৎসরকাল শিমুলতলা শ্মশানে অবস্থিত এক প্রাচীন বটবৃক্ষতলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় দীপদান করে আসত।

শ্মশানে সন্তান রেখে যাওয়া :

এই ঘটনাটি ১৩৫০ বঙ্গাব্দের বঙ্গদেশব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়। যখন আপনি বাঁচার কাছে বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, সন্ততির কোনো খবর ছিল না। এমন এক হৃদয়হীন সময়ে কোনো মা তার সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে শিমুলতলা শ্মশান মাঠে শুইয়ে রেখে যায়। তখনও শিমুলতলা শ্মশানে বন-জঙ্গল ছিল, জন্তু-জানোয়ার ছিল। শুইয়ে রেখে যাওয়া সদ্যজাতকে মুখে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু 'রাখে হরি মারে কে'? সম্ভবতঃ কন্যা শিশুটিকে শুইয়ে রেখে যাওয়ার অল্পকাল পরেই, কাছাকাছি বসবাসকারী এক ব্যক্তি শ্মশানে যায় ও শুইয়ে রেখে যাওয়া শিশুটিকে দেখতে পায়। তারপর শিশুটি জীবিত আছে দেখে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে ও স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে আপন সন্তানের মত ঐ কন্যা সন্তানটিকে লালন পালন করে। তারপর বিবাহের বয়স হলে সুপাত্র দেখে তার বিবাহ দেয়।

বুড়িমার সমাধি :

এই ঘটনাটিও সত্য এবং নিজের চোখে দেখা। তবে কোন সালে ঘটেছিল তা আর স্মরণে নেই। ১লা মাঘ বাণীবন গ্রামে জঙ্গলবিলাস মেলায় ভিক্ষা করতে এসে মেলার কয়েকদিন পর

পির জঙ্গল বিলাসের মাজার নামক ইমারতটির সম্মুখের অনতিদূরে পরিত্যক্ত এক দোকান ঘরের বারান্দায় এক বুড়ি মারা যায়। যেহেতু মেলার এলাকার মধ্যে বুড়ি মারা গেছে, সেহেতু তাকে সৎকার করার দায় মেলা কর্তৃপক্ষের উপরই বর্তায়। কিন্তু মৃতা বুড়ি হিন্দু হওয়ায় মুসলমান মেলা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে বুড়িকে সৎকার করার অনুরোধ জানালেন। তারপর যেন এক ম্যাজিক ঘটে গেল। হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বাণীবন হাটের কয়েকজন দোকানদারের কাছ থেকে প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহ করে নতুন কাপড় ও সৎকারের জন্য যে সব সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তা কিনে নিয়ে একটি ট্রলি রিক্সায় বিছানা পেতে বুড়িমাকে শুইয়ে, ফুল, মালা, ধূপ প্রভৃতি দিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে এক দল শ্মশানযাত্রী বুড়িমাকে নিয়ে শিমুলতলা শ্মশানে আসে, যেন নিজেদেরই অতিবৃদ্ধা ঠাকুরমা মারা গেছে। তার পরে শ্মশানে বুড়িমাকে সমাধি দিয়ে আবার সব শ্মশানযাত্রীরা হৈ-হৈ করতে করতে ফিরে আসে। শিমুলতলা শ্মশানের ইতিহাসে এটিও একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেননা, বর্তমান সময়ে এমন কাজ করা তো দূরের কথা, এমন কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

মড়ে পোড়া বামুন :

এক সময় শ্মশানে শবদাহ বা মড়া পোড়ানোর আগে অগ্নিকর্তাকে শ্মশানে হাঁটুমুড়ে বসে মৃত বা মৃতার জন্য পাঁচকড়া কড়ি দিয়ে বসুমাতার কাছে চৌদ্দ পোয়া জমি প্রার্থনা করা ছাড়াও উপকরণ সহ মন্ত্র উচ্চারণ করে কিছু ধর্মীয় আচার পালন করতে হত। এই ধর্মীয় আচার পালনে পৌরহিত্য করতেন 'মড়ে পোড়া বামুন' বলে পরিচিত এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কোন লোক মারা গেলে যেমন সব আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি খবর পাঠান হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে মড়ে পোড়া বামুন বাড়িও খবর পাঠাতে হত। এখন এসব প্রথা লোপ পেয়ে গেছে। শুধু শিমুলতলা শ্মশান থেকে নয়—হয়ত সব শ্মশান থেকেই। তবে অগ্নিকর্তাকে শ্মশানে হাঁটমুড়ে বসে মৃত বা মৃতার জন্য পাঁচকড়া কড়ি দিয়ে বসুমাতার কাছে চৌদ্দপোয়া জমি প্রার্থনার প্রথাটি এখনও আছে। শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে যে প্রধান ব্যক্তি সেই এখন অগ্নিকর্তাকে দিয়ে এই প্রার্থনা করিয়ে থাকে।

ফুলঘর :

শিমুলতলা শ্মশানে বাবা-মা-এর চিতায় বিবাহিতা মেয়েদের ফুলঘর দেওয়ার রেওয়াজ আছে। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়, যাদের ইচ্ছা হয়—তারাই দিয়ে থাকে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরের দিন অর্থাৎ নিয়মভঙ্গের দিন প্রাতঃকালে ফুলঘর নিয়ে বিবাহিতা মেয়েরা ও তাদের সঙ্গে আরও অনেক মহিলা শ্মশানে যাওয়ার পথে খই ও পয়সা ছড়াতে ছড়াতে, শাঁখ, কাঁসর, ঘন্টা বাজাতে বাজাতে, হরিনাম সংকীর্তনের দলসহ শোভাযাত্রা করে শ্মশানে যায় ও বাবা-মা-এর চিতায় ফুলঘর দিয়ে আসে। কেউ কেউ আবার সঙ্গে কুলপুরোহিত নিয়ে যায় ও ঘটস্থাপন করে পূজা করে।

জনৈক ব্রাহ্মণের জবানীতে জানা যায়, চিতায় ফুলঘর দেওয়া কোন ধর্মীয় আচার নয়— এটি সম্পূর্ণরূপে একটি স্ত্রী আচার। চিতায় ফুল দিয়ে পূজা করারও কোন বিধি নেই। পূজা করলে শিষ্য বা যজমান সন্তুষ্ট হবে, এই কথা ভেবে অনেক ব্রাহ্মণ তাদের সঙ্গে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফুলঘর হল শোলা, কাগজ, বাখারি ও রঙ দিয়ে তৈরি এক রথ বিশেষ। এই রথ ১ ফুট থেকে ৫/৬ ফুট পর্যন্ত উচ্চ হয় ও উচ্চতার অনুসারে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হয়। মালাকার সম্প্রদায় এই ফুলঘর তৈরি করে থাকে। যে সব বিবাহিতা মেয়েরা দেয়, তাদের বিশ্বাস বাবা-মা-র চিতায় ফুলঘর দিলে তার বাবা-মা ফুলের রথে চেপে স্বর্গে যাবে।

স্মৃতিমঞ্চ :

শিমুলতলা শ্মশানে নতুন-পুরাতন ও ভাঙ্গাচোরা মিলিয়ে ৮/১০টি স্মৃতিমঞ্চ আছে।

শ্মশানঘাট :

শিমুলতলা শ্মশানের যে স্থানটিতে শ্মশানযাত্রীদের জন্য চারচালাটি নির্মিত হয়েছে, তার লাগোয়া শিমুলতলা খালে একটি পাকা ঘাট নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা যায়।

শিমুলতলা শ্মশানের কথাপ্রসঙ্গে যেসব কথার উল্লেখ করা হ'ল, তার মধ্যে থেকে কি কি বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় তা খুঁজে দেখার দায়িত্ব পাঠকবর্গের। পরিশেষে জানাই শ্মশান হ'ল শিবের বাসস্থান। শিব হল বিশ্বের আদি বীজ, সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিয়ামক। শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিবের বন্দনায় লিখেছেন :

"সিন্ধু কালি পত্র ক্ষিতি চির লিখে সরস্বতী
তবু অন্ত না পায় মহিমা।"

"অর্থাৎ সমুদ্র যদি লেখার কালি হয়, পৃথিবী যদি লেখার পত্র হয় এবং স্বয়ং দেবী সরস্বতী যদি চিরকাল ধরেও লিখে যান, তবু শিবের মহিমা লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। শিব মহিমা এমনই অনন্ত, অসীম।"

অনুরূপভাবে শিবের বাসস্থান শ্মশানের কথাও অনন্ত, অসীম, তা লিখে শেষ করা সম্ভব নয়।

উল্লেখপঞ্জী :

হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি/তারাপদ সাঁতরা/১৯৭৬
উদ্বোধন/শারদীয়া সংখ্যা/১৪১০
কৃতজ্ঞতা : হীবালাল দাস

❑ লেখক পরিচিতি : প্রবীণ গবেষক, প্রাবন্ধিক।

জগদীশপুর শতমুখী শ্মশান

শ্যামল মান্না

১

কথিত আছে গঙ্গার পশ্চিমতীর বারানসীসম এবং সেখানে শবদাহ হলে মানুষ শান্তি পায়। জগদীশপুর শতমুখী শ্মশান উলুবেড়িয়া পৌরসভার অন্তর্গত হাওড়া জেলার এক বিখ্যাত শ্মশানভূমি। শ্মশানের সামনে দিয়ে গঙ্গানদীর শাখানদী ভাগীরথী বা হুগলী নদী বয়ে চলেছে।

কত মানুষ তাদের পরিজনদের শবদাহ সৎকার করতে এই শ্মশানভূমিতে আসে। কেউ কেউ গঙ্গার মাটিতে তাদের আত্মীয়দের শবদেহ সমাধি দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে চায়। পলিতে ভরা গঙ্গার তীরভূমিতে দাহ চলত কয়েকশো বছর আগে থেকে। বারবার নদী ভাঙ্গনে তৈরি হলো বাঁধ। বাঁধের পূর্ব গা থেকে সরে গিয়ে পশ্চিম গায়ে গড়ে উঠল শতমুখী শ্মশান।

গঙ্গার তীরভূমি গড়ে ওঠা শতমুখী শ্মশানে এক নাগা সন্ন্যাসী প্রায় ষাট বৎসর আগে অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় ধুনি জ্বালিয়ে বসলেন। পরবর্তীকালে তাঁর নাম পরেশ গিরি সাধু বাবা নামে এলাকায় পরিচিতি লাভ করে।

তিনি পঞ্চমুণ্ডীর আসন তৈরি করে সেখানে তন্ত্রসাধনা করতেন। পাঁচটি নরমুণ্ড সাজিয়ে পাশে কাঠের ধুনি জ্বালাতেন। সেই পঞ্চমুণ্ডীর আসন পরবর্তীকালে একটি ঘরে সিমেন্টের বেদী তৈরি করা হয় এবং সেখানেই তিনি তন্ত্রসাধনা করতেন। বর্তমানে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সর্বদা কাঠের ধুনি জ্বলে এবং পাঁচটি নরমুণ্ড তার পাশে বসানো আছে। এবং দেওয়ালের পাশে নাগা সন্ন্যাসীর ছবি টাঙানো আছে।

তিনিই প্রথম এই শ্মশানভূমে কালীপূজার প্রবর্তন করেন। বর্তমানে জনসাধারণের দানে কালীমন্দির এবং শিব মন্দির গড়ে উঠেছে। এই মন্দিরগুলিতে নিত্যপূজা হয়। শনিবারে মন্দিরে প্রচুর ভক্ত সমাগম ঘটে।

এই শ্মশানভূমিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে এবং ফুলের গাছ লাগিয়ে বাগান তৈরি করা হয়েছে। বাগানের পাশে শ্মশান যাত্রীদের বসার জায়গা এবং স্নানের ঘাট আছে। পূর্বে মাটিতে কাঠ সাজিয়ে শবদাহ করা হত। বর্তমানে তিনটি সিমেন্ট বাঁধানো এবং লোহার বিম পুঁতে পাকা চুল্লি তৈরি হয়েছে। সেখানে কাঠ দিয়ে শব দাহ করা হয়। এই দাহ করার কাঠ সরবরাহ করে শতমুখী শ্মশান কমিটি। বাড়ির লোকজন ছাড়াও শ্মশান কমিটির লোকজন শবদাহ করে দেয়।

সারা বছরে এই শ্মশানে প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০টি শবদাহ করা হয়। সাতটি থানার পোস্টমর্টেম বডিও এখানে পোড়ানো হয়। উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালের অস্বাভাবিক মৃত্যুর শব সনাক্তকরণ না হলে এখানে শ্মশানের বিপরীতে গঙ্গার মাটিতে কবর দেওয়া হয়।

এই শ্মশানে কোনো বৈদ্যুতিক চুল্লি এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি। তবে উলুবেড়িয়া পৌরসভা শ্মশানের পুকুর সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। তাছাড়া শ্মশানযাত্রীদের বসার একটি ঘরও তৈরি শুরু হয়েছে।

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে কালীমন্দির নির্মিত হয়েছে। আবার সেই কালী মন্দির ২০০০ সালে পুনঃনির্মাণ হয়েছে। এই মন্দিরে নিত্যপূজা ছাড়া বৎসরে দেওয়ালির সময় কালি মন্দিরে জাঁকজমক করে পূজা হয়। এবং পূজার পরের দিন প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার লোক খিচুড়ি ভোগ খায়। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে মহোৎসব হয়। সেইসময় মন্দির সংলগ্ন জায়গায় ১৬ প্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হয়।

একজন সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের কাছে শোনা গেল যে অতীতে এখানে বনজঙ্গলে ভরা থাকত। সেজন্য সাধারণ মানুষ ভূতপেত্নির ভয়ে এখান দিয়ে চলা ফেরা করতে ভয় পেত। জেলেরা যখন রাতে মাছ ধরত তখন তাদের জালে প্রচুর মাছ পড়ত। কিন্তু জাল তোলার পর মাছ সব উধাও হয়ে যেত। জেলেদের মুখ থেকে শোনা যায় যে ভূত এইসব মাছ জল তোলপাড় করে খেয়ে ফেলত। আবার এটাও শোনা যায় দাহ করা কলসিগুলি গভীর রাত্রিতে নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি করত। এবং কলসি দিয়ে ভূতেরা বল খেলত বলে এলাকার লোকজনদের ধারণা ছিল। বর্তমানে শ্মশানে সকাল থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত গল্প আড্ডা সবই চলে এবং পাশাপাশি মৃতদেহ সৎকার হয়।

খাঞ্জাদাপুর শ্মশান :

বাগনার থানার অন্তর্গত খাঞ্জাদাপুর শ্মশানটির প্রায় দু একর জায়গার উপর অবস্থিত। সেখানে বৎসরে প্রায় দুই শতাধিক মড়া পোড়ানো হয়। আগে শ্মশানভূমি বনজঙ্গলে ভরা ছিল সেজন্য এখানে লোক চলাচল করতে ভয় পেত। বর্তমানে শ্মশানে পূর্ববঙ্গের মানুষজন বসবাস করার জন্য বনজঙ্গল পরিষ্কার করেছে। রূপনারায়ণ নদের পূর্বগায়ে শ্মশানভূমিটিতে মাটিতে কাঠ দিয়ে শবদাহ করা হয়। অনেক সমাধি মন্দির আছে।

প্রতি বৎসরে এখানে আষাঢ় মাসে রথ উৎসব হয় এবং বিরাট মেলা বসে। প্রায় আটদিন ধরে মেলা চলে।

বাগনান মুরলীবাড়ের শ্মশান :

মুরলীবাড়ের শ্মশানের নাম সাধুর শ্মশান। কারণ একজন সাধু এখানে দীর্ঘদিন শ্মশানে সাধনা করতেন। সেই সাধুর মূর্তি স্থাপন করে তার অনুগামী ভক্তগণ এখনও পূজা করে। শ্মশানটিতে একটি পাকা চুল্লি আছে। সেখানে কাঠ দিয়ে শবদাহ করা হয়। বৎসরে প্রায় একশো থেকে দেড়শো মড়া পোড়ানো হয়।

❑ লেখক পরিচিতি : কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক।

চুঁচুড়া চন্দননগরের সমাধিভূমি প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলি নদীর তীরে ইউরোপীয়দের বহু সমাধি আছে। বহু বছর আগে যারা ছিল এবং আজ যারা নেই তাদের কথা ভাবলে মন সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে এইসব সমাধিক্ষেত্রের ছায়ায় শুয়ে আছেন যারা তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ হলো মহিলারা ও শিশুরা। এদের অনেকেরই মৃত্যু হয়েছিল বর্ষায় বা বসন্তে। দুরারোগ্য পেটের অসুখ কিংবা বসন্তের আগমনে ঝরে যেতো এইসব ইউরোপীয় প্রাম। পলাশীর যুদ্ধের বহু আগে, যখন ১৬৯৬ সালে ফরাসিদের দুর্গ গড়ে উঠেছে চন্দননগের তখন থেকেই ফরাসিরা এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বনিকরা চন্দননগরে একটি স্থায়ী সমাধিভূমি তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। বলা বাহুল্য যে তৎকালীন খ্রিস্টান সমাজও চুঁচুড়া ও চন্দননগরে সমানভাবে উদ্যোগী ছিল সমাধিভূমি স্থাপনের ব্যাপারে।

কালের বিচারে চুঁচুড়ায় সমাধিভূমিটি অনেক বেশি প্রাচীন। বর্তমানে ফুল পুকুরের কাছে গোরস্থান মোড়ে নেমে একটু এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে গেলে চোখে পড়বে Dutch Cemetry। বর্তমান নারিকেল বাগানের পাশে শহরের এক প্রান্তে পাঁচিল ঘেরা এই সমাধিভূমিটি বহু পুরনো কবরের পরিচয় বহন করছে। এই সমাধিভূমিতে যারা শুয়ে আছেন তাদের অধিকাংশই ডাচ তবে কয়েকজন ইংরাজ আছেন। রাজপুরুষ, নৌসেনা বা পদাতিক সৈন্যবাহিনীর মানুষ ছাড়াও আছে নাগরিক পরিবারভুক্ত সাধারণ মানুষ। জায়া, পুত্র, কন্যা ভগিনীরা শুয়ে আছেন। শুয়ে আছেন প্রেমিক প্রেমিকারা। ৩০০ বা ৩৫০ বা ২৫০ বছর আগেও যাঁরা বেঁচেছিলেন কূজন কাকলী ভরা এই বাংলাদেশে। কালের প্রবাহে সমাধিক্ষেত্রে পুরনো হয়ে যাচ্ছে তাঁদের এপিটাফ।

চুঁচুড়া শহরের ইতিহাস বেশ পুরানো। ইতিহাসসূত্রে দেখা যায় ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহজাহান চুঁচুড়ায় ডাচদের বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। চুঁচুড়া শহর তৈরি হয়ে গিয়েছিল আনুমানিক ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তখনও চন্দননগর শহর তৈরি হয়নি। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম হেজের ডায়েরিতে চুঁচুড়া উল্লেখিত হয়েছে 'Cinchora' বলে। তখন চুঁচুড়া বেশ পরিচিত শহর। স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ। তখনই এখানে কবরখানাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে যেখানে কবরখানা রয়েছে তার থেকেও আরও বেশি অঞ্চল জুড়ে কবরখানা ছিল। এছাড়া ছিল ব্যক্তিগত কবরখানা। চুঁচুড়াতে অনুসন্ধান করলে আজও এর দেখা মিলবে। যেমন খাদিনা মোড় থেকে তালডাঙার মোড়ের মধ্যে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পূর্ব দিকে মাঠের

ভেতরে একটি সমাধিসৌধ আছে। এই সমাধিটি সুসান আন্না মারিয়া নামে জনৈকা ডাচ মহিলার সমাধি। তিনি মারা যান ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে। এই সমাধিটি ব্যক্তিগত সমাধির একটি পরিচয়। সমাধিটি স্থাপিত আছে একটি অষ্টভূজ বেদীর উপর। বেদীব উপরে যাবার জন্য চারদিকেই সিঁড়ি আছে। ভেতরে প্রবেশের জন্য চারটি গোল খিলানের দরজা আছে। ভবনটির ছাদ গম্বুজাকৃতি। আগে সৌধটির সিলিং থেকে ঝুলতো শিকলে ঝোলানো ব্রোঞ্জের মূল্যবান ঘণ্টা। এখন সেটি নেই। সম্ভবত চুরি হয়ে গেছে। এই ব্যক্তিগত সমাধিভূমিটিকে স্থানীয় মানুষ বলে 'সাতমায়েবের বিবির কবর'। বর্তমান 'ডাচ সিমেট্রির' বাইরে কিছু দূরে বিশাল উঁচু পিরামিড শীর্ষ সমন্বিত একটি কবর দেখা যায় কিন্তু সেটি কার, তা আজ আর উদ্ধার করার আশা নেই। এটিও ব্যক্তিগত সমাধি হতে পারে। ডাচ সমাধিলিপিগুলি এযাবৎ যা পাঠোদ্ধার করা গেছে তা থেকে মনে হয় ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে এই ডাচ সমাধিক্ষেত্র পুনঃনির্মিত হয়েছিল। এই সমাধিভূমি ছাড়া চুঁচুড়ায় আরও দুটি সমাধিভূমি ছিল। দুটিই মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট সমাধিভূমি। একটু বিস্তৃত সীমারেখা ধরলে বলা যায় ইমামবাড়ির কাছে যে কবরখানাটি আছে সেটি বেশ প্রাচীন কবরখানা। অনেকে বলেন ওখানে হুগলির শেষ ফৌজদার খাঞ্জা খাঁর (খান জেহান খাঁ) কবরও থাকতে পারে। এই কবরটি চিহ্নিত নেই।

চুঁচুড়ার আর্মেনিয়ান চার্চের কথা এরপর সমাধিভূমি প্রসঙ্গে আসে। আর্মেনিয় চার্চের চত্বরে বহু সমাধি আছে। এদের ভেতর উল্লেখযোগ্য সমাধি হলো জোসেফ ডেভিডবিচ মেলিক বেগলাব সাহেবের সমাধি। বেগলার ছিলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আলেকজান্দার ক্যানিংহামের যোগ্য সহকারী। বেগলার বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের অনেকটা রচনা করেছিলেন। জোসেফ বেগলারের মৃত্যু হয় চান্দহে সেখান থেকে তার দেহ চুঁচুড়ায় আনা হয়। আর্মেনিয়ান চার্চের ভেতরে বেগলার ও [illegible] সমাধি রয়েছে। তাঁদের স্মৃতিফলক থেকে জানা যায় এঁরা ছিলেন আর্মেনিয়ার টিফ্‌লিস বলে একটা বাজপরিবারের সদস্য। ভাগ্যতাড়িত হয়ে তাঁরা ভারতে আশ্রয় নেন। আর্মেনিয় চার্চের প্রাঙ্গণে এঁদের পরিবারের অন্তত পাঁচজনের সমাধি আছে।

সমাধিভূমি কথা বললে আর্মেনিয় চার্চের কথা মনে পড়ে কারণ এখানকার প্রাঙ্গণ পেরিয়ে যেতে যেতে মাড়িয়ে যেতে হয় অনেক কবর। গা শিরশির করে। কবরগুলির উপর আর্মেনিয় ভাষায় সমাধিলিপি লেখা। এর ওপর সম্পূর্ণ কাজ এখনও হয়নি তবে শ্রদ্ধেয় গবেষক ড. দীপকরঞ্জন দাস এর অনেকগুলি অনুলিপি তৈরি করেছেন। তার কয়েকটি পরে উল্লেখ করা হবে। সুধীবকুমার মিত্র মহাশয়ের মতে (প্রাচীর ফলক ও দ্রষ্টব্য) ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে আর্মেনিয়ান চার্চ তৈরি হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এমন কি বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে মরদেহ সমাধিত করা হতো। সেবার আদর্শে দীক্ষিত আর্মেনিয়ানরা বিশ্বাস করতো সমাধিভূমি অজস্র মানবের পায়ের ধূলিতে পূণ্যভূমি হয়ে উঠবে। চার্চে করুণাময় পরম পুরুষের স্নেহছায়ায় শুয়ে

থাকবে নশ্বর দেহ। আর্মেনিয়ান চার্চের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সমাধির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'মার্গার' বংশের সমাধি। খোজা যোয়ানিজের পুত্র মার্গার এই গির্জার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সম্ভবত সেই মার্গারদেরই সমাধি রয়েছে আর্মেনিয়ান চার্চে। ড. দীপকরঞ্জন দাসের দেওয়া অনুলিপি অনুসারে কয়েকটি সমাধিলিপির কথা বলা হলো, যা রয়েছে আর্মেনিয়ান চার্চে। যেমন :

ডেভিডের সমাধিলিপি

In loving memory of our beloved father David son of the late Freedone Melik Beclaroff, last independent prince of Karabach in the province of Tiflis Caucasus born on 1st May 1795 and died in Chinsurah on 22nd Septemper 1884. I am the resurrection and the life.

জোসেফের সমাধিলিপি

In memory of Joseph son of David Fer Idonwitch Melik Beclaroff of Karabagh
Late executive Engineer P.W.D. & Arehacological Surreyor, Bengal
Born 25th June 1845
Died 24th April 1907 at Chankaha

শামিরের সমাধিফলক

Swamir Josephitch Melik Beglaroff
25 August 1883

মেরীর সমাধিফলক

In memory of Mary wife of Joseph Devidiwitch Melik Beglaroff
A.D. 25 November 1878

এছাড়াও আরও বহু কবর রয়েছে যাদের সমাধিলিপি অবিলম্বে পাঠ করা প্রয়োজন।

ডাচ সিমেট্রিতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে অনেক সেনানায়কদের সমাধি রয়েছে এ কথা আগেই বলা হয়েছিল। নৌ সেনাদের সমাধিগুলির ওপরে নোঙরের চিহ্ন থাকতো। এটি চন্দননগর ও চুঁচুড়া দু জায়গাতেই দেখা গেছে। ওই সমাধিক্ষেত্রে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই তারিখে পরলোকগত একজন ক্যাপ্টেনের সমাধি রয়েছে। ১৫ নং রেজিমেন্টের (N.1.) এই ক্যাপ্টেনের নাম ছিল C. Kiernander. ৪৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান। সম্ভবত তিনি চুঁচুড়াতে থেকে গিয়েছিলেন ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে হস্তান্তরের পরেও। ব্রিটিশদের কাছ থেকে বাটাভিয়া নিয়ে চুঁচুড়া ব্রিটিশদের হস্তান্তর করে ডাচ সরকার।

১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হওয়া এই ডাচ সমাধিক্ষেত্রে বহু ডাচ প্রশাসকের সমাধি আছে। গোটা পরিবারের সমাধিক্ষেত্র রয়েছে বেশ কয়েকটি। কয়েকটি ছোট ছোট শিশুর কবর আছে।

ডাচ সমাধিক্ষেত্রের সমাধিগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সমাধির ওপর উঁচু উঁচু এবং ঊর্ধগামী লম্বা সৌধ বানানো। কয়েকটি ভেঙে পড়লেও এখনও বেশ কয়েকটি রয়েছে। যেমন রয়েছে Sir Cornelius Jouge এর কবর। যিনি মারা গিয়েছিলেন ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডাচ **কুটির** গভর্ণরদের বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় গবেষক ড. অক্ষয়কুমার আঢ্যর একটি লেখায় এই তালিকা রয়েছে। ড. আঢ্যর লেখায় এদের মধ্যে শেষ ওলন্দাজ ওভারবেকের কথা আছে। চুঁচুড়ার ইতিহাসে দেখি বহু ডাচ মানুষ, ব্রিটিশ অধিকারে চুঁচুড়া এসে যাবার পরেও, চুঁচুড়ায় থেকে গিয়েছিল। ওভারবেকও এই দলে ছিলেন। ড. অক্ষয়কুমার আঢ্য তাঁর লেখায় এই থেকে যাওয়া আরও কয়েকটি মানুষের কথা বলেছেন। যেমন Overbeck, Holf, G. Herklots, একজন পাদুকা প্রস্তুতকারক, Feith Michel নামে একজন ফরাসি এবং Berg Andress নামে একজন ডেনমার্কীয় যিনি নীলকুঠির মালিক ছিলেন। কিন্তু চুঁচুড়ায় সমাধি পরিদর্শন করলে দেখ যায় ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের পরে মারা গেছেন এমন বেশ কয়েকজনের সমাধি এখানে রয়েছে। রয়েছে নানা কিংবদন্তী, যেমন সুধীরকুমার মিত্র উল্লেখ করেছেন গোরস্থানের উত্তর দিকে একটি ভগ্নপ্রায় বাড়ির কথা যেখানে নাকি এখনও ভূতের উপদ্রব চলে। অবশ্য সুধীরকুমার মিত্র পঞ্চাশের দশকে এই কথা বলেছেন। চুঁচুড়ায় মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস নেওয়া D.A. Overbeek এর সমাধিফলকটি নিম্নরূপ।

Sacred to the memory
Of
Daniel Anthony overbeek
Last Dutch Government of
Chinsussh
Obit 25th September 1840
Aged 76 years
The memory of the just in blessed
And he shall be as the light of the morning
When the Sun riseth.

এছাড়া আরও দুটি সমাধির উল্লেখ করা যায় একটি হল Helen Welhelmina Overbeek এর। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি তিনি মারা যান। তখন তাঁর বয়স ১৮ বছর। এই পরিবারের আর একটি সমাধি রয়েছে তার ফলকে লেখা আছে।

'Sacred to the
Memory of his beloved son
Peter theodone Gerad Overbeek
Obit 12th Sept. 1831

Aged 33 years
Died as christinas die & his father
envies him, his grave.'

চুঁচুড়ার সমাধিক্ষেত্র সম্বন্ধে পরিশেষে একটি কথা বলবার থাকে যেটি হল আর্মেনিয়ান চার্চ সহ চুঁচুড়ায় সমস্ত সমাধিক্ষেত্রগুলির সমাধিলিপির পাঠোদ্ধার অবিলম্বে প্রয়োজনীয় এবং প্রযোজনীয় সমাধি ক্ষেত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা।

২.

Rest on, dearest, your journey in O'er,
Your loving hands shall toil no more,
On earth you worked. in Heaven you'll rest
We miss you most who loved you best.

চন্দননগরের সমাধিক্ষেত্রে এই ধরনের বহু সমাধিলিপি আছে। যার বেশ কিছু ফরাসি, ইংরাজি ও ল্যাটিনে লেখা। জি.টি. রোগের পাশে, লাল দিঘি ও কৃষ্ণভাবিনী বালিকা বিদ্যালয়ের বিপরীত দিকে অধুনা সেন্ট টমাস স্কুলের গায়ে অবস্থিত এই কবরখানাটি। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে এরই কাছে গড়ে উঠেছিল কোর্ট-দ্য অরলেয়াঁ নামে ফরাসিদের দ্বারা নির্মিত দুর্গ। চন্দননগরের এই সমাধিক্ষেত্রটি বহু প্রাচীন। খুব সম্ভব দুর্গ তৈরির সঙ্গে সঙ্গে এই কবরখানাটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তবে এইটিই চন্দননগরের একমাত্র কবরখানা ছিল না। শোনা যায় বড় বাজারে ইলেকট্রিক অফিসের উল্টো দিকে একটি গির্জা ছিল এবং তার প্রাঙ্গণে বহু কবর ছিল। বর্ণনা শুনে মনে হয় এটি আর্মেনিয়ান চার্চ হওয়া সম্ভব। তবে জি.টি. রোডের পাশের সমাধিক্ষেত্রটি ছিল সম্পূর্ণভাবে খ্রীস্টানদের সমাধিক্ষেত্র যেখানে বিংশ শতাব্দীতে দেওয়া কবরও রয়েছে।

চন্দননগরের এই সমাধিক্ষেত্রের সমাধিগুলি বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। চুঁচুড়ার যেমন লম্বা ও উঁচু ধরনের স্মৃতি স্তম্ভের সারি রয়েছে এখানে তা নেই। নিঃসন্দেহে চুঁচুড়ার ডাচ সিমেট্রি চন্দননগরের থেকে বহু প্রাচীন। গঠন সৌকর্যও আলাদা। ডাচ স্থাপত্যের চিহ্ন রয়েছে কবরগুলিতে। অন্যদিকে চন্দননগরের সমাধিক্ষেত্রে কবরগুলির মধ্যে একটি বড় Mosulium রয়েছে। চন্দননগরের কবরগুলির মধ্যে সবরকম স্থাপত্যের মিশ্রণ রয়েছে। ফরাসি শৈলী ছাড়া রয়েছে ইতালীয় ও গ্রীসীয় স্থাপত্যের নিদর্শন আর অনেক মার্বেল পাথরের কারুকাজ। আয়োনিয়ান স্থাপত্য সংবলিত একটি সমাধি বিশেষ ভাবে নজর কাড়ে। ইতালীয় 'ভিলা টাইপ' বর্হিরঙ্গের সঙ্গে আয়োনিয়ান ও দুটি ডোরীয়ান পিলারের অবস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মার্বেল পাথরের কাজগুলির অনেকগুলি ভেঙে গেছে। তবু যা আছে তাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ধরনের মার্বেল পাথরের সমাধি চুঁচুড়ার ডাচ সিমেট্রিতে নেই। চন্দননগরের সমাধিভূমিতেও বহু নৌ সেনার সমাধি রয়েছে। এই সমাধিগুলিতে নোঙরের চিহ্ন রয়েছে। ফরাসি গভর্ণরদের কয়েকজনের (হারদাঁকুর, ব্লাশতিয়ের

প্রভৃতি) এবং ফরাসি রাজপুরুষদের ও তাদের পরিবার পরিজনদের কবর এখানে রয়েছে। ক্লুনির তিনজন সিসটারের কবরও রয়েছে এখানে। নিরাভরণ পাথরের কবর। অলংকৃত কবর রয়েছে বহু, বহু জীর্ণ কবরও রয়েছে। যার তালিকা তৈরি করা তখুনি দরকার। এপিটাফ মুছে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমাহিত একটি কবর আছে, যা বেশ চিত্রাকর্ষক কবরটি কোনো এক কুর্জন সাহেবের। সম্ভবত ওই কূর্জন সাহেবের নামে চন্দননগরে একটি রাস্তা আছে কূর্জন সাহেবের কবরের গায়ে লেখা আছে 'King of Chandanagar' অনেকগুলি কবরের মার্বেল ফলা উধাও। বহু কবর আজ আর চিহ্নিত করার উপায় নেই। তবু এই একবিংশ শতাব্দীতেও চন্দননগরের এই নির্জন প্রাচীন কবরখানায় ঢুকলে মন উদাস হয়ে যায়। তিনশো বছর ধরে যারা মাটির নিচে ঘুমিয়ে আছেন তাদের উদ্দেশ্যে মন বলে ওঠে 'Rest in peace' আপনারা শান্তিতে ঘুমান। ঘুমিয়ে থাকুন এই বাংলার শ্যামল মাটিতে। শেষে আরও দু'একটি কথা।

পরিশেষে বলা যায় সমাধিভূমি হিসাবে আর্মেনিয় চার্চকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ এই চার্চের অভ্যন্তরে এত বেশি পরিমাণ সমাধি আছে যাদের পরিচয় উদঘাটিত হলে চুঁচুড়ায় নতুন ইতিহাস লিখিত হবে। অধিকাংশই আর্মেনিয় ভাষায় লিখিত। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই চার্চে সবচেয়ে পুরন দুটি কবর হল ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দের কবর। লক্ষণীয়ভাবে একটি কবর ভজনালয় মঞ্চের উপরে যাবার সিঁড়ির নিচে স্থাপিত। ভজনালয়ের ভেতরে পশ্চিম দিকে আরও একটি কবরে লেখা আছে ১৬৯৭ A.D.। গির্জার ভেতরে দুশোর বেশি সমাধি আছে। ড. প্রণব রায় তাঁর 'হুগলি : প্রত্নসম্পদ' প্রবন্ধে এইসব সমাধির মধ্যে অনেকগুলির তারিখ উল্লেখ করেছেন যেমন ১৭৬৬, ১৭৭৯, ১৭৮১ প্রভৃতি। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর সমাহিত Sarhad Leon-এর সমাধি এবং ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি সমাহিত Hyrapiet D. Anthonyএর সমাধিলিপির ভাষা ইংরাজি। এদের মধ্যে শেষের জন জন্মেছিলেন ইস্পাহানে।

ডাচ সিমেট্রি বা ফুলপুকুরে কাছের গোরস্থানে একজন পথিতযশা শিক্ষাবিদের সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাম Revd. James Graves. তিনি চুঁচুড়া চার্চের মিনিস্টার এবং হুগলি কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর সমাধিলিপিতে এইসব লেখা আছে। তিনি মারা যান 1st April 1865 খ্রিস্টাব্দে। ড. প্রণব রায় তাঁর লেখায় যে সমাধিলিপির কথা উল্লেখ করেছেন সেটিই সবচেয়ে বড় সমাধিলিপি। সেই সমাধি হল চুঁচুড়ায় আইন আধিকারিক গ্রেগরিয়াস হার্কলটস্ ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁর সমাধিলিপিটি হল।

"Beneath this stone live the mortal remains of Gregoirus Herklots ESQ Fiscal of Chingurah. He was born at Breman. January 9th 1768 arrived at Chinsurah in 1789. Resided there for a period of sixty three years & died May 26th 1852. Aged 84. Eemployed in responsible officers by both the Dutch &

English Governments. He discharged the duties of public life with unblemished integrity, fidelity & zeal. He rested with the most child like faith upon the promises of the Redeemer & male submission to his master is will the law of his life...

This memorial of his excullences is raised by the greatfull of his surviving children.

এত বড় সমাধিলিপি সাধারণত দেখা যায় না।

কাহিনির শেষে আর একটি বিস্মৃত প্রায় সমাধিভূমির কথা বলি। Bengal Past & Present এর একটি সংখ্যায় D.G. Gawford লিখেছেন বিস্মৃত প্রায় কয়েকটি গোরস্থানের কাহিনি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Ghiretti Burial Ground বা গৌরহাটির সমাধিভূমির কথা। এখানকার দুটি কবরের কথা আছে, এপিটাফের কথা আছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের কথা আছে এই প্রবন্ধে, সেটি হল কবর স্থানান্তরিতকরণের কথা। এখানে বলা হয়েছে সেন্ট লুইস চার্চের কথা যা তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং যেখান থেকে কিছু দেহাবশেষ উঠিয়ে চন্দননগরের Sacred Heart Cemetry-তে কবর দেওয়া হয়েছিল। Gawford ঠিক যে লাইনটি লিখেছিলেন তা হল ".... Some of which were removed to the modern church from the old church of st. Louis, how in ruins". দুঃখের বিষয় এই প্রবন্ধে সব কথা বলা গেল না তবে আশার কথা এই যে প্রবন্ধটি পড়ে পরবর্তীকালে গবেষকরা আরও সমৃদ্ধ গবেষণা করবেন।

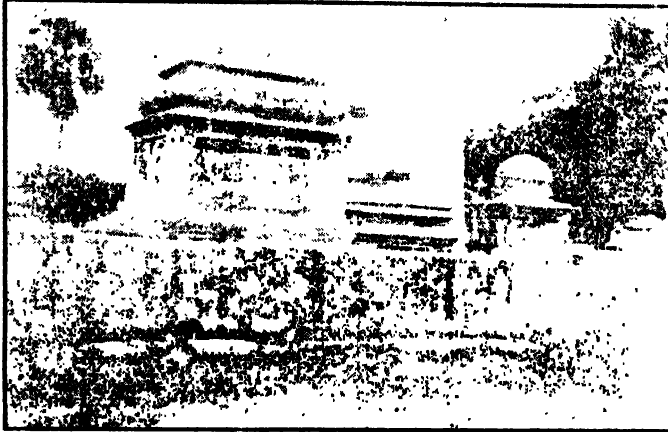
প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র :

১. Asketch of the Administration of the Hoogaly District from 1795 to 1845 – Gurge Toyanbee
২. Bengal Past & Present Vol (III), April-June 1909
৩. Forgotten Gruve Gards –D.G. Gawford (Bengal Past & Present) vol III, April - June 1909, P. 200.
৪. Brief Histry of Hoogaly District–D.C. Crawford
৫. Bengal Past & Present Jubile No 1957
৬. হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ — সুধীরকুমার মিত্র
৭. Hoogaly Past & Present – S.C. De
৮. জোসেফ ডেভিড কোলার (প্রবন্ধ) ড. দীপকরঞ্জন দাস — (প্রকাশিত হয়েছিল "সাইন্যাপস" পত্রিকায় এপ্রিল ২০০৩ সালের সংখ্যায়)
৯. চুঁচুড়ায় শেষ ওলন্দাজ গভর্ণর—ড. অক্ষয়কুমার আঢ্য (প্রবন্ধ) (প্রকাশিত, সাইন্যাপস পত্রিকা অক্টোবর ২০০২ সংখ্যা)

১০. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ২য় খণ্ড ১৯৭৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

আমার এই লেখা দেবাঙ্গন বসু ও সুমনা বসু'র তথ্য সংগ্রহ ও পরিশ্রমে সমৃদ্ধ। চন্দননগর কবরখানায় এই দুজন ছাড়া আমার সঙ্গে ছিলেন সম্পূর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়।





পুরাতন ওলন্দাজ কবরখানা

❑ লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন (পি.জি.) ফর উইমেন।

জয়রামবাটির পবিত্র শ্মশানভূমি

কস্তুরি বসু

হঠা খবর পাই মনে, আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানীর কোনো ভেদ নেই
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
একই বৈকুণ্ঠের দিকে ...

কবিগুরুর উপলব্ধি নিয়েই মনে হয়, 'হরিপদ কেরানী' বা 'আকবর বাদশা', উভয়েই প্রতীকী। একজন সমাজের নিম্নবিত্ত এবং আর একজন সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রতীক। আর এই কবিতার ছত্রে 'একই' কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যে আমরা যেখান থেকেই আসিনা কেন, আমাদের জীবনধারা যা'ই হোক না কেন শেষের দিনে 'একই' ভূমিতে শয়ন করতে হয়। আর তা হল শ্মশানভূমি। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহধর্মিনী শ্রীশ্রী মা সারদামণি দেবীর জন্মস্থান ও স্মৃতি বিজড়িত জয়রামবাটী গ্রামের শ্মশানভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

জয়রামবাটী গ্রামের বর্তমান শ্মশানটি আমোদর নদী যে স্থানে পূর্ববাহিনী তার বামপাশে অবস্থিত। কিন্তু আগে গ্রামের শ্মশান ভূমিটি ছিল সেখানে যেখানে পুণ্যতোয়া আমোদর বাঁক নিয়ে উত্তর মুখে প্রবাহিত। উত্তরবাহিনী নদীর ধারে শবের মাথা উত্তর দিকে দিয়ে দাহ করার রীতি। সেই বিশাল এলাকা ছিল প্রায় গোটা ত্রিশেক বটগাছ দিয়ে ঘেরা। ছিল তখনকার দিনে। এই বিস্তীর্ণ এলাকাটি ছিল জিবটে (জিবট্যা) গ্রামের জমিদারদের। কিন্তু ১৯৫৫ সালে মধ্যসত্ত্ব আইন পাস হবার পর সরকার ঘোষণা করলেন যে নির্দিষ্ট জমির বেশি জমি কোনো মালিকের নামে থাকলে সেই জমি অধিগ্রহণ করবেন সরকার। সেইমত জমিদাররা তাঁদের নিজের এলাকার জমিটুকু রেখে সবই বিক্রি করেদিলেন কোনো ব্যক্তি বিশেষকে এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে। তখনকার সেই বিস্তীর্ণ শ্মশানভূমি পরিণত হল চাষের খেতে। তাই বর্তমান স্থানে শবদাহ শুরু হল। তবে কিছু সমাধি যা অনেক পূর্বকাল থেকেই বর্তমান শ্মশানভূমিতে অবস্থান করছে, তা থেকে বোঝা যায় ব্রাহ্মণদের এই বর্তমান ভূমিতে পূর্বে দাহ করা হত। শিশুদের মৃত্যু হলে এই জমিতে তাদের গেড়ে দেওয়া হত বলে শ্রুতি আছে। কারণ তখনকার নিয়মানুসারে ছয়মাসের আগে কোন শিশুকে দাহ করা হত না। বহু বিখ্যাত মানুষ যাদের সমাধি এই শ্মশানভূমিতে আছে তাঁরা হলেন শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবরী পিতা শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিতা কন্যা যুগলকিশোরী দেবী এবং ওনার সন্তান স্বামী সৎসঙ্গানন্দজী মহারাজ

(১৭ কার্তিক ১৩৬৮)। স্বামী পরমেশ্বরানন্দজীর পুত্র দেহ ওই শ্মশানেই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। বর্তমান শ্মশানটির অবস্থান পূর্বমুখী নদীর ধারে উত্তরমুখী আর নয়।

মূল গ্রাম থেকে বর্তমানে শ্মশানটি ২০ মিটার উত্তর পশ্চিম দিকে আমোদর নদীর তীরে অবস্থিত মূল গ্রাম থেকে শ্মশানে সড়কপথে যোগাযোগ করা যায়। সাধারণত যে স্থানে শবদাহ করা হয় তার একপাশে সবজি চাষ হয়, অন্যপাশে নদীখাত। সেইস্থান থেকে কিছু পূর্বে আমলকি ও বেলগাছের সারি আছে এবং সেইস্থানে শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী সারদানন্দজী বা শরৎ মহারাজ সাধনা করতেন। ওই নিভৃত স্থানটি এখনও সাধনক্ষেত্র।

আগেকার শ্মশানভূমিতে দেখা যেত মৃত মানুষের হাড়, কঙ্কাল, খুলি। যা দেখলে ভয়ের উদ্রেক করত, তখনকার দিনে বসন্ত বা কলেরা জাতীয় মহামারী হলে শবদেহ দাহ না করে শ্মশানে ফেলে রাখা হত বা মাটিতে গেড়ে দেওয়া হত। সাধারণভাবে ফেলে যাওয়া শবদেহ কুকুরে বা শকুনে খেয়ে যেত, তাই তাদের হাড়, কঙ্কাল পড়ে থাকত শ্মশানভূমিতে। হয়তো ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু তখনকার মানুষ সেই সম্পর্কে সম্যক জানতেন কিনা জানা যায় না।

গ্রামটির অবস্থান :

জয়রামবাটী গ্রামটি বাঁকুড়া জেলায় হুগলি জেলার সীমানায় অবস্থিত। গ্রামটিতে ১৫৩৪ জন লোক বাস করেন।

নদীর উৎস গতিপথ ও মানুষের সংস্কার :

আমোদর নদীটি পার্শ্ববর্তী জয়পুর গ্রামের জঙ্গলে অবস্থিত একটি ঝরনা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং জয়রামবাটী গ্রামের উত্তর পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। বর্তমানে নদীতে মাঘ মাসের শেষ অর্থাৎ ইং ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত জল থাকে না। কারণ বর্তমানে কৃষিকার্যের উন্নতি হওয়ায় প্রায় ২৫টা পাম্প চালিয়ে চাষের খেতে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। তাই এই জলশূন্যতা। অথচ শ্মশান নেভাতে বা চিতা নেভাতে গেলে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কলসির মত জল লাগে। তাই নদীতে পাম্প চালানোর ফলে গ্রীষ্মকালে জল পাওয়া যায় না। তখন মালপুকুর নামে গ্রামের দক্ষিণ দিকে জিবটে (জিবট্যা) যেতে যে পুকুর আছে সেই স্থানে শবদাহ করা হয় কারণ এতে সারাবছর জল থাকে। কিন্তু কিছু মানুষের শেষ ইচ্ছা থাকে যে আমোদরের তীরে যেন তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় তখন রামকৃষ্ণ মঠ, মাতৃমন্দিরের কোনো কর্মীকে পাম্প চালিয়ে দিতে অনুরোধ জানাতে হয়। ফলে যাতে নদীতে জল মেলে তার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ জল না হলে শ্মশান নেভান যাবে না।

কিন্তু ১৯৮৫-৮৬ সালে সারা বছর নদীতে জল থাকতো এবং সেখানে শোল, বোয়াল, কালবোস, মৃগেল ইত্যাদি মাছ পাওয়া যেত লোকে ছিপ দিয়ে বা জাল দিয়ে সেখানে মাছ ধরত। কিন্তু বর্তমানে কৃষিকাজের ব্যাপক উন্নতি হওয়ায় যেমন নদীজল বামে যাচ্ছে, তেমনি নেমে যাচ্ছে মাটির জলস্তরও কারণ এখন মাটি থেকেও জল তোলা হচ্ছে। এই কারণে বামে কমে

যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ জল এবং নদীর জল।

শ্মশানের কৃতকর্মাদি :

শ্মশানের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে যার উপর ব্রাহ্মণদের জন্য সাড়ে তিন হাত আর অন্য জাতের জন্য আড়াই হাত লম্বা মাটি কাটা হয়। একে বলে চুল্লি। কখনও চুল্লি এদিক ওদিকে একটু সরেও যেতে পারে। এর উপর কাঠ সাজান হয়। কাঠ শ্মশানযাত্রীরাই কেটে আনেন। চুল্লি প্রথমে তৈরি করা হয়, কারণ, এর ফলে যে ফাঁকা স্থান তৈরি হয় সেই ফাঁকা দিয়ে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে। এরপর মৃতের পরিহিত বস্ত্রাদি খুলে তার শরীরে যদি কোনো ঘুনসি বা তাগা জাতীয় কোনো কিছু থাকে তা কেটে ফেলা হয়। তার পর মৃতদেহকে ঘি মাখানো হয়। তারপর তাকে স্নান করিয়ে গঙ্গামাটি মাখান হয় এবং অনেক সময় কপালে চন্দন দেওয়া হয়। যাদের পয়সাকড়ি তেমন নেই তারা শবের মাথায় সামান্য ঘি ছুঁইয়ে নিয়মরক্ষা করেন মৃতব্যক্তিকে এর পর নববস্ত্র পরান হয়। মৃতদেহ যার বাড়ির তাকেই এই নিয়মগুলি পালন করতে হয়। ব্রাহ্মণ হলে সোজা করে এবং অব্রাহ্মণ হলে উপুড় করে শোয়ান হয় এবং অব্রাহ্মণদের পা হাঁটুর কাছে মুড়ে দেওয়া হয়, তাই ছোট চিতায় অসুবিধা হয় না। শবের মাথাটি একটু বেরিয়ে থাকে। এরপর পুনরায় শবের উপর কাঠ চাপান হয়। পূর্বে শবদাহ করবার জন্য নিমকাঠ ব্যবহার করা হত কিন্তু বর্তমানে নিমকাটের যথাযথ সংকুলান না হওয়ায় একটা ছোট নিমডাল ভেঙে চিতায় দেওয়া হয় নিয়মরক্ষা করার জন্য। অনেক সময় চন্দনকাঠ দিয়ে শবদাহ করা হয় যারা দিতে পারেন অথবা চিতায় চন্দনকাঠের টুকরো দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর শবের মুখে মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র বা সেই স্থানীয় কোনো আত্মীয় প্যাকাটি (পাটকাঠি) বা খড় দিয়ে আগুন ছুঁইয়ে দেন। একে বলে মুখাগ্নি করা। এরপর অন্য পুত্রেরা সাধারণত শবের মুখে আগুন দেন। তারপর চিতা জ্বালাবার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে শবযাত্রীরা অগ্নি সংযোগ করেন। দাহকার্য চলার সময় অগ্নিকর্তাকে একবার বাড়িতে অগ্নিকর্তাকে একবার বাড়িতে আসতেই হবে সঙ্গে শবযাত্রীদের কেউ আসবেন। ঘরে কোনো অঘটন ঘটেছে কিনা তা দেখার জন্যই একবার আসা নিয়ম। আবার ফিরে যাবেন তিনি। তারপর শবদাহ সমাধা হলে চিতায় জল ঢালতে হয় একে বলে শ্মশান নেভানো। শবদাহ করতে সাধারণত সময় লাগে ৩ ঘণ্টা তবে জ্বালানি ভালো হলে ২.৫ ঘন্টা আর ভেজা কাঠ হলে ৩.৫ ঘণ্টাও লাগে। শ্মশান নেভানো হয়ে গেলে শ্মশানের মাটি দিয়ে একটা মানুষের মত অবয়ব তৈরি করা হয় যার মাথার দিকে একটি জলপূর্ণ কলসি ফুলমালা ধুপ ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয় ওই অবয়বের মাথার কাছে এবং সেখানে একটা তুলসী গাছ লাগিয়ে রাখা হয়। সেখানে যব এবং কৃষ্ণতিল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর শ্মশান পরিত্যাগ করার আগে ওই ঘড়ায় একবার ঘা দিয়ে বলতে হয়, তুমি আর আমাদের সঙ্গে ফিরে যেয়োনি। এরপর যারা যারা শবদেহ স্পর্শ করেছিলো তারা সকলে স্নান করে নদীতে বা পুকুরে। একেবারে মাথার চুল পর্যন্ত ডুবিয়ে স্নান করতে হবে। তারপর শ্মশানস্থ বটগাছকে আলিঙ্গণ করে তাকে সাক্ষিস্বরূপ রাখতে হয়।

তারপর ফিরে এসে নিমডাল ছুঁতে হয় এবং পরে আলোচাল মুখে দিতে হয়। তারপর গঙ্গাজল এবং দেবতার চরণামৃত খেতে হয়। এখানকার শ্মশানে কোনো শ্মশান পুরোহিত বা ডোম বলে কেউ নেই। যারা শবযাত্রী আসেন তারাই সব কাজ করেন।

বর্ষাকালে অনেক সময় শবদাহ হতে হতে বৃষ্টি নেমে আসে। তখন ত্রিপল নিয়ে যাওয়া হয় এবং বৃষ্টির সময় সেই ত্রিপল দিয়ে ছাউনি তৈরি করা হয় এবং চারদিকে বাঁশ গেড়ে দিয়ে ত্রিপল আটকে দেওয়া হয়।

শ্মশানের কৃতকর্ম কাঠ কাটা, চিতা সাজান ইত্যাদি করার জন্য ৪ থেকে ১০ জন লোক লাগে। কীর্তন দল থাকলে আরও পাঁচজন।

রামকৃষ্ণ মঠের পূজনীয় সন্ন্যাসীদের কারও শরীর চলে গেলে একইভাবে ওই আমোদরের তীরে শ্মশানে দাহ করা হয়, তবে ওনাদের ক্ষেত্রেও চিত করে শোয়ান হয় দাহকালে।

শ্মশানের কৃতকর্মের ব্যাখ্যা :

প্রশ্ন আসে কেন উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শবদাহ করা হয়? কারণ স্বরূপ অনুমান করা যায় হয়ত এর ফলে ভূ-চুম্বকের কিছু প্রভাব থাকতে পারে। মহামারী যেমন কলেরা বা বসন্ত ভাইরাসঘটিত রোগ। এই রোগিকে পোড়ালে রোগ ছড়াতে পারে বেশি করে বা এই মহামারীতে এত বেশি হারে মানুষের মৃত্যু হত যে দাহ করার মত যথেষ্ট লোক পাওয়া যেত না। তাই তখন মৃতদেহকে ফেলে রাখা হল তা গেড়ে দেওয়া হত শ্মশানে। নিমকাঠ একটি ওষধি গাছ। এই গাছ জীবাণুকে ধ্বংস করে। তাই নিমকাঠের চিতায় আগে পোড়ানো নিয়ম ছিল বা দাহ করে আসার সময় ঘরে ঢোকার আগে নিমডাল ছোঁয়া নিয়ম। অর্থাৎ দেহের মধ্যে যদি কোন জীবাণু থেকে যায় তা নষ্ট হবে। কারণ পূর্বে নিয়ম ছিল নিমদাঁতন দিয়ে মুখ ধোয়া, যা, কালের ব্যবধানে শুধু স্পর্শ করায় এসে দাঁড়িয়েছে। চিতায় আগুন জ্বলার পর অগ্নিকর্তা একবার বাড়িতে আসেন সঙ্গে কারোকে নিয়ে বাড়িতে কোনো অঘটন হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য। শবদাহের শেষে একটি মানুষের অবয়ব তৈরি করা হয় এটা প্রমাণ করার জন্য যে এইস্থানে একটি শবদাহ করা হয়েছে অর্থাৎ স্থানটিকে কেউ যেন নোংরা না করে। জলের কলসি বসিয়ে যব ও কৃষ্ণতিল ছড়িয়ে দেবার কারণ হলো। মৃতব্যক্তিকে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা। যব এবং কৃষ্ণতিল যে কোনো উষ্ণতায়, যে কোনো পরিস্থিতিতে অঙ্কুরিত হতে পারে। তাই বলা যায়, মৃত ব্যক্তি যখন জীবিত ছিলেন যে শক্তি তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল তাই ঐ অঙ্কুরিত বীজ ও উদ্ভিদের মাধ্যমে কার্যকরি হবে এবং সাধারণ মানুষের প্রতীতি হবে যে সেখানে কিছুদিন আগে কেউ মারা গেছে। মৃতব্যক্তির দেহ এবং পোড়া কাঠের যে পাঁশ তার থেকে পুষ্টিলাভ করবে ওই যব আর কৃষ্ণ তিল গাছ আর যাবার সময় যখন কলসিতে ধাক্কা দেওয়া হবে তখন কলসি থেকে উপচে পড়া জল, জলসেচের কাজ করবে ওই গাছগুলির উপর। আবার বলা যায় মিশরীয় সভ্যতায় পিরামিডের মধ্যে খাদ্য ও পানিয় নিবেদনের যে প্রথা ছিল তা হয়ত প্রাচীন আর্য সভ্যতার সঙ্গে আদানপ্রদানে আমাদের বর্তমান সমাজে এসে পড়েছে। আবার ঘড়ার জলে

ধাক্কা দিয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে বলা তুমি আর এদিকে এসোনি অর্থাৎ মৃত্যুর পরে জীবিত ব্যক্তিদের থেকে তিনি আলাদা। বটবৃক্ষকে আলিঙ্গন করে তাকে সাক্ষিস্বরূপ রাখার সঙ্গে তুলনা করা যায় চৌদ্দবছর বনবাসে যাবার পর দশরথের মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে। ঘটনাটি হল, রামের চৌদ্দ বছর বনবাসে যাবার পর রাজা দশরথ শোকে দেহত্যাগ করেন। সেই খবর দূত মাধ্যমে পেয়ে রামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতা শোকাহত হয়ে পড়েন। কিন্তু বনবাসের অঙ্গীকার থাকায় রাজ্যে ফিরে আসতে পারবেন না, তাই পিতার শ্রাদ্ধ শান্তির জন্য রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ জঙ্গলে চললেন ফলমূল সংগ্রহ করতে। এমন সময় রাজা দশরথ পর্ণকুটিরে অবস্থিতা সীতার কাছে এসে জানান যে তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত। তখন অসহায়ভাবে সীতাদেবী জানালেন যে, তাঁর স্বামী ও দেবর বনে ফলমূল সংগ্রহ করতে গেছেন আসলেই তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু রাজা দশরথ অপেক্ষা করতে পারলেন না এবং সীতা দেবীকে জানালেন যে সরযূ নদীর জল ও তৎপার্শ্বস্থ বালি দিয়ে ওনাকে পিণ্ড দিতে। অগত্যা সীতাদেবী তাই করলে রাজা দশরথ খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। তখন সীতা দেবী এই ঘটনার সাক্ষিস্বরূপ রাখলেন সরযূ নদী, তুলসী গাছ ও বটগাছকে। যখন রামচন্দ্র ও লক্ষণ ফিরে এলেন তখন সীতাদেবী সমস্ত ঘটনা জানালে এবং সাক্ষিদের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন সরযূ নদী ও তুলসী গাছ বিশ্বাস করল না ঘটনাটা কিন্তু বটগাছই একমাত্র বিশ্বাস করল। সীতাদেবী তাই আশির্বাদ করলেন বটগাছকে যে, তার ছায়ায় শ্রান্ত পথিক শান্তি পাবে। তাই বটগাছকে সাক্ষীরাখার নিয়ম আছে। যারা মৃতদেহকে বা আনুসঙ্গিক জিনিসকে স্পর্শ করেন তাদের শুদ্ধ হবার জন্য মাথা পর্যন্ত ডুবিয়ে স্নান করতে হয়। বাড়িতে ঢুকেও নিম ছুঁলে শুদ্ধ হয়। আর সারাদিন খালি পেটে থাকার পর আলোচাল খেতে দেওয়া হয়।

দাহ দৃশ্য ও সদ্গতি :

দাহকার্যের সময় প্রথমে মৃতের শরীরের মাংস ও পরে অস্থি পুড়তে থাকে। যত বেশি পুড়বে পাঁশ তত কম হবে। হাড়গুলো পোড়ার পর খড়িমাটির মত সাদারঙের পাঁশ পড়ে থাকে। নাভীটি সর্বশেষ পর্যন্ত জ্বলতে থাকে। নাভীর মাংস পুড়ে পুড়ে জড়ো হয়ে যায়, তাকে ক্রমাগত আঘাত করে করে ছোট করা হয় এবং অবশেষে নীল শিখায় জ্বলতে থাকে। যতক্ষণ নীল শিখায় জ্বলতে থাকে ততক্ষণ বোঝা যায় যে নাভীটি পোড়া শেষ হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই বলবে যে আর অবশিষ্ট নেই, তখনই বুঝতে হবে যে আর অবশিষ্ট নেই। তারপর জল ঢালতে হবে চিতায়। এরপর অস্থির অবশিষ্টাংশ ভাঁড়ে নিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে কাছের গঙ্গা হল শেওড়াফুলি। গ্রামের গরীব লোকেরা সাধারণত সেখানই যায়।

শ্মশান খুব পবিত্র সাধনক্ষেত্র কেন?

শ্মশান খুব পবিত্রস্থান। সাধনার খুব উপযুক্ত জায়গা। দুজন ব্যক্তিও শ্মশানে গেলে ভয় পায়। কারণ মৃত্যুভয় সকলেরই আছে। তাই শ্মশানে হৈ-হুল্লোড় করা বা কোনও ভাবে সাধারণত-কেউ নোংরা করেনা। তাই স্থানটি খুব শান্ত ও পরিষ্কার। সাধনার উপযুক্ত স্থান। এখানে জমিও

খুব কম দামে পাওয়া যায়। তাই শ্মশানে অনেক সাধক শ্মশান কালীমাতার মন্দির স্থাপন করে সাধনা করেন।'

(রচনাটি স্থানীয় ভাষা বজায় রেখে লেখা হল)

শব্দার্থ :

এসোনি—এসোনা
গেড়ে দেওয়া—পুঁতে দেওয়া
পাঁশ—ছাই

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. শ্রীমদ্ স্বামী অমেয়ানন্দজী মহারাজ, অধ্যক্ষ, শ্রীশ্রী মাতৃমন্দির শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া
২. মাননীয় শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, প্রাক্তন শিক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যাপীঠ, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া



শ্মশানে স্মৃতিবেদী। ছবি : এস. বি. জানা।

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষিকা, ভারতীয় নৃপজ্ঞান সংস্থান।

বোড়াইচণ্ডীতলা শ্মশান

কল্যাণ চক্রবর্তী

বিশাল বটগাছটা যেন মেঘে ছাওয়া আঁধার করা মূর্তি। চারিদিকে বেতগাছ। শব্দহীন বিজনতায় পূর্ণ নদীতীরের এই শ্মশানটি। গঙ্গা এখানে দক্ষিণ বাহিনী। অদ্ভুত এক মায়ারাজ্যের পরিবেশ। ধরিত্রীর বুক ফাঁক করে ওঠা বিশাল বটগাছটার গায়ে অসংখ্য ঝুরি।

ধ্যানে মগ্ন এক সন্ন্যাসী। পাশেই খড়ে ছাওয়া একটা ছোট্ট কুটির। পায়ে চলা সরু রাস্তা এগিয়ে গেছে পশ্চিমমুখো। বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা লাল সালু। সন্ন্যাসীর সামনে ধুনি জ্বলছে। জ্বলছে সেই রাত থেকে। নরকঙ্কালের করোটির দুচোখে লাল সিঁদুরের ঢেলা। মাটির খুরিতে রাখা কারনবারি দুটো কুকুর অনেক আগেই চেটেপুটে সাফ করে দিয়েছে। সন্ধ্যার পর শবদাহ করতে কেউই প্রায় আসে না। ঘন বেতগাছের ফাঁকে দিনের আলো যেন সিঁধোতে সাহস করে না। ধরিত্রীর এই সন্তানেরাই আগলে রেখেছে শ্মশানটিকে। দূরদুরান্তের স্বাধুসন্তরা আসেন মাঝে মধ্যে। লোকের মুখে মুখে ফেরে চন্দননগরের বোড়াইচণ্ডীর শ্মশানের স্থান মাহাত্ম্য।

সিংহলে আটকে রয়েছেন শ্রীমন্ত সওদাগরের বাবা। শ্রীমন্ত নির্দেশ পেলেন গর্ভধারিনীর কাছ থেকে। চন্দননগরের বোড়াইচণ্ডীর শ্মশানে পুজো দিয়ে যেতে পারলে মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। বিশাল বাণিজ্যতরী এসে ভিড়ল শ্মশানে। পায়ে পায়ে শ্রীমন্ত সওদাগর এসে পৌঁছলেন সন্ন্যাসীর সামনে। নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন আশীর্বাদ। শ্রীমন্ত মনেপ্রাণে অনুভব করলেন মানবায়িত দেবস্থানের মাহাত্ম্য। বোড়াইচণ্ডীতলার শ্মশানে শ্রীমন্ত ভীষণতাকে পেলেন না। পেলেন মাধুর্য আর রমণীয়তা। সন্ন্যাসীর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব যেন অনাবিল আনন্দের পটভূমি। সুর নেই, শব্দ নেই। শুধুই নির্লিপ্ত সাধনা। নৈবেদ্য মন নিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন শ্রীমন্ত। অনির্বচনীয় এক শিহরণ খেলে গেল শরীরে। সন্ন্যাসীর পুণ্য দর্শনের শ্রীমন্ত পেলেন মহাভাবনা। শ্মশান যেন বিষামৃত তীর্থরেণু। জীবন মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বরণ করে সেই বিষামৃত তীর্থরেণুকে।

হরিহর সাধু থামলেন। শ্মশানে রয়েছে কৃষ্ণকালী মূর্তি। ডাকাতেরা প্রতিষ্ঠা করেছিল। শ্রীমন্ত সওদাগরের বোড়াইচণ্ডীতলার খ্যাতি এখন জগৎ জোড়া। দুর-দূরান্তের মানুষ আসেন বাসনা পূরণের আশায়। এমনিই এক মৃতপ্রায় শিশুকে নিয়ে শ্মশানে এলেন ধীরাজ-এর মা। আকুল আবেদন তন্ত্রসিদ্ধ হরিহর সাধুর কাছে। বাঁচান আমার সন্তানকে। দৈব প্রভাবে বাঁচলেনও ধীরাজ পাল। শ্মশানের কৃষ্ণকালীর মূর্তির সামনে পড়ে থাকলেন ধীরাজ। তারপর থেকে শ্মশানই তাঁর ঘরবাড়ি।

চন্দননগরে ফরাসিরা আসেন ১৬৭৩-এ। তারও একশো বছর আগে পর্তুগীজ জলদস্যুরা যাতায়াত করত এই পথ ধরে। বোড়াইচণ্ডীতলার শ্মশান তখন মহাশ্মশান হয়নি। ছিল অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। ছিল মুক্ত জীবন। শ্মশানে চিতা জ্বলত গুটিকয়েক। কয়েক ঘর জেলের বাস ছিল চন্দননগরে। অনির্দেশ, অব্যক্ত রহস্য মাখানো ছিল সেদিনের শ্মশান। কানপাতলে একটানা কি-র্-র্-র্ শব্দ শোনা যেত। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার, নিবিড় হওয়ার বাসনায় ছুটে আসতেন সাধক সাধিকার দল। নিস্তব্ধ বেতবন, নিঃসঙ্গ বটগাছ, ক্ষীণ নক্ষত্রের আলোয় মায়াবী ছিল সেকালের শ্মশান।

হরিহর সাধুর কাছে অনেক কথাই শুনেছেন ধীরাজ। তন্ত্রের সাধনা সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ কামনার জন্য। নিম্ন থেকে উচ্চবর্ণের মানুষকে পশুধর্ম পথ থেকে দেবত্বে উন্নীত করার সোপান হল তন্ত্রসাধনা। মূলত সমাজের শ্রমজীবী মানুষেরাই এগিয়ে আসতেন এই সাধনায়। গৃহস্থের আলাদা করে সাধনার প্রয়োজনা হত না। প্রকৃতির অনুগামী হয়ে চললে দেবত্ব আসবে নিজের পথেই। মানব জন্মের সার্থকতা হল সৃষ্টির মূল সুরটি ধরা। তন্ত্রের মূল কথা, সুস্থ সবল নীরোগ শরীর। যৌবনের তৃষ্ণা নিয়েই প্রবেশ করতে হবে তন্ত্র সাধনায়। নারী পুরুষের মিলিত জীবন নিয়ে যে সংসার তাকে উপেক্ষা করে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। বৈদিক আর্যধর্মে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ছাড়া অন্য জাতির ধর্ম আচরণের সুযোগ নেই। শূদ্র এবং মেয়েদের ধর্মাচরণের সুযোগ দেয়নি সমাজ। তন্ত্র সেই অর্থে সর্বজনীন। নারী ও নরের জীবন কাব্যই এখানকার পাঠ। নারী পুরুষের প্রেম আনে প্রণয়। হয় সৃষ্টি। সৃষ্টির এই মূল সুরকে ধরে এগিয়ে চলে তন্ত্রের সাধনা। ভোগ আর কামের শেষে আত্মজ্ঞানের প্রসার। মই বেয়ে উঠে মইকে ফেলে দেওয়া। তন্ত্রসাধনা তাই প্রকৃতিকে ধরে, উপেক্ষা করে নয়। সমাজের একেবারে নিম্নস্তরের মানুষের আসা যাওয়া এই শ্মশানে। এই শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষেরাই জ্বালিয়ে রেখেছে শ্মশানের চিতা। তন্ত্রাচারের নিয়মে তাই নারী ব্যতীত সাধনা হয় না। সভ্য সমাজ খাদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনের নাম শুনলে শিউরে ওঠেন। ব্যাভিচারের পাঠশালা না-কি শ্মশান! গার্হস্থ জীবনে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিশ্চিন্তে সকলে কম-বেশি করে চলেছেন পশ্বাচার। শ্মশানের সন্তান যদি জারজ হয়, সভ্য সমাজের রতিক্রিয়ার কোনো সভ্য ব্যাখ্যা নেই। তন্ত্র প্রথম ধরিয়ে দেয় বিকৃতি। পঞ্চ-ম'কারের শেষ প্রান্তে রয়েছে এক উদার ধর্ম। স্বাস্থ্যপূর্ণ এক সৎ ব্যক্তিত্বের ছবি আঁকতে সাহায্য করে তন্ত্রশাস্ত্র। উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে নেই; আছে প্রবল মনশক্তি সম্পন্ন সৎ ব্যক্তিত্ব তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা। থামলেন হরিহর সাধু। নারায়ণদাসী মুখ টিপে হাসছেন।

বিবাহের আদি সংস্কারের বেড়া টপকে এই শ্মশানে ছিলেন তারাক্ষ্যেপী। পশ্বাচার আর বীরাচারের ভেদাভেদ তিনি মানেন নি। সেদিনের শ্মশান ছিল পাশের মাঠে। ছিল না ছাউনি। দুলাল পতি বা ছোটুয়া কেউই বলতে পারে না কবে থেকে তাদের বাবারা ডোমের কাজ শুরু

করেছে। সেদিন ছিল না শ্মশানের পাশে ইটখোলা।

সতীদাহ'র জন্য বিখ্যাত ছিল বোড়াইচণ্ডীতলার শ্মশান। ১৭৮৫, ১৭৯০, ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে শেষ সতীদাহ হয়েছিল বোড়াইচণ্ডীতলার শ্মশানে। পাশাপাশি চলত দাস ব্যবসা। ফরাসিদের সাহসী প্রচেষ্টায় চন্দননগরে বন্ধ হল সতীদাহ প্রথা। সে সময় অর্থাৎ ১৮৭০-এ চন্দননগরে গঙ্গায় বাঁধা ঘাটের সংখ্যা ছিল ২৯টি। শেয়াল এখনও প্রহর ডাকে। জ্যোৎস্না রাতে অথবা গভীর অন্ধকারে বিপ্লবীদের আসা যাওয়ার পথ ছিল এই শ্মশান। পণ্ডিচেরী যাবার আগে শ্রীঅরবিন্দের নৌকা এসে ভিড়েছিল এই শ্মশানে। এসেছিলেন বরেণ্য দেশপ্রেমিকের দল।

বোড়াইচণ্ডীতলার শ্মশানে কান পাতলে আজও শোনা যাবে অসংখ্য জীবন নাট্যের ধ্বনি। অষ্ট সিদ্ধির জন্য আজও বিখ্যাত এই শ্মশান। সর্বহারা মানুষের যজ্ঞশালা। আজও চলেছে তৃষ্ণার্ত অন্বেষণ। চিরশান্তির দেশে এখনও রয়েছে উপাসনার ব্রাহ্ম মুহূর্ত। এই শ্মশান তাই মানুষের মিলনভূমি। হারিয়ে যাওয়া চিন্ময় জীবনের অস্পষ্ট ছবি। ফসল ভরা সেই নৈবেদ্যর কাহিনি কেউ লিখে গেলেন না। সমবেত মনের বৃন্দগান কেউ লিখল না। আত্মার বিনিময়ে আত্মার কাছে যাওয়ার এই যে মিছিল তার চরণচিহ্ন বুকে ধরে আজও বেঁচে আছে চন্দননগরের বোড়াইচণ্ডীতলার মহাশ্মশান। শ্মশানের চিন্ময় সুর বাজছে যুগ যুগান্ত ধরে। অনির্বচনীয় সেই শাশ্বত জীবন কথার তৃষ্ণা। রয়েছে চিতার বুকে। মানুষ খেয়েও তার আশ মিটছে না। নিঃসীম জীবনের গান শুনতে হলে চাঁদনী রাতে একবার আসতে হবেই এই শ্মশানে।

শ্মশানের মন্দিরে এখন রয়েছেন মহামায়া। ধীরাজ পালের বড় মেয়ে।

প্রশ্ন করলাম, ভয় করে না?

হেসে বল্লেন না। ছোট থেকেই আছি তো।

দুঃখ হয়নি কখনও?

পড়ন্ত বিকেলের আলো এসে পড়েছে মুখে। ম্লান সেই মুখ।

হ্যাঁ, একবার হয়েছিল। এগারো বছরের একটা ছেলে জলে ডুবে গিয়েছিল। ওকে দেখে দুঃখ হয়েছিল।

শিশু যেন না আসেন শ্মশানে।

ফসল ভরা নৈবেদ্য মন নিয়ে ফিরলাম বোড়াইচণ্ডীতলার শ্মশান থেকে। শ্মশান যেন নর-নারায়ণের তিল-তুলসি।

হারিয়ে যাওয়ার সুখ স্মৃতিই শুধু রয়েছে এই মানবতীর্থে।

❑ লেখক পরিচিতি : গবেষক, প্রাবন্ধিক।